পৌরাণিকা

পৌরাণিক অভিধান

১ম খণ্ড : অ—প

অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * *

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম (প্রাঃ) লিমিটেড
২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট
কলিকাতা—৭০০০১২

প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা—১৯৬৮

অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
জন্ম—১৯২১

মুদ্রক :
শ্রীঅরুণ কুমার পাইন
আরিফ প্রিন্টার্স
৫১।১।১ সিকদার বাগান স্ট্রিট
কলিকাতা—৭০০০০৪

উৎসর্গ

অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুর করকমলে

পৌরাণিকা

অ—প্রণবের আদি অক্ষর।

অওঘড়—সন্ন্যাসী ব্রহ্মগিরি প্রতিষ্ঠিত দশনামী সম্প্রদায়। গোরক্ষনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়। গুজরাট অঞ্চলে। মোহান্তের মৃত্যু হলে সন্ন্যাসীদের মধ্য থেকে একজনকে বিশেষ ক্রিয়া অনুষ্ঠানের পর মোহান্ত করে নেওয়া হয়। সুখড়, রুখড়, ভুখড়, কুকড়, গুদড় ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে আচার অনুষ্ঠানে অনেক মিল।

অংশাবতার—দ্রঃ অবতার।

অংশু—একজন আদিত্য (দ্রঃ)।

অংশুবর্মা—নেপালে লিচ্ছবি-রাজ শিবদেবের মহাসামন্ত। শিবদেব নামেমাত্র রাজা ছিলেন। আভীরগণ নেপাল দখল করলে ইনি বাহুবলে তাদের হারিয়ে দেন। ফলে প্রতিপত্তি বেড়ে যায় এবং শেষকালে নিজের নামেই রাজত্ব করেন। হিউএনৎসাঙ-এর মতে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচয়িতা সম্বৎ ৬০০-৬২৫ পর্যন্ত নেপালের সর্বময় কর্তা।

অংশুমতী—গন্ধর্বরাজ দ্রমিলের মেয়ে; ধর্মগুপ্তের স্ত্রী।

অংশুমান—(১) সূর্য বংশীয় রাজা। বাহুক-সগর-অসমঞ্জ-অংশুমান-ভগীরথ। সগরের ষাট হাজার ছেলে কপিলমুনির ক্রোধে মারা গেলে ইনি এসে মুনিকে স্তবে সন্তুষ্ট করে ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে যান। এবং মুনির কাছে, অন্যমতে গরুড়ের কাছে জেনে যান, স্বর্গ থেকে গঙ্গা আনতে পারলে সেই জলের স্পর্শে মৃতরা উদ্ধার পাবে। সগরের পর অংশুমান রাজা হন। গঙ্গাকে আনবার জন্য পরে তপস্যা করেছিলেন কিন্তু মারা যান। এঁর ছেলে ভগীরথ/দিলীপ। দ্রঃ পঞ্চজন। (২) দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে একজন অংশুমান রাজা এসেছিলেন।

অংহু—ঋক্‌বেদে এক অসুর। পুরুকুৎস মুনিকে খুব বেশি বিব্রত করত। এই অসুর ও এর সাতটি পুরীকে ইন্দ্র ধ্বংস করেন।

অকম্পন—রাবণের মামা ও একজন সেনাপতি। সুকেশ-সুমালী-অকম্পন। পিতা সুমালী মা কেতুমতী। অকম্পনের বোন নিকষা, কুম্ভীনসী; ভাই ধূম্রাক্ষ ও প্রহস্ত। দণ্ডকারণ্যে রামের হাতে রাক্ষসেরা মারা গেলে রাবণকে খবর দেন রাম যুদ্ধে অপরাজেয়। ইনিই সীতা হরণের পরামর্শ দেন। লঙ্কার যুদ্ধে হনুমানের হাতে মৃত্যু।

অকম্পিত—বুদ্ধবিশেষ।

অকলঙ্ক বা অকলঙ্কদেব—সমন্তভদ্রের সমসাময়িক একজন জৈন নৈয়ায়িক। বহুস্থানে কুমারিলভট্ট এঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। কিন্তু কুমারিলভট্টকে বিদ্যানন্দ পাত্রকেশরী ও প্রভাচন্দ্র সমর্থন করতে পারেন নি। পাণ্ডবপুরাণের প্রথমে শুভচন্দ্র

এঁকে নৈয়ায়িক হিসাবে প্রশংসা করেছেন। রাষ্ট্রকূটের রাজা সাহসতুঙ্গদন্তিদুর্গের রাজত্বকালে (অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ) অকলঙ্কদেব জীবিত ছিলেন। তত্ত্বার্থরাজ-বর্তিকা, অষ্টশতী ও তিনটি জৈনগ্রন্থ (ন্যায় বিনিশ্চয়, লঘীয়স্ত্রয়, স্বরূপ সম্বোধন) এঁর রচনা।

অক্‌সস্—অন্য নাম আমুদরিয়া। রুসীয় তুর্কিস্থান ও মধ্য এসিয়ার প্রধান নদী। পামির মালভূমিতে উৎপন্ন ও আরল সাগরে এসে পড়েছে। অক্‌সস ও হিন্দুকুশের মধ্যে প্রাচীন বহ্লীক বা ব্যাকট্রিয়া রাজ্য অবস্থিত ছিল। পরে অকসস উপত্যকায় ইউচিগণ বাস করতেন। বর্তমানে রুশ-আফগান সীমান্ত।

অকালকুষ্মাণ্ড—অকালে জাত কুষ্মাণ্ড। গান্ধারী অকালে কুষ্মাণ্ডাকার মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। এই মাংসপিণ্ড থেকে শতপুত্র জন্মায় এবং পরে এদের জন্য বংশ নাশ হয়।

অকালপূজা (বা অকাল বোধন)—সূর্যের উত্তরায়ণ দেবতাদের দিন ; দক্ষিণায়ণ রাত্রি। রাত্রিতে পূজা অবিধেয়। ফলে দেবতাদের রাত্রিকালে পূজা করতে হলে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রয়োজন। লঙ্কার যুদ্ধের প্রাক্‌কালে রাম অকালে দুর্গাপূজা করে-ছিলেন। শারদীয় পূজা রামের এই অকালপূজা।

অকূপার—হিমালয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন (দ্রঃ) হ্রদে এক কচ্ছপ , বিষ্ণুর অবতার বলে উল্লিখিত।

অকৃতব্রণ—একজন ঋষি। পরশুরামের প্রিয় শিষ্য। নৈমিষারণ্যে মহাভারত প্রবক্তা সূত এঁর শিষ্য। শিবকে সন্তুষ্ট করে কিছু অস্ত্র লাভ করে পরশুরাম বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে এক গুহাতে একটি ব্রাহ্মণ বালককে বাঘের হাত থেকে রক্ষা করেন। বাঘটি একটি গন্ধর্ব ; তীর বিদ্ধ হয়ে শাপমুক্তি পেয়ে পরশুরামকে প্রণাম করে চলে যায়। বালকটি পরশুরামের কৃপায় অকৃত-ব্রণ (অ-ক্ষত) ছিল ; পরশুরামের শিষ্য হয়ে যান। পাণ্ডবদের বনবাসের সময় অকৃতব্রণ যুধিষ্ঠিরকে পরশুরামের কাহিনী শোনান। মহাভারতে বেশ কয়েক বার এঁর উল্লেখ আছে। অম্বা সকলের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মাতামহ হোত্রবাহের পরামর্শে এই অকৃতব্রণের কাছে সব কথা জানান। অকৃতব্রণ এঁকে আশ্বাস দেন এবং পরশুরামকে সব কিছু জানান। ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে পরশুরামের সারথি ছিলেন।

অক্রূর—বৃষ্ণি- যুধাজিৎ- শিনি-সত্যক- সাত্যকি- জয়-কুণি-অনমিত্র-বৃষ্ণি-শ্বফল্‌ক-অক্রূর। মা গান্দিনী। সম্পর্কে কৃষ্ণের কাকা। আহুকের কন্যা সুতনু স্ত্রী ; পুত্র দেবক ও উপদেবক। অন্য মতে উগ্রসেনের জামাতা। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত। যাদব সেনবাহিনীর বিখ্যাত নায়ক। ভাই অসঙ্গ। এক সময় ইনি কংসের বাড়িতে থাকতেন। কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করার জন্য কংস ধনুর্যজ্ঞ করেন এবং এই যজ্ঞে কৃষ্ণ ও বলরামকে আনবার জন্য এঁকে বৃন্দাবনে পাঠান হয়। কৃষ্ণকে ইনি সব জানিয়ে দেন এবং কংসকে হত্যা করে যাদবদের রক্ষার জন্যও অনুরোধ করেন। এক সময় অক্রূর সত্যভামার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। শতধন্বা এঁকে স্যমন্তক (দ্রঃ) মণি দিয়ে পালিয়ে যান। এই মণির গুণে অক্রূর ব্যয়সাধ্য যাগযজ্ঞও করতে পেরেছিলেন। দ্রৌপদীর

স্বয়ংবর সভাতে ছিলেন। সুভদ্রা হরণের সময় রৈবতক পাহাড়ে বনভোজনে গিয়েছিলেন। সুভদ্রার বিয়ের যৌতুক নিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের কাছে এসেছিলেন। অভিমন্যুর বিয়ে উপলক্ষ্যে উপলভ্যে গিযেছিলেন। পাণ্ডবদের সম্পর্কে ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব জানবার জন্য কৃষ্ণের কথায় ইনি হস্তিনাপুরে দূত হয়ে যান এবং কুন্তীব সঙ্গেও দেখা করে আসেন। অক্রূর ও আহুক সব সময়ই পরস্পরকে দোষ দিতেন যে, তাঁরা বিরোধীদলকে সমর্থন করছেন। প্রথম জীবনে মথুরাতে ও শেষ জীবনে দ্বারকায় কাটান। যদুবংশ ধ্বংসের সময় মৃত্যু হয়।

অক্রোধ—অযুতনায়ী রাজা ও রানি কামা'র ছেলে।

অক্ষ—(১) অক্ষয় দ্রঃ। (২) কাশ্মীরের রাজা দ্বিতীয় নররাজের ছেলে। গোপাদিত্যের পিতা। ৫৯৮ শকাব্দের আগে। এঁর তৈরি দেবপুরীর নাম অক্ষবাল।

অক্ষক্রীড়া—পাশাখেলা। দ্যূত বা জুয়া খেলাও এই নামে পরিচিত। দাবা খেলাও বোঝাত। কোজাগর পূর্ণিমা রাত্রিতে অক্ষক্রীড়া করে রাত জাগার ব্যবস্থা আছে। রঘুনন্দন তাঁর তীর্থতত্ত্বে এর ব্যাখ্যাও করেছেন। এই ক্রীড়া কিন্তু শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। মহাদেব এই খেলার সৃষ্টি করে পার্বতীর সঙ্গে খেলতেন (ব্রহ্ম-পুঃ)। মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে আছে, এই পাশাখেলা রাজ্য নাশ করে: রাজা যেন এই খেলা বন্ধ করে দেন। নলরাজ ও যুধিষ্ঠির এই খেলাতে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। প্রাচীন কালে বহু প্রচলিত। আধুনিক খেলার পদ্ধতি অন্য ধরণের।

অক্ষপাদ—অক্ষপাদ-গৌতম ন্যায় দর্শনের প্রবর্তক। খৃঃ ২ শতকে বা কিছু পরে। ৫ অধ্যায়যুক্ত ন্যায় সূত্রে ইনি প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ-নিরূপণ ও পরীক্ষা করেছেন। বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্য গৌতমসূত্রের সর্বপ্রাচীন ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এঁর প্রকৃত নাম গৌতম। বেদব্যাস এঁর রচিত গ্রন্থের নিন্দা করলে ইনি ব্যাসের মুখ দেখবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। পরে ক্ষমা চাইলে ইনি প্রতিজ্ঞা না ভেঙে নিজের পায়ের ওপর নতুন চোখ তৈরি করে সেই চোখে ব্যাসের মুখ দর্শন করেন। অক্ষ (=চক্ষু) যাঁর পাদদেশে।

অক্ষপ্রপতন—আনর্ত দেশে একটি জায়গা। এখানে গোপতি ও তালকেতু ইত্যাদি দৈত্যকে কৃষ্ণ নিহত করেন।

অক্ষমালা—(১) রুদ্রাক্ষ মালা। জপের জন্য। শৈব ও শাক্তরা এই মালা হাতে বা গলায় ধারণ করেন। (২) অরুন্ধতীই শূদ্রকন্যা অক্ষমালা হয়ে জন্মান। বশিষ্ঠের সঙ্গে বিয়ে হয়। বশিষ্ঠের সংস্পর্শে এসে ইনি অসামান্য গুণবতী হয়ে উঠেছিলেন। আকাশে উত্তর দিকে বশিষ্ঠ সমীপে অরুন্ধতীকে বেষ্টন করে মালার মত অবস্থিত সপ্তর্ষিমণ্ডল।

অক্ষয়—মন্দোদরীর গর্ভে রাবণের এক ছেলে। সীতার অভিজ্ঞান নিয়ে ফেরার সময় হনুমান দ্বিতীয় দফার যুদ্ধে এঁর দ্বারা আক্রান্ত হন। হনুমানের হাতে মারা যান।

অক্ষয় তৃতীয়া—বৈশাখে শুক্লাতৃতীয়া। অতি পুণ্য দিন। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে বলেছেন এই দিনে সত্য যুগের উৎপত্তি। জনার্দন এই দিনে সব সৃষ্টি করেছিলেন ও

গঙ্গাকে দেবলোক থেকে মর্ত্যে আনা হয়েছিল। এই দিনে দান ইত্যাদি কাজে অক্ষয়পুণ্য। এই দিনে কৃষ্ণের চন্দন যাত্রা অর্থাৎ চন্দন পরান হয়। অনেকে এই দিন জলপূর্ণ কলসী দান করেন ও লক্ষীনারায়ণের পূজা করেন। বহু ব্যবসায়ী এই দিনে নতুন খাতা করেন।

অক্ষয় পাত্র—বনবাসের সময় দ্রৌপদী এই পাত্রে রান্না করতেন। সূর্যের কাছে প্রার্থনা করে পেয়েছিলেন। দ্রৌপদীর খাবার আগে এতে অন্ন কোন দিন শেষ হত না; অতিথি সৎকারে অত্যন্ত সহায়ক ছিল।

অক্ষয় বট—প্রলয়ের সময় বিষ্ণু বটপাতায় অবস্থান করেছিলেন। ফলে ধারণা বটগাছ অমর ও অর্চনীয়। প্রয়াগ, পুরী, গয়া, ভুবনেশ্বর চন্দ্রনাথ ইত্যাদিতে এক একটি এই বট গাছ আছে। ধারণা এগুলি অমর; এবং এদের জল দিলে ও পূজা করলে অক্ষয় পুণ্য হয়। প্রয়াগের গাছটি কেল্লার মধ্যে; এর চার দিক ভরাট হয়ে ওঠার জন্য সমতল থেকে গাছটি নীচে অবস্থিত। আকবরের সময় হিন্দুরা এই গাছের তলা থেকে নীচে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করত। গঙ্গা তখন পাশেই ছিল। বৈতরণীর তীরেও অক্ষয়বটের উল্লেখ আছে। দ্রঃ-গয়।

অক্ষর—সাংখ্যের প্রকৃতি। শিব, বিষ্ণু, আকাশ, ধর্ম, মোক্ষ।

অক্ষরবৃত্ত—সংস্কৃত ছন্দ। গীত কবিতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ধ্বনি গাম্ভীর্য, বাক্যের সম্প্রসারণ ক্ষমতা ও সুর বৈচিত্র্যের জন্যও সমাদৃত।

অক্ষহৃদয়—রাজা ঋতুপর্ণের কাছে নল (দ্রঃ) এই মন্ত্র লাভ করেন। এই মন্ত্রের ফলে পাশা খেলার সমস্ত রহস্য জানা যায়। গাছে কত পাতা বা ফল আছে গুণতে পারা যায়। এই মন্ত্র শেখার ফলে নলের দেহ থেকে কলি বার হয়ে যান এবং পরে পাশা খেলাতে নল জয়ী হন।

অক্ষোভ্য—পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের অন্যতম। বিজ্ঞানস্কন্ধ-স্বভাব ও বজ্রকুলী বলা হয়। মামকী ইঁহার প্রজ্ঞা। সমস্ত বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থে এঁর বর্ণনা ও উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ সংস্কৃতি যে দেশে রয়েছে সেখানে এঁর নানা আকারের মূর্তি ও ছবি পাওয়া যায়। বাহন দুটি হাতী; চিহ্ন বজ্র। তিব্বত ও চীনে বিশেষ সমাদৃত। অক্ষোভ্যের রঙ নীল। আক্ষোভ্য থেকে উদ্ভূত দেবতাদের মধ্যে হেরুক (দ্র:) অগ্রগণ্য।

অক্ষৌহিণী—অক্ষ (গজাদি + উহিনী; সংখ্যাকারিণী); অশ্বগজাদির সংখ্যাকারিণী। ২১৮৭০ রথ + ২১৮৭০ হাতী + ২১৮৭০ × ৩ ঘোড়া + ২১৮৭০ × ৫ পদাতিক মিলে ২১৮৭০ × ১০ অংশ যুক্ত সেনাবাহিনী। আবার ১ রথ + ১ হাতী + ৩ঘোড়া + ৫ পদাতি = ১ পত্তি × ৩ = ১ সেনামুখ × ৩ = ১ গুল্ম × ৩ = ১গণ × ৩ = বাহিনী × ৩ = ১পৃতনা × ৩ = চমূ × ৩ = ১ অনীকিনী × ১০ = অক্ষৌহিণী। পত্তির নায়ক পত্তিপতি এবং এই ভাবে সেনামুখ-নেতা, গুল্মনায়ক, গণনায়ক, বাহিনীপতি, পৃতনাপতি, চমূপতি ইত্যাদি। বহু জায়গায় অবশ্য অক্ষৌহিণী কেবল পরিমাণ বাচক; যেমন:—রাবণের বাহ্যভাণ্ড সাত অক্ষৌহিণী।

অগতি—লক্ষ্মণ উর্মিলার ছেলে তক্ষ ও ছত্রকেতুর জন্মস্থান, প্রাচীন নাম কনখল। বক্ষ

জাতি তাড়িয়ে দিয়ে লক্ষ্মণ এখানে নগরী স্থাপন করেন। অগতি তক্ষের রাজধানী হয়।
অগস্ত্য—অগ+স্তৈ (স্তম্ভিত করা); পর্বতকে যিনি স্তম্ভিত করেছেন। বংশঃ—ব্রহ্মা—মরীচি—কশ্যপ—সূর্য—অগস্ত্য। দ্বিতীয় জন্মে মিত্রাবরুণের (দ্রঃ) ছেলে। অন্য নাম অগস্তি, কুম্ভসম্ভব, ঘটোদ্ভব, মৈত্রাবারুণি, পীতাব্ধি, বাতাপিদ্বিট, আগ্নেয়, ঔর্বশীয়, অগ্নিমারুত। স্বনাম খ্যাত মন্ত্রকার ঋষি। বেদজ্ঞ; বহু বিজ্ঞান জানতেন, বহু অস্ত্র চালনায় দক্ষ ছিলেন। স্ত্রী লোপমুদ্রা। ছেলে দৃঢ়াস্য বা দৃঢ়স্যু বা ইধ্মবাহ। শিষ্য অগ্নিবেশ। আদিত্য যজ্ঞে মিত্রও বরুণ উর্বশীকে দেখে যজ্ঞকুণ্ডে বীর্যপাত করেন। এই কুম্ভ থেকে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম এই জন্য নাম কুম্ভযোনি বা মৈত্রাবারুণি। মতান্তরে পুলস্ত্য পত্নী হবির্ভূ'র ছেলে। প্রতিজ্ঞা ছিল বিয়ে করবেন না। কিন্তু এক গুহাতে পিতৃপুরুষদের অধোমুখে ঝুলতে দেখলেন। বংশরক্ষা হবে না বলে এঁদের এই অবস্থা। ফলে বিয়ে করতে মনস্থ করেন। তপোবলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর অন্য অঙ্গ অংশ গ্রহণ করে পরমা সুন্দরী একটি মেয়ে তৈরি করে সন্তানের আশায় তপস্যারত বিদর্ভরাজকে এই মেয়েটির পালনের ভার দেন। এই জন্য মেয়েটির নাম হয় লোপমুদ্রা। মেয়েটি বড় হলে অগস্ত্য এসে বিয়ে করতে চান। সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু লোপমুদ্রা নিজেই রাজাকে অনুরোধ করেন। মহাসিন্ধু তীর্থে এঁদের বিয়ে হয়।
একদিন ঋতুস্নান করে এলে পুত্রকামনায় অগস্ত্য স্ত্রীকে ডাকেন। অন্য মতে লোপমুদ্রা নিজেই সন্তানার্থী হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু দাবি করেন কুমারী অবস্থায় তাঁর যে রকম অলঙ্কার ইত্যাদি ছিল সেই রকম অলঙ্কার দিতে হবে এবং ঋষিকেও উপযুক্ত ভাবে রত্ন আভরণে সাজতে হবে। অন্য মতে বল্কল ইত্যাদি অপবিত্র করতে চান নি; এইজন্য চেয়েছিলেন। অগস্ত্য তখন বাধ্য হয়ে ভিক্ষায় বার হন। প্রথমে শ্রুতর্বা রাজার কাছে। এবং পরে বধ্রাশ্ব এবং তারপর ত্রসদ্দস্য রাজার কাছে গিয়েও কিছু পান না। অসমর্থ রাজারা দানবরাজ ইল্বলের (দ্রঃ) কাছে যেতে বলেন। অন্যমতে অগস্ত্য তিন রাজাকে নিয়ে ইল্বলের কাছে যান। এরপর ইল্বলের ভাই বাতাপি অগস্ত্যের হাতে মারা পড়লে ইল্বল ভয়ে প্রচুর ধনরত্ন দেন। এবং বিশেষ একটি রথ দেন; রথে দুটি ঘোড়া ছিল বিবাজ এবং সুবাজ। রথে করে অগস্ত্য ফিরে আসেন। লোপমুদ্রার বাসনা পূর্ণ হয়। গর্ভবতী হলে অগস্ত্য একদিন জানতে চান লোপমুদ্রা কতগুলি ছেলে চান। হাজার সাধারণ ছেলে, না দশটি ছেলের সমান এক জন হবে এ রকম একশ ছেলে, না, একশ ছেলের সমান দশটি ছেলে, না হাজার ছেলের থেকেও গুণবান একটি ছেলে। লোপমুদ্রা একটি ছেলে চান। অগস্ত্য তথাস্তু বলে বনে চলে যান।

সাত বছর পরে এক রূপবান সন্তান জন্মায়। জন্মেই বেদ পাঠ করতে থাকেন; এবং পিতার জন্য ইধ্ম (সমিধ) সংগ্রহ করে আনত বলে নাম হয় ইধ্মবাহ। নারদ একবার এসে বিন্ধ্যকে বলেন চন্দ্রসূর্য মেরুপর্বতকে প্রদক্ষিণ করেন ইত্যাদি।

বিন্ধ্যপর্বত দাবি করে বসেন তাঁকেও প্রদক্ষিণ করতে হবে। সূর্য রাজি হন না। ফলে আকাশে মাথা তুলে সূর্যের পথ বিন্ধ্য বন্ধ করে দিল। সৃষ্টি বিপন্ন হয়ে পড়ল। বিন্ধ্যকে বোঝাতে না পেরে দেবতারা শেষ পর্যন্ত অগস্ত্যের শরণ নেন। অগস্ত্য বিন্ধ্যের গুরু; কাশী থেকে সস্ত্রীক অগস্ত্য এলে বিন্ধ্য মাথা নীচু করে প্রণাম করলে যতক্ষণ না দক্ষিণদিক থেকে ফিরছেন ততক্ষণ মাথা নীচু করে থাকবার নির্দেশ দিয়ে ১-লা ভাদ্র অগস্ত্য দক্ষিণাপথে চলে যান। মলয়াচলে আশ্রম বেঁধে বাস করতে থাকেন; আর ফেরেন নি। এইভাবে বিন্ধ্য দমিত হয়; সূর্যের পথ মুক্ত এবং নাম হয় অগ (পর্বত)—স্তম্ভিতকারী। অগস্ত্য সমুদ্র পান করে ফেলে কালকেয়দের (দ্রঃ) বার করে দেন। রাজা নহুষকে (দ্রঃ) শাপ দিয়েছিলেন। ইন্দ্রের অতিথি হয়ে একবার স্বর্গে যান। অগস্ত্যের সম্মানে ইন্দ্রের সভাতে উর্বশী এসেছিল। নাচতে নাচতে জয়ন্তের দিকে চেয়ে উর্বশীর তালভঙ্গ হয়, নারদের বীণা 'মহতী'ও বেসুরো হয়ে পড়ে। ফলে অগস্ত্য শাপ দেন জয়ন্ত কোরক/বংশ হয়ে, উর্বশী মাধবী হয়ে এবং মহতী বীণা মানুষের বীণাতে পরিণত হবে।

অসুর শূরপদ্ম স্বর্গ থেকে ইন্দ্রদের তাড়িয়ে দিলে ইন্দ্র এসে শিয়ালিতে তপস্যা করতে থাকেন। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। কাবেরী নদী এই সময় অগস্ত্যের কমণ্ডলুতে ছিলেন। গণপতি ঘটনাটা জানতে পেরে কাকের বেশে এসে কমণ্ডলু উল্টে ফেলে দেন। অগস্ত্য কাকের পেছনে তেড়ে যান; কাক তখন বালকের রূপ ধরে পালাতে চেষ্টা করেও ধরা পড়ে যান। বালক তখন নিজের রূপ ধরে বর দেন অগস্ত্যর কমণ্ডলুতে/কাবেরী নদীতে কোন দিন জলাভাব হবে না। অগস্ত্য একবার বার বছর ব্যাপী যজ্ঞ করেন। বহু ঋষি আসেন। কিন্তু যজ্ঞ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। তবু অগস্ত্য আগত সকলকে ভূরিভোজন করাতে থাকেন এবং বলেন প্রয়োজন হলে নিজেই ইন্দ্র হয়ে বৃষ্টি দিয়ে শস্য রক্ষা করবেন। ভয় পেয়ে ইন্দ্র তখন বিরোধিতা বন্ধ করেন।

ইন্দ্র একবার ভৃগু বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষিদের নিয়ে তীর্থে যান এবং ব্রহ্মসরোবরে এসে অগস্ত্যের সমস্ত পদ্মফুল খেয়ে ফেলেন। অগস্ত্য জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে কে খেয়েছে ধরতে চেষ্টা করেন এবং ইন্দ্রকে ঠিক ধরে ফেলেন। ইন্দ্র তখন সমস্ত ফুল মুখ থেকে বার করে দেন। দেবতারা একবার অসুরদের হাতে পরাজিত হয়ে অগস্ত্যের শরণাপন্ন হলে অগস্ত্য তপোবলে অসুরদের পুড়িয়ে মারলে কিছু অসুর পাতালে ও পৃথিবীতে পালিয়ে যায়। স্বর্গ অসুর মুক্ত হয়। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে রাম ক্লান্ত হয়ে পড়লে অগস্ত্য রামকে আদিত্য হৃদয় মন্ত্র দান করেন। এই মন্ত্রে রাম ক্লান্তি জয় করে রাবণকে নিহত করেন। শিবপার্বতীর বিয়েতে হিমালয়ে সমস্ত দেবতারা এলে হিমালয়ে স্থানটি দেবে যায়, পৃথিবীও ভারে সেই দিকে হেলে যায়। শিব তখন অগস্ত্যকে দক্ষিণ দিকে পাঠান। অগস্ত্য প্রথমে কুট্টালামে বিষ্ণু মন্দিরে আসেন। এখানে পুরোহিতরা

ছাইমাখা সন্ন্যাসীকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দিলে অগস্ত্য বৈষ্ণব সেজে ভেতরে ঢুকে মন্দিরের বিগ্রহকে শিবলিঙ্গে পরিণত করে দেন। তারপর আরো দক্ষিণে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়ে চেপে বসলে পৃথিবী আবার সোজা হয়ে ওঠে। রাজা খেল-এর পুরোহিত ছিলেন (ঋক্)। সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলে দত্তাত্রেয়, প্রমুচি, নমুচি, বাল্মীকি, সোম, কণ্ডু অগস্ত্য ও এঁদের শিষ্যেরা ইত্যাদি দেখা করতে আসেন।

অগস্ত্য আশ্রম পঞ্চবটীর কাছে নাসিক থেকে ২৪ মাইল দ-পূর্বে। বনবাসের সময় পাণ্ডবরা এখানে এসেছিলেন। প্রয়াগের কাছে আর একটি আশ্রমের উল্লেখ আছে: এখানে লোমশ মুনির সঙ্গে যুধিষ্ঠির কিছুদিন ছিলেন। রামায়ণে একটি আশ্রমের উল্লেখ আছে। বনবাসের সময় রাম এঁর আশ্রমে এলে অগস্ত্য মহর্ষি-শ্বেত-এর (দ্রঃ) কাহিনী শোনান এবং শ্বেতমহর্ষির দেওয়া দিব্য আভরণ ইত্যাদি দান করেন। বৈষ্ণব ধনু, অক্ষয় তূণ ও অন্যান্য বহু দিব্য অস্ত্র রামকে দিয়েছিলেন। একটি মতে অগস্ত্য দত্ত ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে রাম রাবণকে নিহত করেন। শম্বুক বধের পর রাম এঁর আশ্রমে এলে এই সময়ে শ্বেতমহর্ষির দেওয়া দিব্য আভরণ ইত্যাদি দেন। যোগ বলে অগস্ত্য দেহত্যাগ করে নক্ষত্রলোক প্রাপ্ত হন।

অগস্ত্যের বিন্ধ্যদমন কাহিনী দাক্ষিণাত্যে আর্য উপনিবেশ স্থাপনের রূপক কাহিনী বলে অনেকের ধারণা। দ্রাবিড় জাতি অগস্ত্যকে তাঁদের প্রথম জ্ঞান-উপদেষ্টা বলে মনে করেন। তামিল ভাষার প্রবর্তক রূপেও অগস্ত্য প্রসিদ্ধ। ডঃ কলডোয়েলের মতে খৃঃ পূঃ ৬।৭ শতকে অগস্ত্যের আবির্ভাব। খ্রীষ্টীয় ৬ শতকে এই নামে একজন তামিল গ্রন্থকার ছিলেন। ভাই সুতীক্ষ্ণ। দ্রঃ-ইন্দ্রদ্যুম্ন, তাড়কা, সপ্তশাল, শূক, মণিমান, দুষ্পণা, ক্রৌঞ্চ।

অগস্ত্যনক্ষত্র—ক্যানোপাস। ভাদ্রের ১৭।১৮ তারিখে আকাশে দেখা যায়।

অগস্ত্যযাত্রা—অগস্ত্য যে দিন দক্ষিণাপথে গিয়েছিলেন। এই দিন যাত্রা নিষিদ্ধ। পরে প্রতি মাসে পয়লা তারিখে কোথাও যাওয়া নিষিদ্ধ হয়।

অগস্ত্যসংহিতা—অগস্ত্য প্রণীত ধর্মশাস্ত্র।

অগস্ত্যোদয়—দ্রঃ অগস্ত্য নক্ষত্র। শরৎকালের আগমন সূচনা করে।

অগ্নি—আগুন। তেজসের একটি রূপ। তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ। প্রত্যক্ষ দেবতা। ঋক্‌বেদে সূক্তসংখ্যার ভিত্তিতে ইন্দ্রের পরই এঁর স্থান। প্রায় ২০০ সূক্তে এঁর স্তব করা আছে। এ ছাড়াও অন্য দেবতাদের সঙ্গে অন্যান্য সূক্তেও অগ্নির উল্লেখ আছে। ঋক্‌বেদে প্রথম ও শেষ সূক্তেও অগ্নির বন্দনা রয়েছে। অগ্নির প্রধান কাজ যজ্ঞস্থলে দেবতাদের ডেকে আনা ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবির্বহন। তিনি মানুষ ও দেবতাদের দূত। ঋক্‌বেদে অগ্নি হোতা, পুরোহিত, ও ঋত্বিক রূপেও উল্লিখিত হয়েছেন। ঋক্‌বেদে অগ্নির জন্ম সম্বন্ধে আছে দ্যুলোক থেকে মাতরিশ্বা এঁকে আহরণ করেছেন। আবার আছে দুটি মেঘের মাঝখান থেকে

ইন্দ্র এঁকে উৎপাদন করতেন। আবার আছে মেঘ থেকে উৎপন্ন হয়ে পৃথিবীতে নেমে এসে অদৃশ্য হয়ে যান; মাতরিশ্বা অগ্নিকে আবার রূপ দেন এবং ভৃগুকে দান করেন। ঋক্‌বেদে অগ্নি বায়ুর পুত্র। কারণ অরণি ঘষবার সময় ব্যান বায়ু ঋষিদের সাহায্য করেন। সন্ধ্যাতে সূর্য অগ্নিকে তাঁর তেজ সমর্পণ করেন এবং সকালে আবার এই তেজ গ্রহণ করেন (ঋক্)। দেবতাদের একবার হাতে হব্যদ্রব্য লেগে গিয়েছিল। অগ্নি তখন জল থেকে একত, দ্বিত, ত্রিত (দ্রঃ) তিনটি ছেলের জন্ম দেন (ঋক্)। আবার আছে দ্যাবা ও পৃথিবী এঁর জননী। শাকপূণির মতে আকাশে সূর্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ ও পৃথিবীতে অগ্নি—অগ্নির এই তিন রূপ। অন্য মতে স্ত্রী ও পুরুষরূপী অরণিদ্বয়ের সংঘর্ষণে এঁর জন্ম। ঋক্‌বেদে অগ্নির কয়েকটি বিশেষণ দেখা যায়:—ঘৃতনির্ণিক, ঘৃতকেশ, দ্রূন্ন, ধূমকেতু, তমোহন, চিত্রভানু, শুক্রশোচিঃ, শুচিদন, কৃষ্ণবর্ত্মনি, হিরণ্যরথ, বৈশ্বানর, তনূনপাত, নরাশংস। ঋক্‌মন্ত্রে অগ্নির সঙ্গে ত্রিত্বসংখ্যার যোগ লক্ষণীয়। যেমন ত্রিষধস্থ, ত্রিপস্ত্য। গার্হপত্য, আবহনীয় ও দক্ষিণ—অগ্নির এই তিনটি রূপ সুবিদিত। যজুর্বেদে হব্যবাহন, ক্রব্যবাহন, ও আমাদ তিনটি রূপ দেখা যায়। ঋক্‌বেদে দৈবোদাস, ত্রাসদস্যব, বধ্রশ্বে রূপেও অগ্নির বর্ণনা আছে। ঋকবেদে অগ্নি রক্ষক, রক্ষোহন্; পুত্র, পশু ও হিরণ্যদাতা। অগ্নির বাহনের নাম রোহিৎ। ব্রাহ্মণ ও রাজন্যরা অগ্নিকে বিশেষ ভাবে পূজা করতেন।

অগ্নিকে বহু জায়গায় যুবা ও যবিষ্ঠ (তুলনায় গ্রীক-হেপাইটস্) বলা হয়েছে। দুটি কাঠের ঘর্ষণে (মন্থনে) অগ্নি জন্মায় বলে নাম প্রমন্থ (তুলনায় গ্রীক-প্রমিথি উস্)। অগ্নির আর এক নাম ভরণ্যু (তুলনায় ফোরোনিউস্)। যজ্ঞাংশ দেবতাদের কাছে পৌছে দেন বলে ঋক্‌বেদে অগ্নি দেবদূত (তুলনায় গ্রীক হারমেস/দেবদূত)। জাত মাত্রেই অগ্নি জনকজননীকে ভক্ষণ করেন। অগ্নি জলের গর্ভ বা ভ্রূণ। আকাশ ও পৃথিবীতে অগ্নির জন্ম ফলে অগ্নি দ্বিজ। গৃহে গৃহে অধিষ্ঠান বলে বহুজন্মা। ল্যাটিনে অগ্নির নাম ইগনিস্, ফরাসিতে ইগ্নি, স্লাভ-অগন্যু স্পেন ও ইতালিতে-ইগনেস্, বালটিক অগনে, ফা-আতশ।

অগ্নির দশটি মূর্তি:—ধূমার্চিঃ, উষ্মা জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্ফালিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্যবহা, কব্যবহা। অগ্নির জিব বা শিখা সাতটি বা সাত রকমের:—করালী, ধূম্রিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীললোহিতা, পদ্মরাগা ও সুবর্ণা। অগ্নির চার শিঙ, তিন পা, দুই মাথা, সাত হাত। ইনি ত্রিলোক দর্শক। উপাসকরা এঁর দয়ায় দীর্ঘ জীবন, ধন ও সমৃদ্ধি লাভ করেন। ক্ষুধা, দৈন্য ও শত্রু থেকেও ইনি রক্ষা করেন। দেবতাদের ইনি মুখ ও জিব। এই মুখ দিয়ে দেবতারা আহুতি গ্রহণ করেন। এঁর বর্ণনা কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত, ধূম্রপতাকা, হাতে জ্বলন্ত বর্শা, বাহন ছাগ। অন্যমতে চার হাত, লোহিত বর্ণ, অশ্বচালিত রথে ভ্রমণ করেন; সপ্তবায়ু এঁর রথের চাকা। ইনি স্থূলকায়, লম্বোদর, রক্তবর্ণ, কেশ, ভ্রূ ও চক্ষু পিঙ্গল; শক্তি ও অক্ষসূত্র ধারী। অন্যমতে রঙ বালার্ক সমান।

ধর্মের ঔরসে বসুর গর্ভে অগ্নির জন্ম; স্ত্রী স্বাহা, ছেলে পাবক, পবমান ও শুচি (দ্রঃ)। আর এক মতে স্বাহার তিন ছেলে দাক্ষিণ্যম, গার্হপত্যম, ও আবহনীয়। দ্রঃ অগ্নিত্রয়। ৬-ষ্ঠ মন্বন্তরে স্ত্রী বসুধারার গর্ভে দ্রবিণক ইত্যাদি। ৪৫ ছেলে। সব মিলে সংখ্যায় ৪৯-জন অগ্নি। অন্য মতে ব্রহ্মার মুখ থেকে জন্ম। আর এক মতে ব্রহ্মার বীর্য; সমুদ্রে পালিত। আর এক মতে অঙ্গিরার ছেলে (দ্রঃ বৃহস্পতি); সন্ধিলার প্রপৌত্র। সপ্তর্ষিদের মধ্যে একজন। অগ্নিকে ভৃগু (দ্রঃ) সর্ব-ভুক্ হবার শাপ দিলে রাগে অগ্নি অগ্নিহোত্র যজ্ঞ থেকে অন্তর্হিত হন। অগ্নির অভাবে ত্রিলোক বিপন্ন হয়ে পড়ে। পরে ব্রহ্মা অগ্নিকে সন্তুষ্ট করে বর দেন অগ্নি সব সময়ই পবিত্র; এবং যা স্পর্শ করবে তাও পবিত্র হবে। কেবল মাত্র অগ্নির গুহ্য-দেশের শিখা ও ক্রব্যাদ শরীর সর্বভুক হবে এবং অগ্নির মুখে যে আহুতি দেওয়া হবে তাই দেবতারা ভাগরূপে গ্রহণ করবেন।

শ্বেতকী রাজার যজ্ঞে অতিরিক্ত হবি খেয়ে অগ্নির কঠিন অগ্নিমান্দ্য রোগ হয়। ব্রহ্মার উপদেশে তখন খাণ্ডব বনের সমস্ত প্রাণী ভক্ষণ করতে যান। এই বন ইন্দ্রের রক্ষিত বন ছিল, ফলে ইন্দ্র বাধা দেন। বনের শত সহস্র হাতী শুঁড় করে জল দিয়ে এবং বহু শীর্ষ সাপেরা মাথায় করে জল এনে আগুন নিবিয়ে দেন। বার বার অকৃতকার্য হয়ে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাহায্যে খাণ্ডব-দহন (দ্রঃ) করে রোগমুক্ত হন। এই সময় অগ্নি বরুণদেবের কাছ থেকে কপিধ্বজ রথ, গাণ্ডীব ধনু ও দুটি অক্ষয় তূণ অর্জুনকে এবং সুদর্শন চক্র ও কৌমোদকী গদা কৃষ্ণকে এনে দেন। কার্তবীর্যার্জুনের (দ্রঃ) কাছেও একবার ভক্ষ্য চেয়েছিলেন।

কার্তিকের জন্মের জন্য শিব পার্বতী রমণ করছিলেন। বহু বছর কেটে যায়। দেবতারা ব্যস্ত হয়ে অগ্নিকে শিবের কাছে পাঠাতে চান। কিন্তু শিবের ভয়ে অগ্নি সমুদ্রে গিয়ে লুকিয়ে থাকেন। সমুদ্রে জল গরম হয়ে উঠতে থাকে; জলচর জীবেরা দেবতাদের সব জানিয়ে দেন অগ্নি সমুদ্রে লুকিয়ে রয়েছে। ফলে অগ্নির শাপে এরা মূক হয়ে যায়। অগ্নি তারপর মন্দার পাহাড়ে পেঁচা সেজে পালিয়ে যান। হাতী ও শুক পাখীরা এবারও দেবতাদের জানিয়ে দেয় অগ্নি গাছের কোটরে লুকিয়ে আছেন। অগ্নির শাপে এদেরও জিব নষ্ট (উল্টে) হয়ে যায়। কিন্তু পরে অগ্নি শুক পাখীর প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন এর ডাক শিশুর কলভাষণ মত মিষ্ট ও মনোজ্ঞ হবে। দেবতারা অগ্নিকে ধরে ফেলেন। অগ্নি তখন বাধ্য হন শিবের কাছে যেতে। অগ্নির উত্তাপে শিব উত্তেজিত হয়ে নিজের বীর্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। দ্রঃ কার্তিকেয়। অন্য মতে অগ্নি যখন ভৃগুর শাপে অভিভূত সেই সময়ে অসুরদের বিনাশের জন্য কার্তিকের জন্মের প্রয়োজনের কথা ব্রহ্মা বলেছিলেন এবং ব্রহ্মাই বলেছিলেন অগ্নিই একমাত্র সাহায্য করতে পারবেন। অগ্নি ভয়ে সমুদ্রে লুকান; প্রথমে ভেকরা বলে দেয় এবং অগ্নির কাছে অভিশপ্ত হয় এরা কোন কিছুর স্বাদ পাবে না। ভেকরা তখন দেবতাদের

কাছে অভিযোগ করলে দেবতারা এদের বর দেন রাত্রির অন্ধকারেও এরা স্বচ্ছন্দচারী হবে। অগ্নি তারপর একটি বটগাছে আত্মগোপন করেন এবং একটি হাতী জানিয়ে দেয় ও অভিশপ্ত হয় হাতীর জিব ভিতর দিকে চলে যাবে। দেবতারা হাতীকে বর দেন তাদের খেতে কোন অসুবিধা হবে না; এবং সব কিছু খেতে পারবে। অগ্নি তারপর এক শমীগাছের কোটরে এসে আত্মগোপন করেন। গাছে একটি শুক পাখী ছিল. বলে দেয়। দেবতারা এসে অগ্নিকে ধরে ফেলেন। শুক ও অভিশাপ পায় তার জিব ভেতর দিকে চলে যাবে এবং দেবতারা বর দেন এর ফলে সে ভাল গান করতে পারবে। শমীগাছ থেকে বার হয়ে আসার জন্য অগ্নির পুনর্জন্ম হল বলা হয়।

অগ্নি একবার পুরূরবার ছেলে জাতবেদস্ হয়ে জন্মান। বৃত্র বধের পর লুকিয়ে থাকা ইন্দ্রকে বৃহস্পতির নিদেশে খুঁজে বার করেন। অগ্নি অষ্টবসুর (অনল) একজন এবং অগ্নি একজন দিকপাল (দ্রঃ)। সৃষ্টির পর মৃত্যু ছিল না। পৃথিবী ভরে যায়। ব্রহ্মা তখন অগ্নিকে পাঠান, জীবলোক পুড়ে শেষ হতে থাকে। শিব শেষে এই আগুন ফিরিয়ে নেবার জন্য অনুরোধ করলে জীবলোক রক্ষা পায়। মহাপ্রস্থানের সময় অর্জুন সমুদ্রের তীরে এসে উপস্থিত হলে অগ্নি বিরাট পর্বতের আকার ধারণ করে অর্জুনের পথ আটকে দাঁড়ান এবং খাণ্ডবদাহনের (দ্রঃ) সময় দেওয়া অক্ষয় তূণ ও গাণ্ডীব জলে বিসর্জন দিতে বলেন। দত্তাত্রেয়ের ছেলে নিমি মারা গেলে শ্রাদ্ধে ভূরিভোজনে দেবতাদের গর-হজম হলে ব্রহ্মা অগ্নির সঙ্গে পরামর্শ করেন। ঠিক হয় ভবিষ্যতে নিমন্ত্রণে অগ্নিকে নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে নিয়ে গেলে আর এ অবস্থা হবে না। এই জন্য রান্নার পর প্রতিটি ভোজ্য বস্তুর একটু অংশ আগুনে দিতে হয়।

বিভিন্ন কাজে যে অগ্নির পূজা করা হয়ঃ—লৌকিক (নবগৃহপ্রবেশাদি কাজ) পাবক; গর্ভাধানে-মারুত; পুংসবনে-চন্দ্রনামা, শুঙ্গাকর্মে (বিশেষ পুংসবন) শোভন: সীমন্তে-মঙ্গল: জাতকর্মে-প্রগলভ্; নামকরণে-পার্থিব; প্রাশনে-শুচিঃ, চূড়াকরণে-সত্য; উপনয়নে-সমুদ্ভব; গোদানে-সূর্যনামা: সমাবর্তনে/কেশান্তে-অগ্নি; সাগ্নিকর্তব্য-বিশেসে-বৈশ্বানর: বিবাহে-যোজক, বিবাহে চতুর্থী হোমে-শিখী; প্রায়শ্চিত্তে-বিধু: পাকযজ্ঞে (বৃষোৎসর্গইত্যাদিতে)-সাহস; লক্ষহোমে-বহ্নি; কোটিহোমে-হুতাশন; পূর্ণাহুতিতে-মৃড়: শান্তিকে-বরদ; পৌষ্টিকে-বলদ অভিচারকর্মে-ক্রোধ; বশ-অর্থে-শমন; বরদানে-অভিদূষক, কোষ্ঠে-জঠর: মৃতভক্ষণে-ক্রব্যাদ।

অগ্নির বিভিন্ন নাম—অনল, অপিত্ত, অজস্র, আশ্রয়াশ, আশুশুক্ষণি, উষর্বুধ, কৃপীটযোনি, কৃষ্ণবর্ত্ম, কৃশানু, ঘৃতপিঃ, চিত্রভানু, ছাগরথ, জাতবেদস্, জ্বলন, জ্বালাময়, জ্বালাকেশ, তনূনপাত, তোমরধর, ত্রিজিহ্ব, দহন, দমনঃ ধনঞ্জয়, ধূমকেতু, নীলপৃষ্ঠ, পাবক, পিঙ্গলশ্মশ্রু, বহ্নি, বীতিহোত্র, বৈশ্বানর, বর্হিস্, বৃহদ্‌ভানু, বায়ুসখ, বিভাবসু, মধুজিহ্ব, রোহিতাশ্ব, শুষ্মা, শোচিষ্কেশ, শিখাবৎ, শুক্র, শুচি, সপ্তার্চিস্, সপ্তজিহ্ব, হিরণ্য-রেতস, হিরণ্যদন্ত, হুতভুক, হুতাশন, হুতাশ

হব্যবাহন, হিরণ্যকেশ ইত্যাদি। দ্র ঃ—অগ্নিপরীক্ষা, অগ্নিরথ, ইন্দ্র, উতঙ্ক, উশীনর, কার্তিকেয়, কার্তবীর্যার্জুন, খাণ্ডবদাহন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নল, রাজানীল, নীল বানর, ভৃগু, মরুত্ত, মায়াসীতা, রন্তু, শ্বেতকী, স্বাহা, হুতাশন।

অগ্নিকুমার—কার্তিকেয় (দ্রঃ)।

অগ্নিকুল—একটি রাজপুত কাহিনী অনুসারে বিশ্বামিত্র, গৌতম, অগস্ত্য প্রভৃতি দ-রাজপুতানার আবু পাহাড়ে একটি যজ্ঞের আয়োজন করেন। দৈত্যেরা এসে বিঘ্ন ঘটাতে থাকে। বশিষ্ঠ তখন মন্ত্রবলে যজ্ঞাগ্নি থেকে পরমার, চৌলুক্য, প্রতিহার ও চাহমান, এই চারজন বীরকে সৃষ্টি করেন। এরা দৈত্যদের নিহত করলে যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়। এই চারজন থেকে পরে পরমার, চৌলুক্য, প্রতিহার ও চাহমান বা চৌহান রাজবংশ সৃষ্টি হয়। অগ্নি থেকে উৎপত্তি বলে এঁরা অগ্নিকুল।

অগ্নিকেতু—রাবণের বন্ধু। লঙ্কার যুদ্ধে নিহত হন।

অগ্নিকোণ—পূর্ব ও দক্ষিণ কোণের মধ্যবর্তী কোণ। এখানে অগ্নির অবস্থান।

অগ্নিজিহব—বিষ্ণু। বরাহ মূর্তি ধারণ কালে অগ্নিজিহ্ব হয়েছিলেন।

অগ্নিত্রয়—তিন রকম আগুন ঃ—(১) গার্হপত্য—যজ্ঞাদির জন্য গৃহপতি যে আগুন গৃহে অনির্বাণ রাখেন। (২) আবহনীয়—গার্হপত্য আগুন থেকে গৃহীত মন্ত্রপূত অগ্নি; হোমের জন্য। (৩) দাক্ষিণ্য বা দক্ষিণাগ্নি—দক্ষিণা দেওয়া হলে এই অগ্নি তৃপ্ত হয়ে দেবতাদের এই দক্ষিণা ভাগ দান করেন। এই তিনটি অগ্নিকে (দ্রঃ) স্বাহার পুত্রও বলা হয়। আবার আকাশে সূর্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ এবং পৃথিবীতে অগ্নি—এই তিনটি অগ্নিও বুঝায়। দ্রঃ-অগ্নিহোত্র।

অগ্নিদেবা— কৃত্তিকা নক্ষত্র।

অগ্নিনক্ষত্র কৃত্তিকা নক্ষত্র।

অগ্নিপরীক্ষা- জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে প্রবেশ করে বা লাঙলের তপ্ত লৌহ শলাকা চেটে এই পরীক্ষা দিতে হত। সতী নারীর এতে কোন ক্ষতি হত না। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাতের ওপর কয়েকটি উত্তপ্ত লৌহ শলাকা নিয়ে কয়েকটি মণ্ডল অতিক্রম করার নির্দেশ আছে। নানা কারণে এই সব পরীক্ষা হত। রাবণ বধের পর সীতা সম্বন্ধে প্রজাদের সন্দেহহীন করার জন্য লঙ্কাতে সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। অপমানে সীতা প্রাণত্যাগ করবেন ঠিক করেন। কিন্তু জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করলে অগ্নি নিজে সীতাকে বার করে এনে রামকে ফিরিয়ে দেন।

অগ্নিপুর—মাহিষ্মতী।

অগ্নিপ—ব্রাহ্মণ বেদনিধির ছেলে। পাঁচটি গন্ধর্ব কন্যা প্রমোদিনী, সুস্বরা, সুতারা, চন্দ্রিকা ও সুশীলা অগ্নিপকে বিয়ে করতে চান। ব্রাহ্মণ ক্রোধে শাপ দেন রাক্ষসীতে পরিণত হবে। বেদনিধির করুণা হয় এবং লোমশ মুনির পরামর্শে প্রয়াগে এদের স্নান করতে বলেন ; ফলে এরা শাপমুক্ত হন। শেষ পর্যন্ত অগ্নিপ এদের বিয়ে করেন।

অগ্নিপূজা—অগ্নির পবিত্রতা প্রায় সব ধর্মেই স্বীকৃত। প্রাচীন কালে বহু দেশে অগ্নি

পূজা প্রচলিত ছিল। ভারতীয়েরা ও জরথুস্ত্রবাদী পার্সিরাও এঁর উপাসক। ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যেরা যেখানে গিয়েছিলেন সেইখানেই এই অগ্নিকেন্দ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে গিয়েছিলেন। আর্যরা নিজেদের অগ্নির সন্ততি বলে বিশ্বাস করতেন এবং উষা, সূর্য, মিত্র, অগ্নি অথবা আতর্-এর পূজা করতেন। উত্তর ভারতে আর্যরা বসবাস করলে পশুযাগে ও অন্যান্য যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত বস্তু অগ্নি দেবতাদের কাছে পৌঁছে দিতেন; অর্থাৎ এক প্রধান দেবতা রূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন। ইন্দো-ইউরোপীয়ানরা (=আর্য) ছিলেন মুখ্যত অগ্নি উপাসক। সর্ববিধ কল্যাণের জন্য এঁরা অগ্নির-সাহায্যে দেবতাদের উদ্দেশ্যে নানা যজ্ঞ ও উপাসনা করতেন। পাঞ্জাবে আসার পর আর্যরা মৃতদেহ অগ্নিসাৎ করে পবিত্র করার প্রথা চালু করেন। ইরানীয় আর্যরা এ প্রথা গ্রহণ করেন নি।

প্রাচীন ইরানের আর্য সংস্কৃতিও অগ্নিকেন্দ্রিক। জরথুস্ত্র পরিপূর্ণ একেশ্বরবাদ প্রচার করে যজ্ঞের বদলে যশ্‌নের (পূজাবিধির) প্রচলন করেন। মূর্তিপূজা, গোমেধ হওম, ও সোমপান নিষিদ্ধ করেন। পশুবধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অগ্নিকে বাদ দিয়ে আদিম আর্যজাতির বেদী বা কুণ্ডগত অগ্নির মহিমা কীর্তন করেন। এই অগ্নি অহুরের (=অসুরের) সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তুলনায়—অসুরস্য জঠরাৎ অজায়ত। এই অগ্নি বিশ্বকে নব জন্ম দেন। দৈব জগতে এই অগ্নি অষ অথবা ঋতের প্রতীক। ফলে সব রকম ক্রিয়া কর্মে এই অগ্নি (পার্সি নাম আতর্) মূলাধার রূপে গৃহীত হলেন। পরিবারেতে অগ্নিকুণ্ড এবং রাজপ্রাসাদে অপদানে (পার্সিশব্দ) অগ্নিরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। পরিবারস্থ অগ্নির কাছে স্বাস্থ্য ও সন্তান ও পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনাদি করা হত। রাজ্যে জাতীয় বিজয়োৎসবে বা রাজ্যাভিষেকের সময় এই আতর্ (=অগ্নি) পূজা পেতেন ও পৌরাণিক বীরদের নাম অনুসারে বৃত্রহণ, বৃত্রঘ্ন বেরেথ্রঘ্ন, বহ্‌রাম ইত্যাদি নাম রাখা হত। অর্থাৎ আথর্বণ-গণ (আতর/অগ্নির রক্ষক গণ) ঐরয় (আর্য) জাতিকে তাঁদের আইরান্ (=ইরান) রূপী উপনিবেশে এনেছিলেন। অগ্নির এই পূজা অগ্নি-কেন্দ্রিক সংস্কৃতির দান। ৬৫১ খৃ-অব্দে আরবের হাতে ইরান পরাজিত হলে আতর-এর পুরোহিতরা জরথুস্ত্র সম্প্রদায়ের আদর্শ বাঁচিয়ে রাখার জন্য ভারতে পালিয়ে আসেন। ৭১০ খৃ-অব্দে আতর্ বহ্‌রামকে গুজরাটের উদ্‌বাড়োতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই আগুন আজও প্রজ্বলিত আছে।

সৌরাষ্ট্রের মৈত্রিকগণ, পাঞ্জাবের অগ্নিহোত্রীরা, অগ্নিকে পার্সিদের মতই শ্রদ্ধা করেন। ভারতে শকযুগে এবং ইরানে প্রাচীন মুদ্রায় অগ্নিবেদীর ছবি দেখা যায়। নওসারী অধিবাসী দস্তুর মেহেরজি রানা সম্রাট আকবরকে অগ্নিপূজার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন।

অগ্নিপূর্ণ—সূর্যবংশে রাজা সুদর্শনের ছেলে। অগ্নিপূর্ণের ছেলে শীঘ্র ও মরু।

অগ্নিবর্ণ—(১) রাজা কুশের ছেলে। (২) সূর্যবংশের সুদর্শনের ছেলে; রঘু বংশে শেষ রাজা। নারী ও সুরাসক্ত হয়ে যক্ষায় আক্রান্ত হন। মন্ত্রীরা পরামর্শ করে রাজাকে জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করে তাঁর গর্ভবতী রাণীকে সিংহাসনে বসান।

অগ্নিবাহু—(১) প্রিয়ব্রতের ঔরসে কাম্যার গর্ভে জাত রাজপুত্র। (২) প্রথম মনুর একটি ছেলে।

অগ্নিবেশ—চরক সংহিতা প্রণয়ন করেন। আগে নাম ছিল অগ্নিবেশ সংহিতা। গ্রন্থটি লুপ্তপ্রায় হলে চরক আবার সঙ্কলন বা সংস্কার করেন। দ্রঃ অগ্নিবেশ্য।

অগ্নিবেশ্য—অগ্নিবেশ। আত্রেয় শিষ্য। অন্যমতে অগস্ত্য বা বৃহস্পতি বা ভরদ্বাজ শিষ্য। ভরদ্বাজ এঁকে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়েছিলেন। দ্রোণ ও দ্রুপদের গুরু।

অগ্নিভূ—কার্তিকেয়।

অগ্নিভূতি—(১) বৌদ্ধ বিশেষ (২) জৈনদের শেষ আচার্য।

অগ্নিমাঠর—বাস্কল শিষ্য। বাস্কলের কাছে ঋক্‌বেদের একটি ভাগ শিখে ছিলেন। ঋক্‌বেদ অধ্যাপক ঋষি।

অগ্নিমারুতি—অগ্নি (ক্ষুধা) যার মারুতির (হনুমানের) মত। বাতাপিকে ভক্ষণ করার জন্য অগস্ত্যের নাম।

অগ্নিমিত্র—শুঙ্গ বংশে পুষ্যমিত্রের ছেলে। ১০০ খৃ-পূ। পতঞ্জলির সমকালীন এক রাজা। এঁকে অবলম্বন করে কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রম্‌ রচনা মনে হয়।

অগ্নিমুখ—অসুর। মরীচি-কশ্যপ-শূরপদ্ম-অগ্নিমুখ। শূরপদ্মের স্ত্রী ময়ের মেয়ে; ছেলে হয় অগ্নিমুখ ভানুগোপ, ব্রজবাহু ও হিরণ্য।

অগ্নিরক্ষণ—অগ্নিকেন্দ্রিক সভ্যতায় ঘরে আগুন জ্বেলে রাখার ধর্মীয় অনুশাসন। দ্রঃ-অগ্নিত্রয়। দিয়াশালাই না থাকা মূল কারণ।

অগ্নিলোক—মেরুপর্বতে কাল্পনিক একটি দেশ; অগ্নি এখানে অধিপতি।

অগ্নিশিরতীর্থ—যমুনার তীরে; সহদেব (পাণ্ডব) এখানে যজ্ঞ করেছিলেন।

অগ্নিশৌচ—চাদর বিশেষ। কর্কোটক নলকে (দ্রঃ) কামড়াবার পর এই চাদর দিয়ে যান।

অগ্নিষ্টুৎ—অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ।

অগ্নিষ্টোম—(১) বহু প্রজা সৃষ্টির জন্য প্রজাপতি কর্তৃক প্রবর্তিত ৫-দিন ব্যাপী বসন্তকালীন যজ্ঞ। (২) চাক্ষুষ মনু ও নড্‌লার (দ্রঃ) একটি সন্তান। অন্য নাম অগ্নিষ্টু।

অগ্নিষ্বাত্ত—মরীচির ছেলে। পিতৃগণ (দ্রঃ)।

অগ্নি সম্ভব—সূর্যবংশে রাজা উপগুপ্তের ছেলে।

অগ্নিসোম—(১) অগ্নিদেব ও সোমদেবের মিলনে জন্ম। ইনি যজ্ঞভাগ পান। (২) ভানু নামে অগ্নি ও তাঁর স্ত্রী নিশা; এঁদের ছেলে অগ্নি ও সোম। দ্রঃ-অগ্রণি।

অগ্নিহোত্র—সাগ্নিকের নিত্যকর্ম যজ্ঞ বিশেষ। গুরুগৃহ থেকে ফিরে বিয়ে করে প্রত্যেক গৃহপতি বাড়িতে একটি করে অগ্নিপাত্র স্থাপিত করতেন। এই স্থাপন করার নাম অগ্ন্যাধান। প্রতিষ্ঠাতা আহিতাগ্নি। চতুষ্কোণ বেদীর পশ্চিমে গার্হপত্য, পূর্বে আহবনীয়, দক্ষিণে দক্ষিণাগ্নি স্থাপন করা হয়। আহবনীয় অগ্নিতে দেবতাদের, দক্ষিণাগ্নিতে মৃত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেবার নিয়ম। গার্হপত্য

আগুনে আহুতি দেওয়া হয় না ; প্রয়োজন মত এই আগুন থেকে আহবনীয়াগ্নি ও দক্ষিণাগ্নি স্থানে আগুন নিয়ে আসা হয়। আহবনীয় অগ্নিতে প্রতিদিন অনুষ্ঠিত যজ্ঞের নাম অগ্নিহোত্র। এই যজ্ঞে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে সূর্য ও অগ্নিকে উদ্দেশ্য করে আহুতি দেবার নিয়ম ছিল। সামান্য একটু দুধ, দই বা চাল দিয়েই আহুতি হয়। যিনি প্রতিদিন এই যজ্ঞ করেন তিনি অগ্নিহোত্রী। গৃহস্থ স্বয়ং তবে অসমর্থ হলে ছেলে, ভাই, ভাগিনেয়, জামাতা বা অধ্বর্যু প্রতিনিধি হিসাবে এই যজ্ঞ করতেন। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ মাস বা জীবনব্যাপী। জীবনব্যাপী যজ্ঞের আগুনে এঁদের দাহ করা হত।

অগ্নীধ্র—(১) অগ্নি রক্ষায় নিযুক্ত ঋত্বিক। (২) স্বায়ম্ভুব মনুর ছেলে জনৈক রাজা। (৩) জম্বুদ্বীপের-রাজা প্রিয়ব্রতের সাত/দশ ছেলের মধ্যে বড়। পরে জম্বু-দ্বীপে রাজা হন। অপুত্রক রাজা মন্দার পর্বতে তপস্যা করলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে পূর্ব-চিত্তি নামে অপ্সরাকে পাঠিয়ে দেন ; অন্যমতে তপস্যা ভাঙবার জন্য পাঠান। গন্ধর্ব মতে বিয়ে হয় ; নয়টি ছেলে :—নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত/ইলাবর্ত, রম্য/রম্যক, হিরন্ময়/হিরণ্বান, কুরু, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল। ছেলেরা বড় হলে রাজ্য ভাগ করে দিয়ে অগ্নীধ্র দেহত্যাগ করেন। কুরু থেকে কুরুবংশ।

অগ্ন্যাধান—দ্রঃ অগ্নিহোত্র। বা অগ্নি সংস্কার।

অগ্রণি—ভানু (দ্রঃ) নামে অগ্নি ও নিশার ৫-ম পুত্র।

অগ্রদানী—শ্রাদ্ধে মৃতের উদ্দেশ্যে যাকে আগে ষড়ঙ্গ তিলাদি দান করা হয়। যে লোভী ব্রাহ্মণ শূদ্রের আগে এই দান গ্রহণ করেন। এঁকে পতিত ব্রাহ্মণ মনে করা হয়। অথচ এই দান গ্রহণের জন্য সমাজে এঁদের চাহিদাও আছে। বর্তমানে সাধারণ ব্রাহ্মণ পুরোহিতও এই দান গ্রহণ করেন।

অগ্রবন—আগ্রা।

অগ্রহ—ভানু নামে অগ্নির স্ত্রী সুপ্রজা (সূর্যকন্যা) ; এঁদের ছয় ছেলে ; একটির নাম অগ্রহ।

অগ্রমন্দির—প্রাচীন ভারতের জলযান। দূর প্রবাস যাত্রার উপযোগী। এই সব নৌকায় গলুইয়ের দিকে কুটুরি থাকত।

অগ্রায়ণী—অপর নাম অনুযায়ী ; ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

অঘ—অঘাসুর (দ্রঃ)।

অঘমর্ষণ—(১) একজন ঋষি। (২) সর্বপাপ দমনকারী মন্ত্র। ঋক্‌বেদের একটি সূক্ত। জলে দাঁড়িয়ে পাঠ করলে পাপ বিনষ্ট হয়।

অঘাসুর—অঘ। বকাসুর ও পুতনার ছোট ভাই। কংসের একজন সেনাপতি। পুতনা ও বকাসুর কৃষ্ণের হাতে নিহত হলে প্রতিশোধ নেবার জন্য এবং কংসের নির্দেশেও গোকুলে অঘাসুর আসেন। চার যোজন লম্বা অজগর হয়ে হাঁ করে পথের ধারে শুয়ে থাকেন। বাড়ি ফেরার পথে কৃষ্ণ ও সঙ্গী গোপালেরা গুহা মনে করে এঁর মুখের মধ্যে ঢুকে পড়েন। অসুর সকলকে গিলতে চেষ্টা করেন।

কৃষ্ণ সকলের পেছনে ছিলেন এবং বিরাট দেহ ধারণ করে অসুরের পেট ফাটিয়ে হত্যা করেন।

অঘোর চতুর্দশী—ভাদ্র মাসে কৃষ্ণা চতুর্দশী। শিবলোকে প্রাপ্তির জন্য শিবপূজা করা হয়।

অঘোরপন্থী—একটি শৈব সম্প্রদায়। এঁদের মতবাদ অঘোর/ভীষণ পন্থা। যিনি শিব, অর্থাৎ অনাসক্ত, আচার ব্যবহার ও লোকাচারের বাইরে। বিষ্ঠা ও চন্দনে সমজ্ঞান যাঁর তিনিই অঘোরনাথ। এঁর শিষ্যেরা অঘোরপন্থী। অঘোরপন্থীরা নিতান্ত অপরিষ্কার। আম-মাংস গলিতশব, মলমূত্র সব কিছুই ভোজন করেন। কখনো অঙ্গ বা মুখ মার্জনা করেন না। নর কপালে মদ্যপান করেন। পরিধান কৌপীন ও বহির্বাস বা কিছুই নয়। নরবলি দেন না; কিন্তু মৃত নর মাংস খান। এ ছাড়াও বহু ঘৃণিত কুৎসিত কাজ করেন। নির্বিকার ও নির্ঘৃণ হওয়াই উদ্দেশ্য। এঁরা যোগী; যথা নিয়মে সন্ন্যাস নিয়ে অঘোরমন্ত্র গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসীরাও এঁদের দৈবশক্তির অধিকারী মনে করেন। কাণে এক রকম দেখতে কুণ্ডল এবং গলায় অস্থিমালা, করোটিমালা, রুদ্রাক্ষ মালা ও ধুমরা ইত্যাদি তীর্থ চিহ্ন ধারণ করেন। চুলদাড়ি কাটেন না। সমাজের সঙ্গে এঁদের কোন সম্পর্ক নাই। কারণ এঁদের প্রায় কিছুরই প্রয়োজন নাই। অনেক সময় নরমাংসের লোভে শবযাত্রীদের সঙ্গ নেন। এঁদের আদি স্থান বরোদা রাজ্য। এখানে অঘোরেশ্বর নামে একটি মঠ ছিল। এই মঠে এঁরা থাকতেন। আজকাল প্রায় নিঃশেষিত। অতি প্রাচীন সম্প্রদায়। মার্কোপোলো, প্লিনি, এরিষ্টটল প্রভৃতি এঁদের উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধদেব এঁদের অচেলক বলতেন।

অঘোরী—অঘোরপন্থী।

অঙ্কুশী—অঙ্কুশধারণকারী। ২৪ জন শাসন দেবীর মধ্যে একজন জৈন দেবী। অশোকা, মানবী, চণ্ডা ইত্যাদি।

অঙ্গ—দেশ বিশেষ। ঋক্ বেদে উল্লেখ নাই। অথর্ব বেদে এই দেশবাসীদের ব্রাত্য বলা হয়েছে। শোণ ও গঙ্গার অববাহিকাতে এদের বাস। পাণিনি বঙ্গ, কলিঙ্গ, ও পুণ্ড্রের সঙ্গে জুড়ে অঙ্গকে মধ্যদেশের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। বলির ছেলে অঙ্গ প্রতিষ্ঠিত দেশ। গঙ্গা ও সরযুর সঙ্গম থেকে পূর্বদিকে বিস্তৃত। রামায়ণ মতে মদন হর কোপানলে এইখানে দেহ ত্যাগ করেছিলেন বলে এই নাম। রাজা দশরথের বন্ধু রোমপাদ/লোমপাদ এখানে রাজা ছিলেন। অন্য নাম লোমপাদ-পুরী বা চম্পা। মহাভারত মতে অঙ্গের রাজা বলে এই নাম। দুর্যোধন কর্ণকে গঙ্গাতীরে অবস্থিত এই রাজ্য দেন; অন্য নাম কর্ণপুরী, অঙ্গপুরী ও মালিনী। ভাগলপুরের চার পাশে এর অস্তিত্ব এখনও পাওয়া যায়। কৌশিকী নদীর দক্ষিণে ও গঙ্গার পূর্বে অবস্থিত দেশ, রাজধানী চম্পা। খৃ-পূ ৫ ও ৬ শতকে ষোড়শ জনপদের অন্যতম। গৌতম বুদ্ধের গৃহত্যাগের সময় অঙ্গ মগধের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিম্বিসার অঙ্গ ও মগধের রাজা হন। অজাতশত্রু যুবরাজ অবস্থায়

এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। গৌতমবুদ্ধের ও মহাবীরের জীবনের একাধিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত এই অঙ্গ প্রাচীন ভারতে শিল্প-সমৃদ্ধ নগরী ও বাণিজ্য কেন্দ্র। সংস্কৃত কবিদের মতে মগধ-রাজধানী গিরিব্রজের পূর্বে এবং মিথিলার পূ-দক্ষিণে বা পূ-উত্তর কোণে। য়ুআন-চুয়াঙ বলেছেন গঙ্গার প্রস্তরময় একটি দ্বীপ থেকে ২৪ মাইল দূরে। একটি মতে ভাগলপুর মুঙ্গের এলাকাতে। বৈদ্যনাথ ধাম থেকে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত; রাজধানী চম্পাবতী। কানিংহাম মতে ভাগলপুরের কাছে চম্পানগর ও চম্পাপুর দুটি গ্রাম এবং ভাগলপুর থেকে ২৪ মাইল পশ্চিমে শিলাকীর্ণ একটি জনপদ হচ্ছে য়ুআন-চুয়াঙ বর্ণিত দ্বীপ। ফ-হিয়েন চম্পা বা চান্পোতে এসে ছিলেন।

অংগ—চন্দ্রবংশে রাজা সুতপসের ছেলে বলি। বলির স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম ৫টি ছেলে হয়। এঁদের নাম অনুসারে পাঁচটি রাজ্য। আরো দুটি ছেলে অদ্রূপ ও অংশাভূ। অঙ্গ একবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। কিন্তু নিঃসন্তান রাজার যজ্ঞে দেবতারা কেউ আসেন না। অঙ্গ তখন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞ থেকে এক দিব্য পুরুষ এক পাত্র চরু দিয়ে যান। রাজা ও রাণী সুনীথা দুজনেই খান; ছেলে হয় বেণ। বেণ অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন, ফলে রাজ্য ত্যাগ করে অঙ্গ চলে যান। আর এক মতে চাক্ষুষ মনুর ছেলে কুরু এবং কুরুর ছেলে অঙ্গ।

অংগ—জৈন আগম শাস্ত্রের অংশ। জৈনদের প্রধান ধর্মশাস্ত্র। এগারটি অঙ্গগ্রন্থ ও একটি দৃষ্টিবাদ মোট ১২টি গ্রন্থ জৈন ধর্মের মূল ভিত্তি। এছাড়া ১২টি উপাঙ্গ গ্রন্থও আছে। বর্তমানের প্রচলিত অঙ্গ শাস্ত্র মহাবীরের পঞ্চম গণধর সুধর্মস্বামী প্রচার করেছিলেন। মহাবীরের নির্বাণের ১৬০ বছর পরে প্রথম লিপি-বদ্ধ হয়। দৃষ্টিবাদের অন্তর্গত ১৪টি পূর্বশাস্ত্রও অঙ্গগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। অঙ্গ গ্রন্থের মূল বক্তব্য প্রতি সং-পদার্থের মধ্যেই যুগপৎ উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থিতির কাজ চলেছে :—উপ্পণেই বা বিগমেই বা ধুবেই বা। জৈন দর্শনেই এটি মূল কথা বা জৈন দর্শনের পরিণাম বাদ। দ্বাদশাঙ্গ গ্রন্থে এই মূল তত্ত্বকে নানা ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

অংগদ—(১) বলির ঔরসে তারার ছেলে। বৃহস্পতির অংশে। সুগ্রীব রাজা হয়ে এঁকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। সীতার খোঁজে হনুমানের সঙ্গে বানর দলের নেতা হিসাবে দক্ষিণ দিকে গিয়েছিলেন। কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এসে প্রথমে মধুবনে প্রবেশ করেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে লঙ্কায় যুদ্ধে এসেছিলেন। অত্যন্ত বাকপটু ছিলেন। যুদ্ধের আগে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে রাবণের কাছে যান। লঙ্কার যুদ্ধের পর রামচন্দ্র/সুগ্রীব এঁকে কিষ্কিন্ধ্যায় যুবরাজ পদে স্থাপিত করেন। দ্বাপরে ইনি ব্যাধ হয়ে জন্মান এবং যদুবংশ ধ্বংসের পর কৃষ্ণকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করেন। (২) শত্রুঘ্ন শ্রুতকীর্তির ছেলে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু। (৩) দুর্যোধনের পক্ষে একজন যোদ্ধা। (৪) কৃষ্ণের ভাই গদ ও স্ত্রী বৃহতীর ছেলে।

অঙ্গদা—পিঙ্গলা নামে দক্ষিণ দিক হস্তিনী। দ-দিকহস্তীর স্ত্রী।

অঙ্গ বংশ—অঙ্গ-অঙ্গভূ-দ্রবিরথ-ধর্মরথ-লোমপাদ-চতুরঙ্গ-পৃথুলাক্ষ-ভদ্ররথ-বৃহন্মনস্-জয়দ্রথ-বিজয়-দৃঢ়ব্রত-স্যতধর্ম-অধিরথ-কর্ণ।

অঙ্গবাহ—বৃষ্ণি বংশে প্রসিদ্ধ এক রাজা। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে বলরামের সঙ্গে যোগদান করেন।

অঙ্গমলক—মলদ/করুষ। তাড়কা যে বনে থাকত সেই এলাকার পূর্বতন নাম। ইন্দ্রের (দ্রঃ) গা থেকে ধূলা, কাদা, মল/করুষ সব ধুয়ে মাটিতে পড়ে; এই করুষ (মল) মাটিতে পড়ে মিশে যায়, ফলে দেশটির এক অংশের নাম মলদ আর এক অংশের নাম হয় করুষ। এরপর বহুদিন দেশটি জনহীন ছিল; পরে তাড়কারা বসবাস করতে থাকেন।

অঙ্গরাগ—নানা বস্তু দিয়ে তৈরি অঙ্গলেপ। সিন্ধু সভ্যতার যুগেও ব্যবহার ছিল। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পাতে অঞ্জন, অঞ্জনশলাকা, অধরাঞ্জনবর্তী, কপোলরক্ত-পিষ্টিকা, লোহার গোল মুকুর, ও হাতীর দাঁতের চিরুনি ইত্যাদি বহু কিছু জিনিস পাওয়া গেছে। বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ ইত্যাদিতে অঙ্গরাগের প্রচুর উল্লেখ আছে। চৌষট্টি কলার মধ্যে দশন-বসন-অঙ্গরাগ একটি কলা ছিল। সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থে ভূরি ভূরি উল্লেখ রয়েছে। কামসূত্র, রতিরহস্য, অঙ্গ-রঙ্গ, নাগর-সবস্ব, পঞ্চ-সায়ক ইত্যাদি গ্রন্থে অঙ্গরাগের বহু পরিচয় আছে। আজকের পাউডার মত লোধ্রচূর্ণ, চন্দনচূর্ণ, কুঙ্কুমচূর্ণ, এবং রঙ হিসাবে অলক্তক ও মঞ্জিষ্ঠা ব্যবহার হত। চোখে কাজল ও বিবিধ অঞ্জন এবং ঠোঁট ও গাল নরম রাখার জন্য মোম ব্যবহৃত হত।

কামসূত্রে নাগরক-বৃত্ত প্রকরণে আছে সকালে নিত্যকৃত্য সেরে নাগরক দন্ত ধাবন করে সামান্য অনুলেপনাদি ধূপ ও মাল্য গ্রহণ করে মুখ মোম ও অলক্তক দিয়ে রঞ্জিত করে আদর্শে মুখ দেখবে এবং মুখবাস ও তাম্বূল গ্রহণ করে নিজ কাজে যোগ দেবে। রোজ স্নান করবে; একদিন অন্তর তেল মাখবে, দুদিন অন্তর ফেনক (সাবান) ব্যবহার করবে, তিন দিন অন্তর নখ কাটবে ও কামাবে। দেহে ঢাকা অংশে যেখানে ঘাম হবে রুমাল বা গামছা দিয়ে মুছে ফেলবে। ঈশ্বর-কৃত গন্ধযুক্তি ও শার্ঙ্গধর কৃত গন্ধদীপিকাতে এবং বৃহৎ-সংহিতার গন্ধযুক্তি প্রকরণে অঙ্গরাগের আলোচনা রয়েছে। প্রাচীন কামশাস্ত্রকারগণ ও চিকিৎসকগণ দেহের দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য বহু অঙ্গরাগের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। অঙ্গলেপন, সুগন্ধ তৈল ও কেশ পতন বন্ধের জন্য নানা লেপ ছিল। দাঁত মাজার জন্য নানা মাজন ও অবাঞ্ছিত লোমনাশক বহু অঙ্গরাগও ছিল।

অঙ্গার—একজন রাজা। মান্ধাতার হাতে পরাজিত হন।

অঙ্গারক—একজন অসুর। উজ্জয়িনীর রাজা মহেন্দ্র বর্মার ছেলে মহাসেন উপযুক্ত একটি স্ত্রী ও একটি তরবারি পাবার জন্য বহুদিন তপস্যা করলে দেবী দেখা দিয়ে একটি অজেয় তরবারি উপহার দেন এবং বর দেন অঙ্গারক অসুরের মেয়ে অঙ্গার-

বতীর সঙ্গে বিয়ে হবে। এবং ভয়ঙ্কর কাজ করার জন্য মহাসেন নাম চণ্ডমহাসেনে পরিবর্তিত হবে। একদিন মৃগয়াতে বাণবিদ্ধ করলে একটি শূকর আহত হয় না; রাজার রথ উল্টে দিয়ে পালিয়ে যায়। শূকরের অনুসরণে রাজা একটি হ্রদের ধারে সুন্দরী একটি মেয়েকে সখীদের সঙ্গে দেখতে পান। রাজার কথা শুনে মেয়েটি কাঁদতে থাকে; কারণ ঐ শূকর তার পিতা অঙ্গারক অসুর; অস্ত্রে তার দেহ ভেদ হয় না। অসুর অবশ্য উপস্থিত শূকর দেহ ত্যাগ করে ঘুমাচ্ছে; কিন্তু ঘুম থেকে উঠে রাজার নিশ্চয়ই ক্ষতি করবে; এই ভয়ে মেয়েটি কাঁদছিল। তার সখীগুলি বিভিন্ন দেশের রাজকুমারী; অসুর তাদের ধরে এনে মেয়ের পরিচারিকা করে রেখেছে। রাজা তখন পরামর্শ দেন অঙ্গারকের কাছে বসে থাকতে এবং অঙ্গারক ঘুম থেকে উঠলেই মেয়েটি যেন কাঁদতে থাকে; অঙ্গারক মারা গেলে তার কি হবে এই ভেবে কাঁদছে যেন। অঙ্গারবতী এই পরামর্শ অনুসারে কাঁদতে থাকলে অসুর কারণ জানতে চান এবং মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন একমাত্র তার বাঁ দিকের নীচের হাতে আঘাত করলে তবেই তার মৃত্যু হবে। অর্থাৎ সে অমর; অঙ্গারবতীর কাঁদবার কোন কারণ নেই। রাজা লুকিয়ে সব শুনছিলেন; তৎক্ষণাৎ বার হয়ে ঐ স্থানে আঘাত করে অসুরকে নিহত করে অঙ্গারবতীকে বিয়ে করেন। মহাসেনের দুই ছেলে হয় গোপালক ও পালক এবং ইন্দ্রের বরে এক মেয়ে বাসবদত্তা—উদয়নের স্ত্রী।

অংগারকা—সিংহিকা।

অংগারপর্ণ—এর পর্ণ বা বাহন জ্বলন্ত অঙ্গার মত। গন্ধর্ব। কশ্যপ মুনির ছেলে। স্ত্রী কুম্ভীনসী। ইনি কুবের সখা ও ইন্দ্রের সারথি। বিচিত্র রথের জন্য নাম চিত্ররথ। একচক্রা থেকে পাঞ্চালে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে যাবার পথে সোমাশ্রয়ণ তীর্থে গঙ্গাতে নারীদের নিয়ে রাত্রিতে অঙ্গারপর্ণ জলবিহারে মত্ত ছিলেন। পাণ্ডবরা এখানে এসে পড়লে অর্জুনের সঙ্গে প্রথমে বিতণ্ডা ও পরে তুমুল যুদ্ধ হয়। আগ্নেয়াস্ত্রে অর্জুন এঁর রথ পুড়িয়ে দিলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান এবং অর্জুনের হাতে বন্দী হন। রথ পুড়ে গিয়েছিল বলে নাম দগ্ধরথ। কুম্ভীনসীর প্রার্থনায় যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে অর্জুন এঁকে মুক্তি দেন। অর্জুনের সঙ্গে মিত্রতা হয় এবং অর্জুনকে চাক্ষুষী বিদ্যা ও পাণ্ডবদের প্রত্যেককে একশত গন্ধর্বদেশীয় ঘোড়া দেন এবং অর্জুনের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করেন। একটি মতে বাতাসের মত গতি চারশত ঘোড়া যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিয়েছিলেন। চাক্ষুষী বিদ্যায় ত্রিলোকের সব কিছু ইচ্ছামাত্র দেখা যেত। অঙ্গারপর্ণ এই সময় তপতী ও সম্বরণ এবং বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কাহিনী বলেন। এঁরই পরামর্শে দেবলের ছোট ভাই, উৎকোচ-তীর্থে তপস্যাকারী ধৌম্যকে, পাণ্ডবরা পৌরোহিত্যে বরণ করেন। পৃথুরাজার সময়ে গন্ধর্বরা যখন পৃথিবীকে দোহন করেন চিত্ররথ তখন বৎস হয়ে ছিলেন। মহাদেব একবার চিত্ররথকে দিয়ে শঙ্খচূড়কে দুষ্ট কাজকর্ম থেকে বিরত হতে বলেছিলেন।

অঙ্গারিকা—দ্রঃ-রম্ভা।

অঙ্গিরস—অঙ্গিরাঃ। ব্রহ্মার মুখ থেকে জন্ম দশটি ছেলের মধ্যে একজন। আর এক মতে ব্রহ্মা যে ১৬ জন প্রজাপতি সৃষ্টি করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন। আর এক মতে প্রজাপতি নিজের বীর্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে অগ্নির জ্বালা থেকে ভৃগু ও জ্বালাহীন অঙ্গার থেকে অঙ্গিরাঃ উৎপন্ন হন (নিরুক্ত)। অন্যমতে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মবীর্য থেকে অঙ্গিরার জন্ম (মৎস্য)। আবার অন্য মতে কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মা এঁকে সৃষ্টি করেন। স্ত্রী কর্দম ঋষির মেয়ে শ্রদ্ধা। অন্য মতে অনেকগুলি স্ত্রী; উল্লেখযোগ্য শুভা, স্মৃতি, শ্রদ্ধা, দেবসেনা, বসুধা। ছেলে উতথ্য ও বৃহস্পতি। অন্য মতে আরো ছেলে সংবর্ত, বৃহৎ-কীর্তি, বৃহৎ-জ্যোতি, বৃহৎ-ধর্মা, বৃহৎ-মনা, বৃহৎ-মন্ত্র, বৃহৎ-ভাষা, পয়স্য, শান্তি, ঘোর, বিরূপ। সুধন্বা (দ্রঃ) ও কার্তিক ইত্যাদি ছেলেরও নাম আছে। দ্রঃ সব্য। স্মৃতির মেয়ে সিনীবালী, রাকা, কুহু ও অনুমতি। একটি মতে দক্ষের মেয়ে স্মৃতি ও খ্যাতি এঁর স্ত্রী (দ্রঃ-অসিক্নী)। আরো চার মেয়ে অর্চিষ্মতী, হবিষ্মতী, মহিষ্মতী ও মহামতী নামও পাওয়া যায়। সপ্তর্ষিদের মধ্যে একজন এবং দশ প্রজাপতিদের মধ্যে প্রথম প্রজাপতি। দ্রঃ-ঋভু। কুৎস মুনিও অঙ্গিরসের বংশে জন্মান। একজন মূল গোত্র প্রবর্তক। এঁর গোত্র কেবলাঙ্গিরস, গৌতমাঙ্গিরস ও ভরদ্বাজাঙ্গিরস তিনটি শাখাতে বিভক্ত। অঙ্গিরা ও তাঁর বংশীয়েরা ঋক্‌বেদের ঋষি হলেও অথর্ববেদ মন্ত্র সঙ্কলনে এঁরা সমধিক প্রসিদ্ধ। এইজন্য অথর্ব বেদের আর এক নাম আঙ্গিরস বেদ। মুণ্ডকে আছে অথর্বার কাছে ইনি ব্রহ্মবিদ্যা পেয়েছিলেন। অথর্ববেদের যাতু, অভিচার ইত্যাদি ঘোর কর্মের মন্ত্রগুলি আঙ্গিরস মন্ত্র নামে অভিহিত। অথর্ববেদের কল্পগ্রন্থের মধ্যে আভিচারিক কল্পের নাম আঙ্গিরস কল্প। মনু প্রভৃতি সংহিতাকারদের অন্যতম। জ্যোতিষ গ্রন্থেরও প্রণেতা।

অঙ্গিরা তপস্যা করে অগ্নির চেয়ে তেজস্বী হয়ে উঠেছিলেন। ফলে অগ্নি নিজেকে হীনবল মনে করে অনুতাপে জলের মধ্যে প্রবেশ করে তপস্যা করতে থাকেন। অগ্নি মনে করেন তাঁর তেজ নষ্ট হয়ে গেছে দেখে ব্রহ্মা আর একজন অগ্নি সৃষ্টি করেছেন। এই রকম যখন ভাবছিলেন তখন অগ্নিতুল্য অঙ্গিরা সামনে এসে জগতের মঙ্গলের জন্য অগ্নিকে প্রকাশিত হতে অনুরোধ করেন; কারণ অন্ধকার দূর করবার একমাত্র অধিকারী অগ্নি। অগ্নি তাঁর নিজের প্রতি অবিশ্বাস অর্থাৎ অগ্নিত্ব নাই জানান এবং অঙ্গিরাকেই অগ্নি হতে বলেন বা অগ্নি হবার বর দেন এবং অগ্নি নিজে দ্বিতীয় অগ্নি হবেন। ফলে বহুস্থানে অঙ্গিরা অগ্নি বলে স্বীকৃত। অঙ্গিরা রাজি হন না এবং অগ্নির কাছে একটি পুত্র প্রার্থনা করেন। অগ্নি তখন নিজের পূর্বতেজ গ্রহণ করেন এবং অঙ্গিরসের বৃহস্পতি নামে একটি ছেলে হয়। অন্য মতে একবার নিজের তেজে অঙ্গিরস উজ্জ্বল হয়ে উঠেন; সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হয়ে যায়। ফলে মানুষে অগ্নিকে ভুলে যায়। অগ্নি তখন বনে গিয়ে আত্মগোপন করেন। অঙ্গিরস জানতে পেরে অগ্নির কাছে

গিয়ে অগ্নিকে সন্তুষ্ট করেন। সেই দিন থেকে অঙ্গিরস অগ্নির প্রথম পুত্র বলে প্রচারিত হন। অগ্নি আবার নিজের কাজ করতে থাকেন। নহুষের পতন হলে ইন্দ্র আবার স্বর্গে ফিরে আসেন; এই সময় অঙ্গিরস ও অন্যান্য মুনিঋষিরা ইন্দ্রকে অভ্যর্থনা করেন। অঙ্গিরস এই সময় অথর্ববেদ থেকে আবৃত্তি করেন ফলে ইন্দ্র বর দেন অঙ্গিরা অথর্বাঙ্গিরস নামে পরিচিত হবেন।

কুরুক্ষেত্রে দ্রোণ যখন তুমুল যুদ্ধ করছিলেন তখন অঙ্গিরস ও অন্যান্য মুনিরা এসে দ্রোণকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেন। দ্রোণ অবশ্য কথা রাখেননি। সূর্যকে একবার রক্ষা করেছিলেন। পাণ্ডবদের বনবাস কালে গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যা করছিলেন। অগস্ত্যের পদ্মফুল চুরি গেলে অঙ্গিরস অগস্ত্যকে অপরাধী কে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। একবার সাগরের সব জল পান করেন কিন্তু এতেও তৃষ্ণা মেটে না; অঙ্গিরস তখন নিজে জলের একটি প্রস্রবণ সৃষ্টি করে সেই জলও পান করে প্রস্রবণ শুষ্ক করে ফেলেন। অগ্নি একবার অঙ্গিরসকে সম্মান না দেখালে অগ্নিকে শাপ দেন; সেই থেকে অগ্নি ধূম উদ্গীরণ করে থাকেন। বায়ু একবার অঙ্গিরসের বিরক্তিভাজন হয়ে পালিয়ে লুকিয়ে থাকেন। শৌনক মুনিকে অঙ্গিরস দর্শন ও শাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা দেন। রাজা অভিক্ষিতের বহু যজ্ঞ করেছিলেন। ধ্রুব যখন তপস্যা করছিলেন তখন ধ্রুবকে আশীর্বাদ করেন।

অগ্নিদেবদের মধ্যে এবং ঋষিদের মধ্যে অঙ্গিরস একজন প্রধান দেবতা/ঋষি (ঋক্)। অঙ্গিরসের এক ছেলে হিরণ্যস্তূপ; ইনিও ঋষি (ঋক্)। অঙ্গিরস একবার দেবতাদের কাছে ইন্দ্রের সমতুল্য পুত্র চান। কিন্তু ইন্দ্র তাঁর সমতুল্য কেউ হবে চাইতেন না। ফলে নিজেই ইন্দ্র অঙ্গিরসের ছেলে হয়ে জন্মান। এই ছেলে সব্য (ঋক্)। অঙ্গিরসের উপদেশে ইন্দ্র একবার সরমাকে (স্বর্গের কুকুরী) লুকান গরুর সন্ধানে পাঠান (ঋক্)। দ্রঃ-কার্তিকেয়, চিত্রকেতু, সুদর্শন। (২) চাক্ষুষ মনুর ছেলে উরু এবং উরুর ছেলে অঙ্গিরস। (৩) অথর্বমন্ত্রবিৎ ঋত্বিক।

অঙ্গিরসগণ—বেদে বর্ণিত দেবতা ও মানুষদের মধ্যবর্তী সৃষ্টি। অগ্নির অনুচর। ভাগবত অনুসারে এঁরা অপুত্রক ক্ষত্রিয়রাজ রথীতরের স্ত্রীর সন্তান।

অঙ্গিরা—অথর্ব বেদের মন্ত্রসমূহ।

অঙ্গুত্তরনিকায়—সুত্ত-পিটকের চতুর্থ নিকায়। অন্য নাম একুত্তর নিকায়। রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ-মহাসংগীতির সময় অনুরুদ্ধ এই নিকায়ের ভার নেন। এই সুত্তগুলি এগারটি নিপাতে (পরিচ্ছেদে) বিভক্ত; প্রতি নিপাত আবার কয়েকটি বগ্‌গে (বর্গে) বিভক্ত। দীঘ্‌ঘ ও মজ্‌ঝিম নিকায়ের বৃহদাকার সুত্তগুলিতে উপস্থাপিত হয়েছে বৌদ্ধধর্মের তত্ত্ব; এবং অঙ্গুত্তর নিকায়ে ছোট ছোট সুত্তগুলির সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম অতি সুন্দর ভাবে আলোচিত হয়েছে। অভিধম্ম পিটকের অন্যতম গ্রন্থ পুগ্‌গল পঞ্‌ঞতি বস্তুতঃ এই অঙ্গুত্তর নিকায় থেকে উদ্ধৃতি সাহায্যে সংকলিত হয়েছে।

অঙ্গুল—বাৎস্যায়ন মুনি।

অঙ্গুলিমালা—প্রথম জীবনে একজন নৃশংস দস্যু; বুদ্ধদেবের সংস্পর্শে এসে পরিবর্তন

হয়। পরে বুদ্ধের শরণ নিয়ে অর্হৎ হন। কোশলরাজের পুরোহিতের ছেলে নাম অহিংসক। তক্ষশিলায় গুরুর অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র। ঈর্ষায় সতীর্থগণ গুরুর মন বিষাক্ত করে দেন। ফলে শিষ্যের ধ্বংস কামনায় দক্ষিণা হিসাবে শিষ্যের কাছে মানুষের ডান হাতের এক হাজার বুড়ো আঙুল দাবি করেন। অহিংসক তখন বনের মধ্যে পথিককে হত্যা করে আঙুল কেটে নিয়ে নিজের গলায় মালা করে ঝুলিয়ে রাখতেন। দস্যুকে দমন করার জন্য কোশলরাজ সৈন্য পাঠান। এদিকে অঙ্গুলিমালার মা খবর পেয়ে ছেলেকে সাবধান করে দিতে আসেন। অঙ্গুলিমালার তখন আর একটি মাত্র আঙুল পেতে বাকি। নিজের মাকেই তাই হত্যা করবেন ঠিক করেন। এই সময়ে বুদ্ধদেব এসে মাকে বাঁচান। পরে ভগবান বুদ্ধ কোশলরাজ প্রসেনজিতের কাছেও অঙ্গুলিমালাকে নিয়ে যান। অঙ্গুলিমালার পরিবর্তনে রাজাও মুগ্ধ হয়েছিলেন। শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার সময় ক্রুদ্ধ জনতার হাতে অঙ্গুলিমালা মারা যান। বুদ্ধের আদেশে জনতার সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করে অঙ্গুলিমালা প্রাণ দেন।

অঙ্গুলিমুদ্রা—দেবপূজায় অঙ্গুলি দিয়ে করণীয় মুদ্রা। কয়েকটি মুদ্রার নাম ঃ-অঙ্কুশ, অভয়, আবাহনী, বর, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ইত্যাদি। তন্ত্রশাস্ত্রে এদের বিশদ বিবরণ আছে।

অচল—দ্রঃ-সুবল। দক্ষ সারথি। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়তে অংশ নিয়ে ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের হাতে নিহত হন।

অচলত্রাতা—(১) বৌদ্ধ প্রধানের উপাধি। গণাধিপ বিশেষ। (২) শেষ জৈন আচার্যের একজন শিষ্য।

অচিন্ত্যভেদাভেদ—চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব মত অর্থাৎ গৌড়ীয়/বঙ্গীয় বৈষ্ণব মত। চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী এবং ঈশ্বরপুরীর দীক্ষাগুরু মাধবেন্দ্রপুরী। এই মাধবেন্দ্রপুরী সম্প্রদায়ের মতে এবং পদ্মপুরাণ মতে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র, ও সনক এই চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছাড়া আর কোন সম্প্রদায় থাকতে পারে না। বঙ্গীয় বৈষ্ণবরা কিন্তু এগুলি থেকে ভিন্ন আর একটি সম্প্রদায়। শঙ্করের কেবলাভেদ এবং অন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আত্যন্তিক ভেদবাদ এঁরা স্বীকার করেন না। বঙ্গীয় বৈষ্ণবরা ভেদাভেদবাদী। এঁদের মতে সমুদয় জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই শক্তি। এবং ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মের শক্তির যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান। পরস্পর বিরোধী ভেদ ও অভেদ যুগপৎ থাকতে পারে; যুক্তিতর্কের অগোচর হলেও শ্রুতার্থাপত্তি নামক প্রমাণের দ্বারা স্বীকৃত। ব্রহ্মার সঙ্গে জীব জগতের যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধকে এঁরা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ নাম দিয়েছেন। এঁরা পঞ্চম বৈষ্ণব সম্প্রদায়। ভারতীয় দর্শনে এই চিন্তাধারা একটি অভিনব সমন্বয় চেষ্টা।

অচিরবতী—অযোধ্যা অঞ্চলে প্রবাহিত রাপ্তি নদীর প্রাচীন নাম। আর একটি নাম সম্ভবত ঐরাবতী এবং ঐরাবতী থেকে রাপ্তি। শ্রাবস্তী এই নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। পঞ্চ মহানদীর অন্যতমা। পালি সাহিত্যে সুবিখ্যাত নদী।

অচ্ছোদ—স্বচ্ছ জল জলাশয়। কাশ্মীর অন্তর্গত মার্তণ্ড থেকে ১০ কি-মি দূরে। বর্তমান নাম আচ্ছাবল। কাদম্বরীতে এর বর্ণনা আছে। এই সরোবরের তীরে সিদ্ধাশ্রম অবস্থিত ছিল।

অচ্যুতাগ্রজ—(১) কৃষ্ণের বড়; বলরাম। (২) ইন্দ্র; অদিতির গর্ভে বামন রূপী বিষ্ণুর জন্মের আগে ইন্দ্রের জন্ম।

অজ—যার জন্ম নাই; চির বিদ্যমান। ঈশ্বর, ব্রহ্মা, জীবাত্মা। সাংখ্যে সত্ব, রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া। আদ্যা শক্তি। দক্ষ যজ্ঞে ব্রহ্মা (=অজ) মেষ রূপ ধরে পালিয়ে যান; ফলে মেষকেও অজ বলা হয়। বিষ্ণু, শিব। বিষ্ণুর মন থেকে জাত চন্দ্র এবং বিষ্ণুর ঔরস জাত মদন ও অজ। একাদশ রুদ্রের একজন (ভাগবত); অন্য কোথাও উল্লেখ নাই।

অজ—দিলীপ-দীর্ঘবাহু-রঘু-অজ-দশরথ। ব্রাহ্ম মুহূর্তে জন্ম বলে নাম। বাল্মীকি মতে নাভাগের ছেলে। অধ্যাত্ম রামায়ণে ও কালিদাস ইত্যাদিতে রঘুর ছেলে। বিদর্ভরাজ কন্যা ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভাতে যাবার সময় পথে একটি হাতী আক্রমণ করে। অজ হাতীটিকে মারবার আদেশ দেন। হাতীটি গুরুতর আহত হলে তার দেহ থেকে অপরূপ সুন্দর গন্ধর্ব প্রিয়ম্বদ বার হয়ে আসেন। একজন ঋষিকে উপহাস করার জন্য তাঁর অভিশাপে এই অবস্থা হয়েছিল। প্রিয়ম্বদ অজকে সম্মোহন নামে একটি বাণ উপহার দেন। এই বাণ দিয়ে স্বয়ংবরে আক্রমণকারী মিলিত রাজাদের সম্মোহিত করে ইন্দুমতীকে বিয়ে করেন। ইন্দুমতীর ছেলে দশরথ। ইন্দুমতী (দ্রঃ) মারা গেলে দশরথকে রাজ্য দিয়ে অজ প্রাণত্যাগ করেন। (২) জহ্নু-অজ-উশিক-গাধি (দ্র ঃ)। (৩) সুরভীর পুত্র অজ, একপাৎ, অহির্বুধ্ন্য, ত্বষ্টা, ও রুদ্র। (৪) তৃতীয় মনু উত্তমের ছেলে অজ, পরশু, দীপ্ত ইত্যাদি।

অজক—কশ্যপ ও দনুর সন্তান :—অজক, বৃষপর্বা ইত্যাদি। একজন দানব।

অজকব—অজ (বিষ্ণু) + ক (ব্রহ্মা) + ব (স্থি)—অর্থাৎ যাতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আছেন। অজ + ক + ব (=বা সেবা করা) + অ—অর্থাৎ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যা থেকে ত্রিপুরাসুর নিধনের সময় তুষ্ট হয়েছিলেন। হরধনু। বেণ রাজার ছেলে পৃথু যখন জন্মান তখন এই ধনু, দিব্যবাণ ইত্যাদি স্বর্গ থেকে পতিত হয়েছিল। দ্রঃ অজগব।

অজকাশ্ব—অজমীঢ় ও কেশিনীর ছেলে জহ্নু। জহ্নুর দুই ছেলে অজকাশ্ব ও বলকাশ্ব।

অজগ—অজ অর্থাৎ ব্রহ্মা যাঁর গান (গৈ=গান করা) করেন অর্থাৎ বিষ্ণু। অগ্নি। শিবধনু।

অজগব—অজকব (দ্রঃ) আজগব। অজ ও গাভীর শিঙ দিয়ে গঠিত ধনু। অজ + গো =বৃষ) + অ অর্থাৎ প্রলয় কালে বিষ্ণু যাঁর বৃষ হয়েছিলেন, শিব। অজ + গব (গো =বাণ) অর্থাৎ ত্রিপুরাসুর নিধনের সময় বিষ্ণু যেখানে বাণরূপ ধারণ করেছিলেন। হরধনু। মান্ধাতার ধনু এবং গাণ্ডীবও এই নামে উল্লিখিত।

অজন্তা—অজণ্টা, অজিণ্ঠা ২০° ৩০´ উঃ এবং ৭৫° ৪৫´ পূঃ। পাহাড় কাটা

গুহা। তরল লাভা কঠিন হয়ে প্রথমে ওপরে একটি শক্ত সর পড়ে। পরে নীচের অংশ সরে গিয়ে যে গহ্বর সৃষ্টি হয় অজণ্টা সেই ধরণের গুহা। একটি বৌদ্ধ কেন্দ্র। মহারাষ্ট্রে অন্যতম জেলা সদর ঔরঙ্গাবাদ থেকে ১০১ কি-মি এবং জলগাঁও স্টেশন থেকে প্রায় ৫৫ কি-মি দূরে ফর্দাপুর গ্রাম এবং এই গ্রাম থেকে ৬ কি-মি দূরে। গুহাগুলি থেকে অজন্তা গ্রাম ১১ কি-মি। নিয়মিত বাসের ব্যবস্থা আছে। হিউএনৎসাঙ এর একটি সুন্দর বিবরণ দিয়ে গেছেন।

৭৬মি উঁচু একটি খাড়া পাহাড়ের গায়ে কেটে গুহাগুলি তৈরি। প্রায় ৫৪৯ মি জুড়ে অর্দ্ধবৃত্তাকারে গুহাগুলি সাজান। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে তৈরি। ফলে পূর্বপরিকল্পিত পরিকল্পনার অভাব। প্রতিটি গুহা থেকে নিজস্ব সিঁড়ি নীচে বহতা নদী ওয়া-ঘোরাতে নেমে গেছে। এখন অবশ্য মাত্র দুটি সিঁড়ি অবশিষ্ট। গুহাগুলির কতকগুলি খৃষ্টপূর্বের; প্রাচীনতমটি (১০নং গুহা) খৃ-পূ দ্বিতীয় শতকের। দ্বিতীয় ভাগের গুহাগুলি চতুর্থ-পঞ্চম খৃষ্টীয় শতকে। এগুলির অধিকাংশ বাকাটকদের রাজত্বকালে তৈরি হয়েছিল। বাকাটক্ রাজা হরিষেনের মন্ত্রী বরাহদেবের আনুকূল্যে ১৬নং গুহা ও হরিষেণের অধীনে একজন সামন্ত রাজের সাহায্যে ১৭নং গুহা তৈরি হয়েছিল। গুহাগুলির মধ্যে কিছু গুহা দেবায়তন অর্থাৎ চৈত্যগৃহ; বাকিগুলি শ্রমণদের সভাস্থল অর্থাৎ সংঘারাম। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সমস্ত মিলে ত্রিশটি গুহা; এদের মধ্যে কয়েকটি গুহা অসমাপ্ত। ২৫-টি সংঘারাম ও পাঁচটি (৯, ১০, ১৯, ২৬, ২৯) চৈত্যগৃহ। ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩ ও ১৫নং গুহা প্রথম ভাগের অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্বের। চৈত্যগৃহ দুটির (৯, ১০) দরজার ওপর চৈত্য গবাক্ষ নামে পরিচিত ঘোড়ার নালের আকার চৈত্য গবাক্ষ আছে। ভেতরে স্তম্ভ শ্রেণীর আসন কুলার মত আকৃতি। গুহার ছাদের নীচের পিঠ অর্দ্ধবৃত্ত; অতীতে এই ছাদের গায়ে কড়িবরগা ছিল। এই দুটি দেবায়তনেই আরাধ্য বস্তু একটি পাথরের বেদী বা স্তূপ; কারণ এ যুগে বুদ্ধমূর্তি পূজা প্রচলিত হয়নি। প্রথম ভাগের বাকিগুলি সংঘারাম অর্থাৎ সুপ্রশস্ত সভাগৃহ। এই সভার তিন দিকে ছোট ছোট আবাসিক কক্ষ।

চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগের গুহাগুলির মধ্যে দুটি গুহা (৭, ১১) পরীক্ষামূলক। পরবর্তী গুহাগুলি এই পরীক্ষার ফলে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাতে গঠিত। এই ভাগের ১৯, ২৬, ও ২৯ এই তিনটি গুহা চৈত্যগৃহ; এবং ২৯ নং গুহাটি অসমাপ্ত। বাকিগুলি সংঘারাম। সংঘারামগুলিতে প্রথমে অলিন্দ, অলিন্দের পরে থামযুক্ত প্রশস্ত মণ্ডপ এবং মণ্ডপের তিনদিকে প্রকোষ্ঠ শ্রেণী। মণ্ডপের পেছনের সারির কেন্দ্রস্থ প্রকোষ্ঠে বুদ্ধমূর্তি উৎকীর্ণ। এগুলি এই আদর্শে গঠিত হলেও সংঘারাম-গুলির প্রত্যেকের কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। ৬নং গুহাটি দোতলা। ১, ২, ১৬, ১৭ নং গুহা স্থাপত্যে ভাস্কর্যে ও চিত্রণে তুলনাহীন। দ্বিতীয় ভাগের চৈত্যগৃহগুলি প্রথম ভাগের গঠনরীতি অনুসারে গঠিত। কিন্তু গুহার গায়ে অলংকারবহুল কারুকার্য এবং আরাধ্য স্তূপে (বেদীতে) বুদ্ধমূর্তি উৎকীর্ণ।

পাহাড় কাটা স্থাপত্যের বিবর্তন ধারায় গুহাগুলি অমূল্য। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা সবই অতুলনীয়। প্রথম ভাগের গুহার ছবিগুলিও খৃ-পূ প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের। ছবিতে বেশভূষা, উষ্ণীষ, অলঙ্কার ইত্যাদি সাঁচী ও ভারুতের উদগত মূর্তির মত। চিত্রগুলি নিপুণ হাতের পরিচয়। সমসাময়িক অন্য ভারতীয় ভাস্কর্য থেকে মূর্তিগুলিও উচ্চস্তরের। চিত্রগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় ভাগের গুহাগুলির ছবি চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে আঁকা। এই ছবিগুলি প্রায় তিন শতাব্দী ধরে আঁকা হয়। ফলে শিল্পমানের ইতর বিশেষ আছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের ছবিগুলি সৌন্দর্যে, ব্যঞ্জনায়, রঙের পরিকল্পনায়, রেখাবিন্যাসে, বৈচিত্র্যে ও গতিশীলতায় সমৃদ্ধ। নরনারীর ললিত সৌন্দর্য ও বিচিত্র আবেগ, নিখুঁত জীবন্ত রূপ ধরেছে। সপ্তম শতকে আঁকা বুদ্ধের ছবিগুলি কিন্তু নিষ্প্রভ ও ভাবব্যঞ্জনা রহিত। এগুলি নীচু মানের। চিত্রগুলি ধর্মীয়; বুদ্ধদেবের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও জাতকের কাহিনী ছবিগুলির উপজীব্য। এই সব ছবিতে সমসাময়িক রাজপ্রাসাদ, কুটির, নগর, গ্রাম, আশ্রম ইত্যাদির জীবন-যাত্রা এবং তখনকার সমাজের আচার ব্যবহার, সংস্কার, বিশ্বাস, পোষাক, পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র এমন কি যুদ্ধ বিগ্রহের প্রাথমিক দলিল রয়ে গেছে। প্রাচীন যুগের মানুষের কল্পিত স্বর্গরাজ্য, দেবদেবী ও উপদেবতার পরিচয়ও এখানে রয়েছে। ছাদে নীচের পিঠে বর্ণাঢ্য অলংকরণ। গাছ-পালা ফুল-ফল পশু-পাখী মানুষ কিন্নর মিলিয়ে বিচিত্র নক্সা। ছবিগুলি স্বাভাবিক সজীবও সুন্দর। এগুলি ফ্রেস্কো নয়। দেওয়ালে প্রথমে কাদামাটি তুঁষ ইত্যাদির, প্রলেপ দিয়ে পটভূমি তৈরি করে নিয়ে তার ওপর চুন দিয়ে ছবির রেখাগুলি টেনে নিয়ে রঙ করা হয়েছে। রঙের জন্য আঠার ব্যবহার করা হয়েছে। লাল, হলুদ, সবুজরঙ, গিরিমাটি, ভুষোকালি চুন, ও নীল পাথর চূর্ণ দিয়ে এই সব রঙ তৈরি হয়েছিল।

অজপ—পিতৃগণ (দ্রঃ)।

অজপা—(১) যা জপিবার নয়। নিশ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ারূপে আপনা থেকে যা জপ করা হয়। শ্বাস গ্রহণ কালে 'হং' মন্ত্র ও ত্যাগ কালে 'সঃ' এই মন্ত্র স্বতঃই উচ্চারিত হয়। 'হং' হচ্ছে পূরক; 'সঃ' রেচক। ৬০ শ্বাসে=১প্রাণ×৬০ =১নাড়িকা ×৬০=৬০×৬০×৬০=২১৬০০০ অজপার সংখ্যা। মানুষ দিবারাত্রে এতবার এই 'হংসঃ' মন্ত্র জপ করে। বিজ্ঞানে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির শ্বাস সংখ্যা ২৮৮০০মত। (২) প্রাণবায়ু। (৩) তান্ত্রিকদের আরাধ্য দেবী।

অজপাদ—অজের পাদের মত পাদ। একাদশ রুদ্রের একজন। পূর্বভাদ্রপাদ নক্ষত্রের দেবতা।

অজবীথী—জন্মরহিত বা অনাদি কালব্যাপী (নক্ষত্র) বীথি। আকাশে উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত ছায়াপথ।

অজমীঢ়—(১) অজম্ (বিষ্ণু)+ঈহ+ক্ত=বিষ্ণুকে যে ভালবাসে; যুধিষ্ঠির। (২) অজ+মিহ্ (সিঞ্চন করা)+ক্ত; বি; অজরাজ যেখানে যজ্ঞে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। (৩)দুষ্যন্ত—ভরত—বৃহৎক্ষেত্র—অজমীঢ়। এঁর তিন স্ত্রী: ধুমিনী, নীলী ও কেশিনী

(=পরমেষ্ঠী)। নীলীর ছেলে দুষ্যন্ত (শকুন্তলার স্বামী নয়); ধূমিনীর ছেলে ঋক্ষ, কেশিনীর ছেলে জহ্নু, প্রজ, রূপিন্ (৪) চন্দ্রবংশে রাজা হস্তীর ছেলে। রাজা বিকণ্ঠের কন্যা সুদেবীর স্বামী। অন্য চারটি স্ত্রী কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও ঋক্ষা। এই চার জনের ২৪০০ ছেলে, এদের মধ্যে সম্বরণ, তপতীর স্বামী, উল্লেখযোগ্য।

অজা—সাংখ্যে মায়া। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনগুণ যুক্ত প্রকৃতি। অজামেকাং লোহিতকৃষ্ণশুক্লাম্—সাংখ্যে।

অজাতশত্রু—যার শত্রু জন্মায় নি। (১) যুধিষ্ঠির। (২) উপনিষদে উল্লিখিত বারাণসীর রাজা। মহর্ষি গর্গ এঁকে ব্রহ্মজ্ঞান দিতে আসেন। কিন্তু এঁর ব্রহ্মজ্ঞান দেখে বিস্মিত হয়ে যান। সমসাময়িক ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে যাঁরা ব্রহ্মবিৎ ছিলেন তাঁদেব অন্যতম।

অজাত শত্রু—জরাসন্ধের অধস্তন ৩৬-শ পুরুষ। মগধ অধিপতি হর্যঙ্ক বংশীয় মগধরাজ বিম্বিসারের ছেলে। মা বিদেহ রাজকন্যা, বিমাতা উত্তর কোশলের রাজা প্রসেনজিতের বোন। অজাতশত্রুর অন্য নাম কূণিক। অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করলে বিমাতা শোকে প্রাণত্যাগ করেন; এবং প্রসেনজিৎ এঁকে যুদ্ধে বন্দী করে কাশী দখল করেন। পরে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে যৌতুক হিসাবে কাশী ফিরিয়ে দেন। প্রথমে বুদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন পরে বুদ্ধদেবের কাছে পাপ স্বীকার করে অনুগামী হন। জৈনরা এঁকে জৈনধর্মাবলম্বী হিসাবে দাবি করেন। লিচ্ছবিদের কাছ থেকে অজাতশত্রু বৈশালী অধিকার করেন। জৈন সূত্র অনুসারে পূর্বভারতের ৩৬টি গণশাসিত রাজ্য সমবায়ও তাঁর কাছে হেরে গিয়েছিল। অবন্তীর রাজা চণ্ডপ্রদ্যোৎ চেষ্টা করেও এঁর অগ্রগতিকে বাধা দিতে পারেন নি। খৃ-পূ পঞ্চম শতকের শেষের দিকে রাজত্ব করতেন। মগধকে বৃহত্তর ও শক্তিশালী করে তুলে মগধরাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

অজামিল—ভাগবতে উল্লিখিত গণিকাসক্ত চোর। কান্যকুব্জের একজন ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রপাঠ, পূজা, অতিথি-সেবা ও বৃদ্ধদের সেবায় ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু একদিন এক শূদ্রা বারাঙ্গনাকে ভোগাসক্ত দেখে তার প্রতি অনুরক্ত হন এবং নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে তাকে বিয়ে করেন। অন্য মতে পিতার নির্দেশে বনে সমিধ আনতে গিয়ে শূদ্রকন্যাকে বিয়ে করেন। এই বারাঙ্গনার আটটি/দশটি ছেলে হয় এবং সবচেয়ে ছোট ছেলের নাম নারায়ণ। দ্যূত, চৌর্যবৃত্তি, প্রবঞ্চনা, প্রাণিপীড়ন ইত্যাদি করে সংসার চালাতেন। মৃত্যুর সময় যমদূতরা এলে অজামিল ভয়ে ছোট ছেলের নাম ধরে ডাকেন। ফলে বিষ্ণুদূতরাও এসে উপস্থিত হন এবং শেষ পর্যন্ত যমদূতরা ফিরে যেতে বাধ্য হন। অজামিল নিজে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছিলেন এবং বিষ্ণুদূত ও যমদূতের কথোপকথন ইত্যাদির মাধ্যমে হরিনাম শুনে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে এবং মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে তপস্যা করতে থাকেন। এবং শেষকালে বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

অজামুখী—কশ্যপ সুরসার (দ্রঃ) মেয়ে। পুরুষ দেখলেই অজামুখী প্রলোভিত করে নিজের কাম চরিতার্থ করতেন। হিমালয়ে একবার দুর্বাসাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে বিয়ে করেন। ছেলে হয় ইল্বল ও বাতাপি। অজামুখী একবার কামের তাড়নায় কাশীতে আসেন। এখানে একদিন ইন্দ্রাণীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ধরে ফেলেন ; ভাই শূরপদ্মর সঙ্গে বিয়ে দেবেন। কিন্তু ইন্দ্রাণীর চিৎকারে মহাদেব অজামুখীর হাত কেটে ইন্দ্রাণীকে মুক্ত করে কৈলাসে পাঠিয়ে দেন। অজামুখীর হাত কাটা গেলে শূরপদ্ম দেবতাদের বন্দী করেন। শেষ অবধি ব্রহ্মার বরে অজামুখীর আবার হাত হয়।

অজিত—(১) বিষ্ণু, শিব, বুদ্ধদেব। (২) দেবগণ বিশেষ। সৃষ্টিকার্য আরম্ভের আগে ব্রহ্মা জয় নামে বারোজন দেবতা সৃষ্টি করেন। কিন্তু এঁরা সৃষ্টি কার্যে কোন সাহায্য না করে ধ্যানে নিযুক্ত হন। ব্রহ্মার সৃষ্টির কাজে বাধা পড়ে ফলে ব্রহ্মা এঁদের শাপ দেন যে প্রতি মন্বন্তরে এঁরা জন্মগ্রহণ করবেন। সপ্ত মন্বন্তরে এঁরা ক্রমে অজিতগণ, তুষিতগণ, সত্যগণ, হরিগণ, বৈকুণ্ঠগণ, সাধ্যগণ ও আদিত্যগণ নামে পরিচিত। (৩) চাক্ষুষ মনুর অধিকার কালে ভগবান অজিত নামে অবতীর্ণ হন। পিতা বৈরাজ, মাতা সম্ভূতি। সমুদ্র-মন্থনে ইনি কূর্মরূপে মন্দার পর্বত পিঠে ধারণ করেছিলেন। (৪) ইক্ষ্বাকুর ছেলে। (৫) চতুদর্শ মন্বন্তরে একজন সপ্তর্ষি।

অজিত কেশকম্বলী—গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক ছয়জন অপধর্মীয়ের (হেরেটিক্) উল্লেখ বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে ইনি একজন। অজিত কেশ রচিত কম্বল পরতেন। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থগুলিতে এঁর মতবাদ সব জায়গায় এক নয়। মতবাদগুলি অবশ্য বিরুদ্ধ ও হেয় মতবাদ এবং উচ্ছেদবাদ (নিহিলিজম্)। অজিতের মতবাদের দীর্ঘ পরিচয় দীঘ্ঘ নিকায় ও মজ্ঝিম নিকায় গ্রন্থে পাওয়া যায়। অজাতশত্রুর সঙ্গে তর্কে এঁকে আদর্শ কুতার্কিক (সোফিস্ট) বলে প্রতীয়মান হয়। এই মতে দানযজ্ঞ পাপপূণ্য সব মিথ্যা। বাপ মাও পূজ্য নয়। চরম জ্ঞানের অধিকারী বা ইহলোক পরলোক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোন ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ থাকতে পারে না। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এই চারটি ভূত দিয়ে গঠিত দেহ মৃত্যুর পর মাটি জল আগুন ও বাতাসে গিয়ে মিলে যায়। মূর্খ বা জ্ঞানী কোন তফাৎ নাই। মৃত্যুতেই সব শেষ। দ্রঃ আজীবিক।

অজিন—প্রথমে ছাগচর্ম বোঝাত। পরে ঋক্ অথর্ব ও শতপথ ইত্যাদিতে হরিণচর্ম। এবং এর পরে বাঘের চামড়া বোঝাত। অর্থাৎ যে কোন পশুর চামড়া বা চামড়ার আসন।

অজিরবতী—অন্য নাম অচিরবতী।

অজিহ্ব—বেঙ। দ্রঃ অগ্নি। বিজ্ঞানে কিছু বেঙ স-জিহ্ব।

অজীগর্ত—অন্য নাম ঋচীক।

অজৈকপাদ—অজের (মেষ রাশির) একপাদ (চতুর্থাংশ) বৎ যার পা। শিবমূর্তি। একাদশ রুদ্রের (দ্রঃ) একজন।

অজ্ঞাবাদ—একটি দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদে বলা হয় আত্মা, ঈশ্বর, ইত্যাদি আছে কিনা জানা নাই। সুতরাং এগুলি সম্বন্ধে হাঁ-না কিছুই বলা সম্ভব নয়। নাস্তিক বা জড়বাদীদের সঙ্গে তফাৎ এই যে নাস্তিক বা জড়বাদীরা সরাসরি আত্মা ইত্যাদি অস্বীকার করেন। অজ্ঞাবাদীরা মধ্যপন্থা নিয়ে চুপচাপ থাকেন। অজ্ঞাবাদের মূলে প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদ। প্রত্যক্ষপ্রমাণ দুটি শ্রেণী সৃষ্টি করেছে একটি অজ্ঞাবাদ এবং আর একটি অবিশ্বাসবাদ। প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যে অনেকখানি অজ্ঞাবাদ রয়েছে। ভগবান বুদ্ধকে আত্মা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি নীরব থাকতেন। অবশ্য তিনি কতটা অজ্ঞাবাদী ছিলেন বলা শক্ত। অজ্ঞাবাদ এই শব্দটি মোটামুটি ১৮৬৯ সালে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। দ্রঃ অজ্ঞেয়বাদ।

অজ্ঞেয়বাদ—এখানে ভগবান ইত্যাদির অস্তিত্ব মোটেই অস্বীকার করা হয় না। এই মতবাদে বলা হয় মানুষের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা এবং ফলে মানুষের জ্ঞান সীমিত। অর্থাৎ কোন দিন জানা সম্ভব নয়। অজ্ঞাবাদে বলা হয় আজ পর্যন্ত জানা নাই পরে জানা যেতেও পারে।

অঞ্জলিকবাণ—ভীষ্মের শরশয্যার সময় এই বাণে অর্জুন ভীষ্মের বিকল্প উপাধানের ব্যবস্থা করেন।

অঞ্জন—(১) পশ্চিম দিকহস্তী (দ্রঃ)। (২) সুপ্রতীক দিকহস্তীর চারটি ছেলে অঞ্জন, ঐরাবত, বামন ও কুমুদ ; এরা চারজন অসুরদের হাতী ; ইন্দ্রের ঐরাবত নয়। (৩) পূজায় ব্যবহৃত অঞ্জন :—সৌবীর, জাজ্বল, তুত্থ, ময়ূর, শ্রীকর, দর্বিকা, নীলমেঘ।

অঞ্জনপর্ব্বা—ঘটোৎকচের ছেলে। কুরুক্ষেত্রে ১৪-দিনের দিন অশ্বত্থামার হাতে নিহত হন।

অঞ্জনবতী—ঈশান কোনে সুপ্রতীক দিক-হস্তীর (দ্রঃ) স্ত্রী।

অঞ্জনা—(১) পশ্চিম দিক হস্তীর স্ত্রী। (২) বিশ্বামিত্রের শাপে অপ্সরা পুঞ্জিকাস্থলা (দ্রঃ)/মানগর্ভা, বানর শ্রেষ্ঠ কুঞ্জরের মেয়ে হয়ে জন্মান। সুমেরু রাজা কেশরী (দ্রঃ) বানরের সঙ্গে বিয়ে হয়। মরুৎ বিনা দেহ সম্পর্কে এঁর গর্ভে শিবের বীর্য স্থাপন করেন। মরুৎকে অঞ্জনা তিরস্কার করলে মরুৎ আশ্বাস দেন একটি অতিবীর সন্তান হবে এবং এই সন্তান মারুতি/হনুমান (দ্রঃ) জন্মালে মুক্তি পাবেন। হনুমান স্তন্যপানের জন্য কাঁদতে থাকলে অঞ্জনা ভৎর্সনা করে বলেন বানরে পাকা ফল খায় এবং দিব্য রূপ ধরে স্বর্গে ফিরে যান।

অঞ্জলি—নাট্যশাস্ত্রে দুটি হাত জোড় করে অভিবাদন করা। দেবতাকে প্রণাম করতে মাথার ওপর, গুরুজনকে মুখ মণ্ডলের ওপর এবং ব্রাহ্মণকে প্রণাম করতে বুকের ওপর অঞ্জলি ধারণ বিধেয়।

অট্টহাস—বীরভূমে সিউড়ি মহকুমার লাভপুর থানায় অবস্থিত ৫১ পীঠের একটি। এখানে সতীর অধরোষ্ঠ পড়েছিল। দেবী ফুল্লরার মন্দিরে প্রায় দশবার হাত চওড়া অঙ্গ সামঞ্জস্যহীন প্রকাণ্ড একটা শিলামূর্তি আছে। বিশ্বাস এটি অধরাকৃতি। মন্দিরের পাশে ভৈরব মন্দির আছে।

অট্‌ঠ কথা বা অত্থকথা—সংস্কৃতে অর্থকথা। বৌদ্ধপালি ত্রিপিটকের নিকায় বা তার অন্তর্গত সুত্তগুলির টীকা বা ব্যাখ্যা। এগুলি বেশির ভাগ বুদ্ধঘোষের রচনা। ধম্মপাল প্রভৃতিরও অট্ঠ কথা পাওয়া যায়। প্রাচীন সিংহলী ভাষায় রচিত অট্‌ঠ কথাও আছে। বুদ্ধঘোষের সমন্তপাসাদিকা, সুমঙ্গল বিলাসিনী, পপঞ্চসূদনী, মনোরথপূরনী, সারত্থপকাসিনী, পরমত্থজোতিকা নামে টীকা বা অট্ঠকথাগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ।

অণহিল পাঠক—প্রাচীন নগরী। আহমেদাবাদের ১০৫ কি-মি উত্তরে সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বর্তমান নাম পাটন। প্রবাদ আছে চাপ বা চাবোৎ-কট বা চোবড়া জাতির রাজা ধনরাজ ৭৪৫ খৃষ্টাব্দে এর প্রতিষ্ঠা করেন। ৯৪০ খৃষ্টাব্দে চৌলুক্যরাজ গুজরাট দখল করে এখানেই রাজধানী করেন।

অণিমা—যোগের অষ্টসিদ্ধির একটি। যথেচ্ছ অতিসূক্ষ্ম হওয়ার ক্ষমতা বা বিভূতি। দেবতারা বা এই বিভূতির অধিকারী যোগী অতিসূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে ঘুরে বেড়াতে পারেন।

অণিমাণ্ডব্য—অণীমাণ্ডব্য। প্রকৃত নাম মাণ্ডব্য। জনৈক মৌন ধার্মিক ব্রাহ্মণ। একদিন আশ্রমের দরজায় যোগাভ্যাস করছিলেন এমন সময় একদল চোর এসে আশ্রমে লুকিয়ে পড়ে। তারপর এরা চুরির জিনিসপত্র ফেলে রেখে পালায়। নগরপাল ইতিমধ্যে এসে আশ্রমে ঢুকে চুরির জিনিসপত্র পেয়ে এঁকে বিচারের জন্য আনেন। রাজা এঁকে শূলে প্রাণদণ্ড দেন। অণিমাণ্ডব্য যোগরত অবস্থায় এ সব কিছুই জানতে পারেন না। শূলবিদ্ধ অবস্থায় কিন্তু মারাও যান না। এই সময় মহাদেব এসে আশীর্বাদ করে যান এবং বহু মুনি ঋষি পাখীর বেশে এসে তাঁকে কুশল প্রশ্ন করে যান। এই সব খবর পেয়ে রাজা এসে ক্ষমা চান এবং শূল খুলে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সম্ভব হয় না ; শূলের কিছুটা অংশ দেহের মধ্যে থেকে যায় বাকি অংশটা কেটে বাদ দেওয়া হয়। অণি অর্থাৎ শূলাগ্র দেহের মধ্যে থেকে যাবার জন্য এই নাম।

অণিমাণ্ডব্য পরে একদিন যমের কাছে এই শাস্তির কারণ জানতে চাইলে যমরাজ জানান বাল্যকালে অণিমাণ্ডব্য এক পতঙ্গের/মতান্তরে ছোট ছোট পাখীর মলদ্বারে এই ভাবে তৃণ শলাকা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। অণিমাণ্ডব্য তখন নিয়ম করেন অন্যমতে অণিমাণ্ডব্য জানান শাস্ত্রে আছে ১২/১৪ বছরের আগে অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য যেন কারো শাস্তি না দেওয়া হয়। এবং বালক বয়সের এই পাপের শাস্তি দেবার জন্য যমকে শূদ্র/বিদুর হয়ে জন্মাবার অভিশাপ দেন। দ্রঃ-বিদুর, দত্তাত্রেয়, উগ্রশ্রবা।

অণু—যযাতির ছেলে।

অণ্ড—প্রলয়ের পর প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল অণ্ড।

অণ্ডকটাহ—ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহ; জীবের স্বকীয় কাজের ফলভোগের স্থান। সংখ্যায় ১৪-টি :—ভূলোক, ভুবর্লোক স্বর্লোক, মহর্লোক, জনর্লোক তপোলোক, সত্যলোক, পাতাল, রসাতল মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল, অতল।

অতল—সাতটি পাতালের (দ্রঃ) প্রথম অংশ। এখানে ময়ের ছেলে বল (দ্রঃ)

রাজত্ব করতেন।

অতিকায়—মধুকৈটভ (দ্রঃ) ত্রেতা যুগে খর ও অতিকায় হয়ে জন্মান। রামের সঙ্গে খরের যুদ্ধ হয় এবং লক্ষ্মণের হাতে অতিকায় মারা যান। অন্য মতে কুবেরকে জয় করে ফেরার পথে ময়ূর গিরিতে কয়েকটি ক্রীড়ারত গন্ধর্বকন্যাকে রাবণ দেখতে পান। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্বের স্ত্রী চিত্রাঙ্গী। চিত্রাঙ্গীকে রাবণ প্রলোভিত করে মিলিত হন। ফলে একটি উজ্জ্বলবর্ণ শিশু অতিকায়ের জন্ম হয়। রাবণ শিশুকে নিয়ে ফিরতে থাকেন। পথে এক জায়গায় পুষ্পক রথ পাহাড়ে ধাক্কা খেলে শিশুটি নীচে পড়ে যায়। রাবণ শিশুটি খুঁজে বার করেন। শিশু একটুও আহত হয় নি ; এবং এত বিরাট আকার হয়ে ওঠে যে রাবণ নিজেই আর একে তুলতে পারেন না। শিশুটি তারপর নিজেই লাফিয়ে বিমানে উঠে আসে। লঙ্কায় ফিরে এসে রাবণ শিশুটিকে ধান্যমালিনীর হাতে দেন পালন করবার জন্য। অন্য মতে রাবণের ঔরসে ধান্যমালিনীর ছেলে। গোকর্ণ তীর্থে অতিকায় তপস্যা করেন। ব্রহ্মা এলেও সমাধিমগ্ন অতিকায় জানতে পারেন না। পরে ব্রহ্মা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং অতিকায়ের প্রার্থনা মত বর দেন :—(১) ব্রহ্মাস্ত্রলাভ ; (২) দুর্ভেদ্য কবচ লাভ ; (৩) তৃষ্ণা ও অন্যান্য বাসনা থেকে মুক্তি। অতিকায়ের মাতুল চন্দ্র রাক্ষস ইন্দ্রের কাছে হেরে গিয়ে ইন্দ্রকে ধরে আনতে বলেন। ফলে অতিকায় ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেন ; বিষ্ণু ইন্দ্রকে সাহায্য করলেও শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রকে হারতে হয়। লঙ্কাতে লক্ষ্মণের হাতে অতিকায় মারা যান।

অতিচার—মঙ্গলাদি পঞ্চগ্রহের স্বস্ব রাশি ভোগের কাল শেষ হবার আগে অন্য রাশিতে গমন।

অতিথি—তিথির কমাবাড়া অনুসারে একই দিনে দুই তিথি বা দুদিনে একই তিথি পড়া। দুদিনে একই তিথি হলে পরদিনের তিথি।

অতিথি—(১) কুশের ছেলে ; মা কুমুদ্বতী ; নাগরাজ ভগিনী। রাম চন্দ্রের নাতি। (২) যার আসা যাওয়ার কোন নির্দিষ্ট তিথি নাই। যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ॥ অকস্মাৎ গৃহমায়াতি সোঽতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ। বা এক রাত্রির অধিক যার স্থিতি নয়। মিতাক্ষরা মতে শ্রোত্রিয়, পথিক ও বেদ-পারগ তিনজনই অতিথি। বৌদ্ধ শাস্ত্রে যিনি বিদ্বান, সর্বত্র ভ্রমণকারী এবং যিনি প্রশ্নোত্তর রূপে উপদেশ দিয়ে জনসাধারণের হিত সাধন করেন।

অতিথিগ্ব—দিবোদাস। এক রাজা। ইন্দ্রের সাহায্যে অসুরদের সঙ্গে অনেকগুলি যুদ্ধ করেছিলেন। অসুরদের ভয়ে একবার জলের নীচে লুকিয়ে ছিলেন।

অতিবল—(১) রাম ও লক্ষ্মণকে বনে নিয়ে গিয়ে বিশ্বামিত্র বল ও অতিবল মন্ত্র দেন। ক্ষুৎ-পিপাসা জয়কারী মন্ত্র। (২) ব্রহ্মা কালপুরুষকে (যম) পাঠান ; ইনি অতিবল নামে সন্ন্যাসীর বেশে রামচন্দ্রের সঙ্গে গোপনে কথা বলতে আসেন।

অতিবাহু—প্রধার ছেলে।

অতিভীম—অগ্নির একটি ছেলে।

অতিরাত্র—নড্‌লার (দ্রঃ) ছেলে।

অতীশদীপঙ্কর—১১শ শতক। যেন বিক্রমণীপুর (বিক্রমপুর)-এর রাজা কল্যাণশ্রীর ছেলে। ভারতে, সুবর্ণ দ্বীপে ও সিংহলে অধ্যয়ন শেষে বিক্রমশীলা মহাবিহারে ৫১-জন আচার্য-ও ১০৮টি মন্দিরের অধ্যক্ষ হন। তিব্বত-রাজ জ্ঞানপ্রভের আমন্ত্রণে তিব্বতে যান (১০৪০ খৃ)। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম স্থাপন করেন। ক-দম্ (পরে নাম গে-লুক্) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। বহু গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। নিজস্ব রচনাও ছিল ; বর্তমানে লুপ্ত ; তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যায়। তিব্বতে বুদ্ধের অবতার বলে পূজিত ; লাসার নিকটে সমাধি স্থান একটি পবিত্র তীর্থ। ভারতবর্ষে থাকাকালীন সম্রাট নয়পালের এবং পশ্চিম দেশীয় কর্ণরাজের মধ্যে বিবাদের মধ্যস্থতা করে দিয়েছিলেন।

অত্রি—ঋক্ বেদে একজন ঋষি ; ৫ম মণ্ডল এঁর দ্বারা রচিত। অথর্ব বেদে এঁর প্রাধান্য। মন্ত্রকার ও গোত্রপ্রবর্তক। এঁর স্মৃতি অত্রিসংহিতা। প্রাচীনতম ঋষিদের সমসাময়িক হলেও পৌরাণিক কাল পর্যন্ত এই বংশের প্রভাকর ছাড়া অন্য কাউকে পাওয়া যায় না। পুরুবংশে রাজা ভদ্রাশ্ব/রৌদ্রাশ্বের দশটি মেয়েকে প্রভাকর বিয়ে করেছিলেন। এই বিয়েতে দশটি ছেলে হয় এবং আত্রেয়দের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বংশে প্রাচীনবর্হিস্ (অন্য মতে অগ্নির ছেলে) মুনি জন্মান। আত্রেয়রা জাহাজ তৈরিতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এই জন্য ভার্গবদের সঙ্গে বিবাদের সময় কার্তবীর্যার্জুন দত্ত-আত্রেয়কে তুষ্ট করে এঁদের সাহায্য নিয়েছিলেন।

ব্রহ্মার মানস পুত্র অত্রি ; চক্ষু থেকে জন্ম ; একজন সপ্তর্ষি। অষ্ট প্রকৃতির একজন। স্ত্রী অনসূয়া (দ্রঃ)। পুত্র লাভের আশায় স্ত্রীর সঙ্গে পাহাড়ে গিয়ে তপস্যা করেন। তুষ্ট হয়ে ত্রিমূর্তি এসে বর দেন বিষ্ণু অংশে দত্তাত্রেয় (দ্রঃ বলি) শিব অংশে দুর্বাসা, এবং ব্রহ্মা অংশে সোম/চন্দ্র জন্মাবেন। মনুসংহিতায় অত্রি মনুর সৃষ্ট দশজন প্রজাপতির একজন ; এঁর ছেলেরা বর্হিষদ্, দৈত্যদানবাদির পিতৃপুরুষ। হরিবংশে ইনি স্বয়ম্ভূর সাত মানসপুত্রের একজন ও স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের একজন। এঁর চোখের জলে চন্দ্রের উৎপত্তি।

স্ত্রী অনসূয়াকে নিয়ে বনবাসে যাবার সময় স্ত্রী কিছু অর্থ চান, শিষ্য ও ছেলে-দের দিয়ে যাবেন। অত্রি বৈন্য রাজার যজ্ঞাশালাতে এসে রাজাকে স্তব করতে থাকেন। কিন্তু এই স্তব রাজার পছন্দ হয় না। দুজনে তর্ক হতে থাকে এবং তর্কের মীমাংসার জন্য দুজনে সনৎকুমারের কাছে এলে ইনি মীমাংসা করে দেন। রাজা তারপর অত্রিকে প্রচুর অর্থ দান করেন। একবার দেবাসুরের যুদ্ধে বাণবর্ষণে চন্দ্রসূর্য ঢাকা পড়ে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেলে দেবতারা অত্রিকে একটা প্রতিকার করতে বলেন। অত্রি তখন সূর্য ও চন্দ্রে পরিণত হয়ে দেবতাদের আলো দেন এবং সূর্যের তেজে অসুরদের পুড়িয়ে শেষ করে দেন। দত্তাত্রেয়ের ছেলে নিমি। নিমির ছেলে মারা গেলে অত্রি এসে-ছিলেন।

কামদ বনে অত্রি একবার তপস্যা করছিলেন। এই সময় দেশে ভীষণ অনাবৃষ্টি

হয়। স্ত্রী অনসূয়া বালি দিয়ে শিবলিঙ্গ গড়ে পূজা করছিলেন। অত্রি স্ত্রীকে জল চান। কিন্তু জল ছিল না। গঙ্গা তখন সেখানে এসে উপস্থিত হন এবং একটি কূপ তৈরি হয়ে কূপ থেকে জল উঠতে থাকে। অনসূয়া গঙ্গাকে এক মাস থেকে যেতে বলেন। গঙ্গা জানান অনসূয়া যদি তাঁর তপস্যার পুণ্য গঙ্গাকে দিয়ে দেন তবেই তিনি থাকবেন। জল পেয়ে অত্রি স্ত্রীর কাছে সব ঘটনা শোনেন এবং গঙ্গাদেবীকে দেখতে চান। অনসূয়ার অনুরোধে শেষ অবধি গঙ্গা পৃথিবীতে সর্বদা বর্তমান থাকতে সম্মত হন।

অত্রি ও অন্যান্য ঋষিরা দ্রোণের কাছে এসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। অসুররা একবার অত্রিকে শতদ্বার যন্ত্রের মধ্যে ফেলে দিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে/পুড়িয়ে মারতে চেষ্টা করলে অত্রি অশ্বিনীকুমারদের স্তব করলে এঁরা এসে মুক্ত করে দেন। রাম অযোধ্যায় ফিরে এলে অত্রি দেখা করতে এসেছিলেন। দ্রঃ- চন্দ্র, বৃষাদর্ভি। (২) শুক্রাচার্যের এক ছেলে অত্রি।

অথর্ব—অথর্বন্=অথ (মঙ্গল)+ঋণ (গমন করা)+বন=যে মঙ্গলে গমন করেন। প্রাচীন পারসিক আথর্বন এবং ফারসী আতর্ (আতিশ=অগ্নি)+বন্ (সেবা/স্তব করা)=আতুরবান্=অগ্নিপূজক। চতুর্থ বেদ। ব্রহ্মার উত্তর মতান্তরে পূর্ব মুখ থেকে উৎপত্তি। সামবেদের, ছান্দোগ্য উপনিষদে একে চতুর্থ বেদ বলা হয়েছে। ঐতরেয়, শতপথ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য প্রভৃতি গ্রন্থে তিন বেদের উল্লেখ আছে ; মনুতেও বহু স্থানে তিন বেদের কথাই বলা হয়েছে। ইতিহাস ও পুরাণে অবশ্য চার বেদের কথাই আছে। এই বেদে বিংশতি কাণ্ড, নয়টি শাখা ও পাঁচটি কল্প। ইহার ব্রাহ্মণ গোপথ ব্রাহ্মণ। উপনিষৎ :-প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য। পাঁচটি কল্পসংহিতা :-নক্ষত্র কল্প ; নক্ষত্র পূজার বিধি। বেদকল্প ; ব্রহ্ম ও ঋত্বিক সম্পর্কীয়। সংহিতাকল্প ; মন্ত্রবিধি। আঙ্গিরসকল্প ; অভিচার ব্যবস্থা। শান্তিকল্প অশ্বহস্তী ইত্যাদি পশুপালন।

অথর্বা ঋষির নামে প্রসিদ্ধ বেদ। অন্য নাম আঙ্গিরস বা অথর্বাঙ্গিরস বা ভৃগ্বঙ্গিরস্ বেদ। অথর্বা, অঙ্গিরাঃ, ও ভৃগু তিন জনেই এই বেদ মন্ত্রের রচয়িতা বা সংকলয়িতা। একটি মতে বশিষ্ঠ পুত্র অথর্বন এর প্রণেতা। বিষ্ণু পুরাণ মতে জৈমিনি পুত্র সুমন্ত মহর্ষি তাঁর প্রিয় শিষ্য কবন্ধকে প্রথমে এই বেদ শিক্ষা দান করেন। কবন্ধ এই বেদকে দুভাগ করে মহর্ষি দেবদর্শ ও পথ্যকে ভাগ করে দেন। দেবদর্শের শিষ্য মেধা, ব্রহ্মবলি, শৌতকায়নি এবং পিপ্পলাদ। পথ্যের শিষ্য জাবালি, কুমুদাদি ও শৌনক। শৌনক আবার তাঁর অংশকে বভ্রু ও সৈন্ধবকে ভাগ করে দেন।

পদ্যের পরিমাণ বেশি থাকা অনুসারে ঋক্, গদ্যের পরিমাণ বেশি থাকা অনুসারে যজুঃ এবং গীতের পরিমাণ বেশি থাকা অনুসারে সামবেদ নাম হয়েছে। চতুর্থ বেদকে এই ভাবে নাম দেওয়া সম্ভব হয়নি। সব ধরণের মন্ত্রই এতে আছে ; ফলে সংকলয়িতাদের নাম অনুসারে নাম। অথর্ব বেদের বহু শাখার মধ্যে আটটি শাখা :-পৈপ্পলাদ, তৌদ, মৌদ, শৌনক, জাজল, জলদ, ব্রহ্মবেদ, দেবদর্শ ও চারণবৈদ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। অথর্ব বেদের যে সমস্ত বিভিন্ন শাখা

তৈরি হয়েছিল তাদের মধ্যে অল্পবিস্তর পাঠভেদ ও প্রয়োগভেদ ছিল। শাখাগুলি বৈদিক চরণপর্ষদের প্রধান ঋষিদের নামে অভিহিত ছিল। এই সমস্ত বহু শাখাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শৌনক শাখার মন্ত্রসংহিতা ভাষ্যসহ ছাপা হয়েছে। পৈপ্পলাদ সংহিতার মূল বইও পাওয়া গেছে। মূল বিষয়ে শৌনক ও পৈপ্পলাদ শাখার লক্ষ্য এক। শৌনক সংহিতায় বিশটি কাণ্ড : সাতশ ত্রিশটি সূক্ত, এবং প্রায় ছ হাজার মন্ত্র রয়েছে। অন্তিম কাণ্ডের অধিকাংশ মন্ত্র ঋক্ বেদেও পাওয়া যায়। অন্য কাণ্ডগুলির অনেক মন্ত্র ঋক্‌বেদে ও যজুর্বেদের সঙ্গে মিলে যায়। সমস্ত মন্ত্রগুলির এক সপ্তমাংশ এইভাবে মিলে যায়। ঋকবেদের অনেক পরে অথর্ববেদ সংকলিত হয়েছিল।

অথর্ববেদের বেশির ভাগ মন্ত্রই স্বার্থকেন্দ্রিক গৃহ্যকর্মের জন্য। এই মন্ত্রগুলির মাধ্যমে মানুষের সহজাত আশা আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। অর্থলাভ, রোগ-নাশ রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি, পারিবারিক সম্প্রীতি, ভূত-নিবারণ ইত্যাদি কাজে যে সব মন্ত্র ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে শান্তমন্ত্র বলা হয়। শত্রুনাশ, পররাজ্য উৎসাদন, বশীকরণ, ভূতাবেশন ইত্যাদি ঘোর কর্ম বা আভিচারিক কর্ম; এবং এই সব কাজের মন্ত্রগুলি ঘোর মন্ত্র নামে পরিচিত। অথর্ববেদে আর এক শ্রেণীর মন্ত্র আছে 'কৃত্যাপ্রতিহরণ' মন্ত্র, এই মন্ত্রগুলি শত্রু কৃত অভিচারের প্রতিষেধ মূলক।

আঙ্গিরস কল্পে দশ রকম আথর্বণিক কাজের উল্লেখ আছে, যথা :-শান্তিক, পৌষ্টিক, বশীকরণ, স্তম্ভন, মোহন, দ্বেষণ, উচ্চাটন, মারণ, আকর্ষণ ও বিদ্রাবন। এই কাজ গুলির সঙ্গে তন্ত্রের ষট্‌কর্মের অদ্ভুত মিল আছে। অন্য বেদে এই ধরণের মন্ত্র অল্প। বিবাহ, গর্ভাধান, পিতৃমেধ প্রভৃতি নিত্যকর্মের মন্ত্রও অথর্ববেদে আছে।

অথর্ববেদের ভূমিসূক্তে (১২-১) সব প্রথম বসুন্ধরাকে জননী বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে 'মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ'। আয়ুষ্য ও ভৈষজ্য মন্ত্রগুলিতে আয়ুর্বিজ্ঞানের প্রথম পদক্ষেপ। নানা ওষধির নাম ও বিভিন্ন শরীর সংস্থানের নাম এখানে রয়েছে। রাজকর্ম পর্যায়ে রাজার নির্বাচন, অভিষেক, গুণাবলী ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্বন্ধে বহু নির্দেশ রয়েছে। অথর্ব বেদে আধ্যাত্মিক মন্ত্রের সংখ্যাও অনেক। একটি পরম তত্ত্বই যে বিশ্ব সংসারের সব কিছুর মূল বহু মন্ত্রে বারবার এ কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্মচারী, বেন, স্কম্ভ, অনড্বান, রোহিত, উচ্ছিষ্ট, কাল, প্রাণ, পাঙ্ক্তি, সলিল ইত্যাদি বিষয়ে মন্ত্রগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। সুপ্রসিদ্ধ ব্রাত্য কাণ্ডের (পঞ্চদশ কাণ্ড) ব্রাত্যগণকে নিগূঢ় অধ্যাত্ম রসের প্রতীক রূপে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

অথর্ব বেদের আর এক নাম ব্রহ্মবেদ। গোপথ ব্রাহ্মণে আছে ব্রহ্মা নামে ঋত্বিক অথর্ব বিদ্যায় পারঙ্গম হবেন। ব্রহ্ম শব্দের এক অর্থ অভিচার অপর অর্থ বিশ্বের মূলতত্ত্ব। এই উভয় অর্থরূপ ব্রহ্মই এই বেদের প্রতিপাদ্য। অর্থাৎ সব দিক থেকেই অথর্ব বেদ ব্রহ্মবেদ। এই বেদে সত্যই আভ্যুদয়িক ও অভিচার মন্ত্রের সঙ্গে আধ্যাত্মিক মন্ত্রের একটা নিবিড় মিশ্রণ হয়ে গেছে। অঙ্গিরস কল্পের মতে এই বেদে সংসারীর ভোগ এবং সন্ন্যাসীর মুক্তি দুইই আছে :-যত্রহি রাগিনাম্ ভুক্তিঃ যত্র হি মুক্তিঃ অরাগিনাম্।

অথর্ব—(১) অথর্ব বেদের ব্রাহ্মণ অংশ। (২) বশিষ্ঠ ঋষি। (৩) ব্রহ্মার বড় ছেলে; মুখ থেকে জন্ম। ব্রহ্মা এঁকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেন (মুণ্ডক)। অথর্ব বেদ রচয়িতা। কর্দম কন্যা শান্তি এঁর স্ত্রী। শান্তির আর এক নাম চিত্তি। কিছু মতে দুই স্ত্রী শান্তি ও চিত্তি। একটি মতে অথবা বশিষ্ঠ পুত্র। অথর্বার কাছ থেকে অঙ্গিরা এবং অঙ্গিরার কাছ থেকে ভরদ্বাজ বংশীয় সত্যবাহ এবং সত্যবাহ থেকে অঙ্গিরস এই ব্রহ্মবিদ্যা পান। কিছু মতে অথর্বাই অঙ্গিরা।

অথর্বা—অথর্বা শব্দটি প্রাচীন কাল থেকে ভারতে ও ইরানে একই অর্থে প্রচলিত। দুই দেশেই অগ্নিপূজা ও পুরোহিতের কাজের সঙ্গে অথর্বার সম্পর্ক। ঋক্‌বেদে আছে ইনি সর্ব প্রথম অগ্নিমন্থন করেন বা স্বর্গ থেকে অগ্নিকে পৃথিবীতে আনেন।

আবার আছে অথর্বার ছেলে দধ্যঞ্চ (দধীচি) অগ্নি জ্বালেন। অগ্নিকে অথর্বা যজ্ঞাদি কাজে নিযুক্ত করেন। অথর্ব বংশের পুরোহিতরা যজমানের পক্ষে প্রশস্ত বলে গণ্য হতেন। শান্তি, স্বস্ত্যয়ন ও মন্ত্রৌষধিতে এঁদের খ্যাতি ছিল। জরথুস্ত্র ধর্মের অগ্নি উপাসক পুরোহিতরাও আথর্বন, বর্তমানে অথ্রৌনা নামে পরিচিত।

অথর্বা ঋষি অঙ্গিরার সঙ্গে মিলে অথর্ব বেদ সঙ্কলন করেছিলেন। এই জন্য অথর্ব বেদের মন্ত্রগুলির দুটি ভাগ :-আথর্বন ও আঙ্গিরস। আথর্বন মন্ত্র ভেষজ ইত্যাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং আঙ্গিরস মন্ত্র অভিচার কাজে ব্যবহার হয়। মহাভারত মতে অথর্ববেদের পেশাদার পাঠকদের নাম অথর্বা। ভৃগু শাপে অগ্নি যখন সমুদ্রে লুকিয়ে ছিলেন তখন এই অথর্বা অগ্নিকে খুঁজে এনে সৃষ্টি রক্ষা করেন।

অদিতি—বড় বলে যাকে ছেদন করা যায় না; অর্থাৎ পৃথিবী—ইয়ং বৈ পৃথিবী অদিতিঃ—শতপথ। বৈদিক অর্থে দেবমাতা, অদীনা, দাক্ষায়ণী, দৌ, আকাশ, জগৎ-জননী, ঐশীশক্তি। (২) অদিতি দক্ষ প্রজাপতির মেয়ে, কশ্যপের স্ত্রী, দেবতাদের মা। এঁর গর্ভে ৩৩-টি ছেলে হয় :-১২ জন আদিত্য, ১১ জন রুদ্র ও ৮ জন বসু; পরে বামন ইত্যাদি। ইন্দ্র এঁকে সমুদ্র লব্ধ কুণ্ডল দান করেন। পারিজাতের জন্য ইন্দ্র ও কৃষ্ণের বিবাদ ইনি মিটিয়ে দেন। এঁর বোন দিতি।

অসুরদের শক্তি বাড়ছে দেখে নিজের ছেলেদের ডেকে অসুরদের ধ্বংশ করতে বলেন। যুদ্ধে যাবার আগে ছেলেদের জন্য রান্না করলে বুধ এসে খেতে চান। কিন্তু নিজের ছেলেরা আগে খেয়ে নিক এই চেষ্টায় বুধকে একটু অপেক্ষা করতে বলেন। বুধ এতে রেগে গিয়ে অভিশাপ দেন যে বিবস্বান অণ্ড হিসাবে তাঁর গর্ভে আসবেন এবং গর্ভ ধারণ করে অদিতি ভীষণ যন্ত্রণা পাবেন। দ্রঃ দিতি, মরুৎগণ। ষষ্ঠ মন্বন্তরে এই আদিত্যেরা তুষিত নামে পরিচিত।

অদৃশ্যন্তী—শক্তির স্ত্রী; পরাশরের মা।

অদৃষ্টবাদ—পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সব কাজ করা হয়েছে তার ফল ভোগ করা রূপ মতবাদ/দর্শন। ক্রমিক জন্ম অনুসারে এই ফল ভোগ করতে হবে। যেটুকু ফল ভোগ হয়ে যায় সেটুকুর হিসাব মিটে যায়। অর্থাৎ বর্তমান জন্মে যা ভোগ করা হচ্ছে সেটি পূর্ব-

অদ্র—সূর্যবংশে এক রাজা।

অদ্রি—(১) সোমরস নিষ্কাশনার্থ পাথর। (২) যুবনাশ্বের পিতা।

অদ্রিকা—অপ্সরা একজন। ব্রহ্মশাপে যমুনাতে মাছ হয়ে বাস করত। দ্রঃ উপরিচর বসু।

অধঃশিরস—(১) হস্তিনাপুরে যাবার পথে এঁর সঙ্গে কৃষ্ণের দেখা হয়। (২) নরক বিশেষ।

অধরচাঁদ—যে চাঁদ সহজে ধরা যায় না। বাউলদের মতে আত্মারূপী আল্লাহ; অন্য নাম সহজ মানুষ; মনের মানুষ, অটল মানুষ, আলেক মানুষ, ভাবের মানুষ ইত্যাদি। এই মানুষ ব্যক্তির অন্তর-তম সত্তা। বাউলরা এঁকে ঈশ্বর ও মনে করেন। এই অধরাকে ধরাই বাউলদের কাম্য।

অধর্ম—অগ্নিপুরাণে অধর্মের স্ত্রী হিংসা, সন্তান অনৃত ও নিকৃতি। এদের সন্তান ভয়, নরক, মায়া, ও বেদনা ইত্যাদি। মায়ার সন্তান মৃত্যু। বেদনা ও রৌরবের সন্তান দুঃখ ও শোক। মৃত্যুর সন্তান ব্যাধি, জরা, দুঃখ, তৃষ্ণা ও ক্রোধ। মহাভারতে অধর্মের স্ত্রী নিঋতি; তিনটি ছেলে:-ভয়, মহাভয়, ও মৃত্যু। অধর্মের স্ত্রী সম্পদের সন্তান দর্প।

অধিদেব—অন্তর্যামী দেবতা। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সূর্যমণ্ডলবর্তী দেবতাদের অধিপতি।

অধিপতি—সমুদ্র/জলের অধিপতি বরুণ; আদিত্যদের বিষ্ণু; বসুদের পাবক; মরুৎদের/দেবতাদের ইন্দ্র/বাসব; ঋষিদের বশিষ্ঠ; মানুষদের মনু; দৈত্যদের প্রহ্লাদ; পিতৃগণের যম; ভূত, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষদের শিব; নদীদের সাগর; পাহাড়দের হিমালয়; গন্ধর্বদের চিত্ররথ; নাগদের বাসুকি; সাপদের তক্ষক; পাখীদের গরুড়; অর্থের কুবের, মৃগদের শার্দুল; ওষধি ও নক্ষত্রদের চন্দ্র: গ্রহদের সূর্য; রাজাদের বৈশ্রবণ; হাতীদের ঐরাবত; ঘোড়াদের উচ্চৈঃশ্রবা, গবাদি পশুর বৃষভ; এবং গাছেদের অধিপতি পিপ্পল। দ্রঃ রাজা।

অধিবাস—চন্দন, তেল, হলুদ ইত্যাদি যোগে অঙ্গ সংস্কার। বিবাহ ইত্যাদি সংস্কার কাজে ও দুর্গাপূজা ইত্যাদি দেবপূজায় করণীয়। দেবপূজায় আগের দিন সন্ধ্যায় এবং বিবাহ ইত্যাদিতে ঐ দিন সকালে অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহ ইত্যাদিতে মন্ত্রপূত চন্দন ইত্যাদি প্রথমে শালগ্রাম ও ভূমি স্পর্শ করিয়ে তারপর যার অধিবাস তার কপালে ও বিভিন্ন অঙ্গে মার্জনা (বাস্তবে স্পর্শ) করা হয়। বুক, মাথা, শিখা, দু চোখ, দুই কবচ, নাভি, হাতের ও পায়ের আঙুল ক্রমান্বয়ে স্পর্শ করা হয়। অধিবাসের জিনিস:- চন্দন, তেল, হলুদ, মাটি, পাথর, ধান, দূর্বা, ফুল, ফল, দই, ঘি, আতপচাল, সিঁদুর, কাজল, গোরচনা (অভাবে হলুদ) সাদা সর্ষে, সোনা, রূপা, তামা, চাদর, দর্পণ, দীপ, গন্ধ, ক্ষেম, স্বস্তিক, শাঁখ, পূর্ণপাত্র, বরণডালা। বিয়েতে ছেলের অধিবাসের অবশিষ্ট চন্দন, তেল, হলুদ, কাজল, সিঁদুর মেয়ের অধিবাসের জন্য ব্যবহার হয়।

অধিভূত—পঞ্চভূতের ওপর যিনি। পরম পুরুষ।

অধিমাস—মলমাস।

অধিযজ্ঞ—যজ্ঞকে অধিকার করে যিনি স্থিত কৃষ্ণ।
অধিরথ—কর্ণের পালক পিতা। বংশ ঃ-নহুষ-যযাতি-অনুদ্রুহ্য-সদানর-কালনর-সৃঞ্জয়-তিতিক্ষা- রুশৎরথ- হোম- সুতপস্- বলি-অঙ্গ-দধিবাহন-দ্রবিরথ-ধর্মরথ-চিত্ররথ- সত্যরথ-রোমপাদ-চতুরঙ্গ-পৃথু-চম্প-হর্যঙ্গ-ভদ্ররথ-বৃহদ্রথ-বৃহন্মনস্-জয়দ্রথ-ধৃতব্রত-সত্যকর্মা- অধিরথ -কর্ণ। এঁরা ক্ষত্রিয়। অধিরথ সারথির কাজ করতেন। অন্য নাম সূত। স্ত্রী রাধা।
অধিরাজ্য—প্রাচীন ভারতে একটি রাজ্য। বর্তমানে রেওয়া।
অধোক্ষজ—অধঃ (স্থিত) অক্ষ (ইন্দ্রিয়-পা) জ ; এক কল্পে বিষ্ণু মহাদেবের পা থেকে জন্মান। বিষ্ণু।
অধোবায়ু—অপান বায়ু।
অধ্ব—বেদের শাখা বিশেষ।
অধ্বর—(১) যজ্ঞ। (২) অষ্ট বসুর দ্বিতীয় বসু।
অধ্বর্যু—যিনি অধ্বরের নেতা ; অর্থাৎ যজ্ঞ শেষ করেন (নিরুক্ত) ; ঋত্বিক বিশেষ। যজুর্বেদ-বিৎ ; যজুর্বেদ বিধানে যজ্ঞ করতে সমর্থ। নারায়ণের মুখ থেকে এঁর উৎপত্তি। যজ্ঞ ভূমির পরিমাণ, বেদি নির্মাণ, যজ্ঞপাত্র নির্মাণ, জলকাষ্ঠ আনয়ন, অগ্নি প্রজ্বালন, পশু আনয়ন, ও বলিদান এঁদের কাজ। ঋত্বিক চারজনের মধ্যে যজমান যাঁকে আগে বরণ করেন এবং আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত যিনি কাজ করেন।
অধ্যবহার—জাতকে বর্ণিত আনন্দ, তিমিন্দ্র ও অধ্যবহার তিনটি মাছ। প্রত্যেকের দেহ পঞ্চ-শত যোজন প্রমাণ।
অধ্যাত্ম—আত্মাকে অধিকার করে যে অবস্থিত। আত্মা/পরমাত্মা/চিত্ত বিষয়ক। পর ব্রহ্ম।
অধ্যাত্ম তত্ত্ব—ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জিজ্ঞাসা।
অধ্যাত্ম রামায়ণ—রাম চরিত্রের আধ্যাত্মিক বর্ণনা। ব্যাস রচিত মহাকাব্য ' ১৪-১৫ শতাব্দীর রচনা মনে হয়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত বলা হয়। হরপার্বতীর কথোপ-কথন আকারে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। রামের কাহিনী প্রসঙ্গে রামভক্তির মাহাত্ম্য। কর্মকাণ্ড, ভক্তিযোগ, ধর্ম ও রাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে। পরমাত্মা ও রামের একাত্মতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। রামহৃদয় ও ও রামগীতা অংশ দুটি রামভক্তদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
অধ্যাস—সর্পতে রজ্জু জ্ঞান রূপ ভ্রান্তি।
অনংশা—নন্দ ও যশোদার মেয়ে। কৃষ্ণ এঁকে শ্রদ্ধা করতেন ও প্রয়োজন মত এঁর পরামর্শ নিতেন।
অনগ্নি—পিতৃগণ (দ্রঃ)।
অনঘ—অলঘু। বশিষ্ঠের ছেলে ; উর্জার গর্ভে জন্ম।
অনঙ্গ—(১) মদন। (২) কর্দম প্রজাপতির ছেলে ; একজন প্রজা বৎসল রাজা। (৩) একটি নদী।

অনঙ্গবজ্র—সিদ্ধাচার্য (দ্রঃ)।

অনধ্যায়—আনুষ্ঠানিক ভাবে অধ্যয়ন না করা বা ছুটি। নানা কারণে শাস্ত্রে এই বিরতির নির্দেশ ছিল। টোলে এখনও অনেকগুলি অনধ্যায় মানা হয়। অনধ্যায় অর্থে বেদপাঠ না করা কিন্তু শাস্ত্রপাঠ ও বন্ধ রাখা হয়। সাধারণত প্রদিপদ, অষ্টমী চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। ত্রয়োদশী রাত্রিতেও ব্যাকরণ পাঠ নিষিদ্ধ। কোন কারণে মন চঞ্চল থাকলে বা ঝড়, বৃষ্টি, মেঘ ডাকা, বজ্রপাত, উল্কাপাত ভূমিকম্প, গ্রহণ, ধূলিবর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড, আশেপাশে যুদ্ধাস্ত্রের শব্দ হলেও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ছিল। কান্না, গানবাজনা, শিয়াল কুকুর উট গাধা ইত্যাদির বিকট ডাক কাণে এলে অনধ্যায় ব্যবস্থা ছিল। বহু লোক একত্র জমা হলে বা গুরুগৃহে বিশিষ্ট ব্যক্তি এলে, রাজার ছেলে হলে বা গ্রামে কেউ মারা গেলে মৃতের সৎকার না হওয়া পর্যন্ত বা পাঠক অশুচি থাকলে কি কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে ও শ্মশান সমীপে অনধ্যায়ের নির্দেশ ছিল। পাঠের সময় গুরু ও শিষ্যের মাঝখান দিয়ে কোন জন্তু চলে গেলে ও অধ্যয়ন বন্ধ রাখা হত।

অনন্ত—শেষ নাগ, বাসুকি (দ্রঃ), গোনস। একজন প্রজাপতি। নাগেদের মধ্যে প্রধান। বিষ্ণুর তামসিক রূপ। কদ্রুকশ্যপ সন্তান। স্ত্রী তুষ্টি। ভাইদের অসৎ ব্যবহারে তাদের ত্যাগ করে অন্যমতে জন্মেঞ্জয়ের সর্প যজ্ঞে মৃত্যু হবে কদ্রু (দ্রঃ) শাপ দিলে অনন্ত ইত্যাদি কিছু সাপ গন্ধমাদন, বদরিকাশ্রম ইত্যাদি স্থানে এসে তপস্যা করতে থাকেন। সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা বর দেন এবং পাতালে/রসাতলে গিয়ে পৃথিবীকে মাথায় ধারণ করে রাখতে বলেন ; যাতে পৃথিবী বিচলিত না হয়। এই কাজে গরুড় অনন্তকে সাহায্য করবেন এবং গরুড় এঁর সখা। পশ্চিমে বরুণালয়েও অনন্তের একটি আবাস রয়েছে। এঁর সহস্র ফণা ; ফণাতে সহস্র মণি জ্বলছে। অসুরদের শক্তিহীন করে রেখেছেন। প্রলয়ের সময় এঁর মুখ থেকে রুদ্র বার হয়ে ত্রিভুবন ধ্বংস করেন। অনন্ত হাই তুললে পৃথিবী কেঁপে ওঠে, ভূমিকম্প হয়। অনন্তের কৃপায় গর্গ জ্যোতি-র্বিদ্যা, নিমিত্ত-বিদ্যা ইত্যাদি লাভ করে ছিলেন। দেবতারাও এঁকে পূজা করেন। কালিকা পুরাণ মতে প্রলয় শেষে নারায়ণ অনন্তের মধ্যম ফণাতে শয়ন করেন। সঙ্গে লক্ষ্মী থাকেন। ছয়টি ফণা বিষ্ণুকে ছাতার মত আচ্ছাদন করে রাখে। দক্ষিণ ফণা বিষ্ণুর উপাধান, উত্তর পাদপীঠ। বিষ্ণু পুরাণে বলরাম (দ্রঃ) এঁর অবতার।

অনন্তজিৎ—১৪-শ জৈন মুনি।

অনন্ত নাথ ১৪-শ জৈন তীর্থঙ্কর। পিতা সিংহসেন, মা সুযশ। কোশলের রাজা। গর্ভকালে সুযশ স্বপ্নে একটি অনন্ত মুক্তার মালা দেখেছিলেন ফলে এই নাম। অনন্তনাথ অশ্বত্থ গাছের নীচে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এঁর চিহ্ন সজারু ; নির্বাণ সুমেরু শিখরে।

অনন্ত বিজয়—যুধিষ্ঠিরের শঙ্খ।

অনন্তবীর্য—ভাবী কল্পে ২৩-শ জৈনাচার্য।

অনন্ত শীর্ষা—বাসুকি পত্নী।

অনন্তা—পুরুর ছেলে জন্মেঞ্জয়ের স্ত্রী।

অনবদ্যা—কশ্যপের স্ত্রী। অপ্সরা।

অনরণ্য—অনারণ্য। সূর্যবংশে সম্ভূতের/ত্রসদস্যুর ছেলে, অযোধ্যার রাজা। নিরামিষাশী। রাবণের দিগ্বিজয় কালে বাধা দিলে যুদ্ধ হয়। আহত ও রথভ্রষ্ট হয়ে মারা যান; ভবিষ্যৎ বাণী করে যান ইক্ষ্বাকু বংশে দশরথ ও রাম জন্মাবেন এবং রাবণ ধ্বংস হবেন।

অনল—ষষ্ঠ বসু (দ্রঃ)।

অনলা—(১) দক্ষের একটি মেয়ে; এঁর সন্তান গাছ লতাপাতা ইত্যাদি। অপর নাম বীরুধা; এই জন্য বীরুৎ অর্থে গাছ। অনলা করঞ্জ গাছে বাস করেন। অনলার আশীর্বাদ পেতে হলে করঞ্জ গাছকে পূজা করতে হয়। (২) অন্য মতে দক্ষের মেয়ে ক্রোধবশা; ক্রোধবশার বংশ :—ক্রোধবশা—শ্বেতা—সুরভি—রেহিণী—অনলা। (৩) মাল্যবানের ঔরসে সুন্দরীর মেয়ে; বিশ্বাবসুর স্ত্রী, মেয়ে হয় কুম্ভীনসী।

অনশন ব্রত—উপবাস রূপ ব্রত। অনশন তিন রকম :—স্বল্প, অর্ধ ও পূর্ণ অনশন। পূর্ণ অনশনে নিরম্বু উপবাস। অতি প্রাচীন ধর্মীয় ব্যবস্থা। সামাজিক-সংস্কার ও স্বাস্থ্যের জন্যও অনুমোদিত। প্রায়শ্চিত্ত ও কামনা পূরণের জন্য অনশন করে হত্যা দেওয়াও সুপ্রাচীন। শুদ্ধি করণ, শোকানুষ্ঠান. সমবেদনা জ্ঞাপন, দীক্ষা, যাদু মন্ত্র ও বিশেষ শক্তি লাভের জন্য এবং সন্ন্যাসী জীবনে অনশন ব্যবস্থা আছে। অর্থ আদায়ের জন্যও অধমর্ণের বাড়িতে গিয়ে অনশন করতে রয়েছে। জৈনদের প্রায় প্রতি ধর্মকার্যের অঙ্গ। বৌদ্ধদের মধ্যেও অনশন স্বীকৃত।

অনশনে মৃত্যু বরণ ভারতীয় ধর্ম বিধানে রয়েছে। জৈনদের আমৃত্যু অনশন তিন রকম :—ভক্তপ্রত্যাখান, ইঙ্গিনী ও পাদোপগমন। ভক্তপ্রত্যাখানে জলপান ও চলাফেরা নিষিদ্ধ নয়। ইঙ্গিনীতে নিরম্বু উপবাস তবে নির্দিষ্টস্থানে চলা ফেরা অনুমোদিত। পাদোপগমনে নিশ্চল নিরম্বু উপবাস। মৃত্যু সঙ্কল্প করে ১, ২, ৩, ৭, ৯ দিন বা একমাস অনশনের বিধান আছে। গরুড় পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে বলেছেন অনশনে মারা গেলে বিষ্ণু তুল্য হয় এবং যতদিন অনশন করে জীবিত থাকে প্রতি দিনের জন্য স-দক্ষিণ যজ্ঞের ফল সঞ্চয় হয়। অগ্নি, মৎস্য পুরাণে, আপস্তম্ব, শ্রৌতসূত্র, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু সংহিতা ইত্যাদিতে অনশন ব্রতের বিধান আছে।

অনস্—অসঙ্গ। অক্রূরের ভাই।

অনসূয়া—মহর্ষি অত্রির (দ্রঃ) স্ত্রী। দক্ষ ও প্রসূতির মেয়ে। অন্য মতে কর্দম দেবহূতির দুই মেয়ে কলা ও অনুসূয়া। সম্পূর্ণ অসূয়াহীন। একদিন এঁর সতীত্ব পরীক্ষা করার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর ব্রাহ্মণবেশে অতিথি হয়ে এসে দাবি করেন ছেলের মত তাঁদের যত্ন করতে হবে; নইলে তাঁরা চলে যাবেন। ইনি তখন এঁদের গায়ে স্বামীর পাদোদক ছিটিয়ে দিয়ে তাঁদের শিশুতে পরিণত করে স্তন পান করতে দেন। অনুসূয়ার এই অপূর্ব মহিমায় এঁরা মুগ্ধ হয়ে বর দিতে চান এবং ইনি এই তিনজনকেই পুত্ররূপে বর চান। ফলে ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর

অংশে দত্তাত্রেয় ও মহেশ্বরের অংশে দুর্বাসা জন্মান। একবার উগ্রশ্রবার (দ্রঃ) কারণে সূর্য না ওঠাতে দেবতারা অনসূয়ার কাছে প্রতিকারের জন্য আসেন। সূর্যের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার জন্য উগ্রশ্রবার স্ত্রীকে অনসূয়া অনুরোধ করেন। ফলে সূর্য উঠলে উগ্রশ্রবা মারা যান কিন্তু অনসূয়া আবার বাঁচিয়ে দেন। দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে একটি মতে অনসূয়া এই সময়ে ত্রিমূর্তিকে পুত্ররূপে বর চেয়েছিলেন। দ্রঃ দত্তাত্রেয়। বনবাসকালে অত্রিমুনির আশ্রমে রামচন্দ্রেরা অতিথি হয়েছিলেন। অনসূয়া তখন অতিবৃদ্ধা এবং কঠোর তপস্যা ও পরহিত ব্রতে রতা। সীতাকে দিব্য মাল্য, রত্নাভরণ, অঙ্গরাগ, গন্ধানুলেপন দান করেন; এগুলি কোন দিন অম্লান হত না এবং বহু উপদেশ দেন। (দ্রঃ) অত্রি। (২) কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলার প্রধান সখী।

অনাত্মবাদ—নৈরাত্মবাদ। একটি মতবাদ। আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা। সাধারণ অর্থে ও ভারতীয় ন্যায় শাস্ত্রে আত্মা ও দেহ দুটি বিভিন্ন জিনিস মিলে জীব। বর্তমানে শরীর বিজ্ঞানে আত্মার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অহং, জ্ঞান, বিবেক ইত্যাদির বিজ্ঞান ভিত্তিক যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাতেও আত্মার কল্পনা উৎসাদিত হয়েছে। চার্বাক মতে দেহই বা দেহের গুণ; অতিরিক্ত কিছু নয় এবং আত্মার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। বৌদ্ধরা আত্মা বলে কোন দ্রব্য মানেন না; দ্রব্য বলে কোন জিনিসই বৌদ্ধ দর্শনে নাই। নৈয়ায়িকরা আত্মাকে স্থায়ী ও অবিনশ্বর ইত্যাদি যে সব গুণ দিয়েছেন বৌদ্ধরা এ সব স্বীকার করেন না। বৌদ্ধমতে রূপ (দেহের মৌলিক উপাদান), বিজ্ঞান (অহং বোধ), বেদনা (সুখদুঃখ অনুভূতি), সংজ্ঞা (প্রত্যক্ষ) এবং সংস্কার (প্রবণতা) এই পাঁচটি স্কন্ধের (জিনিসের) সংঘাত (সমষ্টি) হচ্ছে একটি জীবের একটি বিশেষ ক্ষণের সত্তা। এই সত্তাকে আত্মা বলা যেতে পারে না। কারণ মিলিত সত্তা প্রতিমুহূর্তে বদলাচ্ছে এবং একদিন এই সত্তা শেষ হয়ে যায়। বৌদ্ধদের এই মত ক্ষণিকবাদ।

অবশ্য বৌদ্ধমতের মধ্যে কিছুটা অসামঞ্জস্য আছে। বৌদ্ধরা জন্মান্তর, কর্মফল ইত্যাদি মানেন অথচ আত্মা না থাকলে কার জন্মান্তর হয়! আত্মা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব নীরব ছিলেন।

অনাথপিণ্ডদ—নাম সুদত্ত। বাসস্থান শ্রাবস্তী। শ্রাবস্তীর জেতবন এঁর অর্থে নির্মিত। দানশীলতার জন্য নাম অনাথপিণ্ডদ, অনাথপিণ্ড বা অনাথপিণ্ডিক। এঁর তর্ক করার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। বুদ্ধত্ব লাভের প্রথম বছরেই রাজগৃহে বুদ্ধের সঙ্গে দেখা হয় এবং তার বাণী শুনে শ্রোতাপন্ন হন। কোশল রাজকুমারের উদ্যানভূমি আঠার কোটি মুদ্রায় কিনে নিয়ে সমান অর্থে এখানে একটি বিহার তৈরি করে দিয়ে আর একদফা আঠার কোটি মুদ্রা সমেত বিহারটি বুদ্ধ ও সংঘকে দান করেন। সব সমেত ১৮ × ৩ কোটি মুদ্রা খরচ হয়। বুদ্ধ ও সংঘের জন্য সব সময় অকুণ্ঠিত দান করতেন। দিনে দুবার তথাগতকে দেখতে যেতেন কিন্তু তথাগতকে পরিশ্রান্ত করে তোলার ভয়ে কোন প্রশ্ন করতেন না। পাঁচশ অতিথি ও একশত ভিক্ষুককে

তিনি রোজ খেতে দিতেন। এই অপরিমিত দানের জন্য শেষ বয়সে দরিদ্র হয়ে পড়েছিলেন। এঁর পুত্রবধূ সুজাতা ছিলেন শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের মেয়ে ও বিশাখার ছোটবোন।

অনাধৃষ্টি—রুদ্রাশ্বের ঔরসে অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে জন্ম। অপর নাম ঋচেযু/অম্বগভানু। আরো কয়েক জন অনাধৃষ্টি রয়েছে।

অনার্য—ভারতে যাঁরা বেদ রচনা করেছিলেন অর্থাৎ বর্তমানের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা নিজেদের আর্য বলে দাবি করেন বাকি সকলকে অনার্য বলা হয়। এই অনার্যরা ভারতের নিজস্ব লোক; আদিবাসী। অনেকের মতে আর্যরা ভারতে এসে এঁদের দমন করে নিজেদের উপনিবেশ গড়েছিলেন।

সিন্ধু নদের উপত্যকায় এক বা একাধিক অনার্য জাতির বাস ছিল। এঁরা লোহা ছাড়া অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার জানতেন এবং উচ্চতর সভ্যতার অধিকারী ছিলেন। দ্রাবিড় জাতির পূর্বপুরুষরাও অনার্য নামে অভিহিত; এঁদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি খুব উন্নত ছিল। আর্যরা এঁদের সকলকে পরাজিত করেন। অনেকে দাস রূপে আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শূদ্র নামে পরিচিত হন এবং বহু অনার্য জাতি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বনে পাহাড়ে আত্মগোপন করেন। এঁদের বংশধররা আজ বনে বাস করছেন। বৈদিক সাহিত্যে এঁদের অনার্য, নিষাদ, দস্যু ইত্যাদি বলা হয়েছে। অনার্যদের কালো কুৎসিত চেহারা, অবোধ্য ভাষা ও ধর্মহীনতার বহু উল্লেখ এবং এদের অমিত সাহস ও শক্তিমত্তার কথাও বেদ ইত্যাদিতে আছে।

বর্তমানের কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর, পুলিন্দ, কিরাত, খাসিয়া, ভুটিয়া, নাগা ইত্যাদি বহু জাতি ভারতের সেই আদিবাসী প্রকৃত ভারতীয় বা অনার্য। এদের ভাষা ভারতীয় ভাষা থেকে ভিন্ন; ইন্দো-ইউরোপীয়ান গোষ্ঠীর ভাষাও নয়। নৃতত্ত্ব অনুসারেও এঁরা আলাদা প্রকৃতি। তামিল, তেলেগু, কানাড়ি, মালয়ালম ইত্যাদি ভাষাও ইন্দো-ইউরোপীযান গোষ্ঠীর ভাষা নয়। বর্তমানে এই অনার্যদের জীবনযাত্রায় ও ভাষায় আর্যদের সঙ্গে বহু আদান প্রদান ঘটেছে। অনার্য ভাষা অর্থে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতীয় দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা, উত্তর ও মধ্যভারতীয় অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা এবং হিমালয়ের পাদদেশে ভোটচীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা। ভাষা বিজ্ঞানের আর একটি মতে একমাত্র অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা অনার্য ভাষা; এবং এই গোষ্ঠীতেই সাঁওতাল, মুণ্ডারি, খাসি ইত্যাদি ভাষা পড়ে।

অনাহত—ষটচক্রের একটি। হৃদয়স্থ আদিত্য সন্নিভ ১২-টি দল পদ্ম। এই পদ্মে অযুতসূর্য সমপ্রভ শুদ্ধব্রহ্ম অবস্থিত।

অনিকেত—কুবের অনুচর একজন যক্ষ। অঙ্গবংশে জন্ম।

অনিমিশ—গরুড়ের এক ছেলে।

অনিরুদ্ধ—শিনি-ভোজ -হৃদিক -শূরসেন -বাসুদেব- কৃষ্ণ - প্রদ্যুম্ন- অনিরুদ্ধ। অর্থাৎ কৃষ্ণের পৌত্র। মা রুক্মবতী; অত্যন্ত সুন্দর দেখতে এই অনিরুদ্ধ। অর্জুনের কাছে ধনুর্বেদ শিক্ষা। বলির একশ ছেলের মধ্যে প্রধান বাণ, এই বাণের মেয়ে উষা (দ্রঃ)

স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে দেখে পতিত্বে বরণ করেন। দ্বারকা থেকে এঁকে আনবার জন্য সখী চিত্রলেখাকে পাঠান। নারদের পরামর্শ মত দ্বারকায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করে নারদ প্রদত্ত তামসী বিদ্যায় সকলকে মোহাচ্ছন্ন করে অনিরুদ্ধকে নিয়ে চলে আসেন। বাণের রাজধানী শোণিতপুরে গোপনে গন্ধর্ব মতে বিয়ে হয়। ঘটনা জানতে পেরে বাণ সসৈন্যে ঊষার অন্তঃপুরে গিয়ে অনিরুদ্ধকে পরাজিত করে বন্দী করেন।

অনিরুদ্ধের অন্তর্ধানে দ্বারকাতে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়ল; এমন সময় নারদ এই খবর কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন ও বলরামকে জানালে এঁরা বাণকে পরাজিত করেন। বাণ তখন এই বিয়ে স্বীকার করে নেন। ঊষা অনিরুদ্ধ এর পর দ্বারকায় ফিরে আসেন। অনিরুদ্ধের দ্বিতীয় স্ত্রী রোচনা; মহাবীর বজ্রের জননী। বৃষ্ণি বংশে আর একজন অনিরুদ্ধ ছিলেন; দুই অনিরুদ্ধই দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে যোগ দান করেছিলেন। যদু বংশ ধ্বংসের সময় প্রথম অনিরুদ্ধ মারা যান। ইনি বাসুদেবের চতুর্ব্যূহের একজন। অনিরুদ্ধকে বিষ্ণু ও ব্রহ্মা রূপেও কল্পনা করা হয়। অনিরুদ্ধ যখন বিষ্ণুমূর্তি ধারণ করেছিলেন তখন নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মা জন্মান। দ্রঃ ঊষা।

অনিল—(১) অষ্ট বসুর একজন; পিতা ধর্ম, মাতা শ্বসা। অনিলের স্ত্রী শিবা; দুই ছেলে মনোজব ও অবিজ্ঞাত গতি। (২) গরুড়ের ছেলে। ( ) ঊনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে শেষ বায়ু। (৪) স্বাতি নক্ষত্র। (৫) তন্ত্রে বায়ু বীজ 'য'। (৬) বৃষাদর্ভি তাঁর ছেলে অনিলকে দক্ষিণা হিসাবে সপ্তর্ষিদের (দ্রঃ) দান করেছিলেন।

অনীকবিদারণ—জয়দ্রথের ভাই। সিন্ধু রাজ্যের রাজা। অর্জুনের হাতে মারা যান।

অনীকিনী—চতুরঙ্গ সেনার পরিমাণ। অক্ষৌহিণীর দশম ভাগ। ২১৮৭ হাতী, ২১৮৭ রথ, ২১৮৭ × ৩ অশ্ব, ২১৮৭ × ৫ পদাতি, মোট ২১৮৭০টি।

অনীচদর্শী—জনৈক বুদ্ধ।

অনু—অনুদ্রুহ্য। শর্মিষ্ঠার গর্ভে যযাতির ছেলে। যযাতির জরা নিতে রাজি না হবার জন্য অনু শাপান্বিত হন ও তাঁর সন্তান যৌবন লাভেই মারা যায়। অনু অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াহীন হন।

অনুদাত্ত—বেদগানে নীচু সুর।

অনুপমা—কুমুদ নামে দিক হস্তীর স্ত্রী (অমর)। সুপ্রতীক দিক হস্তীর স্ত্রী (মেদিনী)। অগ্নি বা নৈঋত কোণের হস্তিনী।

অনুপম্যা—বাণাসুরের স্ত্রী। একবার নারদের সঙ্গে ভীষণ মন দেওয়া নেওয়া ঘটে।

অনুবন্ধ—বেদান্ত দর্শনের মতে শাস্ত্র অধ্যয়ন কার্যে অধিকারী, বিষয় ইত্যাদি চারটি অপরিহার্য গুণ।

অনুবাক—শস্ত্র নামক বেদাংশ। গান শূন্য ঋক্ বিশেষ। বেদের একটি বিভাগ।

অনুবিন্দ—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। পাণ্ডবদের বনবাসের সময় চিত্রসেনের হাতে অন্যান্য কৌরবদের সঙ্গে ইনিও বন্দী হন। কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে নিহত। (২) অবন্তির রাজা। কৃষ্ণের পিসী রাজাধিদেবীর ছেলে অনুবিন্দ, বিন্দ এবং মেয়ে মিত্রবিন্দা (কৃষ্ণের স্ত্রী)। অনুবিন্দ কৌরব পক্ষে ছিলেন।

অনুভব—আট প্রকার :-প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব, ঐতিহ্য। এগুলির মধ্যে ক্রমান্বয়ে চার্বাক একটি, কণাদ ও বৌদ্ধ দুটি, সাংখ্যপাতঞ্জল তিনটি, নৈয়ায়িক চারটি, প্রভাকর পাঁচটি, বেদান্তী মীমাংসক ছয়টি, পৌরাণিকরা আটটি অনুভব স্বীকার করেন।

অনুভাগবত—কল্কিপুরাণ।

অনুমতিকল্প—দ্রঃ দশ বখুনি।

অনুমরণ—স্বামীর মৃত্যুতে মৃতদেহ না পেলে স্বামীর পাদুকাদি নিয়ে চিতায় ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের দেহত্যাগ।

অনুমিতি—অনুমান। ধূম থেকে পর্বত বহ্নিমান এই অনুভব (দ্রঃ)।

অনুযায়ী—অগ্রযায়ী। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে নিহত।

অনুরাধা—১১-শ নক্ষত্র। ডেল্টা স্কোর্পি। অধিদেবতা মিত্র। সর্পাকৃতি ৭-টি তারা (কালি) ; বলিনিভ ৪-টি (দীপিকা টিকা)। বিশাখা নক্ষত্রের অন্তর্গত ১৭-শ তারা। যাত্রা সিদ্ধ হয়।

অনুরাধপুর—সিংহলে ১৫-শত বছরের প্রাচীন রাজধানী। খৃ-পূ ৪-শতকে রাজা পাণ্ডুকাভয় এই নগরী পত্তন করে এখানে রাজধানী নিয়ে আসেন। পর পর কয়েকটি রাজা নগরের নানা উন্নতি করেন। খৃষ্ট জন্মের সমসাময়িক কালে ঐশ্বর্যের চরম শিখরে উঠেছিল। ব্রাহ্মণ, জৈন, আজীবিক ও বিভিন্ন পরিব্রাজক সম্প্রদায়ের জন্য এখানে বাসস্থান, চিকিৎসালয় ও প্রসূতিসদন ছিল। বুদ্ধগয়া থেকে আনীত বোধি-দ্রুমের শাখা রাজা পিয়তিস্স এখানে মহাবিহারে বসিয়েছিলেন এবং সেই গাছ আজও জীবিত আছে বলে কথিত। ২৫০ খৃ-পূর্বে দেবানম্পিয় তিস্স ধাতুগর্ভ স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই স্তূপে তথাগতের চিবুক রয়েছে এবং এই স্তূপের কোণে তথাগতের শৌবন/শ্বদন্ত খৃ ৪-শতকে স্থাপিত হয়। তাম্রমহাবিহার ও মহাবংশে বর্ণিত 'রুবন্-বেলি', এই নগরে অবস্থিত। রাজা দুটঠাগামনী এই স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন। নগরে ইষিভূমাঙ্গন স্থানটি মহীন্দরের চিতাভূমি; এখানে ঘণ্টাকার বিহারে ত্রিপিটকের অট্‌ঠ কথা সিংহলী থেকে পালিতে বুদ্ধঘোষ অনুবাদ করেছিলেন। ১০ শতকে চোলরাজ সিংহল আক্রমণ করেন ; অনুরাধপুর বিধ্বস্ত হয়।

অনুরুদ্ধ—ভগবান বুদ্ধের কাকা অমিতোদনের ছেলে। অনিরুদ্ধের ভাই মহানামের অনুরোধে অনুপিয় আম্রবনে বুদ্ধের সান্নিধ্য লাভ করে প্রব্রজিত হন। অচিরে দিব্য চক্ষুলাভ করেন। অনিরুদ্ধ সঙ্ঘের পরম অনুরাগী ও বুদ্ধের অতিপ্রিয় ছিলেন। অনুরুদ্ধের সঙ্গে আনন্দ, ভগু, কিম্বিল, দেবদত্ত ও উপালি প্রব্রজিত হন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময় অনুরুদ্ধ কুশিনারাতে ছিলেন। অনিরুদ্ধের অপরিমিত স্থৈর্যে ভিক্ষুরা নিরুদ্বিগ্ন থাকেন এবং তাঁরই উপদেশে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা ঠিক করেন। প্রথম ধর্ম সংগীতির সময় অঙ্গুত্তর নিকায়ের রক্ষা ও সংকলনের ভার এঁর ওপর ছিল। বজ্জি দেশে বেলুব গ্রামে ইনি দেহত্যাগ করেন।

অনুলোম—উত্তম পুরুষের ঔরসে অধম স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান।

অনুশল্য—একজন দৈত্য। কৃষ্ণের শত্রু ; কৃষ্ণ এঁকে ভয় করতেন। কৃষ্ণকে মারবার জন্য একবার সসৈন্যে হস্তিনাপুর আক্রমন করেন। ভীম অর্জুন পরাজিত হন। কিন্তু বৃষকেতু একে হারিয়ে বন্দী করে কৃষ্ণের সামনে নিয়ে আসেন। কৃষ্ণের উপদেশে এঁর মত পরিবর্তন হয় ; এবং তপস্যার জন্য বনে চলে যান।

অনুষ্টুপ—সংস্কৃত ছন্দ। ৮-অক্ষরে পদ্য ছন্দ। পঞ্চমং লঘু সর্বত্র, সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ গুরুষষ্ঠন্তু পাদানাম্ শেষেম্বনিয়মো মতঃ। এক বিংশতি স্তোম, অথর্ববেদ-আপ্তোর্যাম-যাগ ও বৈরাজ সামের সঙ্গে ব্রহ্মার উত্তর মুখ থেকে উৎপন্ন। সূর্যের (দ্রঃ) অশ্ব।

অনুহ্লাদ—হিরণ্যকশিপুর (দ্রঃ) তৃতীয় পুত্র।

অনূচান—বেদের যিনি অনুবচন করেছেন। সাঙ্গ বেদ প্রবক্তা।

অনূচানা—একজন অপ্সরা।

অনূদর—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

অনূপ—প্রচীন ভারতে বিখ্যাত একটি দেশ। সম্ভবত নর্মদার কাছে।

অনৃত—অধর্ম ও হিংসার ছেলে।

অনেকান্তবাদ—জৈন দর্শনে একটি মতবাদ। অনেক অন্ত (ধর্ম) যুক্ত বস্তু। বস্তুর বহু অন্ত/ধর্ম আছে এই বাদ। উপনিষদে বস্তুর স্বরূপ নিত্য সত্তা। বৌদ্ধ মতে নিত্যসত্তা বলে কিছু নেই ; সবই ক্ষণিক সত্তা। জৈনগণ সমন্বয় করে বলেছেন বস্তু নিত্য বটে আবার অনিত্যও বটে। নিত্য অংশে বস্তুর নাম দ্রব্য, অনিত্য অংশে নাম পর্যায়। এই দ্রব্য পর্যায় স্বরূপই অনেকান্তবাদের মূল। বস্তুর এই স্বরূপকে বোঝাবার জন্য জৈনেরা সাতটি 'নয়'-এর সৃষ্টি করেছেন। যেমন স্যাৎ অস্তি এব ঘটঃ প্রথম নয় ; ইত্যাদি। স্যাৎ শব্দের দ্বারা প্রতিটি নয় উল্লিখিত হয় বলে অনেকান্ত-বাদের অপর নাম স্যাদ্ বাদ (দ্রঃ)।

অনোমা—গোরক্ষপুরে অউমি নদী। নদীর পূর্বতীরে চন্দোর্লি থেকে গৃহত্যাগী গৌতমের ভৃত্য ছন্দক তাঁর ঘোড়া কণ্টককে কপিলাবস্তুতে ফিরিয়ে নিয়ে যান। অন্য মতে বস্তি জেলার কুদাওয়া নদী এবং তমেশ্বর বা মনেয়া থেকে ৬ কি-মি উত্তর-পূর্বে মহাস্থানডির স্তূপটি ছন্দকের ফিরে যাবার চিহ্নিত স্থান। গোরক্ষপুরে অনোমার পূর্বতীরে শিরসরাও স্তূপটি গৌতমের মস্তক মুণ্ডনের স্থান বলে নির্দিষ্ট করা হয়।

অন্তঃকরণ—বুদ্ধি ও মন নামে দুভাগে বিভক্ত। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা ; মন সংকল্পাত্মিকা বৃত্তি। চিত্ত অহঙ্কার এদের অন্তর্ভুক্ত। চিত্র অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি।

অন্তক—পৃথুরাজার প্রশ্রয়ে দেবতারা পৃথিবীকে ধেনুতে পরিণত করে দোহন করেন। বার জন যমকে পান ; এঁদের মধ্যে একজন অন্তক।

অন্তর্ধামা—মনু বংশে। অংশ-অন্তর্ধামা-হবির্ধামা।

অন্তর্ধাণ—এই অস্ত্র অর্জুন কুবেরকে দিয়েছিলেন

অন্তর্বেদি—প্রয়াগ থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দেশ। অন্য নাম শশস্থলী। ব্রহ্মাবর্ত দেশ।

অন্তরচক্র—তন্ত্রে মূলাধারাদি ষট্চক্র।
অন্তরাত্মা—জীবাত্মা; অন্তরস্থ-আত্মা। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অন্তরাত্মা (শ্বেতাশ্ব)।
অন্তরীক্ষ—(১) ভুবর্লোক। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যগত স্থান। বা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যগত। অপ্সরা, গন্ধর্ব যক্ষদের বাসস্থান। স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে যযাতি এখানে ছিলেন। (২) কেতুমাল বর্ষ (৩) পারস্য, আপোগস্থান ইত্যাদি যবন দেশ। (৪) বৈবস্বত মন্বন্তরে যাঁরা বেদ বিভাগ করেন তাঁদের নাম ব্যাস (দ্রঃ)। সব সমেত আটাশ জন ব্যাসের মধ্যে ইনি ১৩-শ ব্যাস। (৫) মুরাসুরের ছেলে। (৬) অগ্নীধ্র ও পূর্বচিত্তির ছেলে নাভি। নাভি (দ্রঃ) ও মেরুদেবীর ১০০ ছেলে ; এদের মধ্যে একজন অন্তরীক্ষ।
অন্তিয়োক—সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে আছে তিনি যবন রাজ অন্তিয়োক ও অন্য চারজন যবন রাজার রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। এসিয়ার পশ্চিম অংশে সিরিয়ার রাজা এই অন্তিয়োক বা দ্বিতীয় অন্তিয়োক ; খৃ-পূ ২৬১-২৪৬।
অন্ত্য—বৈশেষিক পরিভাষা। পরমাণুগত বিশেষ পদার্থ। ঘট ও পট বিভিন্ন কিন্তু এই প্রভেদ আকৃতিগত। কল্পনার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হয় যে পরমাণুই চরম-ব্যাবর্তক। অর্থাৎ পরমাণু-নিষ্ঠ প্রভেদবিশেষ পদার্থই এদের প্রভেদের মূল কারণ। পরমাণু গত এই বিশেষ পদার্থ ই-অন্ত্য।
অন্ত্যজ—রজক, চর্মকার, নট, বরুড় কৈবর্ত, মেদ, ভিল্ল এই সাত জাতি (অত্রি)। বর্দ্ধকী, নাপিত ইত্যাদি ১৭-জাতি (ব্যাস)। শূদ্রের ঔরসে উচ্চবর্ণের স্ত্রীর গর্ভজাত প্রাতিলোমজ সন্তান।
অন্ত্যাবসায়ী—(১) চণ্ডাল (নিষাদ)। (২) শ্বপচ (ব্যাধ)-চণ্ডাল। (৩) ক্ষত্তা (ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যার গর্ভে শূদ্রের সন্তান)। (৪) সূত (ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয় সন্তান)। (৫) বৈদেহক (বৈশ্যার গর্ভে শূদ্র সন্তান)। (৬) মাগধ (ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বৈশ্য সন্তান)। (৭) অয়োগব (বৈশ্যার গর্ভে শূদ্রের সন্তান)। এই সাত জাতি।
অন্ত্যেষ্টি—মৃতদেহের যথা নিয়মে সৎকার না হলে বা সৎকার সম্বন্ধে নির্ভর যোগ্য সংবাদ না পেলে বা বার বছর নিরুদ্দেশ থাকলে কুশপুত্তলিকা বা পর্ণনর দাহের বিধান আছে। শরপত্র বা পলাশ পত্র মেষলোম সুতা দিয়ে গেঁথে মানুষের আকৃতি করতে হয় ; নারকেল ফল দিয়ে মাথা এবং যবের পিটুলি ঐ পুতুলের গায়ে লেপেয় দিয়ে যথা নিয়মে দাহ করতে হয়। সাধু সন্ন্যাসী বা দু'বছরের কম বয়স শিশুর শব মাটিতে সমাধি দেওয়া হয়। সর্পাঘাতে মৃত দেহকে জলে ভাসিয়ে দেওয়ার বিধান রয়েছে। দ্রঃ অগ্নিপূজা।
অন্ধ—(১) কশ্যপ কদ্রুর সন্তান। (১) চেহারা জন্তু মত। তপস্যায় বরপায় সব কিছু ধ্বংস করতে পারবে। সৃষ্টি রক্ষার জন্য ব্রহ্মা একে অন্ধ করে দেন ; তবু এ ধ্বংস করতে থাকে ; ব্যাধ বলাকের হাতে নিহত হয়। (২) ধৌম্যের শিষ্য উপমন্যু ; গাছের পাতা খেয়ে অন্ধ হয়ে যান।
অন্ধক—(১) কশ্যপ ও দিতির ছেলে একজন দৈত্য। দিতির সমস্ত ছেলে দেবতাদের হাতে মারা গেলে কশ্যপের কাছে দেবতাদের অবধ্য এক সন্তান দিতি চেয়েছিলেন।

কশ্যপ সম্মত হয়ে দিতিকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁর আঙুল থেকে অন্ধকের জন্ম। এর হাজার হাত, ও দুহাজার চোখ ছিল। অন্ধ ছিল না; কিন্তু অহঙ্কারে অন্ধ বলে এই নাম। এর অত্যাচারে ত্রিলোকের সমস্ত প্রাণী অস্থির হয়ে পড়লে দেবতারা নারদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। নারদ মন্দার-পারিজাত পুষ্পের মালা পরে অন্ধকের বাড়িতে দেখা করতে আসেন। ফুল দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে ফুলের জন্য অন্ধক মন্দার পাহাড়ে যান। এখানে উমা ও মহাদেব বিহার করছিলেন; ক্রুদ্ধ হয়ে শূলের আঘাতে মহাদেব অন্ধককে নিহত করেন।

অন্ধক—শিবের ছেলে। শিব তপস্যা করছিলেন এমন সময় পার্বতী খেলার ছলে শিবের চোখ টিপে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। এবং এই অন্ধকারই অন্ধক রাক্ষসে রূপ নেয়। সন্তানের জন্য তপস্যারত হিরণ্যাক্ষকে মহাদেব এই ছেলেটি দিয়ে দেন এবং বলে দেন পৃথিবীর সকলের ঘৃণার পাত্র হলে বা ব্রহ্ম-হত্যা করলে বা পার্ব্বতীর প্রতি লুব্ধ হলে মহাদেব একে ভস্মসাৎ করে ফেলবেন। অন্ধক বড় হয়ে শেষ পর্যন্ত পার্ব্বতীর প্রতি মুগ্ধ হয়ে পড়েন। প্রহ্লাদ বোঝাতে চেষ্টা করেন পার্ব্বতী প্রকৃতই তাঁর মা। কিন্তু অন্ধক মহাদেবের কাছে শম্বর অসুরকে পাঠান পার্ব্বতীকে নিয়ে আসার জন্য। মহাদেব বলে দেন তাঁর সঙ্গে পাশা খেলায় জিততে পারলে তবেই তিনি অন্ধকের কথা শুনবেন। অন্ধক শুনে তেড়ে আসেন কিন্তু যুদ্ধে হেরে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেন এবং পার্ব্বতীকে মা বলে স্বীকার করে নিয়ে মুক্তি পান ও ভৃঙ্গীতে পরিণত হন।

অন্ধক—একজন বৈশ্য মুনি, স্ত্রী শূদ্র কন্যা। দুজনেই অন্ধ; সরযূতীরে এক আশ্রমে বাস করতেন। এঁদের এক মাত্র ছেলে সিন্ধু/যজ্ঞদত্ত। সিন্ধু কলসীতে জল ভর-ছিলেন; সরযূতে হাতী জল পান করছে মত শব্দ শুনে রাজা দশরথ শব্দভেদী বাণে একে বিদ্ধ করেন। এরপর শিকারের সন্ধানে এগিয়ে এসে মুমূর্ষু বালকের কাছে তাঁর পরিচয় পান। অনুতপ্ত রাজা বালককে আশ্রমে আনলে মুনি দশরথকে শাপ দেন; পুত্র শোকে রাজাও মারা যাবেন। পুত্রশোকে কাতর মুনিদম্পতী জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন করেন।

অন্ধক—(১) যদুবংশে ক্ষত্রিয় রাজা সত্বান ও স্ত্রী কৌশল্যার ছেলে। কুকুর বংশ প্রতিষ্ঠাতা। এঁর বড় ছেলে কুকুর। (২) উতথ্য মমতার ছেলে; জনৈক মুনি/দীর্ঘতমা।

অন্ধগজন্যায়—দ্রঃ ন্যায়।

অন্ধগোলাঙ্গুলন্যায়—দ্রঃ ন্যায়।

অন্ধতামিস্র—পঞ্চ অবিদ্যার একটি। দেহ নাশে আমিও নষ্ট হলাম এই বুদ্ধি। (২) নরক বিশেষ। মনু মতে বকব্রতী, বিড়ালব্রতী ব্রাহ্মণরা, যাজ্ঞবল্ক্য মতে মহাপাতক ও উপপাতকরা এবং বাজসেন সংহিতা মতে আত্মঘাতীরা এই নরকে যায়। আর এক মতে স্ত্রী বা স্বামী স্বামী বা স্ত্রীকে বঞ্চিত করে অন্নগ্রহণ করলে এই নরকে আসে।

অন্ধদর্পণন্যায়—দ্রঃ ন্যায়।

অন্ধপঙ্গুন্যায়—দ্রঃ ন্যায়।

অন্ধ পরম্পরা ন্যায়—দ্রঃ ন্যায়।

অন্ধ্র—মহাভারতের যুগে বর্তমানের অন্ধ্র অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ছিল। কথিত আছে সহদেব এই দেশের রাজাকে পাশা খেলায় পরাজিত করে জয় করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে বিশ্বামিত্রের শাপে তাঁর কয়েকটি ছেলের অপত্যগণ অন্ধ্র প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হন এবং আর্য দেশের প্রান্ত ভাগে বাস করতে থাকেন।

অন্নকূট—পাহাড়ের মত করে অন্ন সাজিয়ে উৎসব। দেওয়ালির পর কার্তিকী শুক্লা প্রতিপদে কাশীতে অন্নপূর্ণার ও অন্যান্য মন্দিরে এই উৎসব পালন করা হয়। বিশেষত বৈষ্ণব মন্দিরে। জয়দেব প্রভৃতি সাধকদের তিরোধান তিথিতে ও অন্য সময়েও হয়ে থাকে। স্মৃতিকৌস্তুভ, ধর্মসিন্ধু ইত্যাদি গ্রন্থ অনুসারে মূলত এটি গোবর্দ্ধন পূজা। গোময় বা অন্নের সাহায্যে গোবর্দ্ধন গিরির প্রতীক তৈরির বিধান আছে। গোবর্দ্ধন পাহাড়ের কাছে আর একটি পাহাড়ের নাম ও অন্নকূট। বরাহ পুরাণে এর পরিক্রমার বিধান আছে। বাঙলা স্মৃতি গ্রন্থে এই উৎসবের উল্লেখ নাই।

অন্নপূর্ণা—শক্তির একটি রূপ। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে এই পূজার নিয়ম দেওয়া আছে। দেবী রক্তবর্ণা, বিচিত্র বসনা, স্তনভারনম্রা, অন্নপ্রদান নিরতা ও ভবদুঃখহন্ত্রী; তাঁর মাথায় বালচন্দ্র। নৃত্যপরায়ণ শিবকে দেখে তিনি সন্তুষ্ট। চৈত্রের শুক্লা অষ্টমীতে তাঁর পূজা হয়। প্রাচীন কোন গ্রন্থে এই পূজা নাই। কাশীর অন্নপূর্ণা ও অন্নকূট (দ্রঃ) উৎসব প্রসিদ্ধ।

অন্বগভানু—রাজা পুরুর ছেলে প্রবীরের এক স্ত্রী শূরসেনী, ছেলে হয় মনস্যু। মনস্যু ও স্ত্রী অপ্সরা মিশ্রকেশীর ছেলে অন্বগভানু। অন্য মতে পুরুর আর এক স্ত্রীর ছেলে ইক্ষ্বাকু, রুদ্রাশ্ব, প্রবীর; এবং এই রুদ্রাশ্ব ও মিশ্রকেশীর ছেলে অন্বগভানু = ঋচেয়ু = অনাধৃষ্টি।

অন্বয়—সাংখ্যে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি। ব্যাপ্য ও ব্যাপকের অবিনাভাব বা সতত সম্বন্ধ। কার্য কারণের অনুসন্ধান।

অপদেবতা—ভূত, প্রেত, বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর পিশাচ, গুহ্যক সিদ্ধ; এরা দেবযোনি কিন্তু ইন্দ্রাদি থেকে হীনবল।

অপবর্গ—জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ। মোক্ষ।

অপভ্রংশ—খৃ-পূ ২-শতকে পতঞ্জলি শব্দটি ব্যবহার করেন। সংস্কৃত থেকে জন্ম অথচ শিষ্ট ভাষায় অচল শব্দকে পতঞ্জলি অপভ্রংশ বলেছিলেন। বররুচি অপভ্রংশ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি। পুরুষোত্তম প্রভৃতি পরবর্তী পণ্ডিতরা অপভ্রংশ উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু প্রাকৃতের নব্য বা সরলতর রূপ ইত্যাদি স্পষ্ট কিছুই বলেন নি।

বর্তমানে স্বীকার করা হয় যে প্রত্যেক প্রাকৃত থেকে এক/একাধিক অপভ্রংশ ভাষা তৈরি হয়েছিল এবং এই সব আঞ্চলিক অপভ্রংশ থেকে বাঙলা, হিন্দি, পাঞ্জাবি, রাজস্থানি, সিন্ধি, গুজারাটি, মারাঠি ইত্যাদি প্রাদেশিক ভাষার জন্ম। অর্থাৎ পূর্ব ভারতে প্রচলিত প্রাকৃত থেকে পূর্বী অপভ্রংশ এবং পূর্বী অপভ্রংশ থেকে ভোজপুরী, মাগধী, মৈথিলি বাঙলা, উড়িয়া, অসমীয়া উৎপন্ন হয়েছে। শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে

শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং এই অপভ্রংশ থেকে পশ্চিমা হিন্দি প্রভৃতি ভাষার জন্ম। অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ। অপভ্রংশের কাল অনুমান ৫০০-১০০০ খৃষ্টাব্দ। অবশ্য খৃ ১৭-শতক পর্যন্ত অপভ্রংশ ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে। বহু জৈন পণ্ডিত ও বৌদ্ধ পণ্ডিত অপভ্রংশে অনেক বই লিখে গেছেন।

অপরাজিত—(১) এক জন রুদ্র। (২) কদ্রুর ছেলে একটি সাপ। (৩) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে নিহত। (৪) ঋষি বিশেষ।

অপরাজিতা—দুর্গা মূর্তি বিশেষ। আশ্বিনে শুক্লা দশমীতে পূজা হয়।

অপরান্ত—একটি প্রাচীন জাতি/জনপদের নাম। বর্তমানের নাম কোঙ্কন। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমে সহ্যাদ্রি ও সমুদ্রের মাঝখানে। পুরাণ, রঘুবংশ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বৌদ্ধগ্রন্থ ইত্যাদিতে উল্লেখ আছে। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে সম্ভবত আর একটি অপরান্ত দেশ ছিল।

অপরাবিদ্যা—দ্রঃ বিদ্যা।

অপরার্ক—কোঙ্কনের (অপরান্ত) অধিপতি। ইনি শিলাহার রাজা প্রথম অপরাদিত্য খৃ ১২-শ শতাব্দী। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টিকাকার। স্বাধীন চিন্তা মণ্ডিত টিকা। ভা-সর্বজ্ঞের ন্যায়সারের টিকাও লিখেছিলেন।

অপর্ণা—একটি গাছের পাতাও ভক্ষণ করতেন না অর্থাৎ (শিবকে বিয়ে করার জন্য) অনাহারে তপস্যা করার ফলে পার্বতীর এই নাম। দ্রঃ একপর্ণা, একপটলা।

অপান—দেহ গত অধোগামী/গুহ্য বায়ু (দ্রঃ)। বিপরীত প্রাণ বায়ু।

অপান্তরতমস্—অন্য নাম সারস্বত। বিষ্ণু 'ভূ'-এই শব্দ উচ্চারণ করলে এঁর জন্ম। অন্তরে অপগত তমস্; ত্রিকালদর্শী। বিষ্ণুর আদেশে বেদকে ব্যাস/বিন্যাস করেন। দ্বাপরে ইনিই পরাশর পুত্র হয়ে আবার বেদ বিন্যাস করেন।

অপালা—অত্রির মেয়ে। ব্রহ্মবাদিনী। ঋক্ বেদে অষ্টম মণ্ডলে ৯১ সূক্তের ঋষি। চর্মরোগের জন্য দেহে রোম ছিল না; ফলে স্বামী পরিত্যক্তা হন। ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করেন পিতার মাথা (টাক) ও তাঁর দেহ রোম যুক্ত হক এবং অত্রির উষর শস্যক্ষেত্র উর্বর হক। সোমচর্বণরতা অপালার দাঁতের শব্দকে ইন্দ্র অভিষব পাথরের শব্দ মনে করে এসে উপস্থিত হন এবং অপালার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়েছিলেন অপালা।

অপূপ—পুরোডাশ। হবিঃ বিশেষ।

অপ্পয্যদীক্ষিত—১৫২০-১৫৯২ খৃষ্টাব্দ। দাক্ষিণাত্যে ভেলোরের নায়কগণের আশ্রিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। শতাধিক গ্রন্থ রচয়িতা। চিত্রমীমাংসা, লক্ষণাবলী, কুবলয়ানন্দ গ্রন্থ এবং যাদবাভ্যুদয় কাব্যের টিকা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

অপ্পর্—তামিল শৈব সাধক। শৈব নায়নার সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরু। খৃ ৬-শতকের শেষে। দক্ষিণাত্যে জৈন ধর্মের প্রভাব খর্ব করে শৈব ধর্ম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন।

অপ্রতিরথ—সামবেদে প্রাস্থানিক মঙ্গলাচরণ মন্ত্র।

অপ্সরা—অপ্ (জল)-সৃ+অ/অস্ (র্তৃ) ; বিঃ=অপ্সরস্। অর্থাৎ যাঁরা জলে সরণ/ বিহার করেন। অপঃ থেকে জন্ম বলেও এই নাম। দেবযোনি বিশেষ। রামায়ণে সমুদ্র মন্থনে, অন্যমতে কশ্যপের ঔরসে প্রধার গর্ভে সমস্ত (অন্যমতে ১৬ জন) অপ্সরা, কাদম্বরীতে মানসদেব, অনল জল প্রভৃতি থেকে ১৪-টি অপ্সরা কুলের জন্ম। অভিধান চিন্তামণি টীকাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, যম থেকে প্রভাবতী ইত্যাদি ৪৯ অপ্সরার জন্ম। মনুতে এঁরা সপ্তমনুর সৃষ্টি।

সমুদ্র মন্থনে ৬০-কোটি অপ্সরা উঠে আসেন। দেবতা বা দানব কেউই এঁদের নিতে চান নি। ফলে এঁরা না দেবতা না দানব। কামদেব এঁদের অধিপতি। নৃত্যকলায় পারদর্শিনী, দেব সভায় নর্তকী ও গায়িকা। বহুস্থানে গন্ধর্বদের স্ত্রীরূপে পরিচিত। দেবতারা এঁদের দিয়ে মুনিঋষিদের তপস্যা নষ্ট করতেন। মায়াতে নানা রূপ ধারণ করতে পারতেন। মর্ত্যে এসে নানা ভাবে মানুষদের সাহায্য করেছেন। পাশাতেও এঁরা সুনিপুণ। এঁরা সুরসুন্দরী, স্বর্গবেশ্যা। সংস্কৃত সাহিত্যে অপ্সরা সৃষ্টির মাধ্যমে যৌনরস পরিবেশনের পথ সুগম করা হয়েছিল। কয়েকজন অপ্সরার নাম :—

অদ্রিকা, অনবদ্যা, অনুম্লোচা, অনূচানা, অরুণা, অম্বিকা, অসিতা অম্বুজাক্ষী উর্বশী উম্লোচা, ঋতুস্থলা, কেশিনী কর্ণিকা, কাম্যা, কাঞ্চনমালা ক্ষেমা, ঘৃতাচী, চন্দ্রপ্রভা তিলোত্তমা, দান্তা, নাগদন্তা, পুণ্ডরীকা, পুঞ্জিকাস্থলা, পূর্বচিত্তী, প্রজাগরা, প্রমাথিনী, প্রশমী, প্রিয়বর্চস্, প্রম্লোচা, প্রমদ্বরা, বাসনা, বিদ্যুৎপর্ণা, বিদ্যোতা, বিদ্যুতা, বিশ্বাচী (বিশ্বাচী), মধুরস্বরা, মনোরমা, মঞ্জুঘোষা, মরীচি, পুষ্পগন্ধা, মহেশ্বরী, মিশ্রা, মিশ্রকেশী, মেনকা, রক্ষিতা, রম্ভা, রুচিরা, শরদ্বতী, শুচিকা, সহজন্যা, সুকেশী, সুকেশিনী, সুগন্ধা, সুবাহু, সুপ্রিয়া, সুমধ্যা, সুরসা, সুরজা, সুরথা, সোমকেশী, সোমা, হেমা, অলম্বুষা ইত্যাদি।

অবতার—মানুষ হয়ে দেবতার জন্ম। দু রকমঃ-পূর্ণ ও অংশ অবতার। কাজ দুষ্টের দমন এবং ধর্মসংস্থাপন। শতপথে আছে ব্রহ্মা মৎস্য, কূর্ম ও বরাহ অবতারে পৃথিবী সৃষ্টি বা রক্ষা করেন। শুক্রাচার্যের (দ্রঃ) মার কাছে অসুররা শরণাপন্ন হলে বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে এই মহিলার শিরশ্ছেদ করেন। নারী হত্যা দেখে ভৃগু শাপ দেন বিষ্ণুকে, বার বার গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে অর্থাৎ অবতার হয়ে জন্মাতে হবে।

পুরাণে আছে বিষ্ণু দশবার দশটি পূর্ণ অবতার রূপে জন্ম নিয়েছিলেন। বিষ্ণুর সাধারণ দশটি অবতারের নাম মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ/বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। মহাভারতে চার, ছয় ও দশ অবতারের কথা আছে। হরিবংশে বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম ও কৃষ্ণ ৬-জনের উল্লেখ রয়েছে। বায়ু, বরাহ ও অগ্নি পুরাণে ১০ অবতার। বায়ু পুরাণে ১০ অবতারের মধ্যে ব্যাস ও একজন। ভাগবতে তিন জায়গায় (১।৩, ২।৭, ১১।৪) যথাক্রমে ২২, ২৩ ও ১৬ অবতারের নাম আছে। ভাগবতের অবতারদের মধ্যে সনৎকুমার, নারদ, কপিল,

দত্তাত্রেয়, ঋষভ, বুদ্ধ ও ধন্বন্তরি নাম রয়েছে। এই ঋষভ হয়তো জৈন প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব। পাঞ্চরাত্র সংহিতায় ৩৯ অবতারের নাম আছে।

সনক, সনন্দ, সনাতন, নরনারায়ণ, যজ্ঞ, পৃথু, মোহিনী, গরুড়, ঋষি, মনু, মনুপুত্র, ও দেবতারাও বিষ্ণুর অংশাবতার বলা হয়। চৈতন্যচরিতামৃতে পুরুষ অবতার ইত্যাদি ষোল প্রকার অবতারের উল্লেখ রয়েছে। কিছু মতে বলরাম ও কিছু মতে বুদ্ধ অবতার বলে স্বীকৃত নন।

অবদান—পালিতে অপদান। অর্থ উল্লেখ যোগ্য কাজ। অবদানগুলি সংস্কৃতে লিখিত। এগুলিতে তথাগতের অতীত জীবনের ধর্মসম্বন্ধীয় উল্লেখযোগ্য কাজগুলির বর্ণনা আছে। অবদানে তিনটি অংশ থাকেঃ- (১) বর্তমান প্রসঙ্গ; (২) অতীত কাহিনী, (৩) একটি নীতি। এই অতীত কাহিনীর নায়ক বোধিসত্ত্ব হলে অবদানকে জাতকও বলা যেতে পারে। কোন কোন অবদানে জাতক কাহিনীর বদলে বুদ্ধের ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে। প্রথম পর্বের অবদান-গুলিতে হীনযানী ভাবধারা এবং পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ মহাযানী ভাবধারার প্রাধান্য। জাতকের ন্যায় অবদানও বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

অপদান কাহিনীগুলিতে তথাগতের এবং বিখ্যাত শ্রাবক শ্রাবিকাদের জীবনী। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল ভোগ রূপে এবং কল্পান্তে অবস্থিত একাধিক বুদ্ধগণের প্রসাদে কেমন করে এ জন্মে পরমার্থ লাভ হয়েছে তারই কাহিনী। কবিতায় আবেগময় অকপট বর্ণনা। জাতকে নায়ক স্বয়ং তথাগত বুদ্ধ; কাহিনীতে তাঁর বিভিন্ন জন্মের কার্যাবলী। অপদানের কাহিনী ভূতপূর্ব. বুদ্ধদের আন্তরিক সেবা ও তারই ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে জীবন্মুক্তি লাভ।

অবধ—অযোধ্যা।

অবধী—পূর্বী হিন্দির অন্তর্গত একটি উপভাষা। ব্রজভাষার পরই এর স্থান।

অবধূত—বর্ণাশ্রম-ধর্মহীন, সংসারাসক্তি রহিত সন্ন্যাসী। যঃ বিলঙ্ঘ্য আশ্রমবর্ণান্ আত্মনি এব স্থিতঃ পুমান্। অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে। একই সঙ্গে ত্যাগও ভোগের অনুসরণ করেন অথচ কোনটিতেই আসক্ত নন। সব রকম প্রকৃতি বিকারকে উপেক্ষা করেন (অবধূনোতি) বলে নাম অবধূত। অবধূত অনেক রকম: শৈবাবধূত, ব্রহ্মাবধূত, হংসাবধূত, কৌলাবধূত, গৃহস্থ, দিগম্বর। বন, অরণ্য, ভারতী, গিরি, পুরী এঁদের উপাধি। হংসাবধূত=পরমহংস বা পূর্ণাভক্তাবধূত। পরিব্রাট্ = অপূর্ণভক্তাবধূত। গৃহস্থ=সবস্ত্র, সস্ত্রীক, ভাবুক, সাধক, শুচি, গুরুভক্তিরত, নিষ্কাম, শিবার্চনপরায়ণ; মদ্য গ্রহণ ও অগম্যা গমন নিষিদ্ধ। দিগম্বরাধূত=সর্বভোগী, সর্বজাতির ধর্মকর্মে রত; মদ্যগ্রহণ ও অগম্যাগমন বিহিত। পরমহংস=অপরিগ্রহ, নিষেধবিধিরহিত, আত্মভাব সন্তুষ্ট, শোক-মোহ শূন্য, নিঃসঙ্গ, কর্মত্যাগী।

অবন্তি—প্রাচীন ভারতে একটি পরাক্রান্ত দেশ। রাজধানী উজ্জয়িনী, সিপ্রা নদীর তীরে। অনেক সময় উজ্জয়িনীকে অবন্তি এবং সিপ্রাকে অবন্তি নদী বলা হয়। মালব জাতির নাম থেকে অবন্তির আর এক নাম মালব বা পশ্চিম মালব। সাতটি

মোক্ষদায়িনী পুরীর একটি। মহাভারতের সময়ে দক্ষিণে নর্মদা উপকূল থেকে পশ্চিমে মহী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর উত্তরে অবস্থিত রাজ্যের রাজধানী, চর্মণ্বতী নদীর তীরে, দশপুর বা বর্তমানে ধোলপুর। দশপুর রন্তিদেবের রাজধানী।

বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে অবন্তি নামে এক রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। পুরাণে রাজা অবন্তিকে যদুকুলের হৈহয় শাখার মাহিষ্মতী নগরাধিপ কার্তবীর্যার্জুনের বংশজ বলা হয়েছে। আর একটি কিংবদন্তী অনুসারে কার্তবীর্য বংশীয় তালজঙ্ঘ থেকে পাঁচটি বংশ উৎপন্ন হয়ঃ—ভোজ, বীতিহোত্র, শার্যাত, অবন্তি ও তুণ্ডিকের।

মনে হয় এক সময় দক্ষিণ নর্মদা উপত্যকা পর্যন্ত অবন্তিদের অধিকার ছড়িয়ে পড়েছিল। এই অবন্তি দেশের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে উজ্জয়িনী ও মাহিষ্মতীকে কেন্দ্র করে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল মনে হয়। দক্ষিণ অবন্তি অবন্তি-দক্ষিণাপথ নামে বা অশ্মকাবন্তি নামেও পরিচিত। অশ্মক রাজ্যের রাজধানী ছিল অন্ধ্রের নিজামাবাদ অন্তর্গত বোধন (প্রাচীন পৌদন্য)। অর্থাৎ অবন্তি-দক্ষিণাপথ নর্মদার দক্ষিণে বহুদূর বিস্তৃত ছিল। আর মাহিষ্মতী ছিল অনূপ দেশের রাজধানী। মূল অবন্তি আজকের পশ্চিম মালব। হিউএন্-ৎসাঙ্ উজ্জয়িনী ও মালবদেশকে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করেছেন; এই মালব গুজরাটের মহী নদীর নিকট অবস্থিত ছিল। কাদম্বরীতে উজ্জয়িনী অবন্তির প্রধান নগর এবং বিদিশা মালবের প্রধান নগর। বর্তমানের ভিলসার কাছে বেসনগর হচ্ছে প্রাচীন বিদিশা।

ভারতের ঐতিহ্যে অবন্তি বা পশ্চিম মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী সুপ্রসিদ্ধ। এখানকার মহাকাল মন্দির সুপরিচিত। কিংবদন্তীর শকারি বিক্রমাদিত্যের রাজধানীও এই উজ্জয়িনী। অবন্তির ইতিহাসে পুরাণ বর্ণিত প্রদ্যোত বংশ এবং গুপ্তপূর্ব যুগের শকরাজ বংশ প্রসিদ্ধ। শক ও গুপ্তযুগে উজ্জয়িনী জ্যোতিষ চর্চার একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

অবন্তিবংশ—নহুষ-যযাতি-যদু। যদুর এক ছেলে সহস্রজিৎ। সহস্রজিতের বংশে হৈহয় এবং হৈহয় বংশে কনক। কনকের ছেলে কার্তবীর্যার্জুন। (দ্রঃ) অবন্তি।

অবভৃথ—মুখ্য কর্মসমাপ্তিতে করণীয় যজ্ঞ-শেষ কর্ম। যজ্ঞাঙ্গভূত করণীয় স্নান। সোমযাগের শেষে যজমান সপত্নীক পুরোডাশ্ আহুতি দিয়ে স্নান। প্রধান যজ্ঞের অঙ্গীভূত যজ্ঞ; যজ্ঞ শেষে কোন বিষয়ে যেন ন্যূনতা না ঘটে এ জন্য সকল ত্রুটি পুরণার্থে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ।

অবলোকিতেশ্বর—ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ ও তাঁর প্রজ্ঞা পাণ্ডরা থেকে অবলোকিতেশ্বরের উদ্ভব। অবলোকিতেশ্বর একজন মহাযানী বোধিসত্ত্ব। গৌতম বুদ্ধের তিরোধান ও মৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাবের অন্তবর্তীকালে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর বিরাজ করেন।

মহাযানী কারণ্ড-ব্যূহ গ্রন্থে আছে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর নির্বাণ পেয়ে শূন্যে বিলীন হবার মুহূর্তে বহু জীবের আর্তনাদ শুনতে পান। তাঁর অভাবে ভীত জীবদের এই অবস্থা বুঝতে পেরে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর প্রতিজ্ঞা করলেন যে যতদিন জগতের সমস্ত প্রাণী দুঃখ থেকে মুক্তি না পাবে ততদিন তিনি তাদের

মুক্তির জন্য কাজ করে যাবেন ; নির্বাণে প্রবেশ করবেন না। অবলোকিতেশ্বরের অপর নাম পদ্মমণি। নেপাল ও ভারতবর্ষে এঁর বহু মূর্তি পাওয়া গেছে।

অবস্তু—বেদান্তে ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্ত কিছু।

অবস্থাচতুষ্টয়—দেহের চারটি অবস্থা। বাল্য, ১৫ পর্যন্ত ; কৌমার, ৩০ পর্যন্ত ; যৌবন ৫০ পর্যন্ত ; তারপর বার্দ্ধক্য (বৈদ্যক)।

অবস্থাত্রয়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি জীবের তিন অবস্থা (বেদান্ত)।

অবস্থাষটক—জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, নাশ, জীবের এই ছয় অবস্থা বা ভাব (যাস্ক)।

অবস্থান—সূর্যের পথ তিন অংশে বিভক্ত। উত্তর অবস্থান ঐরাবত ; মধ্যম অবস্থান জারদ্গ, দক্ষিণ অবস্থানের নাম বৈশ্বানর।

অবহট্‌ঠ—প্রাকৃত ও নবীন ভারতীয় আর্যগোষ্ঠী ভাষার মধ্যবর্তী অবস্থার সাহিত্যিক ভাষা। বৌদ্ধ তান্ত্রিক, শৈব বা নিরীশ্বর যোগীদের লেখা দোহার ভাষা। অবহট্‌ঠ=অপভ্রষ্ট। বৌদ্ধ যোগী সরহ ও কাহ্ন সংস্কৃতে তত্ত্বকথা ও নবজাতক-বাঙলায় গান লিখেছিলেন এবং অবহট্‌ঠে নীতি ও অধ্যাত্মজ্ঞানের কথা লিখেছিলেন। সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ভাষা সীমাবদ্ধ ছিল না। সাধারণ সাহিত্যেও এই ভাষা (৭০০—১০০০ খৃষ্টাব্দে) চালু ছিল। আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্টাব্দে রচিত প্রাকৃত পৈঙ্গলের অধিকাংশ সূত্রশ্লোক ও উদাহরণ কবিতা এই অবহট্‌ঠ ভাষায় লেখা। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিদ্যাপতির 'কীর্তি লতা' এই অবহট্‌ঠে রচিত।

অবিক্ষিৎ—(১) রাজা করন্ধম ও রাণী সুবর্জার ছেলে। সাত জন স্ত্রী বরা, গৌরী, সুভদ্রা, লীলাবতী, বিভা, মঙ্গবতী ও কুমুদবতী। আর একটি স্ত্রী বৈশালিনী ; অন্য রাজাদের পরাজিত করে স্বয়ংবর থেকে একে নিয়ে আসেন। পরাজিত রাজারা আবার একত্র হয়ে অবিক্ষিৎকে বন্দী করেন। শেষ পর্যন্ত করন্ধম ছেলেকে মুক্ত করে আনেন। অবিক্ষিতের ছেলে মরুত্ত। (২) কুরু ও তাঁর স্ত্রী বাহিনীর একটি ছেলে।

অবিন্ধ্য—একজন রাক্ষস। রাবণকে সীতা ফিরিয়া দিতে উপদেশ দিয়েছিলেন। ত্রিজটাকে পাঠিয়েছিলেন সীতাকে সান্ত্বনা দিতে। সীতাকে হত্যা করার সঙ্কল্প করলে রাবণকে নিরস্ত করেন। যুদ্ধ জয়ের পর সীতাকে রামের কাছে নিয়ে আসেন।

অব্দ—বৎসর। ভারতে অনেকগুলি অব্দ চালু হয়েছিল। যেমন পঞ্চাব্দ, দ্বাদশাব্দ, ষষ্ট্যব্দ, কল্যব্দ, অশোকাব্দ, শকাব্দ, বিক্রম-অব্দ, বুদ্ধাব্দ, জৈনাব্দ, গুপ্তাব্দ, গুপ্তবলভীসংবৎ, কলচুরি বা চেদি অব্দ। পঞ্চাব্দ হিসাব হত পাঁচ-বছর চক্রের ওপর নির্ভর করে ; অর্থাৎ ৫-বছর অন্তর সূর্য ও চন্দ্র আকাশে একই স্থানে এসে হাজির হয়। চন্দ্রসূর্যের এই জাতীয় দুটি ক্রমিক মিলনের অন্তর্গত দিনগুলিকে ৫-টি অব্দ বা বৎসরে ভাগ করে দেওয়া হত। এই মিলনের দিনটি ছিল প্রতি ৫-বর্ষ চক্রের প্রথম দিন। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে (প্রায় ১৩৫০ খৃ-পূ) এই ভাবে পঞ্জিকা গণনার পদ্ধতি দেওয়া

আছে। আরো আগে থেকে অর্থাৎ বৈদিক সংহিতার যুগ থেকেই এই পদ্ধতি চালু ছিল মনে হয়। প্রতি ৫-বছর পরে আকাশে গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান গণনায় কিছুটা ভুল দেখা দিত এবং সেটি সংশোধন করে নিতে হত। ৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদ্ধতি চালু ছিল। দ্বাদশাব্দ :—সম্পূর্ণ রাশি চক্র ভ্রমণ করতে বৃহস্পতির বার বছর লাগে। অর্থাৎ এই দিন গুলিকে বারটি বছরে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। এটিও প্রাচীন পদ্ধতি; কবে চালু হয়েছিল স্পষ্ট নয়। এই পদ্ধতিতেও প্রতি ১২-বছর অন্তর অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান গণনায় যে ভুল দেখা যাচ্ছিল সেই ভুলকে ভ্রমের হারের সাহায্যে সংশোধন করে নেওয়া হত। ১২-অব্দের ভ্রমের পরিমাণ ৫-অব্দের পদ্ধতির ভ্রমের থেকে অনেক কম। এই দুটি প্রথাকে ত্যাগ করে খৃ ৫-শতকে ষষ্ট্যব্দ অর্থাৎ ৬০-বছর চক্র চালু করা হয়েছিল। কোন জ্যোতিষ্কের পরিক্রমার ওপর নির্ভর এই গণনা নয়; ৫-অব্দ ও ১২-অব্দের এটি একটি সমন্বয়। এই গণনাতে প্রতি ৬০ বছর অন্তর আকাশে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থানের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে এবং ভুল প্রমাদ ও অনেক কমে যায়। এই ষষ্ট্যব্দ ভারতে এখনও চালু রয়েছে; দক্ষিণ ভারতে এটি সমধিক প্রচলিত; নাম বার্হস্পত্যাব্দ। ৬০ বছর এই চক্রের অন্তর্গত প্রতিটি বছরের বিভিন্ন নাম আছে। সপ্তর্ষি চার-অব্দ :-এটি মোটামুটি শতাব্দী গণনার একটি পদ্ধতি। এক একটি শতাব্দীকে ভচক্রস্থ এক একটি নক্ষত্রের নামে উল্লেখ করা হত। কল্পনা করা হয়েছিল সপ্তর্ষিমণ্ডল একশ বছর ধরে এক একটি নক্ষত্রে অবস্থান করেন। এটি নিছক কল্পনা; পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক নয়। এই পদ্ধতিতে শতাব্দীর নামকরণ হত নক্ষত্রের নাম অনুসারে। অবশ্য এই একশ বছরকে পঞ্চাব্দ চক্রে ভাগ করে কুড়িযুগে এক শতাব্দী বলা হত। এবং পঞ্চাব্দ হিসাব যেমন ভাবে হয়ে থাকে তেমনি হত। কাশ্মীর ও পার্শ্ববর্তী প্রদেশে এই গণনা চালু ছিল। বৃদ্ধগর্গ মতে মঘা শতাব্দী আরম্ভ হয়েছিল ৩১৭৭ খৃঃ পূ। মঘা শতাব্দীর আরম্ভের তারিখ সম্বন্ধে অর্থাৎ শতাব্দী গণনার অনেক মতানৈক্য রয়েছে। কল্যব্দ ৩১০২-খৃ-পূর্বাব্দ ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্য রাত্র থেকে অর্থাৎ ১৮ ফেব্রুয়ারির সকাল থেকে এই কলি অব্দের হিসাব করা হয়। এই অব্দ সর্বভারতে প্রচলিত। ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে আর্যভট্ট এই কলি-অব্দের হিসাব করেন; তাঁর হিসাব অনুসারে ৩১০২ খৃ-পূর্বাব্দে কলিযুগের সুরু। হিসাবের সুবিধার জন্য এই কল্যব্দ সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর্যভট্টের হাতে যে সমস্ত তথ্য ছিল তা থেকে গণনা করতে করতে দেখান ৩১০২ খ্রী-পূ ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারিতে রাহু ছাড়া অন্য গ্রহগুলির মধ্যাবস্থান মেষ রাশির অতি সন্নিকটে ঘটে ছিল। অবশ্য আর্যভট্টের এ হিসাব প্রমাদ যুক্ত। অধুনা প্রাপ্ত তথ্য থেকে হিসাব করে দেখা যায় গ্রহগুলি ঠিক একত্র ছিল না; ৫০ ডিগ্রির মধ্যে ছড়ান ছিল। ৬৩৪-৬৩৫ খৃষ্টাব্দের এক শিলালিপিতে কল্যব্দের প্রথম ব্যবহার দেখা গিয়েছিল। জ্যোতিষ্কগণের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে এই সমস্ত অব্দ চালু করা হয়েছিল কিন্তু এ ছাড়াও অন্যান্য অব্দও চালু হয়েছিল।

সম্রাট অশোক এক অব্দ গণনা চালু করেন; নাম বিক্রমাব্দ বা অশোকাব্দ

কিন্তু কবে থেকে এই কাল চালু হয়েছিল কোথাও কোন হিসাব পাওয়া যায় না। ২৭৩-২৬৪ খৃ-পূর্বে মনে হয় অশোক অব্দের প্রথম দিন; তাঁর অভিষেকের দিন থেকে সুরু। আর একটি বিক্রমাব্দ চালু করেছিলেন উজ্জয়িনীর এক রাজা বিক্রমাদিত্য। ৫৮ খৃ-পূর্বে এর আরম্ভ। কিন্তু ইতিহাসে ঐ সময়ে ঐখানে ঐ নামে কোন রাজা ছিলেন না। বাংলা ছাড়া উত্তর ভারতে সর্বত্র এই অব্দ আজও চালু আছে। উত্তর ভারতে চৈত্র-শুক্লপ্রতিপদ থেকে, গুজরাটে কার্তিক শুক্ল প্রতিপদ থেকে এবং কচ্ছে আষাঢ় শুক্ল প্রতিপদ থেকে এই অব্দের আরম্ভ।

শকাব্দ আরম্ভ ৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে। দক্ষিণ ভারতে এর নাম শালিবাহনাব্দ বা শালিবাহন শক। মনে হয় সম্রাট কনিষ্ক এর প্রবর্তক। এই অব্দ সর্বভারতে চালু আছে। চান্দ্র গণনায় চৈত্র শুক্লপ্রতিপদ থেকে এবং সৌরগণনায় মেষাদি থেকে এই অব্দ গণনা করা হয়। মনে হয় শকরাজারা ব্যাকট্রিয়া জয় করার সময় থেকে অর্থাৎ ১২৩ খৃ-পূর্বাব্দে এই শকাব্দের সুরু কিন্তু প্রথম দিকের ২০০ বছরকে এক একটি শতক হিসাবে ধরা হয়েছিল এবং শতাব্দী শেষ হতে আবার নতুন করে প্রথম অব্দ, দ্বিতীয় অব্দ হিসাব হয়েছিল। কনিষ্কের সময় থেকে নিরবচ্ছিন ভাবে শকাব্দের হিসাব চালু হয় এবং বরাহমিহিরের সময় থেকে সারা ভারতে চালু হয়েছে। বর্তমানে ভারত সরকারও এই শকাব্দ স্বীকার করে নিয়েছেন। এজেস্ অব্দ শকাব্দের প্রাচীন আর এক নাম।

বুদ্ধাব্দ চালু হয়েছিল বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময় থেকে। এর আরম্ভ ৫৪৫ খৃঃ পূর্বে। যদিও বুদ্ধের পরিনির্বাণ হয়েছিল (মনে হয়) ৪৮৩ খৃ পূর্বাব্দে। সিংহলে খৃষ্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকেই এই হিসাব চালু হয়েছিল। ভারতে ত্রয়োদশ শতক থেকে প্রচলিত হয়। জৈনাব্দ গণনা হয় মহাবীরের নির্বাণ কাল থেকে ৫২৮ খৃ-পূ। রাজা চন্দ্রগুপ্ত ৩১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্তাব্দ চালু করেন। ৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সৌরাষ্ট্র থেকে বাংলা পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারতে চালু ছিল। গুপ্তবংশের পতনের পর কাঠিওয়াড়ের বলভী দেশের রাজাদের নামে গুপ্তাব্দের নাম হয়েছিল গুপ্তবলভী সংবৎ। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত গুজরাট ও রাজপুতনায় এই অব্দ চালু ছিল। কলচুরি বা চেদি অব্দ ২৪৮-২৪৯ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ। মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত। হর্ষবর্ধন সিংহাসনে বসেন ৬০৬ খৃষ্টাব্দে; এবং এই উপলক্ষ্যে হর্ষাব্দ চালু করেছিলেন। ভাটিকাব্দ সুরু হয়েছিল ৬২৪ খৃষ্টাব্দে। গাঙ্গেয়াব্দ প্রচলিত ছিল উড়িষ্যায়; সম্ভবত পঞ্চম শতাব্দীর শেষে ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝে সুরু। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজরা মল্লাব্দ ব্যবহার করতেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা আদিমল্লের রাজ্য কাল ৬৯৪ খৃ থেকে এর সুরু। লক্ষ্মণাব্দ মিথিলায় প্রচলিত। সম্ভবত বিজয়সেন যখন মিথিলা জয় করেন তখন পৌত্র লক্ষ্মণসেনের জন্ম সংবাদ পেয়ে এই অব্দ চালু করেন। এর আরম্ভ ১১০৮-১১১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।

অব্যপদেশ্য—ন্যায়ে নির্বিকল্প জ্ঞান। কোন বস্তু দেখে শিশু নাম করতে পারে না। ইন্দ্রিয় সামান্য ভাবে বস্তু গ্রহণ করে; মন নাম দিয়ে উল্লেখযোগ্য করে নেয়।

অভঙ্গ—মারাঠী সন্ত কবিদের ভক্তি গীতির নাম। ১৩শ থেকে-১৮শ শতকে মহারাষ্ট্রে

ধর্মীয় আন্দোলন এসেছিল ; সেই সময়কার ধর্মীয় গীতি। জনসাধারণের কাছে ভক্তি ও দর্শন পৌঁছে দিয়েছিল এই অভঙ্গ। ওবি নামে আরো পুরাতন একটি জনপ্রিয় ছন্দ থেকে এই অভঙ্গ ছন্দের জন্ম। বাঁধা ধরা ছন্দ রূপ নাই ; গীতিধর্মের প্রাচুর্যই বেশি। গুরু-গ্রন্থ সাহেবেও কিছু অভঙ্গ নীতি স্থান পেয়েছে। সন্ত তুকারামের প্রায় ৪৫০০ অভঙ্গ পাওয়া যায়।

অভয়বস্—দ্রঃ ভরদ্বাজ।

অভয়দেবসূরি—একাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ জৈন টীকাকার। প্রাকৃত ভাষায় এঁর বইয়ের নাম 'জয়তিহুয়ণ'। একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে এই বইটির মহিমায় রোগমুক্ত হন এবং পার্শ্বনাথের একটি মূর্তি উদ্ধার করেন। এঁর বহু শিষ্য ছিল। স্থানাঙ্গ, ভগবতীব্যাখ্যা প্রজ্ঞপ্তি, জ্ঞাতৃধর্মকথা, উপাসকদশাসূত্র, অন্তকৃদ্-দশাসূত্র প্রশ্নব্যাকরণের টীকা, সম্মতিতর্ক-প্রকরণের টীকা, অষ্টকবৃত্তি ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক। এঁর শিষ্য মলধারী হেমচন্দ্র।

অভয়া—ভগবতীর একটি রূপ ; সিংহবাহিনী অষ্টভুজা। এই রূপে দানবদের ধ্বংস করে দেবতাদের অভয় দেন, ফলে এই নাম।

অভিচার—অথর্ববেদীয় মন্ত্রযন্ত্র সাধিত মারণাদি হিংসাত্মক ক্রিয়া। মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, এই ছয় রকম তান্ত্রিক প্রয়োগ। অপরের অনিষ্ট-সাধন বা অপরের দ্বারা অনিষ্টের প্রতিকার সাধনের জন্য তান্ত্রিক প্রয়োগ।

অভিজিৎ—(১) নক্ষত্র বিশেষ। ভেগা। তিনটি নক্ষত্র গঠিত ; পাণিফলের মত। উত্তরাষাঢ়ার শেষ পনের দণ্ড ও শ্রবণার প্রথম চার দণ্ড এই ১৯ দণ্ড এর কাল। এই নক্ষত্রে জন্মালে ললিত কান্তি, সজ্জন, সম্মত, বিনীত, কীর্তিমান, সুবেশ, দেবদ্বিজভক্ত ও স্পষ্টবক্তা হয়। (২) দিনের অষ্টম মুহূর্ত অর্থাৎ মধ্যাহ্নের ২৪ মিনিট আগে থেকে ২৪ মিনিট পর পর্যন্ত মোট ৪৮ মিনিট কাল। (৩) দিনকে পনের ভাগ করলে তার অষ্টম ভাগ অভিজিৎ বা কুতপ কাল। (৪) যদুবংশীয় ভবের ছেলে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্—কালিদাসের নাটক। দুষ্যন্ত (দ্রঃ) শকুন্তলার (দ্রঃ) কাহিনী উপজীব্য।

অভিধর্মকোশ—দার্শনিক বসুবন্ধু রচিত। ৬০০ কারিকায় অভিধর্মের সকল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধদের জন্য লিখিত। আট খণ্ডে রচিত। ধাতু, ইন্দ্রিয়, কর্ম, জ্ঞান ও ধ্যান সম্বন্ধে আলোচনা। শেষ অধ্যায়ে আত্মা সম্বন্ধে বৌদ্ধ মতবাদেব বিশেষ রূপটি পরিস্ফুট। মূল সংস্কৃত পুঁথি নাই ; এর টীকা স্ফুটার্থা -ভিধর্ম-কোশব্যাখ্যা। পরমার্থ ; হিউএন্-ৎসাঙ্ কৃত চীনা অনুবাদ পাওয়া যায়। সমস্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই পাঠ্য হিসাবে এই বই গ্রহণ করেছেন।

অভিধর্মপিটক—দ্রঃ পিটক।

অভিধর্মাবতার—উরগপুর অধিবাসী বুদ্ধদত্ত কৃত অভিধর্ম গ্রন্থ। অভিধর্ম শিক্ষার ভূমিকা। বুদ্ধ ঘোষের বিসুদ্ধিমগ্‌গের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। বুদ্ধদত্তের আলোচনা সবটাই প্রাঞ্জল ; শব্দ সম্পদে সমৃদ্ধ। পদ্যে লেখা ; জায়গায় জায়গায় গদ্যে লেখকের

স্বীয় ব্যাখা। চোড়দেশে এই বই লেখা হয়ে ছিল। এর দুটি টীকা মহাবিহারবাসী বাচিস্সর মহাসামি কৃত এবং সারিপুত্ত শিষ্য সুমঙ্গল কৃত।

অভিনন্দন—চতুর্থ জৈন তীর্থঙ্কর

অভিনবগুপ্ত—কাশ্মীরীয় আচার্য। ভারতের মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিরাট জ্যোতিষ্ক। ৯৫০-৯৬০ খৃষ্টাব্দে জন্ম। কান্যকুব্জ অধিবাসী মহাপণ্ডিত অত্রিগুপ্ত ৭৪০ খৃষ্টাব্দ কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের অনুরোধে কাশ্মীরে বিতস্তা তীরে প্রবরপুর নগরীতে রাজার দেওয়া জমিতে বাস করতে থাকেন। এঁর বংশে দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে বরাহগুপ্ত জন্মান। বরাহগুপ্তের ছেলে নরসিংহগুপ্ত (বা চখখুলক)। সকলেই এঁরা নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। অভিনবগুপ্তের মা বিমলা বা বিমলকলা; শৈশবেই মা মারা যান; পিতা নরসিংহের কাছে শব্দশাস্ত্র ও ব্যাকরণ শেখেন। ভূতিরাজের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা, লক্ষ্মণগুপ্তের কাছে ক্রম ও ত্রিক বা প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন, ভট্টেন্দুরাজের কাছে গীতা, সাহিত্য, অলঙ্কার, ভট্টতোতের কাছে নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। তর্ক, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন ও বৈষ্ণব দর্শনও তাঁর আয়ত্ত ছিল এবং শিক্ষা লাভের জন্য দেশান্তরেও পর্যটন করেছিলেন।

অভিনবগুপ্ত কঠোর জৈন সাধক ছিলেন এবং আজীবন ব্রহ্মচারী। কাশ্মীরের লোক তাঁকে সাক্ষাৎ ভৈরব অবতার মনে করতেন। পরিণত বয়সে বারশ শিষ্যের সঙ্গে কাশ্মীরের কাছে ভৈরবগুহায় প্রবেশ করে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেন।

শৈব আগম শাস্ত্র, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন, অলঙ্কার ও নাট্যশাস্ত্রের ওপর অগণিত বই লিখেছিলেন। বোধপঞ্চদশিকা, মালিনীবিজয়বার্তিক, পরাত্রিংশিকাবিবরণ, তন্ত্রালোক, তন্ত্রসার, ধ্বন্যালোক, লোচন, অভিনবভারতী, ভগবদ্গীতার্থসংগ্রহ, পরমার্থসার, প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী ইত্যাদি রচনা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ভারতীয় নাট্যের তত্ত্ব ও প্রয়োগ আলোচনায় অভিনবভারতীর গুরুত্ব অসামান্য। ধ্বনিপ্রস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক ও প্রবক্তা। রসতত্ত্বকে সুদৃঢ় একটি দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কবিকর্মে শান্তরসের প্রাধান্য এবং শান্তরস থেকে সর্বপ্রকার রসের উদ্ভব বলে তিনি মনে করতেন।

অভিনয়—মূল চারটি অংশ :-সাত্ত্বিক, বাচিক, আঙ্গিক ও আহার্য (বেশভূষা)। আর একটি অংশ অভিমানিক।

অভিনিবেশ—সাংখ্যে আশঙ্কা। যোগদর্শনে মৃত্যু ভয় জনিত অবিদ্যা।

অভিমন্যু—সুভদ্রার গর্ভে অর্জুনের ছেলে। নির্ভীক ও মন্যু/ক্রোধ যুক্ত। অল্প বয়সেই পিতার কাছে অস্ত্র বিশারদ হন। মায়ের সঙ্গে যখন দ্বারকায় ছিলেন তখন কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের কাছেও অস্ত্র শিক্ষা করেন। উত্তরার সঙ্গে বিয়ে হয়। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় এঁর বয়স ষোল মত। অসংখ্য কুরুসেনা হত্যা করেন ও ভীষ্মের রথধ্বজ ছেদন করেন। যুদ্ধের ১৩-শ দিনে দ্রোণের অভেদ্য চক্রব্যূহ ভেদ করার জন্য যুধিষ্ঠির এঁকে আদেশ দেন। অর্জুন ও অভিমন্যু ছাড়া অন্য কেউ এই ব্যূহ ভেদ করতে জানতেন না। অর্জুন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ

করতে জানলেও বার হয়ে আসবার উপায় জানতেন না। অভিমন্যুকে উদ্ধার করে আনবার কথা দিলেও সে কথা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ব্যূহের ভেতর গিয়ে শল্যের ভাই, শল্যপুত্র রুক্মরথ, কর্ণের এক ভাই ও দুর্যোধনের ছেলে লক্ষ্মণ, মগধরাজ জয়ৎসেন, অশ্বকেতু, ভোজরাজ, শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মেঘবেগ, সুবর্চস্, সূর্যভাস ইত্যাদিকে নিহত করেন। বহু মহারথীকেও পরাজিত করেন। শেষ পর্যন্ত মহাদেবের বরে বলীয়ান জয়দ্রথ ব্যূহমুখে পাণ্ডবদের আটকে রাখেন এবং ভেতরে দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও কৃতবর্মা এই ছয় জন মিলে অভিমন্যুকে ঘিরে ফেলে যুগপৎ আক্রমণ করেন। বৃহদ্বল ও আরো অনেক রাজা মারা যান। শেষ অবধি দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন ও শকুনি যুগপৎ আক্রমণে এঁকে নিরস্ত্র করে ফেলেন এবং দুঃশাসনের এক ছেলে অন্য মতে দুঃশাসন মাথায় গদা মেরে এঁকে হত্যা করেন। কাশীদাসে আছে কর্ণ, দুঃশাসন, দ্রোণ, কৃপ, শকুনি, অশ্বত্থামা ও জয়দ্রথ আক্রমণ করেন। অভিমন্যুর মৃত্যুকালে উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন। উত্তরার ছেলে পরীক্ষিৎ; পরবর্তী জন্মে অভিমন্যু রাধার স্বামী আয়ান হয়ে জন্মান। দ্রঃ বর্চা। (২) দ্রঃ মনু।

অভিরথ—কর্দম বংশে একজন মুনি।

অভিরামদাস—১৭-শতকে একজন বৈষ্ণব কবি। ভাগবতের পদ্যানুবাদ করেন। গোবিন্দ-বিজয় রচয়িতা।

অভিষব—যজ্ঞ স্নান বা ব্রত স্নান।

অভিষেক—মানুষ বা দেবতাকে বিশেষ দশায় স্থাপন করা/বা বিশেষ দশায় স্থাপিত হওয়ার জন্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। দেবতা প্রতিষ্ঠা বা বিশেষ পূজা উপলক্ষ্যে দেবতার অভিষেক করা হয়। দুর্গাপূজাতে দুর্গার অভিষেক বা মহাস্নানের ব্যবস্থা আছে। অভিষেকের সময় তীর্থ সলিল, তীর্থমৃত্তিকা ও নানা দ্রব্য ব্যবহার হয় এবং বিবিধ বাদ্য বাজান হয়। রাজার অভিষেকের সময়ও অনুরূপ নানা কিছু ব্যবহার হত; সোনা রূপা, তামা ও মাটির কলসীতে নানা তীর্থ জল সুগন্ধ করে আনা হত এবং সুবর্ণখচিত শঙ্খে পুরোহিত, ও অমাত্য প্রভৃতি রাজা ও রাণীর মাথায় মন্ত্র সহকারে এই জল ছিটিয়ে দিতেন। এরপর মুকুট পরিয়ে ছত্র চামরাদি রাজচিহ্ন যুক্ত করে যথা নিয়মে রাজাকে (কখনো বা রাজা ও রাণী দুজনকেই) সিংহাসনে বসান হত। শাক্ত সাধকদের তিনটি অভিষেক আছে:-শাক্তাভিষেক, ইন্দ্রাভিষেক ও পূর্ণাভিষেক। সাধকদের অভিষেকের মূল কথা সাধনমার্গে সাধককে ক্রমশ উন্নীত করা। পূর্ণাভিষেক কৌল সাধকের অনুষ্ঠান এবং গুরুর অনুমতি সাপেক্ষ। পূর্ণাভিষেকের পর সাধকের নতুন নাম করণ হয় এবং নামের শেষে আনন্দনাথ যুক্ত হয়।

অভিষ্যন্ত—কুরুর (দ্রঃ) ছেলে।

অভ্রমু—পূর্ব দিক্‌হস্তিনী। ঐরাবতের স্ত্রী।

অমথিতকল্প—(দ্রঃ) দশবখুনি।

অমরকণ্টক—মধ্যপ্রদেশে মৈকল পাহাড়ের পূর্বচূড়া; পেণ্ড্রা রোড ষ্টেসন থেকে ৪৮ কি-মি মত দূরে। বাসে যাওয়া যায়। নর্মদা, শোণও মহানদীর উৎপত্তি এখানে। বিখ্যাত

তীর্থ। মৎস্য পুরাণে এর উল্লেখ আছে। মহাদেব ত্রিপুর দগ্ধ করলে কিছু পোড়া অংশ এসে পড়েছিল। এখানে এলে অশ্বমেধের দশগুণ পুণ্য হয়। প্রাচীন কালে বহু মন্দির ছিল। উত্তর ভারতীয় বিশুদ্ধ নাগর রীতি থেকে মধ্যযুগের মধ্যভারতীয় স্থাপত্য রীতিতে বিবর্তন এখানে দেখা দিয়েছিল। অপেক্ষাকৃত অভগ্ন চারটি মন্দির (৯-১১ শতক) থেকে এই বিচার সম্ভব। কেশবনারায়ণ ও মচ্ছেন্দ্র নাথ মন্দির দুটি এবং করণ ডাহ্‌রিয়া (ডাহ্‌লর কলচুরি বংশীয় নৃপতি কর্ণ ১০৩৪/১০৪২-১০৭৩ খৃ; কর্তৃক নির্মিত) এই তিনটি মন্দির প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে মূল্যবান। এই মন্দিরগুলি এবং নর্মদা, শোণও মহানদীর উৎপত্তিস্থল কুণ্ডটি বর্তমানে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। যে কুণ্ডটিকে আজকাল নদী তিনটির উৎস এবং যে মন্দিরগুলি যাত্রীদের দেখান হয় সেগুলি আধুনিক; কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই অবশ্য দেববিগ্রহ অনেক সময় ঐতিহাসিক বিগ্রহ। মেঘদূতের রামগিরি ও আম্রকূটকে অনেকে অধুনাতন রামগড় ও অমরকণ্টক বলে মনে করেন।

অমরকোষ—দ্রঃ-অমরসিংহ।

অমরতরু—পারিজাত, মন্দার, কল্পবৃক্ষ, সন্তান, ও হরিচন্দন।

অমরদাস—তৃতীয় শিখগুরু (১৫০৯-১৫৭৪)। গুরু অঙ্গদের পর ইনি গুরু হন এবং বাইশ বছর ঐ পদে ছিলেন।

অমরনাথ—কাশ্মীরে হিন্দু তীর্থ। পহলগাম থেকে ৪৮ কি-মি দূরে। শ্রাবণী পূর্ণিমাতে তীর্থ যাত্রী আসে। এখানে একটি নৈসর্গিক গুহায় ডলোমাইট পাথরকে আশ্রয় করে স্বয়ম্ভূ তুষার লিঙ্গ আছে। তিথি অনুযায়ী এই মূর্তির হ্রাসবৃদ্ধি হয়। ইনি অমরেশ্বর বা অমরনাথ।

৫১৮২ মি. উচ্চ তুষারাবৃত শিখরের পশ্চিমদিকে অতি মনোরম পরিবেশে গুহাটি অবস্থিত। স্থানীয় নাম কৈলাস। গুহার পশ্চিম দিকে সিন্ধু নদের ক্ষুদ্র উপনদীর নাম অমরগঙ্গা, সাদা মাটির ওপর দিয়ে প্রবাহিত। এই মাটি মাখলে পাপ নিঃশেষ হয়ে যায় বিশ্বাস। নদীর পাশ দিয়ে গুহাতে যাবার পথ। গুহার ব্যাস ১৫ মিঃ, উচ্চতা ৮ মি; গুহার দ্বার থেকে ৬-৮ মিটার ভেতরে গুহার শেষ প্রান্তে লিঙ্গমূর্তি অবস্থিত। মূর্তির উচ্চতা ৯১ সে-মি। যোনিপীঠের পরিধি ২-মি, উচ্চতা ৬১ সে-মি। যোনিপীঠের মধ্যস্থিত উঁচু হয়ে ওঠা সর্পাকৃতি তুষার পিণ্ড দ্বারা লিঙ্গমূর্তি বেষ্টিত। বিশ্বাস অমাবস্যা থেকে বাড়তে বাড়তে পূর্ণিমাতে এই মূর্তি পূর্ণ উচ্চতা লাভ করে এবং কৃষ্ণ পক্ষে ক্ষয় পেতে পেতে অমাবস্যায় নিঃশেষ হয়ে যায়। লিঙ্গমূর্তির দুদিকে দুটি তুষার স্তূপকে একটি পার্বতীর ও একটি গণেশের প্রতীক মনে করা হয়।

অমরসিংহ—বিখ্যাত অমর কোষ অভিধান প্রণেতা। উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম। ইনি জৈন না বৃদ্ধ মত ভেদ আছে।

অমরাবতী—ইন্দ্রের রাজধানী। বিশ্বকর্মা নির্মিত। সুমেরু (দ্রঃ মেরু) পর্বতের উপর। এখানে নন্দন কানন, পারিজাত বৃক্ষ, সুরভী গাভী ও অপ্সরা ইত্যাদি

আছে। নন্দন বনে মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন নামে ৫টি প্রসিদ্ধ গাছ রয়েছে। অমরাবতীর মধ্য দিয়ে অলকানন্দা নদী প্রবাহিত। এখানে শোক, তাপ, জরা, মৃত্যু কিছুই নাই।

অমরাবতী—১৬°৩০´ অক্ষ এবং ৮০°২০´ দ্রাঃ। অন্ধ্রে গুণ্টুর জেলায়; গুণ্টুর থেকে ৩৪ কি-মি দূরে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে। প্রাচীন নাম ধান্যকটক, বর্তমান ধরনি-কোট। অমরাবতীর ৮০৫ মি পশ্চিমে এই ধরনিকোটে ধান্যকটক নগরীর ধ্বংসাবশেষ ও ঢিবিগুলি চারদিকে ছড়ান রয়েছে।

৩-২ খৃ-পূর্ব থেকে খৃষ্টীয় ১৪ শতক পর্যন্ত ধান্যকটক সমৃদ্ধ বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল। এখানে মুখ্য আরাধ্য স্তূপটি (নাম মহাচৈত্য) খৃ-পূ ৩-২ শতকে তৈরি হয়েছিল। এই মহাচৈত্য ছাড়া এখানে অসংখ্য স্তূপ, মন্দির, মণ্ডপ, বাসগৃহ ছিল। ৬-১১ শতকের পাথরের ও ব্রোঞ্জের বুদ্ধ, মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রী, লোকেশ্বর, বজ্রপাণি, হেরুক প্রভৃতির বহুমূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলি তদানীন্তন শিল্প নৈপুণ্যের নিদর্শন বহন করছে। বৌদ্ধধর্ম কি ভাবে ক্রমে মহাযান ও বজ্রযানে রূপান্তরিত হয়েছিল তারও কিছু সাক্ষ্য এখানে পাওয়া যায়। ১১০০ খৃষ্টাব্দের একটি স্থানীয় স্তম্ভ লেখে পল্লব বংশীয় রাজা সিংহবর্মা একটি বুদ্ধ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উল্লেখ আছে। স্থানীয় অমরেশ্বর মন্দিরে একটি স্তম্ভে (১১৮২ খৃঃ) একটি লেখতে আছে ধান্যকটকের রাজা অমরেশ্বরের উপাসক হইয়াও বুদ্ধের উদ্দেশ্যে তিনটি গ্রাম দান করেন ও দুটি অনির্বাণ দীপ উৎসর্গ করেন। সিংহলের কাণ্ডি জেলার গদল-দেনীয় শিলালেখ থেকে জানা যায় খৃষ্টীয় চৌদ্দ শতকে বৌদ্ধ জগতে অমরাবতীর সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল। শিল্পে অমরাবতী সত্যই অমরাবতী ছিল। এর কিছুকাল পরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব অপসৃত হয় এবং অমরেশ্বরের মহিমা ছড়াতে থাকে এবং অমরেশ্বরের নাম থেকে নাম অমরাবতী।

অমরাবতী অন্ধ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তূপ এবং সাঁচীর স্তূপের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর ছিল। কিন্তু উপস্থিত প্রায় কিছুই নাই। এই ধ্বংসের কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক হঠকারী খনন কার্য এবং দ্বিতীয় হচ্ছে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে জমিদার ও স্থানীয় জন সাধারণ কর্তৃক ক্রমাগত চুরি। এই সময়ে অজস্র অমূল্য ভাস্করসমৃদ্ধ প্রস্তর ফলক এমন কি পুড়িয়ে চুন তৈরি করা হয়েছে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের পর থেকে এখানকার অবশিষ্ট প্রস্তরফলক মূর্তি ইত্যাদি যা কিছু পাওয়া গেছে ভারতের, প্যারির ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। অমরাবতী এখন ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীন। অমরাবতীতেও একটি সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে।

অমরু—অমরু শতক নামে সংস্কৃত শ্লোকগুলির রচয়িতা। কোন সময়ের লোক স্পষ্ট নয়। খৃষ্টীয় নবম শতকে বামনের কাব্যালঙ্কারে অমরু শতকের তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। আনন্দবর্দ্ধনও নবম শতকের মাঝখানে অমরুর নাম উল্লেখ করেছেন। অনেকের মতে ইনি ভর্তৃহরির পরবর্তী। অমরু শতকের বর্তমানে চারটি সংস্করণ :—দক্ষিণ ভারতীয়, পশ্চিম ভারতীয়, বঙ্গ ও মিশ্র। এই চার সংস্করণ

মিলিয়ে মোট শ্লোক সংখ্যা ১১৫ মত এবং, এগুলির একান্নটি সব সংস্করণেই আছে। ঊনিশটি টীকা আছে। প্রাকৃতে সত্তসই নামক বইটির মত। জীবন ও প্রেমের বিভিন্ন অবস্থায় নারীর বর্ণনা এই সব শ্লোকে। ভাষা সরস ও সুখপাঠ্য। শ্লোকগুলি এক একটি শব্দময় চিত্র।

অমা—চাঁদের ষোড়শ কলা। নিত্য ক্ষয় বৃদ্ধি রহিত প্রধান কলা। এই কলা অন্য কলাগুলির আধার শক্তিরূপা। অন্য কলাগুলিকে মালার মত গেঁথে রেখেছে।

অমাত্য—ঋক্‌বেদে, পাণিনি ও বৌধায়নের পিতৃমেধসূত্রে অমাত্য অর্থে নিকটবর্তী মানুষ; মন্ত্রী নয়। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে অমাত্য শব্দ মন্ত্রীরূপে ব্যবহৃত। অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে শব্দটি মন্ত্রী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অমাত্য ও মন্ত্রী অধুনা একার্থ-বোধক। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে উচ্চশ্রেণীর রাজকর্মচারীরা অমাত্য; এবং অনেক সময় অমাত্যদের মধ্যে থেকে মন্ত্রী নির্বাচিত হত। মন্ত্রীর সংখ্যা ৩-৪ থেকে ১০-১২ হত। রাজা মন্ত্রীদের পরামর্শে কাজ করতেন।

মনুতে (৭।৫৪) আছে সাত আটজন অমাত্য নিয়ে মন্ত্রী পরিষৎ তৈরি হত। অর্থাৎ অমাত্যরাই মন্ত্রী। সাতবাহন ও পল্লবদের রাজ্যে অমাত্যরা ছিলেন নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী ও প্রান্তীয় শাসনকর্তা। রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালিপিতে আছে অমাত্য ধীসচিব নন; কর্মসচিব মাত্র। গুপ্তযুগে বিভিন্ন শ্রেণীর অমাত্য ছিল। রাজপরিবারের লোক না হয়েও হরিষেণ ও পৃথ্বীসেন কুমারামাত্য ছিলেন এবং যথাক্রমে সন্ধিবিগ্রহিক ও মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কৌটিল্য অনুসারে বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে অমাত্য ও মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করা হত। মহাভারতে আছে অমাত্য কুলশীলসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, বলশালী, মান্য, বিদ্বান, নিরহংকার এবং কার্যাকার্যবিবেককুশলী হবেন। ভরদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পরাশর, পিশুন, কৌণপদন্ত, বাতব্যাধি, বহুদন্তীপুত্র ইত্যাদি শাস্ত্রকারদের মতে যাঁরা রাজার সহপাঠী, রাজার মত গুণযুক্ত, বিপদে রাজার জন্য প্রাণ দিতে পারেন, যাঁরা রাজ্যের আয় বাড়াতে পারেন এবং কুলানুক্রমে যাঁরা রাজভক্ত তাঁরাই অমাত্য হবার যোগ্য।

সোমদেব আত্মীয়দের অমাত্য পদে নিতে বারণ করেছিলেন। কৌটিল্য মতে দেশ, কাল ও কর্মের প্রকৃতি ও পুরুষার্থ বিবেচনা করে অমাত্য নেওয়া উচিত। সোমদেবসূরির মতে ব্রাহ্মণরা কৃপণ; এবং ক্ষত্রিয়েরা অভিযুক্ত হলেই খড়্গ বার করেন। সুতরাং বৈশ্যরাই অমাত্য হবার উপযুক্ত। কৌটিল্যের আগে উপধা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই অমাত্য নিয়োগ করা হত। এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে খনি, হস্তিবন ও রাজকীয় কর্মশালায় কাজ দেওয়া হত। পরবর্তী যুগে কামন্দকীয় নীতিসার ইত্যাদিতে অমাত্যদের পরীক্ষার উল্লেখ আছে।

অমাত্যদের কাজ ছিল দেশে আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, হিসাব-ব্যবস্থা, দেশের উন্নতি, সেনা সমস্যা, পররাষ্ট্র সম্পর্ক ইত্যাদি।

অমাবসু—পুরূরবা উর্বশীর এক ছেলে।

অমিতাভ—পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের মধ্যে প্রাচীনতম। সুখাবতী স্বর্গে শান্তচিত্তে ধ্যানমগ্ন হয়ে অবস্থান করেন। সৃষ্টির দায়িত্ব রয়েছে অমিতাভ থেকে উদ্ভূত বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের ওপর। অমিতাভের বাহন এক জোড়া ময়ূর এবং চিহ্ন পদ্ম। ইনি রক্তবর্ণ, সমাধি মুদ্রাধর, সংজ্ঞাস্কন্ধ-স্বভাব এবং পদ্মকুলী। ইহার প্রজ্ঞা পাণ্ডরা। সুখাবতীব্যূহ নামে মহাযানী গ্রন্থে এঁর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তিব্বত ও চীনে অমিতাভের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। জাপানে অমিতাভের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। অমিতাভের নামে একটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আছে। চীন, তিব্বত ও ভারতে অমিতাভের বহু মূর্তি পাওয়া গেছে।

অমিতৌজা—ক্ষত্রিয় রাজা। রাক্ষস অংশে জন্ম। পাঞ্চাল আগত। পাণ্ডব পক্ষে ছিলেন।

অমিত্রজিৎ—এঁর দেশে বহু শিব মন্দির ছিল। নারদ এঁকে জানান চম্পকাবতী নগরীর গন্ধর্ব কুমারী মাল্য-গন্ধিনীকে রাক্ষস কঙ্কালকেতু হরণ করেছে। অমিত্র-জিৎ রাক্ষসকে নিহত করে মাল্যগন্ধিনীকে বিয়ে করেন।

অমূর্তরয়—রাজা গয়ের পিতা। পুরুর কাছ থেকে তরবারি লাভ করেছিলেন।

অমৃত—(১) সুধা। এই পান করে দেবতারা অমর। সোমরসকেও অমৃত বলা হয়। জিনিসটি কি স্পষ্ট কোথাও বলা নাই। দ্রঃ সমুদ্র মন্থন। (২) অর্থ। ঋত (মাঠ থেকে ও আঙুলে করে কুড়িয়ে পাওয়া শস্য), অমৃত (ভিক্ষায় অযাচিত লব্ধ), মৃত (ভিক্ষায় লব্ধ), প্রমৃত (কৃষি লব্ধ), সত্যামৃত (ব্যবসায় লব্ধ)—এই পাঁচ প্রকার অর্থ।

অমৃতা—(১) প্লক্ষ দ্বীপে প্রবাহিত নদী। এই নদীর জল যে পান করে সে সব সময় সন্তুষ্ট থাকে। (২) আনন্দা, মধ্যা, ভূতনা ও পূতনা এই চারটি জলবাহিনী সূর্যরশ্মি। (৩) যতিদের মতে পরমেশ্বরের ধ্যান কালে অনুভূত অসাধ্য সাধনে সমর্থ সর্বাঙ্গে সঞ্চারী অনির্বচনীয় পদার্থ। ভক্তিমার্গীদের মতে ভক্তিতে সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলে যে আনন্দ মদিরাতে ভক্ত বাহ্জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। যোগীদের মতে সহস্রার পদ্ম নিঃসৃত অপূর্ব আনন্দ রস; সমস্ত সন্তাপ নাশক, ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারক ও সর্বসুখ দাতা। (৪) চন্দ্রের প্রথমকলা।

অমৃতা—মগধরাজ কন্যা। অনশ্বের স্ত্রী। পরীক্ষিতের মা।

অমোঘবর্ষ—দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশের তিনজন রাজার উপাধি। রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় গোবিন্দের ছেলে। প্রথম অমোঘবর্ষই সমধিক প্রসিদ্ধ (আনু ৮১৪-৮৭৮ খৃ) ইনি বেঙ্গীর চালুক্য, মহীশূরের গঙ্গ, গুজরাটের রাষ্ট্রকূট শাখা এবং বাঙলার পালরাজ-গণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। প্রথম অমোঘবর্ষ শান্তিপ্রিয়, ও ধর্ম ও সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন। কবিরাজ-মার্গ নামে কানাড়ি ভাষায় অলঙ্কারের একটি বই লিখেছিলেন। এঁর সভায় বহু সাহিত্যিক ছিল। শেষ জীবনে জৈনধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। হিন্দু ও জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক। একবার প্রজাদের আসন্ন বিপদে দেবী মহালক্ষ্মীর কাছে নিজের আঙুল কেটে উৎসর্গ করেন কথিত আছে।

অমোঘা—(১) মহর্ষি শান্তনুর স্ত্রী। ব্রহ্মা ভ্রমণে এসে শান্তনুর আশ্রমে অমোঘার রূপে মুগ্ধ হয়ে শান্তনুর অনুপস্থিতির সুযোগে সঙ্গম প্রর্থনা করেন। অমোঘা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ব্রহ্মা আশ্রমে বীর্যপাত করে পালিয়ে যান। শান্তনু ফিরে এসে সব শুনে স্ত্রীর ওপরই অসন্তুষ্ট হন। এদিকে তেজ প্রভাবে অমোঘার গর্ভ সঞ্চার হয়। অন্য মতে আশ্রমে ফিরে এসে শান্তনু হংসপদ চিহ্ন দেখে সন্দিগ্ধ হন। এবং সব জেনে স্ত্রীকে বলেন লোকহিতের জন্য এই বীর্য তাঁকে পান করতে হবে। স্ত্রীর অনুরোধে শান্তনু নিজে এই বীর্য পান করেন, স্ত্রীকে প্রসাদ দেন, অন্যমতে রমণ করেন এবং অমোঘা গর্ভবতী হন। একটি মতে দৈবী গর্ভ ধারণ করতে না পেরে যুগন্ধর পাহাড়ে গর্ভ ত্যাগ করেন। স্থানটি লোহিত নামে প্রসিদ্ধ হয়।

অন্যমতে কালক্রমে জলময় একটি পুত্র হয়। অন্যমতে জলরাশির জন্ম হয় এবং এই জলের মধ্যে শিশুমার বাহন, ব্রহ্মার সমান রক্ত গৌর রঙ একটি শিশু ছিল। শান্তনু এই জলকে একটি কুণ্ডের মধ্যে রেখে দেন। জল ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ব্রহ্মপুত্র নদে পরিণত হয় (কালিকা)। অন্য মতে অমোঘার সন্তান ব্রহ্মপুত্র রূপ জলরাশিকে শান্তনু উত্তরে কৈলাস দক্ষিণে গন্ধমাদন পশ্চিমে জারুধি ও পূর্বে সংবর্ত এই চারটি পাহাড়ের মাঝখানে স্থাপন করেন। এই জলরূপ পুত্র ক্রমশ বড় হতে থাকেন। পরশুরাম এখানে স্নান করে শাপমুক্ত হয়ে সকলের মঙ্গলের জন্য পরশু দিয়ে পথ কেটে নিকটে লোহিত সাগরে প্রবাহিত করে দেন। পরে আবার পূব দিকে পথ কেটে ব্রহ্মপুত্র নদকে পূবদিকে প্রবাহিত করেন। (২) তাড়কা বধের সময় বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে অমোঘা ও বিজয়া দুটি মন্ত্র দিয়েছিলেন। (দ্রঃ) অতিবল।

অম্বট্‌ঠ—আচার্য পোক্ খরসাদির শিষ্য। বুদ্ধ ঘোষের সঙ্গে জাতিভেদ নিয়ে এঁর আলোচনা হয়েছিল। বুদ্ধদেবের জীবিত কালে ইনি তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন কিনা কোন বইতে নাই। সুর অম্বট্‌ঠ নামে আর একটি নাম পিটকে আছে; ইনি একজন বুদ্ধভক্ত। আরো কয়েক জন অম্বট্‌ঠ বংশীয়ের নাম পিটক ইত্যাদিতে রয়েছে।

অম্বপালী—আম্রপালী। বৈশালী রাজোদ্যানে এঁর জন্ম এবং উদ্যানপালকের কাছে পালিতা। আম্র উদ্যানের পালক দ্বারা পালিতা বলে এই নাম। অপরূপ সুন্দরী। বিভিন্ন দেশের রাজকুমাররা তাঁকে বিয়ে করতে চান। কিন্তু দেশের নিয়ম অনুসারে শেষ পর্যন্ত তাঁকে সকলের চিত্তবিনোদনের জন্য নর্তকী হতে হয়। বৈশালীর বাগানে বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা হয় এবং ধর্ম ও উপদেশ লাভ করেন। বুদ্ধদেব একবার লিচ্ছবি রাজের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে এঁর গৃহে অন্নগ্রহণ করেছিলেন। ভিক্ষু সংঘকে ইনি একটি বিহার দান করেছিলেন এবং নিজের ছেলেকে তথাগতের বাণী প্রচার করতে দেখে অম্বপালী সংসার ত্যাগ করেন। শেষ পর্যন্ত অর্হত্ব লাভ করেছিলেন। পালি থেরীগাথায় এঁর করুণ কাহিনী ও অকপট আত্মনিবেদন লিখিত আছে।

অম্বর—রাজস্থানের জয়পুর জেলার একটি মহকুমা ও মিউনিসিপ্যাল সহর। জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। জয়পুর রেল স্টেসন থেকে ১০-১১ কি-মি. উত্তরপূর্বে। একটি মতে মহাদেব অম্বিকেশ্বর নাম থেকে নাম। অন্য মতে অযোধ্যা

অধিপতি অম্বরীষের নাম থেকে। অম্বরপুরের অপর নাম অমরপুর। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে কচ্ছবাহ রাজপুতরা এই রাজ্যের খানিকটা দখল করেন এবং সুসাবৎ মিনা-দের প্রধানের কাছ থেকে অম্বর কেড়ে নেন

অম্বরনাথ—মহারাষ্ট্রে থানা জেলার মিউনিসিপ্যাল সহর। বোম্বাই থেকে ৬১ কি-মি. দূরে অম্বরনাথ রেলস্টেসন। সহরের পূর্বপ্রান্তে পাথরের একটি মন্দির গাত্রে লেখ থেকে জানা যায় ১০৬০ খৃষ্টাব্দে চিত্তরাজাদেবপুত্র মম্বানীরাজ এই শিব মন্দির তৈরি করেন। মম্বানীরাজ কল্যাণের চালুক্যদের কোঙ্কন মণ্ডলের মহামণ্ডলেশ্বর। অজন্টা এলূরুর শেষ যুগের স্থাপত্য রীতি অনুসারে নির্মিত। দাক্ষিণাত্য শিখররীতি ও চালুক্যরীতিও মিশে রয়েছে। দেওয়ালের ছবিগুলি ম্লান হয়ে পড়েছে। আকারে বড় এবং অতি অলংকৃত এই মন্দিরটি পশ্চিম ভারতের চালুক্যরীতির মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মাঘমাসে শিবরাত্রির মেলাতে প্রচুর ভিড় হয়।

অম্বরীষ—(১) সূর্যবংশে নাভাগের ছেলে। বিষ্ণুভক্ত। বিষ্ণু অম্বরীষকে সুদর্শন চক্র দান করেছিলেন। একবার রাজা বর্ষব্যাপী একাদশী ব্রতউদ্‌যাপন করে তিন দিন উপবাসী থেকে দ্বাদশীতে পারণে বসবেন এমন সময় দুর্বাসা আসেন।

দুর্বাসা তারপর কালিন্দীতে স্নান ও প্রাতঃকৃত্য করতে যান। কিন্তু ফিরছেন না দেখে, মতান্তরে দুর্বাসা ইচ্ছা করে দেরি করতে থাকলে এদিকে পারণের সময় পার হয়ে যায় দেখে ব্রাহ্মণদের খাইয়ে এবং অনুমতি নিয়ে রাজা খেতে বসে সবে মাত্র বিষ্ণু পাদোদক পান করেছেন, অন্য মতে রাজা খেতে বসেন নি অপেক্ষা করছিলেন এমন সময় দুর্বাসা ফিরে এসে অবশিষ্ট অন্ন পড়ে আছে দেখে বা রাজাকে ভোজন পাত্রের সামনে দেখে রাগে জটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলেন। সেই জটা প্রকাণ্ড উগ্রদেবতাতে অন্য মতে কৃত্যাতে পরিণত হয়ে রাজাকে হত্যা করতে গেলে সুদর্শন চক্র তাকে ভস্মীভূত করে বা গলা কেটে ফেলে দুর্বাসাকে বধ করতে ছোটে। দুর্বাসা ক্রমান্বয়ে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব, ইত্যাদি কারো কাছে আশ্রয় না পেয়ে বিষ্ণুর কাছে আসেন, বিষ্ণু অম্বরীষের শরণাপন্ন হতে বলেন। অন্য মতে বিষ্ণু অম্বরীষের কাছে ক্ষমা চাইতে বলেন। দুর্বাসা রাজার আশ্রয় নিয়ে নিষ্কৃতি পান। অম্বরীষ দুর্বাসাকে একাদশী মাহাত্ম্যও শোনান। পরে ছেলেদের রাজ্য দিয়ে রাজা বনে তপস্যা করতে চলে যান। অগস্ত্যের পদ্মফুল চুরি করার দলেও ছিলেন। একজন পুণ্যশ্লোক রাজা (দ্রঃ)। দ্রঃ শুনঃশেফ, ইন্দ্র। (২) ইন্দুমতীর গর্ভে মান্ধাতার ছেলে। (৩) শুশ্রুকের ছেলে। (৪) পুলহ নামে ব্রহ্মর্ষির পুত্র। (৫) নরক বিশেষ।

অম্বষ্ঠ—ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জন্ম (স্মৃতি)। অনুলোমজ। ব্রাহ্মণের একান্তর পুত্র; অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয় বাদ দিয়ে বিবাহ। বৈশ্যদের চেয় অম্বষ্ঠ উচ্চবর্ণ। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য দুজনেই দ্বিজ বলে এরাও দ্বিজ তুল্য ও দ্বিজধর্মা। এঁদের উপনয়ন হয়; বৃত্তি চিকিৎসকতা। (২) অম্বষ্ঠ দেশের রাজা শ্রুতায়ু। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের হাতে মারা যান। (৩) পাণ্ডবদের পক্ষে একজন অম্বষ্ঠ ছিলেন, চেদি রাজের হাতে মারা যান। (৪) মনে হয় উত্তর সিন্ধু দেশ।

অম্বা—কাশী রাজ হিরণ্যবর্ণের বড় মেয়ে। মা কৌশল্যা। আরো দুই বোন, মেজো অম্বিকা ও ছোট অম্বালিকা। বিচিত্রবীর্যের বিয়ের জন্য ভীষ্ম এঁদের স্বয়ংবর সভা থেকে কেড়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু অম্বা জানান শাল্বকে তিনি পতিত্বে বরণ করেছেন। ফলে ভীষ্ম শাল্বরাজের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু অম্বাকে শাল্ব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ভীষ্মকে বিয়ে করতে চান কিন্তু ভীষ্ম রাজি হন না। অম্বা তখন ভীষ্মকে রাজি করার জন্য এবং রাজি না হলে শাস্তি দেবার জন্য নানা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে মাতামহ হোত্রবাহনের পরামর্শে ভীষ্মের বাল্য গুরু পরশুরামের শরণাপন্ন হন। অকৃতব্রণ (দ্রঃ) ও এই মাতামহ সব কিছু জানালে পরশুরাম ভীষ্মকে অনুরোধ করেন এবং যুদ্ধও হয়। কিন্তু কোন লাভ হয় না। তখন ভীষ্মকে হত্যা করার মানসে অম্বা যমুনা তীরে কঠিন তপস্যায় রত হন এবং নানা তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে গঙ্গার সম্মুখে এসে একদিন উপস্থিত হলেন। গঙ্গাতে স্নান করার পর ভীষ্ম জননী গঙ্গাদেবী তাঁর তপস্যার কারণ জেনে বুঝিয়ে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন। এবং শেষ পর্যন্ত বৎসা দেশে প্রবাহিত অম্বা নদীতে পরিণত হবার শাপ দেন। অম্বা এরপর মহাদেবের তপস্যা করে বর পান প্রথমে নারী হয়ে দ্রুপদের ঘরে জন্মাবেন; পরে পুরুষে পরিণত হবেন এবং যোদ্ধা হিসাবে অম্বা ভীষ্মকে নিহত করবেন এবং পূর্ব জন্মের সমস্ত ঘটনা অম্বার তখন মনে থাকবে। বর পেয়ে অম্বা যমুনাতীরে চিতায় দেহত্যাগ করেন ও দ্রুপদের মেয়ে হয়ে জন্মান। ইনিই শিখণ্ডী।

অম্বালিকা—অম্বার (দ্রঃ) ছোট বোন। বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী। সত্যবতীর নির্দেশে ব্যাস অম্বিকার (দ্রঃ) সন্তান উৎপাদন করেন। কিন্তু অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র জন্মালে সত্যবতী ব্যাসকে অম্বালিকার সন্তান উৎপাদনে নির্দেশ দেন। ব্যাসকে দেখে অম্বালিকা ভয়ে পাণ্ডু বর্ণ হয়ে যান; ফলে পাণ্ডুর জন্ম।

অম্বিকা—(১) অম্বার (দ্রঃ) পরে জন্ম। বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী। বিয়ের সাত বছর পরে যক্ষারোগে নিঃসন্তান বিচিত্রবীর্য মারা গেলে শাশুড়ি সত্যবতী ভীষ্মকে নির্দেশ দেন অম্বিকার গর্ভ উৎপাদন করতে। ভীষ্ম প্রত্যাখ্যান করলে ব্যাসকে নির্দেশ দেন। অম্বিকা ব্যাসকে পছন্দ করেন নি; বা ভয়ে চোখ বুজিয়ে ছিলেন ফলে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হয়। অম্বালিকার (দ্রঃ) সন্তান হবার পর সত্যবতী অম্বিকাকে আবার ব্যাসের কাছে পাঠান। কিন্তু অম্বিকা নিজে না গিয়ে পরিচারিকাকে নিজের মত সাজিয়ে ব্যাসের কাছে পাঠান; এই পরিচারিকার ছেলে বিদুর। শেষ জীবনে অম্বিকা ও অম্বালিকা তপস্বিনীর মত কাটাতেন।

অম্বুবাচী—মৃগশিরার শেষার্দ্ধ, আর্দ্রার পাদ চতুষ্টয় ও পুনর্বসুর পাদত্রয় মিথুন রাশির অন্তর্গত। সূর্য মৃগশিরা ভোগ করে আর্দ্রার প্রথমপাদ ভোগার্থে গমন করলে পৃথিবী ঋতুমতী হন। আষাঢ়ে কৃষ্ণপক্ষের সূর্য যখন আর্দ্রার প্রথম পাদ ভোগ করেন সেই সময় অর্থাৎ তিন দিন কুড়িদণ্ড মত সময় কাল। এই সময় কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম স্বাধ্যায়, দেবপিতৃতর্পণ, হলবাহন ইত্যাদি নিষিদ্ধ। যতি, ব্রতী, বিধবা ও দ্বিজ এই সময় পাক করে ভক্ষণ করেন না। বিধবারা এই নিয়ম ব্যাপক ভাবে পালন করেন।

চাষীরাও এই সময়ে কাজ বন্ধ রাখে। কোথাও কোথাও কিছু আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। উড়িষ্যায় এর নাম রজ; জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি থেকে ২-য় আষাঢ় পর্যন্ত এবং বেশ বড় উৎসব হয়।

অম্ভোরুহ—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে।

অয়ন—গতিপথ। সূর্যের উত্তর দিকে গতি উত্তরায়ণ (মাঘ থেকে আষাঢ়) এবং দক্ষিণ দিকে গতি দক্ষিণায়ন (শ্রাবণ থেকে পৌষ)। বিষুব বৃত্তের সঙ্গে (কল্পিত) রবিমার্গ ২৩°২৭´ মিনিট পরিমিত কোন উৎপন্ন করেছে। ২২-ডিসেম্বরে পরম দ-দিক থেকে সূর্য উত্তরাভিমুখী হয়; ২১ মার্চ বিষুববৃত্ত অতিক্রম করে ২১ জুন পরম উত্তর দিকে গিযে পৌছায়। ২১ জুন থেকে দক্ষিণ মুখে যাত্রা সুরু হয় এবং ২৩ সেপ্টেম্বর পুনরায় বিষুববৃত্ত পার হয়ে পরম দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। ২২শে ডিসেম্বর পরম দক্ষিণ স্থান পেয়ে থাকে। ২২ ডিসেম্বর থেকে ২১শে জুন উত্তরায়ণ। ২১ জুন থেকে ২২ ডিসেম্বর দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণ দেবতাদের দিন; দক্ষিণায়ন রাত। ২২ ডিসেম্বর উত্তরায়ণ দিবস, ২১ জুন দক্ষিণাযন দিবস; এই দুটি অয়নান্ত বিন্দু। সম্পাৎ বা ক্রান্তিপাত বিন্দু অর্থাৎ রবিমার্গ ও খগোল বিষুব বৃত্তের পরস্পর ছেদ বিন্দু দুটির একটি বাসন্ত ক্রান্তিপাত বা মহাবিষুব, ২১ মার্চ। অপরটি শারদ ক্রান্তিপাত বা জলবিষুব ২৩ সেপ্টেম্বর।

এই ছেদ-বিন্দু বা ক্রান্তিপাত আকাশে নক্ষত্র মণ্ডলীর মধ্যে স্থির নয়, বছরে প্রায় ৫০ বিকলা (সেকণ্ড) করে পেছন দিকে সরে যাচ্ছে। এবং এই ক্রান্তি বিন্দু এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে ২৬০০০ বছরে একটি সম্পূর্ণ চক্র আবর্তন করে। ক্রান্তিপাত বিন্দুদ্বয়ের চলনকে ভাস্কর পণ্ডিত সম্পাৎ-চলন নাম দিয়েছিলেন। গণিত-জ্যোতিষের ও ফলিত জ্যোতিষের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বৈদিক সাহিত্যে বহু জায়গায় এই অয়ন বিন্দু বা সম্পাৎ-বিন্দুর অবস্থান দেওযা আছে। ফলে অয়ন চলনের হার জানা থাকার জন্য এই সব সাহিত্যের কাল কতকটা হিসাব করা সম্ভব।

অয়নান্ত বিন্দুদ্বয় এবং সম্পাৎ বিন্দুদ্বয় ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে অতি প্রাচীন কাল থেকেই সুপরিচিত। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের রচনাকালে ১৩৫০ খৃ-পূর্বে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের আদিতে উত্তরায়ণ হত এবং অশ্লেষা নক্ষত্রের মাঝখানে দক্ষিণায়ন হত। এই জন্য সেই সময় ধনিষ্ঠা নক্ষত্রই চক্রের প্রথম নক্ষত্র ছিল। মহাভারত রচনাকালে নক্ষত্র চক্রের প্রথম নক্ষত্র হয় শ্রবণা। এক নক্ষত্র বা ১৩°২০´ অয়ন চলন হতে প্রায় ৯৬০ বছর লাগে। সুতরাং বেদাঙ্গ জ্যোতিষের ৯৬০ বছর মত পরে মহাভারতের রচনা। বরাহমিহির ৫৫০ খৃষ্টাব্দে বলেছিলেন প্রাচীনকালে অশ্লেষার মাঝখানে দক্ষিণায়ন হত কিন্তু তাঁর সময়ে পুনর্বসুতে হচ্ছে। পরে বিষ্ণুচন্দ্র (৫৭৮ খৃ), শ্রীষেণ, মুঞ্জালভট্ট (৯৩২ খৃ) ও ভাস্করাচার্য (১১৫০ খৃ) এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছিলেন। ভাস্করাচার্যের নিরূপিত বার্ষিক গতিবেগে এক বিকলার ও কম ভুল দেখা যায়।

বাসন্ত ক্রান্তিপাত বিন্দুকে আদি বিন্দু ধরে যে গণনা হয় তাকে সায়ন

গণনা এবং আকাশের যে কোন তারকাকে স্থির আদিবিন্দু ধরে গণনাকে নিরয়ণ গণনা বলা হয়। দুটি সম্পাৎবিন্দু ও দুটি অয়নান্ত বিন্দু চারটি বিন্দুই আলাদা এবং চারটি বিন্দুই রবিমার্গের ওপর অবস্থিত। এই যে কোন বিন্দু থেকে বৎসর গণনা করলে বর্ষমান হয় ৩৬৫'২৪২২ দিন। কিন্তু নিরয়ণ বর্ষমান ৩৬৫ ২৫৬৩৬ দিন। নিরয়ণ গণনা অয়ন পথকে বাদ দিয়ে। সায়ন গণনায় ঋতু সমূহ স্থির, তারকাগুলি পরিবর্তনশীল। পাশ্চাত্য ফলিত জ্যোতিষ সায়ন ভিত্তিক। কিন্তু ভারতীয় জ্যোতিষ মূলত নিরয়ণ ভিত্তিক; এই জন্য ভারতীয় জ্যোতিষে ক্রান্তিপাত বিন্দু ভারতীয় জ্যোতিষের আদি বিন্দু থেকে ক্রমশ পেছিয়ে যাচ্ছে। এই অপসরণের পরিমাণ অয়নাংশ। অর্থাৎ ভারতীয় আদিবিন্দু ও ক্রান্তিপাত বিন্দুর মধ্যকার দূরত্বকে অয়নাংশ বলা হয়। আর্যভট্ট (৪৯৯ খৃ), ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খৃ) মনে করেছিলেন তাঁরা সায়ন গণনাই স্থাপিত করে গেলেন। কিন্তু সায়ন নিরয়ণের পার্থক্য তাঁদের জানা ছিল না। এরপর ভারতীয় জ্যোতিষ অয়নাংশ উল্লেখ করে সায়ন ও নিরয়ণ গণনার মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। সূর্যসিদ্ধান্ত এরপর অয়নদোলন মতবাদ সৃষ্টি করেন। অয়ন দোলন অর্থে ক্রান্তিপাত বিন্দু দুলছে অর্থাৎ পেছিয়ে যাচ্ছে আবার এগিয়ে আসছে এবং এই দোলনের সীমা ২৪ বা কোন মতে ২৭°। অয়নদোলন মতবাদ সূর্যসিদ্ধান্তে ছিল না, পরে যোজনা। অয়ন দোলন মতবাদ বিজ্ঞানভিত্তিক নয়।

আদি বিন্দুর স্থান ঠিক নির্ধারিত করতে গিয়ে অনেকে রেবতী নক্ষত্রকে ভচক্রের প্রথম বিন্দু কল্পনা করে পঞ্জিকা সংশোধন করেছিলেন। রৈবতপক্ষ অনুসারে অয়ন গতি ৫০ বিকলা; বর্তমানে অয়নাংশ ১৯°৩৩´ এবং শূন্যায়নাংশ বর্ষ অর্থাৎ ক্রান্তিপাত বিন্দু ও আদি বিন্দুর মিলন বর্ষ ৫৬০ খৃ। রৈবত-পক্ষ হিসাব প্রতিষ্ঠা পায়নি। চৈত্রপক্ষ হিসাব বর্তমান ভারতে চালু রয়েছে। এই হিসাবে চিত্রা নক্ষত্রের ১৮০° অন্তরে ভচক্রের আদিবিন্দু কল্পনা করা হয়। এই গণনায় ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে ১৪ এপ্রিল অয়নাংশ ২৩´২১´২৯´´ এবং বার্ষিক অয়নগতি ৫০ , বিকলা (সেকেণ্ড)। শূন্য অয়নাংশ বর্ষ ২৮৫ খৃ।

অয়োগব—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত সন্তান।

অয়োবাহু—অয়োভুজ। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে নিহত।

অয়োমুখী—সীতা অন্বেষণের সময় মতঙ্গ আশ্রমে আসবার পথে এই রাক্ষসীর সঙ্গে রাম লক্ষ্মণের দেখা হয়। লক্ষ্মণকে বিয়ে করতে চান। এঁর নাক ও স্তন কেটে লক্ষ্মণ এঁকে বিতাড়িত করেন।

অযাতি—নহুষের (দ্রঃ) ছেলে; যযাতির ভাই।

অযুতনায়ী—চন্দ্রবংশের রাজা মহাভৌমের ছেলে। মা সুযজ্ঞা; স্ত্রী ভাসা, এবং ছেলে অক্রোধ। অযুত সংখ্যক পুরুষ-মেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

অযোধ্যা—সরযূ নদী তীরে কোশলের রাজধানী। সূর্যবংশীয় রাজাদের রাজধানী। প্রাচীন অযোধ্যা ৪৮ ক্রোশ লম্বা ও ৮ ক্রোশ চওড়া। মোক্ষদায়িকা সপ্তপুরীর

একটি। সুদৃঢ় প্রাচীর ও জলদুর্গ বেষ্টিত, শত্রু-মিত্র উভয়েরই দুরধিগম্য। হস্তী, অশ্ব, সহস্রপতাকাধারী তুরগসৈন্য পূর্ণ সুদৃঢ় নগরী কেউ জয় করতে পারত না বলে নাম অযোধ্যা। অপর নাম বিনীতা, সাকেতপত্তন, বিশাখ, অযুতো, অযুদো (হিউএন্), বাগদ, ভাগদ (তিব্বতী)।

উত্তর প্রদেশে ফৈজাবাদ জেলার ফৈজাবাদ-অযোধ্যা মিউনিসিপ্যাল সহরের অংশ। অযোধ্যা সহর ও এর পূর্বাঞ্চলের, উত্তর প্রদেশস্থিত, বিস্তৃত অংশ সাধারণত প্রাচীন অযোধ্যা এলাকা বলে পরিচিত। ২৬°৪৮´ উ-অক্ষাংশ ও ৮২°১৪´ পূর্ব-দ্রাঘিমা। অযোধ্যা রেল ষ্টেসন থেকে প্রায় ২ কি-মি দক্ষিণে। লখ-নৌ-গোরখপুর জাতীয়-জনপথের ওপর অবস্থিত। এই পথ অযোধ্যাকে ফৈজাবাদের সঙ্গে যুক্ত করেছে। অযোধ্যার পাশ দিয়ে ঘর্ঘরা (সরযূ) নদী প্রবাহিত।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, অথর্ববেদ, রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণে এর উল্লেখ আছে। এখানে রামসীতার বহু মন্দির আছে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে 'জনম-স্থানে' রাম জন্মেছিলেন ; এবং বর্তমানে এখানে রামসীতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। রামচন্দ্র যেখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন সেই স্থানটির নাম ত্রেতাক-ঠাকুর ; এখানকার বর্তমান মন্দিরটির নাম কালে-রাম-কা-মন্দির। কুলুর রাজা তিন শতক আগে এটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। অহল্যাবাঈ ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটির অনেক উন্নতি সাধন করেন। কালো পাথরের যে প্রাচীন মূর্তিগুলি ঔরংজেব নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন সেগুলি তুলে এনে আবার মন্দিরে স্থাপন করা হয়।

অযোধ্যা রাজ্যকে কোশল রাজ্যও বলা হত। অযোধ্যা থেকে পরে সাকেতে ও তারপরে শ্রাবস্তীতে কোশলের রাজধানী হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যে অযোধ্যা একটি প্রধান ও সমৃদ্ধ নগরী। হিউ-এন্-ৎসাঙ্-এর সময় অযোধ্যায় বৌদ্ধধর্ম অতি প্রবল ছিল। এই সময় এখানে ১০০টি বৌদ্ধ মঠে তিন হাজারেরও বেশি মহাযানী ও হীনযানী ভিক্ষু ছিলেন। হিউএন্-ৎসাঙ্ লিখে গেছেন এখানকার জন সাধারণ ধার্মিক ও ব্যবহার বিদ্যায় অনুরক্ত ছিল। অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে অযোধ্যা প্রথমে যশোবর্মার এবং পরে গুর্জর প্রতিহার সম্রাজ্যের হাতে যায়। এরপর শ্রীবাস্তবদের এবং তারপর কান্যকুব্জের গাহড়বাল শক্তির হতে যায়। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে গাহড়বাল রাজ জয়চন্দ্র মুসলমানদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন এবং অযোধ্যা মুসলমান শাসকের হাতে চলে যায়।

জৈন গ্রন্থাদি অনুসারে ২৪ তীর্থংকরদের মধ্যে ২৩ জনই ইক্ষ্বাকু বংশীয় এবং এঁদের মধ্যে আদিনাথ (ঋষভদেব), অজিতনাথ, অভিনন্দনাথ, অনন্তনাথ ও সুমতিনাথ এখানে জন্মেছিলেন। জৈন মন্দিরগুলির মধ্যে শ্বেতাম্বর জৈনদের অজিত নাথ মন্দিরটি প্রসিদ্ধ।

একমাত্র একাদশীর দিনে সাধারণের কাছে উন্মুক্ত নগেশ্বর নাথের মন্দিরটি কুশ তৈরি করেছিলেন বলে বিশ্বাস। হনুমান-গড়িতে হনুমানের একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরটি বৃহৎ ও দুর্গযুক্ত। এ ছাড়া সীতা কা রসোই (সীতার রান্নাঘর),

বড়া আস্থান (নির্বাসনের পর অভিষেক স্থান), রত্ন সিংহাসন, রঙ মহল, আনন্দ ভবন, (কৌশল্যার তৈরি), কৌশল্যা ভবন, ক্ষীরেশ্বরনাথ মন্দির, শিশ্-মহল মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির, উমাদত্ এর মন্দির, তুলসী চৌরা (রামচরিত মানসের আরম্ভের স্থান); জানকী তীর্থ, চন্দ্রহরি, ধর্মহরি, স্বর্গদ্বার ঘাট, রামঘাট, সুগ্রীবকুণ্ড, মণিরাম কি ছাউনি উল্লেখ যোগ্য। শ্রাবণ শুক্লপক্ষ থেকে শ্রাবণ ঝুলার মেলা আরম্ভ হয়। বিভিন্ন মন্দির থেকে মূর্তিগুলিকে শোভাযাত্রা করে মণিপর্বতে নিয়ে যাওয়া হয়। চৈত্রে রামনবমীর মেলা, কার্তিকে পূর্ণিমার মেলাও উল্লেখ যোগ্য।

মণিপর্বত নামে ২০-মি উচ্চ টিলাটি বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ মনে হয়। রামকোটের দক্ষিণ পূর্বে ছোট টিলা দুটির একটির নাম সুগ্রীব পর্বত। এই টিলা দুটিও বৌদ্ধস্তূপ বলে মনে হয়। মণি পর্বতের কাছে সেঠ্ ও জব্-এর সমাধি এবং থানার কাছে নোয়া-র সমাধি বলিয়া কথিত সমাধি আছে। নোয়ার সমাধি ৮-মিটার দীর্ঘ।

অযোনিসম্ভব—যোনি পথে জন্ম সম্ভব হয় নি যার। যেমন সীতা, অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, দ্রোণ, দ্রৌপদী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ইত্যাদি।

অরণ্য—জনৈক ইক্ষ্বাকু রাজা।

অরণ্যষষ্ঠী—জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ষষ্ঠী। জামাই ষষ্ঠী নামে অধিক পরিচিত। সন্তানের মঙ্গলের জন্য মেয়েরা এই দিন ব্যজন নিয়ে বনে গিয়ে বিন্ধ্যবাসিনী ষষ্ঠীর পূজা করবেন ও ফল মূল খাবেন বিধান আছে। অনেকে এই দিন ষষ্ঠী ব্রত অনুষ্ঠান করেন। সন্তানদের সমস্ত আবদার পুরণ করার জন্য ব্রতে নির্দেশ আছে। জননীরা এই আবদার পুরণের চেষ্টা করেন এবং সন্তানতুল্য জামাতাদেরও খাদ্য ও বস্ত্রাদি দিয়ে খুসি করেন। ষষ্ঠী দেবীকে যে নৈবেদ্য দেওয়া হয় তার সংস্কৃত নাম বায়ন; এবং বায়ন থেকে বায়না বা বাটা শব্দ। এই নৈবেদ্যের অংশ বায়না বা বাটা নামে এই সন্তান ও জামাতাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার নিয়ম।

অরন্ধন—ভাদ্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হলে বৃদ্ধারন্ধন; ভাদ্রের যে কোন দিন হলে ইচ্ছারন্ধন। এই দিনে রান্না নিষিদ্ধ। বাসি অন্ন-ব্যঞ্জন মনসা দেবীকে উৎসর্গ করে গ্রহণীয়।

অরা—শুক্রকন্যা। দ্রঃ-দণ্ডকারণ্য।

অরাচীন—পুরুবংশে রাজা জয়ৎসেন ও স্ত্রী সুষবার (বৈদর্ভী) ছেলে। অরাচীনের স্ত্রী আর একজন বিদর্ভ রাজকন্যা, নাম মর্যাদা; ছেলে মহাভৌম।

অরালি—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে।

অরিষ্ট—(১) বৈবস্বত মনুর ছেলে; অন্য নাম নাভাগ। (২) অসুর। বলিরাজের ঔরস পুত্র। কংসের প্রিয় পাত্র। কংসের নির্দেশে বৃষভ রূপে উপস্থিত হন এবং উপদ্রব করতে থাকেন। কৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে খেলা করছিলেন; গোপিনীরা ভীত হয়ে পড়েন। অরিষ্ট কৃষ্ণকে তারপর আক্রমণ করতে এলে কৃষ্ণ এর শিঙ ধরে পিটিয়ে নিহত করেন।

অরিষ্টনেম—অরিষ্টনেমি। (১) একজন রাজা। জীবনের অসারতা বুঝে সব ছেড়ে দিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। ইন্দ্র স্বর্গে নিয়ে যেতে চান। রাজর্ষি স্বর্গেও যেতে চান না কারণ সেখানে পুণ্যবল শেষ হওয়া ইত্যাদি অনিত্যতা রয়েছে। ইন্দ্র তখন রাজাকে বশিষ্ঠ আশ্রমে পাঠান। (২) মহাভারতে এক ঋষি। এঁর ছেলে হরিণের চামড়া পরেছিল। হরিণ ভেবে একজন হৈহেয় রাজকুমার একে হত্যা করেন। কিন্তু ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে খুঁজে খুঁজে মুনির আশ্রমে ক্ষমা চাইতে আসেন। অথচ আশ্রমে ছেলেটিকে অক্ষত দেখে বিস্মিত হয়ে যান। ঋষি তখন বুঝিয়ে বলেন তাঁরা স্বধর্ম পালন; অতিথি সেবা, ঋষি সংসর্গে বাস ইত্যাদি করেন ফলে তাঁদের অপমৃত্যু নাই। (৩) কশ্যপের ঔরসে বিনতার সন্তান। পৌষ মাসে সূর্য (দ্রঃ) রথে যে যক্ষ অবস্থান করেন তাঁর নাম। যক্ষের কাজ রথে লাগাম ব্যবস্থা করা। (৪) সগর রাজার স্ত্রী সুমতির পিতা। সগরকে ইনি বহু উপদেশ দিয়েছিলেন। একটি মতে অরিষ্টনেমির ১৬টি সন্তান। সকল কাজে স্বস্তি বচনে অরিষ্টনেমির নাম কীর্তন করা হয়। (৫) বৃষ্ণির প্রপৌত্র। (৬) ২২-শ জৈন তীর্থঙ্কর। (৭) একজন প্রজাপতি; ইনি দক্ষের (দ্রঃ অসিক্নী) চারটি মেয়েকে বিয়ে করেন। (৮) অজ্ঞাত বাসের সময় সহদেবের নাম। (৯) কশ্যপের এক নাম।

অরিষ্টা—দক্ষ কন্যা। কশ্যপের চতুর্থী স্ত্রী; সন্তান গন্ধর্বরা।

অরুণ—গরুড়ের বড় ভাই। কশ্যপ কদ্রুকে বর দেন হাজার ছেলে হবে এবং বিনতাকে বর দেন অধিকতর বলবান ও গুণবান ছেলে হবে। বিনতার গর্ভে কশ্যপের ঔরসে দুটি ডিম হয়। বহুদিন কেটে যায় ডিম ফোটে না অথচ সতীন কদ্রুর সন্তানরা দিন দিন বড় হয়ে উঠছে দেখে বিনতা ঈর্ষায় একটি ডিম ফাটিয়ে ফেলেন। ফলে ডিম থেকে অপুষ্ট, উরুহীন একটি শিশু বার হয়ে আসে। উরুহীন বলে নাম অনূরু বা অরুণ। অপুষ্ট অরুণ মাকে শাপ দেন এই ব্যস্ততা ও সতীনপনার জন্য কদ্রুর কাছে তাঁকে ৫-শত বছর দাসী হয়ে থাকতে হবে। এবং দ্বিতীয় ডিমটি এ ভাবে অসময়ে না ভাঙলে সেই ডিম থেকে যে সন্তান হবে সেই সন্তান এই দাসীত্ব থেকে বিনতাকে মুক্তি দেবেন। রামায়ণে আছে অরুণের স্ত্রী শ্যেনী; ছেলে বড় সম্পাতি ও ছোট জটায়ু।

রাহু সুবিধা পেলেই সূর্যকে গ্রাস করেন। এই জন্য সূর্য রাগে সব কিছু পুড়িয়ে নষ্ট করে দিতে যান। দেবতারা ভয়ে ব্রহ্মার আশ্রয় নিলে ব্রহ্মা অরুণকে সূর্যের রথে সারথি করে পাঠান; সূর্যকে আড়াল করে থাকবে। সৃষ্টি তাহলে রক্ষা পাবে। সেই থেকে অরুণ সূর্য সারথি।

উগ্রশ্রবার (দ্রঃ) স্ত্রীর শাপে সূর্য ওঠা বন্ধ থাকে; ইন্দ্র সভাতে এই-সুযোগে অপ্সরাদের নাচ দেখতে যাবেন অরুণ মনস্থ করেন। কিন্তু এখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। অরুণ তখন স্ত্রী বেশে সভাতে যোগদান করেন। ইন্দ্র এঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে সম্ভোগ করেন এবং সেই রাতেই অরুণের একটি সন্তান

হয়। ইন্দ্রের উপদেশে এই শিশুকে গৌতমের স্ত্রী অহল্যার কাছে অরুণ রেখে যান। এই শিশুই বালী। পরদিন সকালে সূর্যের কাছে যেতে অরুণের একটু দেরি হয়ে যায়। কেন দেরি হল সূর্য জানতে চান এবং অরুণকে আবার স্ত্রী বেশ ধারণ করতে বলেন। সূর্যের ঔরসে এবারও একটি সন্তান হয় এবং একেও অরুণ অহল্যার (দ্রঃ) কাছে দিয়ে আসেন। এই দ্বিতীয় শিশু সুগ্রীব। (২) কৃষ্ণের এক ছেলে। (২) সূর্য বংশে ত্রিধম্বার ছেলে। (৩) চন্দ্র বংশে উরুক্ষ রাজার বড় ছেলে। (৪) নরকাসুরের ছেলে। (৫) একটি সাপ।

অরুণা—(১) কশ্যপের ঔরসে প্রধার মেয়ে অরুণা, রম্ভা তিলোত্তমা ইত্যাদি। অরুণোদয় কালে জন্ম বলে নাম অরুণা। (২) প্রাচীন সরস্বতীর শাখা। কুরুক্ষেত্র প্রবাহিত। পৃথু-উদক (পেহোয়া), থেকে ৩-মাইল উ-পূর্বে অরুণা-সঙ্গম নামক স্থানে সরস্বতীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। (৩) প্লক্ষদ্বীপের সাতটি নদীর সর্বপ্রধান নদী। অরুণোদয় কুণ্ড হতে নির্গত হয়েছে বলে এই নাম।

অরুণাচল—অরুণ গিরি। মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্তির অন্যতম তেজোমূর্তি এখানে প্রকাশিত। (দ্রঃ) চিদাম্বরম।

অরুণোদয়—সূর্য ওঠার আগে চার দণ্ড। রাত্রির শেষ যামের শেষার্দ্ধ (ব্রহ্মবৈবর্ত)।

অরুণোদয় সপ্তমী—মাঘী শুক্লা সপ্তমী। এই তিথিতে অরুণোদয় কালে স্নান করে সূর্যকে অর্ঘ্য দিতে হয়।

অরুণোদা—প্লক্ষদ্বীপে একটি নদী।

অরুন্ধতী—(১) বশিষ্ঠের স্ত্রী। প্রজাপতি কর্দমের ঔরসে দেবাহুতির গর্ভে জন্ম। অত্যন্ত বিদুষী এবং তপস্বিনী। পতিভক্তির আদর্শ। যে কোন নারীর তুলনায় পতি-ভক্তিতে শ্রেষ্ঠ; সপ্তর্ষিরাও এঁকে শ্রদ্ধা করতেন। শাস্ত্রে আছে স্বামী-সেবা ধর্ম যাঁরা পালন করেন তাঁরা স্বর্গেও অরুন্ধতীর মত পূজিতা হন। অরুন্ধতী নক্ষত্রকে যখন কেউ দেখতে না পায় তখন তার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে মনে করা হয়। কুশণ্ডিকার সময় মন্ত্রপাঠকালে নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাবার নিয়ম আছে; মন্ত্র :—যথা শচী মহেন্দ্রস্য স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ···বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী, যথা নরায়ণে লক্ষ্মীঃ তথা ত্বং ভব ভর্তরি। আকাশে বশিষ্ঠ নক্ষত্রকে যদি কোন সময়ে অরুন্ধতী নক্ষত্রের পেছনে দেখা যায় তাহলে সেই সময় দেশে তীব্র বিপদ দেখা দেয়।

আগের জন্মে নাম ছিল সন্ধ্যা। ব্রহ্মার কাম/অনুরাগ থেকে জন্ম। সন্ধ্যা ক্রমশ বয়স্কা ও রূপবতী হয়ে উঠতে থাকেন। ব্রহ্মাও উত্তেজিত হয়ে পড়তে থাকেন। শিব এই দেখে ব্রহ্মাকে উপহাস করেন; সন্ধ্যা লজ্জিত হয়ে পড়েন। তবুও ব্রহ্মা ও প্রজাপতিরা (এঁরা সন্ধ্যার ভাই) সন্ধ্যাকে ভোগ করেন। ফলে সন্ধ্যা অনুশোচনায় আত্মবিসর্জন করবেন ঠিক করেন। চন্দ্রভাগা পর্বতে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। ব্রহ্মা জানতে পেরে দুঃখিত হয়ে পড়ে বশিষ্ঠকে পাঠান। ব্রাহ্মণবেশে এসে কি ভাবে তপস্যা করতে হয় বশিষ্ঠ শিখিয়ে দেন। কঠোর তপস্যা করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত গরুড়ের পিঠে চড়ে বিষ্ণু দেখা দেন। সন্ধ্যা বর চান যে কোন জন্মেই স্বামী

ছাড়া অন্য কোন পুরুষের কথা কোন দিন যেন না তাঁর মনে আসে। এবং কোন পুরুষ যদি কোন দিন তাঁর দিকে কামার্ত হয়ে চেয়ে দেখেন তাহলে সে যেন তখনই নপুংসকে পরিণত হয়। এবং কোন জীবেরই যৌবনের আগে যেন কোন দিন কাম ভাব না আসে। বিষ্ণু বর দেন এবং তাছাড়া বলেন প্রিয়ব্রতের ছেলে মেধাতিথি চন্দ্রভাগা নদীর কূলে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করছেন; সকলের অলক্ষ্যে সেই আগুনে সন্ধ্যা গিয়ে যেন দেহত্যাগ করেন। তাহলে সেই আগুন থেকেই মেধাতিথির মেয়ে হয়ে জন্মাবেন এবং দেহত্যাগের সময় যার কথা স্মরণ করবেন তাকেই স্বামী হিসাবে পাবেন। বিষ্ণু তারপর আঙুলের ডগা দিয়ে সন্ধ্যাকে স্পর্শ করে ফিরে যান। সন্ধ্যা দেহ ত্যাগ করলে অগ্নি এই দেহ নিয়ে গিয়ে সূর্যমণ্ডলে স্থাপন করেন। সূর্য এই দেহ দু টুকরো করে নিজের রথে তুলে নেন; উপর অংশটি হয় প্রাতঃসন্ধ্যা এবং নীচের অংশটি হয় সায়ং-সন্ধ্যা।

এদিকে যজ্ঞের শেষে অগ্নিকুণ্ড থেকে অগ্নিশিখার মত একটি মেয়ে জন্মায়। মেধাতিথি একে কোলে তুলে নেন এবং নাম দেন অরুন্ধতী। রোধ অর্থে বাধা; অর্থাৎ যাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। অন্য মতে কর্দম ও দেবাহূতির মেয়ে; চন্দ্রভাগার উপকূলে বড় হতে থাকেন। পাঁচ বছর যখন বয়স তখন ব্রহ্মা এক দিন দেখতে পান এবং সূর্যের স্ত্রী সাবিত্রী ও বহুলাকে অরুন্ধতীর শিক্ষার ভার দেন। মানস সরোবরে সাবিত্রী, গায়ত্রী, বহুলা, সরস্বতী ও দ্রুপদার সঙ্গে অরুন্ধতী বাস করতে থাকেন। এরপর একদিন বশিষ্ঠের সঙ্গে দেখা হয় এবং দুজনেই প্রণয়াবদ্ধ হয়ে পড়েন। দেবতাদের উপস্থিতিতে এঁদের বিয়ে হয়। ইনি একবার স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠেন; ফলে অরুন্ধতীর সৌন্দর্য হানি হয়। মহর্ষিরা একবার অরুন্ধতীকে আশ্রমে রেখে বনে ফলমূল আনতে যান। বার-বছর ধরে অনাবৃষ্টি হবার ফলে ভীষণ অভাব দেখা দিয়েছিল। সপ্তর্ষিরা হিমালয়ে গিয়ে সেখানে থেকে যান। অরুন্ধতী আশ্রমে কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। শিব এই সময় এক দিন ব্রাহ্মণ বেশে এসে খেতে/ভিক্ষা চান। অরুন্ধতী বলেন বদর ফল ছাড়া খাবার মত কিছুই নাই। ব্রাহ্মণের অনুরোধে অরুন্ধতী এই ফল সিদ্ধ করতে থাকেন এবং ব্রাহ্মণ তাঁকে নানা গল্প শোনাতে থাকেন। এইভাবে বার বৎসর কেটে যায়; সপ্তর্ষিরাও ফিরে আসেন। একটি মতে অরুন্ধতী সাধ্য মত খেতে দিলে বৃষ্টিপাত হয়। মহাদেব নিজের মূর্তি ধারণ করে সপ্তর্ষিদের বলেন অরুন্ধতী আশ্রমে থেকেও অধিক পুণ্য অর্জন করেছেন এবং অরুন্ধতীকে বর দিতে চান। অরুন্ধতী বর চান স্থানটি বদরপচন নামে পরিচিত হক।

দক্ষ যজ্ঞে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে বশিষ্ঠও মারা যান এবং অরুন্ধতী সহমৃতা হন এবং দুজনে দুটি নক্ষত্রে পরিণত হন। দ্রঃ বশিষ্ঠ, অক্ষমালা।

(২) সপ্তর্ষি মণ্ডলে (উরসা মেজর) বশিষ্ঠের পাশে ছোট একটি তারা। (৩) দক্ষের দশটি মেয়েকে ধর্ম বিয়ে করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতমা।

অরূপা—দক্ষের একটি মেয়ে।

চাপে সেই সেতু ভেঙ্গে পড়ে। তর্কে সর্ত ছিল হারলে অর্জুন প্রাণ বিসর্জন দেবেন আর ব্রাহ্মণ হারলে অর্জুনের দাস হয়ে থাকবে। অর্জুন আত্মহত্যা করতে গেলে বালক বেশে কৃষ্ণ এসে নিরস্ত করেন। অর্জুন আবার শরযোগে সেতু তৈরি করেন এবং হনুমান এবারে আর ভাঙতে পারেন না। কৃষ্ণ তখন পরিচয় করিয়ে দেন এবং স্থির হয় এখন থেকে অর্জুনের রথের চূড়ায় হনুমান অবস্থান করবেন।

তারপর তীর্থ পরিক্রমা করতে করতে অর্জুন গোকর্ণ ও প্রভাসে আসেন। দ্বারকাতে কৃষ্ণের সঙ্গে বন্ধুতা হয়। কয়েক দিন পরে রৈবতক পাহাড়ে যাদবরা এক দিন উৎসবে মত্ত থাকলে কৃষ্ণের পরামর্শে এই সুযোগে সুভদ্রাকে সন্ন্যাসী বেশে হরণ করেন। ক্রুদ্ধ যাদবরা যুদ্ধ করবেন মনস্থ করেন। কিন্তু ঘটনাটা কোন মতে মীমাংসা হযে যায়; অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে হয়। এর পর দ্বারকাতে এক মৃতপুত্র-ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা দেন পরবর্তী সন্তান হলে তিনি রক্ষা করবেন। পরবর্তী সন্তান প্রসবের সময় শরজালে ব্রাহ্মণের গৃহ ঘিরে রাখেন, তবু শিশুটি মারা যায়। অর্জুন অপমানে আত্মহত্যা করতে যান; কিন্তু কৃষ্ণ নিরস্ত করে অর্জুনকে নিয়ে বিষ্ণুলোক যান। বিষ্ণু জানান কৃষ্ণ ও অর্জুনকে একসঙ্গে দেখবার লোভে বালককে নিয়ে এসেছিলেন এবং দুটি বালককেই ফিরিয়ে দেন। এরপর অর্জুন খাণ্ডবদাহনে (দ্রঃ) সাহায্য করেন এবং অগ্নি এই সময় গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয়তূণ ও কপিধ্বজ রথ অর্জুনকে দিয়েছিলেন।

এরপর ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞ হয়। এবং তারপর পাশা খেলায় হেরে গিয়ে দ্রৌপদীকে নিয়ে পাঁচভাই ১২ বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাত বাসে চলে যান। বনবাসের সময় যুধিষ্ঠিরের পরামর্শে তপস্যা করে দেবতাদের কাছ থেকে অর্জুন নানা অস্ত্র এবং কিরাতবেশী মহাদেবকে পরাজিত করে পাশুপত অস্ত্র ইত্যাদি লাভ করেন। এরপর ইন্দ্রকীল পর্বতে ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন। মূকাসুরকে অর্জুন নিহত করেন। যমের কাছে দণ্ডাস্ত্র, বরুণের কাছে পাশ এবং কুবেরের কাছে অন্তর্ধান অস্ত্র লাভ করেন। এরপর ইন্দ্র রথ পাঠিয়ে অর্জুনকে নিয়ে যান। স্বর্গে আরো অস্ত্র পান এবং গন্ধর্ব রাজ চিত্রসেনের কাছে নাচগান শিক্ষা করেন। স্বর্গে অপ্সরারা অর্জুনকে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যান। উর্বশী নিজে আসেন। অন্য মতে ইন্দ্র পাঠিয়ে ছিলেন অর্জুনকে পরিতৃপ্ত করতে। অন্য মতে দুত হিসাবে চিত্রসেনকে পাঠান হয়েছিল। কিন্তু মাতৃজ্ঞানে উর্বশীকে অর্জুন প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে উর্বশীর অভিশাপে এক বছর অর্জুনকে নপুংসকে পরিণত হতে হয়েছিল। ইন্দ্রের কাছে অস্ত্র শিক্ষার গুরুদক্ষিণা হিসাবে তিনকোটি নিবাত-কবচ (দ্রঃ) দৈত্যদের এবং পৌলমা ও কালকেয় অসুরদের যুদ্ধে ধ্বংস করেন। এ জন্য দিব্যকবচ, দেবদত্ত শঙ্খ, মালা, দিব্যকিরীট ইত্যাদি ইন্দ্র উপহার দেন।

এর পর ঘোষ যাত্রায় আগত দুর্যোধন চিত্রসেনের হাতে বন্দী হলে যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে অর্জুন এঁদের মুক্ত করে দেন। দ্রৌপদীকে জয়দ্রথের (দ্রঃ) হাত থেকে মুক্ত করে আনার পর বকরূপী ধর্মের জলাশয়ে জল আনতে গিয়ে নকুল ও

সহদেবের পর ইনিও মারা পড়েন। দ্রঃ যুধিষ্ঠির।

বার বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের সময় এঁরা বিরাট রাজার আশ্রয়ে কাটিয়ে দেন। অর্জুন এখানে নপুংসক বেশে এবং বৃহন্নলা নাম ধারণ করে বিরাটের মেয়ে উত্তরাকে এক বছর নাচগান শেখান। অপর নাম ছিল বিজয়। অজ্ঞাতবাসের সময় শেষ হয়ে এলে কৌরবরা গুজব শোনেন পাণ্ডবরা বিরাটের আশ্রয়ে আছেন। বিরাটের সঙ্গে যুদ্ধ হলে পাণ্ডবরা নিশ্চয়ই সাহায্য করতে আসবে এবং ধরা পড়ে যাবে এই আশায় কৌরবরা বিরাটের গরু চুরি করেন। বিরাট রাজপুত্র উত্তর এই সময়ে সদর্পে বলেন উপযুক্ত সারথি পেলে তিনি কৌরবদের ঠেকাতে পারতেন। বৃহন্নলা তখন সারথি হতে রাজি হন। কিন্তু যুদ্ধে এসে কৌরব সৈন্য দেখে উত্তর ভীত হয়ে পড়েন। অর্জুন ভীত উত্তরাকে রথে বেঁধে রেখে রথ নিয়ে বনে চলে যান এবং শমীবৃক্ষ থেকে লুকিয়ে রাখা নিজের গাণ্ডীব ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কৌরবদের বিতাড়িত করে গরু উদ্ধার করেন। শমীবৃক্ষ থেকে অস্ত্র আনতে গিয়ে অর্জুন উত্তরকে নিজের দশ নাম :—অর্জুন, ফাল্গুনী, কিরীটী, জিষ্ণু, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী ও ধনঞ্জয়—শোনান। কিন্তু তবু নিজের প্রকৃত পরিচয় দেননি।

এদিকে অজ্ঞাতবাসের সময়ও শেষ হয়ে গেল। পরিচয় পেয়ে রাজা বিরাট আনন্দে নিজের মেয়ে উত্তরার সঙ্গে অর্জুনের বিয়ে দিতে চান। কিন্তু অর্জুনের শিষ্যা বলে বিয়ে হয় অভিমন্যুর সঙ্গে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রাক্ কালে কৃষ্ণকে নিজেদের দলে নিয়ে আসার জন্য অর্জুন দ্বারকাতে যান। দুর্যোধন আগেই দ্বারকাতে এসেছিলেন; কপট নিদ্রায় নিদ্রিত কৃষ্ণের মাথার দিকে বসে ছিলেন। অর্জুন এসে কৃষ্ণের পায়ের কাছে বসে থাকেন। কৃষ্ণ চোখ মেলতে আগেই পায়ের দিকে চোখ পড়ে এবং অর্জুনকে দেখতে পান। এবং প্রথম দেখা অনুসারে অর্জুনের দলে যোগ দেন। দুর্যোধনকে কিছু দুর্ধর্ষ সৈন্য দিয়ে দেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন ছিলেন পাণ্ডব সেনাপতি; কৃষ্ণ ছিলেন সারথি ও উপদেষ্টা। যুদ্ধের প্রারম্ভে স্বজন-নিধন যুদ্ধে অর্জুন অনিচ্ছুক হয়ে পড়েন। কৃষ্ণ তখন বুঝিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন। এই বোঝান-অংশ গীতা। দশম দিনে অর্জুন ও শিখণ্ডীর হাতে আহত হয়ে ভীষ্ম (দ্রঃ) মাটিতে পড়ে যান। তৃষ্ণার্ত ভীষ্মকে অর্জুন মেদিনী বাণ বিদ্ধ করে ভোগবতীর জল পান করান। ভীষ্মের মাথা ঝুলে পড়ছিল; ভীষ্মের ইচ্ছায় অর্জুন শরসন্ধান (দ্রঃ অঞ্চলিক বাণ) করে মাথা তুলে ধরবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। ১২-শ দিনে ভগদত্ত, ১৪-শ দিনে জয়দ্রথ, ১৫-শ দিনে দ্রোণাচার্য, ১৬-শ দিনে মগধরাজ দণ্ডধর ও ১৭-শ দিনে কর্ণকে অর্জুন নিহত করেন। যখন কুরুক্ষেত্রে অর্জুন কর্ণকে নিহত করতে পারছিলেন না/দ্বিধা করছিলেন সেই সময় যুধিষ্ঠির অর্জুনকে গাণ্ডীব ত্যাগ করতে বলেছিলেন। অপমানিত অর্জুন তখন যুধিষ্ঠিরকে তরবারি দিয়ে হত্যা করতে ছুটে যান। কৃষ্ণ নিবারিত করেন। দ্রঃ-ইন্দ্র; অশ্বত্থামা। যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির রাজা হন। অর্জুন অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে দিগ্বিজয়ে

বার হন। ত্রিগর্ত, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও সিন্ধুদেশ জয় করে মণিপুরে নিজের ছেলে বভ্রুবাহনের হাতে নিহত হন। উলূপী (দ্রঃ) তখন অর্জুনকে আবার বাঁচিয়ে তোলেন।

যদুবংশ ধ্বংস হলে এবং কৃষ্ণ মারা গেলে অর্জুন দ্বারকাতে গিয়ে সকলের শেষকৃত্য ইত্যাদি নিষ্পন্ন করে' কৃষ্ণের পত্নীদের ইত্যাদি নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসছিলেন পথে আভীর দস্যুরা বহু যাদব নারীকে হরণ করে। কৃষ্ণের মৃত্যুর জন্য হীনবল অর্জুন গাণ্ডীব তুলতেই পারেন না; রাজধানীতে ফিরে আসেন। এরপর মহাপ্রস্থান। দ্রৌপদীকে নিয়ে পাঁচভাই বার হয়ে যান। পথে লোহিত্য সাগরের তীরে অগ্নিদেবের কথায় অর্জুন গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণ সাগরে বিসর্জন করেন। পথে প্রথমে দ্রৌপদী তারপর সহদেব ও নকুলের পর অর্জুন দেহরক্ষা করেন। এক দিনে শত্রুসৈন্য বিনাশ করার প্রতিজ্ঞা করে তা রাখতে না পারার জন্য এবং অন্যান্য ধনুর্ধরদের অবজ্ঞা করার জন্য অর্জুন সশরীরে স্বর্গে যেতে পারেন নি।

অর্জুনের স্ত্রী দ্রৌপদী, উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা; ছেলে যথাক্রমে শ্রুতকীর্তি, ইরাবান, বভ্রুবাহন ও অভিমন্যু। দ্রঃ ধৃতরাষ্ট্র ও কালকেয়।

অর্জুন—পুরাণাদিতে প্রাচীন হৈহয় বংশে রাজা কৃতবীর্যের ছেলে। অন্য নাম কার্তবীর্যার্জুন (দ্রঃ)। হিমালয় থেকে নর্মদা পর্যন্ত রাজ্যের রাজা।

অর্জুন—সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর মন্ত্রী অর্জুন বা অরুণাশ্ব সিংহাসন অধিকার করেন। ওয়াং-হিউ-এনথ্‌সী নামে একজন চীন রাষ্ট্রদূত ভারতে হর্ষবর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে আসেন। কিন্তু অর্জুন এঁর সমস্ত অর্থ লুট করেন এবং কয়েক জন অনুচরকে হত্যা করেন। দূত তিব্বতের রাজার শরণ নেন এবং তিব্বতী ও নেপালী সৈন্য সাহায্যে ভারত আক্রমণ করে অর্জুনকে হারিয়ে তাঁর রাজ্যের মস্ত বড় অংশ জয় করেন। এটি চীনা কাহিনী।

অর্জুনায়ন—একটি সম্প্রদায়। এঁরা অর্জুনের অন্য মতে কার্তবীর্যার্জুনের বংশধর। পাণিনির টীকায়, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি ও বরাহ-মিহিরের বৃহৎ সংহিতায় এদের উল্লেখ আছে। রাজপুতানার ভরতপুর ও আলওয়ারের অধিবাসী। ব্যাক-ট্রিয়ান গ্রীকদের পতনের পর এঁদের অভ্যুত্থান হয়। পরে শক ও কুষাণদের হাতে পরাজিত হন। গুপ্তযুগে এঁরা সুসংবদ্ধ গণতন্ত্রের অধীনে বাস করতেন।

অর্থবাদ—তিন রকম। গুণবাদ, অনুবাদ, ভূতার্থবাদ। অদিত্যযূপ গুণবাদ, বিরোধ হেতু। অগ্নি হিমের ঔষধ অনুবাদ; কারণ প্রমাণ সিদ্ধ। বজ্র হস্ত পুরন্দর ভূতার্থবাদ।

অর্থশাস্ত্র—প্রাচীন অর্থে রাজ্য শাস্ত্র বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান। কৌটিল্য অনুসারে যে বিস্তার দ্বারা পৃথিবী বা ভূমি লাভ করা যায়। পঞ্চতন্ত্র অনুসারে এটি নীতিশাস্ত্র। অর্থ-শাস্ত্রের অপর নাম দণ্ডনীতি।

অতি প্রাচীন কাল থেকে এদেশে অর্থশাস্ত্রের আলোচনা হয়েছিল। কৌটিল্যের আগে মানব, বার্হস্পত্য, ঔশনস্, পারাশর, আম্ভীয় পাঁচটি প্রাচীন বিশিষ্ট ধারা ছিল এবং ভরদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পিশুন, কৌণপদন্ত, বাতব্যাধি,

বাহুদন্তিপুত্র, কাত্যায়ন, চারায়ণ, ঘোটমুখ প্রভৃতি আচার্যরাও অর্থশাস্ত্রের আলোচনা করেছিলেন।

জয়সওয়াল ও দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মতে আনুমানিক ৬৫০ খৃ-পূর্বে এবং আলতেকার মতে ৫০০ খৃ-পূর্বে এবং উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের মতে ৩০০ খৃ-পূর্বে ভারতে অর্থশাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হয়।

মহাভারতে শান্তি পর্বে (৫৯ অধ্যায়) আছে ব্রহ্মা একলক্ষ অধ্যায়ে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিষয়ে একটি বই লেখেন। বিশালাক্ষ এই বই ছোট করে দশ হাজার অধ্যায়ে নিয়ে আসেন। ইন্দ্র একে আরো ছোট করে বাহুদন্তক নামে পাঁচহাজার অধ্যায়ে পরিণত করেন। বৃহস্পতি তারপর তিন হাজার এবং উশনস তারপর এক হাজার অধ্যায়ে পরিণত করেন। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে আছে ব্রহ্মার গ্রন্থের অর্থসম্বন্ধীয় অংশ বৃহস্পতি এক হাজার অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি, দণ্ডের স্বরূপ, রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ, কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন ও যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতি ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। এ বিষয়ে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। গুপ্তযুগে কামন্দকীয় নীতিসার এবং খৃষ্টীয় নবম-দশম শতকে বার্হস্পত্য সূত্র রচিত হয়। খৃষ্টীয় একাদশ ও বা দ্বাদশ শতকে রচিত শুক্রনীতি ও একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। মহাভারত, রামায়ণ, অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালিকাপুরাণ, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃদ্ধ-হারীত, বৃহৎ-পরাশরস্মৃতি ইত্যাদিতে অর্থশাস্ত্রীয় প্রচুর তথ্য রয়েছে। সোমদেবসূরি কৃত নীতিবাক্যামৃত (৯৫৯ খৃ) ভোজযুক্তিকল্পতরু (১০২৫ খৃ) সোমেশ্বর কৃত মানসোল্লাস (১১২৭-১১৩৮ খৃ), লক্ষ্মীধর কৃত কৃত্যকল্পতরু (১১২৫ খৃ মত) ইত্যাদি গ্রন্থে অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এর রচয়িতা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত। দণ্ডী, বাণ, পঞ্চতন্ত্র ও কামন্দক মতে কৌটিল্য, বিষ্ণুগুপ্ত ও চাণক্য একই ব্যক্তি। আধুনিক পণ্ডিতরা মনে করেন এটি কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীর রচিত নয়। কারণ বাৎসায়নের কামসূত্রের সঙ্গে এমন মিল আছে যে মনে হয় দুটি গ্রন্থের রচনা কালের মধ্যে খুব বেশি ব্যবধান ছিল না। অর্থাৎ বাৎস্যায়নের কাল খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক মত অথচ চন্দ্রগুপ্ত খৃ-পূ চতুর্থ শতক। পতঞ্জলিতে চন্দ্রগুপ্ত ইত্যাদির উল্লেখ আছে কৌটিল্যের উল্লেখ নাই। অর্থশাস্ত্রে কোথাও চন্দ্রগুপ্ত বা তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্রের উল্লেখ নাই। আধুনিক মতে কৌটিল্যের উপদেশাবলী অবলম্বনে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে এই গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পনেরটি ভাগে (অধিকরণ) বিভক্ত ; প্রতি অধিকরণে আবার কয়েকটি প্রকরণ রয়েছে। বইতে মোট ১৮০ প্রকরণ/অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারবস্তু কয়েকটি শ্লোকে দেওয়া আছে। বইটি সূত্র ও ভাষ্য আকারে রচিত ; মাঝে মাঝে শ্লোক আছে। শ্লোকের সংখ্যা ৬০০০। অধিকরণ গুলিতে

আলোচ্য বিষয় (১) রাজকুমারদের শিক্ষা ; (২) বিভিন্ন বিভাগ, তাদের অধ্যক্ষ, নগর ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের শাসন প্রণালী ও গণিকাবৃত্তি পরিচালনা ; (৩) দেওয়ানি আইন ; (৪) সমাজ কণ্টক শোধন ও ফৌজদারি আইন ; (৫) রাজ্যের শত্রু নিরসন, রাজকোষ বৃদ্ধি ও সরকারী কর্মচারীর বেতন ; (৬-৭) সপ্ত রাজ্যাঙ্গ ও ছয় নীতি, (৮) রাজার ব্যসন ও বন্যা অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি দুর্বিপাক, (৯-১০) সামরিক অভিযান ; (১১) পৌরপ্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, (১২-১৩) যুদ্ধজয়ের ও বিজিত দেশের প্রীতি অর্জনের উপায় ; (১৪) মায়ারূপ ধারণ, রোগবিস্তার প্রভৃতি উপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত প্রণালী ; (১৫) গ্রন্থটির পরিকল্পনা।

বইটিতে দুর্বোধ্য পারিভাষিক শব্দও অপাণিনীয় শব্দও আছে। না হলে বইটি সহজবোধ্য। এর দুটি টিকা (১) ভট্টস্বামীর প্রতিপদ্ পঞ্চিকা, (২) মাধবযজ্বার নয়চন্দ্রিকা।

অর্ধকুক্কুটন্যায়—দ্রঃ ন্যায়।

অর্ধগঙ্গা—যুবনাশ্বের শাপে অর্দ্ধরূপে কাবেরী নামে একটি মেয়ে হয়। এঁর আর এক নাম অর্দ্ধগঙ্গা। এতে স্নান করলে গঙ্গা স্নানের অর্দ্ধেক পুণ্য হয়।

অর্ধচন্দ্রবাণ—এই বাণে অর্জুন ভগদত্তের হৃদয় বিদীর্ণ করেছিলেন। বহু ব্যবহৃত বাণ।

অর্ধজরতী—দ্রঃ ন্যায়।

অর্ধনারীশ্বর—শিব ও পার্বতীর পাশাপাশি যুক্ত মূর্তি। এই কল্পনা প্রাচীন গুপ্তযুগে ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে কুষাণ যুগেও এই কল্পনা ও মূর্তি প্রচলিত ছিল। গুপ্তোত্তর যুগে বহু বিগ্রহ পাওয়া গেছে। মূর্তির ডান দিক সায়ুধ অর্ধমহাদেব, বামদিক অর্দ্ধপার্বতী। দক্ষিণ ভারতে কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। মূর্তিগুলি সাধারণত স্থানক। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে নির্মিত ভুবনেশ্বরের কয়েকটি মন্দিরগাত্রে নৃত্যপর এই সংমিশ্রমূর্তি বিশেষ দর্শনীয়। ত্রিষষ্ঠি ভুবনের মধ্যে সপ্তপাতাল শ্রেষ্ঠ। অষ্টম উপপাতাল স্বর্ণময় ; এখানে অর্দ্ধনারীশ্বর বাস করেন।

অর্ধব্রাহ্মণ—কেরল উৎপত্তিতে আছে পরশুরাম সমুদ্রের কাছে জায়গা নিয়ে যে সব ব্রাহ্মণদের সেই জায়গার অধিবাসীদের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।

অর্ধমাগধী—একটি প্রাকৃত ভাষা। জৈনধর্মের প্রাচীন বইগুলি এই ভাষাতে। জৈন বৈয়াকরণরা একে আর্যপ্রাকৃত বলেছেন। সংস্কৃত নাটক ও কবিতায় এর ব্যবহার নাই। অশ্বঘোষের দুটি নাটকে কোন কোন পাত্রের মুখে অর্দ্ধমাগধী মত প্রাকৃত আছে। বুদ্ধদেবের কথ্য ভাষা অর্দ্ধমাগধীর প্রাচীনতর রূপ মনে হয়।

অর্ধসাধক—দশরথের (দ্রঃ) এক মন্ত্রী।

অর্ধসৌরী—বৈশ্য কন্যা জাত, ও ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংস্কৃত ব্রাহ্মণ পুত্র।

অর্ধোদয়—যে তিথিতে সমৃদ্ধ পুণ্যের উদয়। পৌষ বা মাঘ মাসে রবিবারে ব্যতীপাত যোগ ও শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যা রূপ তিথিনক্ষত্রাদি যোগ। কোটি সূর্য গ্রহণের সমান। এই সময় সমস্ত জল গঙ্গাজলের সমান হয়। সমস্ত শুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতুল্য হন। এই যোগে দান বিশেষ পুণ্যজনক। দিনেতে এই যোগ প্রশস্ত। প্রায় ১৭ বৎসর অন্তর অন্তর হয়ে থাকে।

অর্বাবসু—দ্রঃ পরাবসু

অর্বুদ—(১) রাজপুতানায় আরাবলী পর্বতের ৫০০০ফু উচ্চ একটি শিখর। এখানে বশিষ্ঠ আশ্রম ছিল। ফলে একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়। বর্তমানে আবু পাহাড়। (২) একটি সাপ, আবু পাহাড়ে থাকে।

অর্যমা—দ্বাদশ আদিত্যের একজন। পিতৃদেব বিশেষ।

অর্হৎ—ব্যুৎপত্তি অর্থ সম্মানীয় বা সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। প্রাক্ বৌদ্ধযুগে সাধারণত সকল সম্মানী ব্যক্তিই এই নামে অভিহিত হতেন। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে অর্হৎ মানে তৃষ্ণা মুক্ত এবং নির্বাণকে যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। অর্থাৎ রাগ দ্বেষ, মোহ ও কামনা বাসনা মুক্ত। ইনি জীবনের যাবতীয় ব্রত সম্পন্ন, জাগতিক ভাব থেকে মুক্ত, পরমার্থ প্রাপ্ত ও সম্যক জ্ঞানের দ্বারা বিমুক্ত। কাম ভব (জাত) অবিদ্যা প্রভৃতি সব রকম আস্রব (আসক্তি) থেকে মুক্ত হলে তবে ভিক্ষুরা অর্হৎ হতে পারতেন। ধ্যান ও প্রজ্ঞার দ্বারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের মাধ্যমে নির্বাণলাভের যে মার্গ সেই মার্গের সব শেষ স্তর এই অর্হৎ-ত্ব। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে যে কোন বয়সে অর্হৎ হওয়া যায়। বুদ্ধদেব ও অর্হতের মধ্যে তফাৎ এই বুদ্ধদেবরা কয়েকটি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ও সর্বজ্ঞও এবং এগুলি অর্হতের আয়ত্তের অতীত। সুতরাং গৌতমবুদ্ধ ছাড়াও অপর বুদ্ধ আছেন বা থাকতে পারেন এবং বহু বুদ্ধের উল্লেখ বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে। ত্রিপিটকে সব জায়গায় অর্হৎ শব্দটি বুদ্ধের বিশেষণ।

অর্হন—জৈন দেব।

অলকা—হিমালয়ে অলকানন্দা নদীর তীরে কুবেরের রাজধানী। গন্ধর্বদের বাসস্থান।

অলকানন্দা—স্বর্গের নদী; পৃথিবীতে এই নদী গঙ্গা, পাতালে ভোগবতী/বৈতরণী। বিষ্ণুপাদ থেকে বার হয়ে দেবলোক অতিক্রম করে চন্দ্রলোক থেকে ব্রহ্মলোকে আসে। ব্রহ্মলোকে চারটি ধারা সীতা, চক্ষু, অলকানন্দ ও ভদ্রাতে ভাগ হয়ে গেছে। সীতা মেরুপর্বতে নেমে এসে গন্ধমাদন হয়ে পূর্ব সাগরে গিয়ে পড়েছে। চক্ষু নেমে আসে মাল্যবান পর্বতে এবং কেতুমাল পার হয়ে পশ্চিম সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। অলকানন্দা পড়েছে হেমকূট পাহাড়ে এবং ভারতবর্ষ হয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। ভদ্রা শৃঙ্গবান পর্বতে নেমে এসে উত্তর সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হচ্ছে। অলকানন্দাতে স্নান করবার সঙ্কল্প করলেই অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। রামায়ণে এর উল্লেখ নাই। (২) গঙ্গোত্রীর কাছে গঙ্গার একটি ধারা। বিষ্ণুগঙ্গা ও সরস্বতী-গঙ্গার মিলিত ধারা। বদ্রিনাথ থেকে কিছু দূরে বসুধারা নামক জলপ্রপাত থেকে উদ্ভূত। গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগর এই নদীর ধারে অবস্থিত। এর পর গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

অলক্ষ্মী—জ্যেষ্ঠা। দুর্ভাগ্যের দেবী। লক্ষ্মীর বড় বোন। রক্তমাল্য ও রক্ত-কমলে ভূষিত হয়ে সমুদ্র মন্থনে উঠে আসেন। দেবতা বা অসুর কেউই একে বিয়ে করতে চান না। মহাতপা দুঃসহ একে বিয়ে করেন এবং পরে ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অলক্ষ্মী কালো, দুহাত, হাতে ঝাঁটা, গায়ে লোহার গহনা, কাঁকরের চন্দন এবং

সঙ্গে রস ও ভাবের (ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে) বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। ভরত মুনির দীর্ঘ কাল পরে ভামহ ও দণ্ডীর আবির্ভাব; সম্ভবত সপ্তম খৃষ্টীয় শতকের প্রথমার্দ্ধে। ভামহের কাব্যালঙ্কার বইটিতে ছয়টি পরিচ্ছেদে কাব্যশরীর, অলঙ্কার, কাব্যদোষ, ন্যায়নির্ণয় ও শব্দশুদ্ধি এই পাঁচটি জিনিস আলোচিত হয়েছে। দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে কাব্যলক্ষণ, বৈদর্ভী ও গৌড়ীরীতি, শ্লেষপ্রসাদাদি দশটি গুণ, উপমা, অনুপ্রাস প্রভৃতি বহু তত্ত্বের আলোচনা করেছেন। ভামহের মতে কাব্য অলঙ্কারহীন হতে পারে না। এবং স্বভাবোক্তি অলঙ্কার নয়; বক্রোক্তি না হলে অলঙ্কার হয় না। ভামহ অলঙ্কার ও গুণের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য আছে আলোচনা করেন নি। কিন্তু দণ্ডী বলেছেন শ্লেষ প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ, কান্তি ও সমাধি এই দশটি গুণই কাব্যের প্রাণ; অলঙ্কার কেবল শোভা বাড়ায়। ভরতমুনি রসকে কাব্যের প্রাণ বলেছিলেন কিন্তু ভামহ বা দণ্ডী রসকে ততটা উচ্চ সম্মান দেন নি। ভামহ ও দণ্ডীর পর উল্লেখযোগ্য আলঙ্কারিক হচ্ছেন উদ্ভট ও বামন।

উদ্ভটের একটি বই ভামহ-বিবরণ, লুপ্ত; বইটি ভামহ রচিত কাব্যালঙ্কারের একটি টীকা এবং এর একটি খণ্ড যেন সম্প্রতি পাওয়া গেছে। উদ্ভটের দ্বিতীয় বই কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ। দ্বিতীয় বইটিতে মোট ৪১টি অলঙ্কারের লক্ষণ ও উদাহরণ আছে। এই বইতে অনেক জায়গায় উদ্ভট নিজের নতুন মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। বামনের (৭৫০-৮০০খৃ) কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি বইটিতে একটি স্বতন্ত্র মতবাদ ইনি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন পথ অনুসরণ করলেও তাঁর চিন্তায় অভিনবত্ব আছে। এঁর মতে কাব্যের আত্মা হচ্ছে রীতি। এরপর রুদ্রট (কাশ্মীরী) মনে হয় ৯০০খৃষ্টাব্দের কিছু আগে জন্মেছিলেন। ভরতের নবরসের অতিরিক্ত প্রেয়ঃ নামে দশম একটি রসের ইনি আলোচনা করেছিলেন। অলঙ্কার সমূহকে তিনি বাস্তব, ঔপম্য, অতিশয় ও শ্লেষ এই চারটি শ্রেণীতে ভাগ করে ছিলেন। চার রীতি—বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, লাটী ও গৌড়ী; পাঁচ অনুপ্রাস :—মধুরা, ললিতা, প্রৌঢ়া, পরুষা, ভদ্রা; এবং চক্রবন্ধ, মুরজবন্ধ, অর্দ্ধভ্রম, সর্বতোভদ্র ইত্যাদি চিত্রের আলোচনায় রুদ্রট নিজের সবল নতুন দৃষ্টি ভঙ্গি স্থাপন করে গেছেন। মত, সাম্য ও পিহিত তিনটি অলঙ্কার রুদ্রটের আবিষ্কার।

রুদ্রটের পর আনন্দবর্দ্ধন নতুন আর একটি মৌলিক ধারার প্রবর্তন করেন। এঁর বই ধ্বন্যালোক। অবশ্য গ্রন্থকার সম্বন্ধে মতান্তর আছে। আনন্দবর্দ্ধন ভরত মুনির রসকে কাব্যের প্রাণবস্তু বলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইনি ব্যঞ্জনার আলোচনা করেন এবং বলেন রসের ধর্ম হল গুণ, অলঙ্কার হচ্ছে উৎকর্ষ এবং রীতি হচ্ছে প্রকাশ। রসের অপকর্ষ হচ্ছে দোষ। অলঙ্কারকে অভিনবগুপ্ত তিনটি ভাগে ভাগ করেন যথা বাহ্য, আভ্যন্তর ও বাহ্যাভ্যন্তর। গুণ, অলঙ্কার রীতি, বৃত্তি, সংঘটনা, দোষ প্রভৃতি কাব্যের যাবতীয় উপাদনকে আলোচনা করে একটি সুসংহত কাব্যতত্ত্ব বা কাব্যনয় গড়ে তুলেছিলেন। আরো তিনজন আলঙ্কারিক ভট্টনারায়ণ, কুন্তক, ও

মহিমভট্ট, এবং এঁদের তিন জনের পর অভিনবগুপ্ত। ক্ষেমেন্দ্রের (৯৯০-১০৬৩ খৃ) বই ঔচিত্যবিচারচর্চা।

অলঙ্কার শাস্ত্রের ক্রম বিকাশের এই স্রোতকে চার ভাগে ভাগ করা হয় (১) প্রাচীন যুগ থেকে ভামহ পর্যন্ত প্রারম্ভ দশা ; (২) ভামহ থেকে আনন্দবর্দ্ধন দ্বিতীয়স্তর বা সৃষ্টিকারী স্তর ; (৩) আনন্দ বর্দ্ধন থেকে মম্মট পর্যন্ত স্তর এবং (৪) চতুর্থ বা শেষ স্তর মম্মট থেকে জগন্নাথ পর্যন্ত, এটি পণ্ডিতী স্তর। আজকের দিনে অনেকের ধারণা অলংকার-শাস্ত্র উপমা অলঙ্কার ইত্যাদির আলোচনা। কিন্তু তা নয়। অখণ্ড কাব্য সত্তাকে তাঁরা জানতেন এবং সে বিষয়ে সামগ্রিক অলোচনাও তাঁরা প্রচুর করেছেন। শব্দ, অর্থ, গুণ, রীতি, রস, অলঙ্কার, ধ্বনি, ব্যঞ্জনা সব কিছু মিলিয়ে কাব্য এ তত্ত্বটি তাঁরা বারবার উল্লেখ করেছেন।

ইউরোপীয় কাব্যতত্ত্বের চেয়ে ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব অতিপ্রাচীন এবং তুলনায় গভীর ও বৈচিত্র্যময়।

অলঘ—বশিষ্ট ঊর্জার এক ছেলে।

অলম্বল—(১) অলম্বুষ। জটাসুরের ছেলে। মানুষের মাংস খেত। যেহেতু ভীম জটাসুরকে নিহত করেছিলেন সেই হেতু অলম্বল কুরুক্ষেত্র কৌরব পক্ষে ছিলেন। দুর্যোধনের নির্দেশে কুরুক্ষেত্রে ঘটোৎকচের সঙ্গে বহুক্ষণ যুদ্ধ হয়। ঘটোৎকচ পরে মায়া যুদ্ধে এর মাথা কেটে নেন। (২) কুরুক্ষেত্রে সাত্যকির হাতে নিহত জনৈক রাজা। (৩) রাক্ষস ঋষ্য শৃঙ্গের ছেলে। অপর নাল শালকটঙ্ক। কৌরব পক্ষে ছিলেন এবং ঘটোৎকচের হাতে নিহত হন। (৪) আরো অনেকগুলি অলম্বুষ সংস্কৃত সাহিত্যে রয়েছে।

অলম্বুষ—দ্রঃ অলম্বল।

অলম্বুষা—সরস্বতী তীরে তপস্যারত দধীচি মুনির তপস্যা নষ্ট করতে ইন্দ্র অপ্সরা অলম্বুষাকে পাঠান। অলম্বুষাকে দেখে মুনির বীর্য পাত হয় এবং নদীতে পড়ে। ফলে সরস্বতী নদী গর্ভ ধারণ করেন ; ছেলে হয় সারস্বত। সরস্বতী এই ছেলেকে দধীচির কাছে আনলে দধীচি শিশুকে আশীর্বাদ করে বলেন দেশে বার বছর অনাবৃষ্টি হবে, ব্রাহ্মণরা শাস্ত্র ভুলে যাবেন। সারস্বত তখন ব্রাহ্মণদের শাস্ত্র পাঠ শুনিয়ে শাস্ত্রজ্ঞান ফিরিয়ে আনবেন। সারস্বত তারপর সরস্বতীর সঙ্গে ফিরে যান। পরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ব্রাহ্মণরা নানা দেশে চলে যান। বার বছর পরে আবার শস্য হলে তাঁরা ফিরে আসেন কিন্তু বেদ, শাস্ত্র সব ভুলে গেছেন। সারস্বত এঁদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন।

একবার ইন্দ্র, বসু-বিধুম ও অলম্বুষা ব্রহ্মার কাছে আসেন। বাতাসে অলম্বুষার বস্ত্র অসংযত হয়ে পড়ে, বিধূম মুগ্ধ হয়ে যান। আলম্বুষাও বিধূমের চাঞ্চল্যে চঞ্চল হয়ে পড়েন। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে ইঙ্গিত করেন এবং ইন্দ্র তখন এদের শাপ দেন। এই শাপে বিধূম চন্দ্রবংশে সহস্রানীক হয়ে এবং অলম্বুষা রাজা কৃতবর্মার ঔরসে স্ত্রী কলাবতীর মেয়ে মৃগাবতী নামে জন্মান। পৃথিবীতেও এঁরা পরস্পরকে

ভালবাসতে থাকেন এবং এঁদের বিয়ে হবে ঠিক হয়। এরপর অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ইন্দ্র সহস্রানীককে স্বর্গে নিয়ে যান। অসুরদের পরাজিত করে ফেরবার সময় ইন্দ্র সঙ্গে তিলোত্তমাকে দিয়ে দেন। রাজা রথে করে ফিরছিলেন এবং মৃগাবতীর কথা ভাবছিলেন; পাশে তিলোত্তমার কথা শুনতে পান না। ফলে তিলোত্তমা শাপ দেন রাজাকে ১৪ বছর বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। শাপের কথা রাজা জানতে পারেন না।

রাজা কৌশাম্বীতে ফিরে এলে মৃগাবতীর সঙ্গে বিয়ে হয়। যথাকালে মৃগাবতীর গর্ভ হয়। মৃগাবতী এই সময় রাজাকে এক দিন জানান তাঁর বাসনা রক্তের পুষ্করিণীতে স্নান করবেন। লাক্ষা ইত্যাদি যোগে রাজা কৃত্রিম রক্ত পুষ্করিণীর ব্যবস্থা করলে মৃগাবতী এই জলে স্নান করতে নামেন। এদিকে একটি শ্যেন পক্ষী মৃগাবতীকে এক টুকরো মাংস ভেবে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যায়। রাজা সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যান; মাতলি এসে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন এবং শাপের কথা জানিয়ে যান। শ্যেন মৃগাবতীকে উদয়াচলে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। মৃগাবতী প্রাণ-বিসর্জন দেবেন মনস্থ করেন কিন্তু শ্বাপদসঙ্কুল বনেও কেউ তাঁকে খেতে আসে না। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন মৃগাবতীকে এক মুনি বালক জমদগ্নি আশ্রমে নিয়ে আসেন। জমদগ্নি রাণীকে সান্ত্বনা দেন; একটি স্বনামধন্য ছেলে হবে জানান এবং স্বামীর সঙ্গে আবার মিলন হবে আশ্বাস দেন। মৃগাবতীর এরপর ছেলে হয় উদয়ন। জমদগ্নি সমস্ত জাতকর্ম করেন এবং শাস্ত্রবিদ্যা ও ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দেন। ছেলের হাতে মৃগাবতী সহস্রানীকের নামাঙ্কিত বালা পরিয়ে দেন।

বালক উদয়ন বনে একদিন এক সাপুড়েকে সাপ ধরতে দেখেন। সুন্দর সাপটিকে বালক ছেড়ে দিতে বললেও সাপুড়ে ছাড়তে চায় না, উদয়ন তখন হাতের বালা খুলে দিয়ে সাপকে মুক্ত করে দেন। সপুড়ে বালা নিয়ে চলে গেলে সাপটি উদয়নকে বলেন তিনি বাসুকির বড় ভাই বসুনেমি। উদয়নকে বাঁশি ইত্যাদি অনেক জিনিস উপহার দিয়ে যান। সাপুড়েকে দেওয়া বালার মাধ্যমে রাজার সঙ্গে এদের মিলন হয়।

(২) কশ্যপের ঔরসে প্রধার একটি মেয়ে, অপ্সরা। সূর্যবংশে রাজা তৃণবিন্দুকে মোহিত করে বিয়ে করেন। তিন ছেলে বিশালরাজ/বিশালদেব, শূন্যবন্ধু, ও ধূম্রকেতু। বিশালদেব বৈশালী নগর স্থাপন করেন। মেয়ে ইড়বিড়া/ইলবিলা; স্বামী বিশ্রবা এবং ছেলে কুবের।

অলম্বুষি—অলম্বুষের ছেলে।

অলর্ক—(১) সত্যযুগে একজন অসুর। নাম দংশ। ভৃগুর স্ত্রীকে চুরি করার জন্য ভৃগুর শাপে অষ্টপদ তীক্ষ্ণদন্ত ভয়ঙ্কর অলর্ক কীটে পরিণত হন। কর্ণকে (দ্রঃ) আক্রমণ করেন। পরশুরামের দৃষ্টি পাতে মুক্ত হয়ে যান এবং পরশুরামকে প্রণাম করে ফিরে যান। অন্য মতে ইন্দ্র অলর্ক কীট হয়ে অর্জুনের স্বার্থরক্ষার জন্য কর্ণকে আক্রমণ করেছিলেন।

(২) কাশী ও করূষ দেশের রাজা। চন্দ্রবংশে প্রতর্দনের ঔরসে স্ত্রী মদালসার গর্ভে জন্ম। ছেলেকে মদালসা ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেন। লোপমুদ্রার বরে দীর্ঘজীবী হয়ে ৬৬০০০ বছর রাজত্ব করেন। রাক্ষসদের হাত থেকে কাশীরাজ্য ইনি নিজের অধীনে এনে মানুষের বাসোপযোগী করে তোলেন। যমের একজন সভাপতি হন। পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি জয় করবার জন্য এদের বাণবিদ্ধ করেও জয় করতে পারেন নি। শেষে যোগ সাধনায় এদের নিয়ন্ত্রণ করেন। একবার এক অন্ধ ব্রাহ্মণ বালক তাঁর কাছে তাঁর চক্ষু দুটি চাইলে অলর্ক নিজের চোখ দুটি খুলে দান করেছিলেন। যোগ অভ্যাসের দ্বারা ইনি সমস্ত রিপু জয় করেন এবং যোগ বলে দেহত্যাগ করেন।

অলায়ুধ—বক রাক্ষসের ভাই। কির্মীর ও হিড়িম্বকে ভীম বধ করেছিলেন ফলে কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধন পক্ষে বহু সৈন্য নিয়ে যোগদান করেছিলেন এবং ভীষণ যুদ্ধে ঘটোৎকচের হাতে দ্রোণ পর্বে শেষ দিকে মারা যান। অন্য মতে বকের জ্ঞাতি ও হিড়িম্বের ভাই।

অলোলুপ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

অল্লা—পরম দেবতা। অথর্ব বেদে অথর্বণ সূক্তে অল্লার স্বরূপবর্ণিত আছে: অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং, পূর্ণং ব্রাহ্মণমল্লাং, অল্লোবস্থর মহম্মদরকং বরস্য অল্লো অল্লাং ইত্যাদি। ইল্লাকবর, ইল্লাকবর, ইল্লল্লেতি, ইল্লাল্লাঃ ইল্লা ইল্লল্লা অনাদিস্বরূপা অথর্বণী শাখাং হ্রুঁ, হ্রীঁ......করু করু ফট্ ইত্যাদি।

অশোক—(১) অশ্বপতির বড় ভাই; (২) দশরথের এক মন্ত্রী; অন্য নাম অকোপ। (৩) রাবণের প্রমোদ বন (৪) চৈত্র শুক্ল ষষ্ঠী (৫) ভীমের সারথি (৬) অশ্ব নামে অসুর পরিবারে এক রাজা।

অশোক—মগধের মৌর্যবংশের তৃতীয় সম্রাট। অন্য নাম প্রিয়দর্শী। চন্দ্রগুপ্ত এঁর পিতামহ; পিতা বিন্দুসার। তাঁর শিলালিপি ইত্যাদি থেকে অনুমান ২৭৩-২৩২ খৃ-পূ রাজত্ব করতেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজাগুলির চেয় শ্রেষ্ঠ। আলেকজাণ্ডার, সিজর বা নেপোলিয়ান তাঁর তুলনায় প্রদীপ সামান্য। বিন্দুসারের এক শত ছেলের মধ্যে অশোক অন্যতম। পিতার মৃত্যুর আগে তক্ষশীলায় ও উজ্জয়িনীতে রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন। বিন্দুসারের মৃত্যুতে ছেলেদের মধ্যে রক্তাক্ত ভ্রাতৃবিরোধ দেখা দেয় এবং মন্ত্রী রাধাগুপ্তের সাহায্যে অশোক ভাইদের পরাজিত ও নিহত করে মগধের রাজা হন। এর ফলে বিন্দুসারের মৃত্যুর চার বছর পরে অশোকের অভিষেক হয়। তাঁর ব্যক্তি গত জীবনের কোন প্রামাণিক হিসাব মেলে না। তাঁর প্রধান মহিষী অসন্ধিমিত্রা এবং কারুবাকী/চারুবাকী, দেবী, পদ্মাবতী ও তিষ্যরক্ষিতা এই পাঁচজন। ছেলে মহেন্দ্র, তিবর, কুনাল, ও জলৌক। একটি শিলা লিপিতে কারুবাকীও তাঁর গর্ভজ পুত্র তিবরের উল্লেখ আছে। মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রার কথা কোন শিলালিপিতে নাই। অশোকের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পৌত্র দশরথ ও সম্প্রতি রাজত্ব ভাগ করে নেন। চল্লিশ বছর মত রাজত্ব করে ২৩২ খৃ-পূ অশোক

দেহত্যাগ করেন। নানা জায়গা থেকে তাঁর প্রায় চল্লিশটি শিলা লিপি পাওয়া গেছে; এঁদের একটি অনুশাসন লিপি থেকে মনে হয় অশোক যেন ভাইদের হিংসা বা হত্যা করেন নি।

উত্তরাধিকার সূত্রে অশোক যে রাজ্য পান তা উত্তর পশ্চিমে হিন্দুকুশ থেকে সম্ভবত বাঙলার কিছুটা ও হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে পেন্নার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলিঙ্গ তাঁর অধীন ছিল না। রাজা হওয়ার আট বছর পরে কলিঙ্গ জয় করেন। এই যুদ্ধে এক লক্ষ লোক নিহত ও দেড় লক্ষ লোক দেশচ্যুত এবং লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধ জনিত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মারা যায়। যুদ্ধের এই পরিণাম দেখে অশোক গভীর অনুশোচনায় সম্ভবত উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। কলিঙ্গ জয়ের পর দীর্ঘ ত্রিশ বছর রাজত্ব কালে তিনি আর কোথাও কোন যুদ্ধ করেন নি; এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের যুদ্ধ পরিত্যাগ করে ধর্ম-বিজয়ের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। (দ্রঃ অশ্ব)

বুদ্ধগয়া, বস্তি জেলার অন্তর্গত শিগ্‌লিভা গ্রামে অবস্থিত পূর্ববর্তী বুদ্ধ কনক মুনির আশ্রম ও গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনি গ্রাম পরিদর্শন করেন। লুম্বিনিতে তাঁর স্থাপিত স্তম্ভ আছে। সারা বৎসর প্রজাদের সঙ্গে মেলামেশা করে ও ধর্মপ্রচার করে বেড়াতে থাকেন। তাঁর একমাত্র ব্রত হয়ে উঠেছিল ধর্মের বিস্তার ও প্রজাদের মানসিক উন্নতি। আফগানিস্থানের কান্দাহার ও জালালাবাদ; উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের মনসেরা ও সাহাবাজগড়ি; দেরাদুনের কাসমী, ও কাথিয়াওয়াড় গিরনার; উড়িষ্যার তোষালি; এবং মহীশূরের মাস্কি ইত্যাদি স্থানে স্থানীয় বর্ণমালায় তাঁর শিলালিপি পাওয়া গেছে। কান্দাহার ও জালালাবাদে গ্রীক ও আরামাইক অক্ষর; মনসেরা ও সাহাবাজগড়িতে খরোষ্ঠী এবং অন্যান্য স্থানে ব্রাহ্মী লিপি দেখা যায়। শিলালেখের ভাষা অর্দ্ধ মাগধী; কতকটা পালি মত মনে হয়; এই ভাষা তখন ভারতে সর্বত্র প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত অনুশাসনে ধর্মের কথা আছে; দর্শনের কথা নাই।

ভগবান বুদ্ধ গৃহস্থের জন্য যে ধর্ম নির্দেশ দিয়েছিলেন অশোক সেই নির্দেশই ধর্ম বলে প্রচার করেছিলেন। ধর্মপ্রচারে জন্য অশোক দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন রাজ্য চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, ও কেরলপুত্র রাজ্যে, সিংহলে, সম্ভবত ব্রহ্মদেশে এবং সিরিয়া, মিসর, কাইরিনি, মাসিডোনিয়া ও এপিরাস প্রভৃতি রাজ্যে প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। ছেলে মহেন্দ্র ও মেয়ে সংঘমিত্রাকে সিংহলে পাঠিয়ে ছিলেন। রাজকর্মচারীদের ওপর নির্দেশ ছিল কাজের সঙ্গেই ধর্ম প্রচার করবেন। জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মমহামাত্র নামে নতুন এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হলে পাটলিপুত্রে বৃদ্ধ-বৌদ্ধ আচার্যদের ডেকে একটি ঐক্যের চেষ্টা করেন। প্রাণী হত্যা নিবারণের জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। প্রজাদের নিজের সন্তানের মত পালন করতেন এবং নিন্দা ও বিবাদ না করে পরধর্ম উপলব্ধি করার জন্য সকলকে অনুরোধ করতেন। তাঁর তৈরি বরাবর গিরিগুহা অন্য সম্প্রদায়ের

সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধার সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। গাঙ্গেয় উপত্যকার সীমিত বৌদ্ধ ধর্মকে মিসর, পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম এসিয়াতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। পশু ও মানুষের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন জীবের প্রতি তাঁর করুণার স্বাক্ষর। পশ্চিম এসিয়া, মিসর, গ্রীক, দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপেও তিনি এই রকম চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন ও নানা ভেষজ পাঠাতেন।

তাঁর সময় স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্পেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পাঁচশ বছর পরেও তাঁর প্রাসাদের সৌন্দর্য ফা-হিয়েন ইত্যাদিকে মুগ্ধ করেছিল। সারা দেশে প্রায় ৮৪০০০ বৌদ্ধ স্তূপ স্থাপিত করেছিলেন; এগুলি প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গেছে। সাঁচীর বৃহৎ স্তূপটিও অশোকের স্থাপিত; পরে অবশ্য অনেক সংস্কার হয়েছে। সারনাথের স্তম্ভের শীর্ষদেশ ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রতীক।

অশোক—ধর্মশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। এই গাছের পাতা নবপত্রিকার অন্যতম উপকরণ। গৌরী এই গাছের নীচে তপস্যা করে পূর্ণ মনোরথ ও বিগত-শোক হয়েছিলেন। পঞ্চবটী বেদির অগ্নিকোণে এই গাছ বসাতে হয়। বৃহৎ পঞ্চবটী বেদির চারধারে গোল করে পাঁচটি অশোক গাছ বসাতে হয়। বিষ্ণু লক্ষ্মী ও দেবী পূজায় এই ফুল প্রশস্ত। কামদেবের পঞ্চবাণের মধ্যে একটি। এই ফুল থেকে স্ত্রীরোগে ব্যবহৃত ভেষজ তৈরি হয়। কবি প্রসিদ্ধি যুবতীদের পদাঘাতে এর ফুল ফোটে।

অশোকঅষ্টমী—চৈত্র শুক্ল অষ্টমী। এই তিথিতে আটটি অশোক কলিকা খেলে লোকে শোকপ্রাপ্ত হয় না।

অশোকপূর্ণিমা—পূর্ণিমাতে কর্তব্য ব্রত বিশেষ।

অশোকবন—(১) লঙ্কায় সীতা যেখানে বন্দী ছিলেন। বহু অশোক বৃক্ষ যুক্ত। (২) রামের প্রমোদ বন; অযোধ্যায় ফিরে এসে এখানে সীতার সঙ্গে রাম থাকতেন।

অশোকষষ্ঠী—চৈত্র শুক্ল ষষ্ঠী।

অশোকসুন্দরী—শিবপার্বতী একবার বিশ্রম্ভালাপ করছিলেন। পার্বতী কথায় কথায় শিবকে অনুরোধ করেন ব্রহ্মার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ উদ্যান কি আছে দেখাতে। শিব তখন নন্দন বনে নিয়ে যান, কল্পবৃক্ষ দেখান এবং কল্পবৃক্ষের ক্ষমতার পরিচয় দেন। কৌতূহলে পার্বতী কল্পবৃক্ষের কাছে একটি মেয়ে চান এবং তৎক্ষণাৎ সুন্দরী একটি মেয়ে হয়। পার্বতী এঁর নাম দেন অশোক-সুন্দরী এবং একে পালন করেন এবং বর দেন নহুষের সঙ্গে বিয়ে হবে।

সখীদের সঙ্গে একদিন মেয়েটি নন্দন বনে বেড়াচ্ছিল এমন সময় বিপ্রচিত্তির ছেলে হুণ্ড দৈত্য এঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান এবং বিয়ে করতে চান। নহুষের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে জানিয়ে অশোকসুন্দরী দৈত্যকে প্রত্যাখ্যান করেন। অসুর বোঝাতে চেষ্টা করেন নহুষ এখনও জন্মায়নি; জন্মে যখন বিয়ের বয়স হবে তখন অশোকসুন্দরী বুড়ি হয়ে যাবে ইত্যাদি। কিন্তু অশোকসুন্দরী এ সব কথায় কাণ

দেন না। এরপর দৈত্য একটি সুন্দরী মেয়ে সেজে এসে জানায় তার স্বামীকে হুণ্ড হত্যা করেছে; প্রতিশোধ নেবার জন্য মেয়েটি উপস্থিত তপস্যা করছে; এবং গঙ্গা-তীরে মেয়েটির আশ্রমে অশোকসুন্দরীকে আসতে আহ্বান জানায়। বিশ্বাস করে অশোকসুন্দরী আশ্রমে এলে দৈত্য নিজের রূপ ধরে বলাৎকার করতে চেষ্টা করে। অশোক সুন্দরী তখন শাপ দেন নহুষের হাতে তার মৃত্যু হবে এবং কৈলাসে পালিয়ে যান। হুণ্ড তখন তাঁর মন্ত্রী কম্পনকে আয়ুর স্ত্রী ইন্দুমতীকে চুরি করে আনতে এবং চুরি করা সম্ভব না হলে গর্ভের শিশুকে হত্যা করতে নির্দেশ দেন। দ্রঃ নহুষ।

অশোকা—জৈন গৃহদেবতা।

অশৌচ—নিকট আত্মীয়ের জন্ম বা মৃত্যুতে বা অন্য কারণে ধর্মীয় সাময়িক অপবিত্রতা। এই সময় ধর্মকার্য নিষিদ্ধ। আত্মীয়তার দুরত্ব অনুসারে, বর্ণভেদ অনুসারে অশৌচ-কাল এক মাস, দশদিন, তিন দিন বা এক দিন। আমিষ ভক্ষণ ও ক্ষৌরকার্যও নিষিদ্ধ। অশৌচগ্রস্তের ছোঁয়া অন্ন গ্রহণীয় নয়, এমন কি তাঁর দেহ ও অনেক স্থানে অস্পৃশ্য মনে করা হয়। পিতা মাতা বা স্বামীর মৃত্যুতে ছেলের ও স্ত্রীর এক বৎসর পর্যন্ত কালাশৌচ। শরীরে রক্তপাত হলে একদিন এবং রজো কালে অশৌচ ৩/১২ দিন।

অশ্ব—যে পথ ব্যাপ্ত করে বা অধ্বানম্ অশ্নুতে। ইহার উৎপত্তি স্থান সাতটি :—অমৃত (জল ?), বাষ্প, বহ্নি, বেদ, অণ্ড, গর্ভ ও সাম। (২) জ্যোতিষে ধনুঃ রাশি। (৩) পুরুষদের চারটি শ্রেণীর মধ্যে চতুর্থ শ্রেণী। (৪) এক জন দৈত্য; পরে কলিঙ্গ রাজ অশোক হয়ে জন্মান। (৫) বশমুনির ছেলে; এক জন ঋষি (ঋক্)। (৬) কশ্যপ ও তাম্রার সন্তান অশ্ব এবং উষ্ট্র।

অশ্বকৃত—বিবাহের পণ হিসাবে ঋচীক কর্তৃক সংগৃহীত অশ্বের প্রস্রাবে যে নদী হয়েছিল।

অশ্বগ্রীব—(১) কশ্যপ ও দনুর ছেলে; বিষ্ণু দ্বেষী হয়গ্রীব অসুর। (২) বৃষ্ণি বংশে চিত্রকের ছেলে।

অশ্বঘোষ—খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক। সম্রাট কনিষ্কের সমসাময়িক ও সাকেতে জন্ম। মা সুবর্ণাক্ষী। পার্শ্ব বা পার্শ্বের শিষ্য পুণ্যযশাঃ ছিলেন অশ্বঘোষের গুরু। কথিত আছে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম; ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শাস্ত্রে পারঙ্গম হয়ে শেষে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন ও তথাগতের বাণী প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। প্রথমে সর্বাস্তিবাদী ছিলেন। মৈত্রী, করুণা ও বুদ্ধভক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর মতবাদ মহাযান শাখার প্রথম সূত্রপাত। একজন শ্রেষ্ট সংগীতজ্ঞ ও গীতিকার রূপেও বর্ণনা আছে এবং গানের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করতেন। অশ্বঘোষের কাব্য, নাটক, দর্শন গ্রন্থ ভারতীয় চিন্তাধারার মুকুটমণি। তাঁর গ্রন্থ বুদ্ধচরিত, সৌন্দরানন্দ, শারিপুত্র প্রকরণ, বজ্রসূচী, সূত্রালংকার, গণ্ডীস্তোত্রগাথা, মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ।

অশ্বতীর্থ—কান্যকুব্জের তীর্থ। কালী নদী এখানে গঙ্গাতে মিশেছে।

অশ্বত্থ—যা অল্পকাল (শ্বঃ) স্থায়ী নহে। অশ্বের কাণের ন্যায় যার পাতা সর্বদা সচল।

সংসার বৃক্ষ (কঠোপ)। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে এর বিশেষ স্থান। বিষ্ণুর স্বরূপ। রতিরত হর-পার্বতীর কাছে দ্বিজ বেশী অগ্নিকে পাঠিয়ে দেবতারা বাধার সৃষ্টি করেন। ফলে পার্বতীর শাপে বিষ্ণু অশ্বত্থ রূপে, শিব বট রূপে এবং ব্রহ্মা পলাশ রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এই গাছ দর্শন, স্পর্শন ও সেবার দ্বারা মানুষ পাপমুক্ত হয়। আর এক মতে দেবতারা দানবদের হাতে নিপীড়িত হয়ে গাছে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং বিষ্ণু অশ্বত্থ গাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর এক মতে বিষ্ণু এই গাছে অলক্ষ্মীর বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। কেবল শনিবার অলক্ষ্মীর ছোট বোন লক্ষ্মী এখানে আসেন। তাই শনিবার এই গাছ বিশেষ ভাবে পূজনীয়, অন্য দিন অস্পৃশ্য। অশ্বত্থ গাছের গোড়া বাঁধিয়ে দেওয়া, জল দেওয়া, অশ্বত্থ গাছের নীচে ধর্মকার্য করা এবং অশ্বত্থ গাছকে প্রণাম করা অশেষ পুণ্য দায়ক। অশ্বত্থ গাছের ডাল নষ্ট করলে নিদারুণ পাপ হয়। দ্রঃ তুলসী। অশ্বত্থ গাছ প্রতিষ্ঠা; এবং বট অশ্বত্থের বিয়ে দেওয়া আড়ম্বর বহুল ধর্মানুষ্ঠান। বৃক্ষ প্রতিষ্ঠায় সকল প্রাণীর জন্য এই বৃক্ষ উৎসর্গ করা হয়। পঞ্চবটী স্থাপনে বেদীর পূব দিকে অশ্বত্থ রোপন করতে হয়। বৃহৎ পঞ্চবটীতে চার দিকে অশ্বত্থ গাছ থাকে। পূজায় পঞ্চপল্লবের মধ্যে অশ্বত্থ পল্লবও রয়েছে।

(২) অশ্বিনী নক্ষত্র যুক্ত কাল।

অশ্বত্থামা—পিতার নির্দেশে দ্রোণ শারদ্বত মুনি কন্যা কৃপীকে বিয়ে করেন। কৃপীর ছেলে জন্মেই উচ্চৈঃশ্রবার মত চিৎকার করেছিলেন। দৈববাণীও হয়েছিল, ফলে এই নাম। চিরজীবী ও মহাবীর। পিতার কাছে অস্ত্রশিক্ষা; কুরুপাণ্ডব রাজপুত্রদের সঙ্গে এক সঙ্গে শিখতেন। অর্জুন (দ্রঃ)। দ্রোণের কাছ থেকে নারায়ণ প্রদত্ত নারায়ণ অস্ত্র ও ব্রহ্মশির অস্ত্র পেয়েছিলেন। পাণ্ডবদের বনবাস কালে দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণের কাছে ব্রহ্মশির অস্ত্রের বদলে সুদর্শন চক্র চান, উদ্দেশ্য অজেয় হওয়া। কিন্তু সুদর্শন হাতে করে তুলতে না পেরে অপমানিত হয়ে ফিরে আসেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে অংশ নিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে কৌরবদের পক্ষে ছিলেন, বহু যোদ্ধা নিহত করেছিলেন। অর্জুনকে একবার হারিয়ে দেন এবং অর্জুনের কাছেও এক বার হেরে যান। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে হত্যা করার পর পাণ্ডবদের নিহত করার জন্য অশ্বত্থামা নারায়ণ অস্ত্র ছেড়ে ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডবরা সকলে রথ অস্ত্র সব কিছু ফেলে অস্ত্রকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন; নারায়ণী অস্ত্র ফিরে যায়। একটি মতে দ্রোণের মৃত্যুর পর কৃপ ও সাত্বতকে সঙ্গে নিয়ে রাত্রি বেলা পাণ্ডব শিবির আক্রমণ করে প্রহরী মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে দিব্য তরবারি লাভ করে শিবিরে প্রবেশ করে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করেন। অন্য মতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর পাণ্ডবদের হত্যা করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৌরবদের সেনাপতি হন এবং কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে নিয়ে রাত্রে লুকিয়ে পাণ্ডব শিবিরে ঢুকে ধৃষ্টদ্যুম্ন, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর ছেলেগুলিকে ও বহু সৈন্য ও হাতীঘোড়া ইত্যাদি ধ্বংস করেন। কৃষ্ণ সাত্যকি ও পাণ্ডবরা অন্যত্র ছিলেন বলে রক্ষা পেয়ে যান। পুত্র শোকে দ্রৌপদী অন্নত্যাগ করেন এবং ভীমকে বলেন অশ্বত্থামার মাথার সহজাত মণি না পেলে আর অন্ন গ্রহণ করবেন না। ভীম বার হয়ে

যান ; সঙ্গে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনও যান। গঙ্গাতীরে ব্যাস ও অন্যান্য ঋষিদের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে অশ্বত্থামা লুকিয়ে বসে ছিলেন। যুদ্ধ হয় ; পাণ্ডবদের নিহত করবার জন্য অশ্বত্থামা ব্রহ্ম শির অস্ত্র নিক্ষেপ করেন ; অর্জুন ও বাধ্য হয়ে ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করেন। দুই ব্রহ্মশির অস্ত্রে প্রলয় হয়ে যাবে দেখে নারদ ও ব্যাসদেব দুই অস্ত্রের মাঝে দাঁড়িয়ে অস্ত্র মতে দু পক্ষের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা দুজনকে অস্ত্র সংবরণ করতে বলেন। ব্রহ্মচারী অর্জুন তাঁর অস্ত্র সংবরণ করতে পারেন ; কিন্তু সব সময়ে সৎ পথে না থাকার জন্য অশ্বত্থামা অস্ত্র ফেরাতে পারেন না, এবং এই অস্ত্র উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকে হত্যা করে। অস্ত্র সংবরণ করতে না পারার জন্য সর্ত হয় অশ্বত্থামাকে তাঁর মাথার মণি কেটে দিতে হবে। অজাত শিশুকে হত্যা করার জন্য কৃষ্ণ শাপ দেন তিন হাজার বছর এঁকে নিঃসঙ্গ ভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে। যোগবলে উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকেও কৃষ্ণ বাঁচিয়ে তোলেন। এই ভাবে পরাজিত হয়ে মাথা থেকে মণি কেটে দিয়ে অশ্বত্থামা বনে চলে যান। ভীম এই মণি দ্রৌপদীকে দেন এবং দ্রৌপদীর অনুরোধে এই মণি যুধিষ্ঠির মাথায় ধারণ করেন। দ্রঃ বেদব্যাস।

(২) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার হাতী ; ভীমের হাতে মারা যায়। দ্রোণকে নিরস্ত্র ও যুদ্ধবিরত করার জন্য কৃষ্ণের কথায় পাণ্ডবরা অশ্বত্থামা হত হয়েছে বলে চিৎকার করে প্রচার করতে থাকেন। কাথাটা শুনে দ্রোণ বিচলিত হয়ে পড়েন এবং যুধিষ্ঠিরের মুখ থেকে কথাটা শুনতে চান। সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির (দ্রঃ) বাধ্য হয়ে ঘোষণা করেন 'অশ্বত্থামা হতঃ' এবং অনুচ্চ কণ্ঠে বলেন 'ইতি গজঃ'। যুধিষ্ঠিরের কথায় বিশ্বাস করে দ্রোণ ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং এই সুযোগে তাঁকে হত্যা করা হয়।

অশ্বনদী—কুন্তীভোজের দেশে একটি নদী ; চর্মণ্বতীতে এসে মিশেছে। চর্মণ্বতী পরে যমুনাতে ও যমুনা গঙ্গাতে এসে পড়েছে। এই অশ্বনদীতে কুন্তী কর্ণকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

অশ্বপতি—(১) মদ্রদেশের পরম ধার্মিক রাজা। সন্তানের জন্য সাবিত্রীর আরাধনা করেন এবং সাবিত্রীর বরে একটি মেয়ে হয় ; মেয়ের নাম রাখেন সাবিত্রী। (২) কেকয়-রাজ ; কৈকেয়ীর পিতা।

অশ্বমুখ—কিন্নর। কিম্পুরুষ।

অশ্বমেধ—একটি রাজকীয় যজ্ঞ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঐন্দ্র-মহাভিষেক বর্ণনায় কয়েকজন দিগ্বিজয়ী অশ্বমেধ যজ্ঞকারী নরপতির নাম আছে। বসন্ত বা গ্রীষ্মে এই যজ্ঞ করা হত। প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত এক বছর মত সময় লাগত। প্রাচীন ভারতে পুত্র-কামনায় বা রাজচক্রবর্তী হবার জন্যও রাজারা করতেন। ৯৯-টি যজ্ঞ করার পর সুলক্ষণ একটি ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হত। মেঘের মত কালো, মুখ সোনার মত, দু-পাশে অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন, লেজ বিদ্যুৎ মত ঝলকে ওঠে, পেট অংশ কুঁদ ফুল মত সাদা, পা সবুজ মত, কাণ সিঁদুর মত লাল, জিব আগুনের

শিখা মত, চোখ সূর্যের মত, বেগবান ও সর্বাঙ্গসুন্দর ঘোড়া বেছে নেওয়া হত। ঘোড়ার কপালে জয়পত্র বেঁধে দিয়ে রাজা বা রাজ প্রতিনিধি সসৈন্যে এগিয়ে যেতেন। ঘোড়ার সঙ্গে একশত জীর্ণ অশ্বও ছেড়ে দেওয়া হত। ঘোড়া যেখানে খুসি যেত বা ঘোড়াটিকে অন্য দেশের ওপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। কেউ কোন রকম বাধা দিলে যুদ্ধ হত। অর্থাৎ ঘোড়ার মালিকের প্রভুত্ব এই ভাবে সকলকে স্বীকার করিয়ে নেওয়া। এই ভাবে ঘোড়ার অধিকারী রাজচক্রবর্তী উপাধি লাভ করতেন। রাজারা বশ্যতা স্বীকার করে প্রয়োজন মত প্রচুর কর দিতেন। এক বছর পরে ঘোড়া ফিরিয়ে এনে শাস্ত্র অনুসারে যজ্ঞ করে ঘোড়াটিকে বলি দেওয়া হত। ঘোড়া ফিরে এলে পর দিন অশ্বের অভিষেচন ও রাণীদের দ্বারা অশ্বের বিলেপন প্রসাধন শেষ হলে একটি ছাগ ও অন্যান্য বধ্য পশুর সঙ্গে যজ্ঞীয় যূপে বলি দেওয়া হত। রাত্রে রাণীরা ঘোড়ার মৃত দেহের পাশে শুয়ে থাকতেন বা পাহারা দিতেন। ঘোড়ার বুকের মেদ অগ্নিদগ্ধ করে যজ্ঞে দীক্ষিত রাজা দগ্ধ বসার ধূম গ্রহণ করতেন। ঘোড়ার দেহের অন্যান্য অংশও খণ্ড খণ্ড করে কেটে দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দিযে হোম করা এবং যজমানের অবভৃথ স্নান ও ঋত্বিকদের দক্ষিণা দিযে যজ্ঞ শেষ হত। নিমন্ত্রিত সমস্ত রাজাদের ও দেশে অন্যান্য লোকদের নানা উপহার দেওয়া হত। বৈদিক গ্রন্থগুলিতে অশ্বমেধের উচ্ছ্বসিত মহিমা দেওয়া রয়েছে। সমস্ত পাপক্ষয় (মহাপাতকতাও) এবং স্বর্গ ও মোক্ষলাভ এর ফল। শত অশ্বমেধ করলে ইন্দ্রত্ব লাভ হয়। এই জন্য সগর ও দিলীপের শততম অশ্বমেধের ঘোড়া ইন্দ্র চুরি করেছিলেন। রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির দুজনেই এই যজ্ঞ করেছিলেন।

অশ্বমেধ ধর্মীয় যজ্ঞ হলেও এটি রাজনীতিক ক্রিয়া। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এটিকে উৎসন্ন যজ্ঞ বলা হয়েছে। উৎসন্ন কেন বলা হয়েছিল স্পষ্ট নয় তবে এই যজ্ঞের ব্যায়-বাহুল্য রাজাদের উৎসন্ন যাবার মতই ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে বা অন্য কারণে ক্রমশ এই যজ্ঞ অপ্রচলিত হয়ে যায়। কলিযুগে এটি নিষিদ্ধ। শারদীয়া দুর্গাপূজাকে কলির অশ্বমেধ বলা হয়। ঐতিহাসিক যুগে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ দুবার এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমুদ্রগুপ্ত একবার এই যজ্ঞ করেছিলেন।

অশ্বসেন—নাগ। তক্ষকের ছেলে। খাণ্ডবদাহনের (দ্রঃ) সময় কোন মতে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। অগ্নি, অর্জুন ও কৃষ্ণ অন্য মতে কেবল অর্জুন অশ্বসেনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে সে নিরাশ্রয় হয়ে থাকবে। কুরুক্ষেত্রে কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধের সময় প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছায় অজ্ঞাতে সর্পবাণ রূপে কর্ণের তূণে প্রবেশ করেন। কর্ণ এই বাণ নিক্ষেপ করলে কৃষ্ণ বুঝতে পারেন এবং পায়ের চাপে রথকে এক হাত মাটিতে বসিয়ে দিলে এই বাণ অর্জুনের স্বর্ণ কিরীট দগ্ধ করে যায়। অশ্বসেন বিফল হয়ে কর্ণের কাছে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে আবার বাণরূপে নিক্ষিপ্ত হতে চান। কর্ণ এক বাণ দুবার ছুঁড়তে ও অন্যের সাহায্যে জয়লাভ করতে রাজি হন না। ফলে অশ্বসেন সরাসরি অর্জুনকে আক্রমণ করতে যান এবং অর্জুনের হাতে নিহত হন। (২) দ্রোণের সারথি।

অশ্বহৃদয়—নল (দ্রঃ) এই মন্ত্র/বিদ্যা ঋতুপর্ণ রাজাকে দিয়েছিলেন। ঘোড়া কত সময়ে কতটা এগিয়ে গেল হিসাব করার মন্ত্র।

অশ্বিদ্বয়—অশ্বিনীকুমার। সূক্তসংখ্যার দিক থেকে হিসাব করলে ঋক্‌বেদে ইন্দ্র-অগ্নি ও সোম এদের পরেই স্থান। ৫০-এর অধিক সূক্ত প্রধানত এঁদের দুজনের জন্য। এঁরা দ্যুস্থানের (=স্বর্গের) দেবতাদের মধ্যে পরিগণিত। যাস্ক বলেছেন দ্যুস্থান দেবতাদের মধ্যে এঁরা মুখ্য; বিশ্বকে এঁরা ব্যাপ্ত (অশ্‌-ধাতু) করেন; একজন রসের দ্বারা আর একজন জ্যোতির দ্বারা। যাস্কের মতে এঁরা ইন্দ্র ও সূর্য। ঔর্ণবাভ আচার্যের মতে, এঁরা অশ্বযুক্ত বলে অশ্বী। বিভিন্ন মতে (১) এঁরা আকাশ ও পৃথিবী, (২) দিন ও রাত (৩) সূর্য ও চন্দ্র (৪) পুণ্যবান দুজন রাজা, (৫) বিবস্বান ও কারণ্যুর যমজ পুত্র, (৬) আকাশের পুত্র, (৭) সিন্ধুগর্ভজাত, (৮) দক্ষসম্ভূত (৯) সূর্যের সন্তান ও জামাতা। এঁরা যুবা, পুরাতন, মধ্যবর্ণ, জ্যোতির অধীশ্বর, উজ্জ্বলবর্ণ-পদ্মমালা বিভূষিত, বলশালী, ভয়ানক কৌশলী, জ্ঞানী, অহঙ্কারের ধ্বংস কারক। সুবর্ণময় রথে এঁরা দিনে তিনবার ও রাতে তিনবার জগৎ পরিক্রমণ করেন।

এঁরা প্রত্যুষে ঊষার আগে জগতে আলোক নিয়ে প্রবেশ করে ঊষাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। এঁদের উদয় হয় অর্দ্ধরাত্রের পর, পূর্ণ প্রকাশের ব্যাঘাত পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রাতঃকালীন দেবতা (নিরু ১২।১)। পরবর্তী যুগে এঁদের চির যুবক ও অদ্ভুত চিকিৎসক বলা হয়েছে। এইজন্য দেববৈদ্য রূপেও পরিচিত। একটি মানবিক বা ঐতিহাসিক উপাদান এবং একটি দেবতা-মত উপাদান মিলে এই অশ্বি-দ্বয়ের কল্পনা গড়ে উঠেছিল। মানবীয় উপাদান অর্থে কোন এক অসাধারণ চিকিৎসকের ক্ষমতা এবং দেবতা মত উপাদান অর্থে আলোকের রোগ নিরাময় ক্ষমতা ইত্যাদি মিলে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম। ঋক্ বেদে আছে (১) এঁরা বৃদ্ধ চ্যবন ঋষিকে আবার যৌবন এনে দেন; (২) পুরুমিত্রযোষা কমদ্যুকে রথে করে যুবা বিমদের কাছে নিয়ে যান; (৩) যুদ্ধে বিশ্‌পলার জঙ্ঘা ছিন্ন হলে লোহার জঙ্ঘা তৈরি করে দেন; (৪) মহাভারতে আছে উপমন্যুকে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেন; (৫) ঘোষানাম্নী একটি জরৎকুমারী পিতৃগৃহে কুমারীত্ব দশা থেকে এঁদের প্রসাদে মুক্তি পান।

দ্রৌপদীর বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। খাণ্ডবদাহনে অর্জুনের পক্ষে ছিলেন। যুবনাশ্বের গর্ভ থেকে শল্য প্রয়োগে মান্ধাতাকে বার করে এনে ছিলেন। ইন্দ্র এঁদের সোম পান করতে দিতেন না কিন্তু চ্যবনের (দ্রঃ) চেষ্টায় দিতে বাধ্য হন। আশ্বিন মাসে এঁদের নামে ঘি দান করলে সুন্দর দেহ হয়। দীর্ঘতমসের পুত্র দীর্ঘশ্রবস্ এঁদের কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে বৃষ্টি পেয়েছিলেন (ঋক্)। বনের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে তৃষ্ণায় গৌতম এঁদের দুজনকে স্মরণ করলে এঁরা কূপ কেটে জলের ব্যবস্থা করে দেন। দধীচির (দ্রঃ) কাছে মধুবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। এঁদের বাহন গাধা; এই গাধা একবার নেকড়ে বাঘ সেজে বৃষাগীঃর ছেলে ঋজ্রাশ্বের কাছে যায়। ঋজ্রাশ্ব স্থানীয় জনগণের একশত ছাগল এনে একে খেতে দেন। এই কারণে বৃষাগীঃ ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিয়ে ছেলেকে অন্ধ করে দেন। অশ্বিনী-

কুমারদের প্রার্থনা করলে এ'রা আবার চোখ ফিরে পান। সূর্য একবার ঘোড় দৌড় করান এবং যে জিতবে তার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবেন ঠিক করেন। অশ্বিনী কুমারেরা জিতে এই মেয়েকে বিয়ে করেন। অশ্বিনীকুমাররা বিশ্বক অসুর ও তাঁর বংশ নষ্ট করেছিলেন।

সূর্যের দুটি ছেলে নাসত্য (দ্রঃ) ও দস্র ; অপর নাম অশ্বিনীদেব। বিশ্বকর্মার মেয়ে সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে উত্তরকুরুবর্ষে ঘোটকী বেশে বেড়াতে/ তপস্যা করতে থাকেন। সংজ্ঞা নাই ঘটনাটা জানতে পেরে ধ্যানে সংজ্ঞা কোথায় আছেন সূর্য নির্দ্ধারণ করে ঘোটক বেশে সেখানে যান। অশ্বিনীর (= সংজ্ঞার) গর্ভে সূর্যের আশ্বিন ও রেবন্ত দুটি যমজ ছেলে হয়। এঁরাই স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার। অন্য মতে অশ্বিনীকুমার ও রেবন্ত তিনটি ছেলে হয়।

পরম সুন্দর আশ্বিন ও রেবন্ত এক রকম দেখতে ; এক সঙ্গে থাকতেন এবং চিকিৎসা বিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। এঁদের কয়েকটি বিশেষণ:-যুবানা, বভ্রু, হিরণ্যপেশসা, মায়াবিনা, হিরণ্যবর্তনী, রুদ্রবর্তনী। ঋক্‌বেদে এঁদের রথ হিরণ্ময় ; এই রথের ঈষা ও অক্ষ হিরণ্যয়। এই রথ ত্রিচক্র, ত্রিবন্ধুর, এবং এর পবিসংখ্যাও তিন। এই রথের গতি অতি দ্রুত রঘুবর্তনি ; এবং সহস্র আভরণ ও সহস্র কেতুতে ভূষিত—সহস্রকেতু, সহস্রনির্ণিজ। রথের বাহন কখনো রাসভ, কখনো বিহঙ্গ, কখনো শ্যেন বা হংস সদৃশ ক্ষিপ্র অশ্ব। মাদ্রীর (দ্রঃ) গর্ভে এঁদের ঔরসে দুটি ছেলে হয় নকুল ও সহদেব। এঁদের প্রণীত গ্রন্থ 'চিকিৎসা সারতন্ত্র'।

অশ্বিনী—(১) সূর্যের স্ত্রী সংজ্ঞা। (২) স্বর্গে অপ্সরা। (৩) নক্ষত্র বিশেষ (হেড অব এরিজ ; আরিয়েটিস্ বিটা বা গামা)। (৪) দক্ষ প্রজাপতির মেযে ও চন্দ্রের স্ত্রী। ঘোড়ার মাথা মত দেখতে বলে এই নাম। চন্দ্রের ২৭-টি স্ত্রীর মধ্যে প্রথমা। চন্দ্র মণ্ডলের সাতাশটি নক্ষত্রেব মধ্যে ঘোড়াব মাথার আকৃতি নক্ষত্রটি। যে মাসে পূর্ণিমাতে চন্দ্র এই নক্ষত্রে গমন বরেন সেই মাস আশ্বিন।

অশ্বিনীকুমার—অশ্বিদ্বয়।

অশ্বিনীসুত—সুতপস্ মুনির স্ত্রী তীর্থে গেলে সূর্য এঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে জোর করে নিয়ে চলে যান এবং অশ্বিনীসুত নামে একটি ছেলে হয়। তীর্থ থেকে সন্তান নিযে ফিরে এলে মুনি সব জানতে পারেন এবং এঁদের তাড়িয়ে দেন। সূর্য এই ছেলেকে জ্যোতিষ ইত্যাদি শিক্ষা দিয়েছিলেন। সুতপস্ মুনি শাপ দিয়েছিলেন রুগ্ন হয়ে পড়বে কিন্তু পরে করুণা করে বলেন সূর্যপূজা করলে নীরোগ হবেন।

অশ্মক—(১) সূর্যবংশে এক রাজা। কল্মাষপাদের (দ্রঃ) স্ত্রী মদয়ন্তীর ছেলে। (২) জনৈক ঋষি।

অশ্মক—অস্মক। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে দাক্ষিণাত্যে একটি দেশ। কূর্মপুরাণে পাঞ্জাবের কোন অংশ। বৃহৎসংহিতায় উ-পশ্চিমে কোন দেশ। অন্য মতে বৌদ্ধযুগের অস্সক এবং অবন্তির উ-পশ্চিমে অবস্থিত। বুদ্ধের সময় গোদাবরী তীরে অস্সক দেশীয় লোকেরা বাস করত এবং এখানে প্রধান সহর ছিল পোতন। সুত্তনিপাত

ও পারায়নবগ্‌গ অনুসারে গোদাবরী ও নর্মদা তীরে মাহিষ্মতীর মধ্যে কোন স্থানে অবস্থিত। একে অলকা ও মূলকাও বলা হয়েছে। মহাভারতের প্রতিষ্ঠান; বৌদ্ধ পোতালি বা পোতন অশ্মকের রাজধানী। অশোকের সময় মহারাষ্ট্রের অংশ ছিল। খৃ ৬-শতকে দণ্ডী একে বিদর্ভের আশ্রিত বলেছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের টীকাকার ভট্টস্বামী একে মহারাষ্ট্র বলেছেন। মহাভারতে অশ্বক নামেও অভিহিত। অশ্মকের এক রাজার নাম ও অশ্মক ছিল; ইনি পাণ্ডব পক্ষে ছিলেন।

অশ্মকী—শর্মিষ্ঠার ছেলে পুরু; স্ত্রী কৌশল্যা, ছেলে জন্মেঞ্জয়। জন্মেঞ্জয়ের স্ত্রী অনন্তা বা মাধবী, ছেলে প্রাচীম্বা, অর্থাৎ সমস্ত প্রাচী জয় করেছিলেন। প্রাচীম্বার স্ত্রী অশ্মকী; ছেলে সঞ্জাতি।

অশ্মযুগ—তিন ভাগঃ-আদি, মধ্য ও অন্ত্য। পাঞ্জাব, গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্য ইত্যাদিতে আদি অশ্ম যুগের আয়ুধ পাওয়া গেছে।' এগুলি অধিকাংশই অশ্মপিণ্ড থেকে এবং কিছু কিছু অশ্মশল্ক থেকে তৈরি। সোহান নদীর তীরে এক-মুখ আয়ুধের প্রাচুর্য দেখা যায়। কাংড়া জেলায় বাণগঙ্গা নদীর উপত্যকাতে ও এই জাতীয় অস্ত্র পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই জাতীয় আয়ুধের ধারা পূর্ব ও দ-পূ এসিয়া থেকে আগত। মাদ্রাজ অঞ্চলে দ্বিমুখ আয়ুধ ও পাওয়া গেছে; এগুলি অশ্মপিণ্ড থেকে তৈরি। এই জাতীয় আয়ুধের সঙ্গে ইউরোপ ও আফ্রিকার আবেভিলীয় অ্যাশিউলীয় আয়ুধের মিল আছে। হিমালয়ের পাদদেশ ব্যতীত সর্বত্রই দ্বিমুখ অস্ত্রের প্রাধান্য।

মধ্য অশ্মযুগে অস্ত্র ছোট। অধিকাংশই এগুলি কর্নেলিয়ান, জাসপার, এগেট ও চার্ট ইত্যাদি পাথর থেকে। এগুলির বহুবিধ আকৃতি। অন্ত্য অশ্মক যুগে অস্ত্রগুলি মধ্য যুগীয় অস্ত্র থেকে আকারে কেবল ছোট; আর সব দিক থেকে একই রকমের। বর্দ্ধমান জেলার বীরভানপুরে এই রকম অস্ত্র পাওয়া গেছে। গুজরাট ও অন্ধ্রপ্রদেশে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের ক্ষুদ্রাশ্মীয় অস্ত্র পাওয়া গেছে। অশ্মযুগের পর নবাশ্মযুগ।

অশ্মোপাখ্যান—অশ্মগীতা। মহাপণ্ডিত অশ্মন জনককে মানুষের ভাগ্যোদয় ও ভাগ্যহানি ভিত্তিক যে তত্ত্ব জ্ঞান দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এই তত্ত্ব কথাই আবার শোনান।

অশ্লেষা—নবম নক্ষত্র।

অষ্টউপায়—মুক্তির উপায়। যজ্ঞ, দান, বেদপাঠ, তপস্যা, দম, সত্য, ঋজুতা ও মৃদুতা।

অষ্টক—(১) যযাতির মেয়ে মাধবীর গর্ভে বিশ্বামিত্রের ছেলে। একজন রাজর্ষি। স্বর্গ থেকে যযাতির পতনের সময় এক জায়গায় এই অষ্টক ও এঁর তিন ভাই (দ্রঃ মাধবী) প্রতর্দন, বসুমান ও ঔশীনর-শিবির সঙ্গে দেখা হয়। যযাতির পরিচয় পেয়ে অষ্টক নিজের পুণ্য দিয়ে অন্তরীক্ষ বা দিব্যের যে কোন স্থান যযাতিকে দিতে চাইলেন। অন্য তিন ভাইও অনুরূপ স্থান দিতে চান। কিন্তু এঁদের পুণ্যে যযাতি একা স্বর্গে ফিরে যেতে রাজি হন না। শেষ পর্যন্ত এঁরা ৫-জনে এক সঙ্গে স্বর্গে যান।

একবার অষ্টক অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যজ্ঞের পর প্রতর্দন ইত্যাদি তিন ভাইকে নিয়ে আকাশে বিচরণ করতে করতে নারদের সঙ্গে দেখা হয়। নারদের কাছে অষ্টক জানতে চান তাঁদের এই ৫-জনের মধ্যে কে কত বেশি পাপী। নারদ জানান অষ্টক সব চেয় পাপী ; ৫-জনে স্বর্গে যেতে গেলে যদি কাউকে বাদ যেতে হয় তাহলে অষ্টক আগে বাদ যাবেন। কারণ অষ্টক একবার ব্রাহ্মণদের গরুদান করে গর্ব করে সেই কথা বলেছিলেন ; মনে গর্ব ছিল। তারপর বাদ যাবেন প্রতর্দন ; কারণ প্রতর্দন একবার রথে করে যাবার সময় চারজন ব্রাহ্মণ এসে ঘোড়া চাইলে প্রতর্দন রথ থেকে ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেই রথ টানতে থাকেন ; কিন্তু দান করলেও গালিও দিয়েছিলেন। এরপর বাদ দিতে হলে বসুমনা বাদ যাবেন। কারণ বসুমনা নিজের রথ সম্বন্ধে অত্যন্ত গর্বিত। এবং এর পরেও যদি কাউকে বাদ দিতে হয় অর্থাৎ একজন মাত্র যদি স্বর্গে যাবার অধিকার পান তাহলে নারদ নিজেও বাদ যাবেন। কারণ শিবির তুলনায় নারদের পুণ্যও তুচ্ছ।
(২) দুষ্মন্ত (১)—ভরত (২)—অজমীঢ় (৫)—অষ্টক (৬)। (৩) পাণিনীর আটটি সূত্র।

অষ্টকা—যে তিথিতে পিতৃগণ শ্রাদ্ধ ভক্ষণ করেন। গৌণচান্দ্র পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুনের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। অন্য মতে হেমন্ত ও শিশিরের চারটি কৃষ্ণাষ্টমী।

অষ্টকাত্রয়—পৌষ কৃষ্ণাষ্টমী পূপাষ্টকা, মাঘ কৃষ্ণাষ্টমী মাংসাষ্টকা এবং ফাল্গুন কৃষ্ণাষ্টমী শাকাষ্টকা। এই তিথিতে যথাক্রমে অপূপ, মাংস ও শাক দিয়ে শ্রাদ্ধ বিধেয় (বায়ু-পু)।

অষ্টগন্ধ—চন্দন, গুগগুল, কুঙ্কুম, অগুরু, কর্পূর, গোরচনা, জটামাংসী ইত্যাদি।

অষ্টগুণ—দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা।

অষ্টতারিণী—তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, শাশ্বতী, যামেশ্বরী, চামুণ্ডা ; ভগবতীর এই আটমূর্তি।

অষ্টদল—অষ্ট পত্রক যন্ত্র। অষ্ট চক্রের অন্তর্গত দ্বিতীয় চক্র। স্বাধিষ্ঠান পদ্ম। দ্রঃ ষটচক্র।

অষ্টদিক্‌গজ—দ্রঃ-দিক গজ।

অষ্টদিকপাল—আট দিকের অধীশ্বর। পূর্বে ইন্দ্র, অগ্নিকোণে অগ্নি, দক্ষিণে যম ; নৈর্ঋতে নির্ঋতি, পশ্চিমে বরুণ, বায়ুকোণে মরুৎ, উত্তরে কুবের, ঈশানকোণে ঈশ। দ্রঃ-অমরাবতী।

অষ্টদ্রব্য—অশ্বত্থ, উডুম্বর, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ-এদের কাঠ এবং তিল, সিদ্ধার্থ, পায়স ও আজ্য। এই আটটি হোমের জিনিস।

অষ্টধর্ম—সত্য, শৌচ, অহিংসা, অনসূয়া, ক্ষমা, অনৃশংসতা, অকার্পণ্য ও সন্তোষ। দ্রঃ অষ্টগুণ।

অষ্টধাতু—সোনা, রূপা, তামা, রাঙ (বঙ্গ), যশদ (ইস্পাত), সীসা, লোহা ও পারদ। প্রতিমা তৈরিতে পারদের বদলে পেতল গ্রহণীয়।

অষ্টনাগ—অনন্ত বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর (কুলিক) কর্কট ও শঙ্খ।

অষ্টনায়িকা—(১) পার্বতীর আট মূর্তি। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা, চণ্ডবতী। অন্য মতে মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী ও কৌমারী। এদের অষ্ট যোগিনীও (দ্রঃ) বলা হয়।

(২) কাব্যে নাটকে স্বাধীন পতিকা, বাসক সজ্জিকা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও অভিসারিক।

অষ্টনিধি—কুবেরের আট রত্ন :-পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নীল, নন্দ, ও শঙ্খ।

অষ্টপারিষদ—নন্দ, সুনন্দ, চণ্ড, প্রচণ্ড, কুমুদ, কুমুদেক্ষণ, বল ইত্যাদি বিষ্ণুর পারিষদ।

অষ্টবজ্র—সুদর্শন, শূল, ব্রহ্মার অক্ষমালা, বজ্র, বরুণের পাশ, যমদণ্ড, কার্তিকের শক্তি, দুর্গার খড়্গ। দুর্বাসার শাপে ঘোটকযোনি প্রাপ্ত উর্বশী এই অষ্টবজ্রের মিলনে মুক্ত হন।

অষ্টবর্গ—জন্ম সময়ে সূর্য ইত্যাদি আটটি গ্রহের স্থিতি অনুসারে শুভাশুভ ফলসূচক চক্র।

অষ্টবসু—ধর্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যা বসুর (দ্রঃ) গর্ভে জন্ম ধর, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, সাবিত্র (মহাভারতে অহঃ), প্রত্যূষ, প্রভাস। বিষ্ণুপুরাণ মতে দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বসু/বাস্ত ও বিভাবসু। এই নাম সব জায়গায় সমান নয়। ভব, বিষ্ণু, প্রভব, দ্যু, ধর্ম, আপ, অহঃ (দ্রঃ) ইত্যাদি নামও পাওয়া যায়। এঁদের পিতামাতা স্ত্রী ও সন্তানদের নাম সম্বন্ধে ও মতভেদ রয়েছে। দ্রঃ বসু।

অষ্টবিবাহ—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, গন্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস, পিশাচ।

অষ্টভার্যা—কৃষ্ণের স্ত্রী। রুক্মিণী, জাম্ববতী, সত্যভামা, মিত্রবিন্দা, সত্যা, ভদ্রা, লক্ষ্মণা, কালিন্দী।

অষ্টভৈরব—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ, সংহার।

অষ্টমঙ্গল—(১) বুক, ও লেজ, চারটি খুর, কেশ ও মুখ সাদা এইরকম ঘোড়া। (২) সিংহ, হস্তী, বৃষ, কলস, ব্যজন, পতাকা, ভেরী, দীপ। অন্য মতে ব্রাহ্মণ গো, অগ্নি, সূর্য, ঘৃত, স্বর্ণ, জল ও রাজা। দর্পণ, দীপ' কলস, বস্ত্র, অক্ষত, অঙ্গনা, ও স্বর্ণ ইত্যাদি ইত্যাদি আটটি বিভিন্ন বস্তুর (মতানুযায়ী) সমাহার।

অষ্টমাঙ্গল্য—অষ্ট মঙ্গল (দ্রঃ)।

অষ্টমাতৃকা—মাতৃকা (দ্রঃ)।

অষ্টমার্গ—সম্যক দৃষ্টি, স-সংকল্প, স-বাক, স-কর্ম, স-আজীব, স-ব্যায়াম, স-স্মৃতি স-সমাধি। দ্রঃ-অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

অষ্টমূর্তি—শিবের আট মূর্তি, সর্ব ক্ষিতিমূর্তি, ভব জলমূর্তি, অগ্নি তেজমূর্তি, বায়ু মরুৎমূর্তি, ভীম আকাশ মূর্তি, পশুপতি যজমান মূর্তি, মহাদেব চন্দ্রমূর্তি ও ঈশান সূর্যমূর্তি।

অষ্টযোগিনী—দুর্গার আট সখী :—শৈলপুত্রী, চণ্ডঘণ্টা, স্কন্দমাতা, কালরাত্রি, চণ্ডিকা, কুষ্মাণ্ডী, কাত্যায়নী ও মহাগৌরী। দ্রঃ অষ্ট নায়িকা।

অষ্টরস—শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস ও রৌদ্র।

অষ্টরিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, অসূয়া ও দম্ভ।

অষ্টলোহ—সোনা, রূপা, রাঙ, তামা, সীসা, কান্তলোহ, মুণ্ডলোহ ও তীক্ষ্ণলোহ।

অষ্টসখী—রাধা-গদাধর পণ্ডিত, ললিতা-স্বরূপ গোস্বামী, বিশাখা-রায় রামানন্দ, সুচিত্রা-শিবানন্দ, চম্পক লতা-বামানন্দ, রঙ্গদেবী-গোবিন্দ ঘোষ, সুদেবী-বাসুঘোষ তুঙ্গ-শ্রীমাধব ঘোষ।

অষ্টসাহস্রিক—দ্রঃ প্রজ্ঞাপারমিতা।

অষ্টসিদ্ধি—অণিমা, গরিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব।

অষ্টাঙ্গ—জানু, পদ, পাণি, বক্ষ, বুদ্ধি, শির, বাক্য ও দৃষ্টি—প্রণামের এই আটটি অঙ্গ। রথ, হস্তী, অশ্ব, যোধ, পত্তি, কর্মকার, চার ও দৈশিকমুখ্য (দেশের প্রধান ব্যক্তি)—সেনার এই অষ্ট অঙ্গ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার (ইন্দ্রিয় সুখ থেকে মনকে টেনে নেওয়া) ধারণা, ধ্যান সমাধি যোগের এই অষ্ট অঙ্গ। জল, ক্ষীর কুশাগ্র, দধি, ঘি, আতপচাল, যব, শ্বেত, সর্ষপ—পূজার অষ্ট উপচার। ব্যবহারশাস্ত্র, বিচারক, সভ্য, লেখক, জ্যোতির্বিৎ, স্বর্ণ, অগ্নি, জল—বিচারালয়ে অষ্ট অঙ্গ। শল্য, শালক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, বাজীকরণ—আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গ। স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, ক্রিয়ানিষ্পত্তি—এগুলি অষ্টাঙ্গ রতি/মৈথুন।

অষ্টাঙ্গবিদ্যা—ষড়ঙ্গ চারবেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র।

অষ্টাঙ্গিকমার্গ—আট অঙ্গ সমন্বিত বুদ্ধদেব প্রদর্শিত মুক্তি মার্গ : (১) সম্যক দৃষ্টি—চার আর্যসত্য ও দ্বাদশ নিদান যুক্ত প্রতীত্য-সমুৎপাদ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান। (২) সম্যক সঙ্কল্প—কাম, হিংসা, প্রতিহিংসা বিহীন, নিষ্কাম, মৈত্রী ও করুণার সঙ্কল্প। (৩) সম্যক বাক্য—মিথ্যা, পিশুন ও কটুবাক্য ত্যাগ করে সত্য, প্রিয়, মিষ্ট, ও অর্থপূর্ণ বাক্য। (৪) সম্যক কর্ম—প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার ও মাদক সেবন বাদ দিয়ে দয়া, বদান্যতা ও চরিত্র সৎ রাখার কর্ম। (৫) সম্যক জীবিকা—মিথ্যা জীবিকা বাদ দিয়ে সৎজীবিকার আশ্রয় নেওয়া। অস্ত্র, প্রাণী, মাংস, নেশা, ও বিষয়বাণিজ্য মিথ্যা জীবিকার অন্তর্গত। (৬) সম্যক উদ্যম—ইন্দ্রিয় সংযম, কুচিন্তা ত্যাগ, সুচিন্তা, উৎপন্ন সৎচেষ্টার স্থিতি ও বৃদ্ধির চেষ্টা। (৭) সম্যক স্মৃতি—কায়, বেদনা, চিত্ত ও মানসিক ভাব সমূহের প্রকৃত স্মৃতি। এদের মালিন্য ও ক্ষণভঙ্গুরতার প্রতি সতর্ক থাকা। (৮) সম্যক সমাধি—কাম ও অকুশল চিন্তা ত্যাগ করে চিত্তের একাগ্রশীলতা সাধন।

অষ্টাদশধান্য—যব, গোধূম, ধান, তিল, কঙ্গু, কুলত্থ, মাষ, মুদ্গ, মসূর, নিষ্পাব, শ্যামাক, সর্ষপ, গবেধুক, নীবার, আঢ়কী সতীনক, চণক ও চীনক।

অষ্টাদশপুরাণ—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, বায়ু, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড। দ্রঃ পুরাণ।

অষ্টাবক্র—মহর্ষি; সংহিতাকার। পিতা কহোড় বা খগোদর মাতা সুমতি অন্য নাম সুজাতা; মাতামহ উদ্দালক। গর্ভস্থ বালক শুনে শুনে সর্ব বেদজ্ঞ হয়ে ওঠেন এবং এক দিন কহোড়ের বেদ পাঠে উচ্চারণে ভুল থাকায় গর্ভ থেকে শিশু পিতার ভুল ধরিয়ে দেন। রেগে গিয়ে কহোড় শাপ দেন গর্ভেতেই যে শিশুর স্বভাব এত বক্র জন্মালে তার দেহ যেন আট জায়গায় বেঁকে যায়। ফলে শিশু বক্রাঙ্গ হয়ে জন্মান ও অষ্টাবক্র নাম হয়। এই সন্তান জন্মের আগে জনক রাজার সভাপণ্ডিত বাদবিৎ বন্দীর কাছে তর্কযুদ্ধে কহোড় পরাজিত হন। এই তর্ক যুদ্ধের সর্ত মত বন্দী কহোড়কে জলে ডুবিয়ে রাখেন। অন্য মতে কহোড় জলে প্রাণ বিসর্জন করেন। উদ্দালকের কথা মত সুজাতা ছেলেকে কহোড়ের কথা কিছুই বলেন নি। ফলে শিশু উদ্দালককেই বাবা বলে জানতেন। অষ্টাবক্রের মামা শ্বেতকেতু একদিন অষ্টাবক্রকে উদ্দালকের কোল থেকে নামিয়ে দেন এবং বলেন, অন্য মতে এরা দুজনে নদীতে স্নান করতে গেলে কথায় কথায় শ্বেতকেতু বলেন উদ্দালক অষ্টাবক্রের বাবা নন। এর ফলে সুজাতা ছেলেকে কহোড়ের কাহিনী জানাতে বাধ্য হন। বার বছর বয়সে অষ্টাবক্র তখন মাতুল শ্বেতকেতুর সঙ্গে রাজসভাতে এসে তর্ক যুদ্ধে বা কবির লড়াইতে বন্দীকে পরাজিত করেন। এবারও সর্ত অনুসারে বন্দীকে জলে আত্ম বিসর্জন দিতে হয় এবং কহোড় সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে উঠে আসেন। কহোড় তখন সন্তুষ্ট হয়ে ছেলেকে সমঙ্গা নদীতে স্নান করতে বলেন এবং স্নান করে অষ্টাবক্র সুন্দর সমঙ্গ দেহ ফিরে পান। বদান্য ঋষির মেয়ে সুপ্রভার রূপে মুগ্ধ হয়ে অষ্টাবক্র তাঁকে বিয়ে করতে চান। অষ্টাবক্রের ভালবাসা পরীক্ষা করবার জন্য বদান্য তখন এক বৃদ্ধ তপস্বিনীর সঙ্গে দেখা করে আসবার জন্য হিমালয়ে কুবের ভবনাদি পার হয়ে হর-পার্বতীকে প্রণাম করে আরো উত্তরে একটি বনে ঘুরে আসতে বলেন। অষ্টাবক্র বার হয়ে পড়েন এবং কুবের ভবনে এক বৎসর মত অতিথি থাকেন; গন্ধর্ব কন্যাদের নৃত্যগীত উপভোগ করেন, তারপর শিব পার্বতীকে প্রণাম করে শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধার কাছে এলে বৃদ্ধা তাঁকে বিধিমত অভ্যর্থনা করেন এবং প্রতিরাত্রে নানা ভাবে তাঁর সংযম পরীক্ষা করতে থাকেন। অন্য মতে সাতটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে দেখতে পান। এদের মধ্যে যে প্রধানা অর্থাৎ 'উত্তরা' থেকে যান বাকি মেয়েরা অষ্টাবক্রের নির্দেশে চলে যান; এবং এই উত্তরাই অষ্টাবক্রের সংযম পরীক্ষা করেন। এবং শেষ পর্যন্ত অষ্টাবক্রের সংযমে মুগ্ধ হয়ে নিজের পরিচয় দেন। বৃদ্ধা ছিলেন উত্তর দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; ঋষি বদান্যের অনুরোধে অষ্টাবক্রকে পরীক্ষা করছিলেন। এরপর অষ্টাবক্র ফিরে আসেন এবং সুপ্রভার সঙ্গে বিয়ে হয়। জনক রাজাকে মোক্ষ সম্বন্ধে অষ্টাবক্র যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন তারই নাম অষ্টাবক্র সংহিতা। অষ্টাবক্রকে দেখে কয়েক জন দিব্যাঙ্গনা একবার উপহাস করেন। ফলে অষ্টাবক্রের শাপে এঁরা কৃষ্ণের স্ত্রী হয়ে জন্মান এবং কৃষ্ণের মৃত্যুর পর যখন এঁরা অর্জুনের সঙ্গে চলে

আসছিলেন তখন দুর্বৃত্তদের হাতে অপহৃতা হন। রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এলে রাজ্যাভিষেকে অষ্টাবক্র ছিলেন।

অষ্টাবক্র—অসিত মুনি শিবের তপস্যা করে দেবল নামে একটি সন্তান লাভ করেন। অপ্সরা রম্ভা দেবলকে দেখে মুগ্ধ হলেও প্রত্যাখ্যাত হন এবং শাপ দিয়ে দেবলকে অষ্টাবক্রে পরিণত করেন। এরপর ছ হাজার বছর তপস্যা করলে কৃষ্ণ ও রাধা দেখা দেন এবং কৃষ্ণ আলিঙ্গন করলে এঁর দেহের সমস্ত বক্রতা চলে যায় এবং বিমানে করে তিন জনে স্বর্গে চলে যান।

অসঙ্গ—আচার্য অসঙ্গ। দ্বিতীয় ভাই বসুবন্ধু এবং আর এক ভাই বিরিঞ্চি-বৎস। পুরুষপুরে (পেশোয়ারে) এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। অনুজ বসুবন্ধুকে ইনি মহাযানী মতবাদে অনুরাগী করেছিলেন। অসঙ্গ সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ দার্শনিক। মহাযানী সম্প্রদায়ের যোগাচার শাখা খৃ ৪-৫ শতকে এঁর দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। মৈত্রেয় এঁকে প্রবুদ্ধ করেন। অন্যমতে এই মৈত্রেয় হচ্ছেন অভিসময়ালংকার প্রণেতা মৈত্রেয় নাথ। আচার্য অসঙ্গের দৃষ্টি ছিল সাধকের। পরমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা সাধকের আলোচনা। এঁর রচনা সূত্রালঙ্কার, মহাযান সম্পরিগ্রহ শাস্ত্র, যোগাচার-ভূমিশাস্ত্র, মহাযানাভি-ধর্মসংগীতি শাস্ত্র, বজ্রচ্ছেদিকা প্রজ্ঞাপারমিতার টীকা।

অসমঞ্জ—অযোধ্যার রাজা সগরের স্ত্রী কেশিনী ও সুমতি। পুত্র কামনায় রাজা এঁদের নিয়ে হিমালয়ে ১০০ বছর তপস্যা করলে মহর্ষি ভৃগুর বরে কেশিনীর অসমঞ্জ এবং সুমতির ৬০ হাজার ছেলে হয়। অসমঞ্জ বংশ রক্ষা করবে এবং বাকিগুলি ধ্বংস হবে বর ছিল। পরে অসমঞ্জ দুরাত্মা ও প্রজাপীড়ক হয়ে ওঠেন। ছোট ছোট ছেলেদের সরযূতে ফেলে দিতেন, তারা ডুবে যেতে : অসমঞ্জ মজা দেখতেন। শেষ পর্যন্ত সগর তাঁকে তাড়িয়ে দেন। অসমঞ্জের ছেলে অংশুমান প্রজারঞ্জক ছিলেন।

অসচ্ছাস্ত্র—বৌদ্ধ আগমাদি শাস্ত্র। শ্রুতি ও স্মৃতি বিরোধী।

অসহায়—মনুসংহিতার প্রাচীন ভাষ্যকার। সম্ভবত খৃ ৫-৬ শতকে। কুমারিল ভট্টের আগে। এঁর পূর্ববর্তী কোন ভাষ্যকার অজানা।

অসি—কাশীর দক্ষিণে নদী। কাশীর দক্ষিণে গঙ্গাতে এবং উত্তর দিকে বরণা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দ্রঃ বারাণসী।

অসিক্লী—বীরণ প্রজাপতির মেয়ে অন্য নাম বৈরণী। দ্রঃ পঞ্চজন। দক্ষের স্ত্রী। দক্ষ প্রথম দিকে মন থেকে সব সৃষ্টি করছিলেন। পরে স্থির করেন স্ত্রী পুরুষের মিলনের মাধ্যমে সৃষ্টি করবেন। অসিক্লীর গর্ভে দক্ষ তখন প্রথমে হর্যশ্ব নামে ৫ হাজার পুত্রের জন্ম দেন। দ্বিতীয়বার শবলাশ্ব নামে একহাজার ছেলের জন্ম দেন এবং তৃতীয় বারে ৬০টি মেয়ে হয়। এঁদের মধ্যে ধর্ম ১০ জনকে (অরুন্ধতী, বসু, যমী, লম্বা, ভানু, মরুৎবতী, সংকল্পা, মুহূর্তা, স্বধা ও বিশ্বা ; প্রসূতির কন্যা হিসাবে ধর্মের (দ্রঃ) স্ত্রীদের যে সব নাম পাওয়া যায় সেগুলি একটু অন্য রকমের) ; কশ্যপ ১৩ জন (অদিতি, দিতি দনু, অরিষ্টা, খসা, সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু ও মুনি) ; অরিষ্টনেমি ৪ জনকে ; বহুপুত্র ২ জনকে ; অঙ্গিরস ২ জনকে ; ও কৃশাশ্ব

দুজনকে বিয়ে করেন। (২) ঋকবেদে একটি নদী। বর্তমান নাম চন্দ্রভাগা (চেনাব), পাঞ্জাবে।

অসিত—(১) হিমালয়বাসী এক জন ঋষি। বুদ্ধকে দেখতে এসেছিলেন। যিশুকে দেখতে যাবার মত। (২) সূর্যবংশে রাজা ভারতের ছেলে। পদ্মপুরাণে এঁর নাম বাহু। (৩) জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে একজন ঋত্বিক। ব্যাসের শিষ্য। শিবের বরে ছেলে হয় দেবল। জনক রাজাকে পুনর্জন্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছিলেন। দ্রঃ দেবল।

অসিতলোমা—একজন দানব। দনুর গর্ভে কশ্যপের ছেলে। মহিষাসুরের সঙ্গী। ব্রহ্মার বরে দুর্গাকে ও পরে বরুণকেও পরাজিত করেন। এর পর দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। দেবতারা তখন শিবের শরণাপন্ন হলে শিব সকলকে নিয়ে বিষ্ণুর কাছে যান। বিষ্ণুর দেহ থেকে তখন অষ্টাদশ-ভুজা মহালক্ষ্মী অবিভূ্ত হয়ে এঁকে নিধন করেন।

অসিতা—একজন অপ্সরা।

অসিতাঙ্গ—একজন ভৈরব।

অসিধারব্রত—অসিধারে স্থিতির ন্যায় দুষ্কর ব্রত। স্ত্রী ও পুরুষ ব্রহ্মচর্য নিয়ে দুজনের মধ্যে বিছানায় অসি রেখে শুয়ে থাকে। অর্থাৎ কঠিন সংযম পালনীয়। এই ব্রতে মনেও স্ত্রী সঙ্গ চিন্তা না করে যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে মুগ্ধ ভর্তৃবৎ যুবা আচরণ করণীয়।

অসিপত্র—(১) নরক বিশেষ। (২) ব্রত বিশেষ। অশ্বমেধে কর্তব্য।

অসিপত্রবন—নরক। এখানে গাছের পাতায় অসির মত তীক্ষ্ণ ধার। নিজের স্বাভাবিক কর্তব্য না করে অপরের কাজ করলে, অকারণে বৃক্ষ ছেদন করলে ও শাস্ত্র লঙ্ঘন করলে এই নরকে গতি হয় (স্মৃতি)। যমদূতেরা এখানে অসিপত্রের চাবুক মারে।

অসুর—বৈদিক ও পরবর্তী সাহিত্যে প্রচুর ব্যবহৃত শব্দ। অস্+উর+ক (নিরুক্ত)। অনেকের মতে প্রাচীন অস্সুর বা আসিরীয় অধিবাসীদের বোঝাত। ভারতে আর্যগোষ্ঠীর সঙ্গে মধ্য প্রাচ্যের অস্সুর সভ্যতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং এঁরাও বৈদিক যুগের সময় ভারতে অনুপ্রবেশ করতে চেষ্টা করেন। অন্য মতে অসুররা ভারতের অধিবাসী এঁদের সঙ্গে আর্যদের সঙ্ঘর্ষ হত। আবার আর একমতে আসিরীয় অধিবাসীরা আগে ভারতে এসেছিলেন; ভারতে আদিবাসী অর্থে আসিরীয় আগত এই সব লোক বুঝায়। গ্রীক দেশে এক কিংবদন্তী আছে অস্সুর দেশের সম্রাজ্ঞী সেমিরামিস্ ভারত জয় করবার জন্য আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য এ মতগুলি একটিও প্রমাণ ভিত্তিক নয়। আর এক মতে প্রাচীন আর্যগোষ্ঠী সম্ভবত মধ্য এসিয়ার আমুদরিয়া ও শিরদরিয়ার উপত্যাকায় বহুদিন বাস করেছিলেন। এঁদের বিশেষ একটি ধর্মও জীবন চর্চা গড়ে উঠেছিল; এবং প্রাচীন আর্য গোষ্ঠী থেকে এই ধর্ম ও জীবনচর্চা ভিন্ন। আদিম আর্যেরা অগ্নি ও প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করতেন। কিন্তু এই নতুন গোষ্ঠী অনেক গুলি ভাবরূপ দেবতার পূজা আরম্ভ করেছিলেন। প্রাচীন

প্রাকৃতিক শক্তিরূপী দেবতারা দেইবো (প্রাচীন ইন্দোইউরোপীয়) বা দইব (ইন্দইরানীয়) বা দেব (সংস্কৃত) নামে পরিচিত হলেন এবং ভাবরূপী নতুন দেবতারা অসুর নামে পরিচিত হলেন। সম্ভবত আসিরীয় রাষ্ট্রের প্রধান উপাস্য দেবতার নামটি এই উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়েছিল। মনে হয় ব্যাবিলনের কাস্সুবংশীয় রাজগণের মাধ্যমে অস্সুর প্রভাব আর্যধর্মের নবপর্যায়ের ওপর পড়েছিল। অসুর দলের প্রধান হলেন বরুণ আর দইব বা দেব দলের প্রধান হলেন ইন্দ্র এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্যগোষ্ঠী দুই সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে গেল। পণ্ডিতদের মতে মার্জিত রুচি চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কৃষিও গোপালন করতেন; এঁরা হলেন অসুর পন্থী। এবং অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দুর্ধর্ষ যুদ্ধবাদীরা দেবপন্থী। পরে অসুর পন্থীরা ইরানে ও দেব পন্থীরা ভারতে প্রবেশ করেন। এবং ইরানে অসুরপন্থীদের সঙ্গে কিছু দেবপন্থী ও ভারতে দেবপন্থীদের সঙ্গে কিছু অসুরপন্থী রয়ে গেলেন। সংস্কৃতিতে এবং চিন্তাশীলতায় অসুর পন্থীরা অনেক ওপরে ছিলেন ফলে দেবপন্থীদের সঙ্গে এদের প্রথমে সঙ্ঘর্ষ হয়েছিল পরে দেবপন্থীদের ওপর এরা প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। এই জন্য প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে কোথাও কোথাও অসুরদের ও অসুর ধর্মের নিন্দা আবার ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাদেরও প্রশংসা সূচক অসুর উপাধি দেখা যায়। অসুররা যে উন্নততর সভ্যাতার অধিকারী ছিলেন বৈদিক সাহিত্যে তা সুস্পষ্ট। পুরাণ এবং মহাকাব্যে অসুরদের সমান উন্নততর অবস্থা ফুটে রয়েছে। স্থাপত্য বিদ্যায় ময় দানব ইত্যাদি এবং ইন্দ্রজাল শক্তি ইত্যাদি ক্ষমতায় এরা অদ্বিতীয় ছিলেন. কিন্তু সংখ্যাগুরু দেবপন্থীদের ক্রমবর্দ্ধমান চাপে অসুরপন্থীরা ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে যান। তবুও এঁদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের বহু দৃষ্টান্ত আছে।

বেদে প্রাচীনতম অংশে অসুর অর্থে দেবতা। তুলনীয় আবেস্তাতে আহুর। ইন্দ্র, অগ্নি, ও বরুণ অসুর নামে পরিচিত। পরে অসুর অর্থে দেবতাদের শত্রু বোঝায়। এঁরা অমৃতের ভাগ পান নি। ঋক্‌বেদের শেষে এবং অথর্ব বেদেও এঁরা দেবতা বিরোধী। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে আছে প্রজাপতির নিশ্বাস একবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠে অসুরে পরিণত হয়। বিষ্ণু পুরাণে ব্রহ্মার জঙ্ঘা থেকে জন্ম। এঁরা দেবতাদের শত্রু, পূজা ও যাগযজ্ঞ বিরোধী। মৎস্য পুরাণ মতে অসুরদের তিনটি ইন্দ্র (=রাজা):—হিরণ্যকশিপু, বলি ও প্রহ্লাদ। অসুররা রাত্রি ও অন্ধকারের প্রতীক এবং তামসিকতায় পূর্ণ (ব্রহ্মাণ্ড পু)। দেবতাদের হাতে নিহত অসুর মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করে পৃথিবীতে নানা উপদ্রব করতেন।

বিহারে ছোটনাগপুর অঞ্চলে নেতারহাট উপত্যকায় অসুর নামে ক্ষুদ্র একটি আদিবাসী গোষ্ঠী বাস করে। এদের তিনটি সম্প্রদায় (১) বীর অসুর, (২) বিরজিয়া, (৩) আগারিয়া। পুরুষানুক্রমে এঁর লৌহ নির্মাতা। স্থানীয় পার্বত্য অঞ্চল থেকে খনিজ লৌহ এনে নিজস্ব পদ্ধিতে গালিয়ে নানা কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরি করে। একটি মতে এরা অসুর বংশধর; কিন্তু এরও কোন প্রমাণ নাই।

পুরাণে এঁরা কশ্যপ ও দিতির পুত্র। কয়েকটি প্রসিদ্ধ অসুর :—অনুহ্লাদ,

অসিলোমা, অয়ঃশিরস্, অশ্ব, অশ্বশিরস্, অশ্বপতি, অশ্বগ্রীব, অশ্বগতি, অমূর্দ্ধন্, অজক, একপাদ, একচক্র, কপট, কেশী, কুপট, কুম্ভ, কেতুমান গর্গ, চন্দ্র, চন্দ্রমস্, তুণ্ড, হুণ্ড দুর্জয়, নমুচি, নিকুম্ভ, প্রহ্লাদ, পুলোমা, পর বিশ্রুত, বেগবান, বিরূপাক্ষ, বলি, বাণ, বিরোচন, বিপ্রচিত্তি, বাস্কল, বৃষপর্বা; মহাকাল, মহাবল, মূর্দ্ধা, মায়াবান, শম্ভু, শরভ শলভ, শম্বর, শিবি, সূক্ষ্ম, সূর্য, স্বর্ভানু, সংহ্লাদ, হরাহর।

অস্তি—মগধরাজ জরাসন্ধের দুই মেয়ে অস্তি ও প্রাপ্তি। দুজনেই কংসের স্ত্রী। এঁদের প্ররোচনায় কংস যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।

অস্পৃশ্যতা—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আগে রচিত অত্রি ধর্ম-সূত্রে রজক, চর্মকার, কৈবর্ত, ভিল্ল প্রভৃতিরা অন্ত্যজ ছিল। এরা এবং প্রতিলোমজ চণ্ডালাদি শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু সেখানে অস্পৃশ্যতার কোন উল্লেখ ছিল না। ঠিক কোন সময় শূদ্র বর্ণ ছাড়া অন্য জাতিও অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য হয়েছিল জানা যায় না। মনে হয় কৌলিক বৃত্তির সঙ্গে বিচার করে এই অস্পৃশ্যতা গড়ে উঠে ছিল। সিংহল ও জাপানে অনুরূপ ভাবে অস্পৃশ্যতা রয়েছে; এবং এই অস্পৃশ্যতা ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শ জাত ও হতে পারে। মনুতে বৌদ্ধ, পাশুপত, জৈন, লোকায়ত, কাপিল শাখার কাউকে ছুঁলে স্নানের বিধান আছে; অর্থাৎ এঁরাও অস্পৃশ্য। অত্রির মতে বৈদিক ক্রিয়াকরণে বিবাহ সভাতে ও মেলায় এই নিয়ম লঙ্ঘন করা দূষণীয় নয়।

অহঃ—অষ্ট বসুর (দ্রঃ) একজন; পিতা ধর্ম, মা রতি দেবী।

অহং—আমি সব এই বুদ্ধি। আমিত্ব জ্ঞান।

অহল্যা—(১) ব্রহ্মার মানস কন্যা; শতানন্দের মা। অন্য মতে পুরু বংশে দুষ্মন্ত (১) অজমীঢ় (৫)—মুদ্গল (১৩)—(১৪) অহল্যা। হল্য অর্থে বিরূপতা ইত্যাদি। অদ্বিতীয়া সুন্দরী ও সত্যপরায়ণা বলে ব্রহ্মা নাম দিয়েছিলেন অহল্যা। গৌতম ঋষির কাছে এঁকে বহুদিন রেখে গিয়েছিলেন এবং গৌতম ও শ্রদ্ধায় এঁকে রক্ষণাবেক্ষন করেন এবং নিষ্কলঙ্কা অহল্যাকে ব্রহ্মার কাছে ফিরিয়ে দেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে গৌতমের (দ্রঃ) সঙ্গে বিয়ে দেন। কিন্তু ইন্দ্র এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন, কারণ ইন্দ্র মনে করতেন অহল্যাকে তিনিই পাবেন। এই জন্য এক দিন স্নান করবার জন্য আশ্রম থেকে বার হয়ে গেলে ইন্দ্র গৌতমের বেশে এসে অহল্যার কাছে সঙ্গম প্রার্থনা করেন। অহল্যা ইন্দ্রকে চিনতে পেরেও কমার্ত ছিলেন বলে সম্মত হন। গৌতম ইতিমধ্যে ফিরে এলে ইন্দ্র (দ্রঃ) ধরা পড়ে যান এবং গৌতমের শাপে নপুংসক হয়ে যান। অন্য মতে ইন্দ্র একবার অহল্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে মধ্যরাত্রিতে মোরগ সেজে আশ্রমে এসে ডেকে ওঠেন। ভোর হয়েছে ভেবে গৌতম নদীতে স্নান করবার জন্য বার হয়ে গেলে ইন্দ্র গৌতম বেশে ফিরে এসে রাত্রি যাপন করেন। গৌতম মুনি ফিরে এসে সব জানতে পেরে শাপ দেন। শাপ ছিল হাজার বছর ঐখানে অদৃশ্য অবস্থায় অনাহারে বায়ুভুক হয়ে অনুতাপে ভস্মশায়িনী হয়ে, অন্য মতে শিলাখণ্ড হয়ে থাকতে হবে। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে মুক্তি পাবেন। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র এখানে এলে অহল্যা শাপমুক্ত হন। এরপর গৌতম ও ছেলে শতানন্দ ফিরে আসেন এবং

তিনজনে ঐ আশ্রমে বহুদিন বাস করেছিলেন। পদ্মপুরাণেও রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে মুক্তি লাভের কথা আছে। অরুণের (দ্রঃ) দুটি ছেলে অহল্যার কাছে পালিত হতে থাকে। কিন্তু গৌতম সহ্য করতে না পেরে শাপ দিয়ে এঁদের বানরে পরিণত করেন। এরও কিছু পরে ইন্দ্র ছেলে দুটিকে দেখতে এলে অহল্যা গৌতমের অভিশাপের কথা জানান। ইন্দ্র ছেলে দুটিকে খুঁজে বার করেন। বড় ছেলেটির লেজ বড়, নাম হয় বালী ; দ্বিতীয়টির গ্রীবা সুন্দর বলে নাম হয় সুগ্রীব।

কুমারিল ভট্টের মতে এই কাহিনী একটি রূপক। ইন্দ্র সূর্যের এবং অহল্যা রাত্রি বা অন্ধকারের প্রতীক। অহল্যাকে ধর্ষণ একটি রূপক ; অর্থ অন্ধকারকে জয় করা। অন্য মতে অহল্যা উষার প্রতীক। দিনে ইন্দ্ররূপী সূর্যের উদয়ে উষা অসূর্যম্পশ্যা হন। প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যাদের মধ্যে অহল্যা একজন। (দ্রঃ উত্তঙ্ক)।

(২) রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী একটি অপ্সরা। অহল্যার কাহিনী শুনে ইন্দ্র নামে এক অসুরের প্রতি আসক্তা হয়ে রাজা কর্তৃক বিতাড়িত হন।

অহিংসা—দ্রঃ অধর্ম।

অহিচ্ছত্র—প্রাচীন নাম অধিচ্ছত্র। প্রাচীন উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী। অর্থাৎ রোহিলখণ্ড ও পার্শ্ববর্তী অংশের রাজধানী। বর্তমানে বেরিলি জেলার রাম নগর। খননকার্যের ফলে খৃ-পূ ৬ শতকের মৃৎ-পাত্র ইত্যাদি পাওয়া গেছে। বহু ঘর বাড়ি, ইঁটের তৈরি দুটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে। প্রাক্ মৌর্যযুগ থেকে অহিচ্ছত্রের কোন কোন রাজার মুদ্রা পূর্বে বস্তি জেলা পর্যন্ত প্রচলিত থাকায় অনেকে এই রাজাদের পাঞ্চাল ও কোশল দুই দেশেরই রাজা মনে করেন। এই রাজাদের মিত্র উপাধি ; অর্থাৎ মিত্র-রাজ বলেও পরিচিত। অনেকে মনে করেন এঁরাই শুঙ্গ ও কাণ্ব রাজন্যবর্গ। বিভিন্ন মুদ্রা থেকে এঁদের নাম পাওয়া গেছে :-ভদ্রঘোষ, সূর্যমিত্র, ফাল্গুনীমিত্র, ভানুমিত্র, ভূমিমিত্র, ধ্রুবামিত্র, অগ্নিমিত্র, বিষ্ণুমিত্র, জয়মিত্র, ইন্দ্রমিত্র, বৃহৎস্বাতীমিত্র, বিশ্বপাল, রুদ্রগুপ্ত, জয়গুপ্ত, বজ্রপাল, ত্রৈবর্ণীপুত্র ভাগবত, আষাঢ়সেন, দমগুপ্ত, বসুসেন, যজ্ঞপাল, প্রজাপতিমিত্র, বরুণমিত্র। সম্ভবত এঁরা খৃ প্রথম তিন শতকে রাজত্ব করতেন। এক শ্রেণীর মুদ্রায় অচ্যুতের নাম পাওয়া যায়। এই সব মুদ্রায় যে শক প্রভাব রয়েছে তা থেকে মনে হয় এই অহিচ্ছত্র রাজ অচ্যুতের সঙ্গে পশ্চিম ভারতের সম্পর্ক ছিল। সম্ভবত এই অচ্যুত সমুদ্রগুপ্তের হাতে পরাজিত হন। খৃ ৭-ম শতকে হিউ-এনৎসাঙ বৌদ্ধদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বলে অহিচ্ছত্রকে উল্লেখ করেছেন। গুরু দক্ষিণা হিসাবে অর্জুন দ্রুপদকে ধরে আনলে এই অহিচ্ছত্র দ্রোণকে দিয়ে দ্রুপদ মুক্তি পান।

অহিরথ—পুরু বংশে একজন রাজা।

অহির্বুধ্ন্য—(১) বিশ্বকর্মা (দ্রঃ) স্ত্রী সুরভির একটি ছেলে। (২) স্থাণুর (দ্রঃ) ছেলে একজন রুদ্র। (৩) পাতালে একটি সাপ।

অহীনগু—সূর্যবংশে দেবানীকের ছেলে। সৎসঙ্গে কাল যাপন করে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছিলেন।

অহুর-মজ্‌দা—সংস্কৃত প্রতিরূপ অসুর+মেধস্‌। আর্য বা ইন্দোইরানীয় দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বা প্রধান বা ঈশ্বর হলেন অহুর (=সংস্কৃত অসুর=অসু+র প্রাণবান্‌)। জরথুশত্র ইরানে একেশ্বর বাদ প্রচার করেন এবং অহুর মজদা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা বলে গৃহীত হয়। এঁর নীচে বা এঁর প্রতিদ্বন্দ্ব অন্য কোন দেবতা আর রইল না। কিন্তু এঁর প্রতিস্পর্দ্ধী অসত্য ও অন্ধকারের প্রতীক অহ্‌রিমন্‌ নামে পাপপুরুষ স্বীকৃত হয়েছে। এবং ক্রমশ দএব-রা অর্থাৎ দেবতারা ঈশ্বর বিদ্বেষী অপদেবতায় পরিণত পরিণত হয়েছে। ইরানীয় দইব=আবেস্তা দএব=সংস্কৃতে দেব। অহুর মজ্‌দা =আধুনিক ফারসিতে হোরমজদ্‌। অহ্‌রিমন (=আধুনিক ফারসি)=অংগ্রমৈন্যু। দও বা দীব্‌ (=আধুনিক ফারসি)=রাক্ষস। জরথুশ্‌ত্র=সংস্কৃত জরদুষ্ট্র।

অহ্রিমন—মৈন্য দ্রঃ।

অহোরাত্র—মানুষের একমাসে পিতৃগণের এক অহোরাত্র: কৃষ্ণপক্ষ দিন, শুক্লপক্ষ রাত্রি। মানুষের এক বছরে দেবতাদের এক অহোরাত্র; উত্তরায়ণ দিন, দক্ষিণায়ন রাত। দ্রঃ যুগ।

আ

আইহোলি—প্রাচীন অয্যাভোলে বা আর্যপুর। উত্তর ১৬°৫০´ পূর্ব ৭৫°৫৭´। মহীশূরে সিঙ্গাপুর জেলায় কাটগেরি ষ্টেসন থেকে ১৯কিলোমিটার দূরে মালপ্রভা নদীর অপর পারে অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম। চালুক্য বংশের রাজত্বকালে নির্মিত কয়েকটি মন্দির রয়েছে। মেগুটি মন্দিরে দ্বিতীয় পুলকেশীর (৬৩৪ খৃ) সময়ে ক্ষোদিত শিলালিপি বর্তমান। উত্তর ভারতের শিখর বা রেখ মন্দির এবং ধাপে ধাপে রচিত ছাদবিশিষ্ট দ্রাবিড় শৈলী এখানে একত্রে এসে মিশেছে। ৩৪-টি চতুরস্র আসনবিশিষ্ট রেখ মন্দির ভিন্ন, শিখর যুক্ত দুর্গা মন্দিরের আসন আয়ত, কিন্তু পেছনের অংশ অর্দ্ধবৃত্ত। পর্বতে ক্ষোদিত বৌদ্ধ বিহারে এই রকম আসন দেখা যায়। লাড়খানগুড়ি দ্রাবিড় শ্রেণীর প্রাচীনতম মন্দির শ্রেণীর অন্তর্গত। পিঢ়া বিশিষ্ট দেউলের প্রাচীন নিদর্শনও এখানে আছে। লকুলীশাদি বহু শিবমূর্তি, অনন্তশায়ী এবং বামনাদি বিষ্ণুমূর্তি এবং ব্রহ্মাদির মূর্তি মন্দিরে খোদিত আছে। মূর্তিগুলি সহজ, ও সুন্দর ও বলিষ্ঠ।

আউল বা আউলিয়া—এক শ্রেণীর মুসলমান উপাসক সম্প্রদায়। অপর নাম সহজ কর্তাভজা। আদিগুরু আউলিয়া; ফলে সম্প্রদায়ের এই নাম। এঁদের গুরুপীঠের নাম গদি; পশ্চিম বাঙ্গলাতে এঁদের কয়েকটি গদি আছে। এঁদের পরমার্থ প্রকৃতি-সাধনা। প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ইচ্ছানুরূপ বহু বারাঙ্গনা ও গৃহাঙ্গনা এঁদের সাধন-সম্পাদনে নিযুক্ত। নিজের স্ত্রীকে (প্রকৃতি) অপরের অনুরক্ত দেখলেও এঁদের ঈর্ষা বা অসন্তোষ হয় না। এঁরা দাড়ি গোঁফ রাখেন না।

আউলচাঁদ—কর্তাভজা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে নদীয়াতে উলা গ্রামে বারুই জাতীয় পান ব্যবসায়ী মহাদেব দাস তার পানের বরোজের মধ্যে এঁকে কুড়িয়ে পান ও মানুষ করেন। পাগলাটে বা আকুল স্বভাবের জন্য বা সুফি সাধকদের উপাধি আউলিয়া থেকেও এই নাম হতে পারে। অবশ্য ইনি মুসলমান ফকিরের ন্যায় বেশ পরতেন। অনুমান কোন মুসলমান সহজ সাধকের শিষ্য ছিলেন। গুরুর নাম জানা নেই। ভক্তেরা চৈতন্যদেবের অবতার মনে করতেন। সুফিদের হক মতবাদ এবং চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদের আত্মসমর্পণ বা আত্মবিলোপ এঁদের ধর্মের মূল কথা। বড় হয়ে উদাসীন হয়ে ১লে যান এবং ২৪ পরগণা ও সুন্দর-বন অঞ্চলে নানা স্থানে বাস করেন। বেজবা গ্রামে বাস করার সময় ২৭ বছর বয়সে ধর্মগুরু রূপে প্রকট হয়েছিলেন এবং এইখানে তাঁর প্রধান ২২-জন শিষ্যকে লাভ করে-ছিলেন। মৃত্যু ১৭৬৯-১৭৭০ খৃঃ। মৃত্যুর পর দল ভাঙতে থাকে। এই ২২-জন শিষ্যের মধ্যে রামশরণ পাল কর্তাভজা (দ্রঃ) সম্পদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

আউলিয়া মনোহর দাস—বৈষ্ণব পদের প্রসিদ্ধ একজন সংগ্রহকর্তা। এঁর বিরাট গ্রন্থ পদ-সমুদ্র। আর একটি বই নির্যাসতত্ত্ব। আদিবাস বিষ্ণুপুরে; বহু তীর্থ ঘুরে হুগলিতে বদনগঞ্জে বহুদিন বাস করে ছিলেন। এই অঞ্চলে বহু পরিবার এঁর শিষ্য। ১৬৩৮ সালে বৃন্দাবনের পথে জয়পুরে মারা যান; সেখানে তাঁর সমাধি-মন্দির আছে। বদনগঞ্জে প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে এঁর মেলা হয়। নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত জাহ্নবী দেবীর মন্ত্রশিষ্য। সখীভাবে কৃষ্ণের ভজনা করতেন; মাথায় খোপা বেঁধে সাড়ি, কাঁচুলি, নোলক, মল ইত্যাদি পরতেন। প্রবাদ সাধন বলে আড়াইশ বছরের অধিক জীবিত ছিলেন।

আকালি—শিখ সম্প্রদায়ের একটি অংশ। খালসা দল সৃষ্টির সময়ই আসলে এঁদের উদ্ভব। গুরু নানকের প্রেম ও শান্তির বাণীর সঙ্গে যুদ্ধ প্রিয়, অসমসাহসিক এবং কখনো কখনো লুণ্ঠতরাজরত আকালিদের কোথাও মৌলিক সাদৃশ্য নাই। আকালিরা ঈশ্বরের জন্য আত্মসমর্পণকারী যোদ্ধা। কৃপাণকে কেন্দ্র করে এঁদের ভাব জগৎ ও কর্ম জগৎ। কোন পার্থিব প্রভুর প্রভুত্ব এঁরা স্বীকার করেন না। এঁরা পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ না হলেও মানুষের ও সমাজের প্রতি কর্তব্য এঁদের জীবনের একটা বিরাট অংশ। একজন আকালি নিজ হাতে একটা রাস্তা তৈরি করতে করতে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন; গ্রামবাসী ভক্তিভরে তাঁকে আহার্য্য দিয়ে গেছেন এ রকম বহু দৃষ্টান্ত আছে।

আকাশ—পঞ্চভূতের একটি। এইটি আদিভূত। আকাশ থেকে বায়ু>তেজ>অপ>ক্ষিতি উৎপন্ন হয়েছে। বেদান্তে আকাশ ৪-প্রকার:—মহাকাশ, ঘটাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশ (অভ্রখ)। বৈশেষিক নববিধ দ্রব্যের একটি।

আকাশগঙ্গা—মন্দাকিনী।

আকাশপ্রদীপ—বাঁশ ইত্যাদি মাথায় দেবতাদের উদ্দেশে আশ্বিন সংক্রান্তি থেকে কার্তিক মাসে প্রতি সন্ধ্যায় আকাশ বা বিষ্ণু মন্দিরে যে প্রদীপ দেওয়া হয়।

আকাশমুখী—বা উর্দ্ধমুখী শৈব সম্প্রদায়। কৃচ্ছ সাধনের জন্য আকাশের দিকে মুখ করে থাকেন। এইভাবে থাকতে থাকতে শেষ পর্যন্ত ঘাড় নীচু করে মুখ নামান অসম্ভব হয়ে পড়ে। এঁরা ভিক্ষাজীবী, জটাধারী, দাড়ি, গোঁফ রাখেন এবং রঙিন বস্ত্র পরেন।

আকূতি—স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে শতরূপার গর্ভে আকূতি ও প্রসূতি নামে দুই মেয়ে হয়। আকূতির স্বামী প্রজাপতি / মহর্ষি রুচি।

আখড়া—সংস্কৃত অক্ষবাট। মূল অর্থ মল্ল-বা-ক্রীড়া ভূমি। ছোট ছোট ধর্ম সম্প্রদায়ের আশ্রম বা মঠ। যাত্রার আখড়া ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহার আছে।

আগম—বেদাদি আপ্তবাক্যাত্মক শাস্ত্র। তন্ত্রশাস্ত্রের আর এক নাম। মহাদেবের মুখ থেকে 'আ'গত, পার্বতীর কাণে 'গ'ত ও বাসুদেবের 'ম'ত/সম্মত বলে নাম 'আগম' শাস্ত্র। পিঙ্গালামত তন্ত্রমতে যে শাস্ত্রে চতুর্দিকের বস্তুসমূহের (অাস্তা) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ (গম্যতে) করা যায়। আগম-শাস্ত্রে সাতটি বিষয় আলোচিত হয়:— সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতার অর্চনা; সাধনা, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্ম ও চতুর্বিধ ধ্যানযোগ।

আগমনী—দুর্গা। স্বামীর ঘর থেকে প্রতি বছর শরৎ-কালে হিমালয়ে পিতৃগৃহে যেন ফিরে আসেন। এই বিষয় নিয়ে বাঙ্গলায় বহু গান রচিত হয়েছে। বাঙ্গলা দেশের গানের একটি বিশিষ্ট শ্রেণী।

আগ্নীধ্র—ধন দিয়ে বরণীয় ঋত্বিক। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ।

আগ্নেয়—(১) কার্তিক (দ্রঃ)। (২) অঙ্গিরা-রা অগ্নিসম্ভূত বলে আগ্নেয় নামেও পরিচিত ছিলেন। দক্ষিণাপথে অগ্নি অধিষ্ঠিত মাহিষ্মতী পুরী বিশিষ্ট দেশ।

আগ্নেয়াস্ত্র—অগ্নির ছেলে অগ্নিবেশ্যকে ভরদ্বাজ এই অস্ত্র দেন। অগ্নিবেশ্য আবার দ্রোণকে দেন। দ্রোণের কাছ থেকে অর্জুন পেয়েছিলেন। ঔর্ব ঋষিও সগর-রাজাকে এই অস্ত্র দিয়েছিলেন। অগ্নি দেবতার অস্ত্র; ব্রহ্মাস্ত্র, ব্রহ্মশির, পাশুপতাদি অস্ত্র। প্রাচীন ভারতে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারের কোন প্রমাণ নেই। বারুদ ব্যবহার জানা ছিল না। তীর সাহায্যে জ্বলন্ত কিছু হয়তো ছুঁড়ে মারা হত।

আঙ্করটোম—কম্বুজ দেশের রাজধানী। দ-পূর্ব এসিয়াতে প্রাচীন হিন্দু রাজ্যগুলির মধ্যে কম্বুজ (কম্বোজ, বর্তমানে কাম্বোডিয়া) একটি দেশ। ১২ শতকে বঙ্গোপসাগর থেকে দক্ষিণে চীন সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ইন্দোচীন উপদ্বীপ কম্বুজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কম্বুজ সম্রাট ৭ম জয়বর্মা ১১৮১ খৃষ্টাব্দে রাজা হন এবং নিজের রাজধানী রূপে এই বিরাট নগরী আঙ্করটোম (সংস্কৃত 'নগর ধাম) স্থাপন করেন। নগরের চারদিকে পাথরের প্রাচীর ছিল ১৩ কি-মিটার। প্রাচীর ঘিরে ১০১ মিটার চওড়া পরিখা ছিল। পরিখার দুপাড় পাথর বাঁধান। নগরীর সিংহদ্বার ৯ মিটার মত উঁচু ছিল। আঙ্করটোম নগরী সমচতুষ্কোন; ৩০ মিটার চওড়া ৫-টি সোজা রাজপথ নগরীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত উত্তর দক্ষিণে ও পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত। নগরীতে বহু মন্দির ও প্রাসাদ ছিল এবং এগুলির মধ্যে বেয়ন নামে মন্দিরটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। নগরীর মাঝখানে ৭০০ মি × ১৫১ মি একটি মুক্ত অঙ্গন।

আঙ্করভাট—আঙ্করটোমের ১·৬ কি-মি দক্ষিণে কম্বুরাজ্যের একটি বিশাল মন্দির। খৃ ১২ শতকের প্রথম দিকে রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মা তৈরি করেছিলেন। মন্দিরটির চার-দিকে ৪ কি-মি মত লম্বা পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ; প্রাচীরের বার দিক ১৯৮ মি চওড়া পরিখা দিয়ে ঘেরা। পরিখা পার হবার সেতুটি ১১ মি চওড়া। সেতুর পরই ৪৭৫-মি লম্বা এবং সমতল ভূমি থেকে ২-মিটার উঁচু একটি রাস্তা মন্দিরে গিয়ে পৌঁছেছে। মন্দিরের প্রথম তলা কক্ষ ও বারান্দা ২৪৪মি × ২০৬ মি। এই এক তলার সারা গায়ে প্রধানত মহাভারত কাহিনী এবং নানা দেব দেবীর মূর্তি ক্ষোদিত রয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলাতে যেতে হয়। এই তলাগুলি অবশ্য গ্যালারির মত ; ঠিক একটির ওপর আর একটি নয়। তৃতীয় তলার মাঝখানে একটি অঙ্গন এবং এই অঙ্গনের মাঝখানে একটি বিষ্ণু মন্দির। মন্দিরের চূড়া কতকটা উড়িষ্যার মন্দির চূড়ার মত ; এবং ৬৪ মি-উচ্চ। আঙ্করভাটের বিশালতা, নির্মাণ কৌশল ও কারুকার্য এই তিন মিলে এত বিরাট মন্দির পৃথিবীতে আর একটিও নাই।

আঙ্গিরস—অঙ্গিরস মুনির ছেলে। দেবগুরু বৃহস্পতি ইত্যাদি।

আঙ্গিরসকল্প—অথর্ব বেদের একটি সংহিতা।

আঙ্গিরসী—দ্রঃ রাজা কল্মাষপাদ।

আজ্ঞক—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে। ব্রহ্মবাদী।

আচমন—ধর্মকর্মের জন্য মন্ত্রপাঠ করে বিধিমত জল গ্রহণ। পূজার আগে তিনবার জলপান করে, দুবার সংবৃত ওষ্ঠাধর মার্জনা করে, মাথাদি ছয় বা আট অঙ্গ স্পর্শরূপ শুদ্ধি-প্রতীক ক্রিয়া। মনু মতে চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, হৃদয়, মস্তক, মতান্তরে নাভি ও বাহু সমেত আট অঙ্গ স্পর্শ করতে হয়।

আচার—সদাচার হিন্দুধর্মের অঙ্গ। মনুসংহিতা মতে সরস্বতী ও দৃশদ্বতী এই দুই নদীর মধ্যবর্তী ব্রহ্মাবর্ত নামে দেশে পরম্পরাক্রমে প্রচলিত আচারই সদাচার। বিভিন্ন পুরাণে সদাচারের যে বিবরণ আছে সে অনুসারে শাস্ত্রোক্ত ধর্মও স্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক সমস্ত কর্তব্য কর্মই সদাচার। আচারহীন ব্যক্তি সর্বদা নিন্দনীয়। এ ছাড়া লোকা-চার দেশাচার ইত্যাদি আরো অনেক আচার ছিল।

আচারদীপ—রাজা অশ্ব প্রভৃতির নীরাজনার্থ প্রদীপ।

আচার্য—শিষ্যকে উপনীত করে যে ব্রাহ্মণ তাকে সকল্প ও সরহস্য বেদ পাঠ করান।

আজগব—অজগব (দ্রঃ)

আজীবিক—বৌদ্ধ ও প্রাক-বৌদ্ধযুগের অবৌধ সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজক সম্প্রদায়ের একটি অংশ। খৃ-পূ ৬ শতকে এঁদের উৎপত্তি মনে হয়। মহাভারত, বায়ুপুরাণ, ললিত-বিস্তার প্রভৃতি গ্রন্থে এঁদের উল্লেখ আছে। মকখালি গোসাল এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এঁরা সকলেই নগ্ন। ভগবান বুদ্ধ এঁদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ক্রিয়া, বীর্য, কর্ম ইত্যাদি স্বীকার না করার জন্য বুদ্ধদেব এঁদের হেয় জ্ঞান করতেন। আজীবিক অর্থে যাঁরা অপরের দান গ্রহণ করে জীবন ধারণ করেন ; অর্থাৎ ভিক্ষাজীবী। অন্য মতে আজীবিক অর্থে বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ একটি জীবন

যাত্রা। আর একটি মতে মক্‌খালি গোসালের আজীবন পালনীয় প্রতিজ্ঞাই হচ্ছে আজীবিকতা।

প্রাচীন আজীবিকরা অত্যন্ত কঠোর ব্রতধারী। সম্ভবত দলবদ্ধ হয়ে এঁরা লোকালয়ের বাইরে বাস করতেন। সম্পূর্ণ অদৃষ্টবাদী; বার্হস্পত্য মতবাদের সঙ্গেও এঁদের মতবাদের কতকটা সাদৃশ্য রয়েছে। এঁদের মতে নিয়তির নির্দেশে মানুষে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে; জন্মান্তর মাধ্যমে শেষকালে মুক্তি। এঁদের সংঘজীবন, আলোচনা গৃহ ইত্যাদি নির্দিষ্ট স্থান ছিল। বহু গ্রন্থে এঁদের আচার-ব্যবহারের অতি ঘৃণ্য বিবরণ আছে। গাঙ্গেয় অঞ্চলে সমস্ত বড় বড় সহরে এবং দক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় অঞ্চলেও এঁরা বর্তমান ছিলেন। দ্রাবিড় অঞ্চলে এঁদের প্রভাব সবচেয় বেশি ছিল মনে হয়। খৃ ১৪ শতকে তামিলনাদেও এঁরা বর্তমান ছিলেন।

অজণ্টার একটি গুহাচিত্রে একটি নগ্ন সন্ন্যাসী আছে। বিখ্যাত আজীবিক উপকের সঙ্গে বুদ্ধের সাক্ষাতের দৃশ্য বোরোবুডুরের একটি ভাস্কর্যে রয়েছে। বোরোবুডুরের অজীবিক মূর্তিগুলি অবশ্য নগ্ন নয়। বরাবর গুহায় অশোক-শিলালেখ, নাগার্জুন গুহায় দশরথ-শিলালেখ প্রভৃতিতেও এঁদের উল্লেখ আছে।

আজ্ঞাচক্র—সাধনচক্র বিশেষ। ষট্‌চক্রের অন্তর্গত ষষ্ঠচক্র।

আজ্যপ—ঘৃতপায়ী। এঁরা পুলস্ত্যের ছেলে। বৈশ্যদের পিতৃগণ (দ্রঃ)।

আঠারনালা—জগন্নাথ ক্ষেত্রের উত্তর দিকে ছোট একটি নদী মত। আঠার খিলান যুক্ত সেতুর জন্য নাম। প্রবাদ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এখানে নিজের ছেলেদের বলি দিয়েছিলেন।

আড়বার—একটি তামিল শব্দ। আড় অর্থে নিমগ্ন অর্থাৎ যিনি ভগবানে নিমগ্ন। এঁদের মধ্যে বৈরাগ্য জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়। এঁরা সকলেই ঐকান্তিক বৈষ্ণব। অর্চাবিগ্রহে ও তীর্থস্থান গুলিতে এঁদের পরম ভক্তি। কখনো এঁরা জ্ঞানদশায় পরমেশ্বরের ঐশ্বর্যের ধ্যানে, কখনো প্রেমদশায় ভগবানের মাধুর্য রসে বিভোর থাকেন। এই প্রেম দশায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও নায়িকা ভাবের অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে; তবে দাস্য ও নায়িকা ভাবকেই এঁরা প্রাধান্য দেন। নায়িকা দশায় কখনো স্বকীয় বা কখনো পরকীয় ভাব বিদ্যমান।

এঁদের ভজন ধারায় সংকীর্তন একটি প্রধান অঙ্গ। ভগবানের মঙ্গল গান আড়বার সঙ্গীতের একটা বিরাট অংশ। বাঙলার কীর্তন পদাবলীর ভাব, সুর ও তালের সঙ্গে আড়বার পদাবলীর ভাব, সুর ও তালের প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। শ্রীরঙ্গমে প্রতি বছর পৌষ মাসে তিরু-অধ্যয়ন মহোৎসবে দ্রাবিড়বেদান্তের ৪০০০ শ্লোক অভিনয় সহকারে গীত হয়। দ্রঃ শ্রীসম্প্রদায়। এঁদের বার জন আড়বার:—পোয়্‌গৈ, পূদত্ত, পে, তিরুমড়িশৈ, নম্মাড়্‌বার, মধুরকবি, কুলশেখর, পেরিয়াড়্‌বার, অণ্ডাল, তোণ্ডারিপ্পুড়ি, তিরুপ্পান, তিরুমঙ্গই। এঁদের দিব্য উক্তিগুলি দ্রাবিড়বেদান্ত নামে পরিচিত। আড়বার অণ্ডাল মহিলা ছিলেন; গোপীভাবময়ী সাধিকা। তিরুপ্পান ছিলেন সংকীর্তনের সজীব মূর্তি। নম্মাড়বার রচিত সহস্রশ্লোকাবলী বা সহস্রগীতি ভগবানের বিশেষত অর্চাবতারের বিভূতি ও মহিমাসূচক পদাবলী।

আত্মা—ব্রাহ্মণ্য দর্শনে জীবের সমস্ত দুঃখের মূল আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। অর্থাৎ নিজেকে বা আত্মাকে ঠিক মত জানতে পারার ওপর জীবের সমস্ত সুখদুঃখ নির্ভর করছে। এবং এই আত্মা দেহ ও মনের অতীত। বৌদ্ধমতে আত্মা বলে স্থায়ী নিত্য পদার্থ কিছু নাই। সাধারণে যাকে আত্মা বলে সেটি হচ্ছে আশু-বিনাশী মানসধর্মপ্রবাহ। বৌদ্ধমতে নিত্য আত্মাকে স্বীকার করাই সর্বদুঃখের মূল। জৈন মতেও আত্মার স্বরূপ না জানাই জীবের দুঃখের মূল কারণ। অর্থাৎ উপরিউক্ত তিনটি চিন্তাধারাতেই আত্মাকে না জানাই জীবের দুঃখের মূল কারণ; অবশ্য দুঃখ জয়ের জন্য আত্মার এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ পলায়নবাদিতা। ভারতীয় দার্শনিকদের বেশির ভাগেরই মত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতীত এই আত্মা এবং এই আত্মা অপরিণামী। চার্বাক মতে আত্মা স্বীকৃত নয়। আবার বৌদ্ধরা বলেন জড়ভূত ছাড়াও জ্ঞান (=বিজ্ঞান) নামে এক জাতীয় পদার্থ রয়েছে এবং এই অতিরিক্ত জ্ঞানই আত্মা। কিছু ভারতীয় দার্শনিক মতে আত্মা একটি আধার=দ্রব্য ; জ্ঞান, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি মানস ব্যাপারগুলি এই আধারে বর্তমান। আবার কোন কোন মতে আত্মা হচ্ছে গুণ। কোন মতে ভিন্ন ভিন্ন জীব অনুসারে আত্মা বিভিন্ন, আবার অন্য মতে সব আত্মাই এক। সব আত্মাকে যাঁরা এক বলেন তাঁরা অন্তঃকরণ বলে আর একটি জিনিস কল্পনা করে নিয়েছেন এবং এঁদের মতে এই অন্তঃকরণ দেহ ও আত্মার মধ্যবর্তী সত্তা ; অন্তঃকরণ বহু কিন্তু আত্মা এক। আত্মা স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বপ্রকাশ, কূটস্থ চৈতন্য। আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত পরব্রহ্ম জ্ঞাননেত্রে প্রকাশ পান। আত্মারূপ উজ্জ্বলকোষেই পরব্রহ্মের স্থান। এই আত্মাকে জানতে পারাই মুক্তি বা মোক্ষ। সাংখ্য মতে আত্মা চৈতন্য স্বরূপ এবং অনেক। যত জীব তত আত্মা। আত্মা বা পুরুষ অজ্ঞানবশতঃ প্রকৃতির জালে আবদ্ধ হয়। যোগ অভ্যাসে আত্মা মুক্তি পায়। মুক্ত আত্মার সুখ দুঃখ নাই। মুক্ত আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। অদ্বৈত বেদান্ত মতে আত্মা এক, অব্যয়, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দময়, নিত্য বুদ্ধ ও শুদ্ধ। একটি মতে চেতন বায়ু থেকে আত্মার জন্ম। আত্মার চারটি দশা :—জাগ্রত, স্বপ্নগত, সুষুপ্ত, ও তুরীয়।

আত্মারাম—আত্মা যাঁর আরাম (=আনন্দ স্থান)। ব্রহ্মে যাঁর সুখানুভব। ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি, স্বভাব এই সাতটিতে যিনি আরাম (সুখ) অনুভব করেন।

আত্মোপনিষৎ—জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ নির্ণায়ক গ্রন্থ।

আত্রেয়—অত্রি মুনির ছেলেরা। নাড়িজ্ঞান প্রকরণ গ্রন্থ প্রণেতা একজন মুনি।

আত্রেয়ী—অত্রির মেয়ে। বাল্মীকির শিষ্যা। বাল্মীকির কাছে বেদ-বেদাঙ্গ পাঠ করেন। পরে বাল্মীকি লবকুশের শিক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়লে আত্রেয়ী বাল্মীকি আশ্রম ত্যাগ করে উপযুক্ত গুরুর খোঁজে অগস্ত্যের শিষ্যা হন। অগস্ত্য সযত্নে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আত্রেয়ী পরে অদ্বিতীয়া বিদুষী রূপে খ্যাতি লাভ করেন। অগ্নির ছেলে অঙ্গিরসের স্ত্রী। অঙ্গিরস সব সময়ই স্ত্রীকে কটু কথা বলতেন। আত্রেয়ী পিতাকে জানালে অত্রি উপদেশ দেন অগ্নির ছেলে বলে অঙ্গিরসের এই রকম স্বভাব ; জল দিয়ে শান্ত করতে হবে। আত্রেয়ী তখন নদীতে পরিণত হয়ে স্বামীকে শান্ত করেন।

এটি আত্রেয়ী বা পরুষ্ণী নদী। (২) অনসূয়ার অপর নাম। (৩) মনুর ছেলে উরু, উরুর স্ত্রী আত্রেয়ী; সন্তান অঙ্গ, সুমনস্, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও গয়।

আদমসুমার—কৌটিল্যের পরিকল্পিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে আদমসুমারের স্থান ছিল। যাদের ওপর রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল তাঁরা স্বীয় এলাকাতে সমস্ত বাড়ি, লোক সংখ্যা এবং তাঁদের জাতি পেশা ইত্যাদির হিসাব রাখতেন। রাজ্যের সর্বত্রই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মন্ত্রী যদি চাণক্য হন তাহলে খৃষ্ট জন্মের আগেই ভারতে আদম সুমার প্রচলিত ছিল। মেগাস্থেনিসের বিবরণে আছে পাটলিপুত্রেও জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখতে হত। এই হিসাব রাখার অর্থ আদম সুমারের প্রাথমিক পর্যায়।

আদি—অন্ধকাসুরের ছেলে। তপস্যায় বর পান শিবের ওপর পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারবেন। সর্প বেশে তারপর দ্বারীকে ধোঁকা দিয়ে ভেতরে এসে পার্বতীর রূপ ধরে শিবের দিকে এগিয়ে যান। কিন্তু মহাদেব বুঝতে পারেন; আদি নিহত হন।

আদিগঙ্গা—ভাগীরথীর একটি প্রাচীন শাখা। এর তীরে কালীঘাট। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে সাগর দ্বীপের উ-পূবে বর্তমান কাকদ্বীপ পর্যন্ত এই জলপথ আঁকা আছে। এর ১০০ বছর পরের মানচিত্রে এই নদীর সন্ধান নাই। জয়নগর থানার দক্ষিণ পর্যন্ত আজও এই লুপ্ত নদী পথের সাক্ষ্য রয়েছে। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে এই পথে বাণিজ্য তরী যাতায়াতের উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতন্যও নাকি নৌকায় এই পথে চক্রতীর্থ (মথুরাপুর থানাতে) হয়ে রূপনারায়ণ তটে তমলুকে যান এবং সেখান থেকে স্থলপথে পুরী যান। বর্তমানের আদি-গঙ্গা কর্ণেল টলির দ্বারা গড়িয়া পর্যন্ত আংশিক সংস্কৃত জলপথ। আদি গঙ্গার নীচে ভাগীরথীর মূল প্রবাহের গঙ্গা মাহাত্ম্য নাই।

আদিগ্রন্থ—শিখদের প্রসিদ্ধ পূজ্য ধর্মগ্রন্থ।

আদিত্য—সারারণ অর্থে সূর্যের (দ্রঃ) একটি নাম। বৈদিক সাহিত্য মতে অনেকগুলি দেবতা এবং এরা অদিতির সন্তান। অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি। এই অদিতি কিন্তু পরবর্তী যুগের কশ্যপ পত্নী নন। ঋক্‌বেদে (২।২৭।১) আদিত্য ছজন:—মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। ঋক্‌বেদে অন্য জায়গায় (৯।১১৪।৩) এবং (১০।৭২।৮) এঁদের সংখ্যা সাত ও আট বলা হয়েছে; কিন্তু নাম নাই। অথর্ববেদে (৮।৯।২১) এরা আটজন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।১।৯।১) এরা আটজন:—মিত্র, বরুণ, অর্যমা, অংশ, ভগ, ধাতা, ইন্দ্র ও বিবস্বান। শতপথ ব্রাহ্মণে (৬।১।২।৮) এবং (১১।৬।৩।৮) এরা বারো জন; বারো মাসের দেবতা। বৈদিক আদিত্যরা সূর্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষত সম্পর্কিত নন কিন্তু সকলেই দ্যুস্থান দেবতা। বেদের পরবর্তী যুগে আদিত্যেরা সকলেই সৌর দেবতা। মহাভারত ও পুরাণে এদের সংখ্যা সব সময়ই বার এবং কশ্যপের ঔরসে অদিতির (দ্রঃ) গর্ভে জন্ম।

হরিবংশে আছে ত্বষ্টা ভ্রমিযন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের তেজ কমাবার ব্যবস্থা করেন। সেই সময়ে সূর্যের অঙ্গভ্রষ্ট মুখরাগ থেকে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। পুরাণে আছে সংজ্ঞার (দ্রঃ) অনুরোধে বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ কমাবার জন্য সূর্যকে ভেঙে বারটি আদিত্যে পরিণত করে সূর্যের তেজ কমিয়ে দেন। এই বারজন

আদিত্য বার মাসের অধিপতি :—বৈশাখে তপন, জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে গভস্তি, ভাদ্রে যম, আশ্বিনে হিরণ্যরেতা, কার্তিকে দিবাকর, অগ্রহায়ণে চিত্র, পৌষে বিষ্ণু, মাঘে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য ও চৈত্রে বেদজ্ঞ। আর এক মতে মেষ রাশিতে বরুণ, বৃষ রাশিতে সূর্য, মিথুনে সহস্রাংশু, কর্কটে ধাতা, সিংহে তপন, কন্যাতে সবিতা, তুলাতে গভস্তি, বৃশ্চিকে রবি, ধনুতে পর্জন্য, মকরে ত্বষ্টা, কুম্ভে মিত্র, এবং মীনে বিষ্ণু। শিবপুরাণে আদিত্যদের জননী ভানু, দক্ষের মেয়ে। মহাভারত ও পুরাণাদি মতে চাক্ষুষ মন্বন্তরে যাঁরা তুষিত তাঁরাই বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিত্য। সর্বাধিক প্রচলিত বারজন আদিত্যের নাম :—অর্যমা, মিত্র, বরুণ, ধাতা, ভগ, বিবস্বান, পূষা, ত্বষ্টা, বিষ্ণু, অংশ, সবিতা ও শক্র। বায়ু, কূর্ম, অগ্নি, গরুড, স্কন্দ, কালিকা, সৌর ইত্যাদি পুরাণে এঁদের নাম ভিন্ন দেখা যায়; সংখ্যা অবশ্য সব সময়ই বার। এই নামগুলি :—পর্জন্য, ভাস্কর, যম, রবি, সূর্য, অংশুমান, ধনদ, জয়ন্ত, চণ্ড, সোম, উরুক্রম, বিধাতা, রুদ্র, বেদাঙ্গ, ভানু, গভস্তি, স্বর্ণরেতা, দিবাকর, ইন্দ্র, বরদমনু।

আদিত্যদেব মূর্তি তৈরি সম্বন্ধে ধর্মোত্তরকার বলেছেন দ্বাদশ আদিত্যের মূর্তি সূর্য মূর্তিরই অনুরূপ হবে। বিশ্বকর্ম শাস্ত্রের মতে বার জন আদিত্যের মধ্যে পূষা ও সম্ভবত বিষ্ণু দ্বিভুজ বাকি সকলে চতুর্ভুজ। উড়িষ্যাতে কোণার্কে বিবস্বানের দুটি মূর্তি দেখা যায় এবং সমবেত আদিত্যেদের মূর্তি যুক্ত দু-একটি শিলাপট্ট গুজরাটে পাওয়া গেছে। একটি মতে মূল ১২ জন আদিত্য এবং এঁদের ২২ জন ছেলে মিলে মোট ৩৩ জন দেবতা। এঁদের সন্তান সন্ততি মিলে পরে ৩৩ কোটি। এঁদের মধ্যে ইন্দ্র সবচেয়ে বড় বামন সব চেযে ছোট।

আদিত্যকেতু—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে, কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে নিহত।

আদিত্যহৃদয়—রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে রাম ক্লান্ত হয়ে পড়লে অগস্ত্য রামকে এই মন্ত্র দিয়েছিলেন। রামচন্দ্র এই মন্ত্র পেয়ে রাবণকে জয় করেন।

আদিপুরাণ—প্রথম পুরাণ। ব্রহ্মপুরাণ।

আদিবরাহ—বরাহ অবতার।

আদিবুদ্ধ—বজ্রযানের আবির্ভাবের সময় বৌদ্ধ ধর্মে আদিবুদ্ধ-বাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। খৃ ৭-শতকের আগেই মনে হয় বজ্রযানীরা একজন নিরঞ্জন, নিরাকার, নিরাধার আদি বুদ্ধের কল্পনা করে নেন। ইনিই এঁদের শ্রেষ্ঠ দেবতা। বজ্রযানী-গ্রন্থ গুহ্যসমাজে এঁর বিবরণ আছে। কালচক্র যানে আদি বুদ্ধ একটি বিশেষ স্থান পেয়েছেন অর্থাৎ ক্রমশ জনপ্রিয় হযে উঠেছেন। পরবর্তী যুগে বৌদ্ধদের মতে ইনিই সকল কিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। এই আদি বুদ্ধ থেকেই পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের উৎপত্তি।

আদিরাজ—(১) রাজা পৃথু। (২) বৈবস্বত মনু। (৩) পুরুবংশে অবিক্ষিতের ছেলে।

আদ্যশ্রাদ্ধ—মৃতাশৌচ শেষ হবার পরদিন যে শ্রাদ্ধ করা হয়। এই শ্রাদ্ধের একটি মস্ত বড় বৈশিষ্ট্য অন্নের সঙ্গে পোড়া মাছ, কোথাও বা রান্না মাংস এবং বিধবাদের স্থানে পোড়া কাঁচকলা দেওয়ার প্রথা আছে।

আদ্যাশক্তি—আদি শক্তি বা প্রকৃতি। দুর্গা, কালী, নারায়ণী, মহামায়া।

আধারশক্তি—সর্ব আধার শক্তি রূপ মহামায়া। মূলাধার গত কুণ্ডলিনী শক্তি।

আনদ্ধ—বাদ্য যন্ত্র ; মুখ চর্মচ্ছাদিত। শাস্ত্রোক্ত প্রাচীন যন্ত্রগুলি :—পটহ, মর্দল, হুড়ুক, করট, অধট, রঞ্জা, ডমরু, ঢক্কা, টুক্করী, ত্রিবলী দুন্দুভি, ভেরী, নিঃস্বান, তুম্বকী, কম্বুজ, পণব, কুণ্ডলি, শর্কর, টমকি, মণ্ড, মট্ট, ডিণ্ডিম, মৃদঙ্গ, উপাঙ্গ, ও দরী। যন্ত্র কোষ মতে এই সব বাদ্য পাঁচ শ্রেণীর :—(১) সভাতে বাদনীয় :—মৃদঙ্গ, তবলা, ঢোলক। (২) বহির্দ্বারে :—ঢাক, ঢোল, নাগারা, নহবৎ। (৩) গ্রাম্য :—মাদল, জোড়খাই, ডুবডুবি, ডমরু, খঞ্জনী, খোর্দক, হুড়কা, ঘুটক। (৪) সামরিক :—জগঝম্প দামামা, কাড়া, ঢক্কা, তাসা। (৫) মাঙ্গল্য :—টিকারা, কাড়া, নাগারা, ডম্ফ ও খোল।

আনন্দ—ব্রহ্ম। পরমব্রহ্ম।

আনন্দ—ভগবান বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য। গৌতমের জন্ম দিনেই তাঁর কাকারও এক ছেলে হয় ; এই ছেলে আনন্দ। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির দ্বিতীয় বছরে আনন্দ, ভদ্দীয়, অনুরুদ্ধ, ভগু ইত্যাদি মিলে সংঘে যোগদান করেন এবং বুদ্ধের দ্বারা প্রব্রজিত হন। পুন্নমন্তানিপুত্তের কাছে ধর্মের ব্যাখ্যা শুনে স্রোতাপন্ন হন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর বিশ বছর বুদ্ধের কোন পরিচারক ছিল না। আনন্দকে এই ভার দেবার কথা উঠলে আনন্দ কয়েকটি সর্ত করেন। বুদ্ধদেব স্বীকৃত হন এবং আনন্দও ভার গ্রহণ করেন। সারাদিন পরিচর্যা করে রাত্রিতে বারংবার তিনি গন্ধকুটি পরিবেষ্টন করতেন। বুদ্ধের উপদেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে স্মরণ রাখতে পারতেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল ধম্ম-ভণ্ডাগারিক। বুদ্ধের সেবায় থেকে সকলকে তিনি বুদ্ধের উপদেশ লাভের সুযোগ করে দিয়েছিলেন এবং বুদ্ধের বাণী সকলকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন। আনন্দের চেষ্টাতেই ভিক্ষুণী সংঘ স্থাপিত হয়েছিল।

(২) অনমিত্রের ছেলে। ইনিই চাক্ষুষ মনু (৬-ষ্ঠ) রূপে জন্মান। শিশুকালে একটি বিড়াল একে রাজা বিক্রান্তের শিশুর শয্যায় রেখে আসেন। বিক্রান্ত নিজের ছেলে মনে করেই পালন করেন। উপনয়নের সময় বিক্রান্ত ছেলেকে বলেন মাকে (বিক্রান্তের স্ত্রী) প্রণাম করতে। আনন্দ রাজি হন না ; বলেন বার বার মানুষ হয়ে জন্মেছেন ; ফলে তাঁর বহু মা ইত্যাদি। এর পর আনন্দ বনে গিয়ে তপস্যা করেন। ব্রহ্মা বর দেন চাক্ষুষ মনু হয়ে জন্মাবেন।

আনন্দবর্ধন—কাশ্মীরে অবন্তিবর্মার রাজত্বকালে (৮৫৩।৫৪-৮৮৩।৮৪ খৃষ্টাব্দে)। নোণ সুত বা নোণ-উপাধ্যায় আত্মজ বা জোনোপাধ্যায় বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। ইনি কবি, দার্শনিক, ও সাহিত্য বিচারক। দেবীশতক, বিষমবাণ লীলা (প্রাকৃতে) ও অর্জুন-চরিত তাঁর কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক। ধ্বন্যালোক তাঁর সাহিত্য বিচার গ্রন্থ। তত্ত্বালোক তাঁর দার্শনিক গ্রন্থ, এই বই অদ্বৈততত্ত্ব প্রতি-পাদক। আচার্য ধর্মোত্তর রচিত প্রমাণ-বিনিশ্চয় টীকা বলে যে গ্রন্থ আছে তার ওপর আনন্দ বর্দ্ধনের ধর্মোত্তমা নামে একটি টীকা আছে। একটি মতে ধ্বন্যালোকের প্রকৃত লেখক সহৃদয় ; এর কারিকাগুলি মনে হয় আনন্দবর্দ্ধনের।

আনন্দময় কোষ—বেদান্তে পরমাত্মার পঞ্চ কোষের অন্যতম কোষ। কারণ শরীর। জীবাত্মকোষ।

আনন্দরস—মাথাতে সুষুম্না নাড়ি স্থিত সহস্রদল পদ্ম বা সহস্রার থেকে নিঃসৃত অমৃত। ব্রহ্মানন্দ।

আনন্দলহরী—শঙ্কর রচিত স্তোত্র গ্রন্থ।

আনত—(১) শর্যাতির ছেলে। কুশস্থলীতে (দ্বারকা) একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। বরুণ এই দুর্গ জলে ডুবিয়ে দেশটি বনে পরিণত করে দেন। (২) দ্বারকা।

আন্বীক্ষকী—আত্মতত্ত্ব শোনার পর মানস নেত্রে দেখা। তর্ক বিদ্যা. গৌতমের ন্যায় দর্শন।

আপ—একজন বসু (দ্রঃ)। ছেলে বৈতণ্ড, শ্রম, শান্ত ও ধ্বনি।

আপদ্ধর্ম—নিজের ধর্ম দ্বারা জীবন ধারণে অক্ষম হলে বিপন্ন হয়ে অন্যধর্ম গ্রহণ। ব্রাহ্মণের ধর্ম বৃত্তি যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি প্রজাপালনের জন্য অস্ত্রধারণ। বৈশ্যের বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষি। শূদ্রের বৃত্তি দ্বিজাতির সেবা। আপৎকালে উচ্চবর্ণ নিম্ন বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে; শাস্ত্রীয় অনুমোদন আছে। কিন্তু নিম্নবর্ণ কোন উচ্চবর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন না। শাস্ত্রে অনেক স্থলে আপৎ কালে কি বৃত্তি গ্রহণীয় তাও উল্লেখ করা আছে। যেমন শূদ্র দ্বিজাতির সেবা ত্যাগ করতে বাধ্য হলে তন্তুবায়, সূত্রধর ইত্যাদির কাজ গ্রহণ করতে পারে এবং আপৎকালের শেষে আবার নিজের পুরাতন বৃত্তিতে ফিরে আসতে হবে। মনুতে (১০।৭৪-১৩০) আছে আপদ্ধর্ম পালনের দ্বারা মানুষ পরমগতি লাভ করে। আপদ্‌ধর্মের উদাহরণ হিসাবে দেখা যায় বিশ্বামিত্র ক্ষুধায় চণ্ডালের কাছে কুকুরের মাংস গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে আপৎকালে কৃত কাযের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা চালু ছিল।

আপস্তম্ব—আপস্তম্ভ। একজন ধর্মসূত্রকার ঋষি। সংহিতার পরবর্তী যুগে। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত আপস্তম্ব কল্পসূত্র এঁর প্রসিদ্ধ রচনা। গৌতম ও বোধায়ন ধর্মসূত্রের পরে এবং হিরণ্যকেশী ও বশিষ্ঠ ধর্ম-সূত্রের আগে আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের রচনা অর্থাৎ মোটামুটি ৫০০ খৃষ্টাব্দের আগে রচনা। নর্মদার দক্ষিণ অঞ্চলে আপস্তম্ব মতাবলম্বীদের প্রাধান্য দেখা যায়, সুতরাং মনে হয় দাক্ষিণাত্যের লোক ছিলেন। বইটিতে ৩০-টি প্রশ্ন/অধ্যায়। ২৩-টি প্রশ্ন বৈদিক ক্রিয়াকর্ম বিষয়ক এবং নাম আপস্তম্ব শ্রৌত সূত্র। ২৪ ও ২৫ প্রশ্নে পরিভাষা, প্রবরখণ্ড, হৌত্রক মন্ত্র রয়েছে। ২৬ ও ২৭ প্রশ্নে গৃহ্য সংস্কার সমূহ ও অন্যান্য ধর্মীয় ক্রিয়ার আলোচনা; এই অংশটির নাম আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র। ২৮ ও ২৯ প্রশ্নের নাম আপস্তম্ব ধর্মসূত্র। ৩০-শ প্রশ্নের নাম শুল্ব সূত্র; এই অংশে যজ্ঞবেদীর মাপ ইত্যাদির আলোচনা আছে। জ্যামিতি ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ে এটি একটি প্রাচীন গ্রন্থ।

কশ্যপের কাছে দিতি ইন্দ্রহন্তা একটি পুত্র চাইলে কশ্যপ আপস্তম্বকে দিয়ে যজ্ঞ করতে বলেন। আপস্তম্ব যজ্ঞ করে 'ইন্দ্রহন্তা অমিততেজা পুত্র হক' বলে পূর্ণাহুতি

দেন। একবার এক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের জন্য পুরোহিত না পেয়ে পিতৃদেবদের, বিশ্বদেবদের ও বিষ্ণুর কাছে প্রর্থনা করলে আপস্তম্ব সামনে আসেন। ব্রাহ্মণ এঁকে খেতে দেন এবং আপস্তম্ব আরো এবং আরো খেতে চান। ব্রাহ্মণ তখন ঋষিকে শাপ দিতে যান কিন্তু অভিশাপের জল ব্রাহ্মণের হাতে আটকে যায়। এই জন্য নাম আপস্তম্ভ। আপস্তম্ব একবার অগস্ত্যকে প্রশ্ন করেন ত্রিমূর্তির মধ্যে কে বড়। গৌতম বলেন মহাদেব। গৌতমী নদীর তীরে আপস্তম্ব তখন আরাধনা করে মহাদেবের দেখা পান। স্থানটি আপস্তম্ব তীর্থে পরিণত হয়, এখানে স্নান করলে শিবের বরে দিব্য জ্ঞান লাভ হয়। দ্যুমৎসেনকে একবার আপস্তম্ব সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। স্ত্রী অক্ষসূত্রা, ছেলে গার্কি।

আপাপন্থী—অযোধ্যা অঞ্চলে মুন্নাদাস নামে এক স্বর্ণকার প্রচারিত ধর্মপথ। নিজে ইনি কারো শিষ্য ছিলেন না। নিজেই এই ধর্মমত প্রচলন করেছিলেন। নিগুণ ঈশ্বরের উপাসক। নির্গুণ ঈশ্বরের প্রতীক রাম মন্ত্র গ্রহণ করে এঁদের দীক্ষা হয়। রামায়ণের রাম নন। সাধক হয়ে উঠলে এঁরা সাধু বা ফকির হয়ে যান এবং গায়ত্রী-ক্রিয়ার অধিকারী হন। গৃহীদের এ অধিকার নাই। এ ক্রিয়া অত্যন্ত গুহ্য ও বীভৎস। বাউলদের মত এঁরা দেহকে ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ জ্ঞান করেন। গায়ত্রী-ক্রিয়া অর্থে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক শুক্রাদি সঞ্চালন ও গ্রহণরূপ কতকগুলি গুহ্য ক্রিয়া এঁরা পালন করেন। বাউলদের চারিচন্দ্র সাধনার মত এই সব কাজ। অযোধ্যা, নেপাল ও তরাই অঞ্চলে অনুন্নত লোকদের মধ্যে এই মতবাদ প্রচলিত। সৎনামী, ও পল্টুদাসপন্থীদের সঙ্গেও এঁদের বিশেষ মিল আছে। এই সম্প্রদায়ে ফকির ও উদাসীনগণ হলুদ জামা ও টুপি পরেন। নাম মাত্র মুখাগ্নি করে মাটি দিয়ে এঁদের সংকার করা হয়। মৎস্য ও মাংস এঁরা গ্রহণ করেন না। কবীরের মতবাদের প্রভাব এঁদের ওপর অনেকটা রয়েছে।

আপোদ্ধৌম্য—আয়োদ্ধৌম্য।

আফগানিস্তান—অপগস্তান। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এখানকার অনেক নদনদী ও প্রাচীন জাতির উল্লেখ ঋক্ বেদে আছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর (৩২৩ খৃ পূ) পর সেলুকাসকে পরাজিত করে সন্ধিসর্ত অনুসারে আরিয়া (=হেরাত), আবকোসিয়া (=কান্দাহার), পরোপনিসডে (=কাবুল) হস্তগত করেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীন অংশগুলি পরে অশোকের মৃত্যুর পর ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজা অধিকার করে নেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে পূবমধ্য এসিয়ার ইউ. চি জাতি আফগানিস্তানের পূর্ব ও উত্তরপূর্ব অঞ্চলে রাজত্ব স্থাপন করেন; ইউ-চি-দের একটি শাখা কুষাণগণ, এঁরা সমস্ত ইউ-চি-দের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক পুরুষপুরে (=পেশোয়ার) রাজধানী স্থাপন করে আফগানিস্তান, বাল্‌খ্‌ ও ভারতের একটা মস্ত অংশ নিয়ে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। কনিষ্কের রাজত্ব কালে আফগানিস্তানের উত্তরাংশে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে ও বহু মঠ ও সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে কুষাণরাজ্য দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। হিউ-এনৎসাঙ উত্তর ও পূর্ব আফগানে বহু বৌদ্ধ মঠ ও সংঘারাম

দেখেছিলেন। নবম শতকের পূর্বভাগে এই সব অঞ্চলে কয়েকটি হিন্দুরাজ্য ও স্থাপিত হয়েছিল। কাবুলের শাহীবংশীয় হিন্দু রাজারা বহু দিন এখানে স্বাধীন রাজা ছিলেন এবং পাঞ্জাবের খানিকটা পর্যন্ত এঁদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। শাহী বংশীয় শেষ রাজা জয়পাল মুসলমানদের হাতে পরাজিত হলে আফগানিস্থানে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্রঃ ঋভু।

আবগারি—মাদক দ্রব্যের ওপর শুল্ক। মৌর্যযুগে মদ্য উৎপাদন বিক্রয় ও পান করা কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। কোন শুল্কের ব্যবস্থা ছিল না।

আবন্ত্য—ব্রাত্য ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম সন্তান।

আবসথ্য—গৃহাগ্নি।

আবি—অন্ধক দৈত্যের ছেলে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধের চেষ্টায় উমার অনুপস্থিতিতে উমার বেশে শিবকে বধ করতে চেষ্টা করেন। শিবের হাতে মারা যান।

আবু—২৪°৪০´ উ, ৭২°৪৫´ পূ। রাজস্থানের সিরোহি জেলার একটি পাহাড়ি সহর। আরাবল্লী পর্বতমালা থেকে বনাস নদীর উপত্যকা দিয়ে বিচ্ছিন্ন। আবু পর্বত গড়ে ১২২০ মি উচ্চ। আমেদাবাদ থেকে ১৮৫ কি-মি উত্তরে। প্রাচীন নাম অর্বুদ (দ্রঃ) বা অর্বুদাচল। ঋক্‌বেদে (১০।৬৮।১২, ১।৫১।৬) উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে খৃ-পূ ৮-৬ শতকে নাগ উপজাতির বাসস্থান ছিল এবং নাগ সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। মহাভারত ও প্রাচীন পুরাণগুলিতে আবুকে অপরান্ত এবং পশ্চিম উপকূলের অংশ বলা হয়েছে। এখানকার লোক আনর্ত দেশের অধিবাসী বলে উল্লিখিত হয়েছে। বর্তমানের গুজরাটের প্রাচীন নাম আনর্ত। গুজরাটে যখন সোলাঙ্কিদের রাজত্ব আবু তখন চন্দ্রাবতীর পরমার সামন্তদের অধীন। আবু পাহাড়ে এক গুহায় অর্বুদা দেবীর মন্দির আছে। আবু রোড ষ্টেসনের দক্ষিণে ১১ কি-মি দূরে অম্বাদেবীর মন্দির। জৈন সম্প্রদায়ের এক প্রধান তীর্থ আবু। তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ ও নেমিনাথের নাম এই তীর্থের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। বিমলশাহ নির্মিত বিমলবসহী (১০৩০ খৃ) এবং বাস্তুপাল-তেজপাল নির্মিত লুণবসাহী (১২৩০ খৃঃ) মন্দির বিখ্যাত।

আবেস্তা—জরথুস্ত্রের ১৫০০ বছর পরে অথ্‌বান্‌-রা (=পুরোহিত) তাঁদের ধর্মগ্রন্থাদি বোঝাতে আবেস্তা শব্দটি প্রয়োগ করেন। আবেস্তার ভাষা ঋক্‌বেদের ভাষার অনুরূপ; এই ভাষায় অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। প্রায় সমস্ত ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যেও মিল আছে। আবেস্তা গ্রন্থাবলী প-এসিয়ার আর্যদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান। বিদ্‌-ধাতু থেকে আবেস্তার উৎপত্তি স্বীকার করলে আবেস্তা অর্থে জ্ঞান। উপস্তা শব্দের সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করলে আবেস্তা অর্থে (জ্ঞানের) মূলাধার।

আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত—পূর্ণ চৈতন্য থেকে অচেতন জড় বস্তু পর্যন্ত। নিখিল।

আভাস্বর—৬৪-জন গণদেবতা।

আভীর—প্রাচীন বহিরাগত একটি জাতি। সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্য থেকে শকদের সঙ্গে আসে। পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও পরে সিন্ধু উপত্যকাতে বসতি স্থাপন করে। এই

জন্য সিন্ধু উপত্যকা অংশ আভীর রাজ্য বলে অভিহিত হয়। সরস্বতী নদীর মুখেও এরা বাস করতেন। খৃ ১-শতকের একজন বিদেশী গ্রন্থকার এবং ২-শতকে টলেমি এই আভীর রাজ্যকে আবিরিয়া বলেছেন। পুরাণেও এই কথাই আছে। পরে আভীররা আরো দক্ষিণে তাপ্তী নদীর মোহনা থেকে কোঙ্কন পর্যন্ত অপরান্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমশ এরা হিন্দু হয়ে পড়তে থাকেন। হিন্দু শাস্ত্রে বহু স্থানে এঁদের ম্লেচ্ছ বা দস্যু বলা হয়েছে। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে এঁরা শূদ্র। মহাভারতে অশ্বমেধ পর্বে এঁরা ক্ষত্রিয় : কিন্তু পরশুরামের ভয়ে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন না করার জন্য শূদ্রপদ-বাচ্য। প্রকৃত শূদ্রদের সঙ্গে এঁদের ভীষণ শত্রুতা ছিল। নকুল (পাণ্ডব) এঁদের পরাজিত করেন; যুধিষ্ঠিরকে এরা বহু উপহার দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে দ্রোণের গরুড়ব্যূহে আভীর সৈন্যরা অংশ নিয়েছিল। অর্জুন যখন দ্বারকা থেকে যাদব রমণীদের নিয়ে ফিরছিলেন তখন যাঁরা তাঁকে আক্রমণ করেছিল তাদের মধ্যে আভীররাও ছিল। মনুতে ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠা রমণীর গর্ভে সঙ্কর বর্ণ বলে স্বীকৃত। গোচারণ ও গোপালন প্রধান পেশা : পরে কৃষি ইত্যাদি। বিভিন্ন শিলা-লিপি ও তাম্রশাসনে মাঠরি পুত্র ঈশ্বর সেন/দত্ত ইত্যাদি রাজার নাম পাওয়া যায়। সাতবাহনের পর দাক্ষিণাত্যের উ-পশ্চিমে আভীররা এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। সংগীতে আহির/আহিরী রাগিণী এঁদের অবদান। কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার বহু কাহিনীতে আভীরদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মার্কণ্ডেয় ঋষি একবার ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন কলিযুগে ভারতে বহু জায়গায় এরা রাজা হবেন। দ্রঃ গায়ত্রী।

আভ্যুদয়িক—কোন অভ্যুদয় উপলক্ষ্যে শ্রাদ্ধ। শুভকাজের প্রথমে অনুষ্ঠিত। অন্য নাম বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বা নান্দীমুখ। এই শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষদের মুখে নান্দী/প্রশস্তি উচ্চারিত হয়। এটি অন্নপাকহীন আমান্ন শ্রাদ্ধ। দক্ষিণমুখে বা উপবীত ডান কাঁধে নিয়ে বা মধ্যাহ্নে এ শ্রাদ্ধ করতে হয় না।

আমোদপ্রমোদ—প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন ঋতুতে বাড়ির বাইরে গিয়ে সমবেত ভাবে আমোদ আহ্লাদ করবার রীতি ছিল। মল্লযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, বংশযুদ্ধ, রথের দৌড় ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হত। বাৎসায়নের সময় অপরাহ্নে গোষ্ঠীতে (=ক্লাবে) গিয়ে আমোদ আহ্লাদ করা হত। নাগরিকের নিত্য কর্মের মধ্যে দু রকম খেলা প্রচলিত ছিল :—(১) গোষ্ঠী সমবায় (২) সমস্যা-ক্রীড়া। সমস্যা-ক্রীড়ার দু ভাগ :—(১) মাহিমান্য (=সর্বভারতীয়); (২) দেশ্য (=আঞ্চলিক)। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (৪।৪২) কয়েকটি সমস্যা ক্রীড়ার নাম :—মাহিমান্য ক্রীড়া :—যক্ষরাত্রি, কৌমুদীজাগর সুবসন্তক। দেশ্যক্রীড়া :—সহকারভঞ্জিকা, অভ্যূষখাদিকা, বিসখাদিকা, নবপত্রিকা, উদকক্ষ্বেড়িকা, পাঞ্চালানুযান, একশাল্মলী, যবচতুর্থী, আগোলচতুর্থী, মদনোৎসব, হোলাকা, অশোকত্তংসিকা, পুষ্পাবচায়িকা, চূতলতিকা, ইক্ষুভঞ্জিকা, কদম্বযুদ্ধ। নাচগান ও বাজনা সহযোগে এই সমস্ত ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হত।

কার্তিক পূর্ণিমা রাত্রে অন্যমতে কার্তিক অমাবস্যা বা শুক্লা প্রতিপদ রাত্রে যক্ষরাত্রি ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হত। সমস্ত রাত ধরে পাশাখেলা ও নাচগান হত। আশ্বিনের

কোজাগর পূর্ণিমাতে কৌমুদীজাগর অন্য নাম মদনোৎসব বা দ্যূতপূর্ণিমা। প্রেমিক প্রেমিকা দোলাতে ঝুলত ও পাশা খেলে রাত কাটাত। পুরুষরা নিজেদের মধ্যে পাশা খেলত। সুবসন্তক উৎসব হত মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চমী বা বসন্ত-পঞ্চমী রাত্রে। নাচগান ও নানা খেলা দেখান হত। এই তিথিতে মদনোৎসবও হত। উত্তর ভারতে এই তিনটি উৎসব আজও প্রচলিত। নদী, পাহাড়, গাছ, প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে, ফসল ঘরে তোলার সময় উৎসব হত। পুষ্পিত শিমুল গাছকে ঘিরে নাচ গান হত। বসন্তে আমের মঞ্জরীতে এবং চৈত্রে শুক্লা অষ্টমীতে অশোক ফুলে সেজে উৎসব হত। কদমফুল ছুঁড়ে দল বেঁধে যুদ্ধ হত। দল বেধে বনভোজনে যাওয়া ; প্রথম বৃষ্টির পর বনভোজনে গিয়ে গাছে গাছে বিয়ে দেওয়া হত। কচি আম উঠলে, আকে মিষ্টতা এলে, ছোলা মটর ইত্যাদি শস্য পাকলে এক একটি উৎসবের ব্যবস্থা হত। গ্রীষ্মকালে বাঁশের পিচকারি করে পরস্পরকে জল দেওয়া একটি প্রমোদ ছিল। প্রাচীনকালে বৈশাখী শুক্লা চতুর্থীতে সুগন্ধি যবচূর্ণ পরস্পরের গায়ে দিয়ে উৎসব হত। শ্রাবণী শুক্লাচতুর্থীতে দোলাতে দুলত ; বর্তমানে এটি ঝুলন। ফাল্গুনে পূর্ণিমাতে দোল উৎসবে কিংশুক ও অন্যান্য ফুলের সুগন্ধ জল ও যবচূর্ণ ও লাক্ষা নির্মিত কুঙ্কুম পরস্পরের গায়ে দিয়ে উৎসব হত। প্রাচীন লৌকিক উৎসব হোলাকা বা হোরি বর্তমানের দোল।

নাগর ও আঞ্চলিক উৎসব ছাড়াও বিভিন্ন স্থান থেকে আগত জনসাধারণের আমোদ প্রমোদের জন্য মেলা উৎসব ছিল। এই মেলার নাম ছিল সমাজ-উৎসব। এই সমাজগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রচার কাজের সুবিধা ছিল বলে রাষ্ট্র এগুলিকে সাহায্য করত। রামায়ণে আছে উৎসব-সমাজ রাষ্ট্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যাত্রা, উৎসব, সমাজ, এবং প্রবহণের ব্যবস্থা আছে। যাত্রা অর্থে দেবদেবীর রথযাত্রা ; সমাজ অর্থে সমবেত মেলা, উৎসব অর্থে ইন্দ্র মদন ইত্যাদির পূজা বা ঋতু উৎসব এবং প্রবহণ অর্থে উদ্যান ও বনভোজন। সাধারণত নগরের বাইরে দূরে মাঠে বা পাহাড়ের ওপর সুন্দর পরিবেশে সমাজের ব্যবস্থা হত। সহজ মৃগয়ার ব্যবস্থাও থাকত। মল্লযুদ্ধ, লাঠিখেলা, দৌড়, রথচালনা, নাচ, গান, বাজনা এবং নানা দেবদেবীর রথযাত্রার বিচিত্র ব্যবস্থা হত। সমাজ অঙ্গনে ধর্মালোচনা, ও যজ্ঞাদিরও ব্যবস্থা ছিল। ভাটের রঙ্গকৌতুক, বীরগাথা আবৃত্তি, বৈতালিকের গান, পুতুল নাচ, নাটক, জাদুকরের খেলা, তিতির পাখী থেকে হাতী ঘোড়া, মোষ ও ষাঁড়ের লড়াইও বাদ যেত না। অস্ত্রের খেলা, সামরিক কুচকাওয়াজ ও নকলযুদ্ধেরও অনুষ্ঠান হত। সামরিক কুচকাওয়াজ ও নাচগান সহকারে স্বয়ংবর সভাও বসত। এই সব সময়ে মদ্যপান ও মাংসাদি ভক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল। একাদিক্রমে চারদিন মদ্যপানেও রাষ্ট্রের আপত্তি ছিল না। পরবর্তীকালে অশোক এই সব আমোদ প্রমোদের বহু তামসিক অংশ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অনেকের মতে মহাভারতে শৈব-মতবাদীদের সমাজের বর্ণনা আছে ; ফলে সেখানে মদ্যপান ও নাচগানের কথা আছে। লৌকিক সমাজ অনেক সময় বিরাট রঙ্গাঙ্গনে পরিণত হত। সমাগত দর্শকদের থাকবার জন্য শিবির ও

মঞ্চ তৈরি করে দেওয়া হত এবং নানা রকম মাংসের-ব্যঞ্জন করে সকলকে ভোজ দেওয়া হত। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে দেখা যায় সরস্বতীর মন্দিরে পাক্ষিক বা মাসিক নাচগান ও বাজনার অধিবেশন হয়ে থাকত এবং এর নামও ছিল সমাজ।

পালি সাহিত্যে আছে আজীবকগণ নক্ষত্র বিচার করে শুভদিন ঠিক করে দিলে দিনটি ছুটি বলে ঘোষণা করা হত এবং নানা আমোদ প্রমোদে মানুষে মেতে উঠত; এর নাম ছিল নক্ষত্রক্রীড়া। অশোক শিলালিপিতে মঙ্গল নামে একটি উৎসবের উল্লেখ আছে। বিয়েতে এবং পরিবারে ছেলে হলে নানা রকম আমোদ আহ্লাদের আয়োজন করে মঙ্গল উৎসব পালন করা হত। মুসলমান রাজত্বের সময় থেকে আমোদ প্রমোদ ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। কিছু কিছু ব্যবস্থা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। কিছু কিছু কীর্তন গান চালু হয় এবং মেলা বেচাকেনার হাটে পর্যবসিত হতে চলে।

আম্নায়—শ্রুতি, বেদ, নিগম শাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র।

আম্বালা—পাঞ্জাবের একটি বিভাগ, জেলা ও সদর। প্রাচীন সরস্বতী ও বর্তমান যমুনা নদীর মধ্যে। ভারতে আর্যদের অন্যতম আদি বাসস্থান। সপ্তম শতকে হিউ-এন-ৎসাঙের বিবরণে এটি একটি সুসভ্য রাজ্য বলে উল্লিখিত হয়েছে; রাজধানী ছিল শ্রুঘ্ন। কারো কারো মতে জগাধ্রির কাছে বর্তমান শুখ গ্রাম এই শ্রুঘ্ন। আম্বালার ৭২ কি-মি. উত্তরে শতদ্রু নদীর তীরে রূপার, প্রাচীন নাম রূপনগর, একটি সুপ্রাচীন সহর। এখানে হরপ্পার সমকালীন সভ্যতার নিদর্শন আছে। রূপার থেকে ১৬ কি-মি. পূর্বে শিবালিক পাহাড়ে অবস্থিত বর্দারে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। এখানে প্রায় ৭৫০ বছরের প্রাচীন দুর্গা ও অন্য দেবদেবী মূর্তি পাওয়া গেছে। নারায়ণ গড়ের হুসেইনি গ্রামে জামকেশ্বর পুষ্করিণীর তীরে পাণ্ডবরা হিমালয়ের পথে বিশ্রাম করেছিলেন। এটি একটি পবিত্র তীর্থস্থান।

আয়তি—মেরুর দুই মেয়ে আয়তি ও নিয়তি। আয়তি ধাতার স্ত্রী: নিয়তি বিধাতার স্ত্রী। এই ধাতা ও বিধাতা হলেন ভৃগু ও খ্যাতির সন্তান: ধাতার ছেলে প্রাণ; বিধাতার ছেলে মৃকণ্ডু।

আয়ান—বা রায়াণ: প্রকৃত নাম অভিমন্যু (দ্রঃ); পিতা গোল, মাতা জটিলা। গোল কৃষ্ণের মাতামহীর ভাই; সুতরাং আয়ান কৃষ্ণের মাতুল। যশোদার ভাই। গোলকে কৃষ্ণের অংশ স্বরূপ। রাধার স্বামী। ধর্মপ্রাণ কালীভক্ত। আয়ান পুরুষত্বহীন ছিলেন। অন্য মতে একজন ঋষি। এর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে নারায়ণ বর দিতে এলে ইনি বর চান যে নারায়ণের স্ত্রী যেন তাঁর স্ত্রী হয়। আয়ান বর পান; এবং জানতে পারেন দ্বাপরে তিনি লক্ষ্মীকে পাবেন বটে তবে তাঁকে ক্লীব হয়ে জন্মাতে হবে। গীতগোবিন্দ ইত্যাদিতে কিন্তু এই ক্লীবত্বের কথা নেই। দ্বাপরে লক্ষ্মী রাধিকা হয়ে জন্মান এবং আয়ানের সঙ্গে বিয়ে হয়। শাক্ত আয়ান একদিন কালীপূজা করছিলেন এমনসময় কুটিলা খবর দেন রাধিকা কৃষ্ণের সঙ্গে বনে বিহার করছেন। আয়ান ছুটে যান; এদিকে কৃষ্ণ কালীমূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং রাধিকা কালীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে থাকেন।

ফলে আয়ান সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যান এবং বোনকে তিরস্কার করেন। এরপর আয়ানের মৃত্যু হয়।

আয়ু—(১) আয়ুস্। পুরূরবা উর্বশীর ছেলে আয়ুস্। আয়ুসের স্ত্রী স্বর্ভানবী, ইন্দুমতী। ছেলে রজি, নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ (বৃদ্ধশর্মা), রম্ভ, অনেনস্, গয়। আয়ু ধার্মিক রাজা ছিলেন; সন্তান হীন রাজা একবার দত্তাত্রেয় আশ্রমে আসেন। দত্তাত্রেয় সুরাপান করে কতকগুলি মেয়েদের নিয়ে উন্মত্ত অবস্থায় ছিলেন। রাজাকে দেখে মুনি ধ্যানে বসে যান এবং একশ বছর ধ্যান করতে থাকেন। রাজাও অপেক্ষা করতে থাকেন। রাজার ভক্তিতে শেষ পর্যন্ত মুনি রাজাকে বোঝাতে চান তাঁর কোন ব্রাহ্মণত্ব নাই; মদ্য মাংস ও মেয়েছেলে নিয়ে তাঁর দিন কাটে; রাজা বরং অন্য কোন মুনির কাছে যান। আয়ু এসব কথায় কাণ দেন না; সন্তান হক আশীর্বাদ চান। মুনি তখন রাজাকে একটি নরকপালে করে মদ্য ও মাংস আনতে বলেন। রাজা তাই আনেন। দত্তাত্রেয় তখন সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন রাজার একটি ছেলে হবে; এই ছেলে ধার্মিক, প্রজাপালক, বেদে ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং যুদ্ধে দেবাসুর ক্ষত্রিয় ইত্যাদি সকলের কাছে অজেয় হবে। মুনি রাজাকে একটি ফল দেন এবং রাজা ফলটি রাণী ইন্দুমতীকে খেতে দেন। ছেলে হয় নহুষ (দ্রঃ)। (২) ভেকদের রাজা; এঁর মেয়ে সুশোভনা, পরীক্ষিতের স্ত্রী।

আয়ুধ—প্রাচীন যুগে ব্যবহৃত অস্ত্র মহাভারত ইত্যাদির মতে চার রকম:-মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও মন্ত্রমুক্ত। অগ্নি পুরাণ মতে পাঁচ রকম (১) যন্ত্রমুক্ত, পাণিমুক্ত, মুক্তসন্ধারিত, অমুক্ত ও বাহুযুদ্ধ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নানা অস্ত্রের প্রস্তুত প্রণালী প্রয়োগপদ্ধতি ইত্যাদির বহু বিবরণ আছে। ধনুক সাধারণত চার রকম ছিল:- (১) কার্মুক (তালের তৈরি), (২) কোদণ্ড (বাঁশ), (৩) দ্রূণ (কাঠ), (৪) ধনু (শিঙ)। শরের মুখ ধাতু, হাড় বা কাঠ দিয়ে তৈরি হত এবং আকৃতি অনুসারে আরামুখ, ক্ষুরপ্র, গোপুচ্ছ, অর্দ্ধচন্দ্র, সূচীমুখ, ভল্ল, বৎসদন্ত, কর্ণিক, কাকতুণ্ড ইত্যাদি নাম ছিল। অর্থশাস্ত্র অনুসারে খড়্গ তিন রকম নিস্ত্রিংশ, অসিযষ্টি ও মণ্ডলাগ্র। শক্তি অস্ত্র নানা রকমের ছিল, তোমর, প্রাস, কুন্ত, ভিন্দিপাল ইত্যাদিও শক্তি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মুষল, যষ্টি ও গদা এই তিন রকমের গদার উল্লেখ আছে। গদা লোহার হত। ধনুর্বেদে গদা তিন শ্রেণীর; স্থূলাগ্র, চতুরগ্র, ও তালমূলাকৃতি। কুঠার কুলিশ, পরশু ও পরশ্বধ মোটামুটি একই; তবে পরশুর প্রান্ত কেবল অর্দ্ধচন্দ্রের মত। চক্র লোহ নির্মিত, তীক্ষ্ণধার ও ছুঁড়ে মারা হত। এক প্রকার শতঘ্নী নগর প্রাচীরের ওপর থাকত; শত্রু এলে তাদের প্রতি ছুঁড়ে দেওয়া হত। এগুলি কণ্টকাকীর্ণ মহাশিলা ও সচক্রা বলে বর্ণিত হয়েছে। আর এক প্রকার শতঘ্নী ছিল কাঁটাওলা মুগুরের মত। রামায়ণ ও মহাভারতে ও অর্থশাস্ত্রে যন্ত্র নামে নানা অস্ত্রের উল্লেখ আছে। অর্থশাস্ত্র মতে যন্ত্র দুরকম 'স্থির' ও 'চল'। এগুলি সাধারণত নগর দ্বারে থাকত। আকার বিরাট হত এবং চালাবার সময় ভীষণ শব্দ হত। এগুলির সাহায্যে শর ও পাথর শত্রুর ওপর ছুঁড়ে মারা হত। গ্রীক ও রোমানরাও

অনুরূপ যন্ত্র ব্যবহার করেছে। এ ছাড়া অঙ্গত্রাণ হিসাবে বহু জাতের কবচ প্রচলিত ছিল।

আয়ুর্বেদ—বা বৈদ্যক। ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে আয়ুর্বেদ চারটি বেদের সার এবং কশ্যপ মুনির মতে পঞ্চম বেদ। অন্য মতে অথর্ব-বেদের একটি উপাঙ্গ আয়ুর্বেদ। দেহ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে নানা কিছু জিনিস বেদ-গুলির মধ্যে ছড়ান আছে। ঋকবেদে বায়ু, পিত্তকফ এবং অথর্ববেদে নর কঙ্কালের বিভিন্ন অংশের উল্লেখ আছে। বৈদ্যক অর্থে ক্লীবলিঙ্গে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ।

কাহিনী আছে এই বিশেষ বেদটি প্রজাপতি রচনা করে সূর্যকে দেন। সূর্য আর এক সংহিতা তৈরি করে ধন্বন্তরি, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইত্যাদি ষোল জনকে পাঠ করান। এঁরা প্রত্যেকে আবার এক একখানি চিকিৎসা শাস্ত্র রচনা করেন। অন্য মতে ব্রহ্মা তাঁর ধ্যানলব্ধ জ্ঞান প্রজাপতিকে দেন এবং প্রজাপতি অশ্বিনীকুমারদের দেন। ইন্দ্র এঁদের একজনের কাছ থেকে এই বিদ্যা আয়ত্ত করে ভরদ্বাজ ইত্যাদি ঋষিকে দেন। ভরদ্বাজ দেন আত্রেয়কে এবং আত্রেয় অগ্নিবেশ ও অন্য শিষ্যদের দেন। অগ্নি-বেশের কাছ থেকে পান চরক। আবার ধন্বন্তরি (দিবোদাস) সুশ্রুত ও সহ অধ্যায়ীরা আয়ুর্বেদ আয়ত্ত করেন পরে নাগার্জুন এই শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। প্রথম দিকে এই শিক্ষা মুখে মুখেই প্রচলিত ছিল। আত্রেয় শিষ্য অগ্নিবেশ প্রথমে সংহিতা রূপে লিপিবদ্ধ করেন। অগ্নিবেশের দেখাদেখি আত্রেয়ের অন্য শিষ্যরাও যেমন ভেল, জতূকর্ণ, পরাশর, হারীত, ক্ষারপাণি ও এক এক সংহিতা লেখেন। পরবর্তী কালে চরক অগ্নিবেশসংহিতাকে বিশেষভাবে সংকলন করেন এবং নাম হয় চরক সংহিতা। এ ছাড়া খরনাদ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, মাধব সংহিতা ইত্যাদি নানা গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। শল্য চিকিৎসক সুশ্রুত প্রণীত গ্রন্থের নাম সুশ্রুতসংহিতা। আয়ুর্বেদের মধ্যে তান্ত্রিক চিকিৎসা পদ্ধতি নামে আর একটি শাখা আছে। অনেকের মতে এটি আর্যপূর্ব যুগের চিকিৎসা পদ্ধতি। বৈদিক পদ্ধতিতে দুটি ধারা আছে একটি আত্রেয় এবং একটি ধন্বন্তরি। তান্ত্রিক পদ্ধতিতেও দুটি ধারা রসসাধক ও বিষসাধক। রসসাধকরা পারদশোধন, মারণ প্রভৃতি দিয়ে জরা ও ব্যাধি নিয়ন্ত্রিত করতেন এবং বিষসাধকরা নানা বিষ দিয়ে রোগ ও রোগের যন্ত্রণা উপশম করাতেন। বিষসাধকদের গ্রন্থগুলিই তন্ত্র নামে পরিচিত। রসার্ণব তন্ত্র, রসেন্দ্রসার সংগ্রহ, রসেন্দ্র চিন্তামণি, রসহৃদয় তন্ত্র, রসরত্ন, ঔপধেনব তন্ত্র, ঔরভ্র তন্ত্র, নিমিতন্ত্র, শৌনকতন্ত্র, বিদেহ তন্ত্র ইত্যাদি আরো বহু তন্ত্র রয়েছে।

অনেকের মতে কনিষ্কের সভাতে চরক রাজবৈদ্য ছিলেন। সুতরাং গ্যালেনের (আনু ১৩০-২০০ খৃ) সমসাময়িক হয়তো। কয়েক শতাব্দী পরে ধন্বন্তরিও ও অমর সিংহ। ধন্বন্তরির একটি ভেষজ বিদ্যা ও অমরসিংহের অমরকোষে বহু ভেষজের বিকল্প নাম পাওয়া যায়। শুক্রাচার্যের মৃতসঞ্জীবনী এবং ইন্দ্রের দেহে মেষের মুষ্ক-সংযোগ ইত্যাদি অবশ্য নিছক কল্পনা। মুসলমান আক্রমণের পর ভারতের বাইরে আয়ুর্বেদ জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে। বাগদাদে খলিফা হারুন অল রসিদ (৭৬৩-৮০৯

খৃঃ) আয়ুর্বেদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং চরক সুশ্রুত ইত্যাদি আরবিতে অনুবাদ করান। তাঁর সভায় মঙ্ক নামে একজন ভারতীয় চিকিৎসক ছিলেন এবং আয়ুর্বেদের বিষক্রিয়া সম্বন্ধীয় অংশগুলির ফারসি অনুবাদ করেন। চরক সংহিতা অনুবাদ করেন আলি ইবন জৈন এবং অনূদিত সুশ্রুত সংহিতার নাম হয় 'কিতাব সশুর অল হিন্দি'। বাগভট্টের অষ্টাঙ্গহৃদয় ও মাধবকরের নিদান ও আরবিতে ঐ সময়ে অনূদিত হয়। অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে নাগার্জুন চোলাই করা, সত্ত্বপাতন, ঊর্দ্ধপাতন প্রভৃতি পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। বহু বিদ্যার্থীকে চিকিৎসা ও ভেষজ বিদ্যা শেখাবার জন্য হারুন অল রসিদ ভারতে পাঠিয়ে ছিলেন এবং বহু ভারতীয় চিৎিসককে নিয়ে গিয়ে বাগদাদে ও অন্যান্য হাসপাতালে নিযুক্ত করেছিলেন এবং বহু গ্রন্থ অনুবাদ করিয়েছিলেন। অর্থাৎ ইউনানি শাস্ত্রের ওপর আয়ুর্বেদের প্রভাব অনস্বীকার্য।

ব্রহ্মসংহিতা মতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদে নয়টি বিভাগ:—কায়চিকিৎসা, শল্য চিকিৎসা, শালাক্যচিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদচিকিৎসা, রসায়ন চিকিৎসা, বাজীকরণ চিকিৎসা, পশু চিকিৎসা। পশুচিকিৎসা বাদ দিয়ে বাকি আটটি শাখা মিলে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ। কায়চিকিৎসা:—দেহের যে কোন স্থানের রোগের চিকিৎসা। দুভাগে বিভক্ত:—শারীরিক ও মানসিক। বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটি একক ভাবে বা মিলিত ভাবে কুপিত হয়ে যে রোগ ঘটায় তাকে স্বাভাবিক রোগ বলা হয়। বায়ু পিত্ত কফের সুষম অবস্থার নাম সমাগ্নি। এই তিনের স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটলে বিষমাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি বা মন্দাগ্নি অবস্থা দেখা দিতে পারে। বিষমাগ্নি থেকে বাতজরোগ, তীক্ষ্ণাগ্নি থেকে পিত্তজ রোগ ও মন্দাগ্নি থেকে কফজ রোগ দেখা দেয়। স্বাভাবিক রোগ ছাড়া আরো দুটি শ্রেণী রয়েছে: একটি সংক্রামক রোগ; যেমন হাম, বসন্ত, চর্মরোগ, অভিষ্যন্দ প্রভৃতি। আর একটি আগন্তুক রোগ অর্থাৎ পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি দুর্ঘটনা জনিত আসা রোগ। শরীর-গত বায়ুকে আয়ুর্বেদ পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছে: প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান। বায়ু-প্রকৃতির লোকের দেহে ক্ষিতি ও অপ-এর প্রভাব কম থাকে। পুষ্টির অভাবে দেহের ত্বক ও কেশ শুকিয়ে যায়: অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষীণ ও লঘু হয়ে পড়ে; দেহ ও মনে দৃঢ়তা থাকে না। স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজনা প্রবণ হয়ে ওঠে। এবং একটুতেই এদের বাতজব্যাধি দেখা দেয়। শারীরিক ও মানসিক ক্ষুধা জনিত দুটি শক্তিশালী প্রবৃত্তির বিরোধই শুচিবায়ু, মূর্চ্ছা, উন্মত্ততা ইত্যাদি বায়ু রোগের কারণ। আয়ুর্বেদে ৮০ প্রকার বায়ু রোগের নিদান সহ বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। চরকের মতে বস্তি, মলাশয়, কোমর, পদযুগল ও পায়ের হাড়গুলি ও প্রধানত পক্কাশয়ে বায়ুর অধিষ্ঠান। পিত্ত দেহের তাপ ও পরিপাক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। পিত্ত-প্রকৃতির লোকেদের দেহের গঠন হয় মাঝারি। প্রচুর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা থাকে। দেহ থেকে প্রচুর ঘাম, মল ও প্রস্রাব নির্গত হয়। গায়ের চামড়া উজ্জ্বল ও মসৃণ থাকে কিন্তু সহজে কুঞ্চিত হয়ে পড়ে। গ্রীষ্মে সহজে কাবু হয়ে পড়ে। দুর্ধর্ষ সাহস থাকলেও কষ্ট সহ্য করতে পারে

না। অতি তাড়াতাড়ি জরা ও বার্দ্ধক্য এসে দেখা দেয়। পিত্তের উষ্মাই অগ্নি বা অন্য মতে পিত্ত নিজেই অগ্নি। এই পিত্ত উষ্মা বিকৃত হলে তীক্ষ্ণাগ্নি দেখা দেয় এবং পরিণামে অজীর্ণ, গ্রহণী, জ্বর, চক্ষু রোগ ইত্যাদি হতে পারে। স্বেদ, রস, লসিকা, রক্ত ও প্রধানত আমাশয়ে পিত্তের স্থান। কফ দেহের স্নিগ্ধতা, জলীয় ভাগ ও পিচ্ছল গতি নিয়ন্ত্রণ করে। মাথা, গ্রীবা, অস্থিসন্ধি, মেদ এবং প্রধানত বুকে কফের স্থান। কফের প্রকোপে সর্দি কাসি প্রভৃতি শ্বসন যন্ত্রের রোগ দেখা দেয়। কফ-প্রকৃতির লোকেদের দেহ সুগঠিত ও কান্তি লালিত্যপূর্ণ। কেশ ঘন ও কালো। আহার ও চলাফেরা মন্থর ও সংযত। ক্ষুধা তৃষ্ণা ঘর্ম বা গ্রীষ্মে এদের বিশেষ কষ্ট হয় না। প্রজনন ক্ষমতা এদের বেশি।

শল্যচিকিৎসা : সুশ্রুতে শল্য চিকিৎসার অদ্ভুত উৎকর্ষতা দেখা যায়। হিপোক্রেটিস-এর (৪৬০ খৃ-পূ) বহু আগে ভারতে শল্য চিকিৎসা বিশেষ উন্নতি করেছিল। সুশ্রুত সংহিতায় শতাধিক অস্ত্র এবং চোদ্দ রকম পট্টবন্ধনীর বিবরণ আছে। হাড় ভাঙ্গলে এবং সন্ধিতে হাড সরে গেলে বিশেষ চিকিৎসার উল্লেখ আছে। ভাঙ্গা হাড় ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে কাঠ বা বাঁশের ফলক দিয়ে বাঁধবার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। অস্ত্রে কাটা নানা প্রকার ক্ষতের বিবরণ এই বইতে পাওয়া যায়। কনুয়ের সামনের দিক থেকে রক্ত মোক্ষণ, জোঁকের ব্যবহার, পেট ও জলমুষ্ক থেকে জল বার করে দেওয়ার ব্যবস্থা, উপযুক্ত চাপ দিয়ে বেধে রক্তমোক্ষণ বন্ধ করা ইত্যাদি শল্যচিকিৎসার অন্তর্গত। দুর্ঘটনায় আহত হাত পা বা আরোগ্যের সম্ভাবনা হীন রুগ্ন হাতপা কেটে বাদ দিয়ে কাটা অংশে ফুটন্ত তেলের প্রলেপ দিয়ে বেধে দেওয়া হত। অর্বুদ ও বর্দ্ধিত লসিকাগ্রন্থি কেটে বাদ দিয়ে সেখানে সেঁকো বিষ দিয়ে আবার যাতে না হয় ব্যবস্থা ছিল। গাল থেকে মাংস কেটে নিয়ে কাণের সংস্কার করতেও চিকিৎসকরা পটু ছিলেন। নাভির একটু নীচে বাদিকে চিরে নিয়ে পেটের ভেতরে অস্ত্রপ্রচার করা হত। অন্ত্রের কোনখানে টুকরো করে আবার সেলাই করে জুড়ে দেওয়া হত। দেহের যে কোন নলীয় বা থলীয় অংশে কিছু ঢুকলে তা বার করে দিতে পারতেন। প্রসবের সময় প্রয়োজন হলে অস্ত্রোপচার ও চোখের ছানি কাটাও হত। ভোজ প্রবন্ধে আছে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের আগে রোগীকে ভেষজ যোগে সংজ্ঞাহীন করে নেওয়া হত।

শালাক্য চিকিৎসা :—অক্ষকের ওপর যে কোন অংশের শল্য চিকিৎসা। অর্থাৎ চোখ, কাণ, নাক ও গলার ভেতর প্রভৃতি অংশে শল্যায়ন। বিভিন্ন তন্ত্রে এইরূপ চিকিৎসার বিশেষ বিবরণ আছে। ভূতবিদ্যা :—মানসিক রোগের চিকিৎসা। চরকে অষ্টম অধ্যায়, সুশ্রুতে ষষ্ঠ অধ্যায়ে এবং অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে।

কৌমারভৃত্য :—সুশ্রুতে উত্তর তন্ত্রে বারটি পরিচ্ছেদে, কাশ্যপ-সংহিতা ও বৃদ্ধজীবক তন্ত্রে শিশুরোগের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। সদ্যোজাত শ্বসনহীন শিশুকে কৃত্রিম শ্বসনের দ্বারা বাঁচিয়ে তোলার বিবরণও আয়ুর্বেদে আছে। অগদ সংহিতা :—নানা

বিষের ক্রিয়া জনিত রোগ ও উপযুক্ত চিকিৎসা শাখা। রোগের লক্ষণ, মৃত্যুর পরবর্তী পর্যবেক্ষণ বিবরণও অগদ সংহিতার অংশ। রসায়ন চিকিৎসা :—বৈদিক যুগ থেকেই রসায়ন সাহায্যে চিকিৎসা চলে আসছে। পারদ, লৌহ প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট ভেষজ দুহাজার বছর আগেও ভারতে ব্যবহৃত হত। পতঞ্জলি লৌহশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। খৃষ্টীয় ৮-৯ শতকে নাগার্জুন গন্ধক ও পারদ মিশ্রণে কজ্জলীর প্রবর্তন করেন। চোলাই ইত্যাদি এবং ভেষজের বড়ি তৈরি করে ব্যবহারও নাগার্জুন জানতেন। ভেষজ রূপে সেঁকো বিষের ব্যবহার নাগার্জুনের আগেও ভারতে জানা ছিল। ভেষজগুলি বিভিন্ন অনুপান যোগে ব্যবহৃত হয়। বাজীকরণ চিকিৎসা :— বীর্যধারণ ক্ষমতা, প্রজনন শক্তি বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য আয়ুর্বেদের একটি শাখা। এ বিষয়ে বহু তন্ত্র রয়েছে।

এই আটটি বিষয় ছাড়াও পশু চিকিৎসার দিকও আয়ুর্বেদে অবহেলিত হয় নি। এই শাখার অনেক বই আছে; তার মধ্যে পালকাপ্য সংহিতাতে হাতীর, গোতম সংহিতাতে গরুর, এবং শালিহোত্র সংহিতাতে ঘোড়ার রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। এবং এ ছাড়াও বৃক্ষায়ুর্বেদে বৃক্ষাদির চিকিৎসা পদ্ধতির কথা আছে।

আয়ুষ্টোম—দীর্ঘায়ু কামনার যজ্ঞ।

আয়ুস্—দ্রঃ আয়ুঃ।

আয়োগব—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত সন্তান। পেশা নাটক অভিনয় ও হস্তশিল্প।

আয়োদধৌম্য—আপোদ্ধৌম্য, একজন মহর্ষি। এঁর তিন বিখ্যাত শিষ্য বেদ, উপমন্যু, আরুণি। গুরুভক্তি পরীক্ষার জন্য শিষ্যদের নানা ক্লেশ দিতেন এবং পরে বিবিধ বিদ্যায় পারঙ্গম করে গৃহাশ্রমে ফিরে যেতে দিতেন।

আরকট—মাদ্রাজের দুটি জেলা, উত্তর আরকট ও পূর্ব আরকট। সহর আরকট ১২°৫৬´ উ ৭৯°২৪´ পূ। অনেকের মতে তামিল আরুকাড়ু শব্দের অপভ্রংশ। আরুকাড়ু অর্থে ছয় অরণ্য এবং এখানে ছজন ঋষি বাস করতেন। দক্ষিণ আরকটে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বাস ছিল। পাথরের বহু অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিক যুগে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব এসে পড়ে। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত চোল রাজারা দক্ষিণ আরকটে রাজত্ব করতেন। নবম শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ আরকট পল্লবদের অধীন ছিল। পল্লবদের সময় ভাস্কর্য চিত্রকলা ও স্থাপত্য শিল্পের চরম উন্নতি দেখা গিয়েছিল। নরসিংহ বর্মার সময় মহাবলিপুরম নামে জায়গাতে পাহাড় কেটে সাতটি রথ বা মন্দির তৈরি হয়েছিল। এগুলি পল্লব ভাস্কর্যের চরম উৎকর্ষতার নিদর্শন। শৈব পরমেশ্বর বর্মা অগণিত শিব মন্দির তৈরি করেন এবং মহাবলিপুরমের বিখ্যাত গণেশ মন্দিরটিও তাঁর।

আরণ্যক—বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের তিন অংশ; শুদ্ধব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। শুদ্ধ ব্রাহ্মণ মুখ্যত কর্মাশ্রয়ী বা কর্মকাণ্ড এবং উপনিষদ জ্ঞানাশ্রয়ী বা জ্ঞান-কাণ্ড। মাঝখানে আরণ্যক কর্মও জ্ঞানের সন্ধিসাধক সেতু। আরণ্যকে যজ্ঞের উপদেশ আছে কিন্তু এ যজ্ঞে হবন অপেক্ষা মননের প্রাধান্য অধিক।

অরণ অর্থে দূর দেশ বা বনদেশ। অরণে বা অরণ্যে সুগভীর তত্ত্বানুশীল সম্ভব মনে হত। তাই অরণ্যে পাঠ্য গ্রন্থ আরণ্যক। বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী সমাবর্তনের আগে অরণ্যে বা 'অচ্ছদিদর্শ' (যেখানে বাড়ির ছাদ দেখা যায় না) প্রদেশে বসে গুরুর কাছে আরণ্যকের পাঠ গ্রহণ করতেন। গৃহস্থ বয়সকালে বানপ্রস্থে আসতেন এবং বৃদ্ধবয়সে অর্থাভাব হেতু আরণ্যক নির্দিষ্ট মানস যজ্ঞের মধ্যে নিজেকে মেলে ধরতেন। অর্থাৎ জীবনের দুটি প্রান্তে দুবার অরণ্যে এসে আরণ্যক পঠিত হত।

আরণ্যক রূপকবহুল রহস্যবিদ্যা। আরণ্যকে রূপক যজ্ঞের প্রাচুর্য সবচেয়ে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে চতুর্হোত্রযাগ একটি রূপক যজ্ঞ ; চেতনা যেখানে স্রুক, মন আজ্য, বাক বেদি। শাঙ্খায়ন আরণ্যকে আন্তর-অগ্নিহোত্রও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক কর্ম।

গ্রন্থের বিন্যাস ব্যবস্থা ও বস্তু ভাবনার দিক থেকে তুলনা করলে উপনিষদের পূর্বে আরণ্যক। আরণ্যক ব্রাহ্মণের অংশ ; কিন্তু আজ পর্যন্ত যতগুলি ব্রাহ্মণ পাওয়া গেছে ততগুলি আরণ্যক কিন্তু পাওয়া যায় নি। ঋক বেদের দুটি ব্রাহ্মণ ঐতরেয় ও শাঙ্খায়ন এবং দুটিরই আরণ্যক আছে। কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেরও আরণ্যক আছে। ঐতরেয়, শাঙ্খায়ন ও তৈত্তিরীয় এ তিনটি প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ আরণ্যক। শুক্লযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ অংশ বৃহদারণ্যক। এই বৃহদারণ্যক একাধারে আরণ্যক ও উপনিষদ। কৃষ্ণযজুর্বেদে মৈত্রায়ণীয় চরকশাখারও একটি বৃহদারণ্যক আছে। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ প্রভৃতি সামবেদীয় ব্রাহ্মণগুলির কোন আরণ্যক আজও পাওয়া যায় নি। সামবেদের জৈমিনীশাখার উপনিষদ্‌ব্রাহ্মণখানি অনেক অংশে আরণ্যক ধর্মযুক্ত। এটি হয়তো তলবকার জৈমিণীয় ব্রাহ্মণের আরণ্যক। অথর্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণের ও কোন আরণ্যক পাওয়া যায় নি।

আরতি—পূজার একটি অঙ্গ। আরাত্রিক, নীরাজন বা নির্মঞ্ছন। বিগ্রহের সামনে দীপমালা, বা পঞ্চপ্রদীপ, জলপূর্ণ শঙ্খ, ধৌত বস্ত্র, আম বা অশ্বত্থ ইত্যাদির পাতা বা ফুল এবং বেলপাতা দিয়ে আরতি এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ধূপধুনা ও কর্পূরের বাতিও ব্যবহার হয়। প্রথমে দেবতার পদতলে চারবার, তারপর ক্রমান্বয়ে নাভিদেশে দুবার, মুখ মণ্ডলে তিনবার এবং সর্বাঙ্গে সাতবার এগুলি ঘুরিয়ে আনতে হয়। আরতির অনুষ্ঠান ও দর্শন বহুফলপ্রদ। অঙ্গহীন পূজা নীরাজনের দ্বারা পূর্ণতা পায়। সুদৃশ্য দীপাবলী দিয়ে বিষ্ণুর নীরাজন অনুষ্ঠিত হলে তামসিকতা দূর হয় ফলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

আরা—বিহারে। পাটনা থেকে ৫০ কি-মি। ভগবান মহাবীর তাঁর যাত্রাপথে এখান বিশ্রাম করেছিলেন। এখনে সহরে ৪৫-টি জৈন মন্দির আছে। জৈনরা এখানে প্রতি বৎসর এসে মিলিত হন। এখানে অরণ্যদেবী-স্থান সম্পর্কে জনশ্রুতি পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের সময় গভীর জঙ্গলে এইখানে মাতৃমূর্তি স্থাপিত করে পূজা করেছিলেন। কালক্রমে সেই অরণ্য আরাতে পরিণত হয়েছে। রাম নবমীর সময় এখানে তিন দিন ব্যাপী বিরাট মেলা হয়।

আরাকান—উচ্চ শৈলমালা একে ব্রহ্মদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। বঙ্গোপসাগরের

তীরে অবস্থিত। খৃষ্ট জন্মের আগে হিন্দুরা বাস করতেন। এখানে রামাবতীতে কাশীরাজের ছেলে প্রথম হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে বৈশালীতে নতুন রাজধানী হয়। এই শতাব্দীতে রাজা আনন্দচন্দ্রের সময়ের একটি সংস্কৃত শিলালিপিতে পূর্ববর্তী আরো ২০ জন রাজার ৩৫০ বছর ধরে রাজত্ব করার উল্লেখ আছে। আনন্দচন্দ্র বৌদ্ধ ছিলেন; এবং তাম্রপট্টনরাজ নামে অভিহিত হতেন। অর্থাৎ আরাকানের প্রাচীন নাম তাম্রপট্টন। আরো কয়েকটি প্রাচীন লিপি ও মুদ্রা পাওয়া গেছে। বৈশালীর বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ এই রাজ্যের প্রাচীন সমৃদ্ধি ও গুপ্ত পরবর্তী যুগের ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাবের পরিচয় দেয়।

আরুণি—পাঞ্চালের ঋষি। ঋষি গৌতমের বংশে ঋষি উপবেশির নাতি এবং অরুণের ছেলে। আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু। আয়োদ্‌ধৌম্যের(দ্রঃ)শিষ্য। আরুণির ছেলে শ্বেতকেতু ও নাতি বিখ্যাত নচিকেতা। আরুণির দার্শনিক মতবাদ ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে। তৎ-ত্বমসির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইনি আত্মাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। আরুণি একবার গুরুর ক্ষেতের ভাঙ্গা আল বাঁধবার আদেশ পেয়ে আল বাঁধতে চেষ্টা করেন কিন্তু বিফল হয়ে নিজে সেখানে শুয়ে পড়ে নিজের দেহ দিয়ে জল আটকে রাখেন। আরুণি ফিরছে না দেখে আয়োদ্‌ধৌম্য শিষ্যের খোঁজে এসে সমস্ত জানতে পেরে সন্তুষ্ট হয়ে আরুণিকে উঠে আসতে বলেন; ও ক্ষেত্রের আল থেকে উঠে এলেন বলে গুরু নতুন নাম দিলেন উদ্দালক। গুরুর আশীর্বাদে সমস্ত ধর্মশাস্ত্র আরুণির চিরদিনের মত কণ্ঠস্থ হয়ে গেল। (২) বিনতার ছেলে। (৩) ধৃতরাষ্ট্র বংশে একটি গোক্ষুরা সাপ।

আরুষী—মনুর কন্যা। চ্যবনের স্ত্রী। ছেলে ঔর্ব; উরু থেকে জন্ম। এই ঔর্বের ছেলে ঋচীক। ঋচীকের ছেলে জমদগ্নি।

আর্জব—সুবলের ছেলে। শকুনির ভাই। অর্জুনের ছেলে ইরাবানের হাতে মারা যান।

আর্দ্রা—আলফা ওরিওনিস্। দ্রঃকালপুরুষ। ৬-ষ্ঠনক্ষত্র। পদ্মাকৃতি উজ্জ্বল একটি তারা।

আর্মানি—বা আর্মেনিয়া। এসিয়া মাইনর ও কাস্পিয়ান হ্রদের মধ্যবর্তী দেশ। এখানকার অধিবাসীরা ককেশীয় গোষ্ঠীর একটি শাখা। খৃষ্টপূর্বে দ্বিতীয় শতকে এখানে বহু হিন্দু স্থায়ীভাবে বাস করতেন এবং মন্দিরাদি করেছিলেন। মন্দিরগুলির মধ্যে দুটি মন্দিরে দেবমূর্তি যথাক্রমে ১২ হাত ও ১৪ হাত উচ্চ ছিল। ৩০৪ খৃষ্টাব্দে ধর্মান্ধ পাদরি সেন্ট-গ্রেগরি হিন্দুদের বাধা সত্ত্বেও ঐ মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করে ছিলেন।

আর্য—এসিয়া ও ইউরোপের অধিবাসী একটি প্রাচীন জাতি। ঋক্‌বেদে 'আর্য', আবেস্তাতে ঐর্য্য, এবং প্রাচীন পারসিক গিরিলিপিতে অরিয় নামে উল্লিখিত। বৈদিক, সংস্কৃত, এসিয়ার আর্মানি, গ্রীক, ল্যাতিন, গথিক, প্রাচীন আইরিস, প্রাচীন ওয়েলস্, প্রাচীন স্লাব, তোখারি ইত্যাদি ভাষাগুলি একটি গোষ্ঠীগত ভাষা। অর্থাৎ এই ভাষাভাষীরাও একটি গোষ্ঠীর লোক। প্রথমে এই গোষ্ঠীর নাম দেওয়া হয়েছিল ইন্দোগেরম্যানিশ্, পরে নাম দেওয়া হয় ইন্দো-ইউরোপীয়। অর্থাৎ আসাম

থেকে সুদূর আইসল্যাণ্ড পর্যন্ত এই একটি গোষ্ঠীর লোক ও ভাষা। অবশ্য বর্তমানে আর্য অর্থে ভারতীয় ও ইরানের প্রাচীন বসতিকারদের বুঝায়। বর্তমানের এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার জনক হিত্তি-ভারতীয় নামে আর একটি ভাষার প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে।

বিভিন্ন মতবাদ সত্ত্বেও মোটামুটি বলা যায় রুস দেশে উরাল পর্বতের দক্ষিণে তৃণাচ্ছন্ন শুষ্ক সমতল ভূখণ্ডে আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে একটি জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। এরা নর্ডিক বা উদীচ্য জাতি; শ্বেতকায়, দীর্ঘদেহ, নীলচক্ষু, হিরণ্যকেশ, দীর্ঘ কাপাল, সরল নাক। নানা কারণে এঁরা তারপর চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। এখান থেকে আনুমানিক ২০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে হিত্তি ভাষী একটি গোষ্ঠী এসিয়া মাইনরে কাপ্‌পাদোসিয়া-তে এবং ইন্দো-ইরানীয় একটি গোষ্ঠী মধ্য এসিয়াতে এসে বাস করতে থাকেন। ইন্দো-ইরানীয়েরা মধ্য এসিয়ার পামির অঞ্চলে বাস করতেন; অন্য মতে শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া এই নদী দুটির চার পাশে সমতল ভূখণ্ডে বাস করতেন। এখানে এঁরা আধা-যাযাবর ও আধা প্রতিষ্ঠিত কৃষক। অবশ্য ঘোড়াকে এঁরা পোষ মানিয়ে কাজে লাগিয়ে ছিলেন কিন্তু তবু উন্নত ধরণের সভ্যতা গড়ে তুলতে পারেন নি। এখান থেকে পরে ১৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইন্দো-ইরানীয়রা দুটি শাখায় ভাগ হয়ে এক দল উত্তর ভারতে আর একদল ইরানে এসে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করেন। এঁদের বিভিন্ন গোত্র ছিল যেমন মদ্দ বা মদ্র, পশু, পার্শ্ব, বা পাস, পুলস্ত, শক, ভারত, কাশ বা কাশ্যপ, বশ, তুর্ব ইত্যাদি। এই শাখাগুলির মধ্যে কয়েকটি শাখা ভারতে আসে।

১৫০০ খৃঃ পূর্বের মধ্যে আর্যরা ভারতে এসেছিলেন এ মত আজকে সুপ্রতিষ্ঠিত। এর পর ভারতে আর্য সভ্যতার বিকাশ। কিন্তু কোন মতে ২৫০০০ খৃঃ পূর্বে ভারতে আর্য সভ্যতা ও বৈদিক সংস্কৃতির উৎপত্তিকাল। বৈদিক সাহিত্যে প্রাপ্ত তিথি নক্ষত্রের হিসাবে টিলকের মতে ৬০০০ খৃ-পূর্ব এবং জার্মান পণ্ডিত হেরমান য়াকোবির মতে ৪০০০ খৃ-পূর্বে ভারতে আর্য সভ্যতার পত্তন হয়েছিল ও বেদ রচিত হয়েছিল। আবার হ্যজিং দেখাবার চেষ্টা করতেন খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেও ভারতে বেদরচনা সমাপ্ত হয়নি। অবশ্য এ সমস্ত সিদ্ধান্ত মূল্যহীন।

১৫০০ খৃঃ পূর্বের আগে আর্যরা ভারতে এসেছিলেন। এই সময়ে সিন্ধু উপত্যকায় যে সভ্যতা ছিল অনেকের মতে সেটিও আর্য সভ্যতা। তবে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞের মতে সিন্ধু সভ্যতা আর্য সভ্যতা নয় এবং এর আয়ুষ্কাল ২৫০০ খৃ-পূ থেকে ১৫০০ খৃ-পূ। আর্যদের আক্রমণে এই সভ্যতা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। সিন্ধুসভ্যতার মানুষরা নাগরিক জীবনে অভ্যস্থ ও নগর নির্মাণে দক্ষ ছিলেন। বৈদিক সভ্যতার আদি যুগে আর্যরা গ্রামকেন্দ্রিক গোষ্ঠী জীবন যাপন করতেন।

উ-পূ গিরিপথ দিয়ে এঁরা ভারতে এসেছিলেন। ফেলে আসা মধ্য প্রাচ্যের কোন হিসাব এঁরা দিয়ে যান নি। আফগানিস্তান ও উ-প সীমান্ত প্রদেশ ইত্যাদি অংশে বসতি করে সুদূর দ-ভারত ও পূর্ব ভারত সম্বন্ধেও নানা কথা বলেছেন; অথচ

মধ্য প্রাচ্য সম্বন্ধে কোন কথা নাই কেন! জননী জন্ম ভূমিশ্চ একথা কাদের! পানিকরের মতে এঁরা যখন ভারতে আসেন তখন এদের প্রচুর গো-বল ছিল। ছাগল, কুকুর, গাধা ও ঘোড়া পালন করতেন। হাতীর খবর জানতেন না। বেদে ইন্দ্রের বাহন অশ্ব ; ঐরাবত নয়।

ঋক বেদে কৃষির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। ৬-৮ বা বারটি বলদ যোগে ও চাষ করা হত। যব চাষও হত। হ্রদ ও পুষ্করিণী থেকে জল সেচ হত। সাধারণত বিনিময়ে বাণিজ্য হত। একটি জায়গায় মুদ্রা নিষ্ক-এর উল্লেখ রয়েছে। চর্ম শিল্প, দারু শিল্পে ও ধাতু শিল্পে এঁরা দক্ষ ছিলেন। বয়ন শিল্প তখন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। পশমের কম্বলও তৈরি হত। ঋক্ বেদে অয়স্ (=তাম্র ?) শিল্পের প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। আর্যরা সমুদ্র যাত্রা করতেন না। সিন্ধু নদীতে অবশ্য নৌকাবাহী বণিকের উল্লেখ রয়েছে। খাদ্য হিসাবে চাল ও ঘি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত। মাংস ও বহুল প্রচলিত ছিল। ঋষিরা সাধারণত পশুচর্ম পরতেন। সমাজ ব্যবস্থায় কয়েকটি পরিবার মিলে গ্রাম ; কয়েকটি গ্রাম মিলে বিশ্য এবং কয়েকটি বিশ্য মিলে জন।

শত্রুর সঙ্গে বার বার যুদ্ধ করতে হয়েছে ফলে রাজার প্রয়োজন হয়ে ছিল নেতা হিসাবে। এই রাজার কর্তব্য ছিল প্রজাপালন। বেদে পুণ্যশ্লোক রাজা হিসাবে দিবোদাস, সুদাস, অম্বরীষ, নহুষ, পুরূরবা ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। প্রধান পুরোহিত রাজার রাজনৈতিক উপদেষ্টা। রাজ সভার উল্লেখ আছে কিন্তু এই সভার বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না। যুদ্ধ বিগ্রহ সব সময়ই লেগে ছিল। চার দিকে আমাদের শত্রু ঘিরে রয়েছে, আমাদের সাহায্য কর-এই ছিল সে সময়ে স্লোগান। কুভাতট (কাবুল ;) থেকে যমুনা তীর পর্যন্ত সৈন্য যাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। কুভাতটেই ঋক্ মন্ত্রগুলি প্রথম রচিত হয়েছিল। গঙ্গার তীরে যখন আর্যেরা এসে পৌঁছান তখন ঋক্‌বেদের যুগ শেষ হয়ে যায়। পঞ্চনদ পার হওয়া আর্য ইতিহাসে একটি বিরাট পর্ব। বিশাল এবং গভীর সিন্ধুনদী দেখে তাঁরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সিন্ধুকে নিয়ে সুন্দর একটি মন্ত্র রয়েছে ; সিন্ধু পার হয়ে 'দস্যু' রাজাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ঋক্‌বেদে বলা আছে এই সব দস্যুরা আর্যদের থেকে অনেক উন্নত ছিলেন, দস্যু রাজা সম্বর ১০০ নগরের রাজা ছিলেন। এদের দুর্গও শক্তিশালী ছিল। দুর্গগুলিকে অশ্মময়ী, আয়সী, ও শতভুজী বলা হয়েছে। আর্যদের প্রধান শত্রু ছিল পণিরা। নিরুক্ত থেকে বোঝা যায় এই পণিরা প্রধানত ব্যবসায়ী ছিলেন। ধুনি, চুমুরি, বিপ্রু, বর্চিস্, ও সম্বর-দস্যু রাজা হিসাবে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। দস্যুদের যে বর্ণনা রয়েছে তা থেকে মনে হয় এঁরা দ্রাবিড় জাতি। ভাষা এদের ভিন্ন ছিল ; এরা যজ্ঞ করতেন না এবং ইন্দ্রেরও পূজা করতেন না। এবং এই অনার্যদের কাছ থেকেই আর্যেরা ক্রমে শিব, দেবী ও লিঙ্গ পূজা গ্রহণ করেছিলেন।

আর্যদের একটি দল গঙ্গাযমুনা অঞ্চলে বসবাস গড়ে তোলেন ; আর একটি দল রইলেন পঞ্চনদ এলাকাতে। পঞ্চনদ এলাকাতে যাঁরা রইলেন তাঁরা অধিকতর

শক্তিশালী এবং এঁরা যাতে শতদ্রু পার হয়ে এগিয়ে আসতে না পারেন সেইজন্য দাশরাজ্ঞ (দশরাজার) নামে একটি যুদ্ধ হয়েছিল। পৃথিবীতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ লড়াই। সুদাস রাজাকে যারা বাধা দিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন আর্য। সুদাসের দলেও কিছু আর্য ছিলেন। সুদাসের দলই জয়ী হন এবং আর্যদের পরবর্তী বিজয় অভিযান এরপর বন্ধ হয়ে যায়। এবং এর পর থেকে আর্যরা আদিবাসীদের সঙ্গে মিলে হিন্দু সভ্যতার ভিত্তি গড়ে তোলেন।

সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে পিতা তার সন্তানকে বিক্রয় করতে পারতেন। দ্রঃ শুনঃ-শেফ। সন্তানকে সম্পত্তির অধিকার থেকেও বঞ্চিত করতে পারতেন। বিবাহে যৌতুক ছিলই। কন্যাকে বিয়ের পর স্বামীগৃহে চলে যেতে হত। বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। এমন কি সপত্নীকে বিপন্ন করার মন্ত্রও রয়েছে; যাতে স্বামী বিশেষ একজন স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হন। ইন্দ্রাণী এই মন্ত্রের দ্রষ্টা। বিবাহ একটি কর্তব্য বলে পরিগণিত হত। বিধবা বিবাহ ও চালু ছিল।

সিন্ধুসভ্যতার মানুষরা লোহার ব্যবহার এবং সম্ভবত বর্মের ব্যবহার জানতেন না। কিন্তু আর্যরা এই দুটিই ব্যবহার করতেন। সিন্ধু সভ্যতার মানুষরা ঘোড়ার পরিচয় জানতেন কিন্তু আর্যরা ব্যাপকভাবে ঘোড়া ব্যবহার করতেন। সিন্ধু সভ্যতায় প্রতীক উপাসনা, মূর্তিপূজা, লিঙ্গোপাসনা এবং সম্ভবত শিব-পশুপতি ও মহাশক্তি-রূপা জগন্মাতার স্থানও ছিল কিন্তু বৈদিক ধর্মে মূর্তিপূজা, শিব ও শক্তি ও লিঙ্গপূজা ছিল না। আর্যদের মধ্যে বর্ণ বিভাগ ও ছিল না পরে অবশ্য তিন বর্ণ এবং বহু পরে শূদ্র বর্ণের সৃষ্টি হয়। আর্যরা ভারতে এসে কৃষ্ণকায় (নিষাদ), শ্যামল বা কপিল (দ্রাবিড়) এবং পীত (কিরাত) অর্থাৎ অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মঙ্গোল অনার্যদের সংস্পর্শে আসেন। এই আর্যেতর জাতিদের দাস, দস্যু শূদ্র, নিষাদ, কিরাত, শবর, পুলিন্দ ও পরে অন্ধ্র, দ্রমিড় বা দ্রবিড়, কোল্ল, ভিল্ল ইত্যাদি নামে এঁরা অভিহিত করতে থাকেন। আর্যদের সামরিক অভিযান চলতে থাকে। ঋক্‌বেদে (৬।২৭।৫) আছে সৃঞ্জয় নামে আর্য-গোষ্ঠী ইন্দ্রের সাহায্যে হরিয়ুপীয়ার (=হরপ্পা) পূর্বে বরশিখ বংশীয় যজ্ঞপাত্র ধ্বংসকারী বৃচীবৎ-গণকে ধ্বংস করেন। ঋক্‌বেদে ও পরবর্তী সংহিতাগুলি, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক এবং উপনিষদে যে সব তথ্য আছে তা থেকে দেখা যায় ভারতে আর্যসভ্যতা প্রসারের কাল ১৫০০-৫০০ খৃ-পূ। পরবর্তী কালের বৌদ্ধ, জৈন সাহিত্যে ও রামায়ণ মহাভারত থেকেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। আর্যরা ভারতে এসে তাঁদের বহির্ভারতীয় বাসভূমির কথা ভুলে যান তবে মধ্যপ্রাচ্যের ইরান ও মধ্য এসিয়ার বালখ্ (প্রাচীন বাহ্লীক)-এর সহিত কিছুটা সম্পর্ক ছিল। ঋক্‌বেদের যুগে আর্যরা পূর্ব আফগানি-স্তানে ও সমগ্র সিন্ধু উপত্যকায় অর্থাৎ সমগ্র পাঞ্জাবে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় উত্তর অংশেও উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। কাবুল নদী, এর শাখা প্রশাখা, ও ভারতের উত্তর পশ্চিমে বসবাসকারী পখ্‌থ (=পখথূন) ও গান্ধারি জাতি ঋক্‌বেদে সুপরিচিত। সিন্ধু, সুষোমা, আর্জীকীয়া, বিতস্তা অসিক্নী, পরুষ্ণী, বিপাশা, শুতুদ্রী প্রভৃতি নদী এবং পুরু ও শিব জাতির কথা ঋক্‌বেদে

উল্লিখিত আছে। ঋক্‌বেদের যুগে পাঞ্জাব আর্য সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। উত্তরে কাশ্মীর উপত্যকার কিছুটাও এঁরা দখল করেছিলেন এবং মরুদ্‌বৃধা-র‌ও (বর্তমানে মরুওয়ার্দোয়ান) উল্লেখ করে গেছেন। পূব দিকে এই সময়ে আর্যরা সর্‌হিন্দ ও থানেশ্বর ও তার চার পাশে এগিয়ে আসেন। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী, অপায়া, গোমতী, সরয়ূ প্রভৃতি নদী ও মধ্যদেশের অধিবাসী রুশম, উশীনর, দালভ্য, শৃঞ্জয়, মৎস্য, চেদি, ইক্ষ্বাকু ইত্যাদি বংশের সঙ্গেও এঁরা সংস্পর্শে আসেন। রাজপুতানার মরুভূমিকে এঁরা ধন্বন্ বলতেন। এই সময়ে সম্ভবত এঁরা বিন্ধ্য অতিক্রম করেন নি।

ঋক্‌বেদের যুগে আর্যরা যে সব স্থান অধিকার করেছিলে যজুঃ অথর্ব ও ব্রাহ্মণগুলির যুগে সেই সব স্থানগুলির পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিকাংশই দখল করেন। যমুনার প্রবাহ পথ ধরে ভরতগোষ্ঠী এবং সরস্বতী ও সদানীরার স্রোত ধরে বিদেশ বা বিদেহগণ পূব দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। মধ্যভারতে মালব অঞ্চলে এই সময়ে সম্ভবত কুন্তি ও বীতহব্য ইত্যাদি বাস করতেন। আরো কিছুদিন পরে রচিত ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদ-গুলিতে এগিয়ে আসার ইতিহাস আরো স্পষ্ট। ভারতবর্ষ তখন পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে (১) ধ্রুবা মধ্যমা প্রতিষ্ঠা দিশ্ (মধ্য অঞ্চল), (২) প্রাচী দিশ্ (পূর্ব অঞ্চল), (৩) দক্ষিণ দিশ্ (দক্ষিণ অঞ্চল), (৪) প্রতীচী দিশ্ (পশ্চিম অঞ্চল), (৫) উদীচী দিশ্ (উত্তর অঞ্চল)। এদের মধ্যে মধ্য-অঞ্চলটি ছিল আর্য সভ্যতার পীঠস্থান এবং কুরু, পাঞ্চাল, বশ, উশীনর ইত্যাদি আর্যগোষ্ঠীর আবাস স্থান। পূর্ব অঞ্চলে কাশী, কোশল, বিদেহ ইত্যাদি আর্য জনপদগুলির সঙ্গে অনার্য অঙ্গ, মগধ, পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশের সম্পর্ক ছিল। সত্বতগণ এই সময়ে আর্য সভ্যতাকে দক্ষিণ বিভাগে এবং বৈদর্ভগণ আর্য সভ্যতাকে বেরারে নিয়ে গেলেও দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্র, শবর, পুলিন্দ ও মূতিব প্রভৃতি অনার্য জাতিরই প্রাধান্য বজায় ছিল।

এর পরবর্তী যুগে আর্য সভ্যতার বিকাশের পরিচয় বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে ও ব্রাহ্মণ্যসূত্রে আরো স্পষ্ট। ওপরে উল্লিখিত মধ্য অঞ্চল তখন মধ্যদেশ, মজ্‌ঝিম দেশ, শিষ্টদেশ বা আর্যাবর্ত নামে পরিচিত এবং আর্যসভ্যতার কেন্দ্র। ইহার সীমানা তখন উত্তরে হিমালয়, পূর্বে প্রয়াগ বা এলাহাবাদের কাছে কালকবন, দক্ষিণে পারিযাত্র পর্বত (=বিন্ধ্য পর্বতের পশ্চিম অংশ) ও পশ্চিমে সরস্বতী তীরে অদর্শন ও থুন। অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম তখন ও অপবিত্র অনার্য দেশ। ভারতের পূর্ব সীমান্তে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (=আসাম) আর্যসভ্যতার পরিমণ্ডলের বাইরে বলে গণ্য হয়েছে। এই যুগে দক্ষিণে বিদর্ভ (=বেরার) অতিক্রম করে আর্যরা গোদাবরী উপত্যকা পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং ঐখানে পঞ্চবটী, জনস্থান, অশ্মক, মূলক প্রভৃতি উপনিবেশ ও দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলে ভৃগুকচ্ছ ও শূর্পারক প্রভৃতি সমৃদ্ধ বন্দর নগরী তৈরি করেন। উড়িষ্যার কলিঙ্গ নদী (বর্তমানে বৈতরণী) থেকে গোদাবরী পর্যন্ত ভূভাগ এই সময়েও কিন্তু অনার্যদেশ বলেই পরিচিত ছিল। এই যুগে পশ্চিম অঞ্চলে অবন্তী,

সুরাষ্ট্র, সিন্ধু, সৌবীর ইত্যাদি আর্য-অনার্য মিশ্র জনপদ গড়ে ওঠে। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকেও মেগাস্থিনিস ইঙ্গিত করেছেন যে দক্ষিণ ভারতে মাদুরা অঞ্চলের পাণ্ড্যরা উত্তর ভারতের মথুরা থেকে আগত। বার্তিকাকার কাত্যায়নের (খৃ-পূ চতুর্থ শতক) লেখা থেকেও মনে হয় আর্য বংশজ পাণ্ডুগোষ্ঠী থেকেই দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্যগণের উৎপত্তি। অর্থাৎ ১৫০০ খৃ পূ থেকে ৫০০ খৃ-পূ সময়ে সারা ভারতে আর্য সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে।

এই আর্য উপনিবেশ সম্প্রসারণের মূলে সামরিক অভিযান, ধর্ম প্রচার ও বাণিজ্য বিস্তার তিনটিই বর্তমান ছিল। আর্যদের মধ্য থেকে বৈশ্যরা পূর্ব ও দক্ষিণে অনার্য দেশে যাতায়াত করতেন ও বসতি স্থাপন করতেন। ঋষিরা শিষ্যদের নিয়ে আশ্রম স্থাপন করতেন। রামচন্দ্র দক্ষিণে গোদাবরী উপত্যকায় পম্পাতীরে এই রকম বহু আশ্রম পরিদর্শন করেছিলেন। অগস্ত্যের বিন্ধ্য অতিক্রম কাহিনীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। বৌদ্ধ শাস্ত্র সুত্তনিপাতে আছে বাভরিন নামে একজন ত্রিবেদী ব্রাহ্মণ ষোলজন শিষ্য নিয়ে উত্তর ভারতের কোশল জনপদ থেকে দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী তীরে অশ্মক দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। সশস্ত্র সংঘর্ষ এ ছাড়া সব সময়ই লেগে ছিল।

কোন একটি বিশেষ দল দ্বারা বা বিশেষ সময়ে ভারতে এই অনুপ্রবেশ ঘটেনি। আর্যদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে এসেছে। এই সমস্ত গোষ্ঠীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য প্রায়ই ছিল না। এক একটি গোষ্ঠীর এক একটি গোষ্ঠীপতি বা রাজা ছিল, একটি বিশেষ বৈদিক দেবতা তাঁদের দেবতা, একজন বিশেষ পুরোহিত তাঁদের যাজক। এঁদের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই পারস্পরিক যুদ্ধ লেগে থাকত। মধ্যঅঞ্চল যখন আর্যসভ্যতার কেন্দ্র বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন বা তারপর আগত আর্যগোষ্ঠীদের এঁরা ঘৃণ্য ও অপবিত্র মনে করতেন। বৈদিক সভ্যতার এটি একটি দিক। বৈদিক আর্যসভ্যতার আর একটি দিক অনার্যদের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে দক্ষিণ ও পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়া। অনার্যদের সঙ্গে আর্য রাষ্ট্রগুলি মিলিত ভাবে যুদ্ধ করেনি। বিভিন্ন আর্য উপজাতি বিচ্ছিন্ন ভাবে এই যুদ্ধ করেছে।

আর্য বিজয়ের পর আর্য সংস্কৃতির প্রভাব কাবুল, সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় যত গভীর ভাবে ছড়িয়ে পড়ে ভারতের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে সে রকম ছড়ায় নি। এই জন্য মধ্য অঞ্চলের সীমান্তবর্তী দেশগুলির বিশেষত পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের অনার্য ভাষা, সভ্যতা ও লোকযাত্রার সঙ্গে আর্যদের বহু আপোস করতে হয়েছে। এই জন্যই বহু জায়গায় অনার্যদের প্রতি ঘৃণা দেখা যায়। কীকট বা মগধকে (পাটনা ও গয়া জেলা) যাস্ক বলেছেন 'অনার্য নিবাস' এবং পরবর্তী পুরাণে বলা হয়েছে 'পাপভূমি'। শ্রৌতসূত্রগুলিতে মাগধী ব্রাহ্মণের মর্যাদা তত নয়। বৌধায়ন বলেছেন পূর্বে অঙ্গ, মগধ, বঙ্গ, ও কলিঙ্গ; পশ্চিমে সিন্ধু, সৌবীর ও সুরাষ্ট্র; এবং দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের মানুষরা বৈদিক আর্য সভ্যতার গণ্ডির বাইরে। এ রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং এ থেকে বোঝা যায় এই সব অঞ্চলে আর্য সভ্যতা ততটা ব্যাপকতা লাভ করেনি।

আর্যেতর মানুষের সভ্যতা এই সব জায়গায় মাথা তুলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থাৎ ভারতের সভ্যতা আর্য ও অনার্য মিশ্র সভ্যতা। এক সঙ্গে বাস করতে করতে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ থেকে রক্তের মিশ্রণও এগিয়ে চলেছিল। মহাভারতের যুগে এই মিশ্রজাতির নাম হয় হিন্দু জাতি। ফলে আর্য বলতে এই যুগ থেকে মানসিক উৎকর্ষতা যুক্ত সঙ্কর হিন্দু জাতিকে বোঝায়।

আর্যক—বিখ্যাত সর্প। জলের নীচে ভীমের (দ্রঃ) অচৈতন্য দেহ এলে সাপদের কামড়ে দেহের বিষ কেটে যায়; জ্ঞান ফিরে আসে। ভীম ঘটনাবলী বুঝতে না পেরে কিছু সাপ মেরে ফেলেন। এই সময় আর্যক পালিয়ে গিয়ে বাসুকিকে ডেকে আনেন এবং ভীমকে রসায়ন পান করতে দিতে অনুরোধ করলেন।

আর্যভট—বাসস্থান কুসুমপুর (পাটনা)। তাঁর মতে কলির ৩৬০০ বর্ষে তাঁর বয়স ছিল ২৩ অর্থাৎ তাঁর হিসাবে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম। আর্যভটের গ্রন্থ আর্যভটীয়। ভারতীয় বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। গ্রীকদের কাছে ইনি অন্দুবেরিয়স্ বা অন্দুবেরিয়স্ নামে পরিচিত; আরবদের কাছে অর্জভর নামে খ্যাত। ইনিই প্রথম পৃথিবীর আহ্নিক গতির তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এঁর প্রায় হাজার বছর পরে কোপারনিকাস এই তথ্য পাশ্চাত্যে প্রকাশ করেন। বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও লল্ল প্রভৃতি আর্যভটের মতবাদ স্বীকার করেন নি।

ক, খ ইত্যাদি অক্ষর সাহায্যে এক দুই ইত্যাদি সংখ্যা প্রকাশ করার একটি পদ্ধতি ইনি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলেন। আর্যভট মতে ১০০৮ মহাযুগে এক কল্প; অন্যান্য মতে ১০০০ মহাযুগে এক কল্প। আর্যভটের মতে কলিযুগ ১০৮,০০০০ বছর কিন্তু অন্য মতে ৪৩২,০০০০ বছর। আর্যভটের আগে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের স্থূল শুদ্ধ পদ্ধতিতে পঞ্জিকা গণনা হত। পরে অবশ্য গ্রহগতি কিছুটা পর্যবেক্ষণ করা হতে থাকে। ফলে একটি আংশিক শুদ্ধ হিসাব চলছিল। আর্যভট এগুলি পর্যালোচনা করে পরিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত শাস্ত্র রচনা করেন। আর্যভটই যুগ বিভাগ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন এবং কলি যুগের প্রথম দিন নির্দিষ্ট করেন ৩১০২ খৃ-পূ ফেব্রুয়ারি ১৭।১৮ মধ্যরাত্রি। এই মত পরে সকলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এক মহাযুগে (৪৩২,০০০০ বছরে) রবি ও অন্য গ্রহাদি কতবার আবর্তন করে আর্যভট ঠিক করতে চেষ্টা করেন। আর্যভট দুরকম গণনা পদ্ধতি চালু করেন একটি ঔদয়িক এবং আর একটি আর্ধরাত্রিক। পরবর্তী জ্যোতির্বিদরা আর্ধরাত্রিক পদ্ধতিই স্বীকার করেছেন। এঁর হিসাবে কলির প্রথম দিনে গ্রহগণ মেষাদিতে ছিল। অবশ্য আজকের নির্ভুল হিসাবে দেখা যায় রবিতে ৯ অংশ, চন্দ্রে ৫ অংশ, বুধে ৪২ অংশ ইত্যাদি এই প্রকার ভুল ছিল। আর্যভট শকাব্দ ব্যবহার করতেন না; নিজের প্রবর্তিত কল্যব্দ ব্যবহার করতেন।

হিন্দু জ্যোতিষে আর্যভটের অবদান পরিবৃত্ত ও উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের সাহায্যে গ্রহগতির ব্যাখ্যা করা। আর্যভট ত্রিকোণমিতির সাইনকে জ্যার্ধ বলতেন এবং জ্যার্ধের একটি সারণীও তৈরি করেছিলেন। গণিতের বর্গমূল, ঘনমূল নির্ণয় পদ্ধতি

বর্ণনা করেন এবং জ্যামিতি ইত্যাদিতে এই ধ্রুবকটি প্রতিপদে ব্যবহৃত। π এর মান সর্বপ্রথম ৩·১৪১৬ বলে স্থির করেন। সমান্তর শ্রেণীর যোগফল এবং প্রাকৃত সংখ্যার বর্গসমূহের ও ঘনসমূহের যোগ ফলও তিনি শুদ্ধভাবেই দিয়ে ছিলেন। আর্যভটের অপর নাম বৃদ্ধ আর্যভট ও সর্বসিদ্ধান্তগুরু। তাঁর টীকাকার শিষ্য হিসাবে লাটদেব, প্রথম ভাস্কর, ও লল্ল বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

আর্যভট—দ্বিতীয়। ৯৫৩ খৃষ্টাব্দ। এঁর গ্রন্থ আর্য সিদ্ধান্ত। দক্ষিণ ভারতে এখনও এঁর মতে পঞ্জিকা গণনা করা হয়।

আর্যভটীয়—প্রথম আর্যভট কৃত গ্রন্থ; ১২১টি শ্লোকে রচিত। চারটি প্রধান অধ্যায; গীতিকা পাদ ১৩ শ্লোক; গণিতপাদ-৩৩ শ্লোক; কালক্রিয়া-২৫ শ্লোক; গোলপাদ ৫০ শ্লোক। এই চারটি ভাগে মোট ১০৮ শ্লোক এবং এই অংশের অপর নাম আর্যাষ্টশত। গীতিকাপাদে এক মহাযুগে গ্রহাদির ভগণ; গণিতপাদে পাটীগণিত ও অন্যান্য গণিতের বিষয়; কালক্রিয়া পাদে কাল ও ক্ষেত্র বিভাগ, এবং গোলপাদে গ্রহ ও গোল বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ গণিতপাদে বিশুদ্ধ গণিত অন্যত্র জ্যোতির্বিদ্যা ও সম্লিষ্ট গণিত রয়েছে।

আর্যাবর্ত—আর্য জাতির বসতি স্থান। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতে এসে আর্যরা বসতি স্থাপন করতে থাকেন। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে (২।২।১৬) প্রথম এই শব্দটি পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি কালে এই ধর্মসূত্র লেখা হযে ছিল। এতে আর্যাবর্তের সীমা ছিল পশ্চিমে অদর্শন (বিনশন বা কুরুক্ষেত্র), পূর্বে কালক বন (উত্তর প্রদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চল বিশেষ), উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে পারিযাত্র (পশ্চিমে বিন্ধ্য ও আরাবল্লী)। খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলি ও এই সীমা স্বীকার করেছেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে মনুতে (২।২২-২৩) আর্যাবর্তের সীমা উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য, পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর। অর্থাৎ প্রাচীন কালে যেটি আর্যাবর্ত (বিনশন ও প্রযাগ মধ্যবর্তী অংশ) মনুতে সেটি মধ্যদেশ। মনুতে উত্তর ভারত আর্যাবর্ত ও দক্ষিণ ভারত দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য। ভোজ প্রবন্ধে পরমার বংশীয় নরপতি ভোজকে দক্ষিণাপথ ও গৌড়ের অধীশ্বর বলা হয়েছে; এখানে গৌড় অর্থে আর্যাবর্ত। অগ্নীধ্র'র ছেলে নাভি; নাভির ছেলে ঋষভ। ঋষভ ও স্ত্রী জয়ন্তীর কুড়িটি ছেলে; এদের মধ্যে একজন ভরত—এঁর রাজ্য ভারতবর্ষ, একজন আর্য, রাজ্য আর্যাবর্ত; এবং একজন দ্রমিড় এঁর রাজ্য দ্রাবিড়।

আর্যবিবাহ—আট প্রকার বিবাহের একটি। এই বিয়েতে বরের কাছ থেকে যাগাদির জন্য এক বা দুই গোমিথুন নিয়ে কন্যা দান করা হত।

আর্হত—বুদ্ধ বিশেষ। এঁর মতে আত্মা চিরস্থায়ী। প্রতি দেহে এক এক আত্মা নিরন্তর অবস্থিত। এই আত্মা সর্বজ্ঞ ও রাগদ্বেষাদি বর্জিত। আর্হতদের সাধনা সম্যগ্‌দর্শন, সম্যগ্‌জ্ঞান ও সম্যগ্‌চরিত্র। দ্রঃ অর্হৎ, অষ্টাঙ্গিকমার্গ।

আলপনা—মেঝেতে বা দেওয়ালে বা পিঁড়ি, ঘট ইত্যাদিতে পিটুলি গুলে এবং অনেক

সময় রঙ মিশিয়ে আঁকা মাঙ্গলিক সংস্কার। অন্য নাম বৌছত্র; বাংলার বাইরে নাম রঙ্গোলি। ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই প্রচলিত তবে বাঙলা থেকে গুজরাট পর্যন্ত অংশে বেশি। শাস্ত্রের কোন নির্দেশ বা মন্ত্র নাই। সমুদ্র উপকূল থেকে ভেতর দিকে এগোতে আরম্ভ করলেই ক্রমশ আলপনার বৈচিত্র্য কমতে থাকে। হিন্দুর সামাজিক উৎসবে একটি মণ্ডন শিল্প। মেয়েলি ব্রত আচারে একটি অপরিহার্য অঙ্গ। অনেকের মতে আলপনা প্রাক্ আর্য যুগের ঐতিহ্য; এবং অনেকের মতে বাঙলাতেই এর সবচেয় উৎকর্ষ। গুজরাট ও মাদ্রাজেও উন্নত ধরণের আলপনা দেখা যায়। তবে মনে হয় আলপনার পেছনে যেন একটি অভিচারিক অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন থাকে। আন্তরিক কামনাকে এইভাবে ব্যক্ত করা হয় যাতে যেন সিদ্ধি লাভ হয়। সামান্য একটু তুলা বা কাপড় অঙ্কনের তুলি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত যে আঁকে তার সাধ্যমত ফুল লতাপাতা শাঁখ ও নানা নকসা পাখী, মাছ, পায়ের ছাপ ইত্যাদি এঁকে থাকে। মেয়েরাই সাধারণত এঁকে থাকে।

আলার কালাম—আড়ার, আরাড় কালামা। গৌতম বুদ্ধের গুরু। বহু বৌদ্ধ গ্রন্থে এঁর নাম পাওয়া যায়। গৃহত্যাগের পর কিছুকাল এঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেন কিন্তু তৃপ্ত হতে না পেরে উদ্দক (দ্রঃ) রাম পুত্রের কাছে যান। মহাপরিনিব্বাণসুত্তে আলারের গভীর ধ্যানমগ্নতার উল্লেখ আছে। মনে হয় ইনি গৌতমকে ধ্যানপ্রক্রিয়া ও যোগ সাধনা শিক্ষা দেন। আলারের দার্শনিক মত হুবহু সাংখ্য মত কিনা স্পষ্ট নয়। বুদ্ধ ঘোষের মতে আরাড় তাঁর নিজের নাম এবং কালাম তাঁর গোত্র। বোধি লাভের পর গৌতম প্রথমেই এঁকে খবর দেবার চেষ্টা করেন কিন্তু জানতে পারেন সাত দিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

আলীগড়—জেলার বহুস্থানে বুদ্ধযুগের নিদর্শন পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে এই অঞ্চল মথুরার ক্ষত্রপ-দের অধীন ছিল। পরে কুষাণ সাম্রাজ্যের মধ্যে আসে।

আশ্বলায়ন—(১) শৌনক শিষ্য; শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র প্রণেতা। আশ্বলায়ন বৈদিক শাখার প্রবর্তক। কাহিনী আছে শৌনক প্রথম ঋক্‌বেদের কল্পসূত্র তৈরি করেন পরে শিষ্যের সূত্রের উৎকর্ষতা দেখে নিজের গ্রন্থ ফেলে দেন। ঐতরেয় আরণ্যকের চতুর্থ আরণ্যকও আশ্বলায়ন রচিত বলে প্রচলিত। শ্রৌত্রসূত্রে সোমযাগ অন্তর্গত একাহ, অহীন, ও সত্র এই তিন শ্রেণীর যজ্ঞের ও অন্যান্য যজ্ঞের বর্ণনা আছে। গৃহ্যসূত্রে গৃহস্থের করণীয় পাক যজ্ঞ ও সংস্কারগুলির বিবরণ আছে। (২) বিশ্বামিত্রের এক ছেলে।

আশ্বিন—অশ্বিনী নক্ষত্র যুক্ত পৌর্ণমাসী ঘটিত কাল; সূর্য কন্যা রাশিতে অবস্থান করেন।

আশ্রম—আর্যেরা বর্ণ অনুসারে জীবনের কয়েকটি পর্যায় ভাগ করেছিলেন। ব্রাহ্মণের চারটি, ক্ষত্রিয়ের তিনটি, বৈশ্যের দুটি এবং শূদ্রের একটি আশ্রম বিহিত করেন। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস ব্রাহ্মণের এই চারটি আশ্রম। ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাস

আশ্রম নাই। বৈশ্যের দুটি আশ্রম গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ বা কোন মতে ক্ষত্রিয়দের মত তিনটি আশ্রমের এরা অধিকারী। শূদ্রের একমাত্র গার্হস্থ্য আশ্রম। অনেকের মতে কলিকালে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস নিষিদ্ধ। জীবনের এই পর্যায় বা আশ্রম ভাগ আজকাল কোন বর্ণই আর মানে না। প্রাচীন নির্দেশ অনুসারে উপনয়নের পর গুরুগৃহে ব্রহ্মচারী হয়ে বাস করে ইন্দ্রিয় সংযম; দুটি সন্ধ্যাতে সূর্য ও অগ্নির পূজা। গুরুর সেবা ও অধ্যয়ন করা ও ভিক্ষান্ন গ্রহণ করা ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রম। পাঠ শেষ হলে গুরুর আদেশ নিয়ে এবং গুরু দক্ষিণা দিয়ে গার্হস্থ্য আশ্রমে এসে অর্থ উপার্জন করে বিয়ে করে গৃহস্থের কর্তব্য পালন করা দ্বিতীয় আশ্রম জীবন। গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্তব্য তর্পণ করে পিতৃগণের, যজ্ঞ করে দেবগণের, অন্ন দিয়ে অতিথিদের বেদপাঠ করে মুনিদের, সন্তান উৎপাদন করে প্রজাপতির, বলিকর্ম ও আনুষ্ঠানিক ভোজ্যদ্রব্য দান করে মৃতদেরও প্রাণীদের এবং প্রেম দ্বারা সমস্ত জগতের অর্চনা ও সন্তোষ বিধান। গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম। কারণ ব্রহ্মচারী, ভিক্ষাজীবী, সন্ন্যাসী সকলেই একমাত্র গৃহস্থের ওপর নির্ভর করেন। পৌত্র জন্মের পর সাধারণ নিয়মে পঞ্চাশের ওপর বয়স হলে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বা একা একাই বন গমন বিধেয়। এই সময়ে ক্ষৌরকার্য করা হয় না; ফল, মূল, পাতা আহার ও ভূমি শয্যা বিধেয়। বসন ও উত্তরীয় হিসাবে চর্ম, কাশ ও কুশ ব্যবহৃত। দেবার্চনা যজ্ঞ হোম, অতিথি সেবা ও ভিক্ষা এই বাণপ্রস্থের কর্তব্য। এটি তৃতীয় আশ্রম। এইভাবে সত্তর মত বয়স হলে সন্ন্যাস গ্রহণীয়। সন্ন্যাসীর কোন করণীয় নাই; সব দিক থেকে সে মুক্ত। কেবল মোক্ষের জন্য চিন্তা করবেন।

আষাঢ়—(১) সাতাশটি নক্ষত্রের মধ্যে বিংশ নক্ষত্র পূর্বষাঢ়া (ডেল্টা সাজিটারি) ও একবিংশ নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া (দ্রঃ) (টাউ সাজিটারি)। (২) উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র যুক্ত পৌর্ণমাসী ঘটিত কাল। সূর্য মিথুন রাশিতে থাকেন। সংস্কৃত কবিতাতে একটি প্রসিদ্ধ মাস। (৩) সন্ন্যাসীর ব্যবহার্য লাঠি।

আষাঢ়া—উত্তর ও পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র।

আসন—যোগ সাধনের উপবেশন কৌশল। অষ্টাঙ্গ যোগের তৃতীয় যোগ যোগাসন। পাঁচ রকম :-পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন, বীরাসন।

আসব—বৌদ্ধ সাহিত্যে পাপ, রিপু।

আসাম—প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। রামায়ণ ও মহাভারতে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। অমূর্তরায় এই রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। মহাভারতের সময়ে শক্তিশালী বিখ্যাত রাজ্য। বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড ও হরিবংশে উল্লেখ আছে। বরাহরূপী বিষ্ণুর ঔরসে ধরিত্রীর গর্ভে জন্ম মিথিলার নরক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা হয়ে কামাখ্যা দেবীর ভার গ্রহণ করেন এবং এখানকার নাম হয় কামরূপ। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষে হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের করদমিত্র রাজ্য বলে কামরূপের সব প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাসে কামরূপের বর্ণনা আছে। নরকের বংশ ৩৫০-৬৫০ খৃষ্টাব্দে, এই বংশে পুষ্যবর্মা ৩৫০ খৃষ্টাব্দে মত রাজা হন পরে এই বংশের

আরো বারোজন মত রাজা এখানে রাজত্ব করেন। এই বংশে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শেষ রাজা ভাস্করবর্মা, হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর ইনি পশ্চিম-বঙ্গের ওপরও কিছুদিন আধিপত্য করেছিলেন। এই ভাস্করবর্মার সময়েই হিউ-এন-ৎসাঙ কামরূপে আসেন।

অসুরবিবাহ—দ্রঃ বিবাহ।

আসুরি—দ্রঃ পঞ্চ শিখ। কপিলের সাংখ্যদর্শনের আচার্য। আসুরির স্ত্রী কপিলা : আসুরি এঁর কাছেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।

আস্তিক—যাঁরা ঈশ্বরে অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অথবা বেদ, বা কর্মফল যাঁরা স্বীকার করেন। সাংখ্য, যোগ, মায়া, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত এই ষড় দর্শন আস্তিক দর্শন নামে পরিচিত। এই কারণে লোকায়ত বৌদ্ধ, ও জৈন সম্প্রদায় নাস্তিক।

আস্তীক—জরৎকারু (দ্রঃ) মুনির ছেলে। বাসুকির বোন মনসার (=জরৎকারু) ছেলে। মুনি স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যান এবং স্ত্রীর কাতর প্রার্থনায় যাবার সময় গর্ভবতী স্ত্রীকে বলেন 'অস্তি অয়ং সুভগে গর্ভ-স্তব'। এই অস্তি থেকে নাম আস্তীক। এবং বর দেন এই ছেলে বিদ্বান ও বিষ্ণুভক্ত হবে এবং বংশ রক্ষা করবে। বাল্যকালে স্বয়ং মহাদেব আস্তীককে বেদ বেদাঙ্গ শিক্ষা দেন। পরে তপস্যায় বিষ্ণুকে প্রীত করেন। এর কিছু পরে আস্তীক মাকে নিয়ে কশ্যপের সঙ্গে দেখা করে যান। পরে বাসুকির কাছে পালিত হন। চ্যবন মুনি ও কিছু শাস্ত্র পাঠ করিয়েছিলেন। জন্মেঞ্জয় যজ্ঞে সর্পকুল ধ্বংস করতে থাকলে বাসুকি বোনকে ঘটনাটা জানান। অন্য মতে দেবতারা মনসাদেবীর শরণাপন্ন হন। এবং আস্তীক এসে জন্মেঞ্জয়কে সন্তুষ্ট করে নাগকুল রক্ষা করেন। দ্রঃ-সর্পযজ্ঞ। প্রবাদ আস্তীকের নাম নিলে সর্প ভয় দূর হয়।

আস্রপ—একজন রাক্ষস। মূলা নক্ষত্র।

আহবনীয়—গার্হপত্য অগ্নি থেকে অগ্নি নিয়ে হোমের জন্য সংস্কৃত অগ্নি।

আহার—বাহ্য জগত থেকে আহৃত, ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত এবং শরীরে পুষ্টির জন্য আত্মীকৃত বস্তু। ছান্দোগ্যে আছে আহারের শুদ্ধিতে সত্ত্বার শুদ্ধি ও বুদ্ধির নির্মলতা।

আহিতাগ্নি—অগ্নিহোত্রী, সাগ্নিক।

আহুক—ভোজ রাজ বংশে একজন ধার্মিক পরাক্রান্ত রাজা, স্ত্রী কাশ্যা। কৃষ্ণ যখন কংসকে নিহত করেন সেই সময় জরাসন্ধ কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধের উদ্যোগ করলে আহুক জরাসন্ধের পক্ষে যোগদান করেন। এরপর বলরামের সঙ্গে এবং পরে ভীষ্মকের সঙ্গে আহুকের যুদ্ধ হয় এবং আহুক পরাজিত হন। অন্য মতে উগ্রসেনের পিতা ; কৃষ্ণের পিতামহ। আর এক মতে আহুকই উগ্রসেন। আহুকের একশত ছেলে। মেয়ে সুতনু ; অক্রুরের স্ত্রী। অক্রূর ও এই আহুকের মধ্যে নিত্য বিতণ্ডা হত।

আহুতি—(১) হবন যোগ্য ঘৃতাদি বস্তু। (২) দেবগণকে আহ্বান (ঐতরেয়)। (৩) দেবতাদের উদ্দেশ্যে কোন বস্তু দেওয়া।

ই

ইউ-চি—মধ্য এসিয়ার যাযাবর জাতি। খৃ-পূ ২ শতকের মাঝখানে এরা চীনের উত্তর পশ্চিমে বাস করত। পরে হুনদের হাতে হেরে গিয়ে পশ্চিম দিকে পালিয়ে যায়। এদের একটি শাখা সম্ভবত তিব্বতের দিকে চলে এসেছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ অপর শাখা শকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শিরদরিয়া নদীর অববাহিকাতে কিছুদিন বসবাস করে হুনদের দ্বারা আবার আক্রান্ত হয়ে আমুদরিয়ার অববাহিকাতে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। সম্ভবত এই সময়ে যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে এরা কৃষক হয়েছিল। পরে দক্ষিণ ও পূব দিকে এগোতে এগোতে এরা ৫-টি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই ৫-টি শাখার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী শাখা কুষাণ। এই কুষাণ শাখাই কাবুল থেকে কাশী পর্যন্ত বিরাট রাজ্য গড়ে তুলেছিল এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল।

ইক্ষুমতী—ইক্ষুল নদী। এর তীরে সাঙ্কাস্যা নগরী। কানিংহাম মতে ঈশানী নদী। কুরুক্ষেত্রের কাছে। তক্ষক ও অশ্বসেন সাপ এই নদীতে বাস করতেন। মিথিলার রাজার ভাই কুশধ্বজ এই নদীর উপত্যকাতে বাস করতেন।

ইক্ষ্বাকু—ঋক্‌বেদে, ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে এঁর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর বৈবস্বত মনুর ছেলে ইক্ষ্বাকুর উল্লেখ দেখা যায়। মনু হাঁচলে নাক থেকে এঁর জন্ম। অন্য মতে মনুর থুথু থেকে। অর্থাৎ কশ্যপ (১)-বিবস্বান (২)-বৈবস্বত মনু(৩)-ইক্ষ্বাকু(৪)। আর এক মতে অযোধ্যার রাজা পৃথুর ছেলে। এই বংশ ইক্ষ্বাকু বংশ নামে পরিচিত। এঁর তিন ছেলে বিকুক্ষি, নিমি, দণ্ড/দণ্ডক ইত্যাদি। অন্য মতে ১০০ ছেলে এবং এদের মধ্যে ২৫ পশ্চিম দিকে, তিন জন মধ্যদেশে, বাকি অপরে অন্য দেশ শাসন করতেন। আর এক মতে ৫০ জন পূর্ব ও উত্তর দিকে, ৪৮ জন দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে রাজত্ব করতেন : দুজন মাত্র পিতার কাছে ছিলেন। নিমির বংশে জনক (দ্রঃ) এবং বিকুক্ষির বংশে মান্ধাতা, ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র, ভরত, রামচন্দ্র ইত্যাদি। মান্ধাতা বংশে শেষ পুরুষ শান্তনু। বিকুক্ষিকে (দ্রঃ) ইক্ষ্বাকু তাড়িয়ে দিয়েছিলেন পরে অবশ্য ইক্ষ্বাকু মারা গেলে ইনিই রাজা হন।

দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন রাজ্যের পতনের পর অনেকগুলি ছোট ছোট রাজত্ব গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে ধান্যকটকের ইক্ষ্বাকু বংশ অন্যতম। এঁদের মধ্যে প্রথম চান্তমূল, বীরপুরুষদত্ত এবং ইহুভূল বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। প্রথম চান্তমূল অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এই বংশে অনেক বৌদ্ধ ছিলেন। দ্রঃ ইল।

ইঙ্গিত—নাট্য অভিনয়ে আনন্দ প্রকাশক বঙ্কিম দৃষ্টি।

ইড়া—(১) প্রজা সৃষ্টির জন্য মনু এক পাক যজ্ঞ তৈরি করেন। যজ্ঞের জন্য ঘি, মাখন ও আমিক্ষা জলে ফেলে দেন এবং এক বছর পরে একটি মেয়ে এই জল থেকে উঠে আসেন। মিত্রাবরুণ এঁর পরিচয় জানতে চাইলে ইনি মনুর মেয়ে বলে

নিজের পরিচয় দেন। কিন্তু মিত্রাবরুণ বলেন 'তুমি আমাদের'। মেয়েটি কোন উত্তর না দিয়ে মনুর কাছে গিয়ে নিজের জন্মের কাহিনী বলে অনুরোধ করেন তাঁকে যেন যজ্ঞে অর্পণ করা হয়। মনু ইড়াকে দিয়ে কঠোর যজ্ঞ করেন (শতপথ)। অসুর ও দেবতারা একবার অগ্ন্যাধ্যান করেন। মনু ইড়াকে জানতে পাঠান ওঁরা কি ভাবে কাজ করছেন। ইড়া এসে জানান কেউই ওরা ঠিক মত কাজ করছেন না। মনুর যজ্ঞে ইড়া নিজে তিনটি অগ্নিকে ঠিক মত নিয়ে ঠিক স্থানে স্থাপন করেন। একবার মনুর সামনেই দেবতারা ইড়াকে আহ্বান করেন, অসুরা গোপনে আহ্বান করেন। ইড়া দেবতাদের আহ্বান গ্রহণ করেন ফলে সমস্তজীব দেবতাদের দলে গিয়ে যোগদান করেন। (২) পৃথিবী (৩) ইক্ষ্বাকুর মেয়ে, বুধের স্ত্রী; (৪) বায়ুর মেয়ে, বুধের স্ত্রী, ছেলে উৎকল। (৫) দক্ষের মেয়ে, কশ্যপের স্ত্রী। (৬) মনুর স্ত্রী; খণ্ড প্রলয়ের পর এঁর গর্ভে আবার মনুবংশ জন্মায়। (৭) শরীরে রক্তবাহিকা আধার; মেরুদণ্ডের বাম পাশে মহাধমনী। (৮) বেদে ইষ্টি যজ্ঞ, পশু যজ্ঞ ইত্যাদিতে প্রধান যাগের পর যজমান ও ঋত্বিকের ভক্ষ্য হবিঃশেষ। (৯) ধেনু।

ইতিহাস—যাতে ধর্মার্থকামমোক্ষ উপদেশ সহ পূর্ব-বৃতান্ত বর্ণিত থাকে। পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ:-সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, ও বংশানুচরিত। পুরাণে জনশ্রুতি ও কল্পনা আছে। ইতিহাসে তা নাই।

ইতু—কার্তিকের সংক্রান্তিতে ১২-টি ঘট বসিয়ে, অগ্রাহারণ মাসে প্রতি রবিবারে সকালে শস্য ও সম্পত্তির কামনায় সূর্য পূজা। ইন্দ্র=ইন (ব্রাহ্মী লেখ)=ইতু। অবশ্য ইতু পূজার মন্ত্রে মিত্রায় নমঃ মন্ত্র আছে।

ইদাবৎসর—ত্রিশ সূর্যোদয়ে যে মাস হয় সেই রকম বারো মাস যুক্ত বৎসর। বর্ষ পঞ্চকের ৩-য় বর্ষ; ৩৬০ দিনে সম্পূর্ণ।

ইধ্মজিহ্ব—মনুর ছেলে প্রিয়ব্রত। সুরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রতের ছেলে ইধ্মজিহ্ব।

ইধ্মবাহ—অগস্ত্যের (দ্রঃ) ছেলে।

ইন্দীবরাক্ষ—নলনাভ গন্ধর্বের ছেলে। ব্রহ্মমিত্র মুনির কাছে আয়ুর্বেদ শিখতে চান কিন্তু মুনি প্রত্যাখ্যান করেন। গন্ধর্ব ঠিক করেন লুকিয়ে শিখবেন এবং ছয় মাসের মধ্যে অন্যান্য শিষ্যদের সমান শিখে ফেলেন। এক দিন লুকিয়ে থাকার স্থান থেকে ইন্দীবরাক্ষ হেসে ফেললে ব্রহ্মমিত্র ধরে ফেলেন এবং শাপ দেন সাত দিনের মধ্যে রাক্ষসে পরিণত হবে এবং নিজের সন্তানের হাতে তীরবিদ্ধ হলে মুক্তি পাবে। এক দিন নিজের মেয়ে মনোরমাকে খেতে গেলে জামাতা স্বরোচিষের হাতে তীরবিদ্ধ হয়ে মুক্তি পান।

ইন্দুমতী--তৃণবিন্দু ঋষির কঠিন তপস্যায় ভীত হয়ে তপস্যা নষ্ট করার জন্য হরিণী নামে এক অপ্সরাকে ইন্দ্র পাঠিয়েছিলেন। তপোভঙ্গ করতে গিয়ে মুনির শাপে ইন্দুমতী রূপে জন্মাতে হয়। হরিণীর অনুনয়ে তৃণবিন্দু বলেছিলেন পারিজাত দর্শনে শাপমুক্তি হবে। বিদর্ভ রাজ ভোজের ঘরে জন্মান। স্বয়ংবরে রঘুর ছেলে অজকে বরণ করেন। ইন্দুমতীর ছেলে দশরথ। একদিন বাগানে বেড়াবার সময় আকাশচারী নারদের

বীণাচ্যুত পারিজাত মালা তাঁর দেহে এসে পড়ে; স্পর্শ মাত্রেই ইন্দুমতী মারা যান। (২) অন্য মতে রঘুর স্ত্রী। (৩) নহুষের মা।

ইন্দুরাজ—প্রাচীন আলঙ্কারিক। কাশ্মীরের লোক। জন্ম সম্ভবত ৯৬০-৯৯০ খৃষ্টাব্দ। অন্য নাম ভটেন্দুরাজ বা প্রতীহারেন্দুরাজ। আচার্য ভট্টমুকুলের শিষ্য। অভিনব-গুপ্তের সাহিত্যগুরু; এঁর কাছে অভিনব গুপ্ত ধ্বনিশাস্ত্র পাঠ করেন। আচার্য কাণের মতে প্রতীহারেন্দু রাজ অন্য লোক।

ইন্দো-ইউরোপীয়—ইউরোপীয়, ইরানি, ভারতীয় ইত্যাদি ভাষা আলোচনা করে মনে হয় 'হিত্তিভারতীয়' নাম দেওয়া যেতে পারে একটি ভাষা থেকে দুটি ভাষা (১) হিত্তি, (২) ভারত-ইউরোপীয় গড়ে ওঠে। ভারত-ইউরোপীয় ভাষা সম্বন্ধে মোটামুটি তথ্য হচ্ছে সম্ভবত খৃ-পূ ৩-সহস্রকে পূ-দক্ষিণ ইউরোপে কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই ভাষা চালু ছিল। এখান থেকে পশ্চিমে, উত্তরপশ্চিমে, এসিয়া মাইনরে এবং পূর্ব দক্ষিণে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এই ভাষা ও দল ছড়িয়ে পড়ে। আসাম থেকে সুদূর আইসল্যাণ্ড পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর ভাষা নানা পরিবর্তনের ফলে আজ বাঙলা, ইংরাজি, জার্মানি ইত্যাদি ইত্যাদি ভাষায় পরিণত হয়েছে। ১৪০০ খৃ-পূর্বের গ্রীক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে খুব নিকট সম্পর্ক দেখা যায়।

ইন্দ্র—ঋক্‌বেদে আর্যদের প্রধান দেবতা। ঋক্‌বেদে ২৫০ সূক্তে এবং অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে আরো ৫০-সূক্তে অর্থাৎ ঋক্‌বেদে প্রায় একচতুর্থাংশ ইন্দ্রের স্তব। যাস্কের মতে ইনি অন্তরীক্ষের দেবতা। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। অবশ্য স্বয়ম্ভূ বলা হয় নি। ঋক্‌বেদে ৩।৪৮, ৪।১৮ সূক্তে ইন্দ্রের জন্মের বিবরণ রয়েছে যে মাতৃগর্ভেই তিনি মায়ের পার্শ্বদেশ ভেদ করে বার হয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। জন্মেই আকাশকে উজ্জ্বল করেন (৩।৪৪।৪); জন্মাবধি যোদ্ধা (৩।৫১।৮, ৮।৪৫।৪) ও শত্রুদমনকারী (১০।১১৩।৪) ও অজেয়। তাঁর জন্ম সময়ে ভয়ে আকাশ, পাহাড় ও পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল (৪।১৭।২), দেবতারা ভয় পেয়েছিলেন। দেবতারা রাক্ষস বধের জন্য ইন্দ্রকে সৃষ্টি করেন। তৈত্তিরীয় মতে পুরুষের মুখ থেকে ইন্দ্র ও অগ্নির জন্ম (পুরুষ সূক্ত ১০।৯০।১৩)। দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র ও জনক দুই-ই এই ইন্দ্র। এঁর পিতা দ্যৌ বা ত্বষ্টা। অগ্নি ও পূষা ইন্দ্রের ভাই। স্ত্রী ইন্দ্রাণী।

ঋক্‌বেদে এঁর বর্ণনা:-ইন্দ্র হচ্ছেন সুশিপ্র = শোভন হনু বা শোভন নাসিকা। হরিকেশ, হরিশ্মশ্রু। তাঁর রঙ, রথ, ও ঘোড়া সবই হরিৎ বা পিঙ্গল। দুটি লম্বা হাত। হিরণ্যবাহু। স্বেচ্ছায় অনন্ত রূপ ধারণ করতে পারেন (ঋক্ ৩।৫৩।৮)। তাঁর রথ হিরণ্ময়, হাতে হিরণ্ময়ী কশা। রথে ঘোড়া দুটির নাম হরী। বায়ু সারথি। হিরন্ময়ী রথে সব সময়ই আকাশে ঘুরে বেড়ান। হাতে ধনুর্বাণ, হিরণ্ময় অঙ্কুশ, ও ত্বষ্টা নির্মিত দ্যুতিমান বজ্র। এই বজ্র অন্তরীক্ষবর্তী সমুদ্রে জলরাশি দিয়ে আবৃত (ঋক্ ৮।১০০।৯)। এই বজ্রও হিরণ্ময়। তাঁর হাতের প্রকাণ্ড কাঁটা ও জাল দিয়ে শত্রুদের জড়িয়ে ফেলতেন। হাজার হাজার নক্ষত্র খচিত আকাশই ইন্দ্র—এই অর্থে ইন্দ্র সহস্রাক্ষ।

সোম গাছের রস এঁর অতি প্রিয় পানীয়। যে কোন দেবতার তুলনায় সোমলোভী। জন্মেই মা অদিতির স্তনে সোম দর্শন করেন (৩।৪৮।৩)। ইন্দ্রের জন্মের সময় অদিতি বুঝতে পারেন এই সন্তান অমর। নিজের বিপদ আশঙ্কায় ইন্দ্রকে অদিতি অন্যত্র কোথাও চলে বলেন; ইন্দ্র সম্মত হন না; মায়ের পেছু পেছু ত্বষ্টার গৃহে যান। পিতা ত্বষ্টার সোম জোর করে কেড়ে খেয়ে ফেলেন (৪।১৮।৩)। সোমরস পান করতে করতে পেট ফুলে উঠেছিল, দাড়িতে জটা বেঁধেছিল। সোমরস রাখা ঘটের নাম হয়েছিল এই জন্য ইন্দ্রোদর। ইন্দ্রের পেটে সোমরসের হ্রদ (৩।৩২।৮)। এক চুমুকে ত্রিশ হ্রদ সোমরস পান করেন (৮।৬৬।৪)। যজ্ঞে তিনি ৩০-টি সোমপাত্র (ঋক্ ৮।৭৭।৪) নিঃশেষে শেষ করে ফেলেন। সোমপানের যজ্ঞে তাঁকে ডাকা হয় এবং তৃষ্ণার্ত ঋষ্য মৃগের মত ইন্দ্র ছুটে আসেন। সোমপানে দৃপ্ত হয়ে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি মহাযোদ্ধা বৃত্রহা। সোম থেকেই ইন্দ্রের উৎপত্তি (৯।৯৬।৫)। দ্রঃ অপালা।

দেবতাদের রাজা। বায়ু, বৃষ্টি, ঝড় ও বজ্রের দেবতা এই ইন্দ্র। বিদ্যুৎ ও বজ্রের সাহায্যে বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি ঘটান। অনাবৃষ্টি ও অন্ধকার রূপ অসুরকে বিনাশ করেন। সাধারণত তীরধনুক ও বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করেন। তিনি বহু ভোজী ও চিরযুবা। ইন্দ্রের প্রাধন কাজ বৃত্রবধ। বৃত্র বা ব্যাপক মেঘকে বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ করে জলকে প্রমুক্ত করেন। ঋক্‌বেদে মেঘকে পর্বত, বা পুর বা দুর্গ রূপে কল্পনা করা হয়েছে। বৃত্রবধের উপাখ্যানগুলিকে নৈসর্গিক রূপক বলে অনেকে মনে করেন। ত্বষ্টা লোহা ও পাথর দিয়ে তীক্ষ্ণ বহুসূচীমুখ হিরণ্যবর্ণ বজ্র তৈরি করে দিয়েছিলেন। ইন্দ্র সুর ও অসুর (দ্রঃ)। এঁর রথ মনোরথও বটে। হরিৎবর্ণ শত সহস্র সূর্য-চক্ষু অশ্ব ইন্দ্রের রথ বহন করে (৪।৬৩।৩, ৬।৪৭।১৮)। এই রথ ও অশ্ব ঋভুগণের তৈরি। সোমপানে দৃপ্ত হয়ে বজ্র নিয়ে মরুৎগণের সাহায্যে অনাবৃষ্টির অসুর অহিবৃত্রকে আক্রমণ করলে আকাশ ও পৃথিবী কাঁপতে থাকে (১।৮০।১১)। জলরোধকারী বৃত্রকে বজ্রে শতখান করে দেন। বজ্রাঘাতে পাহাড় ফাটিয়ে বন্দী জলকে গোষ্টবদ্ধ গাভীর ন্যায় মুক্তি দেন। পাহাড় ও মেঘে যে দৈত্যরা বাস করেন তাদের পরাস্ত করে জলকে মুক্ত করে দেন।

দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধে আর্যেরা সব সময়ই ইন্দ্রের সাহায্য নিয়েছেন। ঋক্ বেদে ইন্দ্র শক্তিশালী এক বিরাট দেবতা। কিন্তু বিষ্ণুকে ইন্দ্রের ছোট ভাই বলা হয়েছে। পুরাণে এই ইন্দ্র কামুক দেবরাজে পরিণত। অনেক সময় ইন্দ্র ও অগ্নি যমজ ভাই। অদিতির সেবাতে সন্তুষ্ট হয়ে কশ্যপ বর দিতে চাইলে অদিতি একটি আদর্শ পুত্র চান; এই ছেলে ইন্দ্র। ইন্দ্রের শত্রু রাক্ষস, অসুর, দৈত্য। অহি, বৃত্র, উরণ, বিশ্বরূপ, অর্বুদ, বল, নমুচি, জম্ভ, চুমুরি, ধুনি, পিপন/পিপ্রু, শুষ্ণ/তুষ্ণ শম্বর ইত্যাদিকে নিহত করেছিলেন। অহিকে অপসৃত করলেই আকাশে সূর্য প্রকাশ পায়। ইন্দ্র উষাকে প্রকাশিত করলে অন্ধকার গোষ্ঠ থেকে মুক্ত গাভীগুলির ন্যায় সূর্য কিরণ ছড়িয়ে পড়ে; এজন্য ইন্দ্র গোপতি। শত অশ্বমেধ করলে ইন্দ্রত্ব পাওয়া যায় বলে ইন্দ্রের নাম শতমখ; শতক্রতু, শতমন্যু। বৃত্র ইত্যাদিকে

নিধন করার জন্য ইন্দ্রের নাম বৃত্রহা, নমুচিসূদন, জম্ভভেদী, বলভিদ্, পুরুহুত, পাকশাসন। অসুরপুরী বা দস্যুপুরী নষ্ট করার জন্য বা বলির ছেলে পুরকে নিহত করার জন্য নাম পুরন্দর। মেঘ এর বাহন বলে নাম মেঘবাহন। বারি বর্ষণ করে বলেন বৃষা। প্রধান অস্ত্র বজ্র বলে নাম বজ্রী, গোত্রভিদ্; রথের ঘোড়ার রঙ হরিৎ বলে হরিদশ্ব। ইনি পূর্ব দিকের শাসক। স্বর্গরাজ্যের রাজা। বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলে নাম দেবর্ষভ। যেহেতু শত অশ্বমেধ করলে ইন্দ্রত্ব পাওয়া যায় সেইজন্য পৃথিবীতে কেউ শত অশ্বমেধ করতে গেলেই বাধা দিয়েছেন এবং অতি নীচ তারও আশ্রয় নিয়েছেন। চিরশত্রু অসুরদের হাত থেকে স্বর্গ রাজ্য বাঁচাবার জন্য ক্রমাগত যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁদের কাছে বহুবার পরাস্ত হয়েছেন। নিজের ইন্দ্রত্ব লোপের আশঙ্কায় বহু তপস্বীর তপস্যাও কারণে অকারণে অতি নীচ ভাবে নষ্ট করেছেন।

স্বর্গ রাজ্যের যিনিই রাজা তিনিই ইন্দ্র উপাধি পান। ইন্দ্র আদিত্যগণের অন্যতম। সংবর্ত, পুষ্কর প্রভৃতি মেঘের অধীশ্বর। শস্য ও অন্নের প্রাচুর্যের কামনায় রাজা ও ঋষিরা ইন্দ্রের পূজা করতেন। বেদে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, বায়ু একই দেবতা। এক এক মনু পর্যন্ত এক একজন ইন্দ্রের রাজত্ব কাল। প্রতি মন্বন্তরে (দ্রঃ) ইন্দ্র পৃথক। ১৪-শ মন্বন্তরে ইন্দ্রের ১৪টি নাম যজ্ঞ, সত্যজিৎ, রোচন ইত্যাদি।

পুরাণের ইন্দ্রও সমস্ত দেবতাদের রাজা। কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নীচে। পুরাণেও পিতা কশ্যপ মা অদিতি (দ্রঃ)। পুলোমা দৈত্যের মেয়ে ইন্দ্রাণী/শচীকে বিয়ে করেন এবং শ্বশুরকে হত্যা করেন। বহু পুরাণে আছে ইন্দ্রাদি দেবতারা অপুত্রক। আবার আছে ইন্দ্রের ছেলে জয়ন্ত, ঋষভ, অন্য মতে মীঢ্ব, বালী, অর্জুন এবং মেয়ে জয়ন্তী। ইন্দ্রের নগরী অমরাবতী (দ্রঃ মেরু), উদ্যান নন্দন কানন, প্রমোদপুরী বৈজয়ন্ত, ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবা, হাতী ঐরাবত, রথ বিমান, সারথি মাতলি; ধনু ইন্দ্রধনু, খড়্গ পরঞ্জ বা পারন্ধ এবং অস্ত্র বজ্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের স্ত্রী প্রসহা।

ইন্দ্র ত্রিশিরসকে (দ্রঃ) বজ্রাঘাতে নিহত করেন। বজ্র এই সময়ই প্রথম নির্মিত হয়েছিল মনে হয়। ত্রিশিরসের মৃত্যুর পর বৃত্রর জন্ম। ত্রিশিরস্ হত্যার পাপ ব্রহ্ম হত্যার রূপ ধরে ইন্দ্রকে অনুসরণ করতে থাকে। ইন্দ্র একে গ্রহণ করেন এবং এক বছর পরে এই পাপকে কেটে চার টুকরো করে মাটি, জল, বৃক্ষ ও রমণীদের মধ্যে ভাগ করে দেন। এই চারটি অংশ মাটিতে লবন, জলে ফেনা ও বুদ্বুদ, গাছে রস ও রমনী দেহে রজ-রূপে বর্তমান। বৃত্রাসুরকে নেতা করে কালকেয় ও অন্যান্য অসুররা ভীষণ উপদ্রব করতে থাকলে, ইন্দ্র যুদ্ধে হেরে যান ও অজ্ঞান হয়ে পড়েন। বশিষ্ঠ জ্ঞান ফিরিয়ে দেন। স্বর্গ থেকে ইন্দ্র বিতাড়িত হন। দেবতাদের নিয়ে ইন্দ্র তখন বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন এবং বিষ্ণুর নির্দেশে ইন্দ্র দধীচির কাছে এসে দধীচির (দ্রঃ) অস্থি সংগ্রহ করে নিয়ে এই অস্থিতে বজ্র নির্মাণ করিয়ে বজ্রাঘাতে বৃত্রকে (দ্রঃ) বধ করেন। বৃত্র হত্যা করে ইন্দ্রের আবার ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয়। একটি মতে দেবতা ও ঋষিরা তখন ইন্দ্রকে সরযূতে স্নান করিয়ে মলদ ও করূষ (দ্রঃ) দেশে এই পাপ ধুয়ে পাপ মুক্ত করে দেন। আর এক মতে পাপ মোচনের জন্য ইন্দ্র মানস

সরোবরে পদ্ম ফুলের মধ্যে বাস করছিলেন। এই সময়ে স্বর্গে নহুষ (দ্রঃ) ইন্দ্র হন। নহুষের পতনের পর ইন্দ্র স্বর্গে ফিরে এলে অঙ্গিরস (দ্রঃ) অথর্ব বেদ থেকে মন্ত্র পাঠ করে ইন্দ্রকে অভ্যর্থনা করলে ইন্দ্র এঁকে অথর্বাঙ্গিরস বলে পরিচিত হবেন বর দেন।

ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদের সোমপান করতে দিতেন না। কিন্তু চ্যবনের (দ্রঃ) চেষ্টায় বাধ্য হয়ে এঁদের সোমপানের অধিকার দেন। গরুড়ের (দ্রঃ) পিঠে নাগদের রক্ষা করেছিলেন এবং অমৃত আনতে এলে গরুড়কে বজ্রাহত করেছিলেন। ইন্দ্র একবার বলিকে (দ্রঃ) সুযোগ পেয়েও হত্যা না করে তাড়িয়ে দেন। যযাতিকে (দ্রঃ) ইন্দ্র স্বর্গচ্যুত করেন। জানপদী অপ্সরাকে পাঠিয়ে শরদ্বানের চিত্ত বিভ্রান্তি ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন (দ্রঃ কৃপ)। কুরুরাজের সঙ্গে একটা মধ্যস্থতা করে কুরুক্ষেত্রের (দ্রঃ) মাহাত্ম্য অনেকটা সীমিত করেন। খাণ্ডব দাহনের (দ্রঃ) সময় সশস্ত্র বাধা দেন এবং বন্ধু তক্ষকের (দ্রঃ) স্ত্রীপুত্রদের বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন। সুরভিকে (দ্রঃ) শান্ত করার জন্য বৃষ্টি দেন। দময়ন্তীর (দ্রঃ) স্বয়ংবর সভাতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন এবং কলি নলকে (দ্রঃ) শাপ দিতে উদ্যত হলে কলিকে নিরস্ত করেন। শিশু মান্ধাতাকে (দ্রঃ) রক্ষা করেছিলেন। উশীনর শিবিকে (দ্রঃ) পরীক্ষা করে গিয়েছিলেন এবং যবক্রীতকে প্রার্থিত বর দিয়েছিলেন। সত্যভামার (দ্রঃ) অনুরোধে কৃষ্ণ পারিজাত গাছ/শাখা ইন্দ্রলোক থেকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলে ইন্দ্রাণীর তিরস্কারে ইন্দ্র সশস্ত্র বাধা দেন কিন্তু পরাজিত হন এবং মিত্রতা স্থাপিত হয়। নরকাসুরও (দ্রঃ) ইন্দ্র থেকে বড় হবার জন্য তপস্যা করেছিলেন। দেবা-সুরের যুদ্ধের পর ঐরাবতে চড়ে ইন্দ্র শান্ত মনে পৃথিবী ভ্রমণে বার হয়ে সমুদ্রের পূর্বতীরে হাজার বছর বয়স বকমুনির আশ্রমে এসেছিলেন। কেশীকে (দ্রঃ) পরাজিত করে দেবসেনাকে (দ্রঃ) রক্ষা করেন এবং দেবসেনার বিয়ে দেন।

কর্ণের ধনু বিজয় ইন্দ্রের পরিকল্পনায় বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্মিত হয়। ত্রিপুরের হাতে ইন্দ্র পরাজিত হয়েছিলেন এবং একটি মতে ইন্দ্র শিবকে দিয়ে ত্রিপুরকে নিধন করান। কুরুক্ষেত্রে কর্ণও অর্জুনকে কেন্দ্র করে কে জিতবে এই নিয়ে সূর্য ও ইন্দ্রের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়। অসুররা সূর্যের দলে এবং দেবতারা ইন্দ্রের সঙ্গে যোগ দেন। শেষ অবধি সূর্য ইন্দ্রের কাছে হেরে যান। নমুচিকে (দ্রঃ) হত্যা করার জন্য মিত্রঘাতী ও বিশ্বাস ঘাতকতার পাপে জড়িয়ে পড়েন। ইন্দ্র একবাব পাখীর বেশে বনে গিয়ে সেখানে মুনি ঋষিদের নানা উপদেশ দিয়েছিলেন। একবার এক বৈশ্য, কশ্যপ নামে অল্পবয়সী এক মুনিকে নিজের রথের ধাক্কায় ফেলে দেন। মুনি অপমানে আত্মহত্যা করবেন ঠিক করেন। ইন্দ্র এই সময়ে শৃগাল হয়ে মুনিকে আত্মহত্যা কত পাপ বুঝিয়ে নিরস্ত করেন। ইন্দ্রই কামদেবকে (দ্রঃ) পাঠিয়ে শিবকে প্রণয়াসক্ত করে পার্বতীর সঙ্গে বিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। ইন্দ্র একবার ব্রহ্মার কাছে গোদানে কি পুণ্য হয় জানতে চান। ব্রহ্মা বলেন গোদানে লোকে জরাহীন বা ব্যাধিহীন গোলোক প্রাপ্ত হয়। কাশীতে এক ব্যাধ বিষাক্ত তীর দিয়ে

পাখী শিকার করত। এই তীর দৈবাৎ একটি মস্ত বড় গাছে বিদ্ধ হয় এবং গাছটি শুকিয়ে ওঠে। এই গাছের কোটরে একটি পাখী জন্মাবধি বাস করছিল। পাখীটি কিন্তু কোটর ছাড়তে সম্মত হয় না। ইন্দ্র তখন এক ব্রাহ্মণ বেশে পাখীটিকে নতুন আশ্রয়ে যাবার উপদেশ দেন। পাখীটি ইন্দ্রকে চিনে ফেলে কিন্তু নতুন আশ্রয়ে যেতে রাজি হয় না। পাখীটির এই কৃতজ্ঞতায় ইন্দ্র পাখীটিকে স্বর্গে নিয়ে যান।

শম্বর অসুর একবার ইন্দ্রের কাছে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন এবং জানান তাঁর নিজের সমস্ত ঐশ্বর্যের মূল ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি। এই সময় থেকে ইন্দ্রও ব্রাহ্মণদের পূজা করতে থাকেন। এক বনে দেবাশ্রম নামে এক মুনি ও তাঁর রূপসী স্ত্রী রুচি বাস করতেন। রুচির প্রতি অনেকের এবং ইন্দ্রেরও লোভ ছিল। একবার অন্য জায়গায় যজ্ঞ করতে যাবার সময় শিষ্য বিপুলকে মুনি রুচির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে এবং ইন্দ্র বহুরূপী হয়ে আসতে পারেন সাবধান করে দিয়ে যান। বিপুল তাঁর তপস্যার বলে রুচির দেহে প্রবেশ করে রুচিকে পাহারা দিতে থাকেন। এর কিছু পরে সুন্দর একটি যুবকের বেশে ইন্দ্র আসেন এবং রুচিকে নিজের পরিচয় দিয়ে এক রাত রুচির সঙ্গে কাটাতে চান। রুচিও মুগ্ধ হয়ে যান। কিন্তু বিপুলের জন্য শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে যেতে হয়। ইন্দ্র একবার মহামুনি গৌতমের হাতী চুরি করলে গৌতম ধৃতরাষ্ট্রের কাছে অভিযোগ করেন। রাজা ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করতে বলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র হাতী ফিরিয়ে দিয়ে হাতী ও গৌতম দুজনকেই স্বর্গে নিয়ে যান। যুধিষ্ঠিরকে (দ্রঃ) স্বর্গদ্বারে প্রবেশে বাধা দিয়েছিলেন।

ইন্দ্র অদিতির ছেলে হয়ে জন্মালে দিতির ভীষণ হিংসা হয় এবং কশ্যপকে এক দিন ইন্দ্রের সমান একটি ছেলে চান। রামায়ণে আছে সমস্ত অসুররা মারা গেলে দিতি বর চান; অন্য মতে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু মারা গেলে ইন্দ্র-বিজয়ী ছেলে চান। কশ্যপ বলেন ১০,০০০ দিব্যবর্ষ শুচি হয়ে থাকতে থাকতে হবে ইত্যাদি। দিতি সম্মত হন এবং তারপর গর্ভ হয়। অদিতি এদিকে অধৈর্য হয়ে পড়েন; ইন্দ্রের সমান ছেলে কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। ফলে ইন্দ্রকে এই গর্ভস্থ শিশু নষ্ট করে ফেলতে বলেন। অন্য মতে এই ভাবী সন্তান সম্বন্ধে কেবল সাবধান হতে বলেছিলেন। ইন্দ্র তখন বিমাতার সেবা করতে থাকেন এবং সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এক দিন পা না ধুয়ে শুয়ে পড়ার জন্য সুযোগ বুঝে নিদ্রিত দিতির নাক দিয়ে পেটের মধ্যে ঢুকে পড়েন। অন্য মতে কশ্যপ অঙ্গস্পর্শ করে চলে গেলে দিতি কুশপ্লব নামক স্থানে তপস্যা করতে থাকেন। ইন্দ্র নানাভাবে বিমাতাকে পরিচর্যা করতে থাকেন। ৯৯০ বছর কেটে গেলে দিতি একদিন সানন্দে জানান যে ইন্দ্র নিধনকারী আর দশ বছর পরেই জন্মাবে। এই সময় থেকে ইন্দ্র সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এক দিন দুপুর বেলা দিতি মাথার দিকে পা ও পায়ের দিকে মাথা রেখে ঘুমচ্ছিলেন। ইন্দ্র এই সুযোগে গর্ভে প্রবেশ করেন। শিশুকে বজ্র দিয়ে সাত টুকরো করে কেটে ফেলেন। শিশু কাঁদতে থাকলে মা-রুদ (কেঁদনা) বলে থামিয়ে

দেন এবং প্রতিটি টুকরোকে আবার ৭-টি খণ্ডে ভাগ করে ফেলেন। মা-রুদ বলেছিলেন বলে নাম হয় মারুৎ। শিশুটি এই ভাবে ৪৯ মরুৎ-এ পরিণত হন। মরুৎরা পরে ইন্দ্রের সখা/সহায়/অনুচরে পরিণত হন। একটি মতে দিতি গর্ভস্থ ইন্দ্রকে নিষেধ করেন শিশুকে যেন হত্যা না করা হয়। ইন্দ্র তখন বার হয়ে এসে সবিনয়ে জানান তাঁর ভাবী শত্রুকে তিনি কেটে রেখে এসেছেন। দিতি ও আত্মদোষ স্বীকার করেন। আর এক মতে ঘুম ভাঙতে দিতি সব বুঝতে পারেন; ইন্দ্রকে শাপ দেন রাজ্য ভ্রষ্ট হতে হবে এবং অদিতিকে শাপ দেন কারারুদ্ধ হতে হবে এবং তাঁর ছেলেদের ও নিহত হতে হবে। ফলে অদিতি দেবকী (দ্রঃ) হয়ে জন্মান। অম্বরীষের সুদেব নামে একজন মন্ত্রী যুদ্ধ করতে করতে মারা যান। কয়েক বছর পরে অম্বরীষও মারা যান এবং স্বর্গে এসে সুদেবকে দেখে ইন্দ্রকে প্রশ্ন করলে ইন্দ্র জানান অম্বরীষ অনেক যজ্ঞ করেছেন এবং সুদেবও বহু রণযজ্ঞ করেছেন। রণযজ্ঞ ও সমান স্বর্গফলপ্রদ। ইন্দ্র শুনঃশেফকে (দ্রঃ) রক্ষা করেছিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের (দ্রঃ) কাছ থেকে মুখের অন্ন একবার চেয়ে নিয়েছিলেন। কঠোর তপস্যারত এক তপস্বীর কাছে যোদ্ধার বেশে ইন্দ্র একবার দেখা করে নিজের তরবারিটি দিয়ে যত্ন করে রাখতে বলেন। তপস্বী তরবারির যত্ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন: নিজের তপস্যার কথা ভুলে যান; ফলে নরকে পতিত হন। দেবতারা ইন্দ্রকে মেঘবান পর্বতে ইন্দ্রত্বে অভিষিক্ত করেন। হনুমান ইত্যাদিকে সুগ্রীব এই পর্বতেও সীতাকে খুঁজতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মৈনাক (দ্রঃ) বাদে অন্য সমস্ত পাহাড়ের পক্ষচ্ছেদ করেন। ব্রহ্মার বরে অসুর শূরপদ্ম অজেয় হয়ে ত্রিভুবনে অত্যাচার করতে থাকেন এবং ইন্দ্রকে ধরে আনতে লোক পাঠান। ইন্দ্র জানতে পেরে ইন্দ্রাণীকে নিয়ে কোঙ্কনে একটি মন্দিরে লুকিয়ে থাকেন। কিছু দিন পরে ইন্দ্রাণীকে শিবের রক্ষণা-বেক্ষণে রেখে ইন্দ্র কৈলাসে যান। এই সময়ে অজামুখী (দ্রঃ) ইন্দ্রাণীকে ধরে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেন। ইন্দ্র একবার রাজা বৃষণশ্ব / বৃষণাশ্বের মেয়ে হয়ে জন্মান; নাম হয় মেনা (ঋক্)। রাজা ঋজিশ্বন্‌কে অসুর নিধনে ইন্দ্র একবার সাহায্য করেছিলেন। সূর্যের কাছে স্বশ্ব একটি ছেলে চান এবং সূর্য নিজেই স্বশ্বের ছেলে হয়ে জন্মান। এই ছেলের সঙ্গে মহামুনি এতষ যুদ্ধ করেন। মহামুনি প্রায় মারা পড়েছিলেন; ইন্দ্র এসে তাঁকে উদ্ধার করেন।

ইন্দ্র একবার এক ঘোটকীকে পরিহাস ছলে একটি গরু প্রসব করার বর দেন (ঋক্)। চন্দ্রবংশে কৌশাম্বীরাজ শতানীকের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে দেবলোকে নিয়ে গিয়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলেন। যুদ্ধে শতানীক মারা গেলে ছেলে সহস্রানীক যুদ্ধে আসেন ও অসুর নিধন করেন। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে সহস্রানীকের সঙ্গে মৃগাবতীর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। সুদাসকে সাহায্য করার জন্য ইন্দ্র একবার একটি নদীকে শুষ্ক করে দেন যাতে সৈন্য বাহিনী নদী পার হতে পারে। হিরণ্য পুত্র শনি ইন্দ্রকে একবার পরাজিত করে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী দুজনকে বন্দী করে পাতালে নিয়ে যান। বরুণ এই শনির আত্মীয়;

দেবতারা বরুণের শরণ নেন এবং বরুণের অনুরোধে শনি এঁদের মুক্তি দেন। ইন্দ্র তখন শিবের কাছে প্রতিশোধের জন্য প্রার্থনা করলে শিব বিষ্ণুর আরাধনা করতে বলেন। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন ; গঙ্গার জল থেকে শিব ও বিষ্ণু অংশে জন্ম নিয়ে একজন যোদ্ধা শনিকে নিহত করেন।

রামায়ণে আছে রাবণ একবার স্বর্গ অধিকার করে নেন এবং মেঘনাদ ইন্দ্রকে লঙ্কাতে বন্দী করে আনেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রের মুক্তি চাইতে আসেন কিন্তু ইন্দ্রজিৎ বিনিময়ে অমরত্ব চান। শেষ অবধি ব্রহ্মা বর দেন অগ্নিপূজা করলে আগুন থেকে অশ্বসমেত যে রথ বার হয়ে আসবে সেই রথে চড়ে যুদ্ধ করলে মেঘনাদ অবধ্য হবেন। এই বর পেয়ে ইন্দ্রকে মুক্ত করে দেন। অহল্যার সতীত্ব নাশের জন্য গৌতমের শাপে ইন্দ্রের সর্বাঙ্গে সহস্র যোনি ফুটে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রের কাতরতায় গৌতম এগুলিকে চোখে পরিণত করে দেন। এই জন্য নাম সহস্রাক্ষ বা নেত্রযোনি (মহাভারত)। রামায়ণে আছে গৌতমের শাপে ইন্দ্রের মুষ্কদ্বয় খসে যায়। কিন্তু পরে অগ্নি/অশ্বিনীকুমারদ্বয় মেষাণ্ড / অজাণ্ড দিয়ে ইন্দ্রের অভাব মিটিয়ে দেন। আর এক মতে তিলোত্তমার (দ্রঃ) জন্ম হলে তিলোত্তমা যখন দেবতাদের প্রদক্ষিণ করছিলেন তখন প্রদক্ষিণ রত তিলোত্তমাকে দেখবার জন্য ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু হয়েছিল। বৃত্রকে নিহত করে স্বর্গে ফিরে এসে ইন্দ্রের সোমরস পানের মাত্রা ও ইন্দ্রিয়াসক্তি ভীষণ বেড়ে যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে ইন্দ্র যৌন আবেদনে আকৃষ্ট হয়ে অন্য সুন্দরী-দের ফিরিয়ে দিয়ে ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করেন। আবার অন্য জায়গায় আছে ইন্দ্রাণীর সতীত্ব নষ্ট করেন এবং ইন্দ্রাণীর বাবা পুলোমার শাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করেন এবং শ্বশুরকে হত্যা করেন। মহাভারতে আছে এঁর ঔরসে কুন্তীর গর্ভে অর্জুনের জন্ম। এই অর্জুনকে রক্ষা করার জন্য অন্যায় ভাবে কর্ণের কবচ কুণ্ডল সংগ্রহ করে আনেন। পরিবর্তে অবশ্য কর্ণকে একাঘ্নী বাণ দিয়ে এসেছিলেন। অর্জুন স্বর্গে এলে ইন্দ্র এঁকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন এবং পাশুপত অস্ত্র যেন পান আশীর্বাদ করেন ও মহদেবের তপস্যা করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অর্জুন যখন স্বর্গে ছিলেন তখন অর্জুনের মনোরঞ্জনের জন্য একদিন উর্বশীকে পাঠিয়ে ছিলেন।

একবার বেড়াতে বেড়াতে এক অপ্সরা/মেনকার কাছে কাছে দুর্বাসা সন্তানক ফুলের একটি মালা পান। মালাটি ইন্দ্রকে দিলে ইন্দ্র এটি ঐরাবতকে পরিয়ে দেন। ঐরাবত একটি মতে মৌমাছিতে আক্রান্ত হয়ে, ঐ মালা মাটিতে ফেলে দিলে দুর্বাসা শাপ দেন ; ইন্দ্র ও দেবতারা শ্রীভ্রষ্ট ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েন ; দৈত্যদের হাতে হৃতরাজ্য হতে হয় এবং সামান্য গব্যঘৃতের জন্যও ইন্দ্রকে ভিক্ষা করতে হয়। অভিশপ্ত হয়ে ইন্দ্র দুর্বাসার কাছে ক্ষমা চাইলে দুর্বাসা বলে দিয়েছিলেন সমুদ্র-মন্থন করে অমৃত পান করতে। অন্য মতে জরাগ্রস্ত হয়ে দেবতারা বিষ্ণুর কাছে যান এবং বিষ্ণুর পরামর্শে সমুদ্রমন্থন (দ্রঃ) করে অমৃত পান করে সুস্থ হয়ে ওঠেন ও দৈত্যদের বিতাড়িত করেন। পুরাণে কৃষ্ণের সঙ্গে ইন্দ্রের বহু বিরোধের উল্লেখ আছে। ব্রজবাসীরা ইন্দ্রের উপাসক ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের চেষ্টায় তারা কৃষ্ণকে

পূজা করতে আরম্ভ করলে ইন্দ্র অত্যাচার আরম্ভ করেন। কৃষ্ণ তখন গোবর্দ্ধন ধারণ করেন। ইন্দ্র একজন দিকপাল। দ্রঃ অগস্ত্য, অরুণ, অহল্যা, উত্তঙ্ক, ককুৎস, কবন্ধ, কার্তিকেয়, কৃষ্ণ, গাধি, গোবর্দ্ধন, গৌতম, চন্দ্র, ত্রিশঙ্কু, দণ্ড, দধীচি, দিতি, দুর্বাসা, পণি, পাণ্ডব, পৃথু, বলি, বিশ্বরূপ, বৃহস্পতি, মতঙ্গ, মরুত্ত, ময়দানব, মহিষাসুর, মুচুকুন্দ, রন্তিদেব, রাম, শরভঙ্গ, স্রুচাবতী, সগর, সব্য, হনুমান।

আর্যদের সঙ্গে দস্যুদের যুদ্ধে ইন্দ্র আর্যদের সাহায্য করেছিলেন। তাঁরই প্রভাবে কৃষ্ণত্বক দস্যু বা দাসবর্ণ বশীভূত হয়েছিল। বেদের এই দস্যু অর্থে প্রাচীন ভারতীয় আদিবাসী। পুলোমা দৈত্যের মেয়েকে বিয়ে করার অর্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আর্য ও অনার্য রক্তের মিশ্রণ। আবেস্তাতেও 'বেরেথ্ঘন' (=বৃত্রঘ্ন) শব্দটি আছে। অর্থাৎ সুপ্রাচীন ইন্দো-ইরানীয় যুগ থেকেই ইন্দ্র দেবতা।

ইন্দ্রকীল—হিমালয়ে মন্দার পাহাড়। অন্য মতে মহেন্দ্র পর্বত। এখানে নানা মণি-মুক্তা ছিল। অর্জুন এখানে তপস্যা করতে আসেন এবং কিরাতরূপী মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধ হয়।

ইন্দ্রজাল—যাদুবিদ্যা। স্বর্গে ইন্দ্রের সভায় মায়াকারগণ নানা খেলা দেখিয়ে ইন্দ্রের মনোরঞ্জন করতেন তাই নাম ইন্দ্রজাল। অন্য মতে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় চোখের ওপর জাল বিস্তার করে বলে নাম ইন্দ্রজাল। অন্য মতে মালবরাজ ভোজ ও তাঁর মেয়ে ভানুমতী (=বিক্রমাদিত্যের স্ত্রী) এই বিদ্যায় সুদক্ষ ছিলেন বলে নাম ভোজবাজি/ভানুমতীর খেলা। ভারতীয় ইন্দ্রজালে বাটি ও বলের খেলা এ দেশে ও পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন খেলা। রাস্তায় বেদেরা একটি বাটি ও ছোট ছোট কয়েকটি গুটি নিয়ে হাতের খেলা দেখায়, 'এই আছে এই নাই'। জ্যোতিষী ও সন্ন্যাসীরা অঙ্কসংখ্যা, ফুলের নাম ইত্যাদি আগে লিখে রেখে বা নখদর্পণে দেবদেবী ইত্যাদির যে ছবি দেখান সেগুলি আসলে ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির খেলা; বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। এ ছাড়া রসায়নিক বিক্রিয়া গত খেলা ও যন্ত্রপাতি সাহায্যে ইন্দ্রজাল খেলা ভারতে অতি প্রাচীন। প্রাচীন সন্ন্যাসী ও পুরোহিতরা এই ভাবে নানা ইন্দ্র জালের সাহায্যে নিজেদের দৈবশক্তি সম্পন্ন বলে প্রতিপন্ন করতেন। অথর্ববেদ, তন্ত্রশাস্ত্র ও উত্তর রামচরিতে বিভিন্ন স্থানে ইন্দ্রজালের উল্লেখ আছে।

ইন্দ্রজিৎ—রাবণের অন্যতম ছেলে। মন্দোদরীর (দ্রঃ) গর্ভে জন্ম। আর এক মতে সমুদ্রমন্থনে সুলক্ষণা নামে একটি সুন্দরী নারী উঠেছিলেন। ইনি পার্বতীর সখী হন। পার্বতী একদিন স্নান করে সুলক্ষণাকে ঘর থেকে পরিধেয় বস্ত্রাদি আনতে বলেন। এই ঘরে শিব ছিলেন; মুগ্ধ হয়ে সুলক্ষণাকে সম্ভোগ করেন। সুলক্ষণা বিব্রত হয়ে পড়লে মহাদেব বলেন সুলক্ষণার বিয়ের পর এই ছেলে হবে। পার্বতীর কাছে পরে বস্ত্র নিয়ে এলে পার্বতী সব বুঝতে পারেন এবং শাপ দেন ইত্যাদি। পরবর্তী কাহিনী সুলক্ষণা মধুরার মত মন্দোদরীতে (দ্রঃ) পরিণত হলেন। এই জন্য ইন্দ্রজিতের অপর নাম কানীন। অতিকায় ও অক্ষয়কুমার ইন্দ্রজিতের দুই সহোদর। স্ত্রী প্রমীলা। জন্মেই মেঘের মত গর্জন করে উঠেছিল বলে নাম মেঘনাদ।

অপর মতে মেঘের আড়াল থেকে ঘোর নাদে যুদ্ধ করতেন বলে এই নাম। রাবণ মেঘনাদকে নিয়ে দিগ্বিজয়ে বার হয়ে স্বর্গ আক্রমণ করলে মেঘনাদের হাতে ইন্দ্রের ছেলে জয়ন্ত অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জয়ন্তের পিতামহ পুলোমা জয়ন্তকে নিয়ে সকলের অজ্ঞাতে পালিয়ে যান। ইন্দ্র শোকে মুহ্যমান হয়ে বজ্রাঘাত করেন; রাবণ অজ্ঞান হযে যান। মেঘনাদ শিবের বরে মায়া প্রভাবে অদৃশ্য থেকে যুদ্ধ করে ইন্দ্রকে হারিয়ে বন্দী করে ফেলেন। ইতিমধ্যে রাবণের জ্ঞান ফিরে আসে; ইন্দ্রকে লঙ্কায় বন্দী করে নিয়ে আসেন। দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে প্রায় এক বছর পরে ছাড়িয়ে নিয়ে যান। ইন্দ্রজিৎ এই সময় ব্রহ্মাকে অমর হবার বর চান। কিন্তু ব্রহ্মা বর দেন যজ্ঞ করে যজ্ঞ সমাপ্ত করলে অগ্নি থেকে অশ্বযুক্ত রথ পাবেন এবং সেই রথে তিনি অজেয় হবেন। কিন্তু এই যজ্ঞ / অগ্নিপূজা অসমাপ্ত রেখে যুদ্ধ করলে কোন ফল হবে না। ইন্দ্রকে পরাজিত করার জন্য নাম হয় ইন্দ্রজিৎ। অন্য মতে মহামায়ার পূজা করে ইন্দ্রজিৎ মায়াবল লাভ করেছিলেন। এ ছাড়া নিকুম্ভিলাতে অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজসূয়, গোমেধ, বৈষ্ণব, মহেশ্বর ইত্যাদি সপ্ত যজ্ঞ করেছিলেন। এ সময়ে রাবণ দিগ্বিজয়ে বার হয়ে গিয়েছিলেন। যজ্ঞ শেষ হবার পর রাবণ ফিরে আসেন। শুক্র যজ্ঞে পুরোহিত ছিলেন, পুত্রের কাছে সব খবর শুনে বৈষ্ণব যজ্ঞ করার জন্য রাবণ বিরক্ত হয়ে পড়েন। ফলে শুক্র শাপ দেন বিষ্ণুর হাতে নিহত হতে হবে। মহেশ্বর যজ্ঞ করেও বর লাভ করেন। কামচারী ও আকাশচারী রথ, তামসী মায়া, অক্ষয়তূণ ও অমোঘ অস্ত্রাদি পেয়ে দুর্দ্ধর্ষ হয়েছিলেন। মহাদেবের কাছে এই সব মায়া বিদ্যা লাভ করে নাম হয় মায়াবী। লঙ্কায় হনুমান সীতার খোঁজে এলে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল এবং হনুমানকে ইন্দ্রজিৎ বেঁধে ফেলে ছিলেন। লঙ্কায় রামচন্দ্র এলে ইন্দ্রজিৎ প্রথমে অঙ্গদের হাতে পরাজিত হন। ফলে আবার আক্রমণ করে রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ করেন। কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, ত্রিশিরা প্রভৃতি মারা গেলে ইন্দ্রজিৎ আবার আক্রমণ করেন; রামলক্ষ্মণ পরাজিত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

এই সময় হনুমান ঔষধ এনে জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন। অর্থাৎ রাম লক্ষ্মণকে দুবার পরাজিত করেন। চতুর্থ বার ঠিক করেছিলেন মায়া সীতাকে হত্যা করে ব্যকুল রামচন্দ্রদের পরাজিত করবেন। কিন্তু কৌশল ধরা পড়ে ব্যর্থ হয়ে যায়। শেষ কালে নিকুম্ভিলাতে যজ্ঞ করে অজেয় হয়ে যুদ্ধে যাবার জন্য যজ্ঞ করছিলেন। এই সময়ে লক্ষ্মণ এসে (দ্রঃ বিভীষণ) অর্থাৎ যজ্ঞ পূর্ণ হবার আগে নিরস্ত্র অবস্থাতে এঁকে হত্যা করেন।

ইন্দ্রদৈবত—পুত্র কামনায় যজ্ঞ। যুবানাশ্ব এই যজ্ঞ করলে মান্ধাতা ছেলে হয়।

ইন্দ্রদ্বীপ—পৃথিবীর নয় ভাগের এক ভাগ। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব, বরুণ ইত্যাদি।

ইন্দ্রদ্যুম্ন—(১) সত্যযুগে অবন্তি বা উজ্জয়িনীর সূর্যবংশীয় রাজা। বিষ্ণুভক্ত। একদিন বিষ্ণু পূজা করবেন স্থির করে উপযুক্ত স্থান খুঁজতে খুঁজতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে এসে পূজা করে যজ্ঞ শেষ করে এক বিষ্ণু মন্দির তৈরি করান। কিন্তু কি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবেন ভেবে পান না। বিষ্ণু তখন স্বপ্নে জানান তাঁর সনাতনী মূর্তি প্রতিষ্ঠা

করতে এবং জানান ভোরে সমুদ্রতীরে একটা কাঠ ভেসে যাচ্ছে দেখতে পাবে ; সেই কাঠে যেন মূর্তি তৈরি হয়। পর দিন ভোরে কাঠ পেয়ে রাজা নিজেই মূর্তি তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন। এমন সময় বিশ্বকর্মাকে সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে বিষ্ণু এসে কুশলী শিল্পী বলে বিশ্বকর্মার পরিচয় দিয়ে তাঁর হাতে বিগ্রহ নির্মাণের ভার দিতে বলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন এঁকে, কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি তৈরি করার ভার দেন। অন্য মতে উৎকলে নাগ পর্বতে নারদের সঙ্গে নীলমাধব দেখা করেন। অন্য মতে রাজা পুরীতে আসেন। বিগ্রহ বালির নীচে লুকান ছিল ; রাজা দেবতাকে দেখতে না পেয়ে নীল পর্বতে প্রায়ো-পবেশনে আত্মবিসর্জন করবেন ঠিক করেন। তখন দৈববাণী হয় রাজা জগন্নাথ দেবকে দেখতে পাবেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং সুন্দর একটি মন্দির নির্মাণ করান। নারদের আনা নৃসিংহ মূর্তি এই মন্দিরে স্থাপিত হয়। পরে স্বপ্নে রাজা জগন্নাথের দর্শন পান এবং সমুদ্র তীরে অবস্থিত একটি সুগন্ধ বৃক্ষ থেকে বিগ্রহ তৈরি করিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন—(২) রাজা তেজসের ছেলে। অন্য মতে নাভি-ঋষভ-ভরত-সুমতি-ইন্দ্রদ্যুম্ন। বিষ্ণুভক্ত। বৃদ্ধ বয়সে ছেলেদের রাজত্ব দিয়ে মলয় পাহাড়ে তপস্যা করতেন। এক দিন অগস্ত্য আসেন ; ধ্যানরত রাজা জানতে পারেন না। কিন্তু অগস্ত্য অনাদর মনে করে হস্তীতে পরিণত হবার শাপ দেন। রাজা তখন ক্ষমা চাইলে অগস্ত্য বর দেন বিষ্ণু এসে তাঁর পিঠে হাত রাখলে তখন মুক্তি পাবেন। হস্তী হয়ে রাজা ত্রিকূট পাহাড়ে আসেন। এখানে একটি সরোবরের তীরে দেবল মুনি তপস্যা করছিলেন। এখানে এর আগে গন্ধর্ব হূহূ একদিন অপ্সরাদের নিয়ে জল কেলি করতে এসে দেবলের শাপে কুমীর হয়ে এইখানে বাস করছিলেন। হস্তী ইন্দ্রদ্যুম্ন এই জলে নামলে কুমীর দ্বারা আক্রান্ত হন। হাজার বছর ধরে হাতী ও কুমীর টানাটানি করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দুজনেরই মনে দিব্য ভাবের উদয় হয়, ইতিমধ্যে বিষ্ণু এসে সুদর্শন চক্রে কুমীরকে, অন্য মতে দুজনকেই হত্যা করেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন মুক্তি পেয়ে বৈকুণ্ঠে চলে যান। পুণ্য শেষ হলে স্বর্গচ্যুত হয়ে রাজা মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রমে আসেন। মুনি রাজাকে চিনতে পারেন না। মার্কণ্ডেয় তখন আরো বৃদ্ধ প্রাবীরকর্ণ পেচকের কাছে যাবার কথা তোলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন ঘোড়া সেজে মার্কণ্ডেয়কে পিঠে নিয়ে হিমালয়ে প্রাবীরকর্ণের কাছে আসেন ; এবং এও রাজাকে চিনতে পারে না। পেচক তখন রাজাকে আরো বৃদ্ধ নাড়িজঙ্ঘ বকের কাছে যেতে বলেন। রাজা তখন মার্কণ্ডেয়কে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে হ্রদে ঐ বকের কাছে নিয়ে আসেন। বকও চিনতে পারেন না এবং বলেন ঐ হ্রদে অকূপার নামে কচ্ছপের কাছে যেতে। অকূপার নাড়িজঙ্ঘর চেয়েও বৃদ্ধ ; রাজাকে চিনতে পারেন এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জানান রাজা এত গরুদান করেছিলেন যে তাদের পায়ে পায়ে এই হ্রদ তৈরি হয়েছিল। এই জন্য হ্রদের নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন হ্রদ। কচ্ছপের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ থেকে দিব্য রথ নেমে আসে। মার্কণ্ডেয় ও পেচককে রাজা স্বস্থানে পৌঁছে দিয়ে স্বর্গে ফিরে যান। অর্থাৎ প্রমাণিত হয় রাজার পুণ্য এখনও কীর্তিত হচ্ছে ; এখনও

রাজার পুণ্য শেষ হয় নি। (মহা ৩।১৯১।২১) অন্য মতে অকূপার চিনতে পারলে মার্কণ্ডেয় রাজাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। (৩) হিমালয়ে/গন্ধমাদন পর্বতে একটি সরোবর। (৪) পুরীতে ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠিত একটি হ্রদ। (৫) জনকের পিতা। (৬) ইক্ষ্বাকু বংশের এক রাজা। (৭) কৃষ্ণের হাতে নিহত জনৈক রাজা।

ইন্দ্রদ্যুম্নহ্রদ—দ্রঃ-ইন্দ্রদ্যুম্ন।

ইন্দ্রধনু—রামের বনবাসের সময় অগস্ত্য রামকে এই ধনু উপহার দেন। এই ধনুতে রাবণ নিহত হয়। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইন্দ্র মাতলিকে দিয়েও আর একটি ধনুক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ইন্দ্রধ্বজ—নারায়ণ প্রদত্ত ও ইন্দ্রের দ্বারা পূজিত ধ্বজা। অসুরদের হাতে উৎপীড়িত হয়ে দেবতারা ব্রহ্মাকে ধরেন। ব্রহ্মা বলেন ক্ষীরোদ সাগরে নারায়ণের কাছে গিয়ে স্তব করলে দেবতারা একটা ধ্বজা পাবেন। এটিকে বাঁশে বেঁধে ইন্দ্র যদি পূজা করেন তাহলে এই ধ্বজা অসুর বিনাশে সাহায্য করবে। এই ভাবে অসুররা পরাজিত হন। নারায়ণ আরো বলেছিলেন যে রাজা এই ধ্বজা পূজা করবে তার রাজ্যে কোন বিপদ থাকবে না। ভাদ্র মাসে শুক্লা দ্বাদশীতে রাজারা ইন্দ্রের প্রীতির জন্য বিধি মত এই ধ্বজা পূজা করে পরে অনুষ্ঠান সহকারে বিসর্জন দিতেন। (২) চেদি রাজ উপরিচরকে ইন্দ্র একটি যষ্টি দিয়েছিলেন। রাজা এটি পূজা করে ইন্দ্রের কৃপায় পরম সুখে প্রজা পালন করতেন। (৩) পতাকা। এই পতাকা উড়িয়ে দিলে বৃষ্টি হয়। এই পতাকা দণ্ড ভেঙে পড়ছে স্বপ্ন দেখলে দেশে দুর্দৈব আসে।

ইন্দ্রপুর—সুমাত্রা দ্বীপের দ-পশ্চিমে বেঙ্কুলেনের ১০০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে নগরী।

ইন্দ্রপূজা—দ্রঃ উপরিচর বসু

ইন্দ্রপ্রমতি—ঋক্ বেদের একজন আচার্য। পৈল ঋক্ বেদ দুভাগ করে এক ভাগ শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতিকে পড়ান। ইন্দ্রপ্রমতি তাঁর সংহিতার এক অংশ নিজের ছেলে মাণ্ডুকেয়কে পড়ান। ইন্দ্রপ্রমতি বাস্কলের সতীর্থ এবং মার্কণ্ডেয়ের গুরু।

ইন্দ্রপ্রমিতি—ঘৃতাচীর গর্ভে বশিষ্ঠের ছেলে। অন্য নাম কপিঞ্জল/ত্রিমূর্তি। পৃথু কন্যার গর্ভে ইন্দ্রপ্রমিতির ছেলে হয় ভদ্র।

ইন্দ্রপ্রস্থ—ইন্দ্রপত্ত=ইন্দ্রপতন=ইন্দ্রস্থান। বর্তমান দিল্লির নিকটবর্তী নগরী। বর্তমান দিল্লিতে ইন্দ্রপ্রস্থের কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে বিয়ে করে হস্তিনাপুরে এলে ধৃতরাষ্ট্র এঁদের অর্দ্ধেক রাজ্যত্ব দিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করতে বলেন। পাণ্ডবরা এখানে এক বিরাট সুন্দর সহর ইন্দ্রপ্রস্থ গড় তোলেন। ময় দানব (দ্রঃ) এখানে অপূর্ব সভাগৃহ তৈরি করে দেন; মৈনাক পর্বতে অবস্থিত বিন্দুসরোবর থেকে ধনরত্ন এনে ইন্দ্রপ্রস্থ সাজিয়ে দেন। ১৪ মাসে (মাসৈঃ পরিচতুর্দশৈঃ ২।৩।৩৪) এই প্রাসাদ নির্মাণ শেষ হয়। যুধিষ্ঠির এখানে প্রথম রাজা। পাণ্ডবদের পর যাদব বংশে অনিরুদ্ধের ছেলে বজ্র ইন্দ্রপ্রস্থ শাসন করেন। অন্য মতে খাণ্ডব বনের মধ্যে দেবতাদের স্থাপিত একটি নগর। ইন্দ্র এখানে স্বর্ণযূপ দিয়ে বহু যজ্ঞ করেছিলেন এবং সেই সব যজ্ঞে নারায়ণের সমক্ষে ব্রাহ্মণদের বহু দান করেছিলেন। এই জন্য নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। এখানে

মৃত্যু হলে পুনর্জন্ম হয় না ; বিষ্ণুতুল্য হয়। জাতকে আছে ইন্দ্রপ্রস্থ সহর সাত যোজন। যমুনার বাম উপকূলে ইন্দ্রপ্রস্থ, দক্ষিণ উপকূলে দিল্লি। যমুনা তীরে নিগমবোধ ঘাট প্রাচীন স্মৃতি বহন করছে।

ইন্দ্রবর্মা—মালব-রাজা। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব পক্ষে। এর হাতী অশ্বত্থাম। ভীম এই হাতীকে মারলে সমবেত চাপে যুধিষ্ঠিরকে (দ্রঃ) অশ্বত্থামা মারা গেছে বলতে হয়। দ্রঃ দ্রোণ।

ইন্দ্রবল—পাণ্ডু বংশে উদয়ন পুত্র। কিন্তু শবর-রাজ বলে পরিচিত।

ইন্দ্রভূতি—খৃ ৭-৮ শতকে জন্ম। তিব্বতের প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু পদ্মসম্ভবের পিতা। উড্ডীয়ানের রাজা। বজ্রযান ও তন্ত্রশাস্ত্রে একজন সুপণ্ডিত। আচার্য অনঙ্গবজ্রের শিষ্য। প্রায় ২৩টি গ্রন্থের রচয়িতা। এগুলির মধ্যে কুরুকুল্লাসাধন ও জ্ঞানসিদ্ধি মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া গেছে।

ইন্দ্রসভা—অমরাবতীর দেবসভা। বিশ্বকর্মা নির্মিত। দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত। ৪০০ ক্রোশ পরিধি ও দুই ক্রোশ উচ্চ। বা ৩৫০ যোজন × ১০০ যোজন × ৫ যোজন। তেত্রিশ কোটি দেবতা ও ৪৮,০০০ঋষির বসবার স্থান আছে

ইন্দ্রসাবর্ণি– ১৪-শ অর্থাৎ শ্বেতবরাহকল্পে শেষ মনু। এই মন্বন্তরে অবতার বৃহৎভানু; ইন্দ্র শুচি ; দেবতা পাঁচ ভাগ :-চাক্ষুষ, পবিত্র, কনিষ্ঠ, ভ্রাজক, বাচবৃদ্ধ। অগ্নিবাহু, শুচি, শুক্র, মাগধ, অগ্নীধ্র, যুক্ত ও জিত সপ্তর্ষি। উরু, গম্ভীর, ব্রধ্ন ইত্যাদি মনু পুত্র।

ইন্দ্রসেন—(১) নল ও দময়ন্তীর ছেলে। (২) যুধিষ্ঠিরের সারথি ; বনে যাবার সময় প্রথম দিকে এই সারথি সঙ্গে ছিলেন। (৩) সূর্য বংশে পূর্ণের ছেলে ; বীতিহোত্রের পিতা (৪) পরীক্ষিতের ছেলে।

ইন্দ্রসেনা—(১) নল ও দময়ন্তীর মেয়ে। (২) মহর্ষি মুদ্গলের স্ত্রী ; ইনি বীরাঙ্গনা। মহর্ষি মুদ্গল বৃষ বাহিত রথে ইন্দ্রসেনার সারথ্যে শত্রু জয় করে বহু গাভী সংগ্রহ করে আনেন (৩) অঙ্গ রাজকুমারী ; ঋষ্যশৃঙ্গের স্ত্রী।

ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রের (দ্রঃ) স্ত্রী শচী ; সন্তান জয়ন্ত ও জয়ন্তী। কশ্যপ + দনু > পুলোমা > শচী। ঋক্ বেদে আছে ইনি ভাগ্যবতী, এঁর স্বামী অমর। দেবী হিসাবে ইন্দ্রাণী সে রকম পূজিতা নন। শূরপদ্ম অসুর শচীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন এবং ধরে আনবার জন্য অনুচরদের পাঠান। কোঙ্কন দেশে এক মন্দিরে গিয়ে ইন্দ্র আশ্রয় নেন। ইন্দ্রের অনুপস্থিতিতে শূরপদ্মের বোন অজামুখী (দ্রঃ) ইন্দ্রাণীকে দেখতে পেয়ে ধরে ফেলেন এবং বিয়ে করতে বলেন। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্র স্ত্রীকে নিয়ে দেবলোকে ফিরে যান। এই ইন্দ্রাণীর অংশে দ্রৌপদীর জন্ম। কৃষ্ণের সঙ্গে সত্যভামা দেবলোকে এলে ইন্দ্রাণী তাঁকে অদিতির সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যান। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের স্ত্রী প্রসহা। দ্রঃ নহুষ, অগস্ত্য। (২) অষ্ট মাতৃকার একজন। (৩) যোগিনী। (৪) দুর্গা।

ইন্দ্রানুজ—বামন। পুরাণে ইন্দ্রের জন্মের পর কশ্যপ-অদিতির দ্বিতীয় পুত্র বামন জন্মান।

ইন্দ্রিয়—বেদান্তে কর্ম ইন্দ্রিয় :-বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। জ্ঞানেন্দ্রিয়: চক্ষু, কর্ণ,

নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। অন্তরেন্দ্রিয়ঃ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত। চক্ষুর দেবতা সূর্য, কর্ণের দিক, নাসিকা অশ্বিনীদ্বয়, জিব প্রচেতা, ত্বক বায়ু, মন চন্দ্র, বুদ্ধি চতুর্মুখ, অহঙ্কার শঙ্কর, চিত্ত অচ্যুত, বাক্ বহ্নি, পাণি ইন্দ্র, পাদ, বিষ্ণু, পায়ু মিত্র, উপস্থ প্রজাপতি।

ইন্দ্রোতা—ইন্দ্রোদা=শৌনক। শুকের ছেলে। পরীক্ষিতের ছেলে জন্মেজয় একবার এক ব্রাহ্মণ হত্যা করে ফেলেন এবং এঁর পরামর্শে তীর্থ যাত্রা ইত্যাদি.করে মুক্তি পান।

ইরা—দক্ষের মেয়ে কশ্যপের স্ত্রী, সন্তান ঘাস, গুল্ম ও বৃক্ষলতা।

ইরাবতী—(১) পঞ্চনদের একটি। রাবি। গ্রীক হিদ্রাওতেস্। ধবলাধর পাহাড়ের উত্তর ঢাল ও পীর পাঞ্জালের দক্ষিণ ঢাল থেকে উদ্ভূত দুটি জলধারা মিলে সৃষ্টি। চম্বা উপত্যকা হয়ে চন্দ্রভাগার সঙ্গে মিলিত হয়ে সিন্ধু নদে এসে পড়েছে। এই নদীর তীরে হরপ্পার ধ্বংশাবশেষ। (২) ভব নামে রুদ্রের স্ত্রী। (৩) ক্রোধবশার নাতনি. অর্থাৎ কদ্রুর মেয়ে।

ইরাবান—অর্জুন ও উলূপীর ছেলে। অর্জুন যখন তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন তখন একদিন গঙ্গাস্নানের সময় ঐরাবত কূলে কৌরব্য নাগের মেয়ে উলূপী অর্জুনকে প্ররোচিত করে বিয়ে করেন। প্রথম স্বামী গরুড়ের হাতে মারা যান। বংশ রক্ষার জন্য ঐরাবত বিধবা কন্যাকে অর্জুনের হাতে দেন। ইরাবান নাগলোকে মায়ের কাছে পালিত হন। অর্জুনের প্রতি বিদ্বেষ বশত এঁর পিতৃব্য অশ্বসেন এঁকে ত্যাগ করেন। অর্জুন যখন স্বর্গে অস্ত্রশিক্ষা করছিলেন সেই সময় ইরাবান গিয়ে অর্জুনকে নিজের পরিচয় দেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন ইরাবানকে যোগ দিতে বলেন। যুদ্ধের অষ্টম দিনে গজ, গবাক্ষ, বৃষক, চর্মবান, আর্জব ও শুক নামে (মহা ৬।৮৮।২৪) শকুনির ৬-ভাইকে ও বহু কৌরব সৈন্য ধ্বংস করে অলম্বুষের হাতে নিহত হন।

ইল—রামায়ণ মতে বাহ্লীক দেশে কর্দম প্রজাপতির ছেলে। অন্য মতে বৈবস্বত মনু পুত্র কামনায় মিত্রাবরুণকে সন্তুষ্ট করার জন্য অগস্ত্যকে দিয়ে যজ্ঞ করান। কিন্তু মনুস্ত্রী মনাবী/শ্রদ্ধা একটি মেয়ে চান। অন্য মতে যজ্ঞে ত্রুটি ছিল। মনাবীর কথার কন্যা লাভের সংকল্প করে আহুতি দেন ফলে ইলার জন্ম হয়। মনু কিন্তু ছেলে চেয়ে ছিলেন। বশিষ্ঠের কাছে মনু কন্যা লাভের কারণ জানতে চান এবং অনুনয় করলে ইলা পুত্ররূপে সুদ্যুম্ন নামে পরিচিত হন। অন্য মতে মিত্রাবরুণের বরে ইলা সুদ্যুম্ন হন। এই সুদ্যুম্ন একবার সঙ্গীদের নিয়ে মৃগয়াতে বার হয়ে কুমারবনে (দ্র:) প্রবেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে সকলে নারীতে পরিণত হয়ে যান। অন্য মতে মৃগয়াকালে কার্তিকের জন্মস্থান ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করেন। উমা-মহাদেবকে এখানে ক্রীড়ারত দেখতে পান। উমার মনোরঞ্জনের জন্য মহাদেব স্ত্রী রূপে খেলা করছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছা মত অরণ্যের সমস্ত পুরুষ-জন্তু, পুরুষ-বৃক্ষ স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত হয়েছিল। রাজাও তাঁর অনুচরেরা নারীতে পরিণত হন। রাজার কাকুতি/মিনতিতে মহাদেব পুরুষত্ব ব্যতীত অন্য বর দিতে চান। রাজা তখন উমার কাছে মিনতি করাতে এক মাস পুরুষ ও এক মাস স্ত্রী হয়ে থাকার বর পান। এই অবস্থাকে বলা হয়েছে কিম্পুরুষত্ব এবং যেখানে ইনি বাস করতেন সেখানকার নাম হয় কিম্পুরুষ বর্ষ। মৎস্য পুরাণ মতে মনুর বরপুত্র,

রাজা হয়ে দিগ্বিজয়ে সমগ্র পৃথিবী জয় করে দৈবাৎ কুমারবনে/শরবনে প্রবেশ করে তৎক্ষণাৎ নারী হয়ে যান। নাম হয় ইলা এবং পূর্বস্মৃতি ভুলে যান। বিমূঢ় হয়ে কয়েক দিন পরে রাজ্যে ফিরতে থাকেন পথে বুধ এঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করেন। অন্য মতে ইলা একদিন বেড়াতে বেড়াতে চন্দ্রের ছেলে তপস্যারত বুধের সঙ্গে মিলিত হন। রূপে মুগ্ধ হয়ে ইলার গর্ভে বুধ একটি সন্তানের জন্ম দেন; এই ছেলে পুরূরবা। একটি মতে এই ছেলে হবার পর ইলা বশিষ্ঠকে সব জানান এবং বশিষ্ঠ মহাদেবকে অনুরোধ করেন অন্য মতে যজ্ঞ করে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে বর পান এক মাস নারী হয়ে অন্তঃপুরে থাকবেন এবং পরবর্তী মাসে পুরুষ হয়ে রাজ্য শাসন করবেন। এইভাবে জীবন কাটবে। আর এক মতে ইল প্রথম নারীতে পরিণত হন যখন তখন ইলের ভাইরা ইলকে উদ্বিগ্ন হয়ে খুঁজতে থাকেন এবং সব জানতে পেরে চ্যবন বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষিকে দিয়ে এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করে মহাদেবকে খুসি করে মাসান্তর নারী-পুরুষ জীবনের বর পান। এই সময় ইলের নাম সুদ্যুম্ন।

রাজা ইলের পুরুষ অবস্থার ছেলে শশবিন্দু, উৎকল, গয়, বিমল = হরিতাশ্ব। পুরূরবার বয়স হলে সুদ্যুম্ন এঁকে রাজ্য দিয়ে বনে চলে যান। ইলের দেশের নাম ইলাবৃত। ইলার ভাই ইক্ষ্বাকু।

ইলবিলা—দেববর্ণিনী। বিশ্রবার স্ত্রী। কুবেরের মা।

ইলাবৃত—(১) এখানে ইলা (দ্রঃ ইল) বুধের সঙ্গে বাস করতেন। কৈলাসের নিকট। (২) জম্বুদ্বীপে নয়টি দেশের মধ্যে একটি। এর উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান পর্বত; দক্ষিণে নিষধ, হেমকূট ও হিমালয় পর্বত; পশ্চিমে মাল্যবান ও পূর্বে গন্ধমাদন। এই দেশে মেরু পর্বতকে সুমেরু বেষ্টন করে অবস্থিত। মেরু এখানকার নাভি দেশ। অন্য মতে চীন, তুর্কিস্তান ও গোবি মরুভূমি নিয়ে ইলাবৃত বর্ষ। আর এক মতে মধ্য এসিয়ার কোন স্থান, সম্ভবত পামির বা পূর্বতুর্কিস্তান। ইলাবৃতবর্ষের অপর নাম স্বর্গ। (৩) মৎস্য পুরাণে বৈবস্বত মনুর ছেলে রাজা ইলের (দ্রঃ) নাম অনুসারে নাম। (৪) ভাগবত (৫।২) মতে জম্বুদ্বীপের অধিপতি অগ্নীধ্রের নয় ছেলের একজন।

ইলিন—তংসুর ছেলে। স্ত্রী রথান্তরী। ছেলে দুষ্মন্ত, শূর, ভীম, বসু, প্রবসু।

ইলিল—ইলিন (দ্রঃ)।

ইলোরা—দৌলতবাদ ও আওরঙ্গাবাদ নগরের কাছে গুহামন্দির থেকে ৯-ক্রোশ দূরে অবস্থিত নগর। ইলিচপুরের রাজা ইলু কর্তৃক নির্মিত। দ্রঃ এলোরা।

ইল্ববাহ—ইধ্মবাহ।

ইল্বল—সিংহিকার গর্ভে বিপ্রচিত্তির ছেলে। অসুর। ছোট ভাই বাতাপি। অন্য মতে রাক্ষসী অজামুখী দুর্বাসার কাছে আত্মনিবেদন করে এই দুটি ছেলে পান। এরা পিতার তপঃ ফলের ভাগ চাইলে দুর্বসা ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন অগস্ত্যের হাতে মৃত্যু হবে। দ্রঃ অজামুখী। মণিপত্তন বা মণিমতী নগরীতে বাস করতেন। বাতাপি এক তপস্বী ব্রাহ্মণের কাছে ইন্দ্রের সমান পুত্রলাভের বর চেয়ে বিফল হয়ে ব্রাহ্মণ হত্যায় নিযুক্ত

হন। ব্রাহ্মণ বেশ ধরে ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে আনতেন। বাতাপি তারপর মেষ/ছাগল রূপ ধারণ করতেন। ইম্বল এই মাংস নিমন্ত্রিতদের খাইয়ে ভাইকে ডাক দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে বাতাপি ব্রাহ্মণদের পেট চিরে বার হয়ে আসতেন। এইভাবে বহু ব্রাহ্মণ নিহত হলে একদিন দেবতারা অগস্ত্যকে (দ্রঃ) নিয়ে (অন্য মতে অগস্ত্যের সঙ্গে মাত্র তিন রাজা ছিলেন) এখানে অতিথি হন। যথারীতি খেতে দিলে অগস্ত্য একাই সব মাংস খেয়ে ফেলেন। পরে ইম্বলের ডাকে বাতাপির কোন সাড়া মেলে না, এবং অগস্ত্য জানান বাতাপিকে তিনি হজম করে ফেলেছেন। ক্রুদ্ধ ইম্বল তখন অগস্ত্যকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করলে মুনির কোপে ভস্মীভূত হন। (২) প্রহ্লাদ বংশে একজন অসুর। (৩) হ্লাদের (দ্রঃ) ছেলে। (৪) মৃগশিরার ওপরে পঞ্চ তারা।

ইল্বলা—মৃগশিরা নক্ষত্রের মাথায় ৫-টি ছোট ছোট তারা। দ্রঃ ইম্বল।

ইষ্—সামবেদীয় যজ্ঞ।

ইষ্পাদ—দনুর একটি ছেলে। পরজন্মে রাজা নগ্নজিৎ।

ইষ্টি—চারজন ঋত্বিক সম্পাদ্য সাগ্নিক যজমান কর্তৃক অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ। শ্রৌত অগ্নিতে সম্পাদ্য হবির্যজ্ঞ।

ইসমান—যমুনা, বা ত্রিযামা, বা ইক্ষুমতী।

ইসিদাসী—উজ্জয়িনীতে এক ধনী ও ধার্মিক বণিক-কন্যা। সাকেতে এক ধনী বণিক-পুত্রের স্ত্রী। স্বামী একে ত্যাগ করলে দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন এবং আবার পরিত্যক্ত হয়ে তৃতীয় বার বিয়ে করেন। শেষকালে থেরী জিনদত্তার সংস্পর্শে এসে সংঘে যোগদান করে অর্হত্ব লাভ করেন।

ইস্পাত—সম্ভবত ভারতেই প্রথম প্রস্তুত হয়েছিল। ২০০০ বছর আগেও ভারতে উজ্-ইস্পাতের ব্যবহার ছিল। বিশ্ববিখ্যাত দামস্কাসের তরবারি এই ইস্পাতে গঠিত। পরে এই শিল্প ভারতে অবলুপ্ত হয।

ঈ

ঈ-ৎসিঙ্ -চীনে ৬:৫ খৃষ্টাব্দে চি-লি প্রদেশে জন্ম। অল্প বয়সে সেখানে কৃতবিদ্য হযে ওঠেন। ১৫-বছর মত বয়সে ভারতে আসার বাসনা হয় এবং ৬৭১ সালে ক্যাণ্টন থেকে জলপথে দ-পূর্ব এসিয়ার ভারতীয় উপনিবেশ শ্রীবিজয়ে (সুমাত্রাদ্বীপে পালেম্বাং) উপস্থিত হন। শ্রীবিজয় ঐ সময়ে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। ৬৭৩ সালে জলপথে তাম্রলিপ্তে (তমলুকে) আসেন। এখানে কিছুদিন থাকার পর ভারতে বৌদ্ধকেন্দ্রগুলি পরিভ্রমণ করেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদ চর্চা করেন এবং প্রায় ৪০০ বৌদ্ধ পুঁথি সংগ্রহ করেন। এরপর আবার তাম্রলিপ্ত ও শ্রীবিজয় হয়ে ২৫ বৎসর পরে দেশে ফিরে গিয়ে বাকি জীবন সংগৃহীত বৌদ্ধ পুঁথিগুলিকে চীনা ভাষার

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে কাটান। ফা-হিয়েনের মত সংঘের নিয়ম যথাযথ ভাবে পালন করবার ওপর অধিকতর গুরুত্ব অর্পণ করতেন। এ জন্য বিনয় সাহিত্যের চর্চা করতেন এবং মূলসর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমগ্র বিনয়পিটক তিনি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। সব সমেত ৫৬টি বৌদ্ধশাস্ত্র তিনি অনুবাদ করেন এবং সাতখানি মৌলিক গ্রন্থ লেখেন। এর মধ্যে একটি বই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে; এটি ইংরাজিতে অনুবাদ হয়েছে এবং আর একটি বই চীনা ও কোরিয়া থেকে যে সব পরিব্রাজক ভারতে আসতেন তাঁদের জীবনী ও সাধনা সম্বন্ধে: এটি ফরাসিতে অনুবাদ হয়েছে।

ঈরাণ—প্রাচীন পারসিক বা প্রাচীন বাহ্লীক (ব্যাকট্রিয়া) বা প্রাচীন নাদ (মেডিয়া) দেশ। উত্তরকুরু।

ঈর্ষা—দক্ষের মেয়ে। কশ্যপের তের জন স্ত্রীর মধ্যে একজন।

ঈশ—একজন বিশ্বদেব।

ঈশান—ঋক্‌বেদে দেবতাদের একটি বিশেষণ; অর্থ ঐশ্বর্যশালী। উপনিষদে অর্থ প্রভু বা নিয়ন্তা। বেদসংহিতায় রুদ্র; রামায়ণ মহাভারতে শিব এবং পৌরাণিক শিবের একটি নাম। একাদশ রুদ্রের একজন। পৌরাণিক যুগে শিবের অষ্টমূর্তি :-পঞ্চ ভূত, সূর্য, চন্দ্র, যজমান। এই অষ্টমূর্তির মধ্যে ঈশান হচ্ছেন সূর্য। তন্ত্রে শিবের পাঁচ-মূর্তি :— ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব, সদ্যোজাত। (২) আর্দ্রা নক্ষত্রের দেবতা। (৩) ঈশান কোণের দেবতা। (৪) বিষ্ণুর এক নাম। (৫) সাধ্যদেব বিশেষেরও নাম।

ঈশান—দ্বিজাহ্নিক পদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। হলায়ুধের বড় ভাই। রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের ছেলে। ঈশানের আর এক ভাই পশুপতি; এঁরও কয়েকটি গ্রন্থ ছিল। একটি গ্রন্থও পাওয়া যায়নি।

ঈশানকোণ—পূর্ব ও উত্তর দিকের মধ্যবর্তী কোণ।

ঈশানী—সতীর অন্য নাম।

ঈশিতা—অণিমা ইত্যাদি অষ্ট ঐশ্বর্যের মধ্যে স্বামিত্বরূপ ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্যের জন্য স্থাবর, জঙ্গম, সর্বভূত ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন।

ঈশ্বর—(১) একাদশ রুদ্রের একজন। (২) ক্লেশ, জন্ম, কর্ম, বিপাক, আশয় দ্বারা অপরাভূত চৈতন্য (পাতঞ্জল)। ঐশ্বর্য যুক্ত সগুণ ব্রহ্মের উপাধি, অর্থাৎ ব্রহ্মের যে অংশ সৃষ্টি করছেন। ভারতে ধর্মের তিনটি ধারা, ঈশ্বর বিশ্বাসী, নিরীশ্বরবাদী ও নাস্তিক। বেদকে যাঁরা মানে না অর্থাৎ চার্বাক, ও বৌদ্ধ দর্শন নাস্তিক। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব এবং উত্তর মীমাংসা এই ষড়-দর্শন আস্তিক। সাংখ্য আস্তিক হলেও নিরীশ্বরবাদী। সাংখ্যের মতে প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর ধারণা অসিদ্ধ। সাংখ্যের ঈশ্বর-অসিদ্ধ যুক্তিগুলির মধ্যে একটি যুক্তি জীব নিত্য ও অবিনাশী। সুতরাং সৃষ্টিকর্তা অসিদ্ধ। অনেকের মতে সাংখ্য ঠিক ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে না, সাংখ্য বলতে চায় প্রমাণের অভাব হেতু অসিদ্ধ, নতুবা ঈশ্বর সিদ্ধ। যোগে ঈশ্বরকে বলা হয়েছে সগুণ ও সক্রিয় ও সদাক্ত, দেহাদি রহিত

পরম পুরুষ। জগতের নিমিত্ত। জীবকে কর্মানুসারে ফল দেন। যে জীব ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ও কর্মফল অর্পণ করেন তিনি অন্তরে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং কৈবল্য পান। যোগীর অনুভূতি ঈশ্বর সত্তার অন্যতম প্রমাণ।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে চার্বাক ও বৌদ্ধ দার্শনিকরা ঈশ্বর সত্তা মানেন না। বৌদ্ধ মতেও শোক দুঃখ বিনাশ পূর্ণ জগতের কারণ ঈশ্বর নন। কর্তা-ক্রিয়া উপমা দিয়ে জগতকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানুষ ঈশ্বর রূপ কর্তা সৃষ্টি করেছে। ন্যায় দর্শনে ঈশ্বর অপ্রমেয় সগুণ ও সক্রিয় একটি আত্মা। তাঁর দেহ নাই; ইচ্ছাশক্তিই তাঁর সব। ন্যায়ের যুক্তিগুলি অবশ্য সবই প্রকল্প। বৈশেষিক কণাদ জগতের কারণ রূপে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নি। কিন্তু পরবর্তী বৈশেষিকরা নৈয়ায়িকদের প্রকল্পগুলি মেনে নিয়ে ঈশ্বর রূপ সৃষ্টি কর্তাকে স্বীকার করেছেন। মীমাংসকগণ জগতের কর্তা ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না। নানা যুক্তি দিয়ে এঁরা পরমেশ্বরবাদ খণ্ডন করেন কিন্তু দেবতাদের স্বীকার করেন এবং পূজাহোমের আবশ্যকতাও মেনে নেন; এঁরা বলেন বেদ নিত্য। বেদান্ত দর্শনে মায়া বিশিষ্ট ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম হচ্ছেন ঈশ্বর। ঈশ্বরের সত্তা ব্যবহারিক। ব্রহ্মজ্ঞান হলে ঈশ্বর-সত্তা থাকে না।

ঈশ্বরপুরী—মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য; শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু। জন্ম হালিসহর। একটি মতে এঁর বাবার নাম শ্যামসুন্দর আচার্য; রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। ঈশ্বর পুরী সন্ন্যাসী হয়েও সাধারণ বেশে থাকতেন। নবদ্বীপে অদ্বৈতের বাড়িতে এলে কেউ এঁকে চিনতে পারেন নি; কিন্তু কৃষ্ণ বিষয়ক একটি গান শুনে এঁর দেহে সাত্বিক বিকার ফুটে উঠেছিল। ফলে অদ্বৈত এঁকে চিনতে পারেন। এই সময়ে কায়ক মাস গোপীনাথ আচার্যের বাড়িতে ছিলেন। ১৫০৮ সালে গয়াতে নিমাই এঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে চৈতন্য নামে পরিচিত হন। ঈশ্বরপুরী চৈতন্যকে এত ভালবাসতেন যে দেহত্যাগের সময় তাঁর নিজের সেবক গোবিন্দকে শ্রীচৈতন্যের সেবার জন্য পাঠিয়ে দেন। ঈশ্বর-পুরী রচিত তিনটি শ্লোক পাওয়া যায়; একটিতে তিনি নিজের দৈন্য দেখিয়েছেন এবং অন্য দুটিতে মুক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষা শ্যামসুন্দরের সেবা ও গোপীদের প্রেমরস আস্বাদনই জীবনের শ্রেয় বলে উল্লেখ করেছেন।

ঈশ্বরী—পার্বতী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শক্তি, বা যোগিনী বিশেষ।

উ

উক্‌থ—সামবেদ। যজ্ঞ।

উগ্‌গ—বৈশালীর এক গৃহপতি ও শ্রেষ্ঠদাতা। দীর্ঘদেহ, উন্নতমন ও অপরিমেয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন বলে নাম উগ্‌গ শেট্‌ঠি। বুদ্ধের প্রথম দর্শনেই তিনি স্রোতা-পন্ন ও অচিরে অনুগামী হন।

উগ্র—(১) শিবের অষ্টমূর্তির একটি। (২) বরাহ কল্পে ১১-শ দ্বাপরে গঙ্গাদ্বারে

মহাদেব উগ্র নামে অবতীর্ণ হন এবং লম্বোদর, লম্বাক্ষ, লম্বদেশ ও প্রলম্ব নামে চার ছেলে হয়। এঁরা সকলেই মাহেশ্বর যোগে পারদর্শী ছিলেন। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ সেনাপতি হলে মাতৃকা জটাধরা স্কন্দকে সাহায্য করার জন্য উগ্র প্রভৃতি সহায়ককে পাঠিয়েছিলেন। (৪) মহিষাসুরের এক সেনাপতি। (৫) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে নিহত। (৬) শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণ কন্যার সন্তান বা ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রা স্ত্রীর সন্তান। (৭) একজন যাদব রাজা; পাণ্ডবরা এঁকে যুদ্ধে নিজেদের দলে ডেকেছিলেন। (৮) প্রজাপতি কবির পুত্র।

উগ্রক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয় পিতা ও শূদ্রা মাতা থেকে উৎপন্ন জাতি। পূর্ববঙ্গে নিম্ন জাতি; পশ্চিমবঙ্গে নবশাখের অন্তর্গত।

উগ্রচণ্ডা—(১) আশ্বিন মাসে কৃষ্ণা নবমীতে কোটি যোগিনীর সঙ্গে প্রথমে আবির্ভূত হয়ে অষ্টাদশ ভুজা দেবী মহিষাসুরের প্রথম মূর্তি বিনাশ করেন। (২) দক্ষ যজ্ঞে সতী দেহ ত্যাগ করে উগ্রচণ্ডা রূপ নিয়ে কোটি যোগিনী সহ শিবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যজ্ঞ নষ্ট করেন। দ্রঃ চণ্ডনায়িকা।

উগ্রতারা—ভগবতীর এক মূর্তি, অন্য নাম মাতঙ্গী। শুম্ভ নিশুম্ভের উৎপাতে দেবতারা হিমালয়ের পাদদেশে মাতঙ্গমুনির আশ্রমে এসে ভগবতীর আরাধনা করেন। দেবী তুষ্ট হয়ে মাতঙ্গ মুনির স্ত্রীর রূপধারণ করে দেবতাদের দেখা দেন। এবং এই স্ত্রীর দেহ থেকে এক দিব্য মূর্তি বার হয়ে আসে। মাতঙ্গের স্ত্রীর দেহ থেকে নিষ্ক্রান্তা বলে নাম মাতঙ্গী। চার হাত, কৃষ্ণবর্ণ, চোখ রক্তবর্ণ, গলায় মুণ্ডমালা ও সাপ; ডান দিকের হাতে খড়্গ ও কর্ত্রী বাঁ দিকের হাতে পদ্ম ও খর্পর। মাথায় গগন-স্পর্শী জটা। পরিধানে বাঘছাল ও কালো কাপড়। বাঁ পা শবের বুকে ডান পা সিংহের পিঠে। এঁরও অষ্ট যোগিনী আছে।

উগ্রশ্রবা—(১) কুশিক বংশে এক কুষ্ঠরোগী ব্রাহ্মণ। স্ত্রী শীলাবতী (দ্রঃ) অত্যন্ত পতিব্রতা। একদিন এক পতিতার জন্য ব্রাহ্মণ কামার্ত হয়ে উঠে স্ত্রীকে অনুরোধ করেন সেখানে পৌঁছে দিতে। স্ত্রী স্বামীকে কাঁধে নিয়ে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন। পথে অন্ধকারে শূলবিদ্ধ অণিমাণ্ডব্যের (দ্রঃ) গায়ে উগ্রশ্রবার পা ঠেকে যায়। অন্য মতে পা লাগেনি। উগ্রশ্রবার চরিত্র দেখে অণিমাণ্ডব্য শাপ দেন পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই ব্রাহ্মণের মৃত্যু হবে। এই শুনে পতিব্রতা স্ত্রী বলেন তাহলে কাল থেকে আর সূর্যই উঠবে না। ফলে সূর্য না ওঠাতে পৃথিবী নষ্ট হয় দেখে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে যান এবং ব্রহ্মা সকলকে অনসূয়ার কাছে যেতে বলেন। শীলাবতী শাপ তুলে নেন, সূর্য ওঠে, উগ্রশ্রবা মারা যান, অনসূয়া (দ্রঃ) আবার ব্রাহ্মণকে বাঁচিয়ে দেন। দ্রঃ অরুণ।

(২) রোমহর্ষণ মুনির ছেলে। অপর নাম সূত/সৌতি। নৈমিষারণ্যে পুরাণ পাঠ করে শোনান। (৩) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত।

উগ্রসেন—কংসের-পিতা। নহুষ-যযাতি-যদু(১)-হেহয়(৪)-কৃতবীর্য(৯)-কার্তবীর্যার্জুন(১০)-শিনি(১৪)- সত্যক(১৫)- সাত্যকি(১৬)-পৃশ্নি(২০)-চিত্ররথ(২১)-তুম্বুরু(২৬)-দুন্দুভি(২৭)-আহুক(৩১)-উগ্রসেন(৩২)-কংস(৩৩)।

শত্রুঘ্নের দুই ছেলে মথুরাতে রাজত্ব করতেন। এরপর যাদব রাজ শূরসেন মথুরার অধিপতি হন। এই শূরসেন বসুদেবের পিতা, কৃষ্ণের পিতামহ। বসুদেব রাজত্ব নেন না; ফলে আর একজন যাদব রাজা উগ্রসেন মথুরাতে রাজা হন।

আহুকের স্ত্রী কাশ্যা; দুই ছেলে দেবক, উগ্রসেন। উগ্রসেনের স্ত্রী পদ্মাবতী নয় ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। এই ছেলেদের মধ্যে কংস (দ্রঃ) বড়। কংস অবশ্য উগ্র-সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। রাজ্যলোভী কংসের হাতে নিগৃহীত হয়ে উগ্রসেন কারারুদ্ধ হন। পরে কৃষ্ণ বলরাম কংসকে নিহত করে উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে বসান। ইনি দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং যদুবংশ ধ্বংস প্রত্যক্ষ করেন। কোন কোন মতে আহুকই উগ্রসেন। উগ্রসেনের অনুমতি নিয়েই কৃষ্ণ কংসকে নিহত করেন। উগ্রসেনের রাজত্বকালে জরাসন্ধ ও শাল্ব মথুরা আক্রমণ করেছিলেন। উগ্রসেন যখন রাজা তখন একদিন বিশ্বামিত্র, নারদ ও কণ্ব দ্বারকাতে এলে যাদবরা শাম্বকে (দ্রঃ) মেয়ে ছেলে সাজিয়ে ঋষিদের ঠকাতে/পরীক্ষা করতে চেষ্টা করেন। উগ্রসেন দেশে সুরাপান নিষিদ্ধ করেছিলেন। মৃত্যুর পর উগ্রসেন বিশ্বদেবদের দলে গিয়ে যোগ দেন।

(২) পরীক্ষিতের চার ছেলের একজন; জন্মেজয়ের ভাই। (৩) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে, অপর নাম চিত্রসেন। (৪) কশ্যপের ঔরসে মুনির পুত্র। (৫) নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা। (৬) মহাবোধি-বংশ গ্রন্থের উগ্রসেন ও পুরাণে মহাপদ্ম বা মহাপদ্মপতি অনেকের মতে অভিন্ন।

উগ্রা—যোগিনী বিশেষ।

উগ্রায়ুধ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতে উপস্থিত ছিলেন।

উচ্চাটন—তান্ত্রিক ষট কর্মের একটি। স্বস্থান থেকে উচ্ছেদ করার ক্রিয়া। দেবতা দুর্গা। কৃষ্ণাচতুর্দশী বা কৃষ্ণাষ্টমীতে শনিবারে শত্রুর কেশ গ্রথিত অশ্বদন্তের মালা জপ করতে হয়।

উচ্চৈঃশ্রবা—সমুদ্র মন্থনে প্রাপ্ত সাদা ঘোড়া। সপ্ত মুখ, অমৃত পান করত। ঘোড়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্র পেয়েছিলেন। দ্রঃ রমা।

উজ্জপালক—উতঙ্ক মুনির আশ্রমের কাছে একটি মরুভূমি। মধুকৈটভ বংশের সন্তান ধুন্দু এখানে বাস করত।

উজ্জয়—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে।

উজ্জয়িনী—মধ্য প্রদেশে ইন্দোর বিভাগের জেলা ও সহর। ২৩° ৯´ উ × ৭৫° ৪৩´ পূ। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী কাঞ্চী, অবন্তিকা ও দ্বারাবতী এই সাতটি মোক্ষদায়িকা পুরী। প্রাচীন অবন্তি (দ্রঃ) বা মালবের রাজধানী। স্কন্দ পুরাণ মতে ত্রিপুরাসুরকে মহাদেব নিধন করলে জয়ের স্মৃতি হিসাবে প্রাচীন নাম অবন্তি বদলে উজ্জয়িনী নাম রাখা হয়। পশ্চিম মালবের (দ্রঃ) রাজধানী। (দ্রঃ) মাহিষ্মতী। কালিদাসের মেঘদূতে এর নাম বিশালা। সোমদেবের কথা সরিৎ-সাগরে এই নাম পদ্মাবতী, ভোগবতী, বা হিরণ্যবতী। শিপ্রাতটে সুরম্য নগরী। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতের রাজধানী। মৌর্য ও গুপ্তদের সময়ে রাজপ্রতিনিধিদের শাসন কেন্দ্র।

রাজকুমার অশোক ও কিছুদিন এখানে রাজপ্রতিনিধি হয়ে ছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্যের একটি কেন্দ্র ছিল। খৃ ১-ম শতকে এখান থেকে বারিগাজায় (=ব্রোচ নগর) এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি হত। তিনটি বিশিষ্ট বাণিজ্য পথের সঙ্গম এই উজ্জয়িনী। বিভিন্ন সাহিত্যে ও লেখগত প্রমাণ পাওয়া যায় জ্ঞান, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এখানে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ চর্চা ছিল এবং এখান থেকে দ্রাঘিমান্তর হিসাব হত।

খৃষ্টীয় ৬-শতকে গুণমতির শিষ্য পরমার্থ, উজ্জয়িনীর অধিবাসী, চীন পরিদর্শন করেন; এবং সেখানে ৭০টি বৌদ্ধগ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। গুপ্ত-বংশের পর কলচুরি বংশ এখানে রাজা হয়। ৫৯৫ খৃষ্টাব্দে কলচুরিরাজ শংকরগণ এখানে রাজা ছিলেন। এরপর প্রতিহার বংশ এখানে রাজত্ব করেন। ৮-শতকের প্রথম ভাগে নাগ-ভট্ট প্রতিহার উজ্জয়িনী পর্যন্ত এগিয়ে আসা আরবদের পরাজিত করে প-ভারতকে আরবদের কবলমুক্ত করেন। ১৪০১ খৃষ্টাব্দের পর মালবের শাসন কর্তা দিলারখাঁ মালবে স্বাধীন সুলতানি রাজ্য স্থাপিত করেন; ধারা ও মাণ্ডু মালবের রাজধানী হয় এবং উজ্জয়িনীর গৌরব শেষ হয়ে যায়।

উজ্জয়িনীতে শিপ্রা নদীর তীরে মহাকাল শিবের মন্দির, কালীয়দহ, বা প্রাচীন ব্রহ্মকুণ্ড ও কালভৈরব মন্দির এখানকার স্থাপত্যের নিদর্শন। কোটিতীর্থ এখানে বিশেষ একটি স্নানের ঘাট। হিন্দু লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের একটি তীর্থ স্থান। একান্ন পীঠের একটি। শিবরাত্রি, বৈশাখী পূর্ণিমা ও কার্তিকী পূর্ণিমাতে এখানে বড় মেলা হয়। ভারতবর্ষে চারটি স্থানে কুম্ভ মেলা হয়; উজ্জয়িনী তার মধ্যে একটি। বৌদ্ধ ও জৈনদের পবিত্র তীর্থস্থান। বৌদ্ধ প্রচারক মহাকচ্চায়ন বা মহা কাত্যায়ন এবং লুইপাদ এখানে জন্মেছিলেন। এখানে প্রাপ্ত একটি মুদ্রাতে 'ক্রস ও বল' চিহ্ন এবং উজেনিয়া শব্দটি খোদিত দেখা যায়। এই চিহ্নটির নাম উজ্জয়িনী চিহ্ন। খননের ফলে প্রতিরক্ষা প্রাচীর বেষ্টিত নগরের স্তরবিন্যাস পাওয়া গেছে। আনুমানিক ৭৫০ খৃ-পূর্বে নগর পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল। ঐ সময়ে লৌহ ও কালো লাল মৃৎ-পাত্র এবং কিছু পরে উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ মৃৎ-পাত্রের ব্যবহার ছিল।

উঞ্ছবৃত্তি—(১) উপেক্ষিত শস্য খুঁটে জীবন ধারণ। ব্রাহ্মণদের সর্বোৎকৃষ্ট বৃত্তি। ঋত (=উঞ্ছবৃত্তি), অমৃত (দ্রঃ), ও মৃত এই তিনটি ধৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। (২) একজন ব্রাহ্মণ। কর্মহেতু নাম উঞ্ছবৃত্তি বা কাপোতি। ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করতেন। একদিন কিছু খুদ বা ছাতু (যবপ্রস্থম্ উপার্জয়ৎ) পান। প্রথমে অগ্নিকে এই খুদের অংশ অর্পণ করেন তারপর ছেলে, ছেলের বউ ও নিজের স্ত্রীকে ভাগ করে দিয়ে অবশিষ্ট অংশ নিয়ে নিজে খেতে বসেন। এমন সময় ধর্ম এক অতিথি ব্রাহ্মণ হয়ে উপস্থিত হন। অতিথিকে নিজের ভাগ দিয়ে দিলেও অতিথি সন্তুষ্ট হন না। ফলে ক্রমশ বাকি তিন জনেও তাদের ভাগ দিয়ে দেন। ধর্ম তখন সন্তুষ্ট হয়ে এদের সকলকে স্বর্গে নিয়ে যান। মাটিতে যেখানে সামান্য কয়েকটি খুদের কণা পড়েছিল সেখানে

এক বেঁজি এসে গা ঘসলে যে যে অংশে এই খুদ লাগে সেই সেই অংশ সোনা রঙ হয়ে যায়।

উড্ডীয়ান—একটি দেশ। বৌদ্ধ বজ্রযান বহু গ্রন্থে এর নাম আছে। তিব্বতী হিসাব অনুসারে এই দেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রচার হয়েছিল এবং তারপর কামাখ্যা, পূর্ণগিরি ইত্যাদি পীঠস্থানে ও ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এখানকার রাজা ইন্দ্রভূতির ছেলে প্রসিদ্ধ পদ্মসম্ভব। তারানাথের মতে উড্ডীয়ান দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল এবং ৫০০,০০০ নগর যুক্ত। অনেকের মতে আফগানে সোয়াট উপত্যকায় অন্যমতে কাশগড়ে অবস্থিত ছিল। আর এক মতে উড়িষ্যা বা বাঙলার কোন অঞ্চলে।

উতথ্য—একজন ঋষি। পিতা অঙ্গিরা, মা শ্রদ্ধা। স্ত্রী মমতা (দ্রঃ) ও সোমের মেয়ে ভদ্রা। মমতার ছেলে দীর্ঘতমা (দ্রঃ)। উতথ্যের আর এক ছেলে গৌতম। ছোট ভাই দেবগুরু বৃহস্পতি। স্ত্রী ভদ্রার ওপর বরুণ দেবের লোভ ছিল এবং সুযোগ মত ভদ্রাকে সমুদ্রে ভাসিযে নিযে যান। নারদ, ঘটনাটা জানিয়ে দিলে উতথ্য নারদকে দিয়েই অনুরোধ করে পাঠান। কিন্তু কোন কাজ হয় না। উতথ্য তখন সমুদ্রের সমস্ত জল শোষণ করে ফেলেন। বরুণ ভীত হয়ে ভদ্রাকে ফিরিয়ে দেন। মান্ধাতাকে উতথ্য রাজধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন।

উৎকল—(১) বৈবস্বত মনুর এক ছেলে। (২) প্রাচীন উড়িষ্যা। কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ ও উৎকলিঙ্গ এই তিনটি কলিঙ্গের মধ্যে উৎকলিঙ্গ থেকে অপভ্রংশ উৎকল (অশোক অনুশাসন ১০৭)। (৩) ধ্রুবের বড় ছেলে। (৪) পঞ্চ গৌড় ব্রাহ্মণের একজন।

উত্তঙ্ক—উত্তঙ্গ, উতঙ্ক। বিখ্যাত মুনি। আয়োদধৌম্যের বেদ নামে শিষ্যের শিষ্য এই উত্তঙ্ক। অত্যন্ত গুরুভক্ত। যজন কাজের জন্য অন্যত্র যাবার সময় আশ্রমের ভার উত্তঙ্ককে দিয়ে যান। এই সময়ে আশ্রম নারীরা একদিন উত্তঙ্ককে গুরুপত্নীর ঋতুরক্ষা করতে বলেন। অন্যমতে গুরুপত্নী নিজেই এসে ছিলেন। উত্তঙ্ক বিমূঢ় হয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। গুরু ফিরে এসে সব শুনে আশীর্বাদ করে গৃহে ফিরে গিয়ে গৃহী হতে আদেশ দেন। উত্তঙ্ক গুরু দক্ষিণা দিতে চান ; গুরু নিতে চান না ; কিন্তু পীড়াপীড়িতে স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন। উত্তঙ্ককে বিব্রত করার জন্য রাজা পৌষ্যের/সৌদাসের/কল্মাষপাদের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর কুণ্ডল দুটি গুরুপত্নী দক্ষিণা হিসাবে এনে দিতে বলেন। চার দিন পরে পুণ্যক ব্রতে ঐ কুণ্ডল ধারণ করে তিনি ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করে খাওয়াতে চান।

উত্তঙ্ক বার হয়ে পড়েন। পথে প্রকাণ্ড বৃষভারূঢ় একজন মহাকায় ব্যক্তি উত্তঙ্ককে সেই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ করতে বলেন। উত্তঙ্ক দ্বিধা করেন ; লোকটি কিন্তু আবার খেতে বলেন এবং জানান উত্তঙ্কের গুরুদেবও এই পুরীষ খেয়েছেন। উত্তঙ্ক তখন সেই পুরীষ ভক্ষণ করে তাড়াতাড়ি আচমন সেরে পৌষ্যের কাছে আসেন। রাজা রাণীর কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু রাণীকে খুঁজে না পেয়ে উত্তঙ্ক ফিরে এলে পৌষ্য বলেন উত্তঙ্ক সম্ভবত অশুচি আছেন। হয়তো ঠিক মত আচমন করেন

নি। সেই জন্য দেখতে পান নি। উত্তঙ্কের খেয়াল হয় তাড়াতাড়ি আসবার সময় পথে দাঁড়িয়েই আচমন করেছিলেন। পূর্বাস্য হয়ে এবার বিধিমত আচমন করে অন্তঃপুরে রাণীকে দেখতে পেয়ে তাঁকে প্রার্থনা জানান। রাণী কুণ্ডল দুটি দিয়ে সাবধান করে দেন নাগরাজ তক্ষক ও এই কুণ্ডল প্রার্থী। উত্তঙ্ক যেন সাবধান থাকে। রাজা পৌষ্য অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু অন্ন শীতল ছিল ও অন্নে কেশ ছিল বলে উত্তঙ্ক রাজাকে অন্ধ হবার শাপ দেন। নির্দোষ অন্ন দেওয়া সত্ত্বেও এই ভাবে অভিশপ্ত হয়ে রাজা উত্তঙ্ককে নিঃসন্তান হবার শাপ দেন। পরে রাজা অন্ন পরীক্ষা করে বলেন নিশ্চই খোলা চুলে কোন নারী এই অন্ন এনেছিল; এইজন্য কেশ এসে পড়েছে এবং এজন্য রাজা ক্ষমা চান। উত্তঙ্ক তখন বর দেন রাজা আবার দৃষ্টি ফিরে পাবেন। এবং যেহেতু অন্নের দোষ ছিল সেইহেতু রাজার শাপ নিষ্ফল হয়।

কুণ্ডল নিয়ে ফেরার পথে মাটিতে এক জায়গায় কুণ্ডল দুটি রেখে স্নান করতে নামলে এক ক্ষপণক এই কুণ্ডল দুটি নিয়ে ছুট দেয়। উত্তঙ্ক ছুটে গিয়ে ধরে ফেললে ক্ষপণক সহসা এক তক্ষকের রূপ ধরে এক গর্তের মধ্যে চলে যায়। উত্তঙ্ক তখন হাতের লাঠি দিয়ে গর্ত খুঁড়তে থাকেন। এদিকে ইন্দ্রের আদেশে বজ্র এসে এই লাঠির প্রান্তে অধিষ্ঠিত হয়। ফলে নাগলোক পর্যন্ত পথ কাটা হয়ে যায়। নাগ-লোকে গিয়ে উত্তঙ্ক নাগেদের স্তব করতে থাকেন কিন্তু তবুও তক্ষকের দেখা পান না। সেখানে দেখেন দুটি মহিলা সাদা ও কালো সুতা দিয়ে তাঁত বুনছে এবং ছয়টি বালক/কুমার বারটি অর যুক্ত একটি চাকা ঘোরাচ্ছে। এ ছাড়া একটি সুদর্শন পুরুষ ও একটি ঘোড়া রয়েছে। উত্তঙ্ক এঁদেরও স্তব করলে পুরুষটি বর চাইতে বলেন। উত্তঙ্ক নাগেদের বশ করতে পারার বর চান। পুরুষটি তখন ঘোড়াটির গুহ্যদেশে উত্তঙ্ককে ফুঁ দিতে বলেন। অন্য মতে অশ্বরূপধারী অগ্নি উত্তঙ্ককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সে কি চায় এবং অশ্বই বলেছিল তার নাকে ফুঁ দিতে। ফুঁ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার পথে সধূম অগ্নিশিখা বার হয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। নাগ-লোকে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তক্ষক তখন কুণ্ডল ফেরৎ দেন। নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ ঐ দিনই গুরুপত্নীকে কুণ্ডল দেবার কথা; উত্তঙ্ক বিমূঢ় হয়ে পড়লে পুরুষটির উপদেশে ঐ ঘোড়াটিতে চড়ে ফিরে আসেন। গুরুপত্নী উত্তঙ্কের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন; শাপ দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় কুণ্ডল পেয়ে যান। সমস্ত কাহিনী শুনে গুরু বলেন মহিলা দুজন ধাতা ও বিধাতা, সাদা ও কালো সুতা হচ্ছে দিন ও রাত; ছয় কুমার হচ্ছে ছয়টি ঋতু এবং চাকাটি বৎসর, বারটি অর বারটি মাস; পুরুষ ইন্দ্র এবং ঘোড়াটি অগ্নি। পথে বৃষারূঢ় পুরুষটিও ঐরাবতের পিঠে ইন্দ্র; পুরীষ অমৃত। এই অমৃতের জন্যই উত্তঙ্কের নাগলোকে কোন ক্ষতি হয় নি। ইন্দ্র তাঁর সখা বলে উত্তঙ্ককে এইভাবে সাহায্য করেছেন। উত্তঙ্ক তারপর স্বগৃহে ফিরে এসে হস্তিনাপুরে গিয়ে তক্ষকের ওপর প্রতিশোধ নেবার আশায় জন্মেজয়কে সর্পযজ্ঞ করতে পরামর্শ দেন এবং সর্প যজ্ঞ আরম্ভ করেন।

বৃদ্ধ বয়সে উত্তঙ্ক মন্দির পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন। সৌভীর দেশে গুলিক নামে এক ব্যাধকে দেখেন এক বিষ্ণু মন্দিরের চূড়া থেকে স্বর্ণফলক চুরি করতে চেষ্টা করছে। গুলিক উত্তঙ্ককে হত্যা করবার চেষ্টা করে কিন্তু উত্তঙ্কের উপদেশে নিরস্ত হয় এবং ভয়ে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। উত্তঙ্ক মৃত দেহে গঙ্গা জল ছিটিয়ে দিলে ব্যাধ বৈকুণ্ঠে চলে যায়। বিষ্ণুর উপদেশে উত্তঙ্ক বদরিকাশ্রমে তপস্যা করে বৈকুণ্ঠে যান।

অন্য মতে অহল্যার স্বামী গৌতমের ভৃগুবংশীয় শিষ্য। গৌতম একে সবচেয়ে ভাল বাসতেন এবং এঁকে আশ্রম ত্যাগ করতে দেন নি। একদিন বন থেকে সমিধ নিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলে গুরুকন্যা এঁর কষ্ট দেখে কেঁদে ফেলেন। গুরু তখন উত্তঙ্ককে প্রশ্ন করলে শিষ্য বলেন অন্য শিষ্যেরা অধ্যয়ন শেষে বাড়ি ফিরে গেছে; আর তার চুল পেকে গেল বাড়ি ফিরতে পারল না। এই জন্য তার মনোকষ্ট। গৌতম তখন বাড়ি যাবার অনুমতি দেন; বর দিয়ে ১৬ বছর বয়স করে দেন এবং নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেন। উত্তঙ্ক তখন গুরু দক্ষিণা দিতে চান। গৌতম বা অহল্যা কিছুই চা'ন না। কিন্তু উত্তঙ্কের পীড়াপীড়িতে অহল্যা শেষকালে নর মাংসভোজী রাজা সৌদাসের স্ত্রীর কুণ্ডল গুরুদক্ষিণা হিসাবে চান। উত্তঙ্ক তখনই বার হয়ে পড়েন। গৌতম জানতে পেরে শিষ্যকে সৌদাসের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বনের মধ্যে রাজা সৌদাসের সঙ্গে দেখা হলে রাজা উত্তঙ্ককে খেতে আসেন। উত্তঙ্ক মিনতি করে সব কথা বলেন এবং সময় চান গুরুদক্ষিণা দিয়ে ফিরে এলে সৌদাস যেন তাকে খায়। রাজা তখন স্ত্রী মদয়ন্তীর কাছে উত্তঙ্ককে পাঠিয়ে দেন। মদয়ন্তী অভিজ্ঞান চান সত্যই সৌদাস পাঠিয়েছেন কিনা। কারণ দেবতা (দেবাশ্চ, যক্ষাশ্চ, মহোরগাশ্চ) ইত্যাদি অনেকের এই কুণ্ডলের প্রতি লোভ আছে: এমন কি মাটিতে রাখলে সাপে নিয়ে পালাবে। উত্তঙ্ক তখন ফিরে গিয়ে অভিজ্ঞান আনলে রাণী কুণ্ডল দিয়ে দেন। ফেরবার সময় পুঁটলিতে বাঁধা কুণ্ডল গাছে ঝুলিয়ে রেখে বেল গাছে উঠে বেল খেতে থাকেন। এই সময় কুণ্ডল দৈবাৎ মাটিতে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি সাপ এটি নিয়ে কাছেই একটি বল্মীক ঢিপিতে লুকিয়ে পড়ে।

গাছ থেকে নেমে উত্তঙ্ক ৩৫-দিন ধরে ঢিপি খুঁড়তে থাকেন; ইন্দ্র তখন বজ্রকে পাঠিয়ে দিলে পাতাল পর্যন্ত পথ করে উত্তঙ্ক নেমে যান। পাতালে একটি কালো ঘোড়া, কেবল লেজ সাদা; দেখতে পান। ঘোড়া উত্তঙ্ককে তার গুহ্য দেশে ফুৎকার দিলে বলে, নাগলোক অগ্নি শিখাতে ভরে যায়; সাপেরা কুণ্ডল ফিরিয়ে দেয়।

উত্তঙ্ক একবার দ্বারকাতে এসে কুরুপাণ্ডবদের একটা মিটমাট না করে দেবার জন্য কৃষ্ণকে শাপ দিতে যান। কৃষ্ণ তখন বিশ্বরূপ দেখিয়ে উত্তঙ্ককে বুঝিয়ে শান্ত করেন এবং বর দেন যে কোন জায়গায় এমন কি মরুভূমিতেও কৃষ্ণকে স্মরণ করলেই উত্তঙ্ক সেখানে জল পাবেন।

একবার মরুভূমিতে ঘুরতে ঘুরতে তৃষ্ণার্ত উত্তঙ্ক কৃষ্ণকে স্মরণ করলে কাদা

মাথা, নগ্ন দেহ এক চণ্ডাল অনেকগুলি কুকুর নিয়ে সামনে এসে জল দিতে চান এবং এই জল খেতে বার বার অনুরোধ করেন। কিন্তু উত্তঙ্ক খেতে রাজি না হলে চণ্ডাল অন্তর্হিত হয়ে যান এবং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কৃষ্ণ দেখা নিয়ে উত্তঙ্ককে তিরস্কার করে জানান তিনি স্বয়ং ইন্দ্রকে অমৃত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। ইন্দ্র নিজের খুসি মত চণ্ডাল বেশ ধরে এসেছিলেন। কৃষ্ণ বর দেন উত্তঙ্ক অমৃত প্রত্যাখ্যান করেছেন; কিন্তু এরপর মরুভূমিতে উত্তঙ্ক-মেঘ দেখা দেবে এবং মিষ্টি জল মিলবে। সেই থেকে উত্তঙ্ক-মেঘ বৃষ্টি দিয়ে আসছে। দ্রঃ-ধুন্দুমার। কুবলাশ্ব।

উত্তম—স্বায়ম্ভুব মনুর দ্বিতীয় ছেলে উত্তানপাদ। উত্তানপাদ রাজার স্ত্রী সুরুচি, ছেলে উত্তম; অন্য রাণী সুনীতি ছেলে ধ্রুব। সুনীতি ও ধ্রুবকে রাজা অনাদর করতেন। এই জন্য ধ্রুব বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মপদ লাভ করেন। একদিন মৃগয়া কালে বনের মধ্যে এক যক্ষের হাতে উত্তম নিহত হন। পুত্রের খোঁজে দাবদাহে সুরুচি ও মারা যান। (২) স্বায়ম্ভুব মনুর ছেলে রাজা প্রিয়ব্রত। প্রিয়ব্রতের স্ত্রী বর্হিষ্মতী; ছেলে তৃতীয় মনু উত্তম। উত্তম মনুর ছেলে অজ, পরশুদীপ্ত ইত্যাদি। এঁর রাজত্বকালে ইন্দ্র সুশান্তি; পাঁচদল দেবতা: সুধামন, সত্য, জপ, প্রতর্দন, ও শিব/বশবর্তী। প্রতি দলে ১২ জন দেবতা। বশিষ্ঠের স্ত্রী উর্জার সাত ছেলে সপ্তর্ষি:-রজস্, গোত্র, উর্দ্ধবাহু, সবন, অনঘ, সুতপ, শুক্র। (৩) ২১-তম দ্বাপরে ব্যাসের নাম।

উত্তমসাহস—বেদত্রয় বেত্তা, রাজা ও দেবতাকে গালি দিলে উত্তম-সাহস অর্থাৎ সর্বোচ্চ দণ্ডের (১৮০,০০০ পণ মুদ্রা) বিধান ছিল।

উত্তমৌজা—(১) মনুর ছেলে; দশম মন্বন্তরাধিপ। (২) পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদের একটি ছেলে; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে রাত্রি বেলা অশ্বত্থামার হাত নিহত হন।

উত্তর—ভূমিঞ্জয়। মৎস্যরাজ বিরাটের ছেলে। মা সুদেষ্ণা। বড় ভাই শঙ্খ; বোন উত্তরা। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে পিতার সঙ্গে ছিল। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের শেষ মুহূর্তে বিরাট রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে সুশর্মাকে এবং উত্তরাঞ্চলে ভীষ্ম ও দ্রোণকে গোধন হরণের জন্য দুর্যোধন পাঠান। বাধা দিতে গিয়ে সুশর্মার হাতে বিরাট বন্দী হন। ভীষ্মদের বিরুদ্ধে অর্জুনকে সারথি নিয়ে উত্তর যুদ্ধে যান কিন্তু শত্রুসৈন্যবাহিনী দেখে ভয়ে পালাতে চেষ্টা করেন। অর্জুন তখন আত্মপরিচয় না দিয়ে উত্তরকে সারথি করে যুদ্ধ করে ভীষ্ম ও দ্রোণকে বিতাড়িত করেন। কুরুক্ষেত্রে শল্যের হাতে নিহত হন।

উত্তরকুরু—হিমালয়ের উত্তরে প্রাচীন দেশ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮।২৩) বলা হয়েছে দেবভূমি এবং মানুষের অজেয়; অর্থাৎ বাস্তব একটি দেশ। পরবর্তী কালে অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারতের যুগে কাল্পনিক দেশে পরিণত হয়েছিল। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে দেশটি ভারতের বহু উত্তরে এবং এর উত্তর সীমায় সমুদ্র। জাতক অনুসারে হিমালয়ে অবস্থিত। অন্য মতে কাশগড়ের পূর্বস্থিত দেশ। আর এক মতে পামির মালভূমির বেলুর তঘ নামক পর্বতশ্রেণীর যে ঢালু অঞ্চলে বড় বড় নদীগুলি উৎপন্ন

হয়েছে সেই অঞ্চল। এই বেলুর তঘ পশ্চিম তিব্বতের উত্তরসীমা এবং অপর নাম কিউনলুন, কারাকোরাম, হিন্দুকুশ বা সুন্‌লুং। একটি মতে উত্তরকুরু বংশীয়েরা কাশ্মীরে বসতি স্থাপন করেন এবং পরে কুরুক্ষেত্রে বসবাস করতে যান।

জম্বুদ্বীপের একটি অংশ। অন্য নাম কুরুবর্ষ। সুমেরুর উত্তরে ও নীল পর্বতের দক্ষিণে এই উত্তরকুরু অবস্থিত; আর্যদের আদি বাসভূমি। এখানে গাছে ফল ও সুগন্ধ ফুল এবং ক্ষীরী গাছে দুধ পাওয়া যায়। এখানে কল্পবৃক্ষও রয়েছে। মাটিতে সোনা ও মণিমুক্তা ছড়ান। স্বর্গ থেকে পতিত হলে এখানে বাস করে। এখানে ভারুণ্ড পাখী রয়েছে, এরা মৃত দেহ পেলে গুহার মধ্যে সরিয়ে নিয়ে যায়। অন্য মতে মেরুর দক্ষিণে শৃঙ্গীপর্বতের অপর পাশে দেবগণের বাসস্থান। মন্দাকিনী নদী ও চৈত্ররথ বন এখানে রয়েছে। সপ্তর্ষিরা থাকেন। অর্জুন এখানে এসে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করেছিলেন।

উত্তরকোশল—অযোধ্যার অন্তর্গত সরযূ নদীর উত্তরস্থ দেশ। এখানকার প্রাচীন রাজধানী শ্রাবস্তী, ইরাবতী নদীর তীরে। শ্রাবস্তীর দক্ষিণে বর্তমান বলরামপুর।

উত্তরপাঞ্চাল—রাজা পৃষত মারা গেলে দ্রুপদ (মহা ১।১২১।১০) এখানে রাজা হন। পরে দেশটি দ্রোণের অধিকারে আসে।

উত্তর ফাল্গুনী—বিটা লিয়োনিস্। অশ্বিনী আদি অন্তর্গত ১২শ নক্ষত্র। দুটি তারকা বিশিষ্ট; এর দেবতা অর্যমা।

উত্তর ভাদ্রপাদ—গামা পেগাসি। অশ্বিনী ইত্যাদি ২৭ নক্ষত্রের মধ্যে ২৬ নক্ষত্র। ৮টি তারকা যুক্ত; পর্যঙ্ক সদৃশ।

উত্তরমানস—মানস তীর্থ।

উত্তরমীমাংসা—বেদান্ত। পঞ্চাঙ্গ ন্যায়ের বিচার। ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে ব্রহ্মনির্ণয় মূলক যে সব তত্ত্ব আছে তাদের সমন্বয় করা।

উত্তরসাধক—তন্ত্রোক্ত শব সাধনায় সাধকদের পেছনে থেকে যে সাহায্য করে ও সাহস দেয়।

উত্তরা—বিরাটের স্ত্রী সুদেষ্ণার মেয়ে। অজ্ঞাত বাস কালে অর্জুন বৃহন্নলা নামে ক্লীব সেজে উত্তরাকে নাচ-গান শেখাতেন। অর্জুনকে সারথি করে উত্তর (দ্রঃ) যখন যুদ্ধে যান তখন, উত্তরা পুতুল খেলবে বলে, পরাজিত কুরুবীরদের গা থেকে দামী বস্ত্রাদি সংগ্রহ করে আনেন। অর্জুনের পরিচয় পেয়ে বিরাট রাজ অর্জুনের সঙ্গে এর বিয়ে দিতে চান। কন্যা স্থানীয় শিষ্যাকে বিয়ে করতে অসম্মত হওয়াতে উত্তর অভিমন্যুর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করেন এবং বিয়ে হয়। উপপ্লব্য নগরে উত্তরার বিয়ে হবার সময় একজন ব্রাহ্মণ এসে বলেছিলেন উত্তরার সন্তান গর্ভে থাকা কালীন 'পরীক্ষিত' হবে এবং নাম হবে পরীক্ষিৎ (দ্রঃ)। অভিমন্যু যখন মারা যান কৃষ্ণ তখন গর্ভবতী উত্তরাকে সান্ত্বনা দেন। অশ্বত্থামা (দ্রঃ) উত্তরার এই গর্ভস্থ সন্তানকে নিহত করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র যখন বনে যান তখন উত্তরা সঙ্গে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে এসে ছিলেন।

উত্তরাখণ্ড—উত্তরভারতে হিমালয় পর্বতমালার মধ্যে গাড়ওয়াল ইত্যাদি জায়গা।

উত্তরায়ণ—মাঘ থেকে আষাঢ় ছয় মাস। দেবতাদের দিন; অসুরদের রাত। সূর্য এই সময়ে বিষুব রেখার উত্তরে অবস্থিত।

উত্তরাষাঢ়া—টাউ সাজিটারি। চারটি তারা। কুলার মত। এদের দেবতা বিশ্ব। দ্রঃ আষাঢ়।

উত্তরাসঙ্গ—সন্ন্যাসীদের পরিধেয় উত্তরীয়। মঠের ভেতরে ও বাইরে ব্যবহার্য। ত্রি-চীবরের একটি।

উত্তরাস্য—শাস্ত্রমতে দান গ্রহণ করার সময় উত্তর দিকে মুখ করে বসা।

উত্তানপাদ—স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার ছেলে। স্ত্রী সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতির ছেলে ধ্রুব, কীর্তিমান, আয়ুষ্কাল, ও বসু। সুরুচির ছেলে উত্তম। সুরুচির অনুরক্ত রাজা সুনীতি ও ধ্রুবকে (দ্রঃ) বনে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। পরে অনুতাপে এই ধ্রুবকে সমস্ত রাজ্য দিয়ে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। উত্তানপাদের বোন আকূতি (দ্রঃ)।

উত্থানএকাদশী—যে তিথিতে বিষ্ণুর ঘুম ভাঙে। কার্তিক মাসে শুক্লা একাদশী।

উৎপত্তিক্রম—প্রত্যক্ষ রূপ ব্রহ্ম থেকে আত্মা>আকাশ>বায়ু>অগ্নি>জল>পৃথিবী ওষধি>অন্ন>পুরুষ ইত্যাদি ক্রমশ উৎপন্ন হয়েছে (তৈত্তিরীয়)।

উৎপবন—প্রাদেশ প্রমাণ দুটি কুশ দিয়ে নেড়ে দ্রব্যাদি শুদ্ধি করা।

উৎপলবংশ—৯ম-শতকের মধ্যভাগে কর্কোট বংশের পতনের পর কাশ্মীরে অবন্তীবর্মা (৮৫৫-৮৩ খৃঃ) যে বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। মহাপদ্মহ্রদের বন্যা নিবারণ করে বহু জমি চাষের উপযোগী করে তোলেন। অবন্তীবর্মা বিদ্যোৎসাহী। ছেলে শংকর বর্মা রাজা হয়ে পাশে কয়েকটি রাজ্য জয় করেন কিন্তু পরে বিদ্রোহী প্রজাদের হাতে নিহত হন।

উৎসদ—প্রতি মহানরকের চতুর্দ্বারে চারটি করে উৎসদ নামে ১৬টি নরক। অর্থাৎ বৌদ্ধ অষ্ট মহানরকের প্রত্যেকের ১৬টি করে উপনরক আছে।

উৎসব—মন্দিরে প্রাচীনকালে যে সমারোহ করা হত। মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলে অবশ্য করণীয়। বিগ্রহ স্থাপন করার পর ১-রাত, বা ৩-দিন, বা ৭-দিন ধরে এই উৎসব করণীয়। উৎসবের সময় অঙ্কুরবীজ বপন, ও বাদ্য-নৃত্যগীত একান্ত প্রয়োজন।

উৎসবসংকেত—হিমালয় বাসী জাতি। সপ্তগণে বিভক্ত। এদের বিবাহ প্রথা নাই। সঙ্কেত দিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে নারীপুরুষ মিলিত হয়।

উদপান—গৌতমের তিন ছেলে একত, দ্বিত ও ত্রিত (দ্রঃ-অগ্নি)। ছেলেদের পিতৃ-ভক্তিতে গৌতম অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। একটি যজ্ঞ করে গৌতম স্বর্গে যান। এই যজ্ঞে রাজা ও পুরোহিত যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই ত্রিতকে সম্মান দিয়ে প্রণাম করলে দুই ভাইয়ের পছন্দ হয় না। তিন ভাই তারপর অনেকগুলি যজ্ঞ করে বহু গরু সংগ্রহ করে পূর্ব দিকে যাত্রা করেন; ত্রিত আগে আগে যাচ্ছিলেন; পেছনে একত ও দ্বিত পরামর্শ করে গরু নিয়ে অন্য দিকে চলে যান। ত্রিত একা এগিয়ে যেতে যেতে সরস্বতী তীরে একটি নেকড়ে বাঘ দেখে ভয়ে এক জলহীন কূপের মধ্যে পড়ে যান। কূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সোমরস যোগে বেদ পাঠ করে

যজ্ঞ করেন। স্বর্গে বৃহস্পতি এবং দেবতারা বেদপাঠ শুনে ত্রিতকে বর দিতে আসেন। ত্রিত কূপ থেকে উদ্ধার পাবার পর বর চান। সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীর জলে কূপ ভরে যায় ত্রিত ওপরে উঠে আসেন। এবং বাড়ি ফিরে এসে দুই ভাইকে শাপ দিয়ে বৃকতে এবং এঁদের সন্তানদের বাঁদর ইত্যাদিতে পরিণত করেন। স্থানটি সেই সময় থেকে উদপান তীর্থ নামে পরিচিত।

উদয়গিরি—এখান থেকে সূর্য প্রতিদিন আকাশে ওঠে। ২০°৩৮´উ×৮৬°১৬´পূ। একটি তীর্থ স্থান। ছোট পাহাড়। কটক জেলায়। কটক থেকে ৫১'৫ কি-মি। অর্দ্ধ চন্দ্রের মত পূব দিকে বাঁকান; উত্তল দিক পশ্চিমে। উচ্চতা ৭৮ মি। কাছেই বিরূপা নদী।

এখানে বুদ্ধ, জটামুকুট, লোকেশ্বর, জম্ভল প্রভৃতি বৌদ্ধমূর্তি ও একশিলা উদ্দেশিকস্তূপ রয়েছে। আনুমানিক দশম-একাদশ শতকে রাণক ব্রজনাগ যে শৈলখাত সোপান যুক্ত বাপী তৈরি করে দিয়েছিলেন সেটি এখনও প্রায় অক্ষত আছে। এখানে একটি পূর্ণ অবয়ব চতুঃশালা সংঘারাম ছিল। এই সংঘারামের একটি প্রকোষ্ঠের পেছনের দেওয়ালের সংলগ্ন ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় আসীন বুদ্ধদেবের সুন্দর একটি প্রতিমা আছে। এই সংঘারামের প্রবেশিকা সংলগ্ন দেওয়ালের শোভাবর্দ্ধন-কারী অনবদ্য গঙ্গামূর্তি (সপ্তম-অষ্টম শতক) বর্তমানে পাটনায় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে। এই মূর্তিটির দোসর যমুনা মূর্তিটি এখানেই একটি অর্বাচীন মন্দিরে ব্রাহ্মণ্য দেবীরূপে পূজিত হন। একটি ইষ্টক নির্মিত আংশিক প্রকট স্তূপের দুদিকে দুটি বুদ্ধ বিগ্রহ উদয়গিরির ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। চারদিকে আরো বহুমূর্তি ছড়ান আছে। লোকেশ্বরের একটি বৃহৎ বিগ্রহের পিঠে সুদীর্ঘ ধারণী উৎকীর্ণ রয়েছে; অর্থাৎ নবম-দশম শতকে এই প্রতিষ্ঠানটি বজ্রযান সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। পাহাড়ের পশ্চিম গায়ে একটি প্রাকৃতিক গুহার পাশে কয়েকটি বৌদ্ধ দেবদেবীর সুন্দরমূর্তি খোদিত রয়েছে। এখান থেকে ৫ কি-মি দক্ষিণে ললিতগিরি। একটি মতে উদয়গিরি অথবা ললিতগিরি হচ্ছে হিউ-এন-ৎসাঙ বর্ণিত উ-তু (ওড্র) দেশের বিখ্যাত বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান পুষ্পগিরি।

উদয়গিরি-খণ্ডগিরি—২০°১৬´উ×৮৫°৪৭´পূ। বালি পাথরের দুটি পাহাড়। খণ্ডগিরি ৩৮-মি উচ্চ; পূ-উত্তরে উদয়গিরি ৩৪-মি উচ্চ। এখানে হস্তী গুম্ফাতে শিলালেখে রাজা খারবেলের বিজয়যাত্রা ও জৈন ধর্মের সমর্থনের বিবরণ রয়েছে। খারবেল (খৃ-পূ ১ম-শতক) তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের বংশে কূদেপ ও বড়ুখ এখানে নানা গুহা তৈরি করে দিয়েছিলেন। গণেশ গুম্ফাতে (খৃ অষ্টম-নবম শতকে) ভৌম রাজবংশের শান্তিকরদেবের সময়কার একটি লেখ আছে। এখানে দর্শনীয় খাত গুহা উদয়গিরিতে ১৮টি; খণ্ডগিরিতে ১৫টি। রাণীগুম্ফা খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের এবং সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সাজান। এটি দ্বিতলগুহা। রাণীগুম্ফা, মঞ্চপুরী, স্বর্গপুরী, গণেশগুম্ফা এগুলি উদগত চিত্রে সজ্জিত এবং সমসাময়িক মধ্য-দেশের শৈলী প্রতিফলিত হয়েছে। শিল্পমান খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ভারতের শিল্পকৃতি থেকে উচ্চস্তরের এবং

খৃষ্টপর্ব প্রথম শতকের সাঁচীর সঙ্গে তুলনীয়। এখানে উৎখননের সময় ক্ষুদ্রাশ্ম ও নবাশ্ম হাতিয়ার পাওয়া গেছে।

উদয়ন—(১) পুরু (কুরু বা ভরত) বংশের রাজা। বুদ্ধদেবের জীবিতকালে ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম বৎসরাজ্যের রাজা; রাজধানী কৌশাম্বী। অবন্তীরাজ চণ্ড প্রদ্যোতের মেয়ে বাসবদত্তাকে হরণ করে এনে বিয়ে করেন। উদয়ন তাঁর আধিপত্য ভর্গরাজ্যেও বিস্তার করেছিলেন; দেশের প্রভূত উন্নতি করেছিলেন এবং প্রথমে বিরূপ থাকলেও পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এক ছেলের নাম রেখেছিলেন বোধি। উদয়নের পর বৎসরাজ্য সম্বন্ধে কোন বিশেষ তথ্য মেলে না। স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রিয়দর্শিকা, ও রত্নাবলী তিনটি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের নায়ক উদয়ন। দ্রঃ কুরু, কৌশাম্বী, সহস্রানীক, অলম্বুষা (২) অগস্ত্য মুনি, (৩) অবন্তীরাজ।

উদয়প্রভসূরি—জৈন কবি, টীকাকার। ত্রয়োদশ শতাব্দী। ধবলকের (বর্তমান ধোল্কা) রাজা বীরবলের আমাত্য বস্তুপাল এঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এঁর জন্য দূরদূরান্ত থেকে বস্তুপাল পণ্ডিতদের আনিয়ে এঁর শাস্ত্রশিক্ষা পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। ধর্মাভ্যুদয় বা সংঘপতিচরিত্র (১২২১ খৃঃ মত) উদয়প্রভসূরি রচিত মহাকাব্য। নেমিনাথ চরিত নামে আর একটি গ্রন্থ আছে এবং এটি অবশ্য সংঘপতিচরিত্রেরই অংশ। সুকৃত-কীর্তি-কল্লোলিনী ও বস্তুপালস্তুতি নামে দুটি প্রশস্তি কাব্য ও আরম্ভসিদ্ধি নামে একটি জ্যোতিষগ্রন্থও তাঁর রচনা। 'উবএসমালা' গ্রন্থের টীকা কর্ণিকা ও উদয়প্রভসূরির তৈরি। স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী রচয়িতা মল্লিষেন উদয়প্রভসূরির শিষ্য।

উদান—(১) বেদান্তে কণ্ঠদেশের উৎক্রমণ বায়ু। কণ্ঠস্থিত বায়ু। প্রাণ, অপান আদি পঞ্চবায়ুর একটি। এই বায়ু জীবকে বাঁচিয়ে রাখে।

উদান—(২) সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের তৃতীয় গ্রন্থ। বুদ্ধের উদাত্তবাণীর সংকলন; আটটি বর্গে বিভক্ত এবং প্রতি বর্গে দশটি করে সুত্ত। সুত্তগুলিতে প্রথম বুদ্ধের সময়ের এক একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং শেষে বুদ্ধের একটি উক্তি জোড়া আছে। এই উক্তি বা উদান সাধারণত ত্রিষ্টুভ্ বা জগতী ছন্দে রচিত এবং এগুলিতে বৌদ্ধের জীবনাদর্শ, অর্হতের মানসিক শান্তি, নির্বাণ ইত্যাদির মহিমা বলা হয়েছে। সুত্তের গল্পগুলি থেকে উদানগুলি প্রাচীন; এবং সম্ভবত বুদ্ধ বা তাঁর প্রাচীন শিষ্যদের বাণী।

উদাবৎসর—বর্ষপঞ্চকের মধ্যে একটি বৎসর।

উদাবসু—জনক বংশে একজন রাজা।

উদাসী—গুরু নানক প্রবর্তিত শিখ ধর্মকে আশ্রয় করে যে সকল সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে প্রাচীনতম একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়।

উদীচ্য—সরস্বতী নদীর উত্তর পশ্চিম স্থিত দেশ। অন্য নাম উদগ্-দেশ।

উদ্গাতা—সামবেদ গায়ক।

উদ্গীথ—(১) প্রণব। (২) সামবেদের দ্বিতীয় অধ্যায়।

উদ্দক-রামপুত্ত—সংসার ত্যাগের পর গৌতম যাঁদের কাছে শিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন

তাঁদের শেষতম হচ্ছেন উদ্দক রামপুত্ত। মহাবস্তু ইত্যাদি গ্রন্থে এঁর নাম উদ্রক। উদ্দক কোন নতুন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন নি। উদ্দকের পিতা রাম ধ্যানমার্গে যে সমাধি লাভের তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন সেই না-সংজ্ঞা না-অসংজ্ঞা অবস্থা গৌতমকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ধ্যানমার্গের অষ্টাঙ্গ সমাধির শেষ অঙ্গ বলে এটি পরিচিত। এই নতুন জ্ঞান গৌতমের কাছে সম্পূর্ণ মনে হয়নি ; তিনি তখন উদ্দকের কাছ থেকে চলে যান ; কিন্তু উদ্দককে তবু গভীর শ্রদ্ধা করতেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম বুদ্ধ চিন্তা করতে থাকেন যে তাঁর এই নতুন জ্ঞান (সঞ্‌ঞা বেদযিত নিরোধ) উপলব্ধি করবার মত উপযুক্ত ব্যক্তি কে হতে পারে এবং এই জ্ঞান প্রচার করার জন্য কে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন। এই সময়ে প্রথমে আলার-কালাম (দ্রঃ) ও পরে উদ্দকের কথা তাঁর মনে হয়। কিন্তু উদ্দক ইতিমধ্যে মারা গিয়েছিলেন।

সব রকম পাপের মূল উৎপাটন করে সব কিছু জয় করতে পেরেছি বলে উদ্দক যে দাবি করতেন বুদ্ধের মতে এ দাবি অযৌক্তিক। রাজা এলেয্য ও তাঁর দেহরক্ষী ইত্যাদি সকলেই উদ্দকের ভক্ত ছিলেন।

উদ্দালক—(১) অরুণ ঋষির ছেলে আরুণি (দ্রঃ)। রাজর্ষি অশ্বপতির কাছে ব্রহ্মবিদ্যা পান। গুরু আয়োদ্‌-ধৌম্যের দেওয়া নাম উদ্দালক। বা উদ্দাল গাছের নীচে গর্ভস্থ হয়েছিলেন বলে নাম উদ্দালক। ইন্দ্রের সভায় বিশেষ সভাসদ। উদ্দালকের ছেলে শ্বেতকেতু ; মেয়ে সুজাতা। প্রিয় শিষ্য কহোড়ের (দ্রঃ) সঙ্গে সুজাতার বিয়ে দিয়েছিলেন, ছেলে হয়েছিল অষ্টাবক্র। জন্মেজয় আরুণিকেও একজন পুরোহিত নিযুক্ত করেছিলেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে উপশম প্রকরণের এঁর তপস্যা ও সিদ্ধি লাভের কথা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। উদ্দালক ও শ্বেতকেতুর সামনে একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে শ্বেতকেতুর মার কাছে সঙ্গম কামনা জানিয়ে জোর করে তাঁর হাত ধরে নিয়ে যান। শ্বেতকেতু এতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে উদ্দালক বোঝাতে চেষ্টা করেন এটা জীবনের ধর্ম ; স্ত্রীরা গাভীদের মতই অরক্ষিত। কিন্তু শ্বেতকেতু শান্ত হন না এবং দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে নিয়ম করেন স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের সংসর্গ করবে না। পতিব্রতা ও ব্রহ্মচারিণী স্ত্রীকে ত্যাগ করে স্বামী অন্য স্ত্রীতে যেন আসক্ত না হয়। এবং স্বামীর নির্দেশ মত স্ত্রী ক্ষেত্রজ সন্তানে যেন আপত্তি না করে। এই নিয়ম যাঁরা মানবেন না তাঁরা ভ্রূণ হত্যার পাপে পাপী হবেন। শ্বেতকেতু ব্রাহ্মণদের ঘৃণা করতেন বলে উদ্দালক এঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সরস্বতী নদীকে একবার স্মরণ করা মাত্র নদী এঁর যজ্ঞ স্থলে এসে উপস্থিত হয়েছিল।

উদ্দালক—(২) অপর নাম উদ্দালকি। আর একজন মুনি। একবার আশ্রমে ফিরে এসে মনে পড়ে ফুল কমণ্ডলু ইত্যাদি সব কিছু নদীতে ফেলে রেখে এসেছেন। ছেলে নচিকেতাকে এগুলি আনতে পাঠান। কিন্তু ছেলে এসে দেখে জলে সব ভেসে গেছে। নচিকেতা এই কথা জানালে মুনি শাপ দেন, নচিকেতা তৎক্ষণাৎ মারা যান। মুনি তখন শোকে অশ্রুপাত করতে থাকলে তাঁর চোখের জলের স্পর্শে ছেলে আবার জীবিত হয়ে ওঠে। মুনি তখন ছেলের কাছে যমলোকের বিবরণ শোনেন।

উদ্ধব—অপর নাম দেবশ্রবা। কৃষ্ণের সখা ও সচিব ও পরম ভক্ত। একজন যাদব। সাত্যকির ছেলে। বৃহস্পতির শিষ্য। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বৃষ্ণিদের মন্ত্রী। উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগ, কর্মত্যাগ ইত্যাদি বহু উপদেশ দিয়েছিলেন। কংসকে বধ করে উগ্রসেনকে রাজা করে দিয়ে কৃষ্ণ যখন মথুরাতে বাস করছিলেন তখন কৃষ্ণের নির্দেশে এই উদ্ধব গোকুলে এসে নন্দ, যশোদা ও গোপীদের কৃষ্ণের খবর দেন। সকলে ঘিরে ধরে কৃষ্ণের খবর শুনতে থাকেন। উদ্ধব অনেক তত্ত্বজ্ঞানও দান করেছিলেন এই সময়। এঁদের দেওয়া উপহার উদ্ধব মথুরাতে কৃষ্ণকে এনে দিয়ে ছিলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতে ছিলেন। রৈবত পাহাড়ে বন ভোজনেও গিয়েছিলেন। সুভদ্রার বিয়ের যৌতুক নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছিলেন। শাম্ব দ্বারকা অবরোধ করলে ইনি দ্বারকা রক্ষা করেন। একবার এঁকে শ্রীকৃষ্ণ বদরিকাশ্রমে গিয়ে ফলমূল খেয়ে জীবন যাপন করতে এবং অলকানন্দাকে দেখে পাপমুক্ত হতে বলেছিলেন। যদুবংশ ধ্বংসের প্রাক্‌কালে কৃষ্ণ এঁকে কি ঘটবে জানিয়েছিলেন। দ্বারকা ধ্বংস হবার আগে যাদবরা প্রভাসে চলে যান এবং উদ্ধব সকলের কাছে বিদায় নিয়ে নিরুদ্দেশে বার হয়ে পড়েন। একটি মতে ইনি বদরিকাশ্রমে দেহত্যাগ করেন।

উদ্বৎসর—চন্দ্রমাসান্বিত বৎসর।

উদ্বহ—দ্রঃ বায়ু।

উদ্ভট—কাশ্মীর অধিবাসী। কহ্লনের মতে মহারাজ জয়াপীড়ের (৭৭৯-৮১৩ খৃ) সভাপতি। এঁর একটি মাত্র বই 'কাব্যালঙ্কার সার সংগ্রহ' বর্তমানে পাওয়া যায়। উদ্ভটের লেখা 'ভামহ বিবরণ' নামে বিস্তৃত একটি টীকা ছিল এবং এই বইটির সার সংগ্রহ মনে হয় এই কাব্যালঙ্কার সারসংগ্রহ। উদ্ভটের আর একটি বই 'কুমার সম্ভব'। নাট্য শাস্ত্রের ওপরও একটি টীকা লিখে ছিলেন জানা যায়। উদ্ভট ছিলেন ভামহের অনুগামী। তাঁর মতে কাব্যে অলঙ্কারই প্রধান। উদ্ভটের কবিত্ব প্রচুর ছিল। এঁর মতে অনুপ্রাস ত্রিবিধ ও রূপক চতুর্বিধ। কাব্য মীমাংসার ক্ষেত্রে উদ্ভট এক নতুন সম্প্রদায় গড়ে তুলে ছিলেন।

উন্মত্ত—লঙ্কায় রাম রাবণের যুদ্ধে এই রাক্ষস মারা যায়।

উন্মদা—গন্ধর্ব রাজ হংসের সেনাপতি দুর্মদ। পুরূরবার স্ত্রী উর্বশীর ওপর ভীষণ লোভ ছিল। বহুবার উর্বশীকে মনের কথা জানিয়ে ছিলেন কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে ছিলেন। পুরূরবা ও উর্বশী যখন ইন্দ্রের সভাতে ছিলেন তখন একদিন এঁরা রাত্রিতে নন্দন বনে মিলিত হবেন ঠিক করেন। দুর্মদ জানতে পেরে অপ্সরী উন্মদাকে ডাকেন এবং দুজনে মিলে উর্বশী ও পুরূরবার বেশে নন্দন বনে আসেন। প্রকৃত উর্বশী ভুল করে দুর্মদের কাছে যান, পুরূরবারও ভুল হয়। উর্বশীকে সম্ভোগ করার পর দুর্মদ অট্টহাস্যে হেসে ফেলেন। উর্বশী তখন বুঝতে পারেন; ইতিমধ্যে পুরূরবাও এসে হাজির হন। উর্বশী তখন দুর্মদকে শাপ দেন রাক্ষস হয়ে জন্মাতে হবে এবং উন্মদাকে শাপ দেন মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে এবং জীবনে এক জনকে ভালবাসবে কিন্তু বিয়ে হবে অপরের সঙ্গে। পরে এদের প্রার্থনায় করুণা হয় এবং বলেন দুর্মদ উন্মদার

ছেলে হয়ে জন্মাবে এবং স্বামি-পুত্রের মৃত্যুর পর অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মুক্তি পাবে। দুর্মদ শত্রুর তরবারিতে মারা গিয়ে স্বর্গে ফিরে আসবেন। এই শাপের ফলে হিরণ্যপুরের রাজা অসুর দীর্ঘজঙ্ঘের ছেলে হয়ে দুর্মদ জন্মান ; নাম হয় পিঙ্গাক্ষ। উন্মদা বিদেহ রাজের মেয়ে হয়ে জন্মান ; নাম হয় হরিণী।

অসুর পিঙ্গাক্ষ একদিন হরিণীকে দেখে আকাশ পথে উড়িয়ে নিয়ে যান। হরিণী ভীষণ কাঁদতে থাকলে পিঙ্গাক্ষ এঁকে এক বনে ছেড়ে দেন। এই সময় বসুমনস্ নামে এক রাজা এখানে মৃগয়াতে এসে ছিলেন ; পিঙ্গাক্ষকে তিনি হত্যা করেন এবং হরিণীর কাহিনী শুনে জীমূত ঘোড়ায় চড়িয়ে বিদেহে পাঠিয়ে দেন। বিদেহ রাজ আনন্দিত হয়ে বসুমনসের সঙ্গে হরিণীর বিয়ে দিতে চান। কিন্তু নিমন্ত্রিতদের মধ্যে থেকে রাজা ভদ্রশরণ্য হরিণীকে জোর করে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন, ফলে যুদ্ধ হয় এবং বসুমনস্ হেরে যান। কাশীরাজ দিবোদাস ভদ্রশরণ্যকে পরাজিত করেন বটে কিন্তু মুক্তি দেন। ভদ্রশরণ্য হরিণীকে নিয়ে যান এবং বিয়ে করেন এবং দুর্মদ অর্থাৎ পিঙ্গাক্ষ এবার হরিণীর ছেলে হয়ে জন্মায়। এই দুর্মদ বড় হয়ে নিজের খুল্লতাত কন্যা চিত্রাঙ্গীকে গায়ের জোরে বিয়ে করেন এবং একটি সন্তান হয়। এরপর কাশীরাজ দিবোদাসের সঙ্গে যুদ্ধ ভদ্রশরণ্য ও এই দুর্মদের আবার হয় এবং দুজনেই হেরে যান। এরপর অযোধ্যারাজ বসুমনসের সঙ্গে যুদ্ধে ভদ্রশরণ্য ও দুর্মদ দুজনেই মারা যান। হরিণী অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দিয়ে শাপ মুক্ত হন।

উপক—একজন বিখ্যাত আজীবিক (দ্রঃ)।

উপকীচক—মৎস্যরাজ বিরাটের শালা ; কীচকের (দ্রঃ) এরা বাকি ১০৫ ভাই। কালকেয় অসুরের অংশে জন্ম। কীচকের মৃত দেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় সামনে দ্রৌপদীকে পেয়ে তাঁকেও কীচকের সঙ্গে দাহ করবার জন্য এঁরা বেঁধে নিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু দ্রৌপদীর আর্তনাদে ভীম শ্মশানে গিয়ে একটি গাছ তুলে নিয়ে গাছের ঘায়ে সমস্ত ভাইগুলোকে নিহত করে দ্রৌপদীকে মুক্ত করেন।

উপকোশা—উপবর্ষের মেয়ে। বররুচির স্ত্রী।

উপগান—সামবেদীয় ২৩-টি প্রপাঠক সম্বলিত গীতগ্রন্থ।

উপগাহ—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে।

উপগুপ্ত—উত্তরভারত, মধ্য এসিয়া, চীন জাপান ও তিব্বত প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধ সাহিত্যে ও কিংবদন্তীতে উপগুপ্ত একজন বিখ্যাত পুণ্যচরিত সংঘস্থবির। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এসিয়াতে বৌদ্ধ শাস্ত্রে উপগুপ্তের নাম নেই। কিন্তু বর্মাতে লোকশ্রুতিতে উপগুপ্ত একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। মথুরায় (মতান্তরে বারাণসীতে একজন গুপ্ত নামধেয় গান্ধিকের (গন্ধদ্রব্য ব্যবসায়ীর) তৃতীয় ছেলে। বুদ্ধের নির্বাণ লাভের প্রায় ১০০ বছর পরে জন্ম। উপগুপ্তের বড় ভাই অশ্বগুপ্ত, মেজভাই ধনগুপ্ত। প্রথমে পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করেন। পরে মথুরাতে উরুমুণ্ড পাহাড়ে অবস্থিত নটভটিক বিহারবাসী অর্হৎ শাণবাস এঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন। উপগুপ্তের বয়স তখন সতের। দীক্ষা গ্রহণের তিন বৎসর পরে উপগুপ্ত অর্হৎ হন, এবং নাম হয়

অলক্ষণক (বিশিষ্ট শরীর লক্ষণ বিরহিত) বুদ্ধ। লামা তারানাথের মতে উপগুপ্তের দীক্ষাগুরুর নাম অর্হৎ যশস্‌ বা যশেথ। শাণবাসের মৃত্যুর পর উপগুপ্ত সংঘের সর্বোচ্চ স্থবিরের পদ পান এবং নটভটিক সংঘে বাস করতে থাকেন। মথুরা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাঁর স্মৃতিকাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে। এই অঞ্চলে মার অর্থাৎ পাপপুরুষের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয় এবং মার প্রভাব মুক্ত হয়ে অসংখ্য নরনারী তাঁর কাছে দীক্ষা লাভ করেন। কিংবদন্তী আছে উপগুপ্ত সিন্ধু ও কাশ্মীর পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।

হিউ-এন-ৎসাঙ্‌-এর মতে উপগুপ্ত সম্রাট অশোককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন এবং উপগুপ্তের পরামর্শে এবং দেবগণের সাহায্যে সম্রাট অশোক ভারতবর্ষে চুরাশি সহস্রস্তূপ নির্মাণ করে বুদ্ধের শরীর নিদান সংরক্ষিত করেন। অশোকাবদান অনুসারে উপগুপ্ত ছিলেন ধর্ম বিষয়ে অশোকের প্রধান মন্ত্রণাদাতা এবং সম্রাটকে সঙ্গে নিয়ে লুম্বিনী, কপিলবস্তু, বুদ্ধগয়া, ঋষিপতন, (সারনাথ) কুশীনগর, ও শ্রাবস্তী পরিভ্রমণ করেছিলেন। আজ পর্যন্ত অবশ্য অশোকের কোন শিলালিপিতে উপগুপ্তের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নি। সিংহল ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অনুসারে অশোকের ধর্মবিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন মোদগল্যীপুত্র তিষ্য। অনেকের মতে এই তিষ্য ও উপগুপ্ত একই ব্যক্তি।

তারানাথের মত উপগুপ্ত মথুরাতে মারা যান। জাপানী মতে ভূমিকম্পে মারা যান। ব্রহ্মদেশীয় মত অনুসারে মহাকশ্যপ ইত্যাদির মত উপগুপ্তও অমর।

উপগ্রহ—গুরুর কাছে বিধিপূর্বক বেদ পাঠ গ্রহণ।

উপচার—পূজার উপকরণ। যজমানের সঙ্গতি অনুসারে পাঁচ, দশ, ষোল, আঠার বা চৌষট্টি উপচারে পূজার ব্যবস্থা করা হয়। শঠতা না করে সাধ্যমত এই সমস্ত উপচার যথাসম্ভব ভাল সংগ্রহ করা কর্তব্য। পঞ্চ-উপচার অর্থে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য। দশ-উপচার অর্থে পঞ্চ উপচার এবং সঙ্গে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, পানীয়, ও তাম্বুল। ষোড়শ-উপচার অর্থে দশ-উপচার এবং আরো ছয়টি উপচার যথা আসন, স্বাগত প্রশ্ন, মধুপর্ক, স্নানের জল, বস্ত্র, ও আভরণ। অতিথিকে দেয়, ভাল বিছানা ও অনুলেপন বস্তুও উপচার হিসাবে গণ্য হয়।

উপচিত্র—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত।

উপতন্ত্র—জৈমিনি, বশিষ্ঠ, কপিল, নারদ প্রভৃতি কৃত তন্ত্র।

উপতিস্‌স—(১) গোতমবুদ্ধের প্রধান শিষ্য ; অপর নাম সারিপুত্ত। জন্মস্থান নালক। এইজন্য নালকের অপর নাম উপতিসসগাম এবং এঁর বাণীর নাম উপতিস্‌সসুত্ত। (২) কস্‌সপ রচিত 'অনাগতবংশ' নামক পালিগ্রন্থের ভাষ্যকার। (৩) খৃষ্টীয় প্রথম শতকে অরহা উপতিস্‌স নামে একজন ভিক্ষু 'বিমুত্তিমগ্‌গ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। (৪) দশম শতকে সিংহলে উপতিস্‌স নামে একজন বৌদ্ধ মহাবোধিবংশ রচনা করেন। (৫) মহানিদ্দেস গ্রন্থের ভাষ্য সদ্ধম্মপজ্জোতিকা রচনা কার। (৬) মহাবংসের ভাষ্যকারের নাম উপতিস্‌স। (৭-৮) সিংহলে ৩২২-৪০৯ খৃ পর্যন্ত এবং ৫২২-৫২৪ খৃ পর্যন্ত দুজন উপতিস্‌স রাজত্ব করেছিলেন।

উপদেবতা—(১) দেবকের ছেলে (ভাগবত)। (২) অক্রূরের ছেলে। (৩) আহুকের ছেলে (হরিবংশ)। (৪) দেবতাদের নীচে, অর্থাৎ মানুষ থেকে ওপরে ; এঁদের ১০টি ভাগ বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্য, সিদ্ধ, ভূত।

উপদেবী—যদুবংশীয় দেবকের মেয়ে। বসুদেবের স্ত্রী।

উপধাতু—মাক্ষিক, তুত্থক, অভ্র, নীলাঞ্জন, মনঃশিলা, হরিতাল, রসাঞ্জন। অন্যমতে স্বর্ণমাক্ষিক, তারমাক্ষিক, তুঁতে, কাঁসা, পিতল, সিন্দুর, শিলাজতু। দেহস্থ উপধাতুঃ—স্তন্য (রসজ) ; রজঃ (রক্তজ) ; বসা (মাংসজ) ; স্বেদ (মেদজ) ; দন্ত (অস্থিজ) ; কেশ (মজ্জজ) ; ওজঃ (শুক্রজ)।

উপনন্দ—(১) কৃষ্ণের পালক পিতা নন্দের ছোট ভাই। (২) বৌদ্ধ শাস্ত্রে একজন নাগরাজ। (৩) মদিরা নামে বসুদেব পত্নীর গর্ভে জাত পুত্র। (৪) কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের ছেলে। ইনি রাজপুরোহিতের ছোট ভাই কুহনের পরামর্শ ও সহায়তায় যুবরাজ নন্দকে নিহত করতে চেষ্টা করেন। (৫) ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে ; ভীমের হাতে মারা যান। (৬) একটি সর্প।

উপনন্দ—(১) একজন বৌদ্ধ স্থবির। বিনয় পিটক এবং জাতকে ভোগ্য বস্তুর প্রতি এঁর আসক্তির বহু কাহিনী আছে। জনপ্রিয় ছিলেন বটে তবে নিজের গোষ্ঠীতে নানাভাবে ধিকৃত ছিলেন। বুদ্ধ ঘোষ এঁকে লোল জাতিক বলেছেন। জাতকের একটি কাহিনীতে আছে পূর্ব জন্মে ইনি একটি মায়াবী শৃগাল ছিলেন। অন্যান্য শৃগালদের বঞ্চিত করতেন। (২) মগধরাজ অজাতশত্রুর সেনাপতি। মঝ্ঝিম নিকায়ের গোপক মোগ্‌গল্লান সুত্তে বর্ণিত আনন্দ ও বস্‌সকারের আলাপচারির সময়ে উপনন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপনয়ন—বৈদিক দীক্ষা। যজ্ঞোপবীত ধারণ রূপ সংস্কার। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বালকদেব যথাক্রমে ৭ বছব ৩ মাস থেকে ১৫ বছর ৩ মাস, ১০ বছর ৩ মাস থেকে ২১-৩, এবং ১১-৩, থেকে ২৩-৩ উপনয়নের মুখ্যকাল। এই সীমা পার হযে গেলে এবং উপনয়ন না হলে সাবিত্রীপতিত ব্রাত্য বলে অভিহিত হয়। এজন্য কঠিন ব্রাত্য প্রাযশ্চিত্ত করে উপনয়নের ব্যবস্থা করার নিয়ম। বর্তমানে প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে সামান্য অর্থ দান করা হয়। উপনয়ন সংস্কারের মধ্য দিয়ে বালক অধ্যয়নের জন্য গুরুর কাছে যেতেন। বর্তমানে পিতা বা পুরোহিত বা অন্য কেউ গুরুর পদ-গ্রহণ করেন এবং বালককে কতকগুলি নির্দেশ দিয়ে দণ্ড ও উপবীত (দ্রঃ) ধারণ করান ও গায়ত্রীমন্ত্র শিক্ষা দেন। দণ্ডধারণ করে মা বা মাতৃস্থানীয় মহিলার কাছে এবং পিতার কাছে ভিক্ষা নিতে হয়। উপনয়নের পর বেদ পাঠের অনুষ্ঠান হয় এবং চার বেদের চারটি মন্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। উপনয়নের আগে চূড়াকরণ ও কর্ণবেধ এবং উপনয়নের পরে সমাবর্তন সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়। সমাবর্তন উপলক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক স্নান, দণ্ডত্যাগপূর্বক বা দণ্ড ভেঙ্গে নতুন কাপড়, নতুন উপবীত, পাদুকা, কুণ্ডল, গন্ধমাল্য ইত্যাদি গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে উপনয়নের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাজ বহু জায়গায় এক দিনেই সেরে নেওয়া হয় ; ক্বচিৎ কোথাও তিনদিন বা বারো

দিন ব্রহ্মচর্য পালন ও হবিষ্যান্ন গ্রহণের রীতি পালন করা হয়। উপনয়ন সংস্কারের গুরুত্ব ক্রমশ লুপ্ত হয়ে আসছে।

উপনিষদ্—বেদের প্রধান দুটি ভাগ মন্ত্র (=সংহিতা) ও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ অংশ আবার তিন ভাগে বিভক্ত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। আসলে আরণ্যক অংশের অন্তর্গত অংশ উপনিষদ্। এইভাবে উপনিষদ বেদের অন্ত বা বেদান্ত। অন্য মতে বেদজ্ঞানের নিষ্কর্ষ হচ্ছে উপনিষদ্। বেদপাট শেষ করার পর বেদান্ততত্ত্ব শ্রবণের অধিকার জন্মে। উপনিষদ্ শব্দের ব্যাখ্যা হিসাবে একটি মত গুরুর সমীপে (উপ-) বসিয়া (নি+√সদ্) যে বিদ্যা গ্রহণ করতে হয়। অন্য মতে ব্রহ্মবিদের নিকট উপস্থিত হয়ে নিশ্চয়ের (নি) সঙ্গে যে বিদ্যা অনুশীলন করলে অবিদ্যা বিনাশ (√সদ্) প্রাপ্ত হয়। উপনিষদের আর এক অর্থ রহস্য। অর্থাৎ অতি দুর্লভ এই ব্রহ্মজ্ঞান গুরু প্রিয় শিষ্য বা বড় ছেলেকে গোপনে দিতেন। প্রাচীন কালে উপনিষদ্ পাঠ ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য ছিল।

চারটি বেদেরই উপনিষদ্ আছে এবং উপনিষদে আছে কেবল জ্ঞানের উপদেশ। উপনিষদে যজ্ঞ গৌণ; যষ্টব্যের স্বরূপ নির্ণয়ই মুখ্য অর্থাৎ জ্ঞানের প্রাধান্য। উপনিষদগুলি সাধারণত ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের অংশ; তবে উপনিষদে বেদের মন্ত্র (=সংহিতার সঙ্গে) যুক্ত হলে একে সংহিতোপনিষদ্ এবং অপরগুলিকে ব্রাহ্মণোপনিষদ্ বলা হয়। ঋক্‌বেদীয় উপনিষদ্ ঐতরেয় ও কৌষীতকি। সামবেদীয় উপনিষদ্ ছান্দোগ্য ও কেন। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় উপনিষদ্ তৈত্তিরীয়, কঠ, ও শ্বেতাশ্বতর। শুক্ল যজুর্বেদীয় উপনিষদ্ বৃহদারণ্যক, ও ঈশা। অথর্ববেদীয় উপনিষদ্ প্রশ্ন, মুণ্ডক মাণ্ডূক্য। মাণ্ডূক্য ভিন্ন এই উপনিষদ্‌গুলির ওপর এবং মাণ্ডূক্যের কারিকার ওপর শঙ্করাচার্যের ভাষ্য আছে। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক বড় বই; ঈশা মাত্র আঠারটি শ্লোকে সম্পূর্ণ।

ঐতরেয়, কৌষীতকি, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য ও কেন এই ছয়টি গদ্যে রচিত। ভাষার প্রাচীনত্বে ও রচনা শৈলীতে এগুলি ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অনুরূপ। এগুলি পাণিনির পূর্ব যুগের রচনা। কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মহানার'য়ণ (তৈত্তিরীয় আরণ্যকের চতুর্থ প্রপাঠক) ঈশা ও মুণ্ডক এই পাঁচটি কিছু পরের রচনা তবে বুদ্ধের আবির্ভাবের আগে। এগুলি প্রধানত পদ্যে রচনা। এই পাঁচটিতে বেদান্ত চিন্তার সঙ্গে সাংখ্য যোগের মতবাদও মিশে রয়েছে। প্রশ্ন, মাণ্ডূক্য ও মৈত্রায়ণীয় এই তিনটি বুদ্ধের পরে সংকলিত হয়েছে; এদের তৃতীয় শ্রেণীতে ধরা হয়। গদ্য ও পদ্য দুইই আছে এবং এই গদ্যের ভাষার সঙ্গে লৌকিক সংস্কৃতের বিশেষ মিল আছে। চতুর্থ শ্রেণীতে পরবর্তী কালের অসংখ্য উপনিষদ্ রয়েছে; বেদের সঙ্গে এগুলির সে রকম যোগ নেই। বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করবার জন্য উপনিষদ্ নাম দিয়ে এগুলি চালু করেছিলেন। অনেকগুলি প্রধানত পুরাণ ও তন্ত্রের অনুগামী। শাক্ত বৈষ্ণব ইত্যাদি বহু সম্প্রদায়ের এমন কি মোগলযুগে অল্লোপনিষদ্ নামেও একটি উপনিষদ্ রচিত হয়েছিল।

প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলিতে গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এবং স্থানে স্থানে সাঙ্কেতিক ভাষায় উপাখ্যান দিয়ে বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মূল সংহিতা থেকেও মন্ত্র নেওয়া হয়েছে। এইসব আলোচনায় পাত্রপাত্রী হিসাবে ব্রাহ্মণ, গার্গী ইত্যাদি মহিলা, জনক ইত্যাদি ক্ষত্রিয় এবং রৈক্ক ইত্যাদি শূদ্র যোগদান করেছেন। উপনিষদে আত্মা সম্বন্ধে নানা আলোচনা রয়েছে। আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মবিদ্যা হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা, এবং পরাবিদ্যা ; অপরাবিদ্যা ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শনগুলির প্রায় সবগুলিই এই উপনিষদের মতবাদ, প্রভাব বা ছায়া বহন করছে। উপনিষদের তাৎপর্য বিচারের জন্য পরে বহু বই লেখা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে ব্রহ্মসূত্র, ও শ্রীমৎভগবৎ গীতা প্রধান। এই দুই বই এবং উপনিষদ তিনটিকে একসঙ্গে প্রস্থানত্রয় বলা হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র ন্যায়প্রস্থান, গীতা স্মৃতিপ্রস্থান এবং উপনিষদ শ্রুতিপ্রস্থান। এবং বিরোধের স্থলে শ্রুতিই গ্রাহ্য। পাশ্চাত্য চিন্তাজগতেও উপনিষদের প্রভাব প্রচুর। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে দারা শিকোহ-র প্রচেষ্টায় ৫০-টি উপনিষদের একটি পারসিক সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৮০১/২ সালে এই গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ করেন আঁকেতিল দ্যু পেরোঁ। পরে বহু ভাষায় বহু অনুবাদ হয়েছে। ভারতীয় চিন্তা-ধারায় রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উপনিষদের প্রভাব অনেকখানি।

একটি মতে উপনিষদ সব সমেত ২৮০ খানি। যজুর্বেদের মুক্তিকোপনিষদ মতে ঋকবেদের ১০টি উপনিষদ্, শুক্লযজুর্বেদের ১৯, কৃষ্ণযজুর্বেদের ৩২, সামবেদের ১৬ এবং অথর্ববেদের ৩১টি মোট ১০৮ খানি উপনিষদ। ১৯৪৮ সালে নির্ণয়সাগর প্রেস ঈশাদি-বিংশোত্তরশতোপনিষদঃ নামে ১২০টি বইয়ের একটি সঙ্কলন বার করেছেন। এগুলির নাম :—১-ঈশাবাস্য, ২-কেন, ৩-কঠ, ৪-প্রশ্ন, ৫-মুণ্ডক, ৬-মাণ্ডূক্য, ৭-তৈত্তিরীয়, ৮-ঐতরেয়, ৯-ছান্দোগ্য, ১০-বৃহদারণ্যক, ১১-শ্বেতাশ্বতর, ১২-কৌষীতকি,-ব্রাহ্মণ, ১৩-মৈত্রেয়ী, ১৪-কৈবল্য, ১৫-জাবাল, ১৬-ব্রহ্মবিন্দু, ১৭-হংস, ১৮-আরুণিক, ১৯-গর্ভ, ২০-নারায়ণাথর্বশিরস, ২১-মহানারায়ণ, ২২-পরমহংস, ২৩-ব্রহ্ম, ২৪-অমৃতনাদ, ২৫-অথর্বশিরস্ ২৬-অথর্বশিখা, ২৭-মৈত্রায়ণী, ২৮-বৃহজ্জাবাল, ২৯-নৃসিংহপূর্বতাপনীয়, ৩০-নৃসিংহোত্তরতাপনীয়, ৩১-কালাগ্নিরুদ্র, ৩২-সুবাল, ৩৩-ক্ষুরিকা, ৩৪-মন্ত্রিকা, ৩৫-সর্বসার, ৩৬-নিরালম্ব, ৩৭-শুকরহস্য, ৩৮-বজ্রসূচিকা, ৩৯-তেজোবিন্দু, ৪০-নাদবিন্দু, ৪১-ধ্যানবিন্দু, ৪২-ব্রহ্মবিদ্যা, ৪৩-যোগতত্ত্ব, ৪৪-আত্মপ্রবোধ, ৪৫-নারদপরিব্রাজক, ৪৬-ত্রিশিখব্রাহ্মণ, ৪৭-সীতা, ৪৮-যোগচূড়ামণি, ৪৯-নির্বাণ, ৫০-মণ্ডলব্রাহ্মণ, ৫১-দক্ষিণা-মূর্তি, ৫২-শরভ, ৫৩-স্কন্দ, ৫৪-ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণ, ৫৫-অদ্বয়তারক, ৫৬-রামরহস্য, ৫৭-শ্রীরামপূর্বতাপিনী, ৫৮-শ্রীরামোত্তরতাপিনী, ৫৯-বাসুদেব, ৬০-মুদ্গল, ৬১-শাণ্ডিল্য, ৬২-পৈঙ্গল, ৬৩-ভিক্ষুক, ৬৪-মহা, ৬৫-শারীরক, ৬৬-যোগশিখা, ৬৭-তুরীয়াতীতা, ৬৮-সন্ন্যাস, ৬৯-পরমহংসপরিব্রাজক, ৭০-অক্ষমালিকা, ৭১-অব্যক্ত, ৭২-একাক্ষর, ৭৩-অন্নপূর্ণা, ৭৪-সূর্য, ৭৫-অক্ষি, ৭৬-অধ্যাত্ম, ৭৭-কুণ্ডিক, ৭৮-সাবিত্রী, ৭৯-আত্মা, ৮০-পাশুপতব্রহ্ম, ৮১-পরব্রহ্ম, ৮২-অবধূত, ৮৩-ত্রিপুরাতাপিনী, ৮৪-দেবী, ৮৫-ত্রিপুরা, ৮৬-কঠরুদ্র, ৮৭-ভাবনা, ৮৮-রুদ্রহৃদয়, ৮৯-যোগকুণ্ডলী, ৯০-ভস্মজাবাল, ৯১-রুদ্রাক্ষজাবাল,

৯২-গণপতি, ৯৩-শ্রীজাবালদর্শন, ৯৪-তারসার, ৯৫-মহাকাব্য, ৯৬-পঞ্চব্রহ্ম, ৯৭-প্রাণাগ্নিহোত্র, ৯৮-গোপালপূর্বতাপিনী, ৯৯-গোপালোত্তরতাপিনী, ১০০-কৃষ্ণ, ১০১-যাজ্ঞবল্ক্য, ১০২-বরাহ, ১০৩-শাট্যায়নীয়, ১০৪-হয়গ্রীব, ১০৫-দত্তাত্রেয়, ১০৬-গারুড়, ১০৭-কলিসন্তরণ, ১০৮-জাবালি, ১০৯-সৌভাগ্যলক্ষ্মী, ১১০-সরস্বতীরহস্য, ১১১-বহ্বচ, ১১২-গণেশপূর্বতাপিনী, ১১৩-গণেশোত্তরতাপিনী, ১১৪-গোপীচন্দন, ১১৫-পিণ্ড, ১১৬-মহা, ১১৭-আশ্রম, ১১৮-সন্ন্যাস, ১১৯-যোগশিখা, ১২০-মুক্তিক

উপপাতক— মহাপাতক অপেক্ষা লঘু। পরদারগমন, আত্মবিক্রয়, মাতৃত্যাগ, পিতৃত্যাগ, সুতত্যাগ, কন্যাদূষণ, দারবিক্রয়, অপত্যবিক্রয়, বান্ধবত্যাগ, অভিচার, ঋণশোধ না দেওয়া, অনুপযুক্ত পুরোহিত দিয়ে যজ্ঞ করান, নাস্তিকতা, গোহত্যা, ইত্যাদি ৫৯-টি উপপাতক।

উপপুরাণ—পুরাণ সাহিত্যে দুটি ভাগ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। আঠারটি মহাপুরাণের অতিরিক্ত পুরাণগুলি উপপুরাণ। এগুলি মহাপুরাণের পরবর্তী ও পরিশিষ্ট। কতকগুলি উপপুরাণ কিন্তু মহাপুরাণের সমকক্ষ বা আরো মর্যাদাশালী। অনেক উপপুরাণ অর্বাচীন হলেও শাম্ব ও বিষ্ণুধর্মোত্তর বেশ প্রাচীন। উপপুরাণের বিষয়-বস্তু প্রায় মহাপুরাণেরই মত এবং সংখ্যাও আঠার। বিভিন্ন গ্রন্থে উপপুরাণের যে নাম দেখা যায় তাতে কিন্তু উপপুরাণের সংখ্যা আঠার থেকে অনেক বেশি। এছাড়া ও মুদ্রিত ও অমুদ্রিত আরো কিছু উপপুরণ রয়েছে। এই সব উপপুরাণের মধ্যে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসের বহু উপাদান এমন কি মহাপুরাণের থেকেও বেশি রয়েছে। কয়েকটি নাম :—আদি, আদিত্য, উশনঃ, কপিল৷ কালিকা, নন্দী, নৃসিংহ, নারদ, নন্দিকেশ্বর, দেব, দুর্বাসঃ, পদ্ম, পরাশর, বায়ু, বরুণ, বামন, ব্রহ্মাণ্ড, বশিষ্ঠ, ভাগবত, ভার্গব, ভাস্কর, মহেশ্বর, মরীচি, মানব, শাম্ব, শিবধর্ম, শিব, সনৎকুমার, সৌর, স্কান্দ।

উপপ্লব্য—মৎস্য রাজ্যের অন্তর্গত নগর বা গ্রাম। বিরাট নগরের উপকণ্ঠে। অজ্ঞাত-বাসের শেষে এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে পাণ্ডবরা এখানে ছিলেন।

উপবর্হণ—দ্রঃ নারদ।

উপবসথ—বৈদিক যাগের আগের দিন।

উপবাস—সমস্ত পাপ থেকে উপাবৃত্ত হয়ে গুণের সঙ্গে বাস করাকে উপবাস বলা হয় (গোভিল ভাষ্য)। এই ব্যবস্থা থেকে ক্রমে অনশন এসেছে মনে হয়।

উপবীত—(১) যজ্ঞোপবীত। দ্বিজাতির গৃহীত সূত্র। বাম স্কন্ধে ধারণ করলে উপবীত, দক্ষিণস্কন্ধে প্রাচীনাবীত, এবং মালার মত ধারণ করলে নিবীত। ব্রাহ্মণের কাপাস তুলার, ক্ষত্রিয়ের শণের এবং বৈশ্যের মেষলোমের উপবীত বিহিত। উপবীত রূপে ধৃত বস্ত্রও উপবীতের কাজ করে। শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মে দুই গ্রন্থি উপবীত ধারণীয়; উত্তরীয় অভাবে আর এক গ্রন্থি ধারণের ব্যবস্থা আছে।

(২) সূর্যপথ। সূর্যকে বেষ্টন করে অবস্থিত। সূর্য যখন পুরাতন পথ শেষ করে নতুন পথে যান তখন তাঁর নতুন উপবীত হয়।

উপবেদ—বেদের নীচে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। সকল বেদেরই উপবেদ আছে। ঋক্‌বেদের উপবেদ আয়ুর্বেদ, যজুর্বেদের উপবেদ ধনুর্বেদ, সামবেদের উপবেদ গন্ধর্ববেদ বা সঙ্গীতবেদ এবং অথর্ব বেদের উপবেদ স্থাপত্য বেদ। স্মৃতি শাস্ত্র থেকে এগুলি ভিন্ন।

উপমন্যু—মহর্ষি আয়োদ্‌ধৌম্যের গুরুভক্ত শিষ্য। গুরুর গরু চরাতেন। উপমন্যুকে হৃষ্টপুষ্ট দেখে জানতে চান উপমন্যু কি খান। শিষ্য ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন শুনে শিষ্যকে বলেন গুরুকে নিবেদন না করে এ অন্ন গ্রহণ করা অনুচিত। এরপর থেকে ভিক্ষায় যা পেতেন উপমন্যু গুরুকে দিয়ে দিতেন। কিন্তু তবু তাঁর সুন্দর স্বাস্থ্য দেখে আবার জানতে চান উপমন্যু এখন কি খান। শিষ্য জানান দ্বিতীয়বার নিজের জন্য ভিক্ষা করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। গুরুদেব শিষ্যকে দুবার ভিক্ষা করতে নিষেধ করেন কারণ এতে লোভ বেড়ে যায় এবং অপর ভিক্ষার্থী বঞ্চিত হয়। এরপরও উপমন্যুর স্বাস্থ্য অটুট দেখে গুরু আবার জানতে চান উপমন্যু এখন কি খান। উপস্থিত উপমন্যু আশ্রমগাভীর দুধ খাচ্ছেন শুনে বিনা অনুমতিতে এই দুধ খেতে নিষেধ করেন। কিন্তু এর পরেও তাঁকে পূর্ণ স্বাস্থ্যবান দেখে আবার জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন দুধ খেয়ে বাছুরদের মুখ থেকে যে ফেনা বার হয় উপমন্যু সেই ফেনা খান। গুরুদেব এই ফেনা খেতেও নিষেধ করেন ; কারণ বাছুররা উপমন্যুর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে প্রচুর ফেনা তৈরি করে নিজেদের পুষ্টির ক্ষতি করছে। নিরুপায় উপমন্যু এবার গরু চরাতে গিয়ে ক্ষুধায় কাতর হয়ে আকন্দপাতা খেয়ে অন্ধ হয়ে এক কূপের মধ্যে পড়ে যান। এদিকে ফিরতে না দেখে গুরুদেব শিষ্যদের নিয়ে খুঁজতে বার হয়ে কূপের কাছে এসে উপমন্যুর কাছে সব জানতে পেরে শিষ্যকে অশ্বিনীকুমারদের স্তব করার উপদেশ দেন।

অশ্বিনীকুমার দুজন এসে উপমন্যুকে পিষ্টক খেতে দিলে উপমন্যু গুরুকে নিবেদন না করে খেতে অসম্মত হওয়ায় এঁরা মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন উপমন্যুর দাঁত হিরণ্ময় হবে, দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন এবং শ্রেয় লাভ করবেন। এবং আয়োদ্‌ধৌম্যের দাঁত কালো লৌহময় হবে। এই ভাবে এত দিন পরীক্ষা করার পর গুরু উপমন্যুকে শাস্ত্রে পারঙ্গম হবার আশীর্বাদ করেন এবং গৃহে ফিরে যেতে বলেন।

উপমন্যু—(২) সত্যযুগে ব্যাঘ্রপাদ মুনির দুই ছেলে উপমন্যু ও ধৌম্য। কিছু মতে এই উপমন্যুই আয়োদ্‌ধৌম্যের শিষ্য। একবার এই উপমন্যু পিতার সঙ্গে অন্য এক মুনির আশ্রমে গিয়ে দুধ খেয়ে আসেন। ফিরে এসে নিজের মাকে দুধ ঘি দিয়ে পায়স তৈরি করতে বলেন। কিন্তু এই আশ্রমে দুধ ছিল না। ফলে জলে চালের/গমের গুঁড়ো গুলে ছেলেকে খেতে দেন। কিন্তু উপমন্যু খেতে চান না। উপমন্যুর মা তখন শিবের আরাধনা করতে বলেন, দারিদ্র্য মোচন হতে পারে। উপমন্যু তপস্যা করলে শিব ইন্দ্র বেশে এসে বর দিতে চান কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হন। তখন শিব নিজের বেশে দেখা দেন এবং বর দিয়ে উপমন্যুকে দেবতাতে পরিণত করেন।

(৩) সুতপস্‌ মুনির ছেলে। পৃথিবী পরিক্রমা করে গয়াতে এসে পিতৃদেবদের পূজা করলে পিতৃদেবরা জানান বিয়ে করে সন্তানের জন্ম দিতে হবে। এই জন্য কশ্যপের আশ্রমে আসেন গরুড়ের বোন সুমতিকে বিয়ে করবেন বলে। কিন্তু বৃদ্ধ

উপমন্যুকে কশ্যপ মেয়ে দিতে রাজি হন না। বৃদ্ধ তখন শাপ দেন কোন ব্রাহ্মণের সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে দিলে কশ্যপের মাথা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। দ্রঃ ঔর্ব, সগর, যাদবী।

উপযাজ—কশ্যপ গোত্রীয় ঋষি। এঁর বড় ভাই যাজ (দ্রঃ)।

উপরিচরবসু—চেদি বংশে এক রাজা ; প্রকৃত নাম বসু। যযাতি (১)—পুরু (২)—দুষ্মন্ত (১৫)—ভরত (১৬)—হস্তী (২৩)—অজমীঢ় (২৪)—চ্যবন (৩০)—কৃতি(৩১)—বসু (৩২)। ইন্দ্রের উপদেশ অনুসারেই তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু এঁর কঠোর তপস্যায় ভীত হয়ে ইন্দ্র নানা ভাবে ভুলিয়ে তপস্যা থেকে এঁকে নিরস্ত করেন এবং পরিবর্তে স্ফটিকময় বিমান, বৈজয়ন্তী মালা ও একটি লাঠি/বংশদণ্ড উপহার দিয়েছিলেন এবং প্রজাপালন রূপ ধর্ম পালন করতে বলেন ও চেদি রাজ্য জয় করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইন্দ্র এঁকে বন্ধু মনে করতেন। এই রথে করে আকাশে ভ্রমণ করতেন বলে নাম হয় উপরিচর বসু। ঐ মালা ধারণ করে থাকলে যুদ্ধে দেহে কোন আঘাত লাগবে না। অগ্রহায়ণ মাসে রাজপুরীতে এই লাঠি এনে উৎসব করে ইন্দ্রপূজা করেন এবং পরদিন আকাশে ইন্দ্রধ্বজা তোলেন। দণ্ডটির মাথাতে হংস আকৃতি (কারণ হংসের বেশে ইন্দ্র দেখা দিয়েছিলেন) একটি ধ্বজা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দণ্ডটি ফুলের মালায় সাজান হয়েছিল। সেই থেকে ইন্দ্রপূজা প্রচলিত হয়। এঁর রাজধানীর কাছে শুক্তিমতী/শক্তিমতী নামে একটি নদী ছিল। কোলাহল নামে একটি পাহাড় কামার্ত হয়ে এই নদীর পথ রোধ করলে পরদিন রাজা পদাঘাত করে পাহাড় বিদীর্ণ করলে গর্ভবতী নদী পথ পায়। কোলাহলের ঔরসে শুক্তিমতীর গর্ভে এক ছেলে ও গিরিকা নামে এক মেয়ে হয়। কৃতজ্ঞতায় নদী এই ছেলে ও মেয়েকে রাজার হাতে তুলে দেন এবং রাজা এদের পালন করেন। ছেলেটিকে সেনাপতি এবং গিরিকাকে নিজের মহিষী করেন।

মৎস্যরূপিণী একটি অপ্সরার সঙ্গে মিলনে এঁর ছেলে হয় মৎস্য এবং মেয়ে হয় মৎস্যগন্ধা (ব্যাসের মা)। অন্য মতে গিরিকা একদিন ঋতুস্নান করে সঙ্গম প্রার্থনা করেন। কিন্তু পিতৃলোকের আদেশে রাজা মৃগয়া করতে চলে যান। মৃগয়া কালে স্ত্রীর কথা ভাবতে ভাবতে বসন্ত উজ্জ্বল বনে এক বৃক্ষমূলে রাজার বীর্যপাত হয়। এক শ্যেনকে দিয়ে পত্রপুটে রাজা এই বীর্য রাণীর কাছে পাঠিয়ে দেন। পথে আর এক শ্যেনের আক্রমণে এই বীর্য গঙ্গা/যমুনায় পড়ে যায়। ব্রহ্মশাপে মৎস্যরূপিণী অপ্সরা অদ্রিকা এই বীর্য গ্রহণ করে গর্ভবতী হয়ে দশমাস পরে জালে ধরা পড়ে। মাছের পেটে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে পেয়ে জেলে রাজার কাছে নিয়ে আসে। শাপ অনুসারে সন্তানের জন্ম দিয়ে অদ্রিকা শাপমুক্ত হয়ে যায়। রাজা ছেলেকে নেন এবং মেয়েটিকে জেলেকেই দিয়ে দেন। ছেলেটির নাম হয় মৎস্যরাজ ; মেয়েটির গায়ে মাছের গন্ধ থাকায় নাম হয় মৎস্য-গন্ধা। মৎস্যরাজ ধার্মিক রাজা ছিলেন। উপরিচর বসুর পাঁচ ছেলে বৃহদ্রথ, কুশাম্ব (মণিবাহন), মবেল্লা যদু ও রাজন্য নিজের নিজের নামে পাঁচটি রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন।

ইন্দ্র ও মুনিদের মধ্যে এক বার তর্ক হয় গোবধ উচিত কি না ? অন্য মতে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে তর্ক হয়, দেবতারা বলেন যজ্ঞে ছাগ মাংস দেওয়া শ্রেয়, ব্রাহ্মণরা বলেন শস্য দেওয়াই যথেষ্ট। উপরিচর বসু সেই সময় সামনে এলে তাঁকে বিচার করতে বলা হয়। উপরিচর বসু গোহত্যার সপক্ষে যুক্তি দিয়ে ইন্দ্রকে সমর্থন করেন, অন্যমতে দেবতাদের সমর্থন করেন। ফলে মুনিদের/ব্রাহ্মণদের অভিশাপে আকাশ থেকে পাতালে/মাটিতে গর্তে গতি হয়। দেবতারা তখন বর দেন পৃথিবীতে যতদিন উপরিচর থাকবেন ততদিন তাঁকে ক্ষুৎ-পিপাসা পীড়িত হতে হবে না এবং বিষ্ণুর আশীর্বাদে আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসতে পারবেন। উপরিচর বসু বিষ্ণুর স্তব করলে গরুড় গিয়ে উপরিচর বসুকে তুলে এনে নিজের স্থানে স্থাপন করেন। উপরিচর বসু বিষ্ণু ভক্ত, ইন্দ্রের বন্ধু ও যমের সভাসদ ছিলেন। অত্যন্ত পিতৃভক্ত রাজা। শেষকালে পিতৃলোক প্রাপ্ত হন। দ্রঃ কলিঙ্গ।

উপশ্রুতি—উত্তরায়ণের (সূর্যের উত্তর পথের) দেবী। নহুষের রাজত্বকালে ইন্দ্র যখন আত্মগোপন করেছিলেন তখন ইন্দ্রের সন্ধান এনে দিয়ে ইন্দ্রাণীকে সাহায্য করেছিলেন।

উপশ্লোক—কৃষ্ণের এক ছেলে : সৈরন্ধ্রীর গর্ভে জন্ম। কৃতবিদ্য, এবং সাংখ্য-যোগ অভ্যাস করেন।

উপসুন্দ—হিরণ্যকশিপু বংশে নিকুম্ভের বড় ছেলে সুন্দ ও উপসুন্দ। ত্রিলোক জয় করার জন্য দুই ভাই বিন্ধ্য পর্বতে কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মার কাছে বর পান যে ত্রিলোকে এঁরা নিঃশঙ্ক হবেন এবং পরস্পরের হাতে ছাড়া এঁদের মৃত্যু হবে না। এঁরা তখন ত্রিভুবন জয় করতে বার হন এবং তপস্বীদের ওপর অত্যাচার করতে থাকেন। কুব্জা/তিলোত্তমার (দ্রঃ) কারণে দুই ভাই মারা যান। (২) নরকাসুরের সেনাপতি, কৃষ্ণের হাতে মারা যান।

উপসেন বঙ্গন্তপুত্র—বৌদ্ধ মহাশ্রাবক। সারিপুত্তের ছোট ভাই। পিতা বঙ্গন্ত। তিনবেদ পাঠ করার পর বুদ্ধের কাছে ধর্মব্যাখ্যা শুনে উপসেন প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করেন; অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, পরে ভিক্ষু হবার যোগ্যতা লাভ করেন। এবং ধুতংগ অর্থাৎ তেরটি বিশেষ সদাচার অভ্যাস করেন এবং অপরকেও এগুলি অভ্যাস করতে প্রবুদ্ধ করেন। তাঁর প্রচারে বহু লোক সংঘে যোগ দিয়েছিলেন। সর্পাঘাতে মারা যান।

উপস্মৃতি—অপ্রধান স্মৃতি। উপস্মৃতিকার :—কাত্যায়ন, কপিঞ্জল, কশ্যপ, কণাদ, জনক, জাবালি, জাতুকর্ণ, নাচিকেত, ব্যাস, বিশ্বামিত্র, বৌধায়ন, ব্যাঘ্র, লৌগাক্ষী, শতর্জু, সনৎকুমার, স্কন্দ।

উপাংশু—দেবতার প্রতি মনোনিবেশ করে জিব ও ঠোঁট অল্পচালিত করে মন্ত্র উচ্চারণ করা। নিজে ছাড়া এ মন্ত্র অপরে শুনতে পায় না। এর নাম উপাংশু জপ।

উপাকরণ—সংস্কারপূর্বক বেদপাঠ বা পশুবধ।

উপাঙ্গ—মীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায়, যোগ, সাংখ্য, বেদান্ত ইত্যাদি।

উপাধি—ন্যায় দর্শনে গুণবাচক শব্দ।

উপাধ্যায়—যিনি বেদের একদেশ বা ব্যাকরণাদি উপাঙ্গ শিক্ষা দিয়ে জীবিকা চালান। বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির উপাধ্যায় অংশ বল্লাল সেনের দেওয়া উপাধি।

উপার্ধরঙ্গ—হাসাবার জন্য এক প্রকার নাচ। শরীরের অর্দ্ধাংশ নাচান হয় বাকি অর্দ্ধাংশ নিশ্চল থাকে (বৌ. সা)।

উপালি—বৌদ্ধ মহাশ্রাবক। বুদ্ধের বিশিষ্ট শিষ্য। কপিলবস্তুতে নাপিতের ঘরে জন্ম। শাক্যদের সেবা করতেন। অনুরুদ্ধ প্রমুখ শাক্যদের সঙ্গে বুদ্ধের কাছে যান এবং বুদ্ধদেব সন্তুষ্ট হয়ে উপসম্পদা অর্থাৎ দীক্ষা দেন। বুদ্ধদেবের কাছে সমস্ত বিনয় পিটক শিক্ষালাভ করেন এবং বিনয়ধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হন। বুদ্ধদেবের কাছে উপালির প্রশ্নগুলি এবং বুদ্ধদেবের উত্তরগুলি 'পরিবার' গ্রন্থের 'উপালিপঞ্চক' অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে। এই অধ্যায়ের কিছু অংশ হয়তো পরে যুক্ত হয়েছে। বিনয়ের সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করে তিনি বিনয় সংগ্রহের ভার নিয়েছিলেন। কথিত আছে বুদ্ধদেবের জীবিত কালেই ভিক্ষুরা উপালির কাছে বিনয়ের শিক্ষা গ্রহণকে পরম শ্লাঘার বিষয় মনে করতেন। থের-গাথায় উপালির আত্ম-উৎকর্ষের বিবরণ আছে।

উপাশ্রয়—ভিক্ষুণীদের থাকবার জায়গা।

উপাসনা—অনুভূতি সহ পূজা। আনন্দ স্বরূপ ঈশ্বরে নিজের আত্মাকে ডুবিয়ে দেওয়া। উপাসনা দুরকম। নির্গুণ উপাসনা অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, লঘু, গুরু, সংযোগ, বিয়োগ, অবিদ্যা, জন্ম, মরণ, দুঃখাদি গুণ রহিত পরমাত্মাকে উপাসনা করা। সগুণ উপাসনা—সর্বগুণের আধার পরমাত্মাকে উপাসনা করা।

উপেক্ষা—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এই তিন অবস্থা অতিক্রম করে যে অবস্থায় মানুষ সুখে বা দুঃখে অবিচলিত হয়ে শান্তভাবে অবস্থান করে (বৌ, সা)।

উপেন্দ্র—ইন্দ্রের ছোট ভাই। বিষ্ণু, বামন। বিষ্ণু অদিতির গর্ভে বামন হয়ে জন্মান ; নাম উপেন্দ্র।

উপোসথ—(বৈদিক উপবসথ)। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটি অবশ্য কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান। কৃষ্ণপক্ষ বা শুক্লপক্ষের অষ্টম, চতুর্দশ বা পঞ্চদশ দিনে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মিলিত হয়ে 'পাতিমোকখ্' (বৌদ্ধ দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ) আবৃত্তি করতেন ; এবং অনুষ্ঠানের আগের দিনগুলিতে কোন দোষ করলে সেই দোষ স্বীকার করে পাপমুক্ত হতেন। অর্থাৎ এটি যেন একটি শুদ্ধি অনুষ্ঠান।

বৈদিক, জৈন, ও প্রাক্ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও মোটামুটি এই জাতীয় অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। তাঁরাও ঐ একই তিথিতে মিলিত হতেন এবং সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজকরা ধর্ম আলোচনা করতেন। একই 'আবাসের' ভিক্ষুদের একটি অনুষ্ঠানে বাধ্যতামূলক ভাবে যোগ দিতে হত। অনুষ্ঠান কেন্দ্র থেকে তিন যোজন পর্যন্ত (প্রায় ২৪ কি, মি,) একটি আবাসের পরিধি ধরা হত ; অর্থাৎ এই স্থানে একটি অনুষ্ঠানই হত। যে বিহারে থের বাস করতেন সেই বিহারেই উপোসথ-সভা বসত। কথিত

আছে রাজা বিম্বিসারের পরামর্শে বুদ্ধদেব এই অনুষ্ঠান চালু করেছিলেন।

উৎপলবর্ণা—বৌদ্ধ মহাশ্রাবিকা। বুদ্ধের দুই প্রধান শিষ্যার একজন। শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠী কন্যা। দেহের রং নীলপদ্মগর্ভের বর্ণের মত ছিল বলে নাম উৎপলবর্ণা। বহু রাজপুত্র বা শ্রেষ্ঠীপুত্র তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তিনি সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুণী সংঘে যোগ দেন। একদিন একটি দীপ জ্বেলে দীপের শিখা সম্বন্ধে ক্রমাগত চিন্তা করতে করতে অর্হত্ব লাভ করেন। ইদ্ধি (অনৈসর্গিক শক্তি) সম্পন্না ভিক্ষুণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ছিলেন। মারকে তিনি পরাজিত করেছিলেন। উৎপলবর্ণা কিন্তু তাঁর মাতুল-পুত্রের হাতে উৎপীড়িতা হলে বুদ্ধদেব সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুণীদের বনে বাস নিষিদ্ধ করে দেন।

উভয়বেদান্ত—দ্রাবিড় বেদান্ত এবং সাধারণ বেদান্ত মিলে অভিহিত। রামানুজ এই নামটি চালু করেন।

উভয়ভারতী—মাহিষ্মতী নগরীর মীমাংসা দার্শনিক মণ্ডণমিশ্রের স্ত্রী। পিত্রালয় শোণ নদীর তীরে। বিভিন্ন কিংবদন্তীতে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অদ্বৈতবাদ স্থাপনের জন্য শঙ্করাচার্য দিগ্বিজয়ে বার হয়ে কুমারিল ভট্টের নির্দেশে কুমারিল শিষ্য মণ্ডনমিশ্রের সঙ্গে দার্শনিক তর্ক সুরু করেন। এই সময় উভয়-ভারতী মধ্যস্থতার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল তর্কের পর মণ্ডনমিশ্র হেরে গেলে উভয়-ভারতী নিজে তর্কে অবতীর্ণ হন এবং কয়েক দিন আলোচনা করে তাঁকে পরাস্ত করতে না পেরে শেষ কালে কামশাস্ত্র বিষয়ে তর্ক আরম্ভ করতে চান। শঙ্করাচার্য আজীবন ব্রহ্মচারী; কামশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। ফলে এক বছর সময় চেয়ে নেন। তারপর উভয় ভারতীকে পরাজিত করেন। তর্কের সর্ত অনুযায়ী এঁরা দুজনেই তখন শঙ্করাচার্যের শিষ্য হন।

উমা—উমার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কেনোপনিষদে। সামনে আবির্ভূত 'পূজ্য-কে' জানবার জন্য কয়েকজন দেবতা একে একে এগিয়ে আসেন। শেষকালে ইন্দ্র আসেন। ইন্দ্র আসাতে ইনি অন্তর্হিত হন এবং তাঁর পরিবর্তে আকাশে সুশোভনা সুবর্ণালঙ্কার ভূষিতা 'উমা হৈমবতী' দেখা দেন এবং ইন্দ্রকে জানান যে যিনি অন্তর্হিত হয়ে গেলেন তিনি ব্রহ্ম। এই উমাই ব্রহ্মবিদ্যা। ইন্দ্রের ভক্তি দেখে উমারূপে দেখা দিয়েছিলেন।

বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে হিমালয় ও সুমেরু দুহিতা মেনকার মেয়ে হয়ে জন্মান। বৃহৎ ধর্মপুরাণ মতে জ্যৈষ্ঠ শুক্লা চতুর্থীতে জন্ম। কালিকাপুরাণ মতে নাম হয় পার্বতী। পূর্বজন্মে পার্বতী দক্ষের মেয়ে সতী এবং শিবের স্ত্রী ছিলেন। বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ খণ্ডিত হলে মহাদেব তপস্যায় মগ্ন হন। নারদ এই সময়ে হিমালয়কে জানিয়ে যান পার্বতীর সঙ্গে শিবের বিয়ে হবে। এই জন্য হিমালয়ের একান্ত অনুরোধে মহাদেব পার্বতীকে তাঁর আরাধনা করতে অনুজ্ঞা দেন। এদিকে তারকা-সুরের উৎপাতে ইন্দ্রাদি দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নেন এবং জানতে পারেন মহাদেবের ছেলে কার্তিকের হাতে তারকাসুর মারা পড়বেন। দেবতারা তখন পার্বতীর সঙ্গে

মহাদেবের বিয়ে দেবার জন্য মদনকে পাঠিয়ে মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহাদেব বিরক্ত হয়ে অন্যত্র চলে যান। পার্বতী তখন শোকে ও লজ্জায় অভিভূত হয়ে মহাদেবকে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। এই কঠোর তপস্যা দেখে মেনকা উ(=হে) মা (= না) অর্থাৎ ওরে না, বা এত তপস্যা কর না বলেছিলেন। ফলে পার্বতীর নাম হয় উমা। এই সময় আর এক নাম হয় অপর্ণা (দ্রঃ)। শেষ পর্যন্ত মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে বিয়েতে মত দেন এবং সপ্তর্ষিরা হিমালয়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন এবং বিয়ে হয়। দ্রঃ কার্তিক।

এক দিন হিমালয়ে মহাদেবের সঙ্গে উমা বিহার করছিলেন এমন সময় কুবেরের দৃষ্টি এই দিকে পতিত হওয়ায় কুবের একপিঙ্গল (দ্রঃ) হয়ে পড়েন। উমার দেহ-সম্ভূতা কৌষিকী যোগনিদ্রা মহাদেবের নির্দেশে যশোদার মেয়ে হয়ে জন্মান। উমার দেহ থেকে এক মুদ্গর সৃষ্টি হয় এবং তাতে শুম্ভ নিশুম্ভ নিহত হয়। পরে এই মুদ্গর শম্বরকে দেওয়া হয়েছিল। লিঙ্গপুরাণ, হরিবংশ, মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, শিবপুরাণ, বামন-পুরাণ ও মহাভারতে শান্তিপর্বে সতী ও উমা কাহিনী উল্লিখিত আছে। কাহিনী সর্বত্র প্রায়ই এক। কালিকাপুরাণের ঘটনা বিস্তৃততম।

উমাচতুর্থী—উমার জন্ম তিথি। জ্যৈষ্ঠ শুক্লাচতুর্থী।

উমাস্বামী/স্বাতি—১৩৫-২১৯ খৃ। বিখ্যাত জৈন নৈয়ায়িক। মায়ের নাম উমা-বাৎসী, পিতা স্বাতি। সেই জন্য অন্য নাম উমাস্বাতি। মূলতঃ ঘোষনন্দি ক্ষমা-শ্রমণের শিষ্য। দিগম্বররা এঁকে কুন্দকুন্দাচার্যের শিষ্য বলেন। এঁর কয়েকটি উপাধি গৃধ্রপিচ্ছ, বাচকশ্রমণ, বাচকাচার্য। পাঁচশত মত গ্রন্থ লিখেছিলেন। এক মাত্র তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র পাওয়া যায়; এটি পাটলিপুত্রে সংস্কৃত ভাষাতে রচনা। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর দুই সম্প্রদায়ই এই গ্রন্থের বহু টীকা রচনা করেছেন।

উম্লোচা—এক জন অপ্সরা।

উরগ—কদ্রুর সন্তান। নাগেরা কিন্তু সুরসার সন্তান (রামা ৩।১৪।২৮)।

উরশ্চক্র—পাপীর শাস্তির জন্য সুন্দর হারের মত দেখতে পাথরের চাকা। পাপীর গলায় পরিয়ে দিলে ঘুরতে থাকে; এবং চাকার ধারে দেহ ক্ষত বিক্ষত হতে থাকে (বৌ. সা)।

উরুবিল্ব—পালি উরুবেলা। গয়ার দক্ষিণে প্রাচীন মগধরাজ্যের নিরঞ্জনা (=ফল্গু) নদীর তীরবর্তী অঞ্চল। এখানে সেনানিগাম স্থানটিতে গৌতম তপস্যা করেছিলেন। মজ্‌ঝিমনিকায়-এর অরিয়-পরিয়েসন সুত্তে উরুবিল্বের বর্ণনা :—'রমণীয় ভূমিভাগ, মনোহর বনখণ্ড, অদূরে স্বচ্ছসলিলা সতীর্থযুক্ত প্রবহমানা নদী; এবং সব দিকে গোচর-গ্রাম। সাধনপ্রয়াসী কুলপুত্রের উপযুক্ত স্থান।' বুদ্ধত্ব অর্জনের আগে কৃচ্ছ্রসাধনের পথ বর্জন করলে তাঁর 'পঞ্চবগ্গীয়' ব্রহ্মচারীগণ উরুবিল্বতেই তাঁকে ত্যাগ করে চলে যান। সাধারণ অন্ন গ্রহণ করবেন ঠিক করলে সেনানিগাম অধিবাসিনী সেনানীকন্যা সুজাতা তাঁকে পায়সান্ন দেন। যে গাছের নীচে গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন সেই

গাছ এই উরুবিল্ব অঞ্চলেই অবস্থিত। বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম এখানে অজপাল বটবৃক্ষ, মুচলিন্দ বৃক্ষ, ও রাজায়তনে গাছের নীচে কিছুদিন বাস করেছিলেন। পরে এই স্থানগুলিতে অনিমিস চৈত্য, রতনচংকম চৈত্য ও রতনঘর চৈত্য স্থাপিত হয়। উরুবিল্ব থেকে বুদ্ধদেব ইসিপতনে (সারনাথ) যান এবং ৬১ জন অর্হৎকে ধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে আবার উরুবিল্ব ফেরার পথে কপ্‌পাসিক বনে গিয়ে ভদ্দবগ্‌গীয় নামে যুবকদের দীক্ষা দেন। এরপর উরুবিল্বে ফিরে এসে এখানে জটিল তপস্বী তিন ভাই উরুবেল কস্‌সপ, নদী কস্‌সপ, ও গয়া-কস্‌সপ ও তাঁদের হাজার শিষ্যকে নিজের বিভূতি প্রভাবে মুগ্ধ করে দীক্ষা দেন।

উরুবেলা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বালির চড়া। কাহিনী আছে বুদ্ধের আগে দশহাজার তপস্বী এখানে বাস করতেন এবং তাঁদের রীতি ছিল তাঁদের কারো মনে কোন অসৎ চিন্তা এলে এক ঝুড়ি বালি এনে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় ফেলতে হবে। ফলে এই বালির চড়ার সৃষ্টি। মহাবস্তু অবদান মতে উরুবিল্বের সেনানি-গামের নাম সেনাপতি গ্রাম এবং এই গ্রামের পাশেই প্রস্কন্দক, বলাকল্প, উজ্জঙ্গল, ও জঙ্গল নামে আরো চারটি গ্রাম ছিল। মোট এই পাঁচটি গ্রাম মিলে উরুবিল্ব।

উরুবেল কস্‌সপ—দ্রঃ উরুবিল্ব। একজন বৈদিক তপস্বী; নিরঞ্জনা নদীতীরে বৈদিক ক্রিয়াকর্মে জীবন কাটাতেন। এঁর নিষেধ সত্ত্বেও বুদ্ধদেব এখানে এক রাত্রি বিষধর সর্প-পূর্ণ যজ্ঞগৃহে কাটান এবং দুটি সাপকে বশীভূত করেন। কসসপ তখন তাঁর দৈনিক আহারের ব্যবস্থা করেন। বুদ্ধদেব তারপর আরো অনেক আশ্চর্য কাজ করায় কস্‌সপ সশিষ্য বুদ্ধের শরণ নেন এবং অর্হত্ব পান। রাজগৃহে যাবার পথে এই শিষ্যরা অপর অনেককে সংঘভুক্ত করেন।

ঊর্ণনাভ—নাট্যশাস্ত্রে আটাশ প্রকার হস্তাভিনয়ের অন্তর্গত পদ্মকোষ হস্তের বক্রাঙ্গুলি। হিরণ্যকশিপুর দেহ চিরে ফেলবার সময় নরসিংহের আঙ্গুলগুলি যে অবস্থায় ছিল।

উর্ব—(১) পাণ্ডব বংশীয় পুরঞ্জয়ের ছেলে। কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মার সমান তেজস্বী হয়েছিলেন। একবার নিজের উরুতে হুতাসন প্রবিষ্ট করিয়ে তপস্যা করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ উরু ভেদ করে আগুন বার হয়। এই আগুনের নাম হয় উর্ব অনল। ব্রহ্মা এই আগুনকে সমুদ্রে স্থাপন করেন। অন্য মতে বংশ রক্ষার জন্য দেবতারা এঁকে বিয়ে করতে বলেন। কিন্তু ইনি বিয়ে না করেই আগুনে উরু-মন্থন করে ঔর্ব নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। (২) ভৃগু বংশে জন্ম। চ্যবনের ছেলে; ঋচীকের পিতা। ত্রিলোক পুড়িয়ে ফেলার জন্য ভীষণ আগুন সৃষ্টি করে ছিলেন। পরে সমুদ্রে এই আগুন সমর্পন করেন।

উর্বরা—জনৈক অপ্সরা।

উর্বরীয়ান—ক্ষমার (দ্রঃ) ছেলে।

উর্বশী—স্বর্গের অতি সুন্দরী অপ্সরা। ঋক, অথর্ব, শুক্লযজু, শতপথ-ব্রাহ্মণ, বৃহৎ-দেবতা, বোধায়ন-শ্রৌত-সূত্র, মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, শ্রীমদ্-

ভাগবৎ, ও কথাসরিৎসাগরে এঁর কাহিনী বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ান রয়েছে। এগুলির মধ্যে ঋক্‌বেদের সংবাদ স্থক্তের কাহিনী প্রাচীনতম।

নারায়ণের উরুভেদ করে জন্ম তাই নাম উর্বশী। উরুকে (=মহাপুরুষকে) যে বশ করেন তিনি উর্বশী। অন্য মতে সমুদ্র মন্থনে অপ্সরাদের সঙ্গে উঠেছিলেন। আর এক মতে সাতজন মনু এঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। অন্য মতে নরনারায়ণ (দ্রঃ) ঋষি এঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। অনূচানা, অদ্রিকা, অলম্বুষা, অম্বিকা, অসিতা, কাম্যা, ক্ষেমা, তিলোত্তমা, পুণ্ডরীকা, প্রমাথিনী, বিদ্যুৎপর্ণা, মিশ্রা, মরীচি, রম্ভা, শুচিকা, শরদ্বতী, সোমকেশী, সুবাহু, সুপ্রিয়া, সুগন্ধা, সুরমা ইত্যাদির মধ্যে গায়িকা হিসাবে ২১-শ স্থান ঃ সুন্দরী হিসাবে প্রথম স্থান।

শতপথে ও পুরাণে আছে পুরূরবা (দ্রঃ) ইন্দ্রের সভায় নাচ দেখতে এসেছিলেন। উর্বশীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকাতে উর্বশীর তালভঙ্গ হয়। ফলে ইন্দ্রের শাপে উর্বশীকে মর্ত্যে এসে বাস করতে হয় এবং পুরূরবার স্ত্রী হন। অন্য মতে ব্রহ্মার শাপে আর এক মতে মিত্রাবরুণের শাপে মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়। পুরূরবার খ্যাতি শুনে রাজপ্রাসাদে এসে দেখা করেন এবং রাজাও মুগ্ধ হয়ে যান ; বিয়ে করতে চান।

সর্ত থাকে দিনে তিনবার মত তিনি উর্বশীকে আলিঙ্গন করতে পারবেন ; উর্বশী কামার্তা না হলে পুরূরবা সঙ্গম করতে পারবেন না। এবং সঙ্গমকাল ছাড়া রাজাকে যেন কোন দিন উর্বশী উলঙ্গ অবস্থায় না দেখেন। উর্বশীর বিছানার পাশে পুত্রবৎ দুটি মেষশাবক বাঁধা থাকবে ; উর্বশী তাদের ছেলের মত পালন করবেন ; রাজাকেও তাদের যত্ন করতে হবে। এবং রাজা/উর্বশী একসন্ধ্যা ঘৃত মাত্র আহার করবেন। বহু দিন এঁরা স্বামীস্ত্রী রূপে কাটাবার পর দেবলোকে এ দিকে উর্বশীর অভাবে ভীষণ অসুবিধা দেখা দিলে উর্বশীকে ফিরিয়ে আনার জন্য ইন্দ্র গন্ধর্বদের নির্দেশ দেন। গন্ধর্বরাজও উর্বশীর অভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

এক দিন মধ্য রাত্রিতে গন্ধর্ব বিশ্বাবসু উর্বশীর মেষশিশু দুটি চুরি করলে এদের চিৎকারে উর্বশী বিচলিত হয়ে ঘুমন্ত রাজাকে কটূক্তি করেন এবং ভেড়া খুঁজে আনবার জন্য ডাকেন। রাজা ধড়মড়িয়ে উঠে উলঙ্গ অবস্থাতেই ধনুর্বাণ নিয়ে ছুটে যান এবং গন্ধর্বরা এই সময় বিদ্যুৎ চমকের ব্যবস্থা করে প্রাসাদ আলোকিত করে তুললে উলঙ্গ রাজাকে দেখে উর্বশী শাপমুক্ত হয়ে যান। গন্ধর্বরা মেষশিশু দুটি ফেলে যান এবং রাজা এ দুটিকে ফিরিয়ে আনেন। সংবাদসূক্ত অনুযায়ী উর্বশী ৪ বছর ছিলেন এবং গর্ভবতী হবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়ে যান। এই বিচ্ছেদের কারণ পুরূরবার প্রতি অনেকগুলি শাপ ছিল।

পরে এদের মিলন হয়েছিল কিনা বৈদিক সাহিত্যে নাই। শোকে রাজা ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়েন এবং দেশে দেশে উর্বশীকে খুঁজতে থাকেন। এক দিন শেষ পর্যন্ত একটি সরোবরে অন্যান্য অপ্সরাদের সঙ্গে তাঁকে খেলা করতে দেখেন। রাজা অনেক অনুনয় বিনয় করেন। আত্মহত্যার ভয় দেখান কিন্তু উর্বশী ফেরেন না।

অন্য মতে রাজা কুরুক্ষেত্রের কাছে হংসী দেহধারী চারজন অপ্সরার সঙ্গে উর্বশীকে স্নান করতে দেখে তাঁকে ফেরবার জন্য বার বার অনুরোধ করেন। উর্বশী তখন সেই বিখ্যাত শ্লোক শোনান :—

রাজাকে সান্ত্বনা দেন এবং জানান রাজার সহবাসে তিনি তখন গর্ভবতী। বছর শেষ হয়ে এলে এই সন্তানকে তিনি রাজার কাছে দিয়ে যাবেন। আর এক মতে রাজা বদরিকাশ্রমে বিষ্ণুর তপস্যা করতে থাকেন। উর্বশীও রাজার জন্য কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তপস্যাতে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন এবং গন্ধর্বরা উর্বশীকে ফিরিয়ে দেন। ঠিক হয় বছরে এক বাব দুজনের মিলন হবে। সারা রাত্রি তিনি এই দিনে রাজার কাছে থাকবেন। এর পর প্রতি বছরে এঁদের মিলন হয়েছিল এবং ৫-টি অন্যমতে ৭-টি ছেলে হয়েছিল। প্রথম ছেলে আয়ু। এরপর বিশ্বায়ু, শতায়ু, বলায়ু, (বনায়ু ?) দৃঢ়ায়ু, শ্রুতায়ু, ও অমাবসু ছেলে হয়েছিল। সত্যায়ু, রয়, বিজয়, জয় নামও দেখা যায়। এরপর উর্বশী একদিন পুরূবাকে জানান গন্ধর্বরা তাঁকে যে কোন বর দিতে রাজি আছেন। পুরূরবা তখনই বব চান উর্বশীর সঙ্গে যেন বাস করতে পারেন। গন্ধর্বরা তখন একটি আগুনের পাত্র এনে রাজাকে গ্রহণ করতে বলেন এবং বেদের বিধান অনুসারে এই অগ্নিকে তিন ভাগ করে এবং তারপর উর্বশীতে মনঃসংযোগ করে আহুতি দিতে বলেন। বাজা আহুতি দিযে স্বামিস্ত্রী হিসাবে গন্ধবলোকে গিয়ে বাস করতে থাকেন। আর এক মতে রাজা অগ্নিস্থালী নিযে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে থাকেন এবং বনে এক জাযগায এটি ফেলে রেখে প্রাসাদে ফিরে আসেন। এই দিন থেকে ত্রেতা যুগ আরম্ভ হয। রাজার মনে তিনটি বেদ স্ফুট হয়ে ওঠে। রাজা তারপর বনে ফিরে এসে অগ্নি স্থালীটি ফিরে পান। এরপর বটগাছের ডালে দুটি অরণি তৈরি করে অরণি দুটির মাঝখানে নিজের দেহ স্থাপন করে অগ্নি প্রজ্বলিত করেন ; এই অগ্নির নাম জাতবেদস্—এটি পুরূরবার ছেলে। এই জাতবেদস্ থেকে পুরূরবা আরো তিনটি অগ্নি প্রণব, নারায়ণ ও অগ্নিবর্ণ যথাক্রমে উৎপাদন করেন।

শ্রীমৎভাগবৎ অনুসারে নরনারাযণ (দ্রঃ) ঋষির উরু থেকে জন্ম। বৃহৎ দেবতায় আছে মিত্রাবরুণ আদিত্য যজ্ঞে নিমন্ত্রণে এসে উর্বশীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান এবং দুজনেরই বীর্য স্খলিত হয়। দেবতা দুজন এতে ক্রুদ্ধ হযে শাপ দেন উর্বশী পৃথিবীতে নির্বাসিতা হয়ে থাকবেন। পৃথিবীতে এসে উর্বশী পুরূরবার স্ত্রী হন। মিত্রা-বরুণের স্খলিতবীর্য কুম্ভে পতিত হলে সেই বীর্যে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ জন্মান। পদ্মপুরাণে আছে বিষ্ণু একবার ধর্মপুত্র হয়ে গন্ধমাদনে তপস্যা করছিলেন। ইন্দ্র ভয়ে অপ্সরা, বসন্ত ও কামদেবকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এঁরা বিষ্ণুর ধ্যান ভাঙতে পারেন না। তখন কামদেব অন্য মতে ইন্দ্র অপ্সরাদের উরু থেকে অন্যমতে ইন্দ্র নিজের উরু থেকে উর্বশীর সৃষ্টি করে বিষ্ণুর তপস্যা ভঙ্গ করেন। এইজন্য সন্তুষ্ট হয়ে এবং উর্বশীর রূপে মুগ্ধ হয়েও বটে ইন্দ্র এঁকে গ্রহণ করলেন। পরে মিত্রাবরুণ উর্বশীকে চান কিন্তু উর্বশী এঁদের প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলে মিত্রাবরুণের অভিশাপে উর্বশী মনুষ্যভোগ্যা হয়ে পুরূরবার স্ত্রী হন।

আয়ুর বংশে পুরু জন্মান ফলে উর্বশী পৌরব বংশের জননী। অর্জুন যখন দিব্যাস্ত্র লাভের জন্য ইন্দ্রলোকে যান তখন ইন্দ্রের আদেশে উর্বশী এক দিন অর্জুনের মনোরঞ্জন করতে আসেন। কিন্তু পুরূরবার স্ত্রী বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্জুন উর্বশীকে ফিরিয়ে দেন। উর্বশী বোঝাতে চেষ্টা করেন কিন্তু বিফল হয়ে শেষ পর্যন্ত অভিশাপ দেন এই প্রত্যাখ্যানের জন্য অর্জুনকে এক বছর নপুংসক হয়ে কাটাতে হবে। বিক্রম উর্বশী নাটকে কালিদাসের মতে কেশী দৈত্য উর্বশীকে হরণ করেন। পুরূরবা তাঁকে উদ্ধার করলে দুজনে প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। স্বর্গে এক দিন অভিনয় কালে ভুল করে উর্বশী পুরূরবার নাম উল্লেখ করাতে শাপগ্রস্তা হয়ে মর্ত্যে এসে রাজার স্ত্রী হন। পুত্র-মুখ দেখার পর শাপমোচন হয়। পরে নারদের বরে উর্বশী ও পুরূরবার মিলন চিরস্থায়ী হয়। অগস্ত্যের (দ্রঃ) শাপে উর্বশী মাধবী হয়ে জন্মান। দ্রঃ উন্মদা, মিত্রা-বরুণ, অষ্টবজ্র।

পণ্ডিতদের মতে বেদের এই আদি কাহিনীতে সূর্য ও উষার মিলন কাহিনীর সন্ধান মেলে। বা মর ও অমরের ভালবাসার রূপক। অন্য মতে পুরূরবা সূর্য এবং উর্বশী প্রভাতের কুয়াসা। সূর্যের আলো ফুটলেই কুয়াসা মিলিয়ে যায়। অপ্সরারা কুযাশার প্রতীক ; তারা কুয়াশা বা মেঘরূপে সূর্য কর্তৃক আকৃষ্ট হন।

(২) যেহেতু গঙ্গা শান্তনুর পিতার উরুতে বসেছিলেন সেই হেতু গঙ্গার এক নাম।

উলূক—(১) শকুনির ছেলে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আগে দুর্যোধনের দূত হয়ে পাণ্ডবদের কাছে এসেছিলেন। অর্জুন জানিয়ে দিয়েছিলেন যুদ্ধে গাণ্ডীবের সাহায্যে দুর্যোধনের প্রস্তাবের উত্তর তিনি পাঠিয়ে দেবেন। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিলেন। দ্রোণের মৃত্যুর পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। যুদ্ধে ১৮ দিনের দিন সহদেবের ভল্লের আঘাতে মারা যান। (২) কূর্মপুরানে একজন মহর্ষি। ( ) একজন যক্ষ। (৪) বিশ্বামিত্রের এক ছেলে। শর শয্যায় শায়িত ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

উলূপী—ঐরাবত (দ্রঃ) বংশে কৌরব্য নাগের মেয়ে। স্বামী গরুড়ের হাতে মারা যান। অর্জুন যখন বার বৎসর বনবাসী ছিলেন সেই সময়ে এক দিন গঙ্গায় স্নান করতে নামলে কামাতুরা উলূপী তাঁকে পাতালে নাগলোকে টেনে নিয়ে যান এবং অর্জুনকে বিয়ে করেন। উলূপী তারপর অর্জুনকে বর দেন জলে অর্জুন অজেয় হবেন এবং সমস্ত জলচর জীব অর্জুনের বশীভূত হবেন। উলূপীর ছেলে ইরাবান। অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে অর্জুন মণিপুরে এলে বভ্রুবাহন পিতাকে অভ্যর্থনা করতে আসেন। কিন্তু অর্জুন ছেলেকে ক্ষত্রিয়োচিত কাজ করতে বলায় এবং আর এক দিকে উলূপীর প্ররোচনায় বভ্রুবাহন যজ্ঞাশ্ব চুরি করেন এবং যুদ্ধ হয়। উলূপীর মাথাতে অর্জুন ছেলের হাতে নিহত হন। এই মৃত্যুর মূল কারণ শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মকে বাণবিদ্ধ করা। এইভাবে ভীষ্মকে পরাজিত করার জন্য গঙ্গা ও অন্যান্য বসুরা অর্জুনকে নরকে যাবার শাপ দিয়েছিলেম। শাপের কথা জানতে পেরে উলূপী

তৎক্ষণাৎ নিজের পিতাকে গিয়ে জানান এবং উলূপীর পিতা বসুদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। ঠিক হয়েছিল বভ্রুবাহনের হাতে অর্জুনকে একবার মৃত্যুবরণ করতে হবে। অর্জুন মারা গেলে দিব্যমণি প্রভাবে উলূপী আবার জীবিত করে দেন। উলূপী যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে যোগদান করেছিলেন এবং কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রার সঙ্গে আলাপ করে যান ও নানা উপহার দেন। গান্ধারীকেও সেবা পরিচর্যা করেছিলেন। মহাপ্রস্থানের সময় উলূপী গঙ্গাতে প্রবেশ করেন।

উল্মুক—(১) বৃষ্ণি বংশীয় রাজা। বলরামের ঔরসে রেবতীর গর্ভে জন্ম। (২) মনুর স্ত্রী নড্‌লার ছেলে। ধ্রুব বংশীয় রাজা।

উশনস্—ভৃগু মুনির ছেলে। পিতৃদত্ত নাম কাব্য। পরবর্তী যুগে অসুরগুরু শুক্রাচার্য হয়েছিলেন।

উশিক, উশিজ—কলিঙ্গ রাজমহিষীর ধাত্রী। পুত্র লাভের আশায় রাজা স্ত্রীকে ঋষি দীর্ঘতমার কাছে যেতে বলেন। কিন্তু রাণী এঁকে পাঠিয়ে দেন। দীর্ঘতমা এ ঘটনা জেনেও উশিজকেই পুত্রদান করেন। ঋক্‌বেদে এই ছেলের নাম কক্ষীবান্। পালক পিতার দিক থেকে কক্ষীবান ক্ষত্রিয় কিন্তু দীর্ঘতমার দিক থেকে ব্রাহ্মণ।

উশিক—ঋকবেদে এক ঋষি।

উশীনর—(১) যদু বংশের এক রাজা। বসুদেব পত্নী রোহিণীর ছেলে। (২) চন্দ্রবংশীয় রাজা। মহামনার ছেলে ও শিবির পিতা। ৫-টি স্ত্রী নৃগা, নরী, কৃমী, দশা ও দৃষদ্বতী এদের ছেলে যথাক্রমে নৃগ, নর, কৃমি, সুব্রত ও শিবি। দ্রঃ উশীনর-২। (৩) যযাতি(১)-অনুদ্রুহ্যু(২)-সৃঞ্জয়(৫)-উশীনর(৬)>(৭) শিবি ও বেন। বিতস্তা নদীর তীরে নানা যজ্ঞ করে ইন্দ্রের চেয়ে/সমান শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠেন। এঁকে অন্য মতে শিবিকে পরীক্ষা করার জন্য অগ্নি কপোত রূপে এসে রাজার কোলে আশ্রয় নেন। পেছনে শ্যেনরূপী ইন্দ্র এসে ভক্ষ্য কপোতকে ফিরে চান। কিন্তু রাজা শরণাগতকে ছাড়তে রাজি হন না। বরং কপোতের পরিবর্তে যে কোন জিনিস দিতে অঙ্গীকার করেন। শ্যেন রাজার দেহ থেকে কপোতের সমান ওজন মাংস চান। রাজা রাজি হন কিন্তু বারবার মাংস কেটে নিয়েও কপোতের সমান ওজনের হয় না। রাজা তখন নিজেই তুলাদণ্ডে উঠে বসেন। রাজার এই ত্যাগে অগ্নি ও ইন্দ্র নিজেদের রূপ ধরে রাজাকে আশীর্বাদ করে ফিরে যান। এই উশীনরের মেয়েকে (নাম্না জিনবতী নাম ; মহা ১।৯৩।২১) উপহার দেবার জন্য বসু-দ্যু স্ত্রীর কথায় নন্দিনী গরুকে চুরি করেছিলেন। (৪) যযাতির মেয়ে মাধবীর স্বামী।

উশীনর—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ মতে মধ্য দেশ কুরুপাঞ্চালের নিকট একটি জনপদ। গোপথব্রাহ্মণে আছে বশ (পরবর্তীকালে বৎস) ও উশীনর গোষ্ঠী একত্র বাস করতেন। সম্ভবত ঋক্‌বেদের কালেও এঁরা এই দেশেই বাস করতেন। অনেকের মতে পরবর্তী যুগে কাশী ও বিদেহ গোষ্ঠী এঁদেরই বংশধর। পুরাণে আছে চন্দ্রবংশীয় আনব গোষ্ঠীর উশীনর নামে এক রাজা পাঞ্জাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর ৫-ছেলের মধ্যে পরে রাজ্য ভাগ করে দেন। ছেলেদের মধ্যে শিবি মূলতানের

সিংহাসনে বসেন। এই শিবি অন্য ভাইদের থেকেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং শিবি গোষ্ঠী স্থাপন করেন। পশ্চিম পাকিস্থানের মণ্টগোমারি জেলা ও বর্তমান বিকানীর জেলার উত্তরাংশ নিয়ে নৃগ একটি পৃথক রাজ্য তৈরি করেন। যৌধেয়গণ এই বংশের সন্তান। নব 'নবরাষ্ট্রের' এবং কৃমি কৃমিলা সহরের রাজাদের পূর্বপুরুষ। 'সুব্রত' সম্ভবত পূর্বপাঞ্জাবে অম্বষ্ঠগণের আদিপুরুষ।

উশেক—যযাতি বংশে কৃতির ছেলে।

উষীরবীজ—উত্তর ভারতে একটি পর্বত।

উষদ্গু—যদুবংশে এক রাজা। সর্বদা যজ্ঞ করতেন বলে প্রসিদ্ধ।

উষ্ণিক—(১) বৈদিক ত্রিপাদ ছন্দ। (২) লৌকিক চতুষ্পাদ সপ্তাক্ষর ছন্দ। (৩) সূর্যের একটি অশ্ব।

উষ্ণিনাভ—একজন বিশ্বদেব।

ঊ

ঊরু—মনুর ছেলে। স্ত্রী আত্রেয়ী। সন্তান অঙ্গ, সুমনস, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস, গয়।

ঊর্জ—(১) চিত্ররথ গন্ধর্বের স্ত্রী। (২) স্বরোচিষ মনুর ছেলে। স্বরোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ঊর্জ,, স্তম্ভ, প্রাণ, বাত, ঋষভ, নিরয়, পরীবান। (৩) হেহয় বংশে জরাসন্ধের পিতা।

ঊর্জযোনি—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে।

ঊর্জস্বতী—স্বায়ম্ভুব মনুর ছেলে প্রিয়ব্রত ও বিশ্বকর্মার মেয়ে সুরূপার দশটি ছেলে; এবং একটি মেয়ে হয় ঊর্জস্বতী। ঊর্জস্বতীর স্বামী শুক্র ; মেয়ে দেবযানী (যাযতির স্ত্রী)।

ঊর্জা—বশিষ্ঠের স্ত্রী। ছেলে রজস্, গোত্র, ঊর্দ্ধবাহু, সবন, অনঘ, সুতপস্, শুক্র তৃতীয় মন্বন্তরে এঁরা সপ্তর্ষি।

ঊর্জাণী—সূর্যকন্যা (ঋক্‌বেদ)।

ঊর্ণনাভ—সুদর্শন। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত হন।

ঊর্ণা—(১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মরীচির স্ত্রী। এঁর ছয়টি শক্তিমান পুত্র। ছেলেরা ব্রহ্মাকে দেখে বিদ্রূপ করেন বাপ হয়ে মেয়ে সরস্বতীকে বিয়ে করেছেন। ব্রহ্মা তখন এদের দৈত্য হয়ে জন্মাতে শাপ দেন। কালনেমির ছেলে হয়ে জন্মায়। পরবর্তী জন্মে হিরণ্যকশিপুর সন্তান হয়ে জন্মান এবং ধার্মিক ভাবে জীবন যাপন করতে থাকেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চান এবং এঁরা অজেয় হবার বর চান। হিরণ্যকশিপুকে না জানিয়ে এই ভাবে বর চাওয়া হিরণ্যকশিপু সহ্য করতে না পেরে শাপ দেন পাতালে গিয়ে ষড়ভক হয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটাবে। ছেলেরা কাতর হয়ে পড়লে হিরণ্যকশিপু তখন বলেন বহুদিন ঘুমাবার পর দেবকীর সন্তান হয়ে জন্মাবে এবং কালনেমি কংস হয়ে জন্মাবে এবং কংস এদের আছাড় মেরে হত্যা করবে। (২) রোমাবর্ত। চক্রবর্তী

যোগীর ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে সূক্ষ্ম, শুভ্রায়ত রোমাবর্ত। মহাপুরুষের চিহ্ন।

ঊর্ধ্বগপুর—(১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের নগর। (২) পুর নামে অসুরের নগর

ঊর্ধ্বতিলক—ঊর্দ্ধপুণ্ড্রক, ঊর্দ্ধফোঁটা। সম্প্রদায় বিশেষের কপালে চিহ্ন।

ঊর্ধ্ববাক্—একটি অগ্নি। বৃহস্পতির ৫ম পুত্র এই অগ্নি।

ঊর্ধ্ববাহু—(১) শৈব সন্ন্যাসী। এক বা দুহাত উঁচু করে অবস্থান করে থাকেন। জটাধারী। নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান নাই। (২) বশিষ্ঠ ও ঊর্জার সন্তান।

ঊর্ধ্বরেতা—(১) যার বীর্য ঊর্দ্ধগামী, স্খলিত হয় না। ব্রহ্মচারী। (২) দক্ষযজ্ঞে সতী মারা গেলে মহাদেব নিজের বীর্যকে ঊর্দ্ধগত করেন। (৩) সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার ইত্যাদি ৮৮,০০০ ঋষি; এঁদের সকলেরই এই বিশেষণ ব্যবহৃত হয়।

ঊর্ধ্বাম্নায়—ব্যাসদেবের কাছে নারদ এই শাস্ত্র প্রকাশিত করেন। গুরুভক্তি মৎস্যাদি অবতার বর্ণনা, গৌরাঙ্গ মাহাত্ম্য, কৃষ্ণপূজাবিধি, নারায়ণ স্তব, গয়া মাহাত্ম্য ইত্যাদি ১২টি অধ্যায় যুক্ত শাস্ত্র।

ঊর্ব—দ্রঃ ঊর্ব।

ঊর্বশর—ভরত বংশে রাজা মহাবীর্যের ছেলে।

ঊর্মিলা—মিথিলার রাজা জনকের ঔরস জাত মেয়ে। সীতার ছোট। লক্ষ্মণের সাথে বিয়ে হয়। ঊর্মিলা বনে যান নি। রাম রাজা হবার পর ঊর্মিলার দুই ছেলে হয় অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু। লক্ষ্মণ বর্জনের পর ঊর্মিলা আগুণে প্রাণ বিসর্জন করেন।

ঊষা—বৈদিক দেবতা। ঋক্ বেদে কুড়িটি সূক্তে এই দেবতার স্তুতি রয়েছে। ঋষিগণ ঊষাকে অপূর্ব সজ্জায় ভূষিতা তরুণী রমণীরূপে কল্পনা করেছেন। ঋক্ (১।৯২।৪) নর্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করেছেন এবং গাভী যেমন দোহনকালে নিজের উধঃ প্রকাশ করে ঊষাও সেই রকম নিজ বক্ষ প্রকাশ করেছেন। ঋক্ (১।১১৩।১৪):—সুপ্ত প্রাণীদের জাগিয়ে ঊষা অরুণাশ্ব রথে এগিয়ে আসছেন। ঋক্ (১।১১৫।২):—মানুষ যেমন নারীর পেছনে যান সূর্য সেই রকম দীপ্তিমতী ঊষার পেছনে আসছেন। ঋক্ (১।১২৩।১১):—মা দেহমার্জনা করে দিলে মেয়ের শরীর যেমন উজ্জ্বল হয়, ঊষা তুমিও সেই রকম দর্শনীয় আপন শরীর প্রকাশ কর। ১।৯২।১০ মন্ত্রে বলা হয়েছে ব্যাধের স্ত্রী যেমন চলনশীল পক্ষীর পক্ষ ছেদ করে হিংসা করে সেই রকম বার বার আবির্ভূত হয়ে নিত্য এবং এক রূপধারিণী ঊষা (দিনে দিনে) সমস্ত প্রাণীর জীবন হ্রাস করেন। ১।১২৩।২ মন্ত্রে কক্ষিবান বলছেন, 'ঊষা যুবতী; বার বার তাঁর আবির্ভাব হয়।' ঊষাকে দিবোদুহিত এবং নক্তম্ (রাত্রি) ও ঊষাকে দুই বোন ও দিব্যযোষা বলা হয়েছে। সূর্যকে ঊষার প্রণয়ী বলা হয়েছে এবং প্রণয়ীর মতই তিনি ঊষার অনুগমন করেন। আবার অন্য জায়গায় অগ্নিকে ঊষার প্রণয়ী বলা হয়েছে। ঊষা অশ্বিদ্বয়ের সখী। ঊষার রথের বাহক অরুণবর্ণ অশ্ব, গো বা বৃষভ। মঘোনী, ঋতাবরী, হিরণ্যবর্ণা, অমৃতা, দক্ষিণা প্রভৃতি বিশেষণ ঊষার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ঋক ৬।৫৯।৬ থেকে এবং অন্য বর্ণনা থেকে মনে হয় বৈদিক ঊষা আমাদের পরিচিত স্বল্পস্থায়ী ঊষা নয়; দীর্ঘকাল স্থায়ী।

প্রজাপতির মেয়ে ; আদিত্য দেবের বোন। এঁর কাপড় জ্যোতি। চির-যৌবনা এবং সমস্ত সৌন্দর্যের আধার। সোমের (=চন্দ্র) সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়। কিন্তু খবর পেয়ে অগ্নি, সূর্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এসে পাণিপ্রার্থনা করেন। প্রজাপতি তখন ঘোষণা করেন অনন্ত আকাশ পথে অনুধাবনে যিনি সফল হবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বরচিত যত বেশি বেদ সূক্ত আবৃত্তি করতে পারবেন তাঁর সঙ্গেই উষার বিয়ে হবে। অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য বিফল হন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্রের কাছ থেকে বেদসূক্ত লাভ করে শেষ পর্যন্ত সফল হন ও উষাকে লাভ করেন। কিন্তু সকলেই সূর্যের অনুচর বলে এবং সূর্যের প্রীতি কামনায় উষাকে কেউ গ্রহণ করেন না। শেষ পর্যন্ত সূর্যই গ্রহণ করেন। (২) রাত্রি শেষের নাম উষা, দিনের নাম ব্যুষ্টি। উষা ও ব্যুষ্টির মধ্যবর্তী সময় সন্ধ্যা। (৩) বিরোচন-বলি-বাণ-উষা। প্রহ্লাদের পৌত্র শোণিতপুরের রাজা বাণাসুরের মেয়ে। পার্বতীর এক সখী। পার্বতীকে মহাদেবের সঙ্গে বিহার করতে দেখে নিজেও যাতে স্বামীর সঙ্গে ঐ রকম বিহার করতে পারেন কামনা করেন। পার্বতী জানতে পেরে বর দেন তিন দিনের মধ্যে স্বপ্নে উষা এক জন সুপুরুষ রাজকুমারের সঙ্গে বিহার করবেন এবং এই উষার স্বামী হবে। উষা এর পর স্বপ্ন দেখেন এবং সখী চিত্রলেখার সাহায্যে স্বপ্নে দেখা প্রণয়ী অনিরুদ্ধের (দ্রঃ) সাথে বিয়ে হয়। দ্রঃ তিলোত্তমা। (৪) বিদর্ভরাজ সত্যরথ শাল্বের হাতে নিহত হলে মহিষীরা বনে চলে যান। একটি রাণী গর্ভবতী ছিলেন ; নদীতীরে উষা নামে তাঁর একটি মেয়ে হয়। প্রসূতি তারপর জলে নামলে কুমীরে এঁকে খেয়ে ফেলে। মুনি কন্যারা উষাকে পালন করেন। (৫) পুরাণে ভব নামে শিবের জলমূর্তি।

উষ্মা—পাঞ্চজন্য নামে অগ্নির পুত্র।

উষ্মাপা—পিতৃগণ। এঁরা যমালয়ে বাস করেন।

ঋ

ঋক্—বেদের তিন রকম মন্ত্রের অন্যতম। এই মন্ত্রগুলির অক্ষর, চরণ ও অবসান নিয়মবদ্ধ থাকে। এই মন্ত্রে দেবতাদের স্তব করা হয়। ঋক্‌বেদও বুঝায়।

ঋক্‌বেদ—ভারতীয় আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। চারটি বেদের মধ্যেও প্রাচীনতম। ম্যাক্সমূলার মতে (১) ১২০০-১০০০ খৃঃ পূ পর্যন্ত ছান্দস যুগ: (২) ১০০০-৮০০খৃ-পূ পর্যন্ত মন্ত্র যুগ। এই দুটি যুগেই ঋকসংহিতার সমস্ত মন্ত্র রচিত ও সংকলিত হয়েছিল। (৩) ৮০০-৬০০ খৃ-পূ ব্রাহ্মণ যুগ এবং (৪) ৬০০-২০০ খৃ-পূ সূত্র যুগ। অন্য মতে ২৪০০-২০০০ খৃ-পূর্বে রচিত। কাল সম্বন্ধে বহু বিতর্ক আছে। ঋক্‌বেদে উল্লিখিত নক্ষত্র ইত্যাদির অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে রচনা কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকেও ভারতে

আর্যদের প্রবেশ কাল নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে, এবং এদিক থেকে ১৪০০ খৃঃ পূর্বের আগে বেদ রচিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। বর্তমানে যে সংকলন প্রচলিত তাতে ১০১৭ সূক্ত এবং ১১টি বালখিল্য সূক্ত মোট ১০২৮। সূক্তগুলি দশটি মণ্ডলে বিভক্ত, এইজন্য বইটির অপর দাশতয়ী। ১ মণ্ডলে ১৯১ সূক্ত, ২ মণ্ডলে ৪৩, ৩য় মণ্ডলে ৬২, ৪র্থ মণ্ডলে ৫৮, ৫ম মণ্ডলে ৮৭, ৬ষ্ঠ মণ্ডলে, ৭৫, ৭ম মণ্ডলে ১০৪, ৮ম মণ্ডলে ৯২, ৯ম-মণ্ডলে ১১৪, ১০ম মণ্ডলে ১৯১ মোট ১০১৭। বর্তমানে প্রচলিত ঋক শাকল শাখার অন্তর্গত। বিভিন্ন সংস্করণের ৮ম মণ্ডলে অতিরিক্ত (৮।৪৯-৮।৫৯) সূক্ত বালখিল্য সূক্ত নামে পরিচিত। এই এগারটি সূক্ত সম্ভবত ঋকবেদের অপর শাখার অংশ। ঋকবেদের খিল বা পরিশিষ্ট রূপেও আরও কয়েকটি সূক্ত পাওয়া যায়। ঋক্ সংখ্যা ১০৪১৭। বেশির ভাগ সূক্তগুলি স্তব। প্রতি মণ্ডলে কয়েকটি করে অনুবাক আছে। আর এক বিভাগ অনুসারে বইটি আটটি অষ্টকে বিভক্ত, প্রতি অষ্টকে আটটি বর্গ এবং প্রতি বর্গে পাঁচটি মন্ত্র বা ঋক। মণ্ডল বিভাগটি প্রাচীন এবং যুক্তিযুক্ত বিভাগ। দশটি মণ্ডলের মধ্যে ২য়-থেকে ৭ম মণ্ডল যথাক্রমে গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ ও বসিষ্ঠ এবং এঁদের বংশধরদের দ্বারা রচিত। অর্থাৎ এক একটি মণ্ডলে এক একটি বংশের রচনা। ৮ম মণ্ডলের নাম প্রগাথা মণ্ডল, ৯ম মণ্ডলের নাম পবমান মণ্ডল। ১ম এবং ১০ম মণ্ডল পরবর্তী কালের রচনা বলে মনে হয়। ১ম মণ্ডল অনেকগুলি রচনাকারের দ্বারা রচিত। ৮ম মণ্ডল প্রধানত কণ্ব গোত্রীয় ঋষিদের দ্বারা রচিত। ৯ম মণ্ডলে প্রতি সূক্তের দেবতা 'পবমান সোম' অর্থাৎ যজ্ঞে সোমের উদ্দেশ্যে যে সব মন্ত্র পাঠ করা হত সেগুলির সংকলন, রচনাকার বৈশ্বামিত্র, কাণ্ব, কাশ্যপ, আঙ্গিরস ইত্যাদি। ১০ম মণ্ডলও বিভিন্ন রচনাকারের রচনা। অষ্টম মণ্ডলে এক একটি রচনাকারের সূক্তগুলি এক এক স্থানে একত্র করা আছে. প্রতি রচনাকারের সূক্তগুলি আবার দেবতা অনুসারে ভাগ ভাগ করা রয়েছে.

পতঞ্জলি মহাভাষ্যে আছে বহ্বৃচ-দের মধ্যে ঋকবেদের একুশটি শাখা ছিল। কিন্তু উপস্থিত শাকল শাখা ছাড়া অন্য শাখা পাওয়া যায় নি। লিখিত পুঁথি সম্ভব ছিল না, যার ফলে প্রধানত নতুন শাখা গড়ে ওঠা সহজ হয়েছিল। অন্য কতকগুলি শাখার নাম:-বাস্কল, আশ্বলায়ন, শাঙ্খায়ন, মাণ্ডূক, ঐতরেয়ী, কৌষিতকী, শৈশিরী, পৈঙ্গী।

মহর্ষি শৌনকের রচনা 'ঋক্‌প্রাতিশাখ্য' এবং শাকল্যের 'পদপাঠ' ইত্যাদি গ্রন্থের কারণে ঋক্‌বেদের এই শাকল্যশাখার লুপ্ত হয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। এই সমস্ত গ্রন্থে ঋক সংহিতাকে নানা দিক থেকে এমন ভাবে আলোচিত হয়েছে যে শাকল শাখার মূল গ্রন্থকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। অর্থের দিকে মহর্ষি যাস্কের নিরুক্ত বেদের অপ্রচলিত শব্দ ইত্যাদির অর্থ নির্দ্ধারণে অপরিসীম সাহায্য করে। এ ছাড়া আধুনিক তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে প্রাচীন ইরানীয়, গ্রীক, লাটিন ও অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষার শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে বহু এখনও-অজ্ঞাত বৈদিক শব্দের যথার্থ অর্থ নির্ণয় সম্ভব হচ্ছে। বৈদিক ভাষার আর একটি বিশেষত্ব

শব্দের উচ্চারণ ভঙ্গি। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত এই তিনটি উচ্চারণ ভঙ্গি বৈদিক শব্দের অর্থান্তর ঘটায়। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনার মাধ্যমে উচ্চারণ ভঙ্গির আলোচনায়ও বহু জ্ঞাতব্য জিনিস অবগত হওয়া গেছে।

ভাষার দিক থেকে বৈদিক সংস্কৃতে সমাস কম কিন্তু সন্ধি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ ও প্রত্যয় প্রভৃতির বৈচিত্র্য প্রচুর। ঋক্ মন্ত্রগুলি মূলত গায়ত্রী (২৪ অক্ষর), উষ্ণিহ্ (২৮ অক্ষর), অনুষ্টুভ (৩২ অক্ষর), বৃহতী (৩৬ অক্ষর), পঙক্তি (৪০ অক্ষর), ত্রিষ্টুভ (৪৪ অক্ষর), জগতী (৪৮ অক্ষর) এই সাতটি প্রধান ছন্দে রচিত। কবির কল্পনা হিসাব ঋক্ মন্ত্রের বহু স্থান অপূর্ব সুন্দর। ঋক অর্থে পাদ-নিবদ্ধ মন্ত্র। হিরণ্য পশু ও পুত্র ইত্যাদি ঐহিক এবং স্বর্গাদি পারলৌকিক লাভের জন্য ঋষিরা এই সব মন্ত্রে দেবতাদের স্তব করতেন। কিছু ঋকে দেবতাদের প্রথম পুরুষে এবং কিছু ঋকে মধ্যম পুরুষে স্তব করা হয়েছে। এ ছাড়াও কিছু ঋকে রচনাকার ঋষি ও দেবতা যেন এক হয়ে গেছেন ; ঋক্‌গুলির ক্রিয়াপদ এখানে উত্তম পুরুষ। এই ভাবে ক্রিয়াপদ অনুসারে ঋকগুলিকে যাস্ক তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। ঋকগুলিকে আর এক ভাবে ভাগ করা হয়ঃ-কিছু ঋকে দেবতাদের স্তব ; কিছু ঋকে কথোপকথন ছলে বর্ণনা যেমন সংবাদ সূক্ত অংশ, কিছু ঋকে আথর্বন মন্ত্রের মত শপথ, অভিশাপ ইত্যাদি, কিছু সূক্তে লৌকিক বিষয়ের অবতারণা যেমন 'অক্ষসূক্তগুলি', কিছু সূক্তে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব বর্তমান। ভাষার দিক থেকে প্রাচীন ইরানীয়দের আবেস্তার সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে অনেক ক্ষেত্রে আবেস্তার মন্ত্রগুলির ধ্বনি পরিবর্তন করে নিলে ঋক মন্ত্রে রূপান্তরিত হয়।

ঋক্‌বেদের দেবতাদের মধ্যে প্রধান অগ্নি তারপর ইন্দ্র। এ ছাড়া আদিত্য মিত্র, বরুণ, বিষ্ণু, উষস্ অশ্বিদ্বয়, সূর্য, পর্জন্য পৃথিবী, মরুৎ, রুদ্র, যম, সোম, সরস্বতী (=নদী ও দেবতা) ইত্যাদি অসংখ্য দেবতার স্তুতি রয়েছে। বহু মন্ত্রে দেবতাদের পুরুষ আকৃতি কল্পনা করা হয়েছে। নৈসর্গিক ঘটনা ও পদার্থসমূহকে নানা দেবতা ও উপাখ্যান রূপে কল্পিত হতে দেখা যায়। ঋক্‌বেদে দেবতার সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একটি মতে নাম অনুসারে প্রতি দেবতা বিভিন্ন ; নিরুক্ত মতে অগ্নি, ইন্দ্র (=বায়ু) এবং সূর্য এই তিনটি মাত্র দেবতা ; অন্যগুলি এঁদেরই নামান্তর বা প্রকারভেদ। আবার আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের মতে সব দেবতাই এক, কেবল বিভিন্ন রূপে প্রতিভাসমান। এই মূল দেবতা একটি মতে পরব্রহ্ম, আবার মহর্ষি কাত্যায়নের মতে সূর্য। বেদের এই সব দেবতাদের সঙ্গে ইন্দোইউরোপীয় গোষ্ঠীর বহু দেবদেবীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

ঋক্‌বেদে এই বহু দেবতা, এঁরা বিভিন্ন অথচ মিলিত। এঁদের মন, অভিপ্রায় ও কাজ সমভাবাপন্ন। দেবতাদের এই সমবেত ঐশী শক্তিই ঋক্‌বেদে পূজিত হয়। অর্থাৎ বেদে দেবতারা দুই অর্থে ব্যবহৃত। প্রথম অর্থে দেবতারা সিদ্ধ ও অসংখ্য ; এবং দ্বিতীয় অর্থে সিদ্ধ পুরুষদের মিলিত ঐশী শক্তিই হচ্ছে দেবতা। ৫-টি জ্ঞান ইন্দ্রিয়, ৫-টি কর্ম ইন্দ্রিয় ও মন এই এগারটি ইন্দ্রিয় পথে ১১-টি আকারে দেবশক্তি মানুষের

কাছে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গোচর দেবতা ১১। ঋকবেদ অনুসারে এই একাদশ দেবতা স্বর্গে, অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতেও অবস্থিত, অর্থাৎ ১১×৩=৩৩ দেবতা বা বিশ্বদেবা (দ্রঃ)।

বেদ থেকে সেই যুগের আর্যদের চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বহু কিছু জানা যায়। ভারতীয় আস্তিক দর্শন শাস্ত্রের ছয়টি প্রস্থান ঋক্‌বেদের কতকগুলি ঋক্‌কে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বহু পৌরাণিক কাহিনীও ঋক্‌মন্ত্রের অন্তর্গত নাম বা সামান্য উদ্ধৃতিকে কেন্দ্র করে পরে পত্রপল্লবে সজ্জিত হয়েছে।

ঋক্‌ সংহিতা—বেদের দুটি ভাগ। মন্ত্রভাগকে সংহিতা বলা হয়। দ্বিতীয় অংশ ব্রাহ্মণ ভাগ; 'অগ্নিমীলে' ইত্যাদি মন্ত্রসমুদয় এই অংশ আছে। সংহিতার অর্থ সন্ধিকার্য।

ঋক্ষ—(১) পুরুবংশে অজমীঢ়ের ছেলে সংবরণের পিতা। (২) পুরু বংশে রাজা ঋচ ও সুদেবার ছেলে। ঋক্ষের স্ত্রী জ্বালা; ছেলে মতিনার (মহা ১।৯০।২৩-২৪)। (৩) ঋক্ষবান (দ্রঃ) পাহাড়।

ঋক্ষদেব—শিখণ্ডীর ছেলে।

ঋক্ষবন্ত—শম্বর অসুরের নগর। দণ্ডকারণ্য স্থিত বৈজয়ন্ত নগর।

ঋক্ষবান—(১) পুরুবংশে অরিহের ছেলে। (২) চিত্রসেনের ছেলে। (৩) পাহাড়; গণ্ডোয়ানা দেশে অবস্থিত। এই পাহাড় থেকে তাপ্তী ও নর্মদা প্রবাহিত। বর্তমান বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণপূর্ব অংশে।

ঋক্ষরজা—কিষ্কিন্ধ্যার রাজা। সুমেরুপর্বতের মধ্যম শৃঙ্গে ব্রহ্মার শতযোজন ব্যাপী দিব্য সভা বসত। এখানে একদিন যোগাভ্যাসের সময়ে ব্রহ্মার চোখ থেকে একবিন্দু জল পড়েছিল। এই জল থেকে ঋক্ষরজা বানরের জন্ম। ব্রহ্মার নির্দেশে ফলমূল খেয়ে ইনি সুমেরু পাহাড়েই থাকতেন। একদিন সুমেরু পাহাড়ের উত্তর শিখরে এক সরোবরের জলে নিজের ছায়া দেখে ভাবেন অন্য কোন বানর তাকে হয়তো অপমান করছে। ফলে লাফ দিয়ে জলে নেমে ধরতে যান। কিন্তু এই জলে নামার জন্য সুন্দর একটি নারীতে রূপান্তরিত হন। এ দিকে ইন্দ্র ও সূর্য এঁকে দেখে দুজনেই কামার্ত হয়ে পড়েন। ইন্দ্র এঁর কেশে এবং সূর্য এঁর গ্রীবায় বীর্যপাত করেন। ফলে যথাক্রমে বালী ও সুগ্রীবের জন্ম হয়। পর দিন বানররূপ ফিরে পেয়ে ঋক্ষরজা ছেলে দুটিকে নিয়ে ব্রহ্মার কাছে যান। ব্রহ্মা ঋক্ষরজাকে তখন কিষ্কিন্ধ্যার রাজা এবং সমস্ত বানরকুলের অধিপতি করে দেন। বালী ও সুগ্রীবকে ইনি পালন করেন। অন্যমতে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা এবং নিঃসন্তান। ইন্দ্র অহল্যার (দ্রঃ) কাছ থেকে অরুণের (দ্রঃ) দুটি ছেলেকে এনে পালন করতে দেন, এঁরা বালী ও সুগ্রীব।

ঋক্ষরাজ—ভল্লুক রাজ জাম্বুবান (দ্রঃ)। জাম্ববতীর (দ্রঃ) পিতা।

ঋচীক—অজীগর্ত। চ্যবন বংশে ভৃগু মুনির ছেলে। অন্য মতে উর্ব ঋষির ছেলে। ব্রহ্মা>ভৃগু>চ্যবন>উর্ব>ঋচীক। লোভী ব্রাহ্মণ। বিয়ের জন্য চন্দ্রবংশে গাধি রাজার কাছে গিয়ে সত্যবতীকে প্রার্থনা করেন। কন্যার শুল্ক হিসাবে গাধি কালো কাণযুক্ত

এক হাজার ঘোড়া চান। ঋচীক তখন বনে গিয়ে তপস্যায় বরুণকে সন্তুষ্ট করলে গঙ্গার জল থেকে এই ঘোড়া বার হয়ে আসে। ঘোড়াগুলি যেখানে জল থেকে উঠেছিল সেই স্থানটি অশ্বতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। এই ঘোড়াগুলি দিয়ে কান্যকুব্জে সত্যবতীকে বিয়ে করেন। সমস্ত ক্ষত্রিয়েদের উচ্ছেদ করার জন্য অলৌকিক উপায়ে ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। সত্যবতীর ছেলে জমদগ্নি (দ্র)। জমদগ্নির ছেলে পরশুরাম ক্ষত্রিয়গুণ যুক্ত হয়েছিলেন। সত্যবতীর আরো তিন ছেলে শুনঃশেফ (দ্র), শুনঃপুচ্ছ ও শুনঃলাঙ্গুল। অন্য মতে সত্যবতীর সব সমেত একশত ছেলে হয়েছিল। ঋচীকের শালা বিশ্বামিত্র (দ্র)। বিষ্ণু নিজের ধনুকটি (দ্র হরধনু) ঋচীককে দিয়ে দেন ; ঋচীক দেন ছেলে জমদগ্নিকে। জমদগ্নির কাছ থেকে পান পরশুরাম। এই ধনুই রাম পরশুরামের কাছ থেকে নিয়ে শরসন্ধান করে পরশুরামের স্বর্গের পথ রোধ করেন। ঋচীক একবার পরশুরামকে ক্ষত্রিয় নিধন করা থেকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন। ঋচীক বৈকুণ্ঠে গেলে তাঁর স্ত্রীও সশরীরে সঙ্গে যান। সত্যবতী পরে উত্তর ভারতের কৌশিকী নদীতে পরিণত হন।

ঋচীষ—(১) নরক বিশেষ। (২) একজন আদিত্য।

ঋচেপু—অন্বগভানু। ঋচেয়ু। অনাধৃষ্টি। পুরুবংশে রাজা রৌদ্রাশ্বের ছেলে। ঋচেপুর মা অপ্সরা মিশ্রকেশী ; ছেলে মতিনার।

ঋজিশ্বন্—ইন্দ্রের বন্ধু এক রাজা। ঋগবেদে কৃষ্ণ নামে দস্যু এঁর হাতে অংশুমতী নদীর তীরে নিহত হন।

ঋজ্রাশ্ব—ঋক্‌বেদে এক মুনি। রাজর্ষি বৃষাগীঃ এঁর পিতা। অশ্বিনীদেবদের বাহন গাধা বৃকী রূপে ঋজ্রাশ্বের কাছে এলে জনসাধারণের ১০০ মেষ এনে একে খেতে দেন। বৃষাগীঃ এতে কুপিত হয়ে শাপ দিয়ে ছেলেকে অন্ধ করে দেন। অগ্নির স্তব করে দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে পেয়েছিলেন।

ঋণ—হিন্দু ধর্ম অনুসারে তিন রকম। দেবঋণ যজ্ঞ করে পরিশোধ করতে হয়। ঋষি-ঋণ ব্রহ্মচর্য ও বেদপুরাণ পাঠ করে পরিশোধ্য। পিতৃঋণ সন্তান উৎপাদন করে পরিশোধ করতে হয়।

ঋত—(১) ঋ-ধাতু অর্থে গমন করা। সৃষ্টির মূলে এক অস্ফুট নিয়মধর্মী সত্য রয়েছে। এই সত্যের সক্রিয় রূপ হচ্ছে ঋত। ঋত একটি বৈদিক শব্দ। জগৎ অর্থে গতিশীল, বিবর্তমান, অনাদি, অনন্ত সৃষ্টি। ঋত অর্থে গতিশীল, বিবর্তমান, অনাদি, অনন্ত পরিব্যাপ্ত 'সত্য'। নৈসর্গিক ঘটনা, নৈতিক প্রবণতা ও ধর্মীয় আচরণের মধ্যে যে নিয়মানুগত্য রয়েছে সেটি ঋতের সক্রিয় রূপ। ঋতের অন্য অর্থ উদক, যজ্ঞ, উঞ্ছশীল, ও যথার্থ মানস সংকল্প। (২) ঋত (=উঞ্ছবৃত্তি), মৃত, অমৃত (দ্রঃ) প্রমৃত ও সত্যামৃত :- জীবিকার্থে বিভিন্ন প্রকারে লব্ধ অর্থ/বস্তু। (৩) সত্য, (৪) ভিক্ষালব্ধ বস্তু, (৫) এক জন রুদ্র, (৬) একজন ধর্মপুত্র, শ্রদ্ধার ছেলে, (৭) মিথিলেশ্বর বিজয়ের ছেলে ; এঁর ছেলে শুনক।

ঋতধ্বজ—(১) একজন রুদ্র। (২) কুবলাশ্ব ; (দ্র) মদালসা।

ঋতব্রত—সূর্যলোক প্রাপ্তি বিধায়ক ব্রত। ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে তিনরাত উপবাস করে পালনীয়।

ঋতম্ভরা—প্লক্ষদ্বীপ স্থিত একটি নদী।

ঋতু—বৈদিক মতে বসন্ত চৈত্র বৈশাখ। গ্রীষ্ম জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। বর্ষা শ্রাবণ ও ভাদ্র। শরৎ আশ্বিন কার্তিক। হেমন্ত অগ্রহায়ণ পৌষ। শিশির মাঘ ফাল্গুন। দিনকেও ছয়টি ঋতুতে ভাগ করা হয়। সূর্যোদয়ের ১ম দশ দণ্ড বসন্ত, ২য় দশ দণ্ড গ্রীষ্ম, ৩য় দশ দণ্ড বর্ষা, ৪র্থ দশ দণ্ড শরৎ, ৫ম দশ দণ্ড হেমন্ত, ৬ষ্ঠ দশ দণ্ড শিশির। ভিন্ন ভিন্ন অভিচার কর্মের ভিন্ন ভিন্ন ঋতু। অন্যমতে অর্দ্ধরাত্রি শরৎ, প্রভাত হেমন্ত, পূর্বাহ্ণ বসন্ত, মধ্যাহ্ণ গ্রীষ্ম, অপরাহ্ণ বর্ষা, প্রদোষ শিশির। অন্যমতে উষাকাল হেমন্ত, প্রভাত শিশির, প্রহরার্দ্ধ বসন্ত, মধ্যাহ্ণ গ্রীষ্ম, ৪র্থ যাম বর্ষা, রবির অস্তগমন শরৎ। (২) এক ঋতু=৬০ অহোরাত্র।

ঋতুপর্ণ—সূর্যবংশীয় অযোধ্যারাজ অযুতাশ্বের ছেলে। অন্যমতে সগর(১)-অসমঞ্জ(২)-অংশুমান(৩)-ভগীরথ(৪)-ঋতুপর্ণ(৮)। অক্ষ ক্রীড়াতে ও গণনা বিদ্যায় সুপণ্ডিত। এঁর কাছে নল রাজা (দ্রঃ) বাহুক নামে সারথি রূপে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নলকে পাবার আশায় দময়ন্তী যখন মিথ্যা স্বয়ংবরের ঘোষণা করেন তখন ঋতুপর্ণ মাত্র এক দিন আগে সুদেব মাধ্যমে খবর পান। ঋতুপর্ণের অনুরোধে বাহুক এক দিনেই ঋতু-পর্ণকে অযোধ্যা থেকে বিদর্ভে পৌঁছে দিয়েছিলেন। পথে রাজাকে বাহুক অশ্বহৃদয় নামে অশ্বচালনা বিদ্যা শিখিয়ে দেন এবং পরিবর্তে রাজার কাছে অক্ষহৃদয় নামে পাশা খেলা বিদ্যা ও গণনা বিদ্যা লাভ করেন। বিদর্ভে নল দময়ন্তীর মিলন হয়। ঋতু-পর্ণের প্রদত্ত বিদ্যার ফলেই বাহুক কলির হাত থেকে মুক্ত হন ও পুষ্করকে হারিয়ে দিয়ে রাজ্য উদ্ধার করেন। ঋতুপর্ণ মিথ্যাস্বয়ংবর ব্যাপারটা জানতে পেরে ক্ষুণ্ণ হলেও নল দময়ন্তীর মিলনে সুখী হয়েছিলেন।

ঋতুসংহার—কালিদাস কৃত কাব্য। ঋতু সমূহের বর্ণনা।

ঋতুস্থলা—একজন অপ্সরা।

ঋত্বিক—ঋতুতে অর্থাৎ বিশেষ সময়ে যাঁরা যজমানের হয়ে যজ্ঞ করতেন। যজমানের অনুরোধে ঋত্বিকরা এসে যজমানের বাড়িতে ইষ্টিযজ্ঞ, পশুযজ্ঞ, সোমযজ্ঞ, ইত্যাদি সম্পাদন করতেন। বিদ্যা ও কর্ম অনুসারে ঋত্বিকদের চারটি শ্রেণী এবং ষোলটি পদ ছিল। (১) অধ্বর্যু এবং তাঁর অধীনে প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, ও উন্নেতা। (২) হোতা এবং এঁর অধীনে প্রশাস্তা (=মৈত্রাবরুণ), অচ্ছাবাক্ ও গ্রাবস্তুৎ। (৩) উদ্গাতা এবং এঁর অধীনে প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা, সুব্রহ্মণ্য। (৪) ব্রহ্মা এবং এঁর অধীনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আগ্নীধ্র, পোতা। অধ্বর্যু ও তাঁর সহকারীরা যজুর্বেদী; এঁরা যজ্ঞের কাঠামো হাতে করে গড়ে তুলতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিম্নস্বরে মন্ত্র পাঠ করতেন। হোতা ও তাঁর সহকারীরা ঋক্‌বেদী। এঁরা যেখানে যেমন প্রয়োজন ঋক্ মন্ত্র পাঠ করতেন এবং দেবতাদের যজ্ঞে নিয়ে আসবার জন্য অগ্নিকে অনুরোধ করতেন। উদ্গাতাও সহকারীরা সামবেদী। এঁরা যজ্ঞের এই কাঠামোতে সুর সংযোগ

করতেন। সোম যজ্ঞে স্তোত্রগান এঁদের বিশেষ কর্তব্য ছিল। আর ব্রহ্মা ও তাঁর সহাকারীরা সমস্ত যজ্ঞকার্য পরিচালনা করতেন, অনুমতি দিতেন, ত্রুটি হলে শুধরে দিতেন এবং শুধরান সম্ভব না হলে প্রায়শ্চিত্ত করাতেন। যজ্ঞকে বলা হয় যজমানের পক্ষে কায়মনোবাক্যে শব্দব্রহ্মকে অনুভূতির চেষ্টা। এখানে অধ্বর্যু হলেন কায়, ব্রহ্ম হলেন মন, এবং হোতা ও উদ্গাতা হলেন বাক্য।

ঋদ্ধি—বরুণের স্ত্রী।

ঋভু—ঋভু/ঋভুক্ষিন, বাজ, বিভ্বন এই তিন জন স্বল্প পরিচিত দেবতাদের সমষ্টিগত নাম। এঁরা সুধন্বার ছেলে। অর্থাৎ অঙ্গিরসের পৌত্র। ঋক্‌বেদে এঁদের ঋভু বলা হয়েছে। কারুকর্মে দক্ষতার জন্য দেবত্ব লাভ করেন। ঋক্‌বেদে যজ্ঞীয় সোম গ্রহণের জন্য এঁদের আহ্বান আছে। ঋভুরা ত্বষ্টার একটি চমসকে (পানপান) চারটি চমসে পরিণত করে দেন। এ ছাড়া অশ্বিদেবতাদের জন্য সুখবহ রথ, ইন্দ্রের জন্য স্বয়ং শিক্ষিত অশ্ব, বৃহস্পতির জন্য ক্ষীরক্ষরা ধেনু তৈরি করে দিয়েছিলেন। বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে যৌবন দান করেছিলেন। অন্যমতে ইন্দ্রের রথ ও অশ্ব এঁরা শোভিত করে দিতেন। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে এঁদের মাবাবাকে পুনর্যৌবন দান করেন। এক ঋষির একটি গরু মারা গেলে বাছুরটি ভীষণ চিৎকার করতে থাকে। ঋষি এঁদের কাছে প্রার্থনা করলে এঁরা একটি গরু তৈরি করে তার গায়ে মরা গরুর চামড়া লাগিয়ে দিয়ে বাছুরটিকে শান্ত করেন। অন্য মতে এঁরা কয়েক জন দিব্যসত্ত্বা। তপস্যায় এঁরা দেবত্ব পান। এমন কি দেবতারাও এঁদের পূজা করতেন। ঋভুদের সঙ্গে গ্রীক দেবতা অরফিউসের কিছু মিল আছে। (২) এক শ্রেণীর দেবতা। সতীর দেহত্যাগে প্রমথগণ দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করলে দক্ষের পুরোহিত ভৃগু মন্ত্র বলে অগ্নিকুণ্ড থেকে ঋভু নামে সৈন্যদের সৃষ্টি করেন। এঁরা প্রমথদের তাড়ান। বৈবস্বত মন্বন্তরে ঋভুরা দেবতা। (৩) ব্রহ্মার একটি ছেলে। বিখ্যাত পণ্ডিত। তপোবলে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। পুলস্ত্যপুত্র নিদাঘের গুরু। (৪) অপগস্থান (আফগানিস্থান) বাসী সুধন্বার ছেলেদের নাম। অঙ্গিরাবংশজ। বড় ছেলে বা ছেলেগুলি ঋভু নামে পরিচিত। এঁরা অগ্নির পূজা করতেন এবং অগ্নির জন্য ব্রহ্ম বা বেদমন্ত্র রচনা করেছিলেন।

ঋষভ—(১) হিমালয়ের উত্তরে কৈলাসের কাছে এক পর্বত। বিশ্বাস এখানে হিরণ্য-করণী, মৃতসঞ্জীবনী, সন্ধিনী ও সাবর্ণ্যকরণী ইত্যাদি পাদপ পাওয়া যায়। (২) পূর্ব সাগরস্থ ধবলবর্ণ পাহাড়। এখানে সুদর্শন সরোবর আছে। (৩) দক্ষিণ সাগরস্থ পর্বত। এখানে রোহিত নামে গন্ধর্বরা বাস করতেন। (৪) নাভি থেকে উঠে কণ্ঠ শীর্ষ পর্যন্ত যে বায়ু সেই বায়ুর দ্বারা উচ্চারিত সুর। (৫) রাজসাধ্য ও একাহ সাধ্য যজ্ঞ। দক্ষিণা সহস্র ঋষভ। (৬) চন্দ্রবংশে এক রাজা। উপরিচর বসুর নাতির ছেলে। দ্রোণের গরুড় ব্যূহের মধ্যে ইনি ছিলেন। (৭) একজন অসুর। (৮) ঋষভদেব।

ঋষভকূট—হেমকূট নামে পর্বত। দ্রঃ ঋষভ।

ঋষভদেব—প্রথম জৈন তীর্থংকর। অপর নাম আদিনাথ। গর্ভকালে এঁর মা

ঋষভের স্বপ্ন দেখেন ফলে এই নাম। কাহিনী অনুসারে সুষমদুঃষম যুগে সর্বার্থসিদ্ধি নামে বিমান থেকে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ধনুরাশিতে চৈত্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা নাভির ঔরসে স্ত্রী মেরুদেবীর গর্ভে বিনীতা (বর্তমান অযোধ্যা) নগরে জন্মান। ইক্ষুরস পান করে চৈত্রাষ্টমীতে দীক্ষিত হন। গুরু শ্রেয়াংস। বট বৃক্ষের নীচে সিদ্ধি এবং কৈলাস শিখরে মহানির্বাণ লাভ করেন। এঁর চিহ্ন ঋষভ। এঁর সম্বন্ধে রচিত স্তোত্র ও গ্রন্থ আছে। (২) ভাগবত মতে (৫ম স্কন্ধ) ভগবানের অষ্টম অবতার। অগ্নীধ্রের ছেলে নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে জন্ম। ইন্দ্র একবার নাভির রাজ্যে বৃষ্টি বন্ধ করলে ঋষভদেব যোগপ্রভাবে বর্ষণ সম্ভব করেন। ইন্দ্রের মেয়ে জয়ন্তীকে বিয়ে করেন এবং একশ ছেলের মধ্যে বড় ছেলে ভরত প্রমুখ ন-জনকে ভারতে নয়টি দ্বীপে রাজ্য দিয়ে নিজে সর্বত্যাগী দিগম্বর সন্ন্যাসী হয়ে যোগ-চর্চায় রত হন। পুলহের আশ্রমে তপস্যা করতেন। স্থানটির নাম হয় ঋষভকূট। এখানে কারো আসা তিনি পছন্দ করতেন না; এমন কি এখানে বাতাস পর্যন্ত নিঃশব্দে বয়ে যেত; একটুও শব্দ হত না। শিবের ভক্ত ছিলেন। এই সময় সাধারণ লোকে বিদ্রূপ ও কৌতুক ছলে তাঁকে নানা নির্যাতন করত; কিন্তু যোগীদের মতই নির্লিপ্ত হয়ে তিনি সব কিছু সহ্য করতেন। বহু স্থান পর্যটন করে দেহ ত্যাগের কামনায় কূটকাচলের উপবনে উপস্থিত হন। এখানে দাবানলে মারা যান।

ঋষভদ্বীপ—এই দ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে পর্বত বিদারণ করে কার্তিক ক্রৌঞ্চদারণ নাম পান।

ঋষি—দ্রষ্টা। ঋ অর্থে শব্দ করা। অর্থাৎ এঁরা শাস্ত্র পাঠ করতেন এবং কণ্ঠস্থ করে রক্ষা করতেন। তপস্যার ফলে বেদ মন্ত্র যাঁদের কাছে প্রতিভাত হত তাঁরাই প্রথম ঋষি নামে অভিহিত হন। অর্থাৎ বেদকে অপৌরুষেয় রাখবার প্রচেষ্টায় মন্ত্র রচনা-কারদের বলা হয়েছে মন্ত্র তাঁদের কাছে প্রতিভাত হয়ে উঠত; তাঁরা আসল রচনাকার নন। দ্রঃ শ্যাবাশ্ব। বেদের অনুক্রমণিকাতে প্রতিটি বৈদিক মন্ত্রের রচনাকার ঋষিব নাম আছে। এঁদের মধ্যে সাতটি ঋষি (সপ্তর্ষি) বিশেষ ভাবে সম্মানিত। শতপথে এঁদের নাম গোতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বসিষ্ঠ, কশ্যপ ও অত্রি। আকাশে এঁরা সাতটি তারা রূপে বর্তমানে অবস্থিত মনে করা হয়; 'উরসা মেজর' নামে নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত। এঁদের ব্রহ্মার মানসপুত্রও বলা হয়। পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে বলা হয়েছে পরমার্থ তত্ত্বে যাঁরা সম্যক দৃষ্টি রাখেন এবং সংসার অতিক্রম করেছেন বা যাঁদের কাছ থেকে বিদ্যা, সত্য, তপঃ ও শ্রুতি সম্যক রূপে নিরূপিত হয় তাঁরা হচ্ছেন ঋষি। পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে এই সাতজন ঋষির নামের অনেক অদল বদল দেখা যায় এবং এঁদের সম্বন্ধে বহু কাহিনী পাওয়া যায়। এবং এই সাতজন ছাড়া আরো বহু বহু ঋষির নামও দেখা যায়। মহাভারতে সপ্তর্ষির নাম মরীচি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ। বায়ুপুরাণে ভৃগুকেও এবং বিষ্ণুপুরাণে ভৃগু ও দক্ষকেও ঋষি বলা হয়েছে। আবার কিছু গ্রন্থে মনু, কণ্ব, বাল্মীকি, ব্যাস ও বিভাণ্ডককেও ঋষি

বলা হয়েছে। ঋষিদের আবার শ্রেণী বিভাগ রয়েছে :—(১) শ্রুতর্ষি হচ্ছেন সুশ্রুত, ; (২) কাণ্ডর্ষি হচ্ছেন জৈমিনি ; (৩) পরমর্ষি হচ্ছেন ভেল ; (৪) মহর্ষি ব্যাস ; (৫) রাজর্ষি-বিশ্বামিত্র, জনক ; (৬) ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ : (৭) দেবর্ষি নারদ, অত্রি, মরীচি, ভরদ্বাজ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, প্রচেতা, ভরত, তুম্বুরু ও কণাদ। আরো বিশ প্রকার ঋষির উল্লেখ আছে :—(১) বৈখানস, (২) বালখিল্য, (৩) মরীচিপ, (৪) সংপ্রক্ষাল, (৫) অশ্ম-কুট্ট, (৬) আকাশ নিলয়, (৭) অনবকাশিক, (৮) দন্তোলূখল, (৯) অশয্যা, (১০) পত্রাহার, (১১) উন্মজ্জক, (১২) গাত্রশয্যা, (১৩) বায়ুভুক, (১৪) জলাহার (১৫) আর্দ্র-পট্টবাস, (১৬) স্থণ্ডিলশায়ী, (১৭) ঊর্দ্ধবাহু, (১৮) তপোনিষ্ঠ, (১৯) পঞ্চতপান্বিত, (২০) সজপ। মহাভারতে আরো কয়েকপ্রকার ঋষির কথা আছে :—ফলাহারী, মূলাহারী, ঘৃতপায়ী, সোমবায়ব্য ইত্যাদি। পরে ঋষি ও মুনি সমার্থক শব্দ হয়ে উঠেছে। না হলে মুনি অর্থে কৃচ্ছ্রব্রত তপস্বী।

ঋষিকুল্যা—(১) ঋষিগণ কল্পিত নদী। (২) মহেন্দ্র পর্বত থেকে বার হয়ে গঞ্জামের কাছে সাগরে গিয়ে পড়েছে।

ঋষিগিরি—রাজগৃহ।

ঋষিপত্তন—সারনাথ।

ঋষিযজ্ঞ—বেদ ইত্যাদি অধ্যয়ন।

ঋষিলোক—এখানে ঋষিরা থাকেন। ধ্রুবলোকের নীচে, শনিলোকের ওপরে।

ঋষ্যমূক—(১) ঋষ্য অর্থে মৃগ ; অর্থাৎ মৃগেরা (হরিণ) যেখানে নির্ভয়ে বিচরণ করে। দাক্ষিণাত্যের পাহাড়। পূর্বঘাট ও নীলগিরি পর্বতশ্রেণীর মাঝে। এখানে পম্পা সরোবর (নদী)। কাবেরী নদীও এখানে উৎপন্ন হয়েছে। (ঋষ্যমূকশ্চ পম্পায়াঃ পুরস্তাৎ পুষ্পিতদ্রুমঃ। সুদুঃখারোহণো নাম শিশুনাগাভিরক্ষিতঃ॥ রামা ৩।৭৩।৩২) এখানে মতঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল ; মার্কণ্ডেয় মুনিও এখানে থাকতেন। অসুর দুন্দুভিকে বধ করে বালী তার দেহ ছুঁড়ে ফেলে দেন ; অসুরের মুখের রক্ত ছিটকে আশ্রমে এসে পড়েছিল। এ জন্য মতঙ্গ অভিশাপ দিয়েছিলেন বালী এই পাহাড়ে এলেই মারা পড়বেন। এই জন্য সুগ্রীব এখানে নির্ভয়ে বাস করতেন। কবন্ধকে (দ্র) শাপমুক্ত করে রাম লক্ষ্মণ সীতার খোঁজে এখানে এলে শবরীর সঙ্গে দেখা হয় এবং শবরী মুক্তি পায়। সুগ্রীবের সঙ্গে এখানে রামচন্দ্রের বন্ধুতা হয়। (২) বক (দ্র) রাক্ষসের পিতা।

ঋষ্যশৃঙ্গ—বিভাণ্ডক মুনির ছেলে। দশরথের জামাই। বিভাণ্ডক, মতান্তরে কশ্যপ, মুনি তপস্যায় শ্রান্ত হয়ে হ্রদে স্নান করছিলেন। এই সময় উর্বশীকে দেখে কামার্ত হয়ে বীর্য স্খলন হয়। এই বীর্য জলে পড়ে ; একটি তৃষ্ণার্ত হরিণী এই বীর্যযুক্ত জল পান করে গর্ভিণী হয়ে এই শিশুর জন্ম দেয়। ভগ নামে আদিত্যের শাপভ্রষ্টা কন্যা স্বর্ণমুখী এই হরিণী। হরিণীর সন্তান বলে শিঙ ছিল ; বিভাণ্ডক নাম রেখেছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। কৌশিকী নদীর তীরে পিতার আশ্রমে পালিত হয়ে পরে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করে তপস্যা ও বেদ অধ্যয়ন করে কাটাতেন। কোন দিন কোন স্ত্রীলোককে দেখেন নি। অঙ্গ-

দেশের রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের ওপর একবার অসৎ ব্যবহার করাতে এঁরা রাজাকে ত্যাগ করে চলে যান। ইন্দ্রও দেশে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। মহা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রাজা তখন এক জন মুনির পরামর্শে প্রায়শ্চিত্ত করে সকলকে খুসি করেন এবং ব্রাহ্মণ ইত্যাদির পরামর্শে ঋষ্যশৃঙ্গকে দিয়ে বৃষ্টি হবার জন্য যজ্ঞ করাবার ইচ্ছায় কতকগুলি পরমাসুন্দরী বারাঙ্গনাকে পাঠিয়ে দিয়ে বিভাণ্ডকের অনুপস্থিতিতে ঋষ্যশৃঙ্গকে সহজেই কুৎসিত ভাবে ভুলিয়ে নিয়ে আসেন। প্রথম দিন এঁরা নিয়ে যেতে পারেন নি। বিভাণ্ডক আশ্রমে এসে ছেলেকে বিচলিত দেখে জিজ্ঞাসা করে ঘটনাটা কিছুটা জানতে পারেন এবং ছেলেকে বিশেষ ভাবে সাবধান করে দেন। এরা পরে সুবিধামত আবার এসে ঋষিপুত্রকে ভুলিয়ে নিয়ে আসেন। ঋষ্যশৃঙ্গ এসে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। রাজা এঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেন; নিজের পালিতা কন্যা শান্তার সঙ্গে বিয়ে দেন এবং বিভাণ্ডককে প্রচুর ধনরত্ন উপহার পাঠিয়ে দেন। শান্তা দশরথের মেয়ে। অন্যমতে ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞ করলে বৃষ্টি হয়েছিল। একটি মতে বিভাণ্ডক উপহার গ্রহণ করেন নি; ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে এসেছিলেন; কিন্তু আতিথ্য ও সম্মানে শান্ত হন। ঋষ্যশৃঙ্গ পরে অঙ্গদেশেই বাস করতেন। আর এক মতে বিভাণ্ডক নির্দেশ দিয়ে যান শান্তার ছেলে হলে ঋষ্যশৃঙ্গ যেন আশ্রমে ফিরে যান। বশিষ্ঠও মন্ত্রী সুমন্ত্রের পরামর্শে পুত্রেষ্টি/অশ্বমেধ (ঋষ্যশৃঙ্গং পুরস্কৃত্য কর্মচক্রুর্দ্বিজর্ষভাঃ অশ্বমেধে যথান্যায়ং পরিক্রামন্তি শাস্ত্রতঃ॥ রামা ১।১৪।৩২) যজ্ঞে রাজা দশরথ এই ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রধান পুরোহিত করে পূর্ণ মনোরথ হয়েছিলেন।

এ

একচক্র—দনুর (দ্রঃ) বিখ্যাত পুত্র।

একচক্রা—বর্তমানে আরা। জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবরা কুন্তীকে নিয়ে এই নগরে কিছুদিন আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। এখানে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে থাকার সময় ভীমের হাতে বকাসুর নিহত হন। এটওয়ার ৮ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত নগরী।

একচূর্ণী—তৈত্তিরীয় যজুঃ সংহিতার ভাষ্যকার মুনি।

একজটা—(১) অন্য নাম নীলতারা। বৌদ্ধ মহাযান দেবতাদের একজন শক্তিশালী দেবী। এঁর অনেকগুলি নীলমূর্তি আছে। একটি মূর্তির নাম বিদ্যুৎজ্বালা; করালী মূর্তি, বারটি মুখ, চব্বিশটি হাত। তারা দেবীর এই মূর্তির উগ্রতার জন্য আর এক নাম উগ্রতারা। তিব্বতে ইনি লামো নামে পূজিতা। ভীষণতার ইনি প্রতিমূর্তি। নেপালে ইনি আর্য তারাদেবী। বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুসারে খৃ সপ্তম শতকের মাঝখানে সিদ্ধ নাগার্জুন তিব্বত থেকে এঁর পূজা ভারতে প্রচলন করেন। দেবতারা শুম্ভনিশুম্ভের

ভয়ে মাতঙ্গী মহাবিদ্যার স্তব করলে তাঁর দেহ থেকে কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, মুণ্ডমালা বিভূষিতা, ডান হাতে খড়্গ ও পদ্ম বাঁ হাতে কর্ত্রী ও খর্পর মাথায় একজটা মূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল। (২) লঙ্কাতে এক রাক্ষসী। রাবণের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য মিষ্ট কথায় সীতাকে অনেক বুঝিয়েছিল।

একত—দ্রঃ ত্রিত।

একদন্ত—গণেশ। যুদ্ধকালে পরশুরামের কুঠারাঘাতে একটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল বলে এই নাম। অন্য মতে পাশা খেলার জন্য পাঞ্জির প্রয়োজনে রাবণ এঁর একটি দাঁত তুলে নেন। আর এক মতে রাবণ একবার কৈলাসে শিবের সঙ্গে দেখা করতে এলে গণেশ বাধা দেন; রাবণ তখন একটি দাঁত ভেঙ্গে দেন। আর এক মতে কার্তিকের সঙ্গে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলতে গিয়ে দাঁতটি ভেঙে গিয়েছিল।

একপর্ণা—হিমালয় ও মেনকার তিন মেয়ে একপর্ণা, একপাটলা (দ্র) ও অপর্ণা (দ্র)। একটি মাত্র পাতা খেয়ে জীবনধারণ করে তপস্যা করতেন ফলে এই নাম। অসিত-দেবলের সঙ্গে বিয়ে হয়।

একপাটলা—একপর্ণার (দ্র) বোন। একটি মাত্র পাটল (=পারুল) পুষ্প খেয়ে জীবন ধারণ করে তপস্যা করতেন; তাই নাম। জৈগীষব্যের স্ত্রী।

একপাদ—(১) ১১-রুদ্রের একজন। (২) মহিষাসুরের মন্ত্রী।

একপিঙ্গল—একপিঙ্গ, কুবের। পরমেশ্বরের পাশে পার্বতীকে বসে থাকতে দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে কুবেরর একটি চোখ নষ্ট হয়ে পিঙ্গল বর্ণ হয়ে যায়। অন্যমতে গৌরীর শাপে বামচক্ষু নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরে শিবের অনুগ্রহে গৌরী নষ্ট চক্ষুর স্থানে একটি পিঙ্গলবর্ণ চিহ্ন করে দেন। যক্ষেরা এঁকে পূজা করতেন।

একবীর—হেহয় (দ্রঃ)।

একবাদ—বেদান্তে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত তাবৎ পদার্থের অভিন্নত্ব প্রতিপাদক মতবাদ।

একলব্য—নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর ছেলে। দ্রোণের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে এলে দ্রোণ এঁকে নীচ জাতি বলে প্রত্যাখ্যান করেন। একলব্য তখন দ্রোণের মূর্তি তৈরি করে গুরু হিসাবে মূর্তির সামনে তপস্যা করেন ও ধনুর্বিদ্যা চর্চা করতে থাকেন। অচলাভক্তির ফলে ক্রমশ অর্জুনের চেয়েও অস্ত্রকুশলী হয়ে ওঠেন। একদিন কুরুপাণ্ডব বালকরা বনে মৃগয়াতে এলে এঁদের কুকুর একলব্যকে দেখে চিৎকার করে উঠলে ইনি সাতটি তীর যোগে এর স্বর বন্ধ করে দেন; অথচ একটুও ক্ষত হয় না। কুকুরটি ফিরে এলে এঁরা শর প্রয়োগ কৌশল দেখে অবাক হয়ে খুঁজতে খুঁজতে একলব্যের সন্ধান পান। দ্রোণ কথা দিয়েছিলেন অর্জুনকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ শিষ্য করবেন। অর্জুন এ জন্য অনুযোগ করলে দ্রোণ প্রথমে বিশ্বাস করতে চান না। পরে অর্জুনের সঙ্গে বনে আসেন। গুরুকে দেখে একলব্য কৃতার্থ হয়ে যান। কিন্তু দ্রোণ অর্জুনকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে একলব্যকে শিষ্য বলে স্বীকার করে নেন এবং দক্ষিণা হিসাবে একলব্যের ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি চান। একালব্য অকাতরে গুরুদক্ষিণা দেন। এর ফলে একলব্যের তীরসন্ধানের ক্ষমতা কিছুটা বিঘ্নিত হয় এবং অর্জুনের

শ্রেষ্ঠতা বজায় থাকে।\ কৃষ্ণের হাতে একলব্য মারা যান। অশ্বমেধের ঘোড়া ধরলে অর্জুনের হাতে একলব্যের ছেলে নিহত হন।

একশৃঙ্গ—একজন পিতৃদেব (দ্রঃ)।

একাক্ষ—জয়ন্ত নামে একটি কাক। (পুত্রঃ কিল স শক্রস্য বায়সঃ পততাং বরঃ। (রাম ৫।৩৮।২৮)। চিত্রকূটে বাস করার সময় সীতার স্তনে ঠোঁটে করে আঘাত করে। রামচন্দ্র সীতার কোলে মাথা রেখে ঘুমচ্ছিলেন। ঘুম ভেঙে যায় এবং (মৎক্রুতে কাকমাত্রে তু) ব্রহ্মাস্ত্রং (সমুদীরিতম্। রামা ৫।৩৮।৩৯) ছোঁড়েন। কাক ভয়ে নানা দেবতা ও ঋষির কাছে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করেন। এ দিকে অস্ত্র ছুটে আসছে। দেবতারা তখন রামের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে বলেন। জয়ন্ত বাধ্য হয়ে ফিরে আসে এবং একটি মতে সীতার অনুরোধে রাম একে হত্যা না করে ডান চোখটি নষ্ট করে ছেড়ে দেন।

একাগ্নী—এক জনকে হত্যা করবে এই রকম মহাস্ত্র। কর্ণ নিজের কবচ ইন্দ্রকে দিয়ে এই অস্ত্র চেয়ে নেন এবং অর্জুনকে বধ করবার জন্য সযত্নে রেখে দেন। কিন্তু ঘটোৎকচের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধে এই অস্ত্র নিক্ষেপ করতে বাধ্য হন।

একাত্মবাদী—এক ব্রহ্মকে যাঁরা স্বীকার করেন। সবই ব্রহ্ম যাঁদের মত।

একাদশ ইন্দ্রিয়—বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, ও মন।

একাদশতনু—মহাদেব। অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর সব সমেত এই এগারটি মূর্তি মহাদেব ধারণ করেছিলেন। এঁরা একাদশ রুদ্র নামেও পরিচিত। অন্যমতে অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র, হর।

একাদশরুদ্র—দ্রঃ একাদশ তনু।

একাদশী—দ্রঃ মুর। যে সময় সূর্যের দৃষ্টি থেকে চন্দ্রের একাদশ কলা বার হয়ে যায় সেই সময় শুক্লা একাদশী। যখন চন্দ্রের একাদশ কলা সূর্যের দৃষ্টি পথে প্রবেশ করে তখন চন্দ্রকলার জ্যোতি থাকে না; সেই সময় কৃষ্ণা একাদশী। বৈশাখে শুক্লা-একাদশীর নাম মোহনী, কৃষ্ণা একাদশীর নাম বরূথিনী। জ্যৈষ্ঠে যথাক্রমে নির্জলা, অপরা। আষাঢ়ে পদ্মা, যোগিনী। শ্রাবণে পুত্রদা, কামিকা। ভাদ্রে বামনা, অজা। আশ্বিনে পাপাঙ্কুশা, ইন্দিরা। কার্তিকে প্রবোধিনী, রমা। অগ্রহায়ণে মোক্ষা উৎপলা। পৌষে পুত্রদা, সকলা। মাঘে জয়া, বট্‌তিলা। ফাল্গুনে আমর্দকী, বিজয়া। চৈত্রে কামদা, পাপমোচনী। মলমাসে সুভদ্রা ও কমলা; একাদশী একটি পুণ্য তিথি। অপর নাম হরিবাসর। এই দিনে উপবাস বিধেয়। উচ্চবর্ণের বিধবাদের উপবাস অবশ্য কর্তব্য ছিল। বিশেষ নামকরা একাদশী:-শয়ন একাদশী আষাঢ়ে শুক্লা একাদশী। পার্শ্ব একাদশী ভাদ্রে শুক্লা একাদশী। উত্থান একাদশী কার্তিকে শুক্লা একাদশী। ভৈমী একাদশী মাঘে শুক্লা একাদশী। পুরাণে ভদ্রশীল, রুক্মাঙ্গদ ও চন্দ্রহাসের কাহিনীতে একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। দ্রঃ অম্বরীষ।

একাবলী—রাজা হৈহয়ের (=একবীর) স্ত্রী ; এঁর নাতি কার্তবীর্যার্জুন।

একাম্র—শিব মন্দির ; যুক্ত একটি উদ্যান। এখানে একটি আম গাছ ছিল। অপর নাম ভুবনেশ্বর।

একাষ্টকা—প্রজাপতির কন্যা ; ইন্দ্র ও সোমের জননী।

এতশ—(১) সূর্যের একটি ঘোড়া। (২) ঋক্‌বেদে একজন প্রসিদ্ধ ঋষি। রাজা স্বশ্বের ছেলের সঙ্গে যুদ্ধে বিপন্ন হয়ে পড়লে ইন্দ্র এতশকে রক্ষা করেন।

এন্‌টিমনি—এন্টিমনি ও গন্ধক যোগ এন্টিমনি সালফাইড। প্রাচীন ভারতে কাজলের অন্যতম উপাদান। চরক সংহিতায় এর ব্যবহার উল্লেখ আছে। এই সালফাইডের সঙ্গে লোহার টুকরা মিশিয়ে উত্তপ্ত করে ভারতে মৌল এন্টিমনি নিষ্কাশন হত। সোমদেবের রসেন্দ্র চূড়ামণিতে এই প্রণালীর বর্ণনা আছে। সোমদেব এন্টিমনিকে ভাল জাতের সীসা বলেছিলেন।

এলাপত্র—কদ্রুর গর্ভে কশ্যপের ঔরসে একটি সন্তান; উরগ; অত্যন্ত বুদ্ধিমান। কদ্রু(দ্রঃ) ছেলেদের শাপ দিলে অভিশপ্ত ছেলেরা যে সভা করেন সেই সভাতে এই এলাপত্র জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দ্রঃ-ৎকারু।

এলাপুর—বর্তমানে ডেরাওয়াল। এখানে সোমনাথ পত্তন ও সোমনাথের মন্দির আছে।

এলিফ্যান্টা—আঞ্চলিক নাম ঘারাপুরী। ১৮°৫৭´ উ এবং ৭৩´ পূ। বোম্বাই সহর থেকে ১০ কি-মি দূরে ছোট দ্বীপ। এখানে একটি পাথরের হাতী ছিল বলে পর্তুগিজরা এই নাম দিয়েছিল। গুহামন্দিরের জন্য বিখ্যাত। ৬-টি গুহামন্দির আছে ; এর মধ্যে চারটি সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণ। শিবপুরা গুহামন্দিরটি প্রায় ৮-ম শতকের এবং বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ভারতের অন্যান্য গুহা মন্দির থেকে এর আকৃতি, আসন বিন্যাস পৃথক। মন্দিরের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব দিক এমন ভাবে খোলা যে সভাতে সূর্যালোকের অভাব হয় না। এই মন্দিরের দেবতা প্রসিদ্ধ ত্রিমূর্তি। মধ্যের মুখ মহাদেবের, দক্ষিণের মুখ অঘোর-এর এবং বাম দিকে উমার। আরো অনেকগুলি পাথরের সুন্দর মূর্তি আছে। শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে মেলা হয়।

এলোরা—একটি অনুচ্চ পাহাড়। পাশের গ্রামের নামে নাম। মহারাষ্ট্রের জেলা-সদর ঔরঙ্গাবাদের উত্তর উত্তর-পশ্চিমে প্রায় নয় ক্রোশ দূরে (২০° উ ও ৭৫° পূ)। রাষ্ট্রকূট নৃপতি দ্বিতীয় কর্কের তাম্রলিপিতে এই পাহাড় সংলগ্ন এলাকার নাম এলাপুর। অজন্তার (দ্র) মতই প্রাকৃতিক কারণে উৎপন্ন। পাহাড়ে ৫০টির বেশি শৈলখাত গুহা আছে। পাদদেশের গুহাগুলি কালক্রম অনুসারে ১-৩৪ সংখ্যায় চিহ্নিত। দক্ষিণ দিক থেকে হিসাব করলে এই ৩৪-টির প্রথম ১২টি বৌদ্ধদের, পরবর্তী ১৭টি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের এবং উত্তর প্রান্তে বাকি পাঁচটি জৈনদের।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে এখানে মানুষের বাস ছিল। ২১ নম্বর গুহার সামনে পরিষ্কার করবার সময় খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের মৃৎপাত্র, অন্যান্য প্রত্নবস্তু ও গুপ্ত রাজাদের মুদ্রা পাওয়া গেছে। বাদামির চালুক্যরা এই অঞ্চলে যখন রাজা ছিলেন

(খৃ ৬-৭ শতক) সেই সময়ে কয়েকটি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য গুহা কাটা হয়। চালুক্যদের পর রাষ্ট্রকূটদের সময়েও অন্তত দুটি বৌদ্ধগুহা (১১নং ও ১২নং) এবং ব্রাহ্মণ্য ও জৈন গুহাগুলির বেশ কয়েকটি কাটা হয়েছিল। তিন সম্প্রদায়ের সহাবস্থান এখানে লক্ষ্যণীয়। ১৫ নং গুহা সম্ভবত দন্তিদুর্গের আমলে (৭৫৩-৭৫৭খৃ) এবং ১৬ নং গুহা 'কৈলাস'; রাজা প্রথম কৃষ্ণের (৭৫৮-৭৭৩খৃ) সময় কাটা হয়। ১৩নং অসমাপ্ত গুহাটির নাম ছোট কৈলাস।

এলোরার বৌদ্ধগুহাগুলি বিশাল। জমকালো গুহা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু অজন্তার সৌন্দর্য বোধ ও পরিমিতি-বোধ নাই। অধিকাংশ গুহা চিত্রিত ছিল; এখনও সৎসামান্য বিদ্যমান। ছবির মানও নিম্ন স্তরের। অজন্তার তুলনায় এখানে মূর্তিসংখ্যা অনেক বেশি। মহামায়ূরী প্রমুখ বজ্রযান গোষ্ঠীর দেব-দেবীর সংখ্যাও বহু। বুদ্ধ মন্দিরের দরজায় মহাযানী বোধিসত্ত্বের বিরাট মূর্তির পাশে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে। মূর্তিগুলি সে সময়ে প্রলেপিত ও চিত্রিত ছিল। ৫ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ বৌদ্ধগুহাগুলি বিশেষ দর্শনীয়। পঞ্চম গুহাটিতে বিশাল আয়তনের মণ্ডপ ও পেছনে বুদ্ধায়তন। মণ্ডপের দুদিকে কয়েকটি আবাসিক কক্ষ এবং স্তম্ভযুক্ত একটি করে উপশালা। উপশালার পাশে আবার কয়েকটি ছোট কক্ষ। মণ্ডপটিতে দুটি সমান্তরাল নীচু শৈলখাত আসন বোধহয় শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করতেন। দশম চৈত্যগৃহের নাম বিশ্বকর্মা; এর পরিকল্পনা ও রূপকর্ম বহু বিষয়ে অনন্য। ১১ ও ১২নং গুহাগুলির পরিকল্পনাও অনন্য; এ দুটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণযুক্ত তিনতলা সৌধ: প্রতি তলার সামনে স্তম্ভযুক্ত বারান্দা।

১২ নং গুহার প্রায় ৩৭ মিটার উত্তরে ব্রাহ্মণ্য গুহাগুলি। প্রথম দিকে বৌদ্ধশৈলী অনুকরণে তৈরি। পরে নিজস্ব রীতি উদ্ভাবিত হয় এবং চরম সার্থকতা লাভ করে। ১৪ নং গুহা রাবণ-কা-খাই, ১৫ নং দশাবতার, ১৬ নং কৈলাস, ২১নং রামেশ্বর, ২৯ নং ধুমার-লেনা। রাবণ-কা-খাই গুহাটির সামনে ১৬টি স্তম্ভের একটি সমাবেশ শালা, পিছনে প্রদক্ষিণ পথ বেষ্টিত গর্ভগৃহ। সমাবেশ শালার উত্তর ও দক্ষিণ গাত্রে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব দেবদেবীদের খোদাই করা সুন্দর উদ্গত মূর্তি রয়েছে। প্রদক্ষিণ পথের দক্ষিণ প্রাচীরের গায়ে বীরভদ্র ও গণেশসহ সপ্তমাতৃকার মূর্তি। দশাবতার গুহাটি দোতলা, প্রাঙ্গণের সামনে তোরণযুক্ত প্রাচীর, প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি শৈলখাত স্বতন্ত্র মণ্ডপ; পাশে ছোট ছোট দেবায়তন ও একটি জলাধার। গুহার নীচের তলা চোদ্দটি স্তম্ভের একটি সমাবেশ শালা ও চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। দোতলার সমাবেশ শালাটি মস্তবড়; এর পেছনে উপপ্রকোষ্ঠ এবং তারও পেছনে গর্ভগৃহ। সমাবেশ শালার দেওয়ালের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে শৈব ও বৈষ্ণব দেবতাদের এবং বিষ্ণুর কয়েকটি অবতারের সুঠাম বলিষ্ঠ মূর্তি রয়েছে। রামেশ্বর গুহা একটি লম্বা বারান্দার ন্যায় মণ্ডপ: মণ্ডপের দুপাশে একটি করে দেবায়তন ও পেছনে প্রদক্ষিণ পথ পরিবেষ্টিত গর্ভগৃহ। এই গুহা প্রাঙ্গণের কেন্দ্রে শিবের বাহন নন্দীর জন্য একটি স্বতন্ত্র মণ্ডপ ও প্রাঙ্গণের পাশে একটি ছোট দেবালয়। রামেশ্বর গুহার স্তম্ভগুলি

কারুকার্যের জন্ম প্রসিদ্ধ। ধুমার-লেনা গুহা ক্রুশের আকার একটি বিরাট সমাবেশ শালা। এর তিনটি প্রবেশ দ্বার এবং প্রতিটির সামনে একটি অঙ্গন। সমাবেশ শালার পেছনে মন্দির। মন্দিরের চারটি প্রবেশ দ্বারের দুপাশে দীর্ঘকায় দ্বারপাল মূর্তি। কৈলাস গুহা ভারতের বৃহত্তম ও সবচেয়ে আড়ম্বরপূর্ণ শৈলখাত মন্দির। ঠিক গুহার মত নয়; পাথর ইঁট ইত্যাদির সাহায্যে মন্দিরের আদর্শে গঠিত। কৈলাসের স্থানীয় নাম রঙমহল। এলোরার এটি শ্রেষ্ঠ গুহা। মন্দিরের রঙিন ছবিগুলি বিখ্যাত। মন্দিরটি শৈলখাত প্রাঙ্গণের মধ্যে। একটি দোতলা প্রবেশিকা দিয়ে ভেতরে যেতে হয়। প্রাঙ্গণের পেছনে অলিন্দ। অলিন্দের পেছনে দেওয়াল উপস্তম্ভ দিয়ে বিভক্ত, প্রতি ভাগে দেবদেবীর খোদিত অনবদ্য মূর্তি। বিমান ও স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ সমেত মূল মন্দিরটি একটি সুউচ্চ মঞ্চের ওপর অবস্থিত। মঞ্চগাত্রের মাঝখান হাতী ও সিংহ দিয়ে অলংকৃত যেন এরাই মন্দিরটির ভার বহন করছে। মঞ্চে ওঠবার দুটি সিঁড়ি। ওপরে উঠলে প্রথম মণ্ডলে প্রাচীন চিত্রাবলীর অবশেষ অংশ রয়েছে, মণ্ডপ থেকে একটি উপ-প্রকোষ্ঠ দিয়ে গর্ভগৃহে যেতে হয়। মঞ্চের সামনে একটি নন্দী মণ্ডপ। মণ্ডপটির দুপাশে ১৫ মিটার উঁচু ধ্বজস্তম্ভ।

জৈন গুহাগুলির মধ্যে ইন্দ্রসভা, জগন্নাথ সভা ও ছোট কৈলাস। ছোট কৈলাস ১৬ নং গুহার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। ইন্দ্রসভার প্রাঙ্গণের শৈলখাত মন্দিরটি কৈলাসের অনুরূপ; স্থাপত্যশৈলী মূলত দ্রাবিড়ীয়। অঙ্গনের পেছনের গুহাটি দোতলা। মোটামুটি দুটি তলেই একটি করে স্তম্ভযুক্ত-সমাবেশ শালা; ও তার পেছনে মহাবীরের বিগ্রহ যুক্ত গর্ভগৃহ। জগন্নাথ সভাও দোতলা; ওপর তলার সমাবেশ শালাটি ইন্দ্রসভার অনুরূপ। এলোরা গ্রামে রাণী অহল্যাবাঈ নির্মিত ঘৃষ্ণেশ্বর শিব মন্দিরটি রয়েছে। ঘৃষ্ণেশ্বর দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। দ্রঃ ইলোরা।

ঐ

ঐক্ষ্বাকী—ভুমন্যুর ছেলে সুহোত্রর স্ত্রী; ছেলে অজমীঢ়, সুমীঢ়, পুরুমীঢ়। (মহা ১।৮৯।২৬)।

ঐতরেয়—ইতর ঋষি বা ইতরার অপত্য নাম মহিদাস। ইতরা এক ঋষির অন্যতমা স্ত্রী। ঋষি স্ত্রীকে ও ছেলেকে ভালবাসতেন না। একবার এক সভায় ছেলেকে স্বামীর অবজ্ঞাপাত্র দেখে ইতরা কুলদেবতা ভূমিকে স্মরণ করেন। ভূমি তখনই সেখানে এসে মহিদাসকে সিংহাসনে বসিয়ে পাণ্ডিত্য ও ব্রাহ্মন-প্রতিভাসন-রূপ বর দেন। ভূমির বরে ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ মহিদাসের আয়ত্ত হয়ে যায়। এই জন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত।

ঋক্‌বেদের একটি শাখার নাম ঐতরেয় ; ইতরার পুত্র মহিদাস রচিত। এই শাখাতে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক ও ঐতরেয় উপনিষৎ পাওয়া যায়। অর্থাৎ এটি ঋক্‌বেদের একখানি ব্রাহ্মণ ; আট পঞ্চিকায় বিভক্ত ; প্রতি পঞ্চিকায় ৫-অধ্যায় ও প্রতি অধ্যায়ে ন্যূনাধিক ৭-কাণ্ড ; সবসমেত ২৮৫ কাণ্ড। প্রথম ১৬-টি অধ্যায়ে একাহব্যাপী অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ ; পরবর্তী দুই অধ্যায়ে বৎসর ব্যাপী গবাময়ন সত্র ; ১৯ থেকে ২৪ অধ্যায়ে দ্বাদশাহ যজ্ঞের বিবরণ। ২৫ থেকে ৩২ অধ্যায়ে অগ্নিহোত্র এবং শেষ আটটি অধ্যায়ে রাজ্যাভিষেক প্রণালী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। শেষ দশ অধ্যায়ে উপাখ্যান ও ঐতিহাসিক ঘটনাও প্রচুর রয়েছে। নাভানেদিষ্ঠ, হরিশ্চন্দ্র ও শুনঃশেফের কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐতরেয় আরণ্যকের ২-য় ও ৩-য় আরণ্যকের নাম বহ্বৃচ, ব্রাহ্মণোপনিষদ্ বা ঐতরেয় উপনিষদ্। অন্যমতে দ্বিতীয় আরণ্যকের শেষ চার অধ্যায়ের নাম ঐতরেয় উপনিষদ। (২) মান্ডুকি মুনির প্রথমা স্ত্রী ইতরার পুত্র। বালক বয়সে চুপচাপ থাকত এবং সব সময়ই বাসুদেবকে স্মরণ করতেন। ফলে ছেলেকে জড়ধী মনে করে হতাশ হয়ে বিদ্বান বুদ্ধিমান পুত্রের আশায় পিঙ্গাকে বিয়ে করেন। পিঙ্গার চার ছেলেই পণ্ডিত। ইতরা একবার নিজের ছেলেকে মুনির অবজ্ঞার কথা জানান। ঐতরেয় মাকে আত্মহত্যা করতে বারণ করেন এবং ধর্মোপদেশ দেন। কিছু দিন পরে বিষ্ণু দেখা দিয়ে মাও ছেলেকে আশীর্বাদ করেন এবং ঐতরেয়কে হরিমেধ্য রাজার যজ্ঞভার নিতে বলেন। হরিমেধ্যের মেয়ের সঙ্গে ঐতরেয়-র বিয়ে হয়। এই ঐতরেয় মহিদাস-ঐতরেয় নন।

ঐন্দ্রঅস্ত্র—ইন্দ্রের একটি অস্ত্র। এ থেকে অসংখ্য বাণ বার হত।

ঐন্দ্রিলা—বৃত্রাসুরের স্ত্রী। গন্ধর্ব কন্যা।

ঐরাবত—কশ্যপের স্ত্রী ক্রোধবশা। ক্রোধবশার মেয়ে ভদ্রমতা ; ভদ্রমতার মেয়ে ইরাবতী ; ইরাবতীর ছেলে ঐরাবত। ইরাবত অর্থাৎ জল থেকে জাত বলে নাম ঐরাবত। দুর্বাসা (দ্র) ইন্দ্রকে লক্ষ্মীহীন হবার শাপ দিলে ঐরাবতের অনুশোচনা হয় সেই সব অনিষ্টের মূল। ফলে ক্ষীর সমুদ্রে গিয়ে ঐরাবত আশ্রয় নেয় এবং সমুদ্র মন্থনে উঠে আসে। অর্থাৎ সমুদ্রে জন্ম নয়। দ্র পৃথু। অসুর শূরপদ্ম দেবলোক আক্রমণ করলে ভীষণ যুদ্ধ হয়। জয়ন্ত বাণবিদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ মারা (আহত) গেলে ঐরাবত তীব্রভাবে শূরপদ্মকে (দ্র) আক্রমণ করে। অসুর ঐরাবতের দাঁত ভেঙে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলে দেন। ঐরাবত অবশ হয়ে পড়ে থাকে ; পরে বনে গিয়ে শিবের তপস্যা করে দাঁত ফিরে পায় এবং দেবলোকে ফিরে যায়। সমুদ্র মন্থনে উঠলে ইন্দ্র আবার বাহন রূপে পান। ভগীরথ যখন গঙ্গা আনেন তখন এক জায়গায় গঙ্গার স্রোত আটকে গেলে ঐরাবত গঙ্গার পথ খুলে দিতে রাজি হয় কিন্তু সর্ত করে প্রতিদানে গঙ্গার সঙ্গে সে সহবাস করবে। কিন্তু গঙ্গার স্রোতে ঐরাবত ভেসে যায়। পরে অবশ্য দয়া করে গঙ্গা এর জীবন রক্ষা করেন। ঐরাবত হাতীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং এক জন দিকপাল (পূব দিকে)। এর চারটি দাঁত। ঐরাবত ও অন্য

তিনটি দিক হস্তী পুষ্কর দ্বীপে বাস করে। (২) কশ্যপ কদ্রুর এক ছেলে। এই ঐরাবত বংশে উলূপীর পিতা কৌরব্য জন্মান।

ঐল—রাজা এলের/ইলের ছেলে বা ইলার গর্ভে বুধের ঔরসজাত ছেলে পুরূরবা।

ঐলবিল—বিশ্রবা মুনির স্ত্রী ইলবিলার সন্তান।

ঐলাবৃতবর্ষ—অন্যনাম ইলাবৃতবর্ষ। ইলাবৃত রাজার দেশ। দ্রঃ অগ্নীধ্র।

ঐশ্বর্য—অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামবসায়িতা এই আট শক্তি। অন্য মতে সমগ্র প্রভুত্ব, পরাক্রম, যশ, সম্পৎ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টি।

ও

ওঘ—শোণিতপুর নিবাসী নরকাসুরের একজন অনুচর। কৃষ্ণ এঁকে নিহত করেন।

ওঘবতী—ওঘবানের মেয়ে। সুদর্শনের স্ত্রী। মাহিষ্মতীতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজকন্যা সুদর্শনার গর্ভে অগ্নির ঔরসে সুদর্শনের জন্ম। (মহা ১৩।২।-।) সুদর্শন কুরুক্ষেত্রে বাস করতে থাকেন এবং গার্হস্থ্য আশ্রমেই মৃত্যুকে জয় করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। যে কোন মূল্যেও যেন অতিথি সংকার করা হয় স্ত্রীকে নির্দেশ দেন। কারণ অতিথিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এক দিন সুদর্শনের অনুপস্থিতিতে ধর্ম ব্রাহ্মণের বেশে অতিথি হয়ে আসেন এবং ওঘবতীকেই দাবি করেন। ওঘবতী অতিথিকে অন্য প্রলোভন দেখিয়ে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে বিফল হয়ে বাধ্য হয়ে সহাস্যে ব্রাহ্মণকে নিয়ে অন্য ঘরে গিয়ে ঢোকেন। ইতিমধ্যে সুদর্শন ফিরে এসে স্ত্রীকে না দেখে ডাকতে থাকেন। ওঘবতী নিজেকে অতিথির উচ্ছিষ্ট মনে করে নিরুত্তর থাকেন কিন্তু অতিথি সুদর্শনকে ডেকে বলেন তিনি ওঘবতীকে ভোগ করেছেন। সুদর্শন যা উচিত মনে করবেন করতে পারেন। সুদর্শন একটু বিচলিত হন না; বরং দেবতাদের নামে শপথ করে বলেন অতিথি সুখী হোক এটাই তাঁর একান্ত কাম্য। সুদর্শনের পেছনে এতক্ষণ মৃত্যু লোহার মুগুর নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন; ছিদ্র পেলেই আঘাত করবেন। এ দিকে ধর্ম ঘর থেকে বার হয়ে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে জানান তিনি পরীক্ষা করতে এসে-ছিলেন; ছিদ্রান্বেষী মৃত্যুকে সুদর্শন জয় করতে পেরেছেন। ওঘবতী নিজের ক্ষমতায় নিজেকে ও স্বামীকে চিরদিন রক্ষা করতে পারবেন। ব্রহ্মবাদিনী ওঘবতী বাক্য-সিদ্ধা হবেন; এবং নিজের তপস্যার প্রভাবে তাঁর শরীরের অর্দ্ধেকটা ওঘবতীরূপে লোকপাবন করবেন এবং বাকি অর্দ্ধেক শরীরে সুদর্শনের অনুগমন করবেন। সুদর্শন সস্ত্রীক স্বশরীরে শাশ্বত লোক পাবেন। মৃত্যুকে জয় করে গার্হস্থ্যধর্ম মাধ্যমেই কাম-ক্রোধ জয় করতে পেরেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র শ্বেতবর্ণ সহস্র অশ্বযুক্ত রথে দুজনকে পরে স্বর্গে তুলে নিয়েছিলেন। (২) সাতটি সরস্বতী নদীর একটি। এই নদীকে আহ্বান করে কুরুক্ষেত্রে আনা হয়েছিল এবং এই নদীর তীরে ভীষ্মের শরশয্যা হয়।

ওঘবান্—প্রতীকের ছেলে ; এঁর মেয়ে ওঘবতী ; ও ছেলে ওঘোরথ। দ্রঃ সুদর্শন।

ওঙ্কার—(১) কাশীস্থ শিবলিঙ্গ ওঙ্কার নাথ। (২) নর্মদা নদীগর্ভে একটি ছোট দ্বীপের উপর স্থাপিত শিবলিঙ্গ।

ওজন—প্রাচীন ভারতে ওজনের সুনির্দিষ্ট এবং সূক্ষ্ম একক গড়ে উঠেছিল। ওজনের সুনির্দিষ্ট একক সভ্যতার উন্নত অবস্থার পরিচায়ক। ঋক্‌বেদে ও বৌদ্ধজাতকের গল্পে 'নিষ্ক' ও 'মান'-এর উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয় সংহিতায়, কাত্যায়নের শ্রৌতসূত্রে, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও অষ্টাধ্যায়ীর বার্তিকে 'শতমান'-এর উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণ ও জাতকের বিভিন্ন গল্পে 'সুবর্ণ'-এর উল্লেখ রয়েছে। নিরুক্তে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে ও অষ্টাধ্যায়ীতে 'পাদ' রয়েছে। তৈত্তিরীয় সংহিতা, মৈত্রায়ণী সংহিতা, কাঠক সংহিতা ; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, অনুপদসূত্র ও মনুতে কৃষ্ণল ও রক্তিক-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধজাতক গল্পে ও মনুতে কার্ষাপণ বা কার্ষ উল্লিখিত হয়েছে। মনুতে আছে :- ৮ ত্রসরেণুতে (রোদে দৃশ্যমান ভাসমান ধূলিকণা) =১ লিখ্যা (পোস্তদানা)×৩=১ রাজসর্ষপ×৩=১ গৌরসর্ষপ×৬=১ যব×৩=১ কৃষ্ণল বা রক্তিক (=রতি, গুঞ্জাফল)। রৌপ্য :- ২রতিতে=মাষক × ১৬=১ ধরণ বা পুরাণ×১০=১ শতমান। স্বর্ণ :- ৫ রতিতে=১ মাষ×১৬ = ১ সুবর্ণ ×৪=১ পল বা নিষ্ক×১০ নিষ্কে ॥১ ধরণ। তাম্র :- ৮ রতিতে=১ কার্ষাপণ। শস্যবীজের সাহায্যে হিসাবের পদ্ধতি যথেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য ছিল। তোলা, সের, মন ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুতে নাই।

ওড়নষষ্ঠী—অগ্রায়ণ শুক্লা ষষ্ঠী। এই দিন থেকে জগন্নাথ বিগ্রহ শীত বস্ত্র ব্যবহার করেন।

ওদন্তপুরী—উদন্তপুরী, উদ্দণ্ডপুর। বর্তমান বিহার শরিফের অনতিদূরে নালন্দার কাছে একটি বৌদ্ধ বিহার। রাজা গোপাল (৭৫০-৭৫ খৃঃ) বা দেবপাল (৮১০-৫০খৃ) অন্যমতে ধর্মপাল (৭৭৫-৮১০ খৃ) এটির প্রতিষ্ঠাতা। ওদন্তপুরীর অধ্যক্ষের সম্মানিত উপাধি ছিল মহাসংঘিকাচার্য। এখানে আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে চন্দ্রগর্ভ (দীপংকর শ্রীজ্ঞান) শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং পরে এই বিহারের প্রধান আচার্যও হয়েছিলেন। গিরিশীর্ষে অবস্থিত বিহারটি বক্তিয়ার খিলজি দ্বাদশ শতকে ধ্বংস করেছিলেন। আচার্য শান্তরক্ষিতের পরামর্শে তাঁর শিষ্য তিব্বতের রাজা খি-স্রং-লে-সোন ওদন্তপুরীর আদর্শে 'সম-য়ে' নামে তিব্বতের শ্রেষ্ঠ বিহারটি তৈরি করেছিলেন।

ওম্—প্রাচীন অর্থে তথাস্তু। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে প্রজাপতি সংকল্প করলেন, তখন তিনটি বর্ণ অ, উ, ম উৎপন্ন হয়। তিন বর্ণ একত্রে ওম্। মনুতে আছে প্রজাপতি তিন বেদ থেকে অ, উ, ম দোহন করেছিলেন। মহানির্বাণ তন্ত্র মতে বিষ্ণু, শিব, ও ব্রহ্মা এই তিন অংশে অবস্থিত। বিশ্বাস এটি একটি পবিত্র মন্ত্র। বেদে একটি বীজ মন্ত্র। সমস্ত কাজের আরম্ভে ও শেষে এই মাঙ্গলিক বীজমন্ত্র উচ্চারণ করা বিধেয় : নতুবা মন্ত্রপাঠ ও ধর্মক্রিয়া নিষ্ফল হয়। ওম্-এর আর এক নাম প্রণব, তন্ত্রে নাম তার। স্কন্দপুরাণে এর সহস্র নাম রয়েছে ; এখানে বলা হয়েছে 'প্রণবঃ সর্ব-

দেবতাঃ'। পাতঞ্জল যোগ সূত্রে প্রণবজপের বিধান আছে, প্রণব ঈশ্বর বাচক। ছান্দোগ্য উপনিষদে 'ওম্' এর উপাসনার অনুকরণে তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতিতে একাক্ষর বীজমন্ত্রের উপাসনার পদ্ধতি চালু হয়েছিল। ওম্ সম্বন্ধে বলা হয়েছে অকারঃ ভগবান্ ব্রহ্মা অপি উকারঃ স্যাৎ হরিঃ স্বয়ম্। মকারো ভগবান্ রুদ্রঃ অপি অর্দ্ধমাত্রা (ঁ) মহেশ্বরী। ভাগবতে রয়েছেঃ- পরমেষ্ঠী আত্মসংযম করলে তাঁর হৃদয়াকাশ থেকে শব্দ উৎপন্ন হয়েছিল। হৃদয়াকাশে আত্মার নিকট থেকে এর উৎপত্তি। এই বীজ নিজের আশ্রয় ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাচক। সর্বমন্ত্র ও উপনিষৎ স্বরূপ। বেদের সনাতন বীজ। এই থেকে অকারাদি তিন বর্ণ হয়েছিল। গুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ), নাম (ঋক্, যজুঃ ও সাম), অর্থ (ভূঃ, ভুবঃ, ও স্বঃ), এবং বৃত্তি (জাগ্রৎ, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন) এই সমস্ত তিনটি করে পদার্থ ধৃত হয়ে আছে। ব্রহ্মা শেষ পর্যন্ত অক্ষর সমষ্টি এই ওম্ থেকেই সৃষ্টি করেছিলেন। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ও পাণিনি মতে প্রণব ত্রিমাত্রা; অর্থাৎ ও-কার প্লুত। মুখ বুজে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করতে করতে সাধারণ মত মুখ খুললে 'অ' উচ্চারিত হয়। এর পর মুখ আরো বেশি খুললে 'আ' উচ্চারিত হয় এবং বিভিন্ন ভাবে মুখ খোলার ফলে অন্যান্য স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলি উচ্চারিত হয়। ফলে ঋষিদের ধারণা হয়েছিল ওঁ-শব্দ থেকে সমস্ত অক্ষরের উৎপত্তি। বৌদ্ধশাস্ত্রে ও মণি-পদ্মে হূং বলে একটি প্রসিদ্ধ মন্ত্র রয়েছে। এখানে ওঁ অর্থে দেবকুলে; ম = অসুরকুলে; নি = মানুষরূপে, পদ্ = পশুরূপে, মে = হতাশরূপে; হূং = নারকিরূপে = পুনর্জন্ম নিরোধ করে। এই মত অনুসারে পুনর্জন্মের ছয় অবস্থা সূচক ছয় প্রকার বর্ণ উক্ত ছয় অক্ষরে আরোপিত হয়ে থাকে। আর এক অর্থে ওঁ = দৈবিক সিতবর্ণ, ম = আসুরিক নীলবর্ণ; নি = মানুষিক পীতবর্ণ; পদ্—জান্তব হরিৎ-বর্ণ; মে = নৈরাশিক রক্তবর্ণ এবং হূং = নারকীয় কৃষ্ণবর্ণ। অর্থাৎ বৌদ্ধ পণ্ডিতরাও 'ওম্'-এর মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

ওষধি—মৃত সঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, অস্থি-সঞ্চারিণী ও সন্ধানকরণী। হিমালয়ের কাছে ঋষভ ও কৈলাস পর্বতে পাওয়া যেত।

ওষধিপ্রস্থ—ব্রহ্মলোক থেকে গঙ্গা এখানে পতিত হয়। সতী শোকে মহাদেব এখানে তপস্যা করেছিলেন।

ওস্ওয়াল—জাতি বিশেষ। বিক্রম সংবতের চারশ বছর আগে ভীনমালের রাজপুত্র উপলদেব রাজস্থানে যোধপুর জেলায় ওসিয়া (= উপকেশ) নগরী স্থাপন করেন। আচার্য শ্রীরত্নপ্রভসূরি এই ওসিয়াঁদের জৈনধর্মে দীক্ষা দেন এবং এই সময় থেকে এঁরা ওস্ওয়াল নামে পরিচিত।

ঔ

ঔকথ্য—(১ সামবেদের অংশ বিশেষ ; যজ্ঞ বিশেষে গীত হয়। (২) গর্গ (=উকথ) মুনির ছেলে।

ঔড়ম্বর—(১) চতুর্দশ যমের একজন। পিতৃপতি। (২) কচ্ছদেশের প্রাচীন নাম।

ঔত্তরপথিক—উপাসক বিশেষ।

ঔদক—মণিপর্বতের মাথায় একটি উপত্যকা। মুর অসুর এখানকার রক্ষক। এখানে নরকাসুর ১০ হাজার কন্যা সমেত বন্ধ ছিলেন।

ঔর্ব—পিতা চ্যবন, মা আরুষী ; জমদগ্নির পিতামহ। (দ্র ঊর্ব) ভৃগু বংশ। এক ঋষি। হেহয়রা ক্ষত্রিয় ; ভৃগু বংশীয়েরা এঁদের কুলপুরোহিত। কুলপুরোহিতদের এঁরা প্রচুর ধন রত্ন দিতেন। ফলে ভৃগু বংশীয়েরা ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন। ক্ষত্রিয় হেহয়রা এদিকে নানা কারণে দরিদ্র হয়ে পড়ছিলেন এবং ভৃগুদের সহ্য করতেও পারছিলেন না। অন্যমতে অর্থাভাবে এঁরা ভৃগুদের কাছে একবার অর্থপ্রার্থী হন বা ধার চান। কিন্তু এঁরা কিছু দিতে চান না। ফলে হেহয়রা এঁদের ওপর অত্যাচার করতে থাকেন। ভার্গবরা তখন সামান্য কিছু দিয়ে বাকি ধনরত্ন মাটির নীচে লুকিয়ে ফেলেন। হেহয়রা ছাড়ে না ; ভৃগুদের এক জনের ঘর খুঁড়ে কিছু ধনরত্ন পাওয়া যায়। ফলে ক্ষত্রিয় ও ভার্গবদের মধ্যে একটা তীব্র মনোমালিন্য দেখা দেয় এবং ভৃগুদের ওপর এঁরা হামলা করতে থাকেন। রাগে বহু ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণকে এঁরা হত্যা করেন। ভৃগুবংশীয়েরা তখন তাঁদের সমস্ত ধনরত্ন মাটিতে পুঁতে ফেলে হিমালয়ে বনে পালিয়ে যান ; অন্য মতে কেবল মহিলারা পালিয়ে যান। এঁদের মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণী/চ্যবনের স্ত্রী আরুষী নিজের উরুদেশে ক্ষত্রিয়দের ভয়ে ১২ বছর গর্ভ গোপন করে রেখে-ছিলেন। জানতে পেরে ক্ষত্রিয়রা বনে ছুটে এলে ব্রাহ্মণীর উরু থেকে দীপ্তিমান একটি পুত্র জন্মে দীপ্তিতে ক্ষত্রিয়দের অন্ধ করে দেন। উরু থেকে জন্ম বলে এর নাম ঔর্ব। ক্ষত্রিয়েরা তখন ঔর্ব ও ব্রাহ্মণীর কাছে ক্ষমা চাইলে ঔর্ব সন্তুষ্ট হয়ে এদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। কিন্তু পিতা ও পিতৃব্যগণের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য ঘোর তপস্যা আরম্ভ করেন। ঔর্ব সব কিছু ধ্বংস করতে চান দেখে দেবতারা ও ঔর্বকে শান্ত করে বোঝান আত্মহত্যা করে স্বর্গলাভ হয় না বলে স্বর্গলোকের কামনায় স্বেচ্ছায় তাঁরা ক্ষত্রিয়দের হাতে জীবন দিয়েছিলেন। ঔর্ব তখন সমুদ্রে নিজের ক্রোধাগ্নিকে/তপস্যাগ্নিকে ফেলে দেন এবং এই আগুন বড়বা রূপে (ঘোটকীর মাথা) অগ্নি বমন করে সমুদ্র জল পান করে। আজও এই বড়বাগ্নি সমুদ্রের নীচে রয়েছে। মতান্তরে ঊর্ব ঋষি আগুন নিয়ে বুকে মন্থন করেন। ফলে এক জ্বালাময় অযোনিজ পুরুষ ঔর্ব জন্ম নেন।

(২) মালবে এক ব্রাহ্মণ ; স্ত্রী সুমেধা, কন্যা শমীক। ধৌম্যকের ছেলে মন্দারের (শৌনক ঋষি শিষ্য) সঙ্গে খুব ছোট বয়সে শমীকের বিয়ে হয়। শমীকের বয়স

হলে মন্দার স্ত্রীকে নিয়ে ফিরছিলেন ; পথে মহর্ষি ভুশুণ্ডিকে দেখে এঁরা হেসে ফেলেন। মহর্ষি তখন শাপ দিলে এরা দুটি গাছে পরিণত হন। খবর পেয়ে ঔর্ব শমীক রূপ গাছে অগ্নিরূপে বাস করতে থাকেন এবং মন্দার রূপ গাছের মূল দিয়ে শৌনক গণপতির মূর্তি পূজা করতে থাকেন। ঔর্ব ও শৌনকের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে গণপতি গাছ দুটিকে আবার মানুষ করে দেন।

ঔর্বের আশ্রমে এক দিন পরশুরাম এসেছিলেন এবং ভৃগু, ভৃগুর স্ত্রী খ্যাতি ও চ্যবন ঔর্বকে প্রণাম করে গিয়েছিলেন। দ্রঃ যাদবী, সগর, সুমতি।

ঔলূক্য—উলূক মুনির গোত্রাপত্য। বৈশেষিক দর্শনকার কণাদ।

ঔশীনর—উশীনরের ছেলে। সাধারণ অর্থে শিবি।

ঔশীনরা/নরী—উশীনর দেশে এক শূদ্রক কন্যা। এঁর গর্ভে গৌতম মুনির কক্ষীবান ইত্যাদি সন্তান হয়।

ক

কংস—যদু (১)-হেহয়(৪)-কার্তবীর্যার্জুন(১০)-সাত্যকি(১৬)-চিত্ররথ(২১)-তুম্বুরু(২৬)-নাহুক (৩০)-আহুক(৩১)-উগ্রসেন(৩২)-কংস(৩৩)। একটি মতে কালনেমি কংস হয়ে জন্মেছিলেন।

ভোজ বংশীয় রাজা। মথুরার (দ্র) রাজা উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। হরিবংশ অনুসারে ঋতু স্নাতা স্ত্রী পদ্মাবতী (দ্র) বনের মধ্যে সখীদের নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন অন্য মতে পিত্রালয়ে বিদর্ভে পুষ্পবান নামে এক পাহাড়ে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় এক গন্ধর্ব/ সৌভপতি দ্রুমিল (দ্র-গোভিল) কামার্ত হয়ে উগ্রসেনের বেশে এসে সহবাস করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সন্দেহ হওয়াতে 'কস্ত্বং' বলে পরিচয় চান এবং বৈশ্রবণের একজন অনুচর বলে পরিচয় পেয়ে তিরস্কার করতে থাকেন। দ্রুমিল বোঝাতে চেষ্টা করেন পরপুরুষের ঔরসে দেবতার সমান বহুপুত্র পৃথিবীতে জন্মেছে ইত্যাদি। এবং বলেন 'কস্ত্বং' বলে প্রতিবাদ করার স্মৃতি হিসাবে কংস নামে শত্রুবিজয়ী এক ছেলে হবে। উগ্রসেনের স্ত্রী তখন শাপ দেন তাঁর স্বামীর বংশে জন্ম অন্য কারো হাতে এই অবাঞ্ছিত পুত্র নিহত হবে। পদ্মাবতী পিতামাতাকে ঘটনাটা জানান এবং গর্ভনাশের বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু গর্ভের শিশু একদিন পদ্মাবতীকে জানায় সে কালনেমি অসুর ; বিষ্ণু তাকে হত্যা করেছেন ফলে সে প্রতিশোধ নেবার জন্য জন্মাতে চায়। এর দশ বছর পরে কংস জন্মান। কংস পরে এই সব ঘটনা জানতে পারেন ফলে উগ্রসেনের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে থাকেন। কংসের আর আট-ভাই ও দুই বোন দেবকী ও কংসবতী। জরাসন্ধের দুই মেয়ে অস্তি ও প্রাপ্তি এঁর স্ত্রী। অন্য মতে কংস উগ্রসেনের পালিত পুত্র ও নন। কংস দুর্দ্ধর্ষ ধনুর্বিদ ছিলেন এবং তাঁর বহুসৈন্য, রথ ও হস্তী ছিল। দ্রুমিলের বিবরণ নারদ কংসকে

বলেছিলেন এবং ধনুর্যজ্ঞে কৃষ্ণকে আনবার জন্য অক্রূরকে যখন পাঠান তখন অক্রূরকে কংস ঘটনাটি জানিয়েছিলেন।

শ্বশুর জরাসন্ধের সাহায্যে উগ্রসেনকে সিংহাসন চ্যুত করে কংস রাজা হন। রাজা হয়ে যদু, বৃষ্ণি, ও অন্ধকদের ওপর কংস অত্যাচার করতে থাকেন। বোন দেবকীর বিয়ে দেন বসুদেবের সঙ্গে। বোনকে কংস একটি রথ উপহার দেন এবং বসুদেব ও দেবকীকে রথে তুলে নিজে রথ চালিয়ে যখন যাচ্ছিলেন সেই সময় দৈববাণী হয় এঁদের অষ্টম সন্তান কংসকে বধ করবে। কংস তৎক্ষণাৎ দেবকীকে হত্যা করতে যান কিন্তু বসুদেব বাধা দেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন দেবকীর প্রতিটি সন্তানকে কংসের হাতে দিয়ে দেবেন। একটি মতে কংস তখনই বসুদেব ও দেবকীকে বন্দী করে ফেলেন। অন্য মতে দেবকী বসুদেব কারারুদ্ধ হন নি। তাঁদের প্রথম ছেলে হয় কীর্তিমান। কীর্তিমান বড় হতে থাকেন এমন সময় নারদ এসে কংসকে জানান কালনেমি কংস হয়ে জন্মেছেন এবং দেবকীর অষ্টম সন্তান ইত্যাদি। কংস তখন কীর্তিমানকে আছাড় মেরে হত্যা করেন এবং বোন ভগিনী-পতিকে কারারুদ্ধ করেন। প্রলম্ব, চাণূর, তৃণাবর্ত, মুষ্টিক, অরিষ্ট, কেশী, ধেনুক, অঘ, বিবিদ এবং পূতনা ইত্যাদি রাক্ষসরাক্ষসীরা কংসের অনুচর নিযুক্ত হন এবং এঁদের দিয়ে কংস বৃষ্ণি, অন্ধক ও যাদবদের উৎপীড়ন করতে থাকেন। বহু যাদব দেশ ত্যাগ করেন। বিষ্ণুভক্ত উগ্রসেনও নানা ভাবে নিপীড়িত হতে থাকেন।

দেবকীর পর পর আরো পাঁচটি ছেলে হয় (দ্র ঊর্ণা) এবং কংস সবগুলিকেই আছড়ে মেরে ফেলেন। সপ্তম শিশু গর্ভে থাকা কালে বিষ্ণুর নির্দেশে বসুদেবের অপর স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে মহামায়া শিশুটিকে স্থানান্তরিত করে দেন। এই শিশু জন্মালে নাম হয় সঙ্কর্ষণ। এর পর অষ্টম গর্ভ হিসাবে বিষ্ণু আসেন। এবং বিষ্ণুর নির্দেশে নন্দগোপের স্ত্রী যশোদার গর্ভে মহামায়া আসেন। এর পর ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাত্রে দেবকীর অষ্টম পুত্র জন্মান ; এবং যশোদার একটি মেয়ে হয়। প্রহরীরা ঘুমিয়ে পড়ে, কারাগার খুলে যায় (দ্র কৃষ্ণ) এবং শৃঙ্খল বন্ধন ও খুলে পড়ে। বসুদেব সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে সেই রাত্রিতে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যমুনা হেঁটে পার হয়ে ঘুমন্ত যশোদার কাছে রেখে সকলের অজ্ঞাতে যশোদার মেয়েটিকে নিয়ে ফিরে আসেন। মহামায়ার/যোগ-মায়ার মায়াতে সব কাজ নির্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হয়। কারাগারে প্রহরীদের এর পর ঘুম ভাঙলে কংস খবর পান ; মেয়েটিকে আছাড় মেরে হত্যা করতে যান। কিন্তু শিশুটি হাত থেকে ছিটকে বার হয়ে আকাশে উঠে গিয়ে বলে যান গোকুলে কংসের হত্যাকারী নিরাপদে আছেন।

এর পর কংস দেবকী ও বসুদেবকে ছেড়ে দেন। এবং চিন্তিত হয়ে পড়েন। সভাসদরা মন্ত্রণা দেন গত দশ দিনে যত ছেলে জন্মেছে সকলকে হত্যা করতে। এই পরামর্শ অনুসারে শিশুদের হত্যা করার জন্য কংস চারদিকে গুপ্তঘাতক পাঠাতে থাকেন। কিছু গুপ্তচর/ঘাতক ইত্যাদি কৃষ্ণের হাতে নিহত হলে কংস তখন মথুরার সমস্ত শিশুকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কংসের নির্দেশে পূতনা, শকট, তৃণাবর্ত,

অরিষ্ট, বক, অঘ ও কেশী কৃষ্ণকে হত্যা করবার বার বার চেষ্টা করে। এরা সকলেই নিহত হয়। বৃষ-রূপধারী অরিষ্টকে নিধন করা নারদ প্রত্যক্ষ করেন এবং কংসকে আবার জানিয়ে যান যে কৃষ্ণ বলরাম আসলে বসুদেবেরই সন্তান। এবং যে মেয়েটি কংসের হাত থেকে অকাশে পালিয়ে গিয়েছিল সেটি যশোদার সন্তান। কংস তখন দেবকী বসুদেবকে আবার কারারুদ্ধ করেন।

এর পর কংস ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে অক্রূরকে পাঠিয়ে রথে করে কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরাতে নিয়ে আসেন। অক্রূর কংসের অভিসন্ধির কথা বলে দিলেও এঁরা ভয় পান না। মথুরাতে যজ্ঞের আগে ক্রীড়াক্ষেত্রে মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা ছিল। মল্লদের উপদেশ দেওয়া ছিল এঁদের যেন হত্যা করা হয়। কুবলয়াপীড় নামে একটি হাতীও ঠিক করা ছিল প্রয়োজন মত দুই ভাইকে যেন পদদলিত করে ফেলে। কৃষ্ণ বলরাম এখানে ঢুকতে এলে মাহুত হাতীটিকে ইঙ্গিত করে এবং হাতী এসে আক্রমণ করে। কৃষ্ণ হাতীটিকে মেরে একটি দাঁত বলরামকে দান করেন। হাতীর মাহুতকেও কৃষ্ণ বধ করেন। এর পর মল্ল যুদ্ধে কৃষ্ণের হাতে চাণূর এবং বলরামের হাতে মুষ্টিক মারা যায়। আরো তিন জন মল্লবীর কূট, শল এবং কোশল ও এঁদের হাতে নিহত হন। বাকি যারা মল্লযোদ্ধা ছিল তারা ভয়ে বনে পালিয়ে যায়। কংস তখন গর্জন করে ওঠেন; এঁদের দুজনকে বন্দী করে নির্বাসন দেবার জন্য এবং নন্দকে বন্দী করার এবং নন্দ, বসুদেব ও উগ্রসেনকে হত্যা করবার আদেশ দেন। কৃষ্ণ ইতিমধ্যে এগিয়ে এসে কংসকে সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে এনে হত্যা করেন এবং কংসের আট ভাই বাধা দিতে এলে বলরামের হাতে এঁরা মারা যান। উগ্রসেনকে কৃষ্ণ মথুরার রাজা করে দেন।

কংসবতী—কংসের এক বোন। বসুদেবের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী।

ককুৎস্থ—অযোধ্যায় সূর্যবংশীয় বিখ্যাত রাজা। ইক্ষ্বাকুর ছেলে বিকুক্ষি (হরি, বিষ্ণু, কূর্মপু্) মতান্তরে শশাদ। এই বিকুক্ষি বা শশাদের ছেলে পুরঞ্জয়। শিবপুরাণে এই পুরঞ্জয়ের অন্য নাম ককুৎস্থ। রামায়ণে ভগীরথের ছেলে ককুৎস্থ এবং ককুৎস্থের ছেলে রঘু। ত্রেতাতে অসুরদের কাছে হেরে গিয়ে দেবতারা বিষ্ণুর কাছে যান। বিষ্ণু পুরঞ্জয়ের সাহায্য নিতে বলেন এবং আশ্বাস দেন পুরঞ্জয়ের শরীরে বিষ্ণু কিছুটা ভর করে অসুর বধে সাহায্য করবেন। পুরঞ্জয় দেবতাদের সাহায্য করতে রাজি হন সর্ত হয় ইন্দ্রকে রাজার বাহন হতে হবে। লজ্জায় ও অপমানে ইন্দ্র অরাজি হলেও পরে বিষ্ণুর কথায় রাজি হন। পুরঞ্জয় তখন বৃষরূপী ইন্দ্রের ককুদে চড়ে যুদ্ধে গিয়ে দৈত্য নিধন করেন। ককুদে বসে ছিলেন বলে নাম হয় ককুৎস্থ; দৈত্যপুরী জয় করার জন্য নাম হয়েছিল পুরঞ্জয়। মেয়ে তারাবতী। দ্রঃ বেতাল।

কক্ষীবান—দীর্ঘতমার (দ্রঃ) ঔরসে বলিরাজের স্ত্রীর পরিচারিকা উশিকের (দ্র) কক্ষীবান ইত্যাদি এগার জন সন্তান হয়। এঁরা ঋষি কক্ষীবানের অনেকগুলি ছেলে। দীর্ঘকাল তপস্যা করে ব্রাহ্মণত্ব পান। এঁরা কৌষ্মাণ্ড ও গৌতম নামে প্রসিদ্ধ।

ঋক্‌বেদে একজন প্রসিদ্ধ ঋষি। অঙ্গিরস বংশে জন্ম; পূর্বদিকে আশ্রমে বাস করতেন; ইন্দ্রের গুরু ছিলেন এবং রুদ্র তেজে জগতে সব সৃষ্টি করে ছিলেন। যবক্রীত, রৈভ্য, অর্বাবসু, পরাবসু, কক্ষীবান, অঙ্গিরস ও কণ্ব এঁরা সাতজন বর্হিষদ।

এই বর্হিষদরাও ইন্দ্রের গুরু। একজন প্রসিদ্ধ যজন। অশ্বিনী কুমাররা এক বার এক শত কলস সুরা পান করতে দিয়েছিলেন, শক্তি পরীক্ষার জন্য। বিদ্যাশিক্ষা করে কক্ষীবান গুরুগৃহ থেকে ফেরার পথে এক জায়গায় পথে রাত্রি যাপন করেন। এক দিন সকালে রাজা ভাবয়ব্য-এর সুন্দর ছেলে স্বনয়কে দেখতে পান; খেলা করতে করতে পথ ভুলে এসে পড়েছিল। ছেলেটির সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবেন স্থির করেন। ছেলেটিকে রাজপ্রাসাদে এনে দিলে রাজা প্রচুর উপহার দেন।

কঙ্ক—(১) বনবাসের শেষে বিরাট গৃহে অজ্ঞাত বাসের সময় যুধিষ্ঠিরের নাম। কঙ্ক নিজের পরিচয় দিয়েছিনে যে তিনি যুধিষ্ঠিরের সখা ছিলেন এবং পাশা খেলায় নিপুণ। যুধিষ্ঠিররা অজ্ঞাতবাসে চলে যাবার ফলে তিনি এখন আশ্রয়প্রার্থী। কঙ্ক অর্থে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়; অর্থাৎ যুধিষ্ঠির নিজের সত্য পরিচয় দিয়েছিলেন। (২) একটি জায়গা; যুধিষ্ঠির এটি উপহার পেয়েছিলেন। (৩) সুরসার একটি সন্তান; পাখী।

কচ—দেবগুরু বৃহস্পতির ছেলে। অত্যন্ত সুন্দর দেখতে। বৃহস্পতি সঞ্জীবনী বিদ্যা জানতেন না। শুক্রাচার্য জানতেন ফলে মৃত অসুরদের বাঁচিয়ে তুলতেন। দেবতারা ফলে কচকে শুক্রাচার্যের কাছে এই বিদ্যা শেখার জন্য পাঠান। নিজের পরিচয় দিয়ে কচ হাজার বছরের জন্য শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ব্রহ্মচারী হয়ে গুরু ও গুরুকন্যার সেবায় নিযুক্ত হন। দেবযানী এদিকে ক্রমশ কচের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ৫০০ বছর কেটে গেলে দৈত্যরা কচের উদ্দেশ্য জানতে পেরে গোচারণ কালে কচকে ধরে কুচি কুচি করে কেটে কুকুর দিয়ে খাইয়ে দেন। দেবযানী পিতাকে দিয়ে সঞ্জীবনী মন্ত্রে কচকে জীবিত করে তোলেন; কচ কুকুরের দেহ থেকে বার হয়ে আসেন। দৈত্যরা এর পর সুযোগ মত কচের দেহ পিষে ফেলে সমুদ্রে জলে গুলে দেন, শুক্রাচার্য আবার বাঁচিয়ে তোলেন। তৃতীয় বারে দৈত্যরা কচকে পুড়িয়ে ছাই করে সুরার সঙ্গে মিশিয়ে শুক্রাচার্যকে পান করিয়ে দেন। শুক্রাচার্য তখন কচকে প্রথমে জীবিত করেন এবং তার পর তাঁকে সঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা দেন এবং নির্দেশ দেন তাঁর দেহ থেকে বার হয়ে এসে কচ যেন গুরুকে বাঁচিয়ে দেন। এই ভাবে কচ আবার বেঁচে ওঠেন। শুক্রাচার্য এই সময়ে যুবা ও ব্রাহ্মণের কাছে সুরা নিষিদ্ধ পানীয় বলে ঘোষণা করেন। হাজার বছর পরে ফিরে যাবার সময় দেবযানী কচকে বিয়ে করতে চান। কচ শেষবারে শুক্রের দেহ থেকে বার হয়ে এসেছিলেন অর্থাৎ কচ শুক্রের পুত্র স্থানীয় এবং দেবযানী গুরুকন্যা এই দুটি কারণে কচ বিয়ে করতে রাজি হন না। ফলে দেবযানী অভিশাপ দেন কচের সঞ্জীবনী বিদ্যা কোন দিন ফলবতী হবে না। কচও তখন শাপ দেন দেবযানীর বাসনা কোন দিন পূর্ণ হবে না; কোন ব্রাহ্মণ ঋষিপুত্র তাঁকে বিয়ে করবেন না। কচ আরো বলে যান সঞ্জীবনী বিদ্যা তিনি অপরকে শিখিয়ে দেবেন; তাদের এ বিদ্যা নিষ্ফল হবে না।

কচ্চায়ন—কাত্যায়ন। প্রাচীনতম পালি বৈয়াকরণ। পাণিনির বার্তিকাকার ও বুদ্ধের শিষ্য মহাকচ্চায়ন এঁরা অন্য লোক। মনে হয় বুদ্ধ ঘোষের এবং পাণিনি, কাতন্ত্র ও কাশিকা-বৃত্তির পরে। কাহিনী আছে বুদ্ধদেব এঁকে 'অথো অকৃথর-সঞ্‌-ঞাতো' বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

কচ্ছপ—কুবেরের একটি নিধি।

কচ্ছপী—নারদের বীণা।

কঠোপনিষদ—দশটি প্রধান উপনিষদের একটি। কৃষ্ণ যজুর্বেদের কঠ শাখার অন্তর্গত। দুটি অধ্যায় এবং তিনটি করে বল্লী অর্থাৎ মোট ছয়টি বল্লী। আরম্ভে দুটি বাক্য ছাড়া সবটাই পদ্যে রচিত প্রথম অধ্যায়ে পিতা বাজশ্রবস্ ও পুত্র নচিকেতা সংবাদ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে যম ও নচিকেতা সংবাদ। পিতৃসত্য পালনের জন্য নচিকেতা যমালয়ে যান এবং যমের কাছে দুটি বর ও আত্মজ্ঞান লাভ করেন। আত্মতত্ত্ব, আত্মার একত্ব, পরমাত্মার সর্বব্যাপকতা, চিত্তশুদ্ধি ইত্যাদি এই উপনিষদের আলোচ্য বিষয়।

কড়ি—ভারতে প্রাচীন মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত। খৃ পঞ্চম-শতকেও চালু ছিল ফা-হিয়েন লিখে গেছেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বাংলাতেও ব্যবহৃত হয়েছে।

কণাদ—বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা। বিরুদ্ধ বাদীদের দেওয়া নাম কণা/কণভক্ষ, কণভুক, উলুক। ফলে অপর নাম ঔলুক্য দর্শন। আর এক নাম কশ্যপ। খুব বেশি পরিমাণ পিপ্পলী খেতেন বলে অপর নাম পিপ্পলাদ। তণ্ডুল কণা খেয়ে জীবন ধারণ করতেন বলে নাম কণাদ। কণাদের বৈশেষিক দর্শনে দশ অধ্যায়, প্রতি অধ্যায়ে দুটি আহ্নিক; কেবল সূত্র মীমাংসা ও সাংখ্য মতবাদ আলোচিত হয়েছে। মূল গ্রন্থ এবং এর প্রাচীন ও প্রামাণিক ব্যাখ্যাদি সাহিত্য ও লুপ্ত। প্রশস্তপাদ রচিত পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ বৈশেষিক দর্শনের একটি প্রাপ্তব্য প্রচলিত গ্রন্থ। ইনি পরমাণু-বাদী। এর মতে জীবনের কঠোরতাই ঋষিদের আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলসূত্র। বিশেষ নামে একটি অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করার জন্যই এই দশন বৈশেষিক দর্শন। এই মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টি ভাব পদার্থের সঙ্গে অভাব পদার্থ মিলে সব কিছুর সৃষ্টি। অভাব পদার্থ :- প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাব। ইনিই প্রথম বলেন পরমাণুই সৎস্বরূপ নিত্য পদার্থ এবং কারণহীন। এবং পরমাণুর সংযোগেই সমস্ত জড় পদার্থের উৎপত্তি। পরমাণুতে বিশেষ নামে একটি জিনিস আছে এবং এই বিশেষ থেকেই পরমাণু ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। কণাদ দেখান তেজ ও আলোক একই মূল জিনিসের অভিন্ন অবস্থা। কণাদ দর্শনে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই; এই জন্য নাস্তিক বলে অভিহিত। ইনিই বিশ্বে পরমাণুবাদের প্রথম প্রবক্তা। দ্রব্যাদি পদার্থজ্ঞান থেকে মুক্তিলাভ হয় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মত। এঁর কাহিনী ও সময় কাল অজ্ঞাত। মহাভারতে ও পুরাণে ইত্যাদিতে কণাদের মতের আভাস আছে।

কণারক—বা কোণার্ক। পুরী সহর থেকে ৩৪ কি-মি পূর্ব, উত্তরপূর্ব কোণে এবং সমুদ্র থেকে ৪ কি-মি দূরে ধ্বংসাবশেষ একটি সূর্য মন্দির। ১২৫০-৬০ খৃষ্টাব্দে ওড়িশার রাজা লাঙ্গুলিয়া নরসিংহ দেব রচিত। ১৭ শতকের প্রারম্ভে ওড়িশার সুবাদার বাখর খাঁর অত্যাচারের ভয়ে কণারক বিগ্রহ 'মৈত্রাদিত্য বিরিঞ্চিদেবকে' পুরীতে পুরুষোত্তম দেউলে স্থানান্তরিত করা হয় কিন্তু পরে এই বিগ্রহের সন্ধান আর মেলে নি। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে এর উচ্চতা ছিল ২২০ ফুটের কিছু বেশি। সামনে জগমোহনের উচ্চতা বর্তমানে ১১৯-ফু, ৬-ই। কণারকের এই মন্দির তৈরি হবার আগেও সম্ভবত এখানে

আরো পুরাতন কোন মন্দির ছিল। বর্তমানে কাছাকাছি গ্রামে অষ্টশম্ভু ও অষ্টশক্তির মন্দির আছে। এগুলিকে নিয়ে কণারককে পদ্মক্ষেত্র বলে বিবেচনা করা হয়। মন্দির পূর্বাস্য; কিছু দূরে পরবর্তী কালে নিকৃষ্ট কারিগর দিয়ে রচিত নাট মন্দির বর্তমান। এই দুটির মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে সূর্যের সারথি অরুণের মূর্তিযুক্ত স্তম্ভ ছিল। স্তম্ভটি এখন পুরী মন্দিরে আছে। প্রাঙ্গণে আরো কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। মন্দিরের চারদিকে চারটি দরজা ছিল; পূর্ব দরজাতে অতিকায় সিংহমূর্তি; দক্ষিণে অশ্বদ্বয়, উত্তরে হস্তীযুগল এখনও বর্তমান।

সূর্যের রথের আকারে কল্পিত এই মন্দির। ভিত্তি বেদির গায়ে নয় ফুটের বেশি উঁচু বারো জোড়া চাকা যেন রথের চাকা। পূব দিকে প্রধান সিঁড়ির দুপাশে সাতটি ঘোড়ার মূর্তি ছিল। সমস্ত মন্দিরটি কারুকার্য খচিত। বাস্তব ও কাল্পনিক জীবজন্তু, রাজা, রাজধানী, সৈনিক, নাগরিক, রাজাকে উপঢৌকন দিচ্ছে জিরাফ সহ বণিক, গুরুশিষ্য, রাজসভা, বণিকসভা, বিবাহসভা, শিকার কাহিনী, দেবমন্দির, শোভাযাত্রা, কামপাশে আবদ্ধ নরনারী, বৃক্ষছায়ায় গোযান, বা রন্ধনরত নারীমূর্তি মন্দিরের গায়ে খোদিত রয়েছে। মন্দিরের ওপর দিকে নৃত্যরত দেবতা ও নর্তকীদের সংখ্যা অধিক। সব কিছুর ওপরে পাথরের কলস ও দেবতার আয়ুধ ষোড়শদল পদ্ম ছিল। কণারকের তক্ষণ শিল্প ভারতের একটি বিশিষ্ট কীর্তি। সমগ্র মন্দিরটি এই খোদিত মূর্তিগুলি দিয়ে জীবন প্রবাহে যেন উচ্ছল হয়ে রয়েছে। খৃষ্টীয় ১৭-শ শতকের গোড়াতে হয়তো পাশের নদী মজে যাওয়ায় মন্দিরটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। তারপর কালের কবলে সমস্ত মন্দিরটি ক্রমশ ধ্বংস স্তূপে পরিণত হতে থাকে। বিংশ শতকের প্রথম দিক থেকে মন্দিরটির সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে।

কণিক—ধৃতরাষ্ট্রের এক জন কূটনীতিক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রকে সর্বদাই উত্তেজিত করতেন। শত্রুকে যে কোন উপায়ে ধ্বংস করার নীতির সমর্থক। কণিকের নীতি ভীতুকে ভয় দেখিয়ে জয় করবে। সাহসীকে সম্মানিত করে ছলনা করে হত্যা করবে। লোভীকে উপহার দিয়ে বশ করবে। নিজের পিতা, গুরু বা নিজের ছেলেও যদি শত্রু হয় তাকে হত্যা করতে দ্বিধা করবে না। কাউকে অপমান সূচক কোন কথা বলবে না এবং পৃথিবীতে সকলকে অবিশ্বাস করবে। এই নীতির সমর্থনে বলতেন এক শৃগাল এক সিংহের মাংস খাবার জন্য একটি বাঘ, একটি ইঁদুর ও একটি বেঁজির সঙ্গে বন্ধুতা করে। ইঁদুরকে দিয়ে সিংহের থাবা এমন ভাবে খাইয়ে ফেলে যে সিংহ খোঁড়া হয়ে পড়ে। এর পর বাঘকে দিয়ে সিংহকে হত্যা করায়। শৃগালের পরামর্শ মত তারপর সকলে স্নান করতে যায়, এসে মাংস খাবে এবং শৃগাল পাহারা দিতে থাকে। বাঘ স্নান করে প্রথম ফিরে আসে; শৃগাল জানায় ইঁদুর অহঙ্কারে বলে বেড়াচ্ছে সে নিজে সিংহকে নিহত করেছে। অপরের হাতে নিহত শিকার শৃগাল নিজেই আর খেতে রাজি নয়। শুনে বাঘের অহমিকা আহত হয় এবং বাঘ না খেয়েই চলে যায়। এর পর ইঁদুর এলে শৃগাল জানায় বেঁজি বলেছে সিংহের মাংস বিষ; খেলেই মৃত্যু হবে। ইঁদুর না খেয়ে পালিয়ে যায়। এর পর বেঁজি এলে শৃগাল তাকে তেড়ে যায় এবং বেঁজি ভয়ে পালিয়ে যায়। শৃগাল নিজের খুসি মত তখন সিংহের মাংস খেতে থাকে।

কণ্ডু—কণ্বের ছেলে। একজন প্রসিদ্ধ মহর্ষি। কণ্ডু ও মেধাতিথি দুই ভাই। গোমতী তীরে কঠোর তপস্যা করছিলেন। ইন্দ্র ভয়ে প্রম্লোচা অপ্সরাকে পাঠান। এঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রায় শতবর্ষ এঁর সঙ্গে মন্দর পর্বতে বসবাস করেন। এরপর অপ্সরা বিদায় নিয়ে ফিরে যেতে চান কিন্তু মুনি রাজি হন না। বার বার এই ভাবে বিদায় চাওয়া ও রাজি না হওয়ার মধ্য দিয়ে কয়েক শত বছর কেটে যায়। মুনি ভোগের নতুন নতুন পথে ভেসে চলতে থাকেন। এর পর এক দিন সন্ধ্যা বন্দনার উদ্যোগ করলে ৯০০ বছর ৬ মাস ৩ দিন পরে ধর্মের কথা মনে পড়েছে বলে অপ্সরা পরিহাস করেন। প্রথমে মহর্ষি বিশ্বাস করতে চান না। বলেন মাত্র সেই দিন সকালে দু জনের দেখা হয়েছে। কিন্তু তারপর কণ্ডু মুনির জ্ঞান ফিরে আসে; গর্ভবতী স্ত্রীকে তিরস্কার করেন ও ফিরে যেতে বলেন এবং নিজে আবার তপস্যায় মগ্ন হন। প্রম্লোচা সব শোনেন। গা দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে এবং শেষ অবধি চলে যান। অপ্সরার গায়ের ঘাম ও গর্ভ নীচে বহু গাছের পাতায় ও নরম শাখায় ছড়িয়ে পড়ে। বাতাসে এগুলি তারপর এক জায়গায় জমা হয়ে চন্দ্রালোকে পরিপুষ্ট হয়ে মারিষা = বার্ক্ষী নামে একটি শিশু কন্যাতে পরিণত হয়। অন্যমতে একটি গাছে গর্ভ ত্যাগ করে গিয়েছিলেন, এই ফেলে দেওয়া গর্ভ থেকে মারিষা নামে একটি মেয়ে হয়। এক বনে কণ্ডুর প্রিয় পুত্র ১৬ বছর বয়সে মারা যান। শোকে অভিশাপ দিয়ে বনটিকে মুনি মরুভূমিতে পরিণত করেন। সীতার অন্বেষণে হনুমান এই মরুভূমিতে ও এসেছিলেন। রামের রজ্যভার গ্রহণের সময় কণ্ডু অযোধ্যাতে গিয়েছিলেন।

কণ্ব—ঋক্‌বেদে এক ঋষি। পুরুবংশে অপ্রতিরথের ছেলে। কণ্বের ছেলে কণ্ডু ও মেধাতিথি। কণ্ব গোত্রের আদি পুরুষ। শুক্লযজুর্বেদের কণ্বশাখা প্রণয়ন করেন। প্রাচীন ঋষিদের মধ্যে কণ্ব বংশ একটি প্রসিদ্ধ বংশ। কশ্যপ বংশে জন্ম কি না অস্পষ্ট তবে কাশ্যপ নামেও পরিচিত। মালিনী নদীর তীরে শিষ্যদের নিয়ে আশ্রমে বাস করতেন। অন্য মতে প্রবেণী নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত। আর এক মতে চম্বল নদীর তীরে। রাজপুতানাতে কোটা থেকে চার মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। শকুন্তলার পালক পিতা। দুষ্মন্তের ছেলে, গোবিতত নামে যে যজ্ঞ করেন তাতে কণ্ব প্রধান পুরোহিত ছিলেন। মাতলি ও তার স্ত্রী সুধর্মা দুজনে মিলে মেয়ে গুণকেশীর পাত্র খুঁজতে বার হয়েছিলেন—এ ঘটনাটি কণ্ব দুর্যোধনকে বর্ণনা করেন। রাম রাজা হলে কণ্ব দেখা করতে এসেছিলেন। কণ্ব ও মেনকার একটি মেয়ে হয় নাম ইন্দীবর-প্রভা। ঋক্‌বেদে ১ম মণ্ডলের ৫০টি সূক্ত এবং ৮ম মণ্ডলটি কণ্ব পরিবারের দ্বারা লিখিত। শকুন্তলার স্বামী দুষ্মন্তের কাকার ছেলে এই কণ্ব।

কতি—বিশ্বামিত্রের ঔরসে শীলাবতীর গর্ভে জন্ম পুত্র। কতির বংশ কাত্যায়ন বংশ।

কথাসরিৎসাগর—সংস্কৃত পদ্যে লেখা কাহিনী। ১০৬৩-৮১ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরী কবি সোমদেব রচিত। ২১৩৮৮ শ্লোক। জলন্ধর রাজকন্যা কাশ্মীর রাজ অনন্তের মহিষী সূর্যমতির চিত্ত বিনোদনের জন্য পৈশাচী ভাষায় গুণাঢ্য (দ্র) রচিত বৃহৎ-কথা গ্রন্থের সার-সংগ্রহ। বৃহৎ-কথার কাশ্মীরী সংস্করণ অবলম্বনে ক্ষেমেন্দ্র সংস্কৃত পদ্যে বৃহৎ-কথা-মঞ্জরী রচনা করেন। এর পর প্রায় ৩০ বছর পরে কথাসরিৎসাগর রচিত হয়। সোমদেব বৃহৎ-কথা মঞ্জরী অনুসরণ করেছিলেন কিনা মত ভেদ আছে। তবে

এই দুটি বইতেই প্রথম ৫-টি খণ্ডের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। কথাসরিৎসাগর ১৮টি পরিচ্ছেদ বা লম্বকে বিভক্ত; লম্বকের অবান্তর বিভাগের নাম তরঙ্গ; সমগ্র গ্রন্থে ১২৪ তরঙ্গ। উদয়ন বাসবদত্তা, বেতালপঞ্চবিংশতি ও পঞ্চতন্ত্রের বহু কাহিনী এই গ্রন্থের অন্তর্গত।

কদ্রু—দক্ষ প্রজাপতির মেয়ে; এরা দুই বোন; কদ্রু ছোট, বিনতা (দ্র) বড়। দুজনেই কশ্যপের স্ত্রী। কশ্যপ বর দিতে চাইলে কদ্রু বলশালী এক হাজার নাগ এবং বিনতা এই নাগেদের চেয়ে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ দুটি সন্তান চান। যথা কালে কদ্রুর হাজারটি এবং বিনতার দুটি ডিম হয়। তারপর পাঁচশ বছর পরে কদ্রুর ডিমগুলি থেকে বাচ্চা বার হয়ে আসে। বিনতা (দ্র)। এক দিন এর পর উচ্চৈঃশ্রবা অন্য মতে ঐরাবতের লেজের কি রং এই নিয়ে দুই বোনে তর্ক হয়। বিনতার মতে লেজ সাদা, কদ্রুর মতে কালো। ঠিক হয় যার কথা মিথ্যা হবে তাকে অপরের দাসী হয়ে থাকতে হবে। কদ্রু তারপর গোপনে ছেলেদের ডেকে উচ্চৈঃশ্রবার লেজে লেগে থাকতে বলেন যাতে লেজ কালো দেখায়। অনন্ত (দ্রঃ) ইত্যাদি বহু সাপ রাজি হন না; কদ্রু তাঁদের অভিশাপ দেন জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে তাঁদের মৃত্যু হবে। পর দিন বিনতা হেরে গিয়ে কদ্রুর দাসী হন। এই ভাবে বিনতার প্রথম ছেলে অরুণের অভিশাপও সফল হয়। এরপর বিনতার দ্বিতীয় ডিম থেকে গরুড়ের জন্ম হয়। কদ্রুর আদেশে গরুড়কে (দ্র) সাপদের দেখাশোনা করতে বাধ্য হতে হয়। কদ্রুর ছেলে উরগ (দ্র)। দ্রঃ নাগ।

কদ্রুর প্রধান ছেলেগুলি :—শেষ, পুরাণ-নাগ, আর্যক, বাসুকি, কপিঞ্জর, উগ্রক, ঐরাবত, এলাপত্র, কলশপোতক, তক্ষক, সবাম, সুমনস্, কর্কোটক, নীল, দধিমুখ, ধনঞ্জয়, অনিল, বিমল, কালীয়, কল্মাষ, পিণ্ডক, মণিনাগ, শবল, আপ্ত, শাখ, পিণ্ডারক, হস্তিপিণ্ড, বালি, করবীর, পিঠরক, শিখ, পুষ্পদংষ্ট্র, সুমুখ, নিষ্ঠানক, বিল্বক, কৌণপাশন, হেমগুহ, বিল্বপাণ্ডুর, কুঠার, নহুষ, মূষকাদ, কুঞ্জর, পিঙ্গল; শঙ্খ, প্রভাকর, বাহ্যকর্ণ, শিরাপূর্ণ, কুমুদ, হস্তিপদ, হরিদ্রক, কুমুদাক্ষ, মুদ্গর, অপরাজিত, তিত্তির, কম্বল, জ্যোতিক, হলিক, অশ্বতর, পন্নগ, কর্দম, কালীকক, শ্রীবহ, বহুমূলক, বৃত্ত, কৌরব্য, কর্কর, ধৃতরাষ্ট্র, সংবর্ত, অর্কর, পত্ত, শঙ্খপিণ্ড, কুণ্ডোদর, শঙ্খমুখ, সুবাহু, মহোদর, কুষ্মাণ্ডক, বিরজস্, ক্ষেমক, শালিপিণ্ড।

কদ্রু একবার বিনতাকে বলেন সমুদ্রের মাঝে রমণীয়ক দ্বীপে নিয়ে যেতে। বিনতা কদ্রুকে পিঠে নেন এবং গরুড় নাগেদের পিঠে নেন। গরুড়ের কাছে ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগে; আকাশে সূর্যমণ্ডলের কাছে উঠে যান ফলে সূর্যের অসহ্য তাপে নাগশিশুরা ঝলসে যেতে থাকে। কদ্রু তখন ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করে বৃষ্টি নামিয়ে উরগদের রক্ষা করেন।

এরপর গরুড় মায়ের দাসীত্ব মুক্তির উপায় কি কদ্রুর কাছে জানতে চাইলে কদ্রু অমৃত এনে দিতে বলেন, তাহলে বিনতাকে তিনি মুক্তি দেবেন।

কনকধ্বজ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীম সেনের হাতে নিহত।

কনকায়ুস—করকায়ুস। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে যোগ দিয়েছিলেন।

কনখল—(১) এইখানে দক্ষ যজ্ঞ করছিলেন। (২) গঙ্গাতীরে একটি পবিত্র জায়গা।

এখানে স্নান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। বশিষ্ঠের নির্দেশে লক্ষ্মণের ছেলে তক্ষ এখানে বনবাসীদের পরাজিত করে অগতি/তী নগরী স্থাপন করেন। দ্র হরিদ্বার।

কনিষ্ক—কুষাণ বংশে শ্রেষ্ঠ রাজা। ৭৮ খৃষ্টাব্দে রাজা হন এবং এই সময়ে শকাব্দ চালু করেন। অন্য মতে খৃ ২-শতকে। বিহার থেকে কাশ্মীর এবং মধ্য এসিয়ার গোবি মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য ; পুরুষপুর (= পেশোয়ার) ছিল রাজধানী। পার্থিয়ান ও চীনদের তিনি পরাজিত করেছিলেন। অশ্বঘোষ, চরক ও আরো কয়েক জন পণ্ডিত তাঁর সভাতে ছিলেন প্রবাদ আছে। কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মহাসংগীতি তিনিই ডাকিয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধের অস্থির ওপর একটি বিরাট ও সুন্দর স্মৃতিসৌধ রচনা করে দিয়েছিলেন। একটি আধারের মধ্যে পেশোয়ারের কাছে ভূগর্ভে এটি পাওয়া গিয়েছিল ; উপস্থিত এটি ব্রহ্মদেশে রক্ষিত আছে।

কন্‌জ্যুর—দ্রঃ তন্-জ্যুর।

কন্দর্প—মদন (দ্রঃ)।

কন্দলী—ঔর্ব ঋষির জানু থেকে জন্ম। অন্য মতে ব্রহ্মার পৌত্রী। অত্যন্ত কলহ-পরায়ণা। ঔর্ব এঁকে দুর্বাসার সঙ্গে বিয়ে দেন এবং অনুরোধ করেন কন্দলীর শত অপরাধ যেন দুর্বাসা ক্ষমা করেন। দুর্বাসা তাই করেছিলেন এবং তারপর বিরক্ত হয়ে ভস্ম হবার জন্য শাপ দেন। পরজন্মে কলাগাছ হয়ে জন্মান এবং কাউকে আর বিয়ে করেন নি।

কন্যাকুব্জ—কুশ নামে এক ধার্মিক রাজা/মুনির ছেলে কুশনাভ। কুশনাভের স্ত্রী ঘৃতাচীর ১০০ মেয়ে হয়েছিল। এক দিন উদ্যানে এই মেয়েরা নাচগান করছিলেন বায়ু তখন এদের রূপে মুগ্ধ হয়ে সকলকে এদের বিয়ে করতে চান। মেয়েরা অবজ্ঞায় এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে বায়ু এদের সর্বাঙ্গ ভেঙ্গে দেন ফলে এঁরা কুব্জ হয়ে যান। এই জন্য স্থানটির নাম হয় কন্যাকুব্জ। পরে অনুনয় বিনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে পবনদেব বলেন কাম্পিল্যরাজ ব্রহ্মদত্তের, অন্য মতে কাছেই তপস্যারত মুনি ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে বিয়ে হলে এরা পূর্বরূপ ফিরে পাবে। কুশনাভ এই মত বিয়ে দেন এবং ব্রহ্মদত্ত এঁদের পাণিস্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই এঁরা পূর্বরূপ ফিরে পান। এই কন্যাকুব্জে ইন্দ্র ও বিশ্বামিত্র এক সঙ্গে সোম/সুরা পান করেছিলেন। দ্র কান্যকুব্জ।

কন্যাকুমারী—(১) একটি মহিলা পদব্রজে কাশী থেকে এসে এখানে স্নান করে পাপমুক্ত হন ; ফলে নাম হয় কন্যাকুমারী। (২) ময়াসুরের মেয়ে পুণ্যকাশী কৈলাসে শিবের তপস্যা করেন। শিব দেখা দিলে শিবের দেহে লীন হয়ে যাবার বর চান। শিব বলেন বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে, দ-সমুদ্রতীরে বসে তপস্যা করতে হবে, পুণ্য-কাশীর আশ্রম কন্যাক্ষেত্র বা তপস্থল নামে প্রসিদ্ধি পাবে এবং বাণাসুর ইত্যাদি দুষ্টদের দমন করতে হবে ; তারপর। এই নির্দেশে ইনি সমুদ্রের তীরে এসে কন্যা-কুমারী নাম গ্রহণ করে তপস্যা করতে থাকেন। বাণাসুর ত্রিভুবন জয় করে দুষ্ট শাসক হয়ে উঠে কন্যাকুমারীকে দেখে বিয়ে করতে চান। কিন্তু ইনি প্রত্যাখ্যান করলে দুর্মুখ ও দুর্দর্শন নামে দুই অনুচরকে নিয়ে যুদ্ধ করতে এসে বাণাসুর নিহত হন।

(২) কংসের হাত থেকে যে শিশুকন্যা আকাশে চলে যান সেই কন্যাই কন্যাকুমারী। (৩) হেরোডটাস (খৃ-পূ ৩-য় শতক) তাঁর গ্রন্থে কন্যাকুমারীর উল্লেখ করেছেন। ৬০ খৃষ্টাব্দে লিখিত পেরিপ্লাস গ্রন্থে এই তীর্থের মাহাত্ম্যের উল্লেখ আছে। টলেমির 'কোমারিয়া এক্রন' গ্রন্থে উল্লেখ আছে এখানে তিনি তীর্থ স্নান করেছিলেন এবং মন্দিরে পূজাও দিয়েছিলেন। ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে মার্কোপলো এই মন্দিরে পূজা দিয়েছিলেন।

কপর্দী—একজন রুদ্র (দ্রঃ)।

কপালী—যিনি কপাল ধারণ করেন। (১) একবার ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে ত্রিভুবনে কে বড় তর্ক হয়। এমন সময়ে সামনে একটি উজ্জ্বল আলো ফুটে ওঠে এবং দৈববাণী হয় এই আলো কোথা থেকে আসছে যে বলতে পারবে সেই ত্রিভুবনে প্রকৃত প্রধান। ব্রহ্মা তখন ওপর দিকে উঠতে থাকেন এবং বিষ্ণু নীচের দিকে যেতে থাকেন। বহু বহু দিন ধরে এগিয়ে যাবার পর ব্রহ্মা একটি কেতকী ফুল দেখতে পান, ফুলকে জিজ্ঞাসা করলে ফুলটি জানায় এই আলোর উৎস থেকে তিনব্রহ্মপ্রলয়-কাল পার হয়ে সে আসছে। ব্রহ্মা তখন ফুলটিকে নিয়ে বিষ্ণুর কাছে এসে বলেন এই আলোর উৎস তিনি দেখে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কেতকী ফুলটি শিবের মূর্তি ধরে অন্য মতে শিব আবির্ভূত হয়ে এই মিথ্যা বলার জন্য ব্রহ্মার একটি মাথা নখে ছিঁড়ে ফেলেন। ব্রহ্মা তখন শিবকে শাপ দিলেন নর-কপাল হাতে আটকে থাকবে এবং এই নিয়ে জীবন ভর ভিক্ষা করতে হবে। শিব ও শাপ দেন কেউ ব্রহ্মাকে কোনদিন পূজা করবে না।

অন্য মতে সত্য যুগে শ্বেতদ্বীপে অনন্ত সুখ লাভের জন্য বিষ্ণু এবং সমস্ত বাসনা জয় করার জন্য ব্রহ্মা তপস্যা করছিলেন; এবং এক বার এঁদের দেখা হয়ে যায় ইত্যাদি। এই সময়ে লিঙ্গ দেহ ধারণ করে শিব দেখা দেন এবং তাঁর আদি বা অন্ত যে জানতে পারবে সেই বড় ইত্যাদি। ব্রহ্মা তার পর বিষ্ণুকে এসে বলেছিলেন শিবের মাথা থেকে ঐ ফুল এনেছেন; এবং কেতকী ব্রহ্মাকে সমর্থন করেন। এই মিথ্যা ভাষণের জন্য মহাদেব কেতকীকে শাপ দেন কোন পূজায় কেতকী ফুল ব্যবহৃত হবে না এবং ব্রহ্মার একটি মাথা ছিঁড়ে নেন ইত্যাদি। (২) ভগবতী জগৎ পালন করেন বলে অথবা ব্রহ্মার কপাল ধারণ করেন বলে নাম কপালী। (৩) একজন রুদ্র। দ্রঃ-কাল ভৈরব।

কপিঞ্জল—দ্রঃ-ইন্দ্রপ্রমিতি।

কপিল—ঋষি। পুরাণে ও সাহিত্যে একাধিক কপিলের উল্লেখ আছে। গৌড়পাদ স্বামীর মতে কপিল ব্রহ্মার মানস পুত্র; এবং দ্বাবিংশতি সূত্র সংবলিত 'তত্ত্ব মানস' নামে ছোট বইটি কপিল প্রণীত আদি সাংখ্য গ্রন্থ। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে তত্ত্বমানস সূত্র ও সূত্রষড়ধ্যায়ী দুটিই কপিলের রচনা। ভাগবতে দেবহূতি কপিল সংবাদে এবং কপিল মতবাদে বেদান্ত দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যুক্ত সাংখ্য দর্শন রচনা করেন। সাংখ্য মতে প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি। আত্মা কিছুই সৃষ্টি করে না; আত্মা কেবল দ্রষ্টা। কর্মফল অনুসারে আত্মা দেহান্তরে আশ্রয় নেয়। কর্মক্ষয় হলে আর দেহান্তরে যায় না। বস্তু মাত্রেই সৎ এবং সৎ থেকেই সতের উৎপত্তি। এই সব তত্ত্ব, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি কপিল নিজের মাকে শোনান। একাগ্রচিত্তে

তপস্যা করার জন্য কপিল পাতালে আশ্রম করেছিলেন।

কপিল হচ্ছেন কর্দম প্রজাপতির ঔরসে দেবহূতির ছেলে। আর এক মতে বৈবস্বত মনুর ছেলে কপিল। অপর নাম চক্রধনু। একটি মতে বিষ্ণুর অবতার। কঠোর তপস্যা করেছিলেন। ইতিমধ্যে কর্দম প্রজাপতি মারা গেলে দেবহূতি এসে কপিলের কাছে ভক্তিযোগ শিখতে চান। কপিল মাকে উপদেশ দেন।

রাক্ষসের বেশে ইন্দ্র সগর রাজার অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করে পাতালে ধ্যান মগ্ন কপিলের আশ্রমে বেঁধে রেখে আসেন। সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে ঘোড়া খুঁজতে পাতালে এসে এঁকে ঘোড়া চোর মনে করে আক্রমণ করলে মুনির ক্রোধে সকলে ভস্ম হয়ে যান। এর পর অংশুমান এসে মুনিকে সন্তুষ্ট করে ঘোড়া নিয়ে যান। কপিলমুনিই এই অংশুমানকে গঙ্গাজল স্পর্শে এদের মুক্তির উপায় বলে দেন। মাকে উপদেশ দেবার পর কপিল পুলহের আশ্রমে গিয়ে বাস করতে থাকেন। ভীষ্মকে শরশয্যায় দেখা করে যান। কপিল ও স্যমরশ্মি মুনির মধ্যে একবার আলোচনা হয় গৃহস্থধর্ম না যোগ ধর্ম কোনটি বড়। কপিল শিবের ভক্ত ছিলেন। (২) একটি সর্প :- ধর্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত ও কপিল—এই সাতটি সাপ পৃথিবীকে ধারণ করে রয়েছে। (৩) ভানু নামে অগ্নির চতুর্থ পুত্র। (৪) শালিহোত্রের পিতা ; একজন মুনি ; উপরিচর বসুর যজ্ঞ পরিচালনা করেন। (৫) বিশ্বামিত্রের এক ছেলে।

কপিলা—(১) দক্ষের মেয়ে, কশ্যপের স্ত্রী। একটি মতে এঁর মেয়ে অরুণা, রম্ভা, তিলোত্তমা ইত্যাদি ; ছেলে অতিবাহু, হাহা, হুহু, গন্ধর্ব ইত্যাদি। (২) পঞ্চশিখের জননী।

কপিলাবস্তু—কপিল মুনির বাসস্থান। অন্য নাম কপিলপুর, কপিলবস্তু। সুপ্রচলিত প্রবাদ অনুসারে পোতলক অথবা সাকেতে রাজত্বকারী জনৈক ইক্ষ্বাকু রাজার নির্বাসিত ছেলেরা কপিলের আশ্রমের কাছে মনোরম পরিবেশে এই নগরী তৈরি করে এখানে বাস করতেন। এঁদের সঙ্গে এঁদের বোনেরাও ছিলেন। বোনেদের বিয়ে করে শোণিতগর্বী শাক্য বংশের স্থাপন করেন। এই বংশে বুদ্ধদেবের জন্ম। বুদ্ধদেবের সময় কপিলাবস্তু বিরাট সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল কিনা মতভেদ আছে। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে শাক্যরা মনে হয় কোসলরাজ প্রসেনজিতের অনুগত বা আশ্রিত রাজা ছিল। প্রবাদ আছে প্রসেনজিতের স্ত্রী শাক্যদের ক্রীতদাসী ছিলেন ; এবং মাতুল বংশের কাছে উপযুক্ত সম্মান না পাওয়ার ক্ষোভে প্রসেনজিতের ছেলে বিরুঢক বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই কপিলাবস্তু ধ্বংস করেন এবং এখানকার অধিবাসীদের নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে শাক্যদের প্রায় শেষ করে দিয়েছিলেন। এর পর শাক্য বংশ আর কোন দিন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। ফা-হিয়েন কপিলাবস্তু পরিদর্শন করেন এবং সে সময় এখানে কেবল এক দল বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং দশটি উপাসক পরিবার ছিল ; রাজা বা অন্য কোন প্রজা ছিল না। শুদ্ধোদনের জীর্ণ রাজপ্রাসাদ ও বুদ্ধদেবের স্মৃতিজড়িত কয়েকটি প্রাসাদ দেখেছিলেন। হিউ-এন্-ৎসাঙ ও এই জরাজীর্ণ প্রাসাদ ও নগরী দেখেছিলেন। এখানকার বৌদ্ধদের অবস্থা তখন চরম শোচনীয়।

কিন্তু কপিলাবস্তু জায়গাটি ঠিক কোথায় আজও নিশ্চিত হওয়া যায় নি। বেশির ভাগ মতে কপিলাবস্তু হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশে এবং কোশল রাজ্যের

অন্তর্গত, এবং এই কপিলাবস্তু একটি নদীর কাছে একটি হ্রদের তীরে অবস্থিত। নদীটির নাম একটি মতে ভাগীরথী আর একটি মতে রোহিণী। লুম্বিনীর অপর নাম রুম্মিনদেই (জেলা ভৈরহাওয়া, নেপালী তরাই) এবং এখানে অশোকের স্তম্ভলিপিতে উল্লেখ আছে এটি বুদ্ধদেবের জন্মস্থান। রুম্মিনদেই-এর উত্তর-পশ্চিমে ২৪ কি-মি দূরে তিলৌরাকোট (জেলা তৌলি হাওয়া, নেপালী তরাই) এবং রুম্মিনদেই-এর ১৪ কি-মি পশ্চিমে ভারত নেপাল সীমান্তে পিপ্‌রাওয়া (জেলা বস্তি, উত্তরপ্রদেশ) এই দুটি জায়গার একটি কপিলবস্তু হতে পারে। তিলৌরাকোটে অবশ্য বৌদ্ধযুগের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় নি, মৌর্যযুগের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে। ফা-হিয়েন অনুসারে পিপরাওয়াই কপিলবস্তু এবং এখানে প্রচুর বৌদ্ধ যুগীয় ধ্বংসাবশেষ ও পাশেই গানওয়ারি গ্রামে মৌর্যযুগের অপর্যাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। পিপ্‌রাওয়ার বৃহত্তম স্তূপটির কেন্দ্রস্থানে খননের ফলে পাঁচটি মঞ্জুষা পাওয়া গেছে এবং এদের একটির গায়ে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ গচ্ছিত রাখার কথা উল্লিখিত রয়েছে। তবু পিপ্‌রাওয়াই যে কপিলাবস্তু এ কথা এখনও নিশ্চিত নয়।

কপোত—গরুড়ের একটি ছেলে।

কবচী—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে, ভীমের হাতে নিহত।

কবরী—দ্র কেশবিন্যাস।

কবন্ধ—গন্ধর্বরাজ শ্রীর ছেলে নাম দনু/বিশ্বাবসু। সুপুরুষ ছিলেন; কিন্তু স্থূল-শিরা ঋষির ফলমূল অপহরণ করাতে ঋষির শাপে মাথাহীন, উদরে মুখ ও দীর্ঘহস্ত হন। পরে মিনতি করলে ঋষি বর দেন রামচন্দ্র তাঁর হাত দুটি কেটে তাঁকে অগ্নিসংকার করলে শাপমুক্ত হবেন। অন্য মতে ব্রহ্মার বরে দীর্ঘায়ু হয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। ইন্দ্র তারপর বজ্রাঘাতে দুই ঊরু ও মাথা দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। তখন ক্ষমা চাইলে ইন্দ্রের বরে যোজন সমান লম্বা হাত পা, পেটেতে তীক্ষ্ণ দাঁতযুক্ত মুখ গড়ে ওঠে। এই হাত দিয়ে জীবজন্তু ধরে খেতেন। ইন্দ্র এই অবস্থা থেকে মুক্তির ঐ একই উপায় বলেছিলেন। জটায়ুর সঙ্গে দেখা হবার পর সীতার খোঁজে ক্রৌঞ্চারণ্যে মতঙ্গ আশ্রমের কাছে নিবিড় বনে রাম লক্ষ্মণ কবন্ধের হাতে গিয়ে ধরা পড়েন। এঁরা কবন্ধের দুটি হাত কেটে দিলে কবন্ধ মাটিতে পড়ে যান এবং এঁদের পরিচয় পেয়ে অগ্নিসংকারের জন্য এঁদের অনুরোধ করেন। অগ্নিসংকারের পর কবন্ধ পূর্ব দেহ ফিরে পান এবং সীতা উদ্ধারের জন্য ঋষ্যমূকে গিয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপনের পরামর্শ দিয়ে এবং কোন পথে যেতে হবে দেখিয়ে দিয়ে হংসযুক্ত দিব্যরথে করে পুণ্য-লোকে চলে যান।

কবি—(১) বিবস্বানের নাতি। বৈবস্বত মনুর এক ছেলে। (২) বৃহস্পতির ৫-ম পুত্র; ইনি এক জন অগ্নি। সমুদ্রে বড়বাগ্নি রূপে অবস্থিত। অপর নাম ঊর্দ্ধভাক্ (ম ৩।২০৯।২০)। (৩) ব্রহ্মার যজ্ঞে কবি, ভৃগু ও অঙ্গিরস উৎপন্ন হন। এই কবিকে ব্রহ্মা নিজের ছেলে বলে গ্রহণ করেন এবং এই কবির ছেলেদের নাম বরুণ; এই বরুণগুলির মধ্যে একজনের নাম কবি আর এক জনের নাম কাব্য।

কবীর—সাধক কবি; কাশীতে জন্ম, আনুমানিক ১৪৪০-১৫১৮ খৃঃ। কাহিনী অনুসারে এক ব্রাহ্মণ বিধবার মাতৃপরিত্যক্ত শিশু; নিরু নামে এক মুসলমান জোলার ঘরে প্রতি-

পালিত। শৈশবেই ধর্মসাধনা ও সাধুসেবায় আগ্রহ দেখা দেয়। বালক বয়স থেকে লোককে নানা উপদেশ দিতেন এবং বালকের কোন গুরু ছিল না বলে নিগুরা ও গুরু-হীন বলে উপহাসের পাত্র হয়েছিলেন। পরে কবীর রামানন্দের শিষ্য হন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। কবীরের জীবনে লোঈ নামে একটি মহিলা ছিলেন। এক মতে ইনি কবীরের শিষ্যা আর এক মতে স্ত্রী এবং লোঈ-এর গর্ভে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়েছিল। কবীর লেখাপড়া জানতেন না। সুফি যোগী ও বৈদান্তিকদের কাছ থেকে আহৃত জ্ঞান এবং নিজের উপলব্ধি ও স্বভাবকবিত্ব মিলে কবীরের সাধন-মূর্তি গড়ে উঠেছিল। তাঁর ভক্তি ও রামনাম কীর্তনে হিন্দুমুসলমান সকলেই তাঁর শিষ্য হতে থাকেন। কবীর হিন্দুমুসলমানের ধর্মীয় মিলন করতে চেয়েছিলেন। ফলে বহু লোকের অপ্রীতিভাজন হতে হয়েছিল। কিন্তু তবুও হিন্দি জনসমাজের ওপর কবীরের প্রভাব তুলসীদাসের পরই। অদ্বৈতবাদ, ও ইসলামের একেশ্বরবাদ এবং সম্প্রদায়হীনতা মিলিয়ে ভক্তিপন্থ নামে ধর্মমত গড়ে তোলেন। কবীর রামানন্দস্বামীর বার জন শিষ্যের এক জন এবং বৈষ্ণবদের প্রতি আকর্ষণ বেশি ছিল। কিন্তু উপাসনা ও ক্রিয়াকলাপের দিক থেকে বৈষ্ণব বা কোন হিন্দু সম্প্রদারের প্রভাব স্বীকার করতেন না। কবীরপন্থী গৃহস্থরা নিজেদের জাতীয় ও বর্ণোচিত আচার অনুষ্ঠান করেন। সন্ন্যাসীরা কবীরের ভজনা এবং ধর্মসংগীত গান করেন। এঁর প্রভাবে উত্তর ভারতে সন্তকাব্য নামে একটি সাহিত্য শাখা গড়ে উঠেছিল এবং কবীরের সময় থেকে প্রায় ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত এই সাহিত্য চালু ছিল। এই সাহিত্যে ভক্তিপন্থ-এর মতবাদ বিধৃত হয়েছে। সন্ত কবিদের মধ্যে রৈদাস, নানক, ধরমদাস, দাদু, রজ্জব ইত্যাদি নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই প্রায় নিরক্ষর ছিলেন। শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীকে বাদ দিয়ে সাধারণ লোকের ওপর এঁদের প্রভাব অপরিসীম হয়ে উঠেছিল। পরে জাতিভেদ দেখা দিয়েছে। কবীরপন্থী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন সংস্রব নেই। মুসলমানদের প্রধান কেন্দ্র মগহর। হিন্দুদের দুটি দল; এক দলের প্রধান কেন্দ্র বারাণসী আর এক দলের ছত্তিশগড়। নিম্ন বর্ণ হিন্দুদের অস্পৃশ্য ধরা হয়। ব্রাহ্মণরা উপবীত নেন; ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেউ জপমালা নিতে পারেন না। কবীর পন্থীদের সন্ন্যাসাশ্রমে যোগ দেবার জন্য উৎসাহিত করা হয়। দু বছর শিক্ষানবিসির পর মেয়েরাও সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন।

কমলযোনি—প্রলয়ের পর ত্রিজগৎ তমোময় ও জলময় ছিল; এবং দেবতা, ঋষি, স্থাবর, জঙ্গম কিছুই ছিল না। একমাত্র বিষ্ণু নারায়ণ রূপে যোগনিদ্রায় অভিভূত হয়ে শেষ নাগের কোলে শুয়ে ছিলেন। এই সময়ে তাঁর হাজার মাথা, হাজার চোখ, হাজার পা ও হাজার বাহু ছিল। এর পর তাঁর নাভি থেকে শত যোজন বিস্তীর্ণ এক পদ্ম ফুটে ওঠে এবং এই পদ্মে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা (= কমলযোনি) উৎপন্ন হন।

কমলা—দ্র লক্ষ্মী। প্রহ্লাদের মা কয়াধুর অপর নাম।

কমলাকরভট্ট—বিখ্যাত নির্ণয়-সিন্ধু (১৬১২ খৃ) গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্মকৃত্যের ব্যবস্থা আছে। মীমাংসা দর্শন অলঙ্কার ইত্যাদির ওপরও এঁর গ্রন্থ আছে। সব সমেত গ্রন্থের সংখ্যা কুড়ির বেশি। এঁর প্রপিতামহ নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত রামেশ্বর ভট্ট দাক্ষিণাত্য থেকে কাশীতে এসে বাস করতে থাকেন। এঁর পিতামহ নারায়ণ

ভট্ট সম্রাট আকবরের কাছে জগৎ-গুরু উপাধি লাভ করেছিলেন। এঁর পিতৃব্যপুত্র নীলকণ্ঠ ভট্ট ভগবন্ত-ভাস্কর নামে বিরাট গ্রন্থের রচয়িতা। এঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্বেশ্বর ভট্ট (=গাগাভট্ট) শূদ্র রূপে পরিচিত শিবাজির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করে তাঁর রাজ্যাভিষেকে পৌরোহিত্য করেছিলেন।

কমলাক্ষ—তারকাসুরের একটি ছেলে।

কম্বোজ—বা কম্বুজ। ভারতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত; গান্ধারের সঙ্গে এর উল্লেখ দেখা যায়। গান্ধারের পাশেই ছিল মনে হয়। মহাভারতে আছে রাজপুরে গিয়ে কর্ণ কাম্বোজদের পরাজিত করেছিলেন। হিউ-এন-ৎসাঙ বলেছেন কাশ্মীরের দক্ষিণে রাজপুর রাজ্য; এবং অসভ্য জাতির বাস। সম্ভবত ম্লেচ্ছ সংস্পর্শে সংস্কৃতির অবনতি ঘটেছিল। মনে হয় বর্তমানের রাজাওরি এই রাজপুর। মজ্‌ঝিমনিকায়েতে কম্বোজ দেশে আর্য সংস্কৃতির উল্লেখ আছে। যাস্কের সময় কম্বোজের ভাষা অনার্য ভাষা বলে পরিচিত ছিল। ভূরিদত্ত জাতকে এখানকার ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অনার্যরূপ বলা হয়েছে। মহাভারতে চন্দ্রবর্মা ও সুদক্ষিণ কম্বোজের এই দুই রাজার উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কাম্বোজদের 'বার্তাশস্ত্রোপজীবী সংঘ' বলা হয়েছে; এদের রাজা ছিল; গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং অস্ত্রশস্ত্র (=যুদ্ধ ব্যবসায়) ও বার্তা (=কৃষি পশুপালন ও বাণিজ্য) এদের জীবিকা ছিল। এখানকার ঘোড়া প্রসিদ্ধ ছিল।

কম্বোজ—বা কম্বুজ, দক্ষিণপূর্ব এসিয়াতে ইন্দোচীনে। বর্তমানে নাম কাম্বোডিয়া। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে বা আরো কিছু আগে এখানে ভারতীয় উপনিবেশ (=ছোট ছোট রাজ্য), ভাষা, ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়েছিল। চীনা গ্রন্থে বিবরণ পাওয়া যায় কৌণ্ডিণ্য নামে এক ভারতীয় ব্রাহ্মণ এখানে এসে দক্ষিণ ভাগে এক রাজ্য স্থাপন করেন। এখানকার লোকেরা তখন অসভ্য ছিল ও উলঙ্গ থাকত। ক্রমে হিন্দু সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল। ষষ্ঠ শতকে উত্তর অঞ্চলের (অর্থাৎ কম্বোজের) রাজা এই অংশ জয় করে নেন এবং সবটাই কম্বোজ নামে অভিহিত হতে থাকে। কম্বোজে অনেক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। যশোবর্মা, ইন্দ্রবর্মা, জয়বর্মা ইত্যাদি রাজারা অনেক দেশ জয় করেছিলেন। চীন ও ব্রহ্মসীমান্ত এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত রাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল। চম্পা ও আনাম ও (=ভিয়েৎনাম) কিছু দিন এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শৈবধর্মই এখানে প্রাধান্য পেয়েছিল। বৈষ্ণব তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবও কম ছিল না। ব্যাপক সংস্কৃত অনুশীলন হত। ষষ্ঠ ও দ্বাদশ শতকের প্রায় দু'শ শিলালিপি পাওয়া গেছে; এগুলি অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষাতে। এখানে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল। আঙ্কর-ভাট এখানের বিখ্যাত মন্দির। রাজধানী আঙ্কর-টোম। চোদ্দ শতকের পর আনাম ও থাই জাতির আক্রমণে দুর্বল হয়ে পড়ে। এখন স্বাধীন রাজ্য; ধর্ম বৌদ্ধ।

কয়াধু—অন্য নাম কমলা। হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী; জম্ভাসুরের মেয়ে। কয়াধুর চার ছেলে হ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ, ও সবচেয়ে ছোট প্রহ্লাদ।

করন্ধম—দ্র-সুবর্চা।

করবীর—(১) একটি সাপ। (২) গোমন্ত পর্বতের পাদদেশে একটি দেশ; এখানে রাজা ছিলেন শৃগাল-বাসুদেব। পরশুরামের নির্দেশে কৃষ্ণবলরাম একে নিহত করেন।

করবীরাক্ষ—খর দূষণের সঙ্গী এক রাক্ষস ; রামের হাতে নিহত হন।

করভাজন—ঋষভ দেবের নয় জন ছেলের মধ্যে একটি। একজন যোগী ; বিদেহ রাজের যজ্ঞে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের দিব্য জ্ঞান দান করেন।

করাভ—শকুনির একটি ছেলে।

করম্ভ—রম্ভের ভাই। মহিষাসুরের কাকা।

করম্ভা—করণ্ডু। কলিঙ্গ রাজ কন্যা। পুরুবংশে রাজা অক্রোধের স্ত্রী, দেবাতিথির মা।

করূষ—(১) একটি দেশ ও জাতি। পাণিনি ও মৎস্য পুরাণ মতে দ-ভারতে একটি জনপদ। ভাগবত ও কৌটিল্য মতে দং-পূ ভারতে। কৌটিল্য অনুসারে এখানে ভাল হাতী মিলত। দীনেশচন্দ্র সরকার বলেছেন বিহারে শাহাবাদ জেলা। (২) বৃত্র-হত্যার পাপ ইন্দ্রের (দ্র) গা থেকে এইখানে ধুয়ে ফেলে দেওয়া হয় ; এই জন্য নাম। এখানে তাড়কা (দ্র) থাকত।

কর্কোটক—মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর এক হাজার ছেলের মধ্যে প্রধান একজন। এক বার নারদকে বঞ্চনা করলে নারদের শাপে বনের মধ্যে গতিশক্তিহীন হয়ে আগুনে পুড়তে থাকেন। কথা ছিল যদি কোন দিন নল রাজা এসে বাঁচান তবেই মুক্তি পাবেন। নল রাজা (দ্র) এর আর্ত চিৎকারে কাছে এগিয়ে এলে কর্কোটক নিজেকে অঙ্গুষ্ঠ মত ছোট করে নেন যাতে সহজেই তুলে নিয়ে যাওয়া যায়। রাজা তুলে নিয়ে এলে কর্কোটক পাপমুক্ত হন এবং নিজের পরিচয় দেন এবং তারপর নলকে গুণে গুণে পা ফেলে এগোতে বলেন। দশ পা এগিয়ে গেলে রাজাকে কামড়ে সারা দেহ নীল/ বিকৃত করে দেন। এই আচরণে নল বিস্মিত হয়ে পড়লে কর্কোটক নিজের মূর্তি ধারণ করে বুঝিয়ে বলেন বিষের জ্বালায় রাজার শরীরে কলি নির্জীব হয়ে পড়বেন এবং এই বিকৃত চেহারা রাজাকে কেউ আর চিনতে পারবে না। এ ছাড়াও অযোধ্যায় রাজা ঋতুপর্ণের আশ্রয়ে গিয়ে থাকতে এবং তাঁর কাছে অক্ষক্রীড়া ও অক্ষহৃদয় মন্ত্র শিখতে বলেন এবং ঋতুপর্ণকে অশ্বহৃদয় মন্ত্র শিখিয়ে দিতে বলেন। অক্ষক্রীড়াতে পারদর্শী হলে কলি চলে যেতে বাধ্য হবেন। এ ছাড়া কর্কোটক দুটি পরিধেয় দেন এবং বলে দেন এই দুটি পরিধান করলে আবার নিজের রূপ ফিরে পাবেন এবং যুদ্ধে অজেয় হবার বর দেন।

কর্ণ—পৈল (১)>সুতপা (২)>বলি (৩)>অঙ্গ (৪)>লোমপাদ (১০)>ভদ্ররথ (১৫)> বৃহৎরথ(২০)>বিশ্বজিৎ(২১)>কর্ণ (২২)। দ্র অধিরথ। স্ত্রী পদ্মাবতী, ছেলে কৃষ্ণসেন, চিত্রসেন, বৃষকেতু ইত্যাদি। সত্যসেন, সুষেণ ইত্যাদি ছেলের নামও পাওয়া যায়। কুন্তীর (দ্র) কানীন পুত্র। কর্ণ থেকে জন্ম বলে নাম কর্ণ। সন্তান হলে কলঙ্কের ভয়ে কাঠের বাক্স করে অশ্ব নদীতে ভাসিয়ে দেন। কুন্তীর পালিকা মাতা ছাড়া ঘটনাটি কেউ জানতেন না। এই পাত্র ভাসতে ভাসতে অশ্বনদী থেকে যমুনা ও গঙ্গা হয়ে চম্পা পুরীতে আসে। বসু (=সুবর্ণ) নির্মিত কবচ ধারণ করে জন্ম বলে নাম বসুষেণ। সূত অধিরথ তখন চম্পাপুরীর রাজা, স্ত্রী রাধা। গঙ্গায় ভেসে যাওয়া শিশুকে এনে নিঃসন্তান স্ত্রীকে দান করেন। কুন্তী চর মুখে সমস্ত খবর পান। শিশু-কাল থেকে ধার্মিক, সত্যবাদী, বীর ও অসাধারণ দানশীল। বেদাদিতে সুপণ্ডিত ও সূর্যের উপাসক ছিলেন। শিক্ষার সময় অধিরথ হস্তিনাপুরে পাঠিয়ে দেন ; কৃপ, দ্রোণের

কাছে অস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। এবং দুর্যোধনের সঙ্গে মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হন। অস্ত্র শিক্ষার সময়ই কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। কর্ণ এমন কি দ্রোণকে গোপনে ব্রহ্মাস্ত্র শিখিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু দ্রোণ সূত-পুত্র বলে রাজি হন নি। এর পর মহেন্দ্র গিরিতে পরশুরামের কাছে গিয়ে ভৃগুবংশীয় বলে আত্মপরিচয় দিয়ে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করতে চান। পরশুরাম বিশ্বাস করে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা দেন। এক দিন আশ্রমের কাছে একটি ব্রাহ্মণের হোমধেনু চর ছিল; কর্ণ এটিকে অসাবধানে বাণবিদ্ধ করে হত্যা করেন। ফলে ব্রাহ্মণ শাপ দেন যার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য কর্ণ অস্ত্র শিক্ষা করছেন তার সঙ্গে যুদ্ধের সময় কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে যাবে; এবং ভীষণ ভয় পেয়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে ইতিমধ্যে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণের শিরশ্ছেদ করবেন। কর্ণ ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হন না। এর পর এক দিন পরশুরাম কর্ণের কোলে মাথা রেখে ঘুমচ্ছিলেন; এই সময়ে অলর্ক (দ্র) নামে একটি কীট কর্ণের উরুতে কামড় দিয়ে রক্ত পান করতে থাকে ও ক্রমশ ভেতরে উঠতে থাকে। অসহ্য যন্ত্রণা হতে থাকে এবং রক্ত গড়াতে থাকে কিন্তু তবু কর্ণ নিশ্চল হয়ে বসে থাকেন পাছে পরশুরামের ঘুম ভেঙে যায়। এর পর ঘুম ভাঙলে কর্ণের ধৈর্য দেখে পরশুরামের সন্দেহ হয় শিষ্য তাঁর নিশ্চয়ই কোন ক্ষত্রিয়। কর্ণ তখন সব কথা স্বীকার করেন। ফলে পরশুরাম রেগে গিয়ে শাপ দেন কার্যকালে কর্ণ এই অস্ত্র প্রয়োগ ভুলে যাবেন;

দ্রোণের কাছে কুরুপাণ্ডব বালকদের অস্ত্র শিক্ষা শেষ হলে পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। কর্ণ নিজেও তাঁর পারদর্শিতা দেখান। কর্ণ অর্জুনের থেকেও কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন; এবং অর্জুনকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করেন। কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীল কর্ণের সঙ্গে অর্জুন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে চান না এবং কৃপাচার্য বাধা দেন কর্ণ কোন রাজা বা রাজকুমার নন। দুর্যোধন তৎক্ষণাৎ কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজা বলে ঘোষণা করে কৃপাচার্যের আপত্তি খণ্ডন করেন। একটি মতে এই সময়ে কর্ণও দুর্যোধনের মিত্রতা স্থাপিত হয়। বৃদ্ধ অধিরথ এই সময়ে এগিয়ে এলে কর্ণ তাঁর পদধূলি নিয়ে প্রণাম করেন। দুর্যোধনের বদান্যতা কর্ণ কোন দিন ভোলেন নি। দ্র রক্তজ।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে লক্ষ্যভেদ করতে গেলে দ্রৌপদী সূতপুত্রকে বিয়ে করবেন না জানান। ফলে কর্ণ আর চেষ্টা করেন নি। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করলে উপস্থিত রাজাদের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয় তাতে কর্ণ অর্জুনের কাছে হেরে যান। পরে হস্তিনাপুরে পাশাখেলার সময় দ্রৌপদীর এই প্রত্যাখ্যানের জন্য অপমান করে কর্ণ প্রতিশোধ নেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়তে কর্ণ অংশ নিয়ে ছিলেন। পরশুরামের কাছে থাকার সময় কলিঙ্গ রাজের মেয়ের স্বয়ংবর উপলক্ষ্যে রাজা জরাসন্ধের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জরাসন্ধ সন্তুষ্ট হয়ে মালিনী নগরী দান করেন। অন্য মতে জরাসন্ধকে পরাজিত করেন; এবং মালিনী ও চম্পা জয় করে অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে নেন। সরাসরি যুদ্ধে ভীমের কাছে একবার পরাজিত হন।

ক্রমশ দুর্যোধনের একজন প্রধান পরামর্শ দাতায় পরিণত হন এবং জতুগৃহের পরামর্শ দাতাদের মধ্যেও ইনি এক জন। বনবাস কালে পাণ্ডবরা যখন দ্বৈতবনে ছিলেন তখন কর্ণ ও শকুনি পরামর্শ দিয়ে দুর্যোধনকে বনে পাঠান পাণ্ডবদের বিদ্রূপ/

বিব্রত করবার জন্য। কিন্তু এর ফলে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের হাতে সপরিবারে দুর্যোধন বন্দী হলে কর্ণ এঁদের উদ্ধার করতে পারেন নি। এর পর কর্ণ দিক বিজয়ে বার হন এবং বলে যান রাজসূয় উপলক্ষ্যে পাণ্ডবরা যে সব দেশ জয় করেছিলেন সেগুলিকে তিনি একাই জয় করতে পারবেন। এই সময়ে কর্ণ প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন।

দুর্যোধন যখন বৈষ্ণব যজ্ঞ করছিলেন কর্ণ সেই সময় প্রতিজ্ঞা করেন অর্জুনকে বধ না করা পর্যন্ত পা ধোবেন না এবং জলগ্রহণ করবেন না। পরে কর্ণ আসুর ব্রত গ্রহণ করে প্রতিজ্ঞা করেন অর্জুনকে মারতে না পারা পর্যন্ত এই ব্রত পালন করবেন এবং এই ব্রত কালে যে কোন প্রার্থী যা চাইবেন তাই দান করবেন। এই সময়ে কর্ণের দানশীলতা পরীক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ বেশে কৃষ্ণ এসে কর্ণের ছেলে বৃষকেতুর মাংস খেতে চান। কর্ণ অম্লান বদনে ব্রাহ্মণকে খুসি করতে চেষ্টা করেন। কৃষ্ণ তখন সন্তুষ্ট হয়ে বৃষকেতুকে বাঁচিয়ে দেন। এই আসুর ব্রতের সময় অর্জুনের মঙ্গলের জন্য ইন্দ্র ব্রাহ্মণ বেশে এসে কর্ণের সহজাত কবচ ও কুণ্ডল চেয়ে নেন। অথচ কর্ণ জানতেন এই কবচ কুণ্ডল যত দিন তিনি ধারণ করে থাকবেন তত দিন তিনি অজেয় থাকবেন। কর্ণ কেবল অনুরোধ করে ছিলেন দেহ থেকে কেটে দিতে গিয়ে তাঁর যেন কোন ক্ষত না হয়। সূর্য অবশ্য আগেই ইন্দ্র (দ্র) সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কর্ণ নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল রইলেন। অবশ্য সূর্যের পরামর্শে অর্জুন বধের জন্য ইন্দ্রের কাছে একাঘ্নী (দ্র) অস্ত্র চেয়ে নিয়েছিলেন। অস্ত্র পান কিন্তু সর্ত থাকে এই অস্ত্র এক জনকে মাত্র বধ করতে পারবে। কবচ ও কুণ্ডল দেবার জন্য কর্ণের নাম হয়েছিল বৈকর্তন ও কর্ণ। কুরুক্ষেত্রে এই একাঘ্নী/বৈজয়ন্তী অস্ত্র কর্ণ ঘটোৎকচের প্রতি ব্যবহার করতে বাধ্য হন। কর্ণের ধনুক ইন্দ্রের পরিকল্পনায় বিশ্বকর্মা নির্মাণ করে দেন ; এই ধনুর নাম বিজয়/কাণ্ডপৃষ্ঠ।

বিরাটের গরু-চুরির যুদ্ধে কর্ণের গা থেকে উত্তর বস্ত্র সংগ্রহ করে এনেছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে কৃষ্ণ গোপনে দেখা করে কর্ণের জন্মের কাহিনী বলেন এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কুন্তীর প্রতি অভিমানে, অর্জুনের প্রতি হিংসায় এবং দুর্যোধনের প্রতি কৃতজ্ঞায় কর্ণ রাজি হন নি। বরং কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন যুধিষ্ঠির যেন এ সব কথা জানতে না পারেন ; জানলে যুধিষ্ঠির রাজা হতে চাইবেন না ; কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধও হয়তো সম্ভব হবে না। এর পর কুন্তী নিজে দেখা করেন এবং এই সময়ে সূর্য দৈববাণী করে কর্ণকে কুন্তির কথা রাখতে বলেন। কিন্তু কুন্তীকেও ফিরিয়ে দেন ; কেবল কথা দেন অর্জুন ছাড়া যুদ্ধে কোন ভাইয়ের কোন ক্ষতি করবেন না। কর্ণ বা অর্জুন মিলে পঞ্চপাণ্ডব ঠিকই থাকবেন। কর্ণ গর্বিত, নীচ, পরশুরামের কাছে অভিশপ্ত এবং কবচকুণ্ডলহীন বলে ভীষ্ম এঁকে অর্দ্ধরথ বলে গণনা করেন। ফলে কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেন ভীষ্মের জীবিত কালে তিনি যুদ্ধ করবেন না। ভীষ্ম যখন শরশয্যায় তখন কর্ণ দেখা করতে এলে কর্ণকে তিনি ভাইদের সঙ্গে যোগ দিতে বলে ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যুর হাতে পরাজিত হন, ভীমকে এক দিন হত চৈতন্য করে দেন এবং অর্জুনের কাছে এক দিন আহত হয়ে কিছুটা পিছিয়ে এসেছিলেন। এই যুদ্ধের সময় কৃপাচার্যকে একবার অপমানিত করেন। নিরুপায় হয়ে ইন্দ্রের কাছে পাওয়া অস্ত্রে ঘটোৎকচকে

নিহত করেন। যুদ্ধে তের দিনের দিন অন্যায় যুদ্ধে আরো ছ-জনের সঙ্গে মিলে অভিমন্যুকে বধ করেন। ষোল দিনের দিন দ্রোণ মারা গেলে খবর শুনে কর্ণ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। তারপর কর্ণ সেনাপতি হন। অর্জুন বাদে চার ভাইকে পরাজিত/অপদস্থ করেন কিন্তু কারো কোন ক্ষতি করেন না। এই যুদ্ধে মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথি ছিলেন এবং কলহ করে কর্ণের মনোবল নষ্ট করে দিতে চেষ্টা করেন। কর্ণের সর্পবাণে (অশ্বসেন দ্র) অর্জুনের কিরীট ভূলুণ্ঠিত হয়। অর্জুনের সঙ্গে এই যুদ্ধে পরশুরাম ও ব্রাহ্মণের শাপ সফল হয়। যুদ্ধে রথে চাকা মাটিতে বসে যায় কর্ণ এই চাকা মাটি থেকে বার করবার চেষ্টা করেন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন; অর্জুন এই সময়ে কর্ণকে নিহত করেন। চিত্রসেন, সত্যসেন ও সুষেণ তিন ছেলেই নকুলের হাতে যুদ্ধে মারা যান। মৃত্যুর পর কর্ণের তেজ সূর্যে বিলীন হয়ে যায়। (২) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে নিহত হন। (৩) ঘণ্টাকর্ণের ছোট ভাই।

কর্ণসুবর্ণ—প্রাচীন বাংলার একটি মহানগর। খৃষ্টীয় ৭-ম শতকে গৌড়াধিপ শশাঙ্কের রাজধানী। হিউ-এন-ৎসাঙ-এর বর্ণনায় এখানকার জলবায়ু, ভৌগলিক তথ্য ও এখানকার অধিবাসীদের গুণাবলী ও জ্ঞান-পিপাসার পরিচয় পাওয়া যায়। এই খানে এবং এর উপকণ্ঠে হিউ-এন-ৎসাঙ বহু বৌদ্ধ বিহার, সংঘারাম, স্তূপ ও দেবমন্দির দেখেছিলেন। এগুলির মধ্যে লো-তো-উই-চি বা লো-তো-মো-চি অর্থাৎ রক্তমৃত্তিকা মহা-বিহারটি সুবিখ্যাত ছিল। এই বিহারটির কাছেই সম্রাট অশোক নির্মিত স্তূপের উল্লেখও হিউ-এন-ৎসাঙ করেছিলেন এবং হিউ-এন-ৎসাঙের বর্ণনা থেকে জানা যায় বুদ্ধদেব এখানে সাত দিন থেকে ধর্মপ্রচার করেছিলেন।

হাওড়া থেকে ১৯২-কি-মি দূরে চিরুটি রেল ষ্টেসনের কাছে রাজবাড়ি ডাঙা নামে একটি টিপি মত জায়গা খুঁড়ে এখানে রক্তমৃত্তিকা বিহারটি নিঃসন্দেহে পাওয়া গেছে। এখানে উৎখননের ফলে আনুক্রমিক ছয়টি পর্যায়ের অতি মনোরম সৌধমালা ইত্যাদি পাওয়া গেছে। প্রাচীনতম পর্যায়ের সৌধমালা প্রাচীর বেষ্টনী দিয়ে সুরক্ষিত ছিল কিন্তু গঙ্গার প্লাবনে বিধ্বস্ত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের সৌধগুলি বন্যার পলিমাটির ওপর নির্মিত। এই পর্যায়ের একটি দেওয়ালের ভিতে একটি নরমুণ্ড পাওয়া গেছে; সৌধ নির্মাণের সঙ্গে জড়িত নরবলির এটি প্রত্নতাত্ত্বিক নির্ভুল নিদর্শন। তৃতীয় পর্যায়ে একটি বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়; এটি হিউ-এন-ৎসাঙের সমসাময়িক অর্থাৎ সপ্তম শতকের। চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ের বেষ্টনী প্রাচীর ও এর চারকোণে সুসজ্জিত ইষ্টক নির্মিত সমকোণিক চারটি বেদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষষ্ঠ পর্যায়ের সৌধ নিদর্শনের মধ্যে একটি গোলাকার বৃহৎ স্তূপের ভিত্তি ও চুনের পলেস্তারা দেওয়া সমকোণিক একটি বেদি পাওয়া গেছে। এইখানে লোক বসতি মুসলমান আক্রমণ কাল পর্যন্ত অর্থাৎ তের-চোদ্দ শতক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল মনে হয়। অর্থাৎ এই চিরুটির কাছেই গঙ্গার তীরে কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল; গঙ্গার গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

কর্ণাট—কর্ণাটক। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে কুন্তল নামেও পরিচিত। অশোকের সময় কর্ণাটের বিভিন্ন অংশে সত্যপুত্র ও কেরলপুত্রেরা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতেন। এর পর শাতবাহন ও গঙ্গবংশের এক শাখা এর কতকটা অংশে আধিপত্য স্থাপন করেন। পরে কুন্তল নামে এখানে একটি স্বাধীন পরাক্রান্ত রাজ্য গড়ে ওঠে।

কর্দম—ব্রহ্মার ছেলে ; একজন প্রজাপতি। সরস্বতী নদীর তীরে দশহাজার বছর হরির তপস্যা করেন এবং হরি দেখা দিলে উপযুক্ত স্ত্রীর জন্য বর চান। হরির নির্দেশে সাধ্বী পতিব্রতা দেবহূতিকে বিয়ে করেন। কর্দম সন্তুষ্ট হয়ে স্ত্রীকে একটি বিমান দান করেন এবং দুজনে মিলে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে থাকেন। কলা, অরুন্ধতী ইত্যাদি নয়টি মেয়ে হবার পর কর্দম যোগাভ্যাসের জন্য বনে যাবার সঙ্কল্প করেন। স্ত্রী তখন বিচলিত হয়ে পড়েন এবং কর্দম আশ্বাস দেন হরির মতই এক ছেলে হবে। এই ছেলে কপিলমুনি। কপিলের জন্মের পর মরীচি ইত্যাদির সঙ্গে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে কর্দম সংসার ত্যাগ করেন এবং সমাধিতে ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করেন। (২) পুলহের ঔরসে ক্ষমার গর্ভে জন্ম। প্রথমে অঙ্গিরার মেয়ে সিনীবালীকে বিয়ে করেন। পরে সিনীবালী চাঁদকে দেখে মুগ্ধ হয়ে স্বামীকে ত্যাগ করলে কর্দম অত্রির মেয়ে শ্রুতিকে বিয়ে করেন। শ্রুতির ছেলে শঙ্খপাদ ও মেয়ে কাম্যা। একটি মতে পুলস্তের ছেলে কর্দমের স্ত্রী দেবহূতি। কর্দম প্রজাপতির ঔরসে স্ত্রী প্রিয়ব্রতের গর্ভে ছেলে হয় সম্রাট, কুক্ষি, বিরাট।

কর্ম—বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত একটি পদার্থ (=ক্যাটিগরি)। সাধারণে পরিচিত ক্রিয়াই দর্শনের কর্ম। কণাদের মতে ক্রিয়া বা কর্ম একটি পৃথক এবং অন্য নিরপেক্ষ পদার্থ। একটি সক্রিয় বস্তুর স্থানিক গতি পরিবর্তন পরপর তিনটি ক্ষণের ওপর নির্ভরশীল তিনটি পৃথক ঘটনার সমন্বয়। অর্থাৎ ক্রিয়া এই তিনটি ঘটনার সমন্বয়। (১) প্রথম ক্ষণে বস্তুটি কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে বিভক্ত বা পৃথককৃত হয় ; (২) দ্বিতীয় ক্ষণে পূর্ব সংযোগ নষ্ট হয় ; (৩) তৃতীয় ক্ষণে উত্তর সংযোগের উৎপত্তি অর্থাৎ অন্য স্থানিক অবস্থার সঙ্গে নতুন সংযোগের উৎপত্তি। এই ভাবে তিনটি ক্ষণ গত তিনটি পৃথক ঘটনার সমন্বয়ে একটি ক্রিয়া। তিনটির যে কোন একটিকে বাদ দিলে ক্রিয়া সম্ভব নয়। এবং এই তিনটি ঘটনার পর মুহূর্তে ক্রিয়ার অস্তিত্ব লোপ হয়। এই তিনটি ঘটনার সঙ্গে ক্রিয়াটির উৎপত্তিক্ষণ ও বিনাশক্ষণকে হিসাবের মধ্যে নিলে একটি ক্রিয়া পাঁচটি-ক্ষণবাপী পদার্থ।

কর্মবাদ—নিজের কর্ম অনুসারে সুফল ও কুফল ভোগ করা। এক জীবনে কৃতকর্মের সমস্ত ফল ভোগ করা সম্ভব না হতে পারে। সুতরাং স্থূলদেহ বিনাশের পর সূক্ষ্ম শরীর অভুক্ত কর্ম বহন করে এবং কর্মফল ভোগ উপযোগী নতুন দেহ গ্রহণ করে। বর্তমান জীবনে কৃতকর্মের নাম পুরুষাকার : পূর্ববর্তী জীবনের সঞ্চিত অর্থাৎ অভুক্ত কর্মের নাম দৈব বা অদৃষ্ট। পূর্ব জন্মের এই কর্ম অজ্ঞেয় এবং অপ্রত্যক্ষ এবং অপর নাম ভাগ্য ; ভবিতব্য বা নিয়তি। সঞ্চিত কর্মগুলির মধ্যে যখন যে কর্মের ফল ফলতে থাকে তাকে প্রারব্ধ কর্ম বলা হয়।

দৈব (=অদৃষ্ট) বড় না পুরুষাকার বড় বহু মতভেদ আছে। দৈবের দুটি ভাগ স্বীকার করা হয় ; একটি সঞ্চিত ভাগ এবং অপর একটি প্রারব্ধ ভাগ। এবং স্বীকার করা হয় সঞ্চিতভাগকে অর্থাৎ পূর্বজন্মের কর্মের সঞ্চিত অংশকে পুরুষাকার খণ্ডন করতে পারে কিন্তু প্রারব্ধভাগকে পারে না। এই জন্য তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষরাও সাধারণ মানুষের মত রোগ শোক ভোগ করে থাকেন। আবার বলা হয়েছে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে তখন আর কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না।

প্রারব্ধ কর্ম ছাড়া সমস্ত সঞ্চিত কর্ম তখন নিঃশেষে বিনষ্ট হয়ে যায়। এই কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ সমস্ত ভারতীয় দর্শনেই সংসার সৃষ্টির ভিত্তিরূপে স্বীকৃত। এই কর্মবাদের সঙ্গে ঈশ্বরকেও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বাদরায়ণের মতে জীবের কর্ম অনুসারে ঈশ্বর তার সুখদুঃখের নিয়ন্তা। কর্মজীবনের একটি প্রতিপাদ্য মানুষের এ জীবনের কর্মই পরজীবনে দৈব বা অদৃষ্ট রূপে পরিগণিত। চার্বাক মতেও কর্মবাদ স্বীকৃত; কিন্তু পূর্বজন্ম ও ঈশ্বর বাদ দিয়ে।

জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ এবং মানুষ, পশুপাখী কীটপতঙ্গ সব কিছু মিলে একটা অখণ্ড ধারার, একটা সমগ্রতার কল্পনা করা সম্ভব হয়েছিল এই রঙীন কর্মবাদ ও প্রমাণহীন জন্মান্তরবাদের মধ্য দিয়ে। একটা সস্তা ও অতি সহজ সান্ত্বনা এনে দিয়েছিল।

কলচুরি—হৈহয় বংশ। মহাভারতে। চন্দ্রবংশে যযাতির পৌত্র সহস্রার্জুনের পৌত্র হৈহয়ের বংশধর। বিভিন্ন শিলালিপিতে অহিহয়, চেদি, কলচ্চুরি, কটচুরি, কলৎস্থরী, কুলচুরি ইত্যাদি নাম। এই বংশের আদি বাসস্থান নর্মদা উপত্যকা। প্রাচীন রাজধানী মাহিষ্মতী (॥ বর্তমান মান্ধাতা)। অবন্তিও এক সময় এই রাজ্যভুক্ত ছিল। ৬-শতকে দক্ষিণে নাসিক, পশ্চিমে গুজরাত, পূর্বে বুন্দেলখণ্ড, বাঘেলখণ্ডের অঞ্চল সমেত গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৬-শতকের শেষে এঁদের প্রতিপত্তি হ্রাস পায়।

কলহা—ভিক্ষু নামে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী। সৌরাষ্ট্রে। ব্রাহ্মণ যা বলতেন স্ত্রী ঠিক তার বিপরীত করতেন। ফলে ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে ঠিক বিপরীত কাজগুলি করতে বলতেন। একদিন শ্রাদ্ধের পিণ্ডগুলি গঙ্গাতে দিতে বললে কলহা এগুলি শৌচকূপে ফেলে দেন। ফলে পরজন্মে কলহা রাক্ষসী হয়ে জন্মান। কিন্তু ধর্মদত্ত (দ্র) পাপমুক্ত করেন এবং নিজের পুণ্যের অর্দ্ধেক দান করেন। এই কারণে এঁরা দুজনে পরজন্মে দশরথ ও কৌশল্যা/কৈকেয়ী হয়ে জন্মান।

কলা—(১) কর্দমের স্ত্রী দেবহূতির মেয়ে। মহর্ষি মরীচির স্ত্রী। কলার সন্তান মহর্ষি কশ্যপ ও মেয়ে পূর্ণিমা। (২) বিভীষণের মেয়ে। (৩) একজন অপ্সরা। (৪) ৬৪ কলা।

কলাপ—পাণিনির পরবর্তী ব্যাকরণগুলির মধ্যে অন্যতম। খৃষ্টীয় প্রথম মতান্তরে তৃতীয় শতকে দাক্ষিণাত্যে সর্ববর্মাচার্য রচিত। প্রাথমিক অবস্থায় অতিক্ষুদ্র আকার ছিল বলে অপর নাম কাতন্ত্র (ঈষৎ তন্ত্র)। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের মতে কলাপের সঙ্গে ঐন্দ্রশাখার সাদৃশ্য আছে। তামিল ব্যাকরণ তোল কাপ্পিয়ম-এর সঙ্গেও সাদৃশ্য রয়েছে। এক সময় সিংহল, কাশ্মীর, নেপাল ও তিব্বতে জনপ্রিয় ব্যাকরণ ছিল। বাংলাতে বিশেষ করে পূর্ববাংলাতেও বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। কলাপের দুর্গাসিংহকৃত টীকা 'বৃত্তি' ও সুষেণাচার্য কৃত পঞ্জী প্রসিদ্ধ। শ্রীপতি দত্ত কলাপের অসম্পূর্ণতা দূর করবার জন্য 'কাতন্ত্রপরিশিষ্ট' এবং চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার 'কাতন্ত্রছন্দঃ-প্রক্রিয়া' রচনা করেন। কাতন্ত্রছন্দঃ প্রক্রিয়া বৈদিক অংশ সম্পর্কিত। একটি কাহিনী আছে দাক্ষিণাত্যে রাজা শাতবাহন বা শালিবাহন স্ত্রীর সঙ্গে এক দিন জলকেলি করছিলেন। স্ত্রী রাজাকে 'মোদকং দেহি দেব' বলে জল দিতে বারণ করলে রাজা

মোদক (লাড্ডু) এনে দেন এবং রাণীর কাছে তিরস্কৃত হন। রাজা তখন সভাপণ্ডিত সর্ববর্মাচার্যকে অনুরোধ করেন ছ মাসের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী ছোট করে একটি সম্পূর্ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখে দিতে হবে। সর্ববর্মাচার্য তখন শিবের আরাধনা করেন। শিবের আদেশে কুমার (=কার্তিকেয়) তাঁর বাহন ময়ূরের কলাপের সাহায্যে এই ব্যাকরণ লিখে দেন ; এই জন্য নাম কলাপ বা কৌমার। (২) বিখ্যাত এক মুনি ; রাজসূয় যজ্ঞের শেষে যুধিষ্ঠির এঁকে পূজা করেন।

কলাবউ—অন্য নাম নবপত্রিকা। কলা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু ও ধান এই নয়টি গাছ মিলিয়ে এবং শ্বেত অপরাজিতার লতা ও হলুদ সুতা দিয়ে বেঁধে তৈরি করে কাপড় পরিয়ে মাথায় সিঁদুর দিয়ে দেওয়া হয়। দেখতে হয় অবগুণ্ঠনবতী বধূর মত। নয়টি গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যথাক্রমে ব্রাহ্মণী, কালী, দুর্গা, কার্তিকী, শিবা, রক্তদন্তিকা, শোকরহিতা, চামুণ্ডা ও লক্ষ্মী। কিন্তু সমবেতভাবে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা। দুর্গাপূজার সময় সপ্তমীর দিন প্রথমে নবপত্রিকার স্থাপনা একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। গণেশের পাশে বসিয়ে দেওয়া হয় ; গণেশের স্ত্রী নয়।

কলাবতী—(১) রাধার মা। কান্যকুব্জের মেয়ে। যজ্ঞকুণ্ড থেকে জন্ম। বৃষভানু রাজের স্ত্রী। (২) কাশী রাজকন্যা ; দুর্বাসাকে পূজা করে শিব-মন্ত্র পান। অত্যন্ত ধর্মশীলা। মথুরার রাজা দাশার্হকে অন্য মতে দশরথকে বিয়ে করেন। রাজা নিজে পাপী ছিলেন ; স্ত্রীর তেজ সহ্য করতে পারছিলেন না। কলাবতী তখন রাজাকে গর্গ মুনির কাছে নিয়ে গেলে মুনি রাজাকে কালিন্দীর জলে ডুব দিতে বলেন। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ তখন এঁর দেহ থেকে কাক হয়ে বার হয়ে উড়ে যায়। রাজা নিষ্পাপ হন। (৩) একজন অপ্সরা।

কলাবিদ্যা—চাঁদের কলা/অংশ মত, বিদ্যার এক একটি শাখা। বাৎসায়ন ইত্যাদি মতে কলার সংখ্যা ৬৪। ক্ষেমন্দ্র কৃত কলাবিলাসের ১০-ম সর্গে ১০০ কলার উল্লেখ রয়েছে। শয্যা রচনা, গাছে চড়া, চুরিবিদ্যা, মারণ, উচাটন, সন্তরণ, প্রত্যুপকার, গীত, বিদ্যা ইত্যাদি সব কিছুই কলা।

কলি—কশ্যপ ও মুনির ছেলে ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, বরুণ, ধৃতরাষ্ট্র, গোপতি, সুবর্চস্, সত্যবাক্, অর্কপর্ণ, প্রযুত, বিশ্রুত, চিত্ররথ, শালিশিরস্, পর্জন্য, নারদ ও কলি। পরীক্ষিৎ রাজা হয়ে রাজ্য জয় করতে বার হলে এক দেশে দেখেন এক শূদ্র রাজা একটি বৃষ ও গাভীকে বিব্রত করছেন। পরীক্ষিৎ রাজাকে লক্ষ্য করে বাণ সংযোগ করতে গেলে কলি এসে প্রণাম করেন। কলিকে পরীক্ষিৎ হত্যা করেন না কিন্তু তাঁর রাজ্য পরিত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীই পরীক্ষিতের রাজ্য ফলে কলি রাজার কাছে থাকার মত জায়গা চান। ঠিক হয় যেখানে পাশাখেলা, বেশ্যালয়, সুরাপান, হত্যা, স্বর্ণ ইত্যাদি থাকবে যেখানে বাস করবেন।

কলি ও দ্বাপর দুজনে দময়ন্তীর স্বয়ংবরে এসেছিলেন ; পথে ইন্দ্র ইত্যাদিকে ফিরে আসতে দেখেন এবং নলের বিয়ের খবর পান। নলের বিয়ে করা রূপ আস্পর্দ্ধাতে কলি ও দ্বাপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। কলি নলকে শাস্তি দেবেন ঠিক করেন এবং দ্বাপর সাহায্য করবেন ঠিক হয় এবং সুযোগ মত নলের (দ্র) দেহে প্রবেশ করেন।

কলিকাল—চার যুগের মধ্যে শেষ যুগ। কলি এর অধিষ্ঠাতা। এই যুগের আয়ু ১২০০ দিব্য বছর; অর্থাৎ ১২০০ × ৩৬০ = ৪৩২,০০০ মানবিক বছর। প্রতিমন্বন্তরে ৭১টি মহাযুগ বা দিব্যযুগ (দ্র কাল)। প্রতি দিব্যযুগে একটি কলিযুগ থাকে। বর্তমানে ৭-ম মনু বৈবস্বতের অধিকার কাল। অতীতে কলিযুগে কল্কি অবতার জন্মেছিলেন কিনা পুরাণে কোন সঠিক উল্লেখ নাই। ৩১০২ কলি বর্ষে খৃ-শতাব্দী আরম্ভ হয়েছে ধরা হয়। এই যুগের শেষে অষ্টম মন্বন্তর আরম্ভ হবে। কৃষ্ণ যে দিন স্বর্গারোহণ করেছিলেন সে দিন কলিযুগের জন্ম।

কলিঙ্গ—দ্র ঋতায়ু। বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। সুদেষ্ণার গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে জন্ম। এর রাজ্যের নাম কলিঙ্গ। উড়িষ্যার দক্ষিণ থেকে দ্রাবিড়ের উত্তর পর্যন্ত ভূভাগ। উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল। প্রাচীন রাজধানী তোসলি। ভুবনেশ্বর থেকে ১০ কি-মি দূরে অবস্থিত ধৌলি এই তোসলি। খৃ-পূ ৪ শতকের প্রথম দিকে মগধের সম্রাট মহাপদ্ম নন্দ কলিঙ্গ অধিকার করেন। খৃ-পূ ৩-শতকের মাঝে সম্রাট অশোক আবার কলিঙ্গ জয় করেন। মগধের পতনের সুযোগে কলিঙ্গে মহামেঘবাহন নামে রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশ প্রাচীন চেদি বংশের শাখা; এরা আর্য। এই মেঘবাহন বংশে ৩য় নরপতি খারবেল নিজেকে রাজর্ষি বসু অর্থাৎ পৌরণিক চেদিরাজ উপরিচর বসুর বংশধর বলে দাবি করতেন।

কলিযুগ—কলি যুগে সকলে অসাধু। পাপ এ সময়ে ত্রিপাদ, পুণ্য একপাদ। দান যজ্ঞ নামেই প্রচলিত থাকবে; ব্রাহ্মণ শূদ্রের কাজ করবে শূদ্রেরা সমৃদ্ধ হয়ে উঠবেন। মানুষ অল্পায়ু এবং দেহ খর্ব্বকায়। পশু ভাব বৃদ্ধি পাবে। ধান বিক্রি হবে; ব্রাহ্মণে বেদ ও বিক্রি করবে। বেদ পাষণ্ড-দূষিত হবে। ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষুক হবেন, মুনিরা ব্যবসায়ী হবেন। বিনা কারণে ব্রাহ্মণরা চুল ও নখ রাখবেন। চতুরাশ্রম পালিত হবে না। নরহত্যা ব্যাপক হয়ে উঠবে। ব্যবসায়ীরা ঠকাবে ও মাপে কম দেবে যৌবনের প্রারম্ভে চুল পেকে যাবে; বৃদ্ধেরা যুবকদের মত আচরণ করবে। মেয়েরা তাদের দেহাংশ বিক্রি করবে, গৃহিণীরা ভৃত্যের সঙ্গে এবং এয়োতিরা অপরের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সুখে লিপ্ত হবেন। বহু লোক ক্ষুধায় প্রাণ হারাবে। মিথ্যা, হিংসা ও শোকের প্রাধান্য হবে। মানুষ কামী ও কটু ভাষী; জনপদ দস্যুপীড়িত, স্ত্রীগণ অল্পভাগ্যা। এই যুগের শেষে কল্কি জন্মাবেন। তারপর আবার সত্যযুগ আরম্ভ হবে।

কল্কি—বিষ্ণুর দশ অবতারের শেষ অবতার। বর্তমান যুগের শেষে বিষ্ণু কল্কি রূপে জন্মগ্রহণ করে কলিকে বিনাশ করলে আবার সত্যযুগ আসবে। পৃথিবী ম্লেচ্ছপূর্ণ হলে সমস্ত মানুষ নাস্তিক ও একবর্ণ হয়ে উঠলে এবং পৃথিবী পাপে ভরে গেলে কল্কি আসবেন। কোন জাতি বিচার থাকবে না। কেবল মাত্র ১৫-টি সূত্রযুক্ত বাজসনেয় ধর্ম পালিত হবে। রাজা ধর্মহীন ও প্রজাভক্ষক হবেন। নরভোজী ম্লেচ্ছ তখন রাজা হবেন। শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের ঘরে চৈত্র শুক্লা দ্বাদশীতে কল্কি জন্মাবেন। মায়ের নাম সুমতি। ডানাওলা সাদা ঘোড়ায় চড়ে জ্বলন্ত ধূমকেতুর মত এক হাতে তলোয়ার আর এক হাতে চক্র নিয়ে এগিয়ে আসবেন। ম্লেচ্ছও বিধর্মীদের শেষ করে

অশ্বমেধ যজ্ঞ করে দক্ষিণা স্বরূপ সমস্ত পৃথিবী ব্রাহ্মণদের দান করে বর্ণাশ্রমধর্ম/সত্য-যুগ স্থাপন করবেন এবং দেহ ফেলে রেখে স্বর্গে ফিরে যাবেন।

কল্কি পুরাণে সবচেয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে এবং অতীতের কাহিনী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবত বৌদ্ধযুগের অধঃপতনের সময় কল্কিপুরাণ লিখিত। এই পুরাণ মতে কল্কি বৌদ্ধ ধর্মের উৎসাদন করেছিলেন। মহাভারত ও অন্যান্য কয়েকটি পুরাণে কল্কির জন্ম ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। মৎস্য পুরাণ মতে মহাবীরের নির্বাণ প্রাপ্তির পর প্রতি হাজার বছরে কল্কি আবির্ভূত হয়ে জৈনধর্মের খণ্ডন করেন।

কল্প—দ্রঃ কাল। পুরাণ মতে ১৪টি মন্বন্তর মিলে ব্রহ্মার এক কল্প এবং দুই কল্পে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র। দিনে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় ও বিদ্যমান থাকে; রাত্রিতে লয় পায়। (২) ধ্রুবের ছেলে।

কল্পতরু—কল্পান্ত পর্যন্ত স্থায়ী তরু। সমুদ্র মন্থনে উত্থিত এবং কল্পান্তে আবার সমুদ্রে ডুবে যাবে। এর কাছে যা কিছু চাওয়া যায় পাওয়া যায়। দেবলোকের একটি গাছ। আবার মন্দার, পারিজাত, সনাতন, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন গাছ ও এই নামে পরিচিত।

কল্পসূত্র—বেদাঙ্গ গ্রন্থ। বৈদিক যজ্ঞ, সামাজিক জীবন ও লোকাচার ক্রমেই এমন জটিল ও বহুবিস্তৃত হয়ে উঠতে থাকে যে এই সব ব্যবস্থাগুলি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে সূত্রাকারে সংক্ষিপ্ত করে কল্পসূত্র নামে গ্রন্থ রচনা করা হয়। বহু মতে এই কল্পসূত্র বেদেরই সমান; বৌধায়ন, আপস্তম্ভ, আশ্বলায়ন, ও কাত্যায়ন প্রভৃতি কল্পসূত্র অপৌরুষেয়। কতকগুলির নাম:— ঋক্‌বেদে কল্পসূত্র:-আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন ও শৌনক। সামবেদে:- মশক,, লাট্যায়ন ও দ্রাহ্যায়ন। কৃষ্ণযজুর্বেদে:- আপস্তম্ভ, বৌদ্ধায়ন, সত্যাষাঢ়, হিরণ্যকেশী, মানব, ভরদ্বাজ, বাধুল, বৈখানস, লৌগাক্ষি, মৈত্র, কঠ, বারাহ। শুক্লযজুর্বেদে:- কাত্যায়ন। এবং অথর্ব বেদে কৌশিক।

কল্মাষপাদ—প্রকৃত নাম সৌদাস/মিত্রসহ। ৩৫-তম ইক্ষ্বাকু রাজা। ভগীরথ(১)-ঋতুপর্ণ(৫)-সুদাস(৭)-কল্মাষপাদ/মিত্রসহ(৮)। সুদাসের ছেলে বলে নাম সৌদাস। একবার মৃগয়াতে ব্যাঘ্ররূপী দুই রাক্ষসের একটিকে বধ করেন; দ্বিতীয় রাক্ষসটি প্রতিশোধ নেবেন ভয় দেখিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। রাজা তারপর যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করছিলেন সেই যজ্ঞে বশিষ্ঠ পুরোহিত ছিলেন। প্রতিশোধ নেবার জন্য সেই রাক্ষস বশিষ্ঠের রূপ ধরে রাজার কাছে সমাংস অন্ন খাবেন বাসনা প্রকাশ করেন। রাজা ব্যবস্থা করেন। কিন্তু রাক্ষস গোপনে এই মাংস সরিয়ে দিয়ে নরমাংস দিয়ে রাখেন। খেতে গিয়ে বশিষ্ঠ নরমাংস বুঝতে পেরে রাজাকে অভিশাপ দেন রাজা নরমাংসাশী রাক্ষস হবেন। অন্য মতে বশিষ্ঠরূপী এই রাক্ষস রাজাকে এই মাংস গোপনে আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে বলেন এবং মাংস বা অন্যমতে নর মাংস পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বশিষ্ঠ মাংস দেখে অভিশাপ দেন। বিনা দোষে অভিশপ্ত হয়ে রাজাও জল নিয়ে শাপ দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সৌদাসের স্ত্রী মদয়ন্তী রাজাকে নিবৃত্ত করেন। কিন্তু মন্ত্রপূত এই জল যেখানে পড়বে সে জায়গা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই রাজা জলটি নিজের পায়ের ওপর ফেলেন এবং দুই পা পুড়ে কালো হয়ে যায়। সেই থেকে নাম কল্মাষ-পাদ। নিজের ভুল বুঝতে পেরে বশিষ্ঠ বলেন ১২-বছর পরে সৌদাস মুক্তি পাবেন।

এরপর সৌদাস রাক্ষস হয়ে বনে মানুষ খেয়ে দিন কাটাতেন। অন্য মতে সৌদাসকে যজমান হিসাবে পাবার জন্য বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে ভীষণ প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। এই সময় বিশ্বামিত্রের আদেশে কিংকর নামে এক রাক্ষস সৌদাসের দেহে প্রবেশ করে। এরপর এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ রাজার কাছে এসে অন্ন ও মাংস খেতে চাইলে রাক্ষসাবিষ্ট রাজা প্রাসাদে কোন মাংস না থাকাতে পাচককে নরমাংস রান্না করে ব্রাহ্মণকে খাওয়াতে আদেশ দেন। আহার করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ বুঝতে পেরে রাজাকে নরমাংসাশী হবার শাপ দেন। ফলে সৌদাস প্রথমে শক্তিকে(মহা ১।১৬৬।৪) পরে বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় বাকি ১০০ ছেলেকে (মহা ১।১৬৬।৩৮) খেয়ে ফেলেন। অন্য মতে রাজা মৃগয়া গিয়ে বশিষ্ঠের আশ্রমে আসেন। শক্তি বার হয়ে আসছিলেন। বা বনের পথে একদিন দুজনের সামনাসামনি দেখা হয়েছিল। কেউ কাউকে পথ ছাড়তে রাজি হন না। ফলে রাজা রেগে গিয়ে কশাঘাত করেন এবং শক্তি তখন শাপ দিয়ে রাজাকে ষোল বছরের জন্য নরমাংসাশী রাক্ষসে পরিণত করেন। রাজা তৎক্ষণাৎ শক্তিকে খেয়ে ফেলেন। এবং বিশ্বামিত্র নিজে অপর মতে বিশ্বামিত্রের নির্দেশে কিংকর এই সময়ে কল্মাষপাদ রাক্ষসের দেহে ভর করেন ও বশিষ্ঠের অন্য ছেলেদেরও কল্মাষপাদকে দিয়ে ভক্ষণ করান। আর এক মতে একবার মৃগয়াতে গিয়ে এক রাক্ষসকে নিহত করলে রাক্ষসের ছোট ভাই প্রতিহিংসাতে পাচক হয়ে পাকশালাতে কাজ করছিল। একবার একটি শ্রাদ্ধের কাজে রাজা বশিষ্ঠকে নিমন্ত্রণ করেন। এই সুযোগে নরমাংস রান্না করে দিলে বশিষ্ঠ রাজাকে বার বছরের জন্য নরমাংস ভোজী রাক্ষস হবার শাপ দেন। উত্তঙ্ক (দ্র) এই কল্মাষপাদের স্ত্রীর কুণ্ডল নিয়ে গিয়েছিলেন।

এক ব্রাহ্মণ তাঁর স্ত্রী আঙ্গিরসীকে সম্ভোগ করছিলেন (মৈথুনায়োপসংগতৌ মহা ১।১৭৩।৮)। কল্মাষপাদ তখন ব্রাহ্মণকে খেয়ে ফেলেন। ফলে আঙ্গিরসী শাপ দেন ভার্যাসঙ্গ করলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে এবং বশিষ্ঠের ঔরসে বংশকর ক্ষেত্রজ পুত্র পেতে হবে ; এরপর ব্রাহ্মণী সহমৃতা হন। এই ব্রহ্ম হত্যার পাপ ভয়ঙ্কর মূর্তিতে অনুসরণ করতে থাকলে রাজা শেষ পর্যন্ত জনকের কাছে আসেন। এখানে গৌতমের সঙ্গে দেখা হয়। মুনি দিব্যজ্ঞান দিলে রাজা গোকর্ণে গিয়ে কিছুদিন তপস্যা করেন। ১৩ বছর এই ভাবে রাক্ষস জীবনের পর বশিষ্ঠের সঙ্গে দেখা হয় অন্য মতে বশিষ্ঠকে খেতে যান ; বশিষ্ঠ মন্ত্রপূত জল দিয়ে শাপমুক্ত করে দেন ; সাবধান করে দেন ব্রাহ্মণদের কোন দিন যেন আর অপমানিত না করেন এবং অযোধ্যায় ফিরে যেতে বলেন। কল্মাষপাদ কিন্তু ব্রাহ্মণীর শাপ মনে রেখে স্ত্রী সহবাস করতেন না এবং পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য বশিষ্ঠকে অনুরোধ করলে বশিষ্ঠের ঔরসে রাণীর গর্ভ হয়। কিন্তু সাত/বারো বছরেও কোন সন্তান না হওয়ায় রাণী/বশিষ্ঠ একদিন একটি পাথরের (=অশ্ম) টুকরো দিয়ে গর্ভে আঘাত করলে রাণীর একটি ছেলে হয়। এই ছেলে অশ্মক। দ্রঃ পরাশর। চিত্রগুপ্ত।

কল্যাণ—অঙ্গিরস ইত্যাদি কয়েকজন ঋষি ও কল্যাণ সকলে মিলে স্বর্গে যাবার জন্য এক যজ্ঞ করেন। কিন্তু কেউই এঁরা দেবযান জানতেন না। শেষ অবধি সকলে কল্যাণ মুনির ওপর সন্ধানের দায়িত্ব দেন। কল্যাণ বার হয়ে পড়েন এবং গন্ধর্ব

উর্ণায়ুর সঙ্গে দেখা হয়। এই গন্ধর্ব এঁকে একটি সাম গান ঔর্ণায়ুব শিখিয়ে দেন যাতে দেবযানের সন্ধান পাওয়া যাবে। কল্যাণ ফিরে এসে সঙ্গীদের সব বলেন কিন্তু কার কাছ থেকে পেয়েছেন বলতে রাজি হন না। অঙ্গিরা ইত্যাদি সকলে এই সাম গান করে স্বর্গলাভ করেন কিন্তু কল্যাণ যেহেতু 'উর্ণায়ু'র কথা চেপে গিয়েছিলেন সেই হেতু স্বর্গ যেতে বঞ্চিত হন এবং কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত হন।

কশিপু—কশ্যপপুত্র। দুর্দ্ধর্ষ রাজা। দেবাসুরের যুদ্ধে নিহত হন।

কশেরু—প্রজাপতি ত্বষ্টার সুন্দরী মেয়ে। এর যখন ১৪ বছর বয়স তখন নরকাসুর একে চুরি করে নিয়ে যান। কৃষ্ণ নরকাসুরকে জয় করে কুমারী কশেরুকে বিয়ে করেন।

কশ্যপ—একজন প্রজাপতি। ঋষি। শুক্লযজুর্বেদ ইত্যাদি বৈদিক সংহিতা মতে হিরণ্যবর্ণ ব্রহ্মা থেকে এঁর উৎপত্তি। লিঙ্গপুরাণে ইনি ব্রহ্মার মানস পুত্র। ভাগবতে মরীচি ও কলার সন্তান; অর্থাৎ ব্রহ্মার নাতি। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী কশ্যপের সন্তান। দক্ষের তেরটি মেয়ে এঁর স্ত্রী :- অদিতি, অরিষ্টা, ইলা, ক্রোধবশা, কাষ্টা, তাম্রা, তিমি, দনু, দিতি, মুনি, সরমা, সুরসা, সুরভি। অন্যমতে এঁদের নাম অদিতি, কালা/কালকা, কপিলা, কদ্রু, ক্রোধা, দিতি, দনু, দনায়ুস্, প্রধা, বিশ্বা, বিনতা, মুনি, সিংহিকা এবং আরো আটজন সুরসা, খসা, সুরভি, তাম্রা, ইরা, পুলোমা, ও অরিষ্টা মোট একুশ জন। কাশা, অনলা (দ্রঃ) ও অলকা ইত্যাদি নামও পাওয়া যায়। অদিতির সন্তান দেবতারা, দিতির দৈত্য, কাষ্টার অশ্বাদি পশুরা, অরিষ্টার গন্ধর্বেরা, সুরসার রাক্ষসরা, অন্য মতে নাগেরা, ইলার বা অনলার বৃক্ষ-উদ্ভিদাদি, মুনির অপ্সরা, অন্যমতে মানুষ, ক্রোধবসার পিশাচকুল, তাম্রার পক্ষীরা, সুরভির গোমহিষাদি, সরমার শ্বাপদাদি এবং তিমির সন্তান জলজন্তু। বিভিন্ন পুরাণে বহু মতান্তর আছে। আর এত মতে দক্ষের আটটি মেয়েকে বিয়ে করেন এবং পিতা মরীচির মত সুমহান পুত্রদের জন্ম দিতে বলেন। ফলে অদিতি অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র ও যুগল অশ্বিনীকুমারদের, দিতি দৈত্যদের, দনু অশ্বগ্রীবদের এবং কালকা বা কালিকা নরক ও কালকের জন্ম দেন। বাকি চারজন (তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু, অলকা) কশ্যপের কথায় সম্মত না হয়ে ক্রোধা, ভাসা, পূতনা, ধৃতরাষ্ট্র, শুকী, মৃগী, মৃগমন্দা, হরি, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দূলী, শ্বেতা, সুরভি, সুরসা, কদ্রু, মনুষ্য ও পবিত্র ফল সকলের জন্ম দেন। চাক্ষুষ মনন্বরে সুতপস্ মুনি ও তাঁর স্ত্রী পৃশ্নি দীর্ঘকাল তপস্যা করলে বিষ্ণু দেখা দেন। এঁরা বর চান বিষ্ণু তাঁদের ছেলে হয়ে জন্মান। পরবর্তী বৈবস্বত মন্বন্তরে এই সুতপস্ ও পৃশ্নি কশ্যপ ও অদিতি হয়ে জন্মান এবং প্রতিশ্রুতি মত বিষ্ণু বামন হয়ে জন্মান। এই জন্মেও অদিতি এবং সুরসা ছাড়াও বহু স্ত্রী ছিল। আর এক মতে যজ্ঞ করবার উপযুক্ত গরু না পেয়ে কশ্যপ একবার বরুণের গরু চুরি করে যজ্ঞ করেন এবং ফিরিয়ে দেন না। ফলে বরুণ কশ্যপের আশ্রমে তেড়ে এলে স্ত্রী অদিতি ও সুরসা বরুণকে উপযুক্ত সম্মান দেন না। এই জন্য বরুণ শাপ দেন। এবং কশ্যপ বসুদেব, অদিতি দেবকী ও সুরসা রোহিণী হয়ে জন্মান। অন্য মতে কশ্যপ বরুণকে ফিরিয়ে দিলে বরুণ ব্রহ্মার কাছে অভিযোগ করেন। ব্রহ্মা কশ্যপকে ডেকে পাঠান এবং ব্রহ্মা ও বরুণ দুজনে কশ্যপকে নন্দগোপ হয়ে জন্মাবার শাপ দেন।

কদ্রু যখন অবাধ্য সাপদের সর্পযজ্ঞে মৃত্যু হবে বলে শাপ দেন তারপর থেকে এদের বিষ ভীষণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় ব্রহ্মা কশ্যপকে সর্পবিষ নিবারণের বিদ্যা-শিক্ষা দেন। দ্র গজকচ্ছপ।

সমস্ত ক্ষত্রিয় নিধন করে অন্যমতে আঠার/একুশবার নিধন করে পরশুরাম এক যজ্ঞ করেন এবং যত রাজ্য জয় করেছিলেন/বা সমস্ত পৃথিবী কশ্যপকে দান করেন। কশ্যপ তখন পরশুরামকে দান প্রাপ্ত রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। সমুদ্রের তখন করুণা হয় এবং পরশুরামকে শূর্পারক দেশ দান করেন। অন্য মতে পরশুরাম (দ্র) তখন সমুদ্রকে বাণ বিদ্ধ করে সমুদ্র থেকে একটি অংশ নিয়ে নিজের বসবাসের জন্য একটি দেশে পরিণত করেন। কশ্যপ এটিকে কেড়ে নিয়ে ব্রাহ্মণদের দিয়ে দেন। পরশুরাম তখন বনে চলে যান। এর পর শূর্পারক/কেরল এলাকা একবার পাতালে নেমে যেতে থাকলে কশ্যপ পৃথিবীকে ধারণ করেন এবং উত্তর দিক থেকে ক্ষত্রিয়দের এনে এখানে রাজা করেন। এই শূর্পারক দেশ কেরল (শান্তি অধ্যা ৪৯)। ব্রহ্মা একবার যজ্ঞ করে সমস্ত পৃথিবী কশ্যপকে দান করলে পৃথিবী পাতালে গিয়ে কাঁদতে থাকেন। কঠোর তপস্যা করে কশ্যপ পৃথিবীকে শান্ত করেন। সুধন্বা (দ্রঃ) ও বিরোচনের তর্ক একটি মতে কশ্যপ মিটিয়ে ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলা কালীন কশ্যপ একবার দ্রোণের সঙ্গে দেখা করে যুদ্ধ থামিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। যদুবংশ ধ্বংসের কারণও এই কশ্যপ (দ্র শাম্ব)। কশ্যপের আর এক নাম অরিষ্টনেমি ও দেখা যায়। দ্র কাশ্যপ ; পরশুরাম।

কহোড়—কহোড়ক = খগোদর। এক মুনি। উদ্দালক ঋষির শিষ্য। অষ্টাবক্রের (দ্র) পিতা। শিক্ষা সমাপ্ত হলে উদ্দালক নিজের মেয়ে সুজাতার (= সুমতি) সঙ্গে বিয়ে দেন।

কহ্লণ—কাশ্মীর ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীর রচয়িতা। কহ্লণের পিতা চম্পক কাশ্মীর রাজ হর্ষের (খৃ ১০৮৯-১১০১) মন্ত্রী ছিলেন। কহ্লণের পৃষ্ঠপোষক অলকদত্তের উৎসাহে আট তরঙ্গ রাজ তরঙ্গিনী রচনায় ১০৭০ শকাব্দে কহ্লণ প্রবৃত্ত হন এবং পরের বছর বইটি সম্পূর্ণ হয়। কিংবদন্তি ও নানা কাহিনী গ্রহণ করলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি রক্ষা করতে কহ্লণ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

কাক—দ্র কলাবতী। কশ্যপও তাম্রার একটি সন্তান কাকী ; এই কাকী থেকে সমস্ত কাকের জন্ম। মরুত্ত যজ্ঞে ধর্ম কাকের রূপ ধরে পালিয়েছিলেন ফলে ধর্ম কৃতজ্ঞতায় বর দেন পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে দত্ত তণ্ডুল বলি দিলে সেই বলি কাকেরা পাবে।

কাকী—কার্তিকেয়ের সাতজন ধাত্রী মাতা :-কাকী, হলিমা, মালিনী, পলালা, আর্যা ও মিত্রা (দ্র কাক)।

কাক্ষীবতী—রাজর্ষি কাক্ষীবানের মেয়ে ভদ্রা। (মহা ১।১১১।১৫) পুরুবংশীয় রাজা ব্যুষিতাশ্বের স্ত্রী। রাজা যক্ষাতে মারা যান। কাক্ষীবতী স্বামীর দেহ জড়িয়ে ধরে কাঁদছিলেন। এমন সময় ব্যুষিতাশ্ব আকাশ বাণী করে স্ত্রীকে ঘরে ফিরে গিয়ে ঋতু স্নান করে শুয়ে থাকতে বলেন ; স্ত্রীকে সন্তানবতী করে দেবেন। যথাকালে মৃতস্বামীর ঔরসে সাতটি সন্তান হয়।

কাক্ষীবান—গৌতম (অহল্যার স্বামী নন) মহর্ষি যখন গিরিব্রজে বাস করছিলেন তখন উশীনর দেশের একটি শূদ্রারমণীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং ছেলে হয় কাক্ষীবান, যুধিষ্ঠিরে সভায় ছিলেন। কাক্ষীবানের ছেলে চণ্ডকৌশিক, মেয়ে ভদ্রা ও ঘোষা। দ্র কাক্ষীবতী।

কাঞ্চী—কাঞ্চিপুরম্, কাঞ্জিবরম। ১২°৪৯´৪৫´´ উ ও ৭৫°৪৫ পূ। প্রাচীন সহর। অতি প্রাচীন সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। খৃ-পূ ২-শতকে মহাভাষ্যে এর উল্লেখ আছে। ৬-শতকে হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে এসেছিলেন; ধর্মে জ্ঞানে বিদ্যায় ও বিক্রমে ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ স্থান বলে উল্লেখ করে গেছেন। ভারতে ৭-টি মোক্ষদায়িকা নগরীর একটি। দুটি ভাগ:-শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী। দাক্ষিণাত্যের স্মার্তদের মতে শিবকাঞ্চী বারাণসীর সমান। শিবকাঞ্চী থেকে ৬-কি-মি দূরে বিষ্ণুকাঞ্চী।

কাঠমন্ডু—প্রাচীন নাম মঞ্জুশ্রীপত্তন। নেপালের রাজধানী; ৮৫°১২´ পূর্ব এবং ২৭°৪২´´ উ। অর্দ্ধ চন্দ্রাকার, ৭০০ কি-মি ব্যাপী মনোরম উপত্যকা; মধ্য হিমালয়ে ১৪০০ মিটার উচ্চে। উত্তর ও উ-পশ্চিমে নাগার্জুন ও শিবপুরী পর্বত এবং দক্ষিণে মহাভারত পর্বত। বর্তমানে রক্সৌল থেকে কাঠমন্ডু পাকা সড়ক তৈরি হয়েছে। উত্তর থেকে বিষ্ণুমতী নদী ও পূর্বদিক থেকে বাগমতী নদীর মিলন স্থানে অবস্থিত। কাহিনী আছে এখানে বৃষ্টির রাজা নাগরাজের বাসস্থান স্বরূপ একটি হ্রদ ছিল। কোতওয়াল পাহাড় বিদীর্ণ করে মঞ্জুশ্রীদেব জল বার করে দিয়ে এই স্থানটিকে জনপদে পরিণত করেন। বার হয়ে যাওয়া এই জল বাগমতী নদী। এই জল পরে দক্ষিণে চোভার গিরি প্রাচীরে আটকে গেলে মঞ্জুশ্রীদেব খড়্গ দিয়ে আবার পথ করে দেন এবং বাগমতী বুড়িগণ্ডকিতে গিয়ে মেশে। অপর কাহিনী অনুসারে নেওয়ার জাতি এই জনপদের স্থাপয়িতা। নেওয়ার ইতিহাস বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক। বুদ্ধ এখানে স্বয়ম্ভুনাথ; পদ্মের কোরক থেকে তাঁর জন্ম। কাঠমণ্ডুর পশ্চিমে স্বয়ম্ভুনাথের চৈত্য মন্দিরে (প্রবাদ ২০০০ বছরেরও পুরাতন) স্তূপের মাথায় এই পদ্ম কোরকের প্রতীক আছে। বুদ্ধ এখানে নিজে এসেছিলেন। লিচ্ছবি রাজবংশ বৈশালী থেকে এখানে আসে এবং ৭২৩ খৃষ্টাব্দে এই বংশের রাজা গুণকমাধব কান্তিপুর সহর স্থাপন করেন। কথিত আছে ষোড়শ শতকে নরসিংহ মল্লের সময় দৈব সহায়তায় একটি মাত্র শালবৃক্ষের টুকরো থেকে মণ্ডপ বা ধর্মশালা তৈরি হয়েছিল। এই কাষ্ঠমণ্ডপটি এখনও দরবার স্কোয়ারের এক দিকে বিদ্যমান। কাষ্ঠমণ্ডপ থেকে নাম হয় কাঠমন্ডু। এখানকার প্রাচীন ও বর্তমান অধিবাসী মঙ্গোলীয় নেওয়ার জাতি। এখানকার মল্লরাজ বংশ দক্ষিণ ভারত থেকে আগত বলা হয়; দক্ষিণ ভারতের প্রভাব এখানে বেশ স্পষ্ট। শংকরাচার্য এখানে বিখ্যাত পশুপতিনাথ মন্দির স্থাপন করেন। হিন্দু-রাজ্য হলেও মৌর্য যুগ থেকে এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রচুর প্রভাব ছিল। এই প্রভাব কমে এলেও এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। তান্ত্রিক আচার-প্রধান মহাযানী বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এখানকার হিন্দুধর্মে প্রচুর দেখা যায়। এখানে পশুপতিনাথের মন্দির ১০০০ বছরের অধিক পুরাতন। কাঠমন্ডুর দক্ষিণে মচ্ছন্দ্রনাথের মন্দির। কাঠমন্ডুর পশ্চিমে স্বয়ম্ভুনাথের চৈত্য মন্দির। কাঠমন্ডু থেকে বাগমতীর উৎসে যাবার পথে বোধনাথের মন্দির।

কান্ডর্ষি—বেদের একটি অংশের মীমাংসক ঋষি। যেমন কর্মকাণ্ডের মীমাংসক জৈমিনি ; ব্রহ্মকাণ্ডের বেদব্যাস ; ভক্তিকাণ্ডের শাণ্ডিল্য।

কাত্যায়ন—মহর্ষি কাত্যের ছেলে। একজন মুনি। মহিষাসুর এঁর শিষ্য। রৌদ্রাশ্বের তপস্যা ভগ্ন করার জন্য কাত্যায়ন শিষ্যকে শাপ দিয়েছিলেন যে মেয়েদের হাতে নিহত হবে। দ্রঃ কাত্যায়নী, কতি।

কাত্যায়নী—(১) ভগবতী মূর্তি। কাত্যায়নের শাপের কারণে ব্রহ্মাদি দেবতাদের নিজ নিজ দেহ থেকে তেজ বার হয়ে এই তেজ মিলিত হয়ে এই দেবীর সৃষ্টি হয়। কাত্যায়ন এঁর প্রথম পূজা করেন বলে নাম কাত্যায়নী। দশভুজা সিংহবাহিনী আশ্বিনের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে সৃষ্ট হন এবং শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে কাত্যায়নীর পূজা নিয়ে দশমীতে মহিষাসুরকে সদলবলে নিহত করেন। দুর্গা পূজাটি কাত্যায়নীর পূজা। (২) যাজ্ঞবল্ক্যের এক স্ত্রী। যাজ্ঞবল্ক্য যখন সংসার ত্যাগ করেন তখন এই কাত্যায়নী সংসারের যত কিছু ভাগগ্রহণ করেন। অপর স্ত্রী মৈত্রেয়ী (দ্রঃ)।

কান্‌হেরি—প্রাচীন নাম কৃষ্ণগিরি। মহারাষ্ট্রের ঠানা জেলায়। ভারতের অন্য কোন পাহাড়ে এত শৈলখাত বৌদ্ধগুহা (শতাধিক) নাই। খৃষ্টীয় ১ম শতক থেকে ১০-ম শতক পর্যন্ত স্থানটি জীবিত ছিল। কাছে সমুদ্র এবং শূর্পারক (সোপারা) কল্যাণ, চেমুল প্রভৃতি সমৃদ্ধশালী বন্দরের সঙ্গে যাতায়াতের সুবিধা থাকার জন্য এখানের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল। গুহাগুলির স্থাপত্য সে রকম নয় ; সংখ্যাতেই অধিক। তবে গুপ্ত ঐতিহ্যের অনুকরণে খৃষ্টীয় ৬ শতকের উৎকীর্ণ চিত্র গুলিতে কমনীয় শিল্প সুষমা আছে। সাধারণত গুহাগুলি ছোট। অধিকাংশ গুহার সামনে একটি অঙ্গন, অঙ্গনের দুপাশে শৈলখাত প্রাচীর, প্রাচীরে এক অংশে একটি জলাধারের ঠিক ওপরে একটি কুলুঙ্গি। অঙ্গনের পর উঁচু স্তম্ভ যুক্ত একটি বারান্দা ; বারান্দার পর একটি বাস কক্ষ অথবা স্তম্ভহীন হল ঘর। কিছু হল ঘরে গবাক্ষ আছে এবং প্রাচীনতর অধিকাংশ গবাক্ষগুলিতে জালি আছে। বৃহত্তর হলঘরগুলির এক দিকে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ আছে। প্রাচীরের গায়ে বেষ্টনী গরাদ ক্ষোদিত। প্রায় সব গুহাতেই একটি করে জলাধার রয়েছে। দরবার গুহাটির স্বাতন্ত্র্য প্রচুর। এটিতে আটটি স্তম্ভ যুক্ত অষ্টকোণী একটি বারান্দা ; হলঘরের পেছন দিকের কেন্দ্র স্থলে মুখ্য দেবায়তন এবং দশটি প্রকোষ্ঠ। হলঘরে ৩ দরজা, ২ জানলা। এই হলের মেঝেতে এলোরার ৫-নং গুহার মত দুটি নীচু শৈলখাত বেঞ্চি আছে। মুখ্য দেবায়তনে প্রলম্বপাদ আসনে উপবিষ্ট ধর্মচক্র প্রবর্তন মুদ্রায় বুদ্ধদেবের মূর্তি রয়েছে। এই গুহাতে ৮৫৩ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্রকূট নৃপতি অমোঘবর্ষ ও শীলহার বংশীয় রাজপুত্র কপার্দির 'লেখ' রয়েছে। শাতবাহন রাজা যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণির (খৃ ২ শতক)-রাজত্ব কালে নির্মিত ৩য় গুহাটি চৈত্য গৃহ ; কার্লার চৈত্য গৃহের মত দুটি স্তম্ভ যুক্ত এবং কার্লার চৈত্র গৃহের অতি অক্ষম অনুকরণ। এই দুটি স্তম্ভের মধ্যে একটিতে বুদ্ধদেবের মূর্তি রূপায়িত হয়েছে। বুদ্ধ প্রতিমার সঙ্গে বোধিসত্ত্ব ও কতকগুলি নাগমূর্তি রয়েছে এবং এগুলিতে অমরাবতী শৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। কতকগুলি গুহার দেওয়ালে প্রধানত বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করে প্রচুর চিত্রাবলী রয়েছে। অধিকাংশ বুদ্ধমূর্তিগুলি সুঠাম ভঙ্গিমায় ও অলৌকিক আনন্দের অভিব্যক্তিতে ভাস্বর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের দুপাশে

একজন করে বোধিসত্ত্বের মূর্তি। বুদ্ধহীন ছবির সংখ্যা অল্প। তিনটি গুহায় অষ্ট মহাভয়ের কবল থেকে ভক্তদের উদ্ধাররত বোধিসত্ত্বের মূর্তি এবং খৃষ্টীয় ৬ শতকে ক্ষোদিত ৪১ নং গুহায় একাদশ মস্তক বিশিষ্ট চতুর্ভুজ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি অনন্য। ৬৭ নং গুহায় দীপংকর জাতকের কাহিনী একটি চিত্রে উৎকীর্ণ রয়েছে। এলোরায় যে রকম বজ্রযানীয় দেবদেবীর প্রচুর পূর্ণায়ত মূর্তি রয়েছে এখানে কিন্তু সে রকম নেই। এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানটির একটি নিজস্ব শ্মশান ছিল এবং বিশিষ্ট ভিক্ষুদের ভস্মাবশেষের ওপর ছোট ছোট স্তূপ বিদ্যমান ছিল।

কান্যকুব্জ—অপর নাম কন্যাকুব্জ (দ্র), কুশস্থল, কুসুমপুর, গাধিনগর। বর্তমান নাম কনৌজ; ২৭°২'৩০" উ × ৭৯°৫৮' পূ। উত্তর প্রদেশে ফররুখাবাদ জেলায়। বর্তমানে একটি ভগ্নাবশেষ সামান্য সহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। প্রাচীন কালে এর উত্তর পূর্ব সীমানায় গঙ্গা ছিল। এখন প্রায় ৬-কি মি দূরে সরে গেছে। গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে নদীতট থেকে একটি পাহাড় খাড়া উঠে গেছে। পাহাড়ের পশ্চিমে প্রাচীন কান্যকুব্জ একটি দুর্ভেদ্য দুর্গের মত অবস্থিত ছিল। প্রাচীন সাহিত্য ও শিলালেখে কান্যকুব্জের নাম পাওয়া যায়। মহাভারতের যুগে পঞ্চালের রাজধানী ছিল কাম্পিল পরে রাজধানী হয় কান্যকুব্জ। রাজা কুশনাভ মহোদয় নামে একটি নগরী স্থাপন করেন; এই মহোদয়ের পরবর্তী নাম কন্যাকুব্জ (দ্র) বা কান্যকুব্জ। খৃ পূ-২ শতকে মহাভাষ্যে এর উল্লেখ আছে। সম্ভবত এটি টলেমি বর্ণিত কানোগিজা। ফা-হিয়েন এর নাম অনুবাদ করে কা-নাও-য়ি বা কানোয়ি করেছিলেন। হিউ-এন-ৎসাঙ রাজধানী, রাজ্য দুটিকেই কনৌজ বলেছিলেন। বিভিন্ন যুগে কনৌজের রাজসভার অনুগ্রহ প্রাপ্ত কবি ও নাট্যকারদের মধ্যে বাণ, বাকপতিরাজ, রাজশেখর ও শ্রীহর্ষের নাম উল্লেখযোগ্য। হিউ-এন-ৎসাঙের বর্ণনায় ৮ কি. মি. × ২ কি. মি. সহর। এই এই সহরে এবং চার পাশের অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা মার্জিত ও সুবোধ্য এবং এখানকার বাচন ভঙ্গি ভারতের অন্যত্র আদর্শ ছিল। নবম শতকে রাজশেখরও এই কথা বলে গেছেন। এখানকার পুরবাসিনীদের সাজসজ্জাও সকলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল। প্রবাদ আছে বাঙলাতে আদি শূর এখান থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে এনেছিলেন এবং শ্রীহর্ষ এঁদের মধ্যে অন্যতম। গুপ্তোত্তর যুগে কান্যকুব্জ ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিল। খৃষ্টীয় ৫ শতকে ফা হিয়েন এখানে বৌদ্ধদের দুটি সংঘারাম দেখেছিলেন; হর্ষের সময় এখানে সংঘারাম ছিল এক শত। প্রবাদ আছে এই অঞ্চলে গঙ্গার তীরে বুদ্ধদেব ধর্ম প্রচার করেছিলেন। প্রাচীন প্রাসাদ ও মন্দির শিল্প শোভায় অতুলনীয় ছিল; বর্তমানে এগুলি নাই। এখানে খৃষ্টীয় ৪ ও ৫-শতকে গুপ্ত বংশ, ৬-শতকে মৌখরী বংশ ও ৮-শতকের প্রথম দিকে যশোবর্মা রাজত্ব করেন। ৭-শতকে হর্ষবর্দ্ধনের সময় কনৌজ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। পাল বংশের সম্রাট ধর্মপালের এখানে অভিষেক হয়। ৯-শতকের প্রথমে প্রতিহার রাজ কনৌজ দখল করেন; এবং এঁদের রাজধানী হিসাবে কনৌজ গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করেছিল। ১০-শতকে প্রতিহারদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে কনৌজ সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

কাপালিক—শৈব্য বা শাক্ত সম্প্রদায়। এরা ছয়টি মুদ্রা, দুটি উপমুদ্রার তত্ত্বজ্ঞ ও

ধারক। কণ্ঠিকা বা ঘন্টিকা, রুচক, কুণ্ডল, শিখামণি এই চারটি অলংকার এবং ভস্ম ও যজ্ঞোপবীতে এই ছয়টি মুদ্রা; এবং কপাল ও খট্টাঙ্গ ছুটি উপমুদ্রা। এই মুদ্রার দ্বারা দেহ মুদ্রিত করলে পুনর্জন্ম হয় না। যোনিরূপ আসনে অবস্থিত আত্মাকে ধ্যান করে এঁরা নির্বাণ লাভ করেন। এঁরা বামাচারী; অন্য নাম মনে হয়, সোমসিদ্ধান্তী। এঁদের শাস্ত্র ভৈরবাষ্টক, চন্দ্রজ্ঞান, হৃদভেদতন্ত্র, কলাবাদ। বহুসময় এঁরা শ্মশানবাসী, নরপালে ভোজন বিলাসী, অগ্নিতে নরমাংস আহুতি দেন, ব্রাহ্মণ কপালে সুরাপান করেন এবং নরবলি দিয়ে মহাভৈরবের পূজা করেন।

কাবেরী—নদী। দ্র ক্রৌঞ্চ। দাক্ষিণাত্যে একবার ভীষণ গ্রীষ্মে সব জল শুকিয়ে গেলে অগস্ত্য (দ্র) কাবেরী নদীকে মহাদেবের কাছ থেকে কমণ্ডলু করে নিয়ে আসেন। পথে ক্রৌঞ্চকে পাহাড়ে পরিণত করেন এবং তারপর একটি স্থানে (দ-ভারতে) বসে অগস্ত্য ধ্যান করছিলেন। ইন্দ্রের অনুরোধে গণেশ কাকের বেশে এসে অগস্ত্যের কমণ্ডলু উল্টে দিয়ে যান; কাবেরী নদী মাটিতে গড়িয়ে যান; নদীর উৎপত্তি হয়। কাকের সঙ্গে অগস্ত্যের বচসা হয় এবং শেষ পর্যন্ত গণপতি নিজের মূর্তি ধরে অগস্ত্যকে আশীর্বাদ করেন।

কাব্য—কাব্যের সংজ্ঞা হিসাবে ভামহ বলেছেন শব্দ ও অর্থের সাহিত্য (=সহযোগিতা) হচ্ছে কাব্য। দণ্ডীর মতে 'ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্ন' পদাবলীই কাব্য; রুদ্রটের মতে কবি-কর্মই কাব্য; মম্মটের মতে অদোষ, গুণযুক্ত, সালংকার শব্দ ও অর্থই কাব্য এবং বিশ্বনাথের মতে রসাত্মক বাক্যই কাব্য। ভামহ আরো বলেছেন প্রতিভা থাকার একান্ত দরকার। মম্মট ইত্যাদির মতেও প্রতিভার একান্ত প্রয়োজন। সংস্কৃতে গদ্য ও পদ্য ভেদে কাব্যের মূলত ছুটি শ্রেণী। দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে কাব্যের তিনটি শ্রেণী স্বীকার করেছেন; গদ্য, পদ্য ও গদ্যপদ্যমিশ্র।

পদ্যবদ্ধ কাব্যের ৫টি শ্রেণী:—মুক্তক, কুলক, কোষ, সংঘাত, ও সর্গবন্ধ (=মহাকাব্য); গদ্যবদ্ধ কাব্যের ছুটি শ্রেণী আখ্যায়িকা ও কথা। গদ্য ও পদ্যের মিশ্রকাব্য চম্পূকাব্য। পরবর্তীকালে খণ্ডকাব্য ও বিরুদকাব্য নামে আরো ছুটি শ্রেণী স্বীকৃত হয়েছিল। অর্থাৎ মোট দশটি শ্রেণী এবং এগুলি সবই শ্রব্য কাব্য। এই দশটি শ্রেণীর মধ্যে মহাকাব্যই অন্যান্য কাব্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত।

মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হয় ইতিহাসকথা; প্রথমে থাকে আশীর্বচন, নমস্ক্রিয়া, বা বস্তু নির্দেশ। নগর, পাহাড়, সমুদ্র, চন্দ্রসূর্যের উদয় ও অস্ত, ঋতু, উদ্যানক্রীড়া, সলিলক্রীড়া, মধুপান, রতিউৎসব, বিপ্রলম্ভ, বিবাহ, কুমারজন্ম, গূঢ়মন্ত্রণা, দূতপ্রেরণ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধ এবং শেষকালে নায়কের অভ্যুদয় বর্ণিত হয়। বিবিধ অলংকার, রস ও ভাব থাকে। শ্লোকগুলি শ্রুতি সুখকর হয়; অন্যূন আটটি সর্গ থাকে। কথাবস্তু মুখ, প্রতিমুখ ইত্যাদি পঞ্চসন্ধি সমন্বিত হয়। ধর্ম অর্থকাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গের উপদেশ থাকে; এ ছাড়া মানব চরিত্র, সমাজজীবন, রাজনীতি ইত্যাদির বিষয়ও থাকে। মহাকাব্য হিসাবে পরিচিত অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ প্রাচীনতম। কালি-দাসের রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব ও ছুটি প্রসিদ্ধ মহাকাব্য। ভারবির (৬-৭ শতক) কিরাতার্জুনীয়, ভর্তৃহরি রচিত রাবণবধ, কুমারদাস রচিত জানকীহরণ, মাঘরচিত শিশুপালবধ এই চারটিও মহাকাব্য নামে পরিচিত। ভারবি ও মাঘের পর রচিত

মহাকাব্যের মধ্যে কৃত্রিমতা বাড়তে থাকে এবং কবিত্ব ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকে। রত্নাকর রচিত হরবিজয়, শিবস্বামী রচিত কপ্‌ফিণাভ্যুদয়, মঙ্খক রচিত শ্রীকণ্ঠচরিত, অভিনন্দ রচিত রামচরিত, ও শ্রীহর্ষ রচিত নৈষধচরিত ও মহাকাব্য রূপে পরিচিত। এগুলি মনকে মোটেই ছুঁতে পারে না তবে নৈষধচরিত পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ। পরবর্তী যুগে মহাকাব্য রচনা স্রেফ পাণ্ডিত্যের কসরতে পরিণত হয়েছিল। কবিরাজ রচিত রাঘবপাণ্ডবীয়, হরদত্তসূরি রচিত রাঘবনৈষধীয়, বিজয়নগরের সভাকবি রচিত রাঘব-পাণ্ডব-যাদবীয় এবং ভৌমক প্রণীত রাবণার্জুনীয় মহাকাব্য বলে পরিচিত। এগুলিতে প্রতিটি শ্লোকে দুই বা তিন অর্থ হয়ে থাকে।

ঐতিহাসিক কাব্য হিসাবে রাজতরঙ্গিণী, শঙ্কুক রচিত ভুবনাভ্যুদয়, ক্ষেমেন্দ্র রচিত নৃপাবলী, পদ্মগুপ্ত রচিত নবসাহসাঙ্কচরিত, বিহ্লণ রচিত বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত, সন্ধ্যাকরনন্দী রচিত রামচরিত, জোনরাজ রচিত পৃথ্বিরাজবিজয়, হেমেন্দ্রসূরি রচিত কুমারপালচরিত, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ কৃত প্রাণাভরণ, আসফ-বিলাস, ও জগদাভরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রাজতরঙ্গিণী বাদে অন্য গ্রন্থগুলির ঐতিহাসিক তথ্য বহু-বহু ত্রুটিপূর্ণ।

খণ্ডকাব্য আর এক শ্রেণীর সংস্কৃত কাব্য, মোটামুটি ইংরাজি লিরিক জাতীয়। ঋতুসংহার একটি খণ্ডকাব্য।

দূতকাব্য :—সংস্কৃত সাহিত্যে এটি একটি বিশেষ ধারা। এই ধারায় প্রথম বই কালিদাসের মেঘদূত। পরে মেঘদূতের অনুকরণে ধোয়ীরচিত পবনদূত, বিষ্ণুদাস রচিত মনোদূত, রূপগোস্বামী রচিত উদ্ধবসন্দেশ ও হংসদূত, কৃষ্ণসার্বভৌম রচিত পদাঙ্ক-দূত ইত্যাদি প্রায় একশত দূতকাব্য রয়েছে। দূতকাব্যে নিসর্গবর্ণনা, বহু জনপদের ভৌগলিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্য এবং ভক্তি ও দার্শনিকতা ছড়িয়ে রয়েছে।

শতককাব্য :—একশত শ্লোকযুক্ত এক একটি কবিতা সংগ্রহ। প্রতি শতকে শ্লোকগুলি একই বিষয়ের ওপর রচিত। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এগুলি অপূর্ব। অমরু রচিত অমরুশতক ; ভর্তৃহরি রচিত বৈরাগ্যশতক, নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক, শিহ্লণ রচিত শান্তিশতক, ভল্লটশতক, সোমনাথ রচিত অন্যোক্তিশতক, শম্ভুকবি রচিত অন্যোক্তিমুক্তালতা, নীলকণ্ঠ রচিত অন্যাপদেশশতক ও জনৈক অজ্ঞাত কবির মূর্খশতক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

স্তোত্রকাব্য হিসাবে আর একটি ধারা গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন দেবদেবীর স্তব এই ধারার অন্তর্গত। এই স্তবগুলি বর্ণনা, ভক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে অপূর্ব। যেমন গঙ্গাস্তোত্র, মহিম্নঃস্তোত্র ইত্যাদি।

গদ্যকাব্যের সংখ্যা খুব বেশি নয়। বাণভট্টের কাদম্বরী ও হর্ষচরিত, এবং সুবন্ধুর বাসবদত্তা উল্লেখযোগ্য।

চম্পূকাব্য :—গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ। পদ্যের মধ্যে স্থানে স্থানে কবিতার আশ্রয় নিয়ে রচনায় মাধুর্য ও বৈচিত্র্য বাড়ান হত। চম্পূকাব্যগুলির মধ্যে ভোজ রচিত রামায়ণ চম্পূ সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। অনন্তভট্ট রচিত ভারতচম্পূ, নীলকণ্ঠ দীক্ষিত রচিত নীলকণ্ঠবিজয়চম্পূ, বেঙ্কটাধ্বরি রচিত বিশ্বগুণাদর্শচম্পূ, ত্রিবিক্রম রচিত নলচম্পূ,

সোমদেব সূরি রচিত যশস্তিলক চম্পূ, জীবগোস্বামী রচিত গোপালচম্পূ, কবিকর্ণপুর রচিত আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ, শংকর কবি রচিত শংকর চেতো-বিলাস-চম্পূ উল্লেখযোগ্য।

কাব্যমাতা—শুক্রের মা ; পুলোমা।

কাব্যালঙ্কার সার সংগ্রহ—উদ্ভট রচিত। 'ভামহবিবরণ' নামে উদ্ভট রচিত অধুনালুপ্ত বিরাট গ্রন্থের সারসংগ্রহ মনে হয়। ৬-টি বর্গে বিভক্ত এবং এতে ৪১-টি বিভিন্ন অলংকার ও তাদের উদাহরণ দেখান আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভামহের লক্ষণগুলি অক্ষরশ বা ঈষৎ পরিবর্তন সহকারে এই গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। উদ্ভটের নিজের রচিত কুমারসম্ভব থেকে নানা উদাহরণ এই কাব্যালঙ্কার সারসংগ্রহে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই বইয়ের ওপর প্রতীহারেন্দুরাজ কৃত দুটি টিকা 'লঘুবৃত্তি' ও 'বিবৃতি' পাওয়া যায়।

কাম—স্বাহার এক ছেলে। ইনিও অগ্নি, অদ্ভুত সুন্দর দেখতে।

কামদেব—কন্দর্প (দ্র)।

কামধেনু—গো জাতির প্রথম। এক জন দেবী যেন। যে কোন প্রার্থিত বস্তু দান করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলেই দুধ পাওয়া যায়। নাম অনেক সময় সুরভি এবং নন্দিনী। আবার অন্য মতে প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষ কন্যা সুরভির গর্ভে রোহিণীর জন্ম। এবং শূরসেনের ঔরসে রোহিণীর গর্ভে কামধেনুর জন্ম। আর এক মতে কশ্যপ ক্রোধবশার মেয়ে সুরভি। সুরভির দুটি মেয়ে রোহিণী ও গন্ধর্বী। রোহিণীর সন্তান পৃথিবীর সমস্ত গো জাতি। আর এক ব্যাখ্যা সুরভি যদিও কশ্যপের কন্যা কিন্তু অন্য পুরুষের অভাবে কশ্যপের ঔরসে সুরভির সন্তান হয়। অর্থাৎ ক্রোধবশার মেয়ে হয়েও কশ্যপের স্ত্রী।

মৎস্য পুরাণ মতে বিষ্ণুর শরীর থেকে যে অষ্ট মাতৃকার সৃষ্টি হয়েছিল কামধেনু তাদের মধ্যে অন্যতমা। স্কন্দ পুরাণ মতে সমুদ্রমন্থনে কামধেনু উঠেছিল অর্থাৎ ক্রোধবশার কন্যা নয়। আর এক মতে সমুদ্র মন্থনে অমৃত উঠলে ব্রহ্মা যত পারেন অমৃত পান করেন এবং বমি হয়ে যায় ; ঐ বমি কামধেনু। এই কামধেনুটি রসাতলে থাকেন এবং এর পূব দিকে সুরভি, দক্ষিণে হংসিকা, পশ্চিমে সুভদ্রা, এবং উত্তরে ধেনু অর্থাৎ আরো চারটি কামধেনু রয়েছে। বিষ্ণু যখন অদিতির গর্ভে অবস্থিত সেই সময় সুরভি কৈলাসে ব্রহ্মার আরাধনা করেন এবং ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে সুরভিকে দেবী করে গোলকে থাকার নির্দেশ দেন। কৃষ্ণ ও রাধা একবার ইন্দ্রিয় ভোগে লিপ্ত ছিলেন। তারপর ক্লান্ত হয়ে দুধ খাবার ইচ্ছা হলে কৃষ্ণ তাঁর দেহের বাম দিক থেকে সুরভি ও বাছুর মনোরথকে সৃষ্টি করেন। সুদাম এই দুধ দুয়ে দেন। মাটির পাত্রে এই দুধ খেতে গিয়ে পাত্র পড়ে ভেঙে যায় এবং পড়ে যাওয়া দুধে ক্ষীর সমুদ্র তৈরি হয়। রাধা ও সখীরা এই সমুদ্রে জলকেলি করেন। এই সুরভির গা থেকে অসংখ্য সুরভির সৃষ্টি হয় এবং এগুলিকে শ্রীকৃষ্ণ গোপদের উপহার দেন।

কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করলে ইন্দ্র পরাজিত হন। কামধেনু তখন গোকুলে এসে নিজের দুধ দিয়ে কৃষ্ণকে স্নান করিয়ে যান। জমদগ্নি একবার গোকুলে যান এবং কামধেনুকে পূজা করে সন্তুষ্ট করলে কামধেনু তাঁর বোন সুশীলাকে জমদগ্নির হাতে দান করেন। জমদগ্নি আবার স্ত্রী রেণুকাকে এই গরু দান করেন। জমদগ্নির

কামধেনু কপিলা ; বশিষ্ঠের শবলা বা নন্দিনী। আরো বহু স্থানে কামধেনুর উল্লেখ রয়েছে। একটি মতে কামধেনুর সন্তান অযশ, একপাৎ অহির্বুধ্ন্য, ত্বষ্টা ও রুদ্র। দ্রঃ ত্রিশঙ্কু, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, বসু ও ইন্দ্র।

কামন্দক—নীতিসার গ্রন্থের রচয়িতা। মহাভারতে শান্তিপর্বে কামন্দকের উল্লেখ আছে ; নীতিসারের উল্লেখ নাই। গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী শিখরস্বামীই কামন্দক, অনেকে অনুমান করেন। আবার অন্য মতে গুপ্ত যুগের শেষভাগে এই নীতিসার রচিত হয়েছিল।

কামরূপ—দ্রঃ আসাম, কামাখ্যা।

কামশাস্ত্র—যৌন সম্ভোগ শাস্ত্র। ভারতে অতি প্রাচীন কাল থেকে আলোচিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬।২।১২-১৩ ; ৬।৪।২-২৮) প্রথম কামশাস্ত্রের অনুশীলনের পরিচয় রয়েছে। বর্তমানে উপলভ্যমান বাৎসায়ন রচিত কামসূত্রই প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বাৎস্যায়ন মতে :-প্রজা রক্ষা করবার জন্য লক্ষ অধ্যায় ত্রিবর্গ সাধন এক শাস্ত্র প্রজাপতি উপদেশ দিয়েছিলেন। এই উপদেশের একাংশ নিয়ে স্বায়ম্ভুব মনু ধর্মশাস্ত্র রচনা করেন ; আর এক অংশ নিয়ে বৃহস্পতি অর্থশাস্ত্র তৈরি করেন এবং বাকি অংশ নিয়ে মহাদেবের অনুচর নন্দী হাজার অধ্যায় কামসূত্র প্রণয়ন করেন। শ্বেতকেতু পরে নন্দীর এই গ্রন্থকে ৫০০ অধ্যায়ে ছোট করে আনেন। এর পর পঞ্চাল দেশীয় বাভ্রব্য সাত অধিকরণে ও ১৫০ অধ্যায়ে বইটিকে আরো ছোট করে তোলেন। এর পর এই এক একটি অধিকরণ নিয়ে নানা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল এবং এই রচনাগুলি এক দেশিক ছিল বলে এবং বাভ্রব্যের রচনা বিরাট ছিল বলে বাৎস্যায়ন গুছিয়ে কামসূত্র রচনা করেন। কামসূত্রের রচনা কাল মনে হয় খৃ ৩-শতকের মাঝামাঝি। এর অনেকগুলি টীকা হয়েছিল ; এগুলির মধ্যে জয়মঙ্গলই প্রসিদ্ধ।

বাৎস্যায়নে উল্লিখিত নন্দীই সম্ভবত প্রাচীন কামশাস্ত্রকার নন্দিকেশ্বর। উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতু লিখিত সম্ভবত একটি কামশাস্ত্র ছিল। গণিকাপুত্র রচিত পারদারিক, দত্তকাচার্য রচিত দত্তকসূত্র বা বৈশিক অধিকরণ, চারায়ণ রচিত সাধারণ অধিকরণ ; ঘোটকমুখ রচিত কন্যাসংপ্রযুক্তক ; গোনর্দীয় রচিত ভার্যাধিকারিক ; সুবর্ণনাভ রচিত সাম্প্রয়োগিক, এবং কুচুমার রচিত ঔপনিষদিকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই চারায়ণ বা দীর্ঘচারায়ণ কোশলরাজ প্রসেনজিতের মন্ত্রী ছিলেন। কুচুমারের ঔপনিষদিকের একটি সংক্ষিপ্ত কাব্যসংস্করণের খণ্ডিত অংশ বর্তমানে পাওয়া যায়। কুচুমারকে ঋষি মনে করা হত এবং তাঁর গ্রন্থ কুচোপনিষদ নামে পরিচিত।

অর্বাচীন কালে অজস্র কামশাস্ত্র রচিত হয়েছিল। কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের মন্ত্রী দামোদর গুপ্ত নবম শতকের গোড়ায় কুট্টনীমত নামে একটি বই লেখেন। ১০ বা ১১ শতকে পদ্মশ্রী বা পদ্মশ্রীজ্ঞান নামে এক বৌদ্ধভিক্ষু নাগরসর্বস্ব রচনা করেন। ক্ষেমেন্দ্র লেখেন বাৎস্যায়নসূত্রসার ও সময়মাতৃকা। বার শতকে কোক্কক লেখেন রতি রহস্য। এই কোক্ককই কোকা পণ্ডিত। এঁর পরবর্তী গ্রন্থগুলি রতিরহস্য অনুকরণে রচিত. রতিরহস্যের অনূন্য চারটি টীকা হয়েছিল ; এগুলির মধ্যে

কাঞ্চীনাথের টীকাই বিখ্যাত। এর পর আরো বই লেখা হয়েছিল। ১৭ শতকে কামপ্রবোধ রচনা করেছিলেন বিকানীর রাজ অনূপ সিংহের সভাকবি ব্যাসজনার্দন।

কামা—পৃথুশ্রবার মেয়ে। অযুতন্যায়ীর স্ত্রী। ছেলে অক্রোধন।

কামাখ্যা—২৬° ১০´ উ×৯১° ৪৫´ পূ। আসামে কামরূপ জেলার ঝালুকাবাড়ি থানার অন্তর্গত। ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরে অবস্থিত। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ২৯৩ মিটার উচ্চে নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত। চার দিকের প্রাকৃতিক-দৃশ্য সুন্দর। এখানকার দেবীর নামও কামাখ্যা। দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করলে বিষ্ণু সতীর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করে ফেলেন। সতীর যোনিদেশ এইখানে পড়েছিল। একান্নপীঠের একটি। রাজপুত্র নরক আদি মন্দিরটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। ১৫৬৫ সালে রাজা নরনারায়ণ মন্দিরটির সংস্কার করেন। এখানকার দেবী কামাখ্যার সঙ্গে কামেশ্বরের বিবাহ উৎসবের স্মরণার্থে পৌষমাসে পৌষবিয়া উৎসব, বসন্তে বাসন্তী উৎসব, আষাঢ়ে অম্বুবাচী ও শরতে দুর্গাপূজা উল্লেখযোগ্য।

কাম্পিল—দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী। প্রাচীন কাম্পিল্য। পুরাতন গঙ্গা নদীর ধারে, বদায়ুঁ ও ফররুখবাদের মাঝামাঝি কোন স্থানে ছিল। ফররুখবাদ জেলার ফতেগড় সহরের ৪৫ কি-মি উ-পূর্বে অবস্থিত। দ্রুপদের রাজধানী; এখানে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভা হয়েছিল। বুড়গঙ্গা (গঙ্গার প্রাচীন খাত) তীরে একটি ঢিপি এখনও দ্রুপদের রাজধানী হিসাবে পরিচিত। দ্রুপদের আগে এখানে নীপ বংশীয়েরা রাজত্ব করতেন। এই বংশের প্রথম রাজা নীপ পাণ্ডবদের ১২ বা ১৫ পুরুষ আগে। এই বংশে বিখ্যাত রাজা ব্রহ্মদত্ত পাণ্ডবদের ঊর্দ্ধতন ৫-পুরুষ রাজা প্রতীপের সমসাময়িক। ভীষ্মের সময় এই রাজবংশ ধ্বংশ হয়। ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তাতে কাম্পিল্যের উল্লেখ আছে.

কাম্যকবন—বনবাসের সময় পাণ্ডবরা এখানে বহু দিন ছিলেন। এখানে বিদুর, সঞ্জয় ইত্যাদিও দেখা করতে এসেছিলেন। এই বনেই পাণ্ডবদের সঙ্গে নারদ ও মার্কণ্ডেয়ের সাক্ষাৎ হয়।

কাম্যা—(.) কর্দমের ঔরসে স্ত্রী শ্রুতির গর্ভে ছেলে শঙ্খপাদ ও মেয়ে কাম্যা। স্বায়ম্ভুব মনুর ছেলে প্রিয়ব্রতের স্ত্রী। (২) একজন অপ্সরা।

কায়ব্যূহ—পতঞ্জলি বলেছেন নাভিচক্রে চিত্তসংযম করলে কায়ব্যূহ জ্ঞান হয়।

কারণ্ডব্যূহ—একজন বুদ্ধ।

কারীষ—বিশ্বামিত্রের একটি ছেলে।

কারূষ—(১) কারুষ দেশের রাজা। ভদ্রা নামে একটি যুবতী এঁকে বিয়ে করবার জন্য তপস্যা করছিলেন এমন সময় শিশুপাল এসে এঁকে ধরে নিয়ে যান। (২) বৈবস্বত মনুর এক ছেলে। (৩) একজন যক্ষ। তপস্যা করে একটি মন্বন্তরের অধিপতি হন। (৪) প্রাচীন ভারতে একটি দেশ। সম্ভবত বর্তমানের বুন্দেলখণ্ড। ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা-পাপ ব্রাহ্মণরা এখানে ধুয়ে দিয়েছিলেন। ইন্দ্রের করীষ (ময়লা) যেখানে পড়েছিল সেখানের নাম হয় করীষ; পরে নাম কারুষ হয়ে দাঁড়ায়।

কার্ত্তবীর্য—কৃতবীর্যের ছেলে। অন্য নাম অর্জুন বা কার্তবীর্যার্জুন। যযাতি (১)>যদু (২)>সহস্রজিৎ(৩)>একবীর(=হেহয়)(৫)>ভদ্রসেন(৮)-কৃতবীর্য(১০)>কার্তবীর্য(১১)।

নর্মদা তীরে হৈহয় রাজ্যের রাজধানী মাহিষ্মতী। কার্তবীর্য রাজা হয়ে গার্গ মুনির কাছে অমিতবলশালী হবার জন্য উপদেশ চান। গার্গ রাজাকে দত্তাত্রেয়র কাছে যেতে বলেন। অত্রিপুত্র দত্তাত্রেয় মুনির কাছে হাজার হাত পেয়ে অজেয় হয়ে ওঠেন। দশহাজার যজ্ঞ করেছিলেন। ইনি যখন ত্রিলোকের রাজা সেই সময় এক-দিন অগ্নি এসে এঁর কাছে কিছু ভিক্ষা চান। রাজা কিছু পাহাড় ও বন দিয়ে দেন। অগ্নি এগুলি পোড়াতে থাকেন। এখানে আপব মুনির আশ্রম পুড়ে গেলে মুনি শাপ দেন রাজার সব হাত কাটা যাবে বা পরশুরাম কেটে ফেলবেন। হেহয়রা ক্ষত্রিয়; কুলপুরোহিত ভৃগু (দ্রঃ) বংশীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এবং ক্রমশ সমস্ত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে হেহয়দের তথা ক্ষত্রিয়দের তীব্র সংঘর্ষ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত ঔর্ব (দ্রঃ) জন্মালে হেহয়রা কিছুটা শান্ত হয়। এর বহুকাল পরে হেহয় বংশে কার্তবীর্য ও ভৃগুবংশে জমদগ্নি জন্মান; এবং উত্তরাধিকারে আসা কলহ আবার দেখা দেয়। এ ছাড়াও আর একটি কারণ ছিল।

একবার কার্তবীর্য মৃগয়া পথে ক্লান্ত হয়ে জমদগ্নি (দ্রঃ) আশ্রমে এসে কাম-ধেনুর ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ ও আশ্চর্য হয়ে গরুটিকে নিয়ে যাবার চেষ্টায় মারামারি আরম্ভ করেন। এবং জমদগ্নিকে নিহত করেন। কামধেনু ব্রহ্মলোকে অন্তর্হিত হয়ে যান। রাজা এর বাছুরটিকে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। প্রতিশোধ নেবার জন্য পরশুরাম শিষ্য অকৃতব্রণকে সঙ্গে নিয়ে মাহিষ্মতী আক্রমণ করে রাজার সব হাত কেটে দেন এবং শেষ পর্যন্ত শিরশ্ছেদ করেন। এই কার্তবীর্যার্জুনের জলক্রীড়া রেণুকার (দ্রঃ) মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

নারদ একবার কার্তবীর্যের সঙ্গে দেখা করলে রাজা সাদরে অভ্যর্থনা করে মোক্ষ-লাভ তথা জাগতিক সুখ ভোগের পথ জানতে চান। নারদ ভদ্রদীপ প্রতিষ্ঠা নামে যজ্ঞ করতে বলেন। নর্মদা তীরে রাজা সস্ত্রীক যজ্ঞ করেন। অত্রির ছেলে দত্তাত্রেয় এই যজ্ঞে গুরু ছিলেন। যজ্ঞের শেষে কার্তবীর্যকে সন্তুষ্ট হয়ে বর চাইতে বললে রাজা অনেকগুলি বর ও এক হাজার হাত চান। এই হাজার হাত নিয়ে রাজা মহানন্দে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলে দৈববাণী হয় ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ অনেক বড়; ব্রাহ্মণের সাহায্যে ক্ষত্রিয়কে রাজ্য স্থাপন করতে হয়। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং বুঝতে পারেন বায়ু এই কথা বলেছেন এবং বায়ুর সঙ্গে তর্ক করতে থাকেন। বায়ু তখন আবার সাবধান করে দেন ব্রাহ্মণের শাপে কার্তবীর্যকে বিপদে পড়তে হবে।

ত্রিভুবন জয় করে রাবণ সসৈন্য নর্মদা তীরে এসে এক রাত্রি বিশ্রাম নেন। পর দিন সকালে নদীতীরে শিবের মূর্তি গড়ে পূজা করছিলেন এমন সময় কার্তবীর্য স্ত্রীদের নিয়ে জলক্রীড়া করছিলেন এবং খেলার ছলে হাজার হাত দিয়ে নদীর স্রোত আটকে দেন। জলে রাবণের পূজার জিনিস ইত্যাদি ভেসে যায়। রাবণ বিরক্ত হয়ে ওঠেন এবং ঘটনাটা জানতে পেরে রাজাকে আক্রমণ করেন। তীব্র যুদ্ধে রাবণ হেরে গিয়ে বন্দী হন। এক বছর বন্দী থাকার পর পিতামহ পুলস্ত্য এসে রাবণকে মুক্ত করে দেন এবং এঁদের আমরণ বন্ধুতা স্থাপন করিয়ে দিয়ে যান। কার্তবীর্যার্জুন ত্রিভুবন জয় করেন। সূর্যবংশে ত্রয্যারুণ, হরিশ্চন্দ্র, রোহিতাশ্ব এবং চুঞ্চু এঁর কাছে পরাজিত হন। হাজার হাত পেয়ে দেবতা ও যক্ষদের হারিয়ে দেন। এমন কি

বিষ্ণুকেও যুদ্ধে আহ্বান করেন। ইন্দ্রকে অপমানিত করেন। বিজয়গর্বে উল্লসিত হয়ে রাজা সমুদ্রতীরে গিয়ে সমুদ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং জলজন্তুদের বাণবিদ্ধ করে হত্যা করতে থাকেন। তখন বরুণ দেব দেখা দিয়ে নিজের হার স্বীকার করে নিয়ে রাজা প্রকৃত কি চান অর্থাৎ প্রকৃত একজন যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান জানতে পেরে পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলেন।

কার্তবীর্যের একশত ছেলে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শূর, শূরসেন, ধৃষ্ট, কৃষ্ণ ও জয়ধ্বজ। কার্তবীর্যের পর জয়ধ্বজ রাজা হন। জয়ধ্বজের ছেলে তালজঙ্ঘ। হৈহয় বংশ পরে পাঁচটি শাখায় ভাগ হয়ে যায়:—ভোজ, অবন্তি, বীতিহোত্র, স্বয়ংজাত ও শৌণ্ডিক শাখা।

কার্তিকেয়—সপ্তর্ষি যজ্ঞে হোমকুণ্ড থেকে অগ্নি সপ্তর্ষিদের স্ত্রীদের দেখে কামাবিষ্ট হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁদের পাওয়া অসম্ভব জেনে দেহত্যাগ করার সঙ্কল্প করে বনে যান। দক্ষকন্যা স্বাহা অগ্নিকে কামনা করতেন। অগ্নির দুর্বলতা বুঝে স্বাহা এই সময় অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপ ধরে অগ্নির কাছে এসে সহবাস করেন এবং গরুড় পক্ষিণী হয়ে অগ্নির বীর্য এক কাঞ্চনকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। স্বাহা তারপর সপ্তর্ষিদের প্রত্যেকের স্ত্রীর রূপ ধরে অগ্নির সঙ্গে সহবাস করেন এবং প্রতিবারই অগ্নির বীর্য কাঞ্চনকুণ্ডে ফেলে দিয়ে আসতেন। বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতীর তপস্যার প্রভাবে স্বাহা কেবল অরুন্ধতীর মূর্তি ধরতে পারেন নি। এই ছয়টি নারীর মাধ্যমে কাঞ্চনপাত্রে নিক্ষিপ্ত স্কন্ন অর্থাৎ স্খলিত শুক্র থেকে স্কন্দের জন্ম। এঁর ছয় মাথা। এঁর জন্মের পর ঋষিরা সন্দেহের বশে স্ত্রীদের পরিত্যাগ করেন। স্বাহা প্রকৃত ঘটনাটা বার বার বললেও কেউ বিশ্বাস করেন নি। বিশ্বামিত্র জানতেন কিন্তু তাঁকে এঁরা বিশ্বাস করলেন না। ঋষিপত্নীরা তাঁদের কলঙ্ক মোচনের জন্য স্কন্দের কাছে এলে তিনি এঁদের রক্ষা করেন। স্বাহাও স্কন্দের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন তিনি অগ্নির সঙ্গে বাস করতে চান। স্কন্দ আশ্বাস দেন ব্রাহ্মণরা হোমে ঘি দেবার সময় 'স্বাহা' বলবেন ফলে অগ্নির সঙ্গে তাঁর সর্বদা বাস করা হবে। একটি মতে অগ্নির সঙ্গে স্বাহার বিয়ে হয়।

অন্য মতে অরুন্ধতীকে বাদ দিয়ে বাকি ছয়টি ঋষিপত্নী সকালে গঙ্গা স্নান করতে গিয়ে অগ্নির সঙ্গে সহবাস করতেন এবং গর্ভবতী হন। পরে তাঁরা সকলেই তাঁদের গর্ভ হিমালয়ের শিখরে পরিত্যাগ করে আসেন। এই মিলিত গর্ভ/তেজ থেকে কার্তিকের জন্ম। আর এক মতে বরুণের যজ্ঞে সকলে আসেন, শিব ও আসেন। ঋষিদের সুন্দরী পত্নীদের দেখে শিবের বীর্যপাত হয়। শব এই বীর্য অগ্নিতে ফেলে দেন। অগ্নি এই বীর্য গঙ্গাকে ধারণ করবার জন্য দেন। গঙ্গা প্রথমে অস্বীকৃত হলেও বীর্য ধারণ করেন এবং ছেলে হলে ছেলেটিকে শরবনে ফেলে দেন। এই ছেলে কার্তিকেয়।

মহাদেব যে ধনু দিয়ে ত্রিপুরকে বধ করেছিলেন শিশু স্কন্দ সেই ধনু নিয়ে গর্জন করে ওঠেন। স্কন্দের সংবাদ শুনে এবং স্কন্দের অমিত বলের জন্য ঈর্ষায় দেবতারা এঁকে খুন করবার জন্য ইন্দ্রকে অনুরোধ করেন। কিন্তু ইন্দ্র সাহস না করতে দেবতারা লোকমাতাদের অর্থাৎ শিবের অনুচরী মাতৃকাদের পাঠান। কিন্তু

এরা শিশুকে স্তন্য দিয়ে নিজেদের সন্তানের মত পালন করতে থাকেন। পরে ইন্দ্র সদল বলে আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু অগ্নিপুত্র স্কন্দ মুখের আগুনে দেব সৈন্যদের পুড়িয়ে ফেলেন। ইন্দ্র তখন বজ্রাঘাত করলে কার্তিকের দক্ষিণ পাশ বিদীর্ণ হয়ে বিশাখ নাম, সোনার মত রঙ এক যুবকের আবির্ভাব হয়। দেবরাজ ভয় পেয়ে কার্তিককে তখন দেব সেনাপতির পদে বরণ করেন (দ্র গণেশ)। অন্য মতে অসুরদের কাছে পরাজিত ইন্দ্র মেরু পর্বতে বাস করছিলেন; দেবতা ও ঋষিরা কার্তিকের শরণাপন্ন হন। ইন্দ্র জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে কার্তিকের সঙ্গে যুদ্ধ করে কার্তিকের মুখ ক্ষত করে দেন। এই ক্ষত থেকে শাখ ও বিশাখ নামে কার্তিকের দুই ছেলে হয়। এই দুটি ছেলের সাহায্যে আবার ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। কিন্তু এই সময়ে শিব এসে ইন্দ্রকে জানান তারকাসুর বধের জন্য কার্তিকের জন্ম; যাতে ইন্দ্র রাজ্য ফিরে পান। ইন্দ্র তখন কার্তিককে চিনতে পারেন এবং ক্ষমা চেয়ে নিয়ে দেব সেনাপতি করে দেন; (দ্র গণেশ)। এর পর দেবাসুরের যুদ্ধে প্রায় সমস্ত দানবই কার্তিকের শরে নিহত হন। মহাদানব মহিষেরও মুণ্ডচ্ছেদ করেন; তারকের ছেলেদেরও নিহত করেন এবং বাণাসুরকে পরাজিত করেন।

রুদ্রকে অগ্নি বলা হয়। অর্থাৎ অগ্নি বা রুদ্রের পুত্র কার্তিক। বা মহাদেব অগ্নির শরীরে প্রবেশ করে এই পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। অন্য মতে ব্রহ্মার নির্দেশে দেবতারা পার্বতীর সঙ্গে (দ্রঃ মদন) মহাদেবের বিয়ে দেন। বিয়ের পর বহু দিন কোন সন্তান হয় না। দেবতারা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। হরপার্বতী এক দিন বিহার করছিলেন অগ্নি (দ্রঃ) এই সময় দেবতাদের নির্দেশে কপোত রূপ ধরে সেইখানে এলে মহাদেব সম্ভোগে বিরত হন এবং বীর্যপাত হয়। অন্য মতে হরপার্বতী বহুদিন ধরে সম্ভোগ করছিলেন। সারা পৃথিবী কম্পিত হয়ে ওঠে। দেবতারা ভয়ে ব্রহ্মার শরণ নিলে ব্রহ্মা অগ্নিকে (দ্রঃ) পাঠান। অগ্নির তেজে উত্তপ্ত হয়ে মহাদেবের বীর্যপাত হয়। মহাদেবের বীর্য পৃথিবীতে পড়ে। পৃথিবী এই বীর্য ধারণ করতে না পেরে অগ্নিতে ফেলে দেন। অন্য মতে মহাদেব তাঁর পতিত বীর্য অগ্নিকে (দ্রঃ) ধারণ করতে বলেন। অগ্নি অসমর্থ হয়ে এই বীর্য শরবনে ফেলে দেন। অন্য মতে অগ্নি এই বীর্য গঙ্গাতে ফেলে দেন এবং গঙ্গা অসমর্থ হয়ে হিমালয়ের পাশে শরবনে এই বীর্য ত্যাগ করেন। শরবনে এই বীর্য সুন্দর একটি বালকে পরিণত হয়। আর এক মতে শরবনে ফেলে দিলে দেবতারা তখন ছজন কৃত্তিকাকে এই বীর্য রক্ষা করার জন্য পাঠান। এঁরা এই বীর্য পান করে গর্ভবতী হয়ে ছয়টি সন্তান প্রসব করেন। এবং এই ছয়টি ছেলে জুড়ে গিয়ে একটি ছেলে কার্তিকে পরিণত হন। গঙ্গা মহাদেবের বীর্য ফেলে দিয়ে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে গিয়ে আশ্রয় নেন। পরে দেবী বসুন্ধরা এই ছেলেকে গ্রহণ করেন এবং শরবনে এই ছেলে বড় হতে থাকে। অন্য মতে কৃত্তিকারা এসে ইতিমধ্যে জন্মলব্ধ বালককে স্তন্য দান করে পালন করেন। আর এক মতে পার্বতী নিজে কৃত্তিকাদের পাঠিয়েছিলেন। পরে পার্বতী কার্তিককে চেয়ে নেন। কার্তিকের স্ত্রী দেবসেনা। দ্রঃ রজ, বিশাখ। আর এক মতে হরপার্বতীর সম্ভোগে সারা পৃথিবী কাঁপতে থাকে; সৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। দেবতাদের অনুরোধে মহাদেব তখন বিরত হন; শিবের স্খলিত বীর্য পৃথিবীতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দেবতাদের

অনুরোধে এই তেজ/বীর্য অগ্নি গ্রহণ করে পুড়িয়ে ছাই করে দেন; গাদা হয়ে ছাই যেখানে পড়ে থাকে সে স্থানে শরবন গড়ে ওঠে। অগ্নি শিবের তেজ গ্রহণ করে পুড়িয়ে ছাই করে দিলেও কিছু তেজ তাঁর মধ্যে ছিল; অগ্নি সহ্য করতে পারছিলেন না। দেবতাদের গিয়ে জানান. দেবতারা অগ্নিকে ব্রহ্মার কাছে পাঠান। কিন্তু পথে গঙ্গার সঙ্গে দেখা হয় এবং গঙ্গাকে এই বীর্য ধারণ করতে দেন। ৫০০০ বছর অগ্নি এই তেজ/বীর্য ধারণ করেছিলেন ফলে তাঁর দেহের রঙ সোনার মত হয়ে যায় এবং নাম হয় হিরণ্যরেতঃ। ৫০০০ বছরেও গঙ্গার কোন সন্তান হয় না; এবং গঙ্গাও এই তেজ সহ্য করতে পারছিলেন না। ফলে ব্রহ্মার কাছে যান এবং ব্রহ্মার নির্দেশে উদয় পর্বতে শরবনে (স্যাকারাম মুঞ্জা—রস্ক) এই বীর্য মুখ থেকে বার করে দেন। এবং ১০০০ বছর পরে এই বীর্য একটি শিশুতে পরিণত হয়। শিবের তেজে এই শরবন ও এখানে পশুপাখী গাছপালা যা কিছু ছিল সোনা ওসোনার মত রঙ হয়ে যায়।

দেবতাদের অনুরোধে মহাদেব বিরত হলে পুত্র কামনায় এই ভাবে বাধা পেয়ে পার্বতী দেবতাদের শাপ দেন 'যুষ্মাকম অপ্রজাঃ সন্তু পত্নয়ঃ' এবং পৃথিবীকে শাপ দেন বহুভোগ্যা হবে এবং কোন দিন কোন সন্তান হবে না।

শিশু জন্মেই বজ্র নির্ঘোষে কাঁদতে থাকেন। ছজন কৃত্তিকা এসে স্তন্যদান করতে থাকেন। এই ছজনের দিকে দেখতে দেখতে শিশুর ছয়টি মুখমণ্ডল হয়; নাম হয় কার্তিকেয় ও ষড়ানন। ব্রহ্মার কাছে খবর পেয়ে অগ্নি দেখতে আসেন, পথে গঙ্গার সঙ্গে দেখা হয়। দুজনে তর্ক হয় এ কার ছেলে। বিষ্ণু এসে তখন শিবের কাছে গিয়ে এই তর্কের সমাধান করতে বলেন। শিবের কাছে এলে শিব পার্বতীকে নিয়ে শরবনে আসেন। এখানে এসে মহাদেব বলেন দেখা যাক শিশু কার দিকে চেয়ে দেখে। শিবের উদ্দেশ্য জানতে পেরে কুমার, বিশাখ, শাখ, ও নৈগমেয় এই চারটি অংশে ভাগ হয়ে শিশু শিব পার্বতী গঙ্গা ও অগ্নির দিকে যথাক্রমে চেয়ে থাকে। শিব তখন বলেন কৃত্তিকাদের সন্তান হিসাবে কার্তিকেয়, গঙ্গার ছেলে হিসাবে কুমার, পার্বতীর ছেলে হিসাবে স্কন্দ, শিবের ছেলে হিসাবে গুহ, এবং অগ্নির ছেলে হিসাবে মহাসেন নামে পরিচিত হবেন। মহাদেব এরপর দেবতাদের স্মরণ করেন; সকলে এলে শিশুকে কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী তীরে নিয়ে গিয়ে শিব ও বিষ্ণু একে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন। পার্বতী তারপর শিশুকে কোলে তুলে নেন। দেবতারা তাদের নানা অস্ত্র ইত্যাদি দেন এবং সহায় হিসাবে অনেকগুলি প্রমথ ইত্যাদি দান করেন। শিবের দেওয়া প্রমথ ঘণ্টাকর্ণ, লোহিতাক্ষ, নন্দিসেন ও কুমুদমালী। গরুড় বাহন হিসাবে নিজের ছেলে ময়ূরকে দান করেন। এর পর তীব্র যুদ্ধ হয়। তারক, তারকের তিন ছেলে, মহিষাসুর, বলির ছেলে বাণ সকলে যুদ্ধে আসেন। যুদ্ধে তারক ও অন্যান্য বহু অসুর নিহত হন। বাকি সব পালিয়ে যান।

এরপর কার্তিকের বয়স হতে থাকে; পার্বতীর সীমাহীন আদরে একেবারে নষ্ট হয়ে যান। কিছু দেব রমণীদেরও বলাৎকার করে বসেন। সকলে তখন পার্বতীর কাছে এসে অভিযোগ করেন। পার্বতী তৎক্ষণাৎ কার্তিককে ডেকে পাঠান এবং দেখান এই সমস্ত দেবপত্নীদের মধ্যে পার্বতীরই অংশ রয়েছে। কার্তিক তখন অনুশোচনায় শপথ করেন এর পর সমস্ত নারীকে তিনি পার্বতী বলে শ্রদ্ধা করবেন।

খাণ্ডবদাহনের সময় কৃষ্ণ ও অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন। ক্রৌঞ্চ পর্বতকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। দেবসেনার সঙ্গে কার্তিকের যখন বিয়ে হয় তখন কার্তিক কৃত্তিকাদের বলেছিলেন : আপনারা অপেক্ষা করুন ; আমার ১৬ বছর বয়স হলে আমি শিশু হত্যা করব এবং এই সব শিশুদের ভক্ষ্য হিসাবে আপনাদের দিয়ে যাব। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কার্তিকের দেহ থেকে অগ্নির মত উজ্জ্বল এক পুরুষ বার হয়ে আসে ; এর নাম রৌদ্রগ্রহ, বা পূতনাগ্রহ বা শকুনিগ্রহ। অপর মতে পালিকা মাতৃকাগণ ও স্কন্দ থেকে জন্ম কয়েকজন কুমার ও কুমারীকে স্কন্দগ্রহ (= অপদেবতা) বলা হয় : ষোলবছর পর্যন্ত বালকবালিকাদের এঁরা অমঙ্গল ঘটান।

কার্তিকেয় বৈদিক যুগের দেবতা নন। বর্তমানেও এঁর পূজার প্রচলন সে রকম ব্যাপক নয়। সংহিতা ও আরণ্যক যুগের পরে এঁর পরিকল্পনা রূপ পায় এবং এক দিন এঁর পূজা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। কার্তিকেয়ের অনেক নাম ; স্কন্দ পুরাণে ১০৮ নাম রয়েয়েছ : এগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত নামগুলি হচ্ছে :— কার্তিকেয়, স্কন্দ, কুমার, বিশাখ, মহাসেন, ব্রহ্মণ্য, সুব্রহ্মণ্য, নৈগমেয়, সনৎকুমার, গুহ, জয়ন্ত, ষড়ানন। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথম দেখা যায় ঋষি সনৎকুমার ও স্কন্দ অভিন্ন। মহাভারত ইত্যাদিতে সনৎকুমার ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ মানসপুত্র, মহাজ্ঞানী, পরমর্ষি। মহাভারতে শান্তিপর্বে স্কন্দকে সনৎকুমার বলা হয়েছে। শল্য পর্বে আছে ব্রহ্মা স্কন্দকে দেব সেনাপতি করে দেন। দেবসেনার সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। বায়ু কূর্ম ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে ব্রহ্মার ধ্যান প্রসূত অষ্টনাম ও অষ্টতনুর মধ্যে শিবের পাশুপতী তনুর নাম অগ্নি ; অগ্নির স্ত্রী স্বাহা এবং ছেলে স্কন্দ।

বেদোত্তর সাহিত্যে কার্তিকেয়ের জন্মের সঙ্গে স্বাহা, রুদ্র, শিব, অগ্নি, গঙ্গা ও ছজন কৃত্তিকাকে জড়িয়ে নানা কাহিনী তৈরি হয়েছে। বামন পুরাণে গঙ্গার পরিবর্তে কুটিলাকে অগ্নির কাছ থেকে মহাদেবের বীর্য গ্রহণ করতে দেখা যায়। এতগুলি দেবতাকে মিলিয়ে কার্তিকেয়ের এই বিচিত্র জন্মকাহিনী গড়ে তোলার কারণ কি স্পষ্ট নয়। প্রাচীন কালে কার্তিকেয়ের পূজার সঙ্গে সূর্যপূজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল মনে হয়। মহাভারত পুরাণ ও শিল্পশাস্ত্রে কার্তিকের সঙ্গে এবং হাতে মুরগি রাখার নির্দেশ আছে। কার্তিকেয়ের মুরগিযুক্ত বহু প্রাচীন মূর্তিও পাওয়া গেছে। এই মুরগি সূর্যের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী (নিরুক্ত ১২-১৩) বা সম্পর্কিত। বামন ও স্কন্দ পুরাণে দেখা যায় অরুণ কার্তিকেয়কে মুরগি উপহার দিচ্ছেন। কানপুরে লালা ভগত গ্রামে কাতিকেয় উপাসনার নিদর্শন রূপ কুক্কুট শীর্ষ যে ভগ্নাবশেষ স্তম্ভ (খৃ ২-শতক) আছে তার গায়ে সূর্যমূর্তি ক্ষোদিত রয়েছে। ভবিষ্য পুরাণে স্কন্দ সূর্যের অনুচর এবং সূর্যের বাঁদিকে অবস্থিত। সূর্যের পার্শ্বদেবতা রাজ্ঞ ও কার্তিকেয় অভিন্ন বলা হয়েছে। মৎস্য পুরাণে নবগ্রহ পূজার সঙ্গে কার্তিকেয় জড়িত। অর্থাৎ সূর্যও কার্তিকেয় পূজার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

এ ছাড়া কার্তিকেয়ের কল্পনায় ও পূজায় লৌকিক ধর্মের প্রভাব অনেকখানি এসে মিশেছিল। বৌদ্ধ ও জৈন পুরাণেও কার্তিকেয় গৃহীত হয়েছেন। পালি সাহিত্যে স্কন্দ, কুমার ও ময়ূরবাহন রূপে বা শিবের সঙ্গে কার্তিকেয় উপস্থিত রয়েছেন। বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান শাখায়ও কার্তিকেয়র উল্লেখ রয়েছে। জৈন শাস্ত্রে

জয়ন্ত নামে অনুত্তর দেবতা হিসাবে বর্তমানে। জৈন ধর্মশাস্ত্রে কুমার ও ষন্মুখ নামে যে দুজন যক্ষ রয়েছে তারা কার্তিকেয়র একটি সংস্করণ মাত্র। জৈন কাহিনীতে আছে হরিনেগমেসি বা নৈগমেষ ছিলেন ইন্দ্রের সেনাপতি এবং মহাবীরকে ইনি ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভ থেকে ক্ষত্রিয় ত্রিশলার গর্ভে স্থানান্তরিত করে দিয়েছিলেন। এই নৈগমেয় নাম সাদৃশ্যে ও জীবিকাতে ব্রাহ্মণ্য দেবতা নৈগমেয় অর্থাৎ কার্তিকেয়। এছাড়াও জৈন ভাস্কর্যে নৈগমেয় ছাগমুখ এবং মহাভারতে ও পুরাণাদিতেও কার্তিকেয় মুখ ছাগ ; এবং তাঁর সপ্ত অনুচরী মাতৃগর্ভ থেকে ভ্রূণ অপহরণ করেন।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবে পরস্পর বিরোধী উপাদানের সংমিশ্রণে কার্তিকেয়র এই রূপায়ণ। সনৎকুমার রূপে কার্তিকেয় বেদের উপদেষ্টা। দক্ষিণ ভারতে সুব্রহ্মণ্য মূর্তিতে পূজিত এবং এই সুব্রহ্মণ্য তাঁর পিতা মহাদেবকে প্রণব শিক্ষা দিয়েছিলেন। একদা দস্যু তস্করের উপাস্য দেবতা ছিলেন কার্তিকেয় ; মৃচ্ছকটিক নাটকে তস্করদের কার্তিকেয় পুত্র বলা হয়েছে ; চৌর্য শাস্ত্রের প্রবক্তাও সেখানে কার্তিকেয়। প্রাচীন ভারতীয় চৌর্যশাস্ত্রের নাম ষন্মুখকল্প। উন্মাদ রোগ, অপস্মার রোগ প্রভৃতির এবং ডাকিনী, শাকিনী, ভ্রূণাপহারিণী অনুচরীদের দেবতাও কার্তিকেয়। এই সকল রৌদ্র-কর্মের মধ্যে দিয়ে দেখলে কার্তিকেয় ভয়াল বৈদিক দেবতা রুদ্রের একটি সংস্করণ। আবার কার্তিকেয় কর্তৃক বিভিন্ন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কাহিনী ও কুশস্থলী নামে কার্তিকেয় তীর্থে ব্রহ্মার দ্বারা শিব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেখা যায় শৈব প্রভাবও কার্তিকেয়র পূজার মধ্যে এসে পড়েছিল। কার্তিকেয় ও তাঁর অনুচর বিশেষকে পুরাণে কোন কোন জায়গায় আরোগ্যকারীও বলা হয়েছে। ব্রহ্ম-পুরাণে কার্তিকেয়কে মুনি পত্নীদের সঙ্গে ব্যাভিচারে রত দেখা যায় ; এটা যেন অগ্নির কাছ থেকে পাওয়া চরিত্র দোষ। দেবসেনাপতি রূপে তারকাসুর নিধন করলেও কার্তিকেয়কে আবার ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্ব রূপেও পুরাণাদিতে দেখা যায়। এক মতে কার্তিকেয় চিরকুমার আর এক মতে এঁর স্ত্রী দেবসেনা। পদ্মপুরাণে কার্তিকেয়র বোন অশোকসুন্দরী (দ্রঃ), শিবপার্বতীর মেয়ে।

প্রাচীনকালে ভারতের সর্বত্র এঁর পূজা ব্যাপক প্রচলিত ছিল। অর্থশাস্ত্রে দুর্গমধ্যে জয়ন্ত বা কার্তিকেয়রও পূজাগৃহ নির্মাণের নির্দেশ আছে। মহাভাষ্যে আছে শিব, স্কন্দ, বিশাখ ইত্যাদি দেবতার প্রতিমা পূজার জন্য তৈরি করে বিক্রি করে মৌর্য রাজারা অর্থ সঞ্চয় করতেন। কুষাণরাজ হুবিষ্কের মুদ্রায় স্কন্দ, কুমার, বিশাখ, ও মহাসেন তিনজনই বর্তমান। পাঞ্জাবে যুদ্ধ ব্যবসায়ী যৌধেয় উপজাতি কার্তিকেয়র পরম ভক্ত ছিলেন এবং কার্তিকেয়র নামে মুদ্রা চালু করেছিলেন। মনে হয় যৌধেয়দের অনেকে নিজেদের রাজ্য কার্তিকেয়কে উৎসর্গ করে প্রতিনিধি রূপে রাজকার্য চালাতেন। এঁদের রাজধানী রোহিতক কার্তিকেয় উপাসনার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। গুপ্ত সম্রাট ১-ম কুমারগুপ্তের বিল্‌সদ স্তম্ভ লেখে কার্তিকেয়র মন্দির প্রসঙ্গ এবং সম্রাট স্কন্দ-গুপ্তের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ বিহার স্তম্ভ লেখে স্কন্দ ও মাতৃকাগণের উল্লেখ রয়েছে। অন্ধ্রের ইক্ষ্বাকু বংশীয়, বাদামির চালুক্য বংশীয়, ও বনবাসীর কদম্ববংশীয় রাজারা নিজেদের কার্তিকেয় দ্বারা সুরক্ষিত বলে বর্ণনা করে গেছেন। মেঘদূতে আছে

দেবগিরি স্কন্দ পূজার কেন্দ্র স্থান। কাব্য মীমাংসা ইত্যাদিতেও কার্তিকেয় নগর বা কার্তিকেয়পুর এই দেবতার পূজার ব্যাপকত্ব সূচনা করে। অবশ্য শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদির মত কোন সম্প্রদায় গড়ে ওঠে নি। বর্তমানে উত্তর ভারতে কার্তিকেয়ের পূজা সে রকম হয় না কিন্তু দক্ষিণ ভারতে ব্যাপক ভাবে হয়ে থাকে। কার্তিকেয়ষষ্ঠী, কুমারষষ্ঠী ইত্যাদি ব্রত থেকে এই পূজার একদা জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর। বাংলা দেশে গণিকামহলে জাঁকজমক করে এঁর পূজা হয়ে থাকে এবং এই পূজার পেছনে কোন ঐতিহ্য আছে কিনা স্পষ্ট নয়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে শিল্পশাস্ত্রগুলিতে কার্তিকেয়র নানাবিধ মূর্তিনির্মাণ প্রণালীর বিস্তারিত নির্দেশ রয়েছে। দক্ষিণ ভারতে কার্তিকের অনেকগুলি মন্দিরও আছে।

কার্তিক—দ্রঃ কালপুরুষ।

কার্য-কারণ—ন্যায়-বৈশেষিকে কার্য-কারণের স্বরূপ লোকপ্রচলিত ধারণারই অনুরূপ। ভারতীয় দর্শনে কার্যকারণ বাদের দুটি ধারা (স্থূল) দেখা যায়। ন্যায় বৈশেষিক মতে এর নাম অসৎকার্যবাদ এবং সাংখ্যবেদান্ত মতে এর নাম সৎকার্যবাদ। সৎকার্যবাদ অর্থে বীজ অঙ্কুরের কারণ বটে কিন্তু বীজের মধ্যে অঙ্কুর সৎ। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে কার্যের উৎপাদক কারণ তিন প্রকার সমবায়ী, অসমবায়ী, ও নিমিত্ত। সাংখ্য বেদান্ত মতে এই কারণ দুরকম:—উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। মীমাংসা, সাংখ্য ও বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শন মতে কারণের মধ্যে কার্য উৎপাদন শক্তি রয়েছে, এই জন্য কারণ থেকে কার্যের উৎপত্তি ; ন্যায় বৈশেষিক মতে সব সময় এটি সত্য নয়।

কার্লা—মালাব্‌লি রেল স্টেসনের প্রায় ৫ কি-মি উত্তরে পুনা জেলার গ্রাম। এই গ্রামের পাশে প্রাচীন বলুরক পর্বত। এই পাহাড়ে ১১০ মিটার উচ্চে বারটি শৈলখাত বৌদ্ধ বিহার, কয়েকটি শৈলখাত জলাধার ও একটি চৈত্যগৃহ বিদ্যমান। খৃষ্টীয় ৭ শতক পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি জীবিত ছিল। এখানকার বিহারগুলির মধ্যে অন্তত দুটি গুপ্ত-বাকাটক যুগের। চৈতগৃহটি শৈলখাত স্থাপত্য কলার অনবদ্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত ; এবং বিশ্বের প্রত্নকীর্তি রাজির অন্যতম। খৃষ্টীয় ২-শতকের দ্বিতীয় পাদের আগেই তৈরি হয়েছিল। বর্ষাকালে বলুরকের গুহাবাসী শ্রমণদের ভরণপোষণের জন্য করজিকা (=সম্ভবতঃ বর্তমান কার্লা) গ্রামটি দেওয়া হয়েছিল। ধেনুকাকটের কয়েক জন যবন ও বনবাসী, সোপারা প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানের লোক ও অন্য বহুলোকের দানে এই চৈত্যটি তৈরি হয়েছিল।

উচ্চ শৈলখাত আবরণীযুক্ত বারান্দা ও তিনটি দ্বারপথে অধিগম্য কুলার-আকার-হলঘর নিয়ে এই চৈত্যগৃহ। মাঝখানের দ্বার পথের ওপরে ঘোড়ার খুরের আকার খিলান যুক্ত এবং খিলানের মাঝে কাঠের জালি দেওয়া গবাক্ষ। বারান্দার ভেতরের দেওয়ালে বিচিত্র কারুকার্য ও ভাস্কর্য। এই দেওয়ালে ৬-টি প্রাণবন্ত মিথুন মূর্তি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। পাশের একটি দেওয়ালে তিনটি হাতীর সামনের দিক এমন ভাবে ক্ষোদিত যে মনে হয় বহুতলা সৌধাবলী কাঁধে বহন করছে। দেওয়ালগুলিতে বুদ্ধদেবের উদ্গত মূর্তিগুলি খৃ ৬-শতকের সংযোজনা। হলঘরের মধ্যে থামগুলি কুলার মত সাজান ফলে ঘরটি তিন ভাগে ভাগ হয়ে পড়েছে। কুলার মধ্যভাগ ও কুলার সামনে সমাবেশ স্থান এবং পাশে ঘুরান বারান্দা। কুলার মধ্যভাগের শেষপ্রান্তে শিলা

নির্মিত স্তূপ। স্তূপটির মেধিতে দুটি চত্বর। স্তূপের মাথায় কারুকার্য খচিত কাঠের ছাতা। সম্মুখ সারের এবং স্তূপের পেছন দিকের স্তম্ভগুলি অনলংকৃত ও আটকোণা। অন্য স্তম্ভগুলির মাথায় দু জোড়া জন্তুপৃষ্ঠারোহীর প্রতিমূর্তি। প্রতি জোড়ায় সাধারণত একটি পুরুষ ও একটি মেয়ে; আবার দু একটিতে কেবল দুটি মেয়ে। নাভিস্থানের খিলান-ছাদের নীচে নির্মাণের সময়কার কাঠের কড়িবরগা এখনও বিদ্যমান। চৈত্য-গৃহের সামনে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ; এই প্রাঙ্গণের দুপাশে একটি করে স্তম্ভ ছিল। বাঁ দিকের স্তম্ভটির মাথায় চারটি সিংহের প্রতিমূর্তি রয়েছে। দক্ষিণ পাশের স্তম্ভটি ভেঙ্গে অর্বাচীন একবীরা মন্দিরটি সম্ভবত নির্মিত হয়েছিল। চৈত্যগৃহের সমসাময়িক বিহার-গুলির বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। যেগুলি আছে সেগুলি সে রকম কিছু নয়। সামান্য কয়েকটি প্রকোষ্ঠে শৈলখাত শয়ন স্থান আছে। কয়েকটিতে খৃ-৬ শতকের কাছাকাছি সময়ের বুদ্ধদেবের ক্ষোদিত মূর্তি রয়েছে। কয়েকটি মূর্তির মাথার প্রায় ওপরে একটি করে মুকুট ধরা রয়েছে। ৬ ও ১১ নং বিহার দুটি গুপ্ত বাকাটক যুগের। ৬ নম্বরের দেওয়ালে ধর্মচক্র প্রবর্তন মুদ্রাতে বুদ্ধদেবের দুটি মূর্তি। ১১নং বিহারের কয়েকটি প্রকোষ্ঠ অসমাপ্ত; হলঘরের দেওয়ালে বোধিসত্ত্ব সহ বুদ্ধমূর্তি রয়েছে।

কাল—প্রাচীন ভারতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত চার যাম বা প্রহর এবং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় চার যাম বা প্রহর। অর্থাৎ মোট ৮ প্রহরে ২৪ ঘণ্টায় এক অহোরাত্র। দণ্ড যন্ত্র (সূর্যঘড়ি) সাহায্যেও আর এক হিসাব হত; এবং এক মুহূর্ত=দিবাকালের বা রাত্রিকালের ১/১৫ অংশ ধরা হত। দিন ও রাত ছোট বড় হয় বলে মুহূর্ত কখনো সমান হয় না। কেবল বাসন্ত বিষুব সংক্রান্তি এবং জলবিষুব সংক্রান্তির দিন রাত ও দিনের মুহূর্ত সমান হয় এবং এই দুটি দিনে ১ প্রহর=১/৮×২৪=৩ ঘণ্টা; ১ মুহূর্ত= =১/১৫×১২=৪৮ মিনিট। অর্থাৎ ৩০ মুহূর্তে এক অহোরাত্র। সূর্যের অর্দ্ধোদয় থেকে তিনটি মুহূর্ত মিলে প্রাতঃকাল; পরবর্তী তিনটি মুহূর্ত সংগব কাল, সংগবের পর তিন মুহূর্ত মধ্যাহ্ন, পরবর্তী তিন অপরাহ্ণ। সন্ধ্যার পরিমাণও সব সময়ই তিন মুহূর্ত নির্দিষ্ট ছিল। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে এই রকম হিসাব ছিল। পরে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের সময় (৩০০-১২০০খৃ) অহোরাত্র=৬০ দণ্ড বা ঘটিকা। প্রতি দণ্ডে ৬০ পল এবং প্রতি পলে ৬০ বিপল এবং প্রতি পলে ৬ প্রাণ। এই গণণায় এক অহোরাত্র =৩৬০০ পল বা ২১৬০০০ বিপল। এই এক দণ্ড=ঘটিকা=২৪ মিনিট এবং এক প্রাণ=৪ সেকেণ্ড। আর এক হিসাবে দুটি পাতা ওপর ওপর স্থাপন করে একটি সূচ দিয়ে বিদ্ধ করলে প্রথম পাতাটি থেকে দ্বিতীয় পাতাতে সূচ যেতে যে সময় লাগে তাকে বলা হয় অল্পকাল। অল্পকাল×৩০=ত্রুটি; ত্রুটি×৩০=কাল; কাল×৩০=কাষ্ঠা ×১০=নিমেষ (=মাত্রা)×৪ =গণিত×১০=দীর্ঘশ্বাস×৩৬= ঘটিকা×৬০=অহোরাত্র। ১-চান্দ্রমাসে পিতৃলোকের ১ অহোরাত্র। ১২ চান্দ্র-মাসে=১ মানবীয় বৎসর=এক দৈব দিন। ৩৬০ দৈব দিনে=১ দৈব বৎসর। ৪৮০০ দৈব বর্ষে=১ সত্যযুগ; ৩৬০০ দৈব বর্ষে=এক ত্রেতাযুগ; ২৪,০০ দৈব বর্ষে=এক দ্বাপর; এবং ১২,০০ দৈব বর্ষে=এক কলিযুগ। অর্থাৎ এই চারটি যুগ মিলে ১২,০০০ দৈব বর্ষ=১ চতুর্যুগ বা এক দৈবযুগ। ৭১ দৈবযুগ (৭১× ১২,০০০ দৈব বৎসর) মিলে একটি মনুর রাজত্বকাল=১ মন্বন্তর। ১৪-টি মন্বন্তর=

১ কল্প = ব্রহ্মার দিবা ভাগ। ২ কল্পে ব্রহ্মার অহোরাত্র। ৩৬০ ব্রহ্ম অহোরাত্রে = ১ ব্রহ্ম বৎসর ; ১২০ ব্রহ্ম বৎসরে ব্রহ্মার জীবন = এক মহাকল্প। ব্রহ্মার মৃত্যুতে যে প্রলয় সেটি মহাপ্রলয়। বর্তমানে শ্বেত বরাহ কল্পে ৭ম মন্বন্তর। বৈবস্বত মনুর রাজত্ব-কাল চলেছে। এই মন্বন্তরের ২৭-শ 'চতুর্যুগ'-টি শেষ হয়েছে ; ২৮-শ চতুর্যুগের সত্য ত্রেতা দ্বাপর শেষ হয়ে কলিকাল চলেছে। ১-বৈশাখ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে ৫০৬৭ কল্যব্দের আরম্ভ।

অমাবস্যা থেকে পরবর্তী অমাবস্যাকে চান্দ্রমাস বলা হয়। চান্দ্রমাস ২৯ দি, ১২ ঘ, ৪০ মি, ২·৮ সে ধরা হয়। পঞ্জিকার কাজ চান্দ্রবৎসর ও সৌর বৎসরের সমন্বয় করা। ৬২ চান্দ্রমাসে ৬০টি সৌর মাস। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে ৬০ সৌর মাস অর্থাৎপাঁচ বছরে (১৮৩০ দিন)এক যুগ ধরা হয়। এই এক যুগে অতিরিক্ত দুটি চান্দ্রমাস হচ্ছে মল-মাস। উত্তরায়ণারম্ভ অমাবস্যায় ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের সংযোগে এই পঞ্চবর্ষ যুগের আরম্ভ। হিসাবের সুবিধার জন্য কালের আদি বিন্দু ৪৭১৩ খৃ-পূ ১লা জানুয়ারি ধরা হয়। এই দিন থেকে দিনের হিসাবকে জুলীয়-দিবস-হিসাব নাম দেওয়া হয়েছে। এই হিসাব অনুসারে কল্যব্দ = ১৭-১৮ ফে ৩১০২ খৃ-পূ = ৫৮৮৪৬৬ জুলীয়-দিবস ; শকাব্দ = ১৫-৩-৭৮ খৃষ্টাব্দ = ১৭৪৯৬২১ জু-দিবস। এই জুলীয় দিবস প্রবর্তনের প্রায় হাজার বছর আগে আর্যভট্ট অনুরূপদিবস ভিত্তিক গণনাই প্রবর্তন করেছিলেন এবং এর নাম অহর্গণ—গণনা। সূর্যসিদ্ধান্ত মতে সত্যযুগ ১৭২৮০০০ + ত্রেতা = ১২৯৬০০০ + দ্বাপর = ৮৬৪০০০ + কলি = ৪৩২,০০০ = ৪৩২,০০০০ যুগে এক মহাযুগ। আর্যভট্টের মতে ১৫৭৭৯১৭৮০০ দিনে এক মহাযুগ এবং এর ফলে আর্যভট্ট ও বরাহমিহিরের বর্ষমান = ১৫৭৭৯১৭৮০০/৪৩২,০০০০ = ৩৬৫.২৫৮৭৫ দি = ৩৬৫ দি, ৬ঘ, ১২মি, ৩৬সে।

ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে অনাদি অনন্ত মহাকাল নবদ্রব্যের অন্যতম। এই মহাকাল অপ্রত্যক্ষ এবং অনুমেয়। কোন কাজের দ্বারা অবচ্ছিন্ন কালকে খণ্ডকাল বলা হয়। খণ্ডকাল সাদি সান্ত ও প্রত্যক্ষ। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, পূর্বকালীন, সমকালীন, পরকালীন ইত্যাদি বিশেষণ মহাকালের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। মহাকাল ও খণ্ডকাল দুইটি জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ সদ্‌বস্তু। সাংখ্য মহাকাল বলে কিছু স্বীকার করে না। সাংখ্য মতে কাল হচ্ছে পদার্থের অবস্থা মাত্র। শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে কালকে ঈশ্বর সৃষ্ট বলেছেন। অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু হিসাবে কাল খণ্ডকাল এবং অনাদি বা মহাকাল নয়। কোন কোন মায়াবাদী মহাকালের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং মহাকালকে অবিদ্যার নামান্তর মনে করেন। অর্থাৎ মায়াবাদীরা কালকে জগতের ন্যায় মিথ্যা অবভাস মাত্র মনে করেন। দ্রঃ যম, বৎসর।

কালকবৃক্ষীয়—কোশলে ক্ষেমদর্শী রাজার রাজত্বকালে প্রজারা রাজপুরুষদের অত্যাচারে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিল। এই সময়ে রাজার মিত্র কালকবৃক্ষীয় মুনি একটি পিঞ্জরাবদ্ধ কাক নিয়ে রাজার কাছে আসেন। মুনি তারপর সারা রাজ্য ঘুরে বেড়াতে থাকেন এবং প্রচার করতে থাকেন এই কাকের ভাষা তিনি বুঝতে পারেন ইত্যাদি। কিন্তু মুনি আসলে রাজপুরুষদের কাজকর্ম দেখতে থাকেন এবং রাজ প্রাসাদে এসে কাক বর্ণনা করছে বলে মন্ত্রীর অন্যায় কাজকর্ম ইত্যাদির বিবরণ দিতে থাকেন। মন্ত্রী ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং অনুচরেরা সেই দিন রাত্রিতে কাকটিকে বাণবিদ্ধ

করে হত্যা করে। পরদিন মুনি রাজাকে ব্যক্তিগত ভাবে সব ঘটনা জানালে রাজা প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। কালকবৃক্ষীয়কে মন্ত্রী করে দেন; দেশে সমৃদ্ধি ফিরে আসে। ক্ষেমদর্শীর কোষাগার একবার শূন্য হয়ে পড়লে রাজা জনক সেই সময় আক্রমণ করতে আসেন। কালকবৃক্ষীয়ের পরামর্শে রাজা জনকের মেয়েকে বিয়ে করলে দেশ আবার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

কালকা—কালিকা। কশ্যপের একটি স্ত্রী। রামায়ণ মহাভারত মতে দক্ষকন্যা। বিষ্ণু পুরাণে কালকা ও পুলোমা (দ্র) বৈশ্বানরের মেয়ে। দুজনেই কশ্যপের স্ত্রী। এঁদের সন্তান ৬০,০০০ দানব; এদের নাম নরকাসুর, পৌলম, কালঞ্জয় ও কালকেয় (দ্র)। এঁরা দুর্জয় দানব। তপস্যায় কালকা বর পেয়েছিলেন তাঁর সন্তান হবে কিন্তু কোন গর্ভ যন্ত্রণা পেতে হবে না। কালকা ব্রহ্মার কাছে আর একবার বর পেয়েছিলেন ছেলেরা তাঁর অমর হবে।

কালকামুখ—রাক্ষস প্রহস্তের ভাই। খরদূষণের সঙ্গে ছিল।

কালকূট—তীব্র বিষ। সমুদ্র মন্থনে উঠেছিল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে ত্রিভুবনে সকলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেব কণ্ঠে এই বিষ ধারণ করে সৃষ্টি রক্ষা করেন।

কালকেতু—(১) জনৈক ব্যাধের ছেলে। ইন্দ্রের ছেলে নীলাম্বর মহাদেবের শাপে ব্যাধ হয়ে জন্মান। (২) প্রসিদ্ধ অসুর রাজা। দুন্দুর পুত্র। একাবলীকে চুরি করে পাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কালকেয়—কশ্যপের ঔরসে কালকার (দ্র)/কালার গর্ভে জন্ম। দ্রঃ পুলোমা। সংখ্যায় ৬০,০০০। অনেক সময় বৃত্রের দুর্দান্ত অনুচর হয়ে যুদ্ধ করেছেন। বৃত্রের মৃত্যুর পর এঁরা ভয়ে সমুদ্রের নীচে লুকিয়ে থাকতেন; সংকল্প করেছিলেন ত্রিলোক ধ্বংস করবেন এবং রাত্রিবেলা উঠে এসে ব্রাহ্মণদের ও আশ্রমবাসীদের হত্যা করতেন। বশিষ্ট চ্যবন ও ভরদ্বাজের আশ্রমে বহু ক্ষতি করেছিলেন। দেবতারা তখন বিষ্ণুর কাছে যান এবং বিষ্ণুর পরামর্শে অগস্ত্যের কছে এসে সমুদ্র পান করতে অনুরোধ করেন। অগস্ত্য এক গণ্ডূষে সমুদ্র পান করলে দেবতারা এঁদের বিনাশ করেন। কিন্তু কালকেয়রা অবশ্য পাতালে পালিয়ে যান। মহাভারতে আছে কালকা এক জন মহাসুরী। হাজার বছর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে বর পান ছেলে কালকেয়রা দেবরাক্ষস ও নাগদের অবধ্য হবে এবং ব্রহ্মার তৈরি হিরণ্যপুর নামে দিব্য নগরে বাস করবে। এই কালকেয়রা একবার নিবাতকবচদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেবলোক আক্রমণ করতে থাকেন। এই সময়ে দেবলোকে অস্ত্রশিক্ষার পর অর্জুন গুরুদক্ষিণা হিসাবে রৌদ্র নামক পাশুপত অস্ত্রে এঁদের বিনাশ করেন।

কালচক্রযান—বজ্রযানের একটি শাখা হিসাবে উৎপন্ন। তান্ত্রিক বৌধর্মের একটি অঙ্গ। এই সম্প্রদায়ে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ অনুশীলন ছিল। কাল অর্থাৎ সময় এবং এর অংশ পানীপল, ঘটিকা, মুহূর্ত, শ্বাস, তিথি, পক্ষ ইত্যাদির সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন এই মতবাদীরা বাখ্যা করতেন। দ্বাদশ রাশিচক্রে সূর্যের সঞ্চারের দ্বারা দ্বাদশ নিদান সমন্বিত প্রতীত্য সমুৎপন্নের ব্যাখ্যা এঁদের একটি অভিনব চেষ্টা। ফলিত জ্যোতিষ সাহায্য মানুষের জীবনে গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব নিরূপণ

করতেন। এঁদের মত মানুষের ভৌতিক দেহে ত্রিজগতের সমস্ত কিছু অধিষ্ঠিত এবং ষড়ঙ্গযোগের সাহায্যে ইহা উপলব্ধি করা যায়। এই উপলব্ধি হলে কাল ও তার গতিকে ঠিক মত জানতে পেরে মানুষ জরাব্যাধি থেকে নিস্তার পাবে এবং জন্ম মৃত্যু চক্রের গতি বন্ধ হবে। তান্ত্রিক সম্প্রদায় হিসাবে কালচক্রযানীদের সাধনায় যোগশাস্ত্র ও মন্ত্র-মুদ্রা-মণ্ডল ইত্যাদির বিশেষ প্রভাব লক্ষণীয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বহু দেবদেবী ও বৈষ্ণব ও শাক্ত মতবাদ কালচক্রযানে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। কালচক্রতন্ত্র ও এর টীকা বিমলপ্রভায় ইসলাম ধর্মেরও উল্লেখ আছে। গুহ্য সমাজ ইত্যাদি গ্রন্থে যে বজ্রযানীয় আদি বুদ্ধ আছেন তিনিই কালচক্রযানীদের প্রধান দেবতা কালচক্র। ইনি ত্রিকালজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, উৎপাদব্যয় বর্জিত এবং সকল বুদ্ধের জনক।

কথিত আছে আশি বছর বয়সে অন্য মতে বোধিত্ব পাওয়ার পরের বছরেই গৌতম বুদ্ধ ভারতে ধান্যকটকে কালচক্রচান মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। যে পর্ষদে এই মতবাদ ব্যাখ্যা করা হয় সেখানে শম্ভলরাজ সুচন্দ্র ছিলেন এবং তিনিই শম্ভলদেশে এই মতবাদের মূলতন্ত্র রক্ষা করেন। নানা বিচারে মনে হয় এসিয়ায় শম্ভল নামক কোন দেশে (সম্ভবত পূর্ব-তুর্কিস্থানে তারিম অঞ্চলে) এর উৎপত্তি। তিব্বতী ঐতিহাসিক নড়পাদের (না-রোপা) শিষ্য চিলুপা বা পি-টো-পা শম্ভল দেশের উত্তর অঞ্চলে থেকে ভারতে এই মতবাদ নিয়ে আসেন। আনুমানিক ১০ শতকে এই মতবাদ ভারতে প্রবেশ করে ছড়িয়ে পড়ে। রাজা মহীপালের সময় পূর্ব ও উত্তর ভারতে এই মতবাদের রীতিমত চর্চা ছিল। নড়পাদ, অতীশ, চিলুপা, তিলোপা, সোমনাথ ইত্যাদি বৌদ্ধ পণ্ডিতরা এই মতবাদে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ১০২৬ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর হয়ে এই মতবাদ তিব্বতে যায় এবং এই সময়টিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিব্বতের বর্তমান বর্ষক্রম ১০২৬ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রবর্তিত হয়েছিল। তিব্বতে লামা বৌদ্ধ-ধর্মে আজও এই মতবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। সমগ্র তিব্বতের ধর্ম ও সমাজ জীবনে এই মতবাদ রূপান্তর এনেছিল। মূল সংস্কৃত বই তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং কিছু টীকাও তিব্বতিতে রচিত হয়। ১৪৪২ খৃষ্টাব্দের ব্রহ্মদেশে পাগান শিলালেখ থেকে মনে হয় ১৫-শতকে এই মতবাদ ব্রহ্মদেশেও অজানা ছিল না।

কালদ্বিজ—করবীর পুরে স্বার্থপর এক শূদ্র। যমরাজ এঁকে চারটি মন্বন্তর ধরে নরকে বাসের শাস্তি দেন। শাস্তি শেষ হলে সাপ হয়ে জন্মান এবং পাথরের ফাটলে অতি কষ্টে দিন কাটাতেন। এক বার আশ্বিন পূর্ণিমান্তে কিছু খই কড়ি এই সাপ (কাল দ্বিজ) ছুঁড়ে দেন এবং এগুলি বিষ্ণুর পায়ে এসে পড়ে এবং পাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে যান।

কালনেমি—(১) রাবণের মামা। শক্তিশেলে অচৈতন্য লক্ষ্মণকে বাঁচাবার জন্য হনুমান গন্ধমাদন থেকে ঔষধ আনতে গেলে হনুমানকে মারবার জন্য রাবণ এঁকে পাঠান। রাবণ কথা দিয়েছিলেন পুরস্কার হিসাবে অর্দ্ধেক রাজত্ব দেবেন। কালনেমি সঙ্গে সঙ্গে বিরাট পরিকল্পনা করে ফেলেন রাজ্যের কোন অর্দ্ধেক অংশ নেবেন। তার পর আগেই গন্ধমাদনে এসে উপস্থিত হয়ে হনুমানকে নিজের আশ্রমে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু হনুমান এই আতিথ্য না নিয়ে জলাশয়ে স্নান

করতে গিয়ে এক কুমীরের মুখে পড়েন। দক্ষের শাপে এক অপ্সরা এই কুমীর হয়েছিল। হনুমান একে নিহত করলে অপ্সরা মুক্তি পেয়ে কৃতজ্ঞতায় হনুমানকে সাবধান করে দেন। হনুমান ফিরে এসে কালনেমিকে আকাশে এমন ছুঁড়ে দেন যে কালনেমি একেবারে রাবণের সিংহাসনের ওপর এসে পড়েন ও মারা যান।
(২) এক রাক্ষস। বিষ্ণু এঁকে বিতাড়িত করলে রাবণের মাতামহ সুমালীর সঙ্গে পাতালে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। (৩) হিরণ্যকশিপুর ছেলে। দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতাদের হারিয়ে দিয়ে সর্ব লোকের ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ান। শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাভিলাষী হয়ে বিষ্ণুকে আক্রমণ করলে সুদর্শন চক্রে নিহত হন এবং গরুড় পাখার ঝাপটায় এঁর মৃত দেহ পৃথিবীতে ফেলে দেন। এই কালনেমিই উগ্রসেনের ছেলে হয়ে জন্মান।

কালপথ—বিশ্বামিত্রের ছেলে; দার্শনিক ও ব্রহ্মবাদী।

কালপুরুষ—(১) যম। তপস্বীর বেশে রামের জীবনের শেষ অঙ্কে রামের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। গোপনে কথা বলতে চান। লক্ষ্মণ (দ্র) দ্বারী নিযুক্ত হন। কালপুরুষ গোপনে নিজের মূর্তি ধারণ করে জানান ব্রহ্মার নির্দেশে তিনি এসেছেন এবং রামকে স্বর্গে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। (২) শীত ও বসন্ত রাতে আকাশে একটি সুপরিচিত নক্ষত্র মণ্ডল। সাতটি উজ্জ্বল এবং অনেকগুলি অনুজ্জ্বল তারা। শিশুমার প্রভৃতি মণ্ডলের মত সহজেই চোখে পড়ে। কালপুরুষে বাহু সূচক চার প্রান্তে চারটি উজ্জ্বল তারার নাম :—উত্তরপূর্বে আর্দ্রা (বেটেলজিউস), উত্তর পশ্চিমে গণেশ (বা কার্তিক; বেলাট্রিকস্), দক্ষিণ পশ্চিমে বাণরাজ (রাইজেল), কালপুরুষের মাথায় তিনটি অনুজ্জ্বল তারা; এদের মধ্যে উজ্জ্বল তারাটি মৃগশিরা (মাইসা)। কালপুরুষকে কতটা যোদ্ধার মত দেখতে; হাতে ধনুক বা ঢাল; কোমরে কোমর বন্ধ ও লম্বা তরবারি।

কালবেলা—সপ্তাহে প্রতিদিন নির্দিষ্ট এক যামার্দ্ধকে (দ্র) কালবেলা বলা হয়। এই সময়ে শুভ কাজ বর্জনীয়। বৃহস্পতি ও শনিবারে বারবেলার গুরুত্ব বেশি। বিয়ের পরদিন সমস্ত রাত্রিই কালরাত্রি। হিসাব :—

	রবি	সোম	মঙ্গ	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
কালবেলা	৫ যামর্দ্ধ	২	৬	৩	৭	৪	১, ৮
বারবেলা	৪	৭	২	৫	৮	৩	৬
কালরাত্রি	৬	৪	২	৭	৫	৩	১, ৮

কালভৈরব—শিবের এক অনুচর। মহাদেব নিজের অংশে এঁকে সৃষ্টি করে কাশীধাম রক্ষার ভার দেন। এঁর এক মাত্র কাজ দুষ্টের দমন। ব্রহ্মা নিজে কন্যা গমন করার জন্য কাশীতে শিবতত্ত্বজ্ঞান নিতে আসেন। মহাদেবের আদেশে কালভৈরব ব্রহ্মার একটি মাথা কেটে নেন। কাশীতে যেখানে এই মুণ্ড পড়ে সেই স্থানের নাম কপালমোচন দ্র কপালী।

কালমুখ—রাক্ষস ও মানুষের সন্তান। দক্ষিণ দিকে সহদেব এদের পরাজিত করেন।

কালযবন—একজন যবন রাজ। মহর্ষি গার্গ্যের ঔরসে গোপালীর গর্ভে জন্ম। গোপালী একজন শাপভ্রষ্ট অপ্সরা। পুত্র কামনায় গার্গ্য ১২-বছর কেবল লোহাচুর খেয়ে মহাদেবের তপস্যা করলে কালযবনের জন্ম হয়। এক অপুত্রক যবন রাজ একে পালন করেন এবং যবন রাজের পর ইনি রাজা হন। শিব/ব্রহ্মার কাছে ইনি বর পেয়েছিলেন যাদবদের পরাজিত করতে পারবেন। জরাসন্ধ এই কালযবনকে যাদবদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন। যাদবরা ভয়ে কৃষ্ণের পরামর্শে মথুরা থেকে দ্বারকায় পালিয়ে যান। কালযবনও পিছু পিছু এগিয়ে আসেন। কৃষ্ণ কালযবনের বরের কথা জানতেন ; এই জন্য পালাবার ছলে হিমালয়ে গুহায় ঘুমন্ত রাজা মুচুকুন্দের কাছে এসে হাজির হন। কালযবন এখানে এসে ঘুমন্ত রাজাকে কৃষ্ণ মনে করে লাথি মারেন। মুচুকুন্দের ঘুম ভেঙে যায় এবং তাঁর দৃষ্টিপাতে কালযবন ভস্মীভূত হন।

কালরাত্রি—(১) দ্রঃ কালবেলা। (২) একজন দেবতা ; কয়লা মতো কালো ; মুখ ও চোখ ফোলা। রক্তমাল্য ও রক্তবস্ত্র পরিধান ; হাতে পাশ।

কালা—কালকা (দ্র)।

কালিকা—কালকা (দ্র)।

কালিকাপুরাণ—একটি উপপুরাণ। গিরিজা, দেবী, কালী, ভদ্রকালী, মহামায়া প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্তির পূজার বিবরণ আছে। এই উপপুরাণে প্রতিপাদ্য আদ্যা-শক্তির পূজা।

কালিকেয়—রাজা সুবলের ছেলে। অভিমন্যুর হাতে মারা যান।

কালিদাস—সংস্কৃত সাহিত্যে বাল্মীকি ও বেদব্যাসের পর এঁর স্থান। জীবন ও জন্ম-কাল কিছুই জানা নাই। প্রবাদ প্রথম জীবনে মন্দমতি ছিলেন পরে পণ্ডিত হন। একটি মতে খৃ পূ ১-শতকে বিক্রমাদিত্যের সময়ে তাঁর নবরত্নের একজন ছিলেন। অপর মতে গুপ্তযুগে ৩০০-৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। খৃ ৬৩৪ আইহোলি শিলালিপিতে এঁর উল্লেখ আছে। হর্ষচরিতে (৭ শতকে) কালিদাসের উল্লেখ রয়েছে। তাঁর রচনা থেকে মনে হয় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, অলঙ্কার, ছন্দ, ব্যাকরণ, ষড়বেদ, ন্যায় ও প্রচলিত দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলিতে পণ্ডিত ছিলেন। সাংখ্য ও যোগের বহু তত্ত্ব ও পরিভাষিক শব্দ তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। প্রায় ৩০-টি ছন্দ ব্যবহার করেছেন। ত্রিমূর্তিকেই শ্রদ্ধা করতেন তবে মূলত নির্গুণব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। বর্ণাশ্রম ধর্মের পৃষ্ঠপোষক এবং সংযম ও স্বার্থত্যাগের সমর্থক। আত্মসংবৃত প্রেমের মঙ্গলময় সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে গেছেন। প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলে স্বীকার করেন নি। তপস্যার নির্মল বেদীতে প্রেমকে স্থাপন করেছেন। আসক্তি বিমূঢ় হলে তার প্রায়শ্চিত্ত অনিবার্য বার বার বলেছেন। বৈদর্ভী রীতিতে রচনা ; ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা তাঁর কাব্যে প্রধান ; অলঙ্কার ও গুণ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। রচনা :—অভিজ্ঞানশকুন্তলম, বিক্রমোর্বশীয়, মালবিকাগ্নিমিত্রম, নাটক ; রঘুবংশ, কুমারসম্ভব মহাকাব্য ; মেঘদূত ও ঋতুসংহার খণ্ডকাব্য। এ ছাড়া শ্রুতবোধ, নলোদয়, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গারতিলক, জ্যোতির্বিদাভরণ ইত্যাদি রচনাও তাঁর বলে প্রচলিত।

কালিবঙ্গা—সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর উপত্যকা খুঁড়ে হরপ্পা সভ্যতার ২৫টি বসতি-স্থল পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় কালিবঙ্গা। প্রাক্ হরপ্পীয় সভ্যতার

সংস্কৃতি কেন্দ্র ; এই সংস্কৃতির আর এক নাম সোথী সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির পর হরপ্পা সংস্কৃতি এখানে এসেছিল। এখানেও নগরের একাংশে একটি দুর্গিকা ছিল।

কালিন্দী—যমুনা (দ্র)।

কালী—দশ মহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা। শাক্তেরা আদ্যাশক্তি মনে করেন। চার হাত ; ডান দিকে দুহাতে খট্টাঙ্গ ও চন্দ্রহাস এবং বাঁ দিকে দুহাতে চর্ম ও পাশ। গলায় নরমুণ্ড, দেহে ব্যাঘ্রচর্ম। বড় বড় দাঁত ; রক্ত চক্ষু ; বিস্তৃত মুখ ; স্থূলকর্ণ ; বাহন কবন্ধ। পুরাণ ও তন্ত্রে কালীর উগ্র ও শান্ত দুটি রূপেরই বর্ণনা আছে। বিষ্ণু ধর্মোত্তরে ভদ্রকালীর রূপ শান্ত ও সুন্দর। দেবী মাহাত্ম্য, কারণাগম, চণ্ডীকল্প, ভবিষ্যপুরাণ, দেবীপুরাণ ইত্যাদিতে কালী বা মহাকালী উগ্ররূপা। প্রবাদ তন্ত্রসার রচয়িতা আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ দক্ষিণাকালীর প্রবর্তন করেন। কিন্তু তাঁর আগেও পূজা প্রচলিত ছিল। সিদ্ধকালী, ভদ্রকালী, গুহ্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, মহাকালী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপ প্রচলিত আছে। জ্যৈষ্ঠে ফলহারিণী ও মাঘে রটন্তী কালী পূজা হয়।

শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে হেরে গিয়ে দেবতার স্বর্গচ্যুত হয়ে দেবী আদ্যাশক্তি ভগবতীর স্তব করতে থাকেন। তখন ভগবতীর দেহ থেকে আর এক দেবী বার হয়ে আসেন। এই নতুন দেবীর নাম হয় কৌষিকী। দেহ থেকে কৌষিকী বার হয়ে গেলে আদ্যাশক্তি ভগবতীর রঙ কালো হয়ে যায় এবং কালী বা কালিকা নামে অভিহিত হন। পরে অবশ্য আবার মনোহর রূপ হয়েছিল। দ্রঃ কৌষিকী। উজ্জয়িনীতে কালীমন্দির প্রসিদ্ধ। চিদাম্বরম মন্দিরে প্রধান দেবী কালী, মহীশূরে চামুণ্ডী (কালী) প্রধান/গৃহদেবী ; কাঞ্চীতে কামাক্ষী, মাদুরাতে মীনাক্ষী এবং উত্তর কর্ণাটকে মূকাম্বিকা এগুলি কালীরই শান্ত মূর্তি।

কালীঘাট—আদি কলিকাতার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে বাংলার প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। দেবীর ৫১ পীঠের একটি। এখানে বিষ্ণুচক্রে দেবীর দক্ষিণ পায়ের আঙুল পড়েছিল। এখানে দেবী কালী ; ভৈরব নকুলেশ্বর। নকুলীশ বা নকুলেশ্বর প্রাচীন শৈব সম্প্রদায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রাচীন বলা হয় বটে কিন্তু অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন গ্রন্থে ও রঘুনন্দনের তীর্থতত্ত্বেও এর উল্লেখ নাই।

কালীয়—বিষধর সাপ। এক হাজার মাথা। গরুড়ের সঙ্গে নাগেদের বৈরিতার একটা মীমাংসা হয় ; ঠিক হয় গরুড়কে (দ্র) তাঁরা হবিঃর ভাগ দেবেন। কিন্তু কালীয় সম্মত হন না ; গরুড়কে ঘৃণা করতেন। ফলে যুদ্ধ হয় এবং হেরে গিয়ে সপরিবারে সমুদ্র ছেড়ে হ্রদে এসে আশ্রয় নেন। অন্য মতে যমুনার গর্তে আশ্রয় নেন। গরুড় জলের ধারে এর জন্য প্রতীক্ষা করে বসেছিলেন এবং মাছ ধরে ক্ষিদে মেটাতেন। গরুড়ের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য তীরে বাসকারী সৌভরি ঋষির শাপে ঐ জল বিষাক্ত ও গরুড়ের অপেয় হয়ে ওঠে। অন্য মতে গরুড়ের সঙ্গে কালীয়ের একদিন যুদ্ধ হয় ; পাখার ঝাপটায় জল ছিটকে সৌভরি ঋষির তপস্যায় বিঘ্ন হতে থাকে। ফলে সৌভরি শাপ দেন গরুড় এখান থেকে চলে যাক, ভবিষ্যতে কোন দিন এখানে এলে গরুড়ের মাথা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। ফলে কালীয় নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করতে থাকেন। এ দিকে কালীয়ের ভয়েও কেউ জলে নামতে পারতেন না এবং কালীয়ের

মুখ থেকে ক্রমাগত আগুন ও ধূম বার হতে থাকার ফলে তীরবর্তী দেশগুলি জল শূন্য হয়ে পড়ে। একটি মাত্র কদম গাছ সুস্থ ছিল কারণ অমৃত নিয়ে ফেরার পথে গরুড় এই গাছে এসে বসেছিলেন। এক দিন কয়েক জন রাখাল ও তাদের গরুগুলি এই জল খেয়ে মারা গেলে কৃষ্ণ ঐ কদম গাছ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কালীয় তার হাজার ফণায় তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরলে কৃষ্ণ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার ফণার ওপর উঠে নাচতে বা পা দিয়ে মাথা থেঁতলাতে থাকেন। কালীয়ের মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকে এবং কালীয়ের পুত্র-পরিবার কাতর হয়ে প্রাণভিক্ষা চান। কৃষ্ণ তখন তাকে সমুদ্রে রম্যক দ্বীপে ফিরে যেতে বলেন এবং আশ্বাস দেন তাঁর পায়ের চিহ্ন কালীয়ের মাথায় থাকবে এবং এই চিহ্ন দেখলে গরুড় আর শত্রুতা করবেন না। সপরিবারে কালীয় রমণক দ্বীপে গিয়ে বাস করতে থাকে; কৃষ্ণকে নিজের মাথার মণি উপহার দিয়ে যান। কশ্যপ কদ্রুর সন্তান শেষ, ঐরাবত, তক্ষক, কর্কোটক, কালীয়, মণি-নাগ ও পুরাণ-নাগ

কালেয়—কালকেয় (দ্র)।

কাশিরাজ—চন্দ্রবংশে রাজা কাশ-এর ছেলে। কাশিরাজের ছেলে দীর্ঘতমা। দীর্ঘতমার ছেলে ধন্বন্তরী। কাশিরাজের মেয়ে গান্দিনীকে যদু বংশের রাজা শ্বফল্ক বিয়ে করেন। গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর জন্মান। বন্ধু পৌণ্ড্রকবাসুদেবকে সাহায্য করতে গিয়ে কৃষ্ণের হাতে কাশিরাজ মারা যান। আরো বহু কাশিরাজ নামের উল্লেখ আছে।

কাশী—বারাণসী (দ্র)।

কাশ্যপ—(১) মহারাজ দশরথের একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। (২) জনৈক মুনি। এঁর ছেলে বিভাণ্ডক এবং নাতি ঋষ্যশৃঙ্গ। (৩) কশ্যপের ছেলে মহর্ষি কাশ্যপ। (৪) এক জন বিষ চিকিৎসক। রাজা পরীক্ষিৎকে (দ্র) রক্ষা করার জন্য আসছিলেন। পথে ব্রাহ্মণ বেশী তক্ষকের সঙ্গে দেখা হয়। এঁর অভিপ্রায় জানতে পেরে পরীক্ষার জন্য তক্ষক এক বটগাছে কামড় দেন। বটগাছ সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে গেলেও কাশ্যপ মন্ত্রবলে গাছটিকে আবার বাঁচিয়ে দেন। তক্ষক তখন ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধনরত্নের প্রলোভন দেখান এবং কাশ্যপও ধ্যানে জানতে পারেন পরীক্ষিতের আয়ু শেষ হয়েছে। ফলে তিনি তক্ষকের কাছে অভীষ্ট অর্থ নিয়ে ফিরে যান।

এই নামে অপর মুনিও দেখা যায় আবার বহুস্থানে কশ্যপকে ও কাশ্যপ বলা হয়েছে। অর্থাৎ দুটি নাম মিশে খিচুড়ি হয়ে আছে। এই কাশ্যপকে মরীচি পুত্র অর্থাৎ ব্রহ্মার নাতিও বলা হয়েছে। কাশ্যম্ (মদ) পান করতেন বলে নাম কাশ্যপ। অনেক জায়গায় শকুন্তলার পালক পিতা কণ্বকেও কাশ্যপ বলা হইয়াছে। এই কণ্ব প্রীতিরথের নাতি এবং মেধাতিথির ছেলে; চন্দ্রবংশীয় এক জন রাজর্ষি। অর্থাৎ দুষ্মন্ত ও কাশ্যপ দুজনে খুড়তুতো জাড়তুতো ভাই। অর্থাৎ কশ্যপ বংশীয় নয়। মহাভারতে কণ্ব নামের পরিবর্তে বহুস্থানে কাশ্যপ ব্যবহৃত হয়েছে। পরীক্ষিতকে কামড়াতে আসার সময় তক্ষক যাঁকে ধনরত্ন দিয়ে ফেরান তাঁর নাম কাশ্যপ দেখা যায়। কিন্তু ইনি হয়তো প্রকৃতই কশ্যপ; কেননা সর্পমন্ত্রের প্রথম স্রষ্টা কশ্যপ। ঋষ্যশৃঙ্গের পিতাও কাশ্যপ বলে উল্লেখিত হয়। (২) বসুদেবের এক পুরোহিত, পাণ্ডবদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। (৩) কশ্যপ পুত্র, একটি অগ্নি।

কাশ্যপদ্বীপ—চন্দ্রে শশকচিহ্ন।
কাশ্যপী—সমস্ত পৃথিবী কশ্যপকে দান করা হয়েছিল বলে পৃথিবীর একটি নাম।
কাশ্য—(১) কাশী রাজ; অপর নাম ক্রোধবশ, অম্বা অম্বিকা ইত্যাদির পিতা।
কাশ্যা—কাশীরাজের মেয়ে। অন্য নাম বপুষ্টমা। স্বামী রাজা জন্মেজয় (দ্র)। কাশ্যার দুই ছেলে চন্দ্রাপীড় ও সূর্য্যাপীড়। জন্মেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে স্ত্রীকে সংযতা হয়ে থাকতে বলেন, কিন্তু ইন্দ্র গোপনে বপুষ্টমার সংযম নষ্ট করেন ফলে যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটে। রাজা তখন স্ত্রীকে ত্যাগ করতে কৃতসংকল্প হন কিন্তু বিশ্বাবসুর পরামর্শে শান্ত হন। দ্রঃ আহুক।
কিংকর—একজন রাক্ষস। কল্মাষপাদের (দ্র) দেহে প্রবেশ করে এবং বশিষ্ঠের সমস্ত ছেলেদের কল্মষপাদকে দিয়ে হত্যা করেন।
কিন্নর—কুৎসিত নর। অন্য নাম কিম্পুরুষ। দুটি ভাগ এক ভাগে মুখ ঘোড়ার মত দেহ মনুষের আর এক ভাগের মুখ মানুষের, দেহ ঘোড়ার। এরা নৃত্যগীত বিশারদ এবং বাদ্য এঁদের অত্যন্ত প্রিয়। (১) কশ্যপ ও অরিষ্টার সন্তান। এঁদের রাজা চিত্ররথ। হিমালয়ে কৈলাসে বাস। (২) বিদ্যাধর যক্ষ গন্ধর্ব ইত্যাদি দশপ্রকার দেবযোনির অন্যতম। ব্রহ্মার ছায়া থেকে জন্ম; রাজা কুবের। (৩) অশ্বমুখের সন্তান; অনেকগুলি গণে বিভক্ত। প্রাচীন ভারতের ধর্ম সাহিত্য ও শিল্পকলায় এঁদের বিশেষ স্থান রয়েছে। জৈনধর্ম গ্রন্থে এঁরা ব্যন্তর দেবতা।
কিমিন্দম্—একজন মহর্ষি। হরিণরূপ ধরে স্ত্রী সঙ্গ করছিলেন। রাজা পাণ্ডু হরিণ মনে করে তীর বিদ্ধ করেন। রাজা পাণ্ডুও স্ত্রী সঙ্গ করতে গেলে মারা যাবেন শাপ দিয়ে মহর্ষি দেহত্যাগ করেন। না জেনে ব্রহ্মহত্যা করেছেন বলে কোন শাপ দেন নি।
কিম্পুরুষ—(১) অন্য নাম কিন্নর (দ্র)। (২) অগ্নীধ্র (দ্র) পূর্বচিত্তির এক ছেলে; কিম্পুরুষ শাসিত দেশের নাম কিম্পুরুষবর্ষ। জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত হেমকূট পাহাড় ঘেরা, অন্য মতে দক্ষিণ দিকে একটি দেশ। আর এক মতে হিমালয়ের উত্তরে। পরবর্তী জীবন হনুমান এখানে কাটান। অন্য মতে কিম্পুরুষরা পুলহের ছেলে। আর এক মতে এঁদের মা যক্ষিণী।
কিরাত—ভারতের প্রাচীনতম একটি আদিবাসী। কিরাত=ভোট ব্রহ্ম। চীনা ও ভোট জাতির আকৃতির সঙ্গে কিছু মিল আছে। সংস্কৃতে কিরাত অর্থে সাধারণ পার্বত্য অসভ্য উপজাতি। পর্বত ও অরণ্যে এদের বাস। কোল শবর ইত্যাদি অস্ট্রিক ভাষাভাষী থেকে এরা পৃথক। ব্রহ্মপুত্র বিধৌত অঞ্চলে ভোটদেশের কতকাংশে; পূর্ব নেপাল ও ত্রিপুরা রাজ্যে মুখ্যত এদের বাস বলা হত। কিরাতদের প্রাচীনতম উল্লেখ যজুর্বেদে। বাজসনেয়ি সংহিতা ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এঁদের পার্বত্য গুহাবাসী বলা হয়েছে। রামায়ণে এদের পাহাড় ও দ্বীপে বাসকারী এবং কাঁচা মাংস খায় বলে বর্ণিত। মহাভারতে ভীম বিদেহ রাজ্য অতিক্রম করে পূর্বাঞ্চলে সাতটি কিরাত রাজাকে পরাজিত করেন। মহাভারতে সভাপর্বে আছে কিরাতরা ভীষণ নিষ্ঠুর এবং যুদ্ধে ও শিকারে বিশেষ নিপুণ। অর্জুনকে পরীক্ষা করবার জন্য মহাদেব একবার কিরাতবেশে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

সুশ্রী গৌরবর্ণ কিরাতরা পশুচর্ম পরত ও মাথায় জটার ত্রিকোণ চূড়া বাঁধত। ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব মতে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর কিরাত জাতি প্রায় খৃ-পূ ১০ শতকে ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চল দিয়ে ভেতরে এসে ঢোকে। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের ভৌমবংশীয় রাজা ভগদত্ত চীন ও কিরাত বাহিনী নিয়ে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিলেন। মনু এঁদের ব্রাত্য বা বৃষল ক্ষত্রিয় হিসাবে ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে নিয়েছেন। মেধাতিথি এঁদের নিম্ন শ্রেণীর ক্ষত্রিয় বলেছেন। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে কিরাতদের বহু তথ্য পাওয়া গেছে। নাগার্জুনকোণ্ডা শিলালিপিতে (ঐতিহাসিক যুগে) আছে শ্রীশৈলবিহারে যে বৌদ্ধ শ্রমণরা আসতেন তাঁদের মধ্যে চিলাত (কিরাত) অন্যতম। সাঁচির বৌদ্ধস্তূপে প্রস্তর বেষ্টনীর ওপরও চিরাতীয় (কিরাতীয়) উপাসকের নাম আছে। খৃ ৯-শতকে গুর্জর-প্রতিহার রাজ ২-য় নাগভটের গোয়ালিয়র প্রশস্তিতে আছে কিরাতদেরও তিনি জয় করেছিলেন।

কিরীটী—(১) দেবাসুরের যুদ্ধে দেব সেনাপতি স্কন্দকে সাহায্য করবার জন্য যক্ষগণ যে সব লোক পাঠান তাদের এক জনের নাম। (২) অর্জুনের নাম। দানবদের সঙ্গে যুদ্ধে সূর্যপ্রভ একটি কিরীট ইন্দ্রের কাছে অর্জুন পেয়েছিলেন; ফলে এই নাম।

কির্মীর—বক রাক্ষসের ভাই; হিড়িম্বের বন্ধু। কাম্যক বনে থাকতেন। বনবাসের জন্য পাণ্ডবরা এখানে এলে বকের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য মায়ায় এঁদের পথ রোধ করেন। ভীষণ যুদ্ধে ভীমের হাতে নিহত হন।

কিষ্কিন্ধ্যা—মহীশূরের উত্তরে পম্পার কাছে। নিঃসন্তান ঋক্ষরাজ এখানে রাজা ছিলেন। ঋক্ষরাজের পর বালী রাজা হন। সহদেব এখানে এসে বানরদের সঙ্গে সাত দিন যুদ্ধ করেছিলেন।

কিসা গোতমী—শ্রাবস্তীর একটি দরিদ্র পরিবারে জন্ম। কৃশতার জন্য নাম। এক মাত্র পুত্রের মৃত্যুতে বুদ্ধদেবের কাছে এলে বুদ্ধদেব তাঁকে মৃত্যু ঘটে নি এই রকম একটি গৃহ থেকে এক মুষ্টি সর্ষে আনতে বলেন। কিসা গোতমী ব্যর্থ হলে বুদ্ধদেব তাঁকে ধর্মোপদেশ দেন; ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশ করে অন্তর্দৃষ্টি সহ অর্হত্ব লাভ করেন। অমসৃণ ও সাধারণ পোষাক পরিহিতা। ভিক্ষুণীদের মধ্যে তিনি প্রধান ছিলেন।

কীকট—ঋক্ বেদে মাত্র ৩-৫৩ সূক্তে এই জাতির উল্লেখ আছে। এঁরা বৈদিক ধর্মে অবিশ্বাসী। নিরুক্তে (৬-৩২) কীকট একটি অনার্য দেশ। কিন্তু বর্তমানে মনে হয় কীকট একটি অনার্য জাতি। পরবর্তীকালে কীকট ও মগধ (দ্র) একার্থবাচক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভবত দক্ষিণ বিহারের অংশ। (২) প্রিয়ব্রত বংশে রাজা ভরতের (দ্রঃ) একটি ছেলে।

কীচক—কেকয় রাজার ছেলে। স্ত্রী মালবীর এক ছেলে কীচক এবং পরবর্তী ১০৫ ছেলে উপকীচক (দ্র)। কালকেয় অসুর বংশে/অংশে জন্ম। একটি বোন সুদেষ্ণা। কীচক মৎসরাজ বিরাটের শালা ও সেনাপতি; ১০৬ ভাই বিরাট রাজার সঙ্গেই থাকতেন। ত্রিগর্তরাজ সুশর্মাকে বার বার যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় দ্রৌপদী এই সুদেষ্ণার পরিচারিকা বেশে থাকতেন, নাম ছিল সৈরিন্ধ্রী/মালিনী। কীচক এঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করতে চান কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হন এর পর কীচকের অনুনয়ে সুদেষ্ণা ছল করে এক পূর্ণিমা রাত্রিতে দ্রৌপদীকে কীচকের

ঘরে পাঠান। কীচককেও প্রস্তুত থাকতে বলে দিয়েছিলেন। কীচক দ্রৌপদীকে ধরতে গেলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে দ্রৌপদী রাজসভায় এসে আশ্রয় নেন। কীচকও সঙ্গে সঙ্গে এসে সকলের সামনে দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে তাঁকে অপমান করেন। সভাতে উপস্থিত পাণ্ডবরা আত্মপ্রকাশের ভয়ে চুপ করে থাকেন।

পাঞ্চালী তারপর ভীমকে সব খবর জানালে ভীমের পরামর্শে দ্রৌপদী কীচককে নৃত্যশালায় গোপনে দেখা করতে বলেন। পর দিন মধ্যরাত্রিতে কীচক এলে ভীমের হাতে নিহত হন ; হাত পা দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত করে দেন।

কীর্তি—(১) ব্যাসের ছেলে শুক। শুকের স্ত্রী পিতৃদেব কন্যা পীবরী ; চার ছেলে কৃষ্ণ, গৌরপ্রভা, ভূরি, দেবশ্রুত ও একটি মেয়ে কীর্তি। এই কীর্তির স্বামী অণু ; বিভ্রাজ দেশের রাজা বিভ্রমের ছেলে। ছেলে ব্রহ্মদত্ত। (২) দক্ষ প্রজাপতির মেয়ে।

কীর্তিমান—বসুদেব দেবকীর প্রথম ছেলে। সন্তান জন্মের পর কংসের কাছে পাঠিয়ে দিলে কংস একে ফিরিয়ে দেন। কারণ দেবকীর অষ্টম পুত্র তাঁর শত্রু। এর পর নারদ এসে কংসকে তাঁর পূর্বজন্ম, কৃষ্ণের জন্মের কারণ ইত্যাদি জানিয়ে গেলে কংস তখন কীর্তিমানকে আছাড় মেরে হত্যা করেন।

কীর্তিসেন—বাসুকির এক ভাই।

কুকুর—(১) অনুমান কাঠিওয়াড়ের উত্তর অঞ্চলে আনর্ত দেশের কাছে একটি দেশ। ভাগবত ও পুরাণ অনুসারে দ্বারকা মণ্ডলের অন্তর্গত। পুরাণ কথিত যাদব সাত্বত শাখার অন্ধকের নাম অনুসারে নাম। বৃহৎসংহিতাতে (১৪।৫।৪) কুকুরদেশ পশ্চিম ভারতে। শাতবাহন বংশীয় গোতমী পুত্র শাতকর্ণি অন্যান্য অঞ্চলগুলির সঙ্গে এটিও জয় করেছিলেন। (২) বৃষ্ণি বংশে এক রাজা। সাত্যকি(১)-পৃশ্নি(৫)-চিত্ররথ(৬)-কুকুর(৭)। কুকুর ও অন্ধক বংশীয় সকলেই আত্মকলহে মুষল পর্বে নিহত হন। (৩) কশ্যপ বংশে একটি সাপ।

কুক্কুটপাদ—হিউ-এন-ৎসাঙ বোধিদ্রুম থেকে নৈরঞ্জন নদী পার হয়ে কিউ-কিউ-চ-পো-থো বা কক্কুটপাদ পাহাড়ে যান। গয়ার ২৫ কি-মি উত্তরপূর্বে কুর্কিহার গ্রামের কাছে যে তিনটি পাহাড় আছে সেই তিনটি মনে হয়। অন্য মতে বুদ্ধগয়ার ২৪ কি-মি পূ-উ-পূর্বে হাসরা কোলের মোহের পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া সোভনাথ এই কুক্কুটপাদ। অন্য মতে ফা-হিয়েনের গুরুপাদগিরি বা গুরুপা (বুদ্ধগয়ার ৩৩ কি-মি পূর্ব দক্ষিণে) এই কুক্কুটপাদ। এইখানে বুদ্ধদেবের এক প্রধান শিষ্য অলৌকিক কার্যকলাপ দেখিয়েছিলেন এবং এখানেই তিনি দেহ রাখেন। এখানে কয়েকটি বৌদ্ধস্তূপের ভগ্নাবশেষ রয়েছে।

কুক্কুটারাম—কৌশাম্বীতে সশিষ্য বুদ্ধদেবের থাকবার জন্য তিন জন ধনী শ্রেষ্ঠী ঘোষিত, কুক্কুট ও পাবারিক ঘোষিতারাম, কুক্কুটারাম ও পাবারিকাম্ববন নামে প্রসিদ্ধ তিনটি সংঘারাম করে দিয়ে ছিলেন।

কুকুর—(১) চন্দ্রবংশে এক রাজা। কুকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা। (২) একজন প্রসিদ্ধ মুনি।

কুক্ষি—প্রিয়ব্রতের মেয়ে ; কর্দম (দ্র) প্রজাপতির স্ত্রী ; ছেলে কুক্ষি।

কুচেল—সুদাম (দ্র)।

কুজ—দেবগণের মধ্যে একজন। অস্ত্র শক্তি, গলায় অক্ষমালা।

কুঞ্জর—(১) অঞ্জনার পিতা; এক জন বানর রাজা। হনুমানের মাতামহ। (২) কশ্যপের স্ত্রী কদ্রুর ছেলে একটি সাপ।

কুট্রাল—তামিলনাড়ুর দক্ষিণ সীমান্তে একটি মন্দির। শৈব অগস্ত্য এখানে এই বিষ্ণু মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে বৈষ্ণব পূজারী ইত্যাদি বাধা দেন। অগস্ত্য তখন বৈষ্ণব সেজে মন্দিরে ঢোকেন এবং মন্দিরের পূজারী ইত্যাদিকে শিক্ষা দেবার জন্য বিষ্ণুমূর্তি শিবলিঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সেই থেকে এটি শিব মন্দির।

কুণাল—মৌর্য সম্রাট অশোকের ছেলে। মহিষী পদ্মাবতীর গর্ভে জন্ম। প্রথম নাম ধর্ম-বিবর্ধন। আয়ত সুন্দর চোখের জন্য হিমালয়ের কুণাল পাখীর সাদৃশ্য হেতু এই নাম। ৬৪ প্রকার বিদ্যায় পারদর্শী হন এবং কাঞ্চনমালাকে বিয়ে করেন। কিন্তু বিমাতা তিষ্যরক্ষিতার কামবাসনা পূর্ণ করতে অসম্মত হলে বিমাতার চক্রান্তে রাজ আদেশে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দমনে যান। বিদ্রোহী প্রজারা সেখানে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিলে তিষ্যরক্ষিতা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এই সময়ে সম্রাটকে এক কঠিন ব্যাধি থেকে নিরাময় করে তিষ্যরক্ষিতা এক সপ্তাহের জন্য সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব লাভ করেন ও এই সময়ে তক্ষশিলায় অশোকের নামে জরুরি আদেশ পাঠান কুণালের চোখদুটি যেন তুলে ফেলা হয়। অনুগত কুণাল ঘাতক ডেকে রাজার আদেশ পালন করে স্ত্রীকে নিয়ে পাটলিপুত্রের পথে বার হয়ে পড়েন। পথে গান গেয়ে ভিক্ষা করতে করতে দীন বেশে রাজধানীতে এসে প্রবেশের অনুমতি না পেয়ে রাজার রথ শালায় রাত্রি যাপন করেন। পর দিন প্রত্যূষে কুণালের বাণী শুনে অশোক তাঁকে ডেকে পাঠান এবং প্রিয়পুত্রের এই অবস্থার কারণ জানতে পেরে স্ত্রীকে কঠোর শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মৈত্রীভাবনায় কুণাল পিতাকে শান্ত করলে অলৌকিক প্রভাবে কুণাল আবার চক্ষুলাভ করেন। কারো কারো মতে মহিষী কারুবাকীর ছেলে তিবরই এই কুণাল। কুণাক জাতক গ্রন্থে হিমালয়ের কুণালপক্ষী রূপী বোধিসত্ত্বের কাহিনী আছে; অশোকের ছেলের কোন কাহিনী নাই।

কুণিগার্গ্য—বিখ্যাত একজন মুনি। তপস্যার বলে একটি কন্যার জন্ম দেন এবং তারপর সমাধিতে দেহত্যাগ করেন। মেয়ে বৃদ্ধকন্যা। মহা ৯।৫১।৩

কুণ্ডভেদী—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। অপর নাম কুণ্ডজ। ভীমের হাতে নিহত হন।

কুণ্ডজ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। দ্র কুণ্ডভেদী।

কুণ্ডলী—(১) কুণ্ডাশী। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত হন। (২) গরুড়ের এক ছেলে।

কুণ্ডিক—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। এই ধৃতরাষ্ট্র জন্মেজয়ের ছেলে; দেবব্রত ভীষ্মের কয়েক পুরুষ আগে। কুণ্ডিকের ভাই হস্তী, বিতর্ক ক্রাথ, কুণ্ডল ইত্যাদি (মহা ১।৮৯।৫১)।

কুণ্ডিন—প্রাচীন ভারতে একটি নগরী। বিদর্ভ রাজধানী। দময়ন্তী এখানে জন্মান ও পালিত হন।

কুণ্ডোদর—(১) কুণ্ডাধার। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে মৃত্যু। (২) বিশিষ্ট একটি সাপ।

কুৎস—(১) গোত্র প্রবর্তক এক ঋষি। বহু ঋকমন্ত্র রচনাকার। ইন্দ্র এঁকে বহুবার নির্যাতন করেছিলেন। একবার শুষ্ণ এই ঋষিকে কূপে ফেলে দিয়েছিলেন। এই সময়ে কুৎসের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র শুষ্ণকে হত্যা করে এঁকে উদ্ধার করেন। কুৎস ও ইন্দ্র দেখতে এমন ছিলেন যে ইন্দ্র এঁকে এক বার নিজের প্রাসাদে নিয়ে গেলে শচী চিনতেই পারেন নি কে ইন্দ্র। (২) রাজর্ষি রুরুর ছেলে।

কুন্তক—কাশ্মীর দেশীয়। সম্ভবত অভিনবগুপ্তের সমসাময়িক। এঁর বই 'বক্রোক্তি জীবিত'। কারিকা ও বৃত্তি গ্রন্থও এঁর নিজের রচনা। বৃত্তিতে পাঁচ শতের অধিক উদাহরণ বিভিন্ন কবির লেখা থেকে নেওয়া। বক্রতাকে কুন্তক বর্ণবিন্যাস বক্রতা, পদপূর্বার্ধবক্রতা, পদপরার্ধবক্রতা, বাক্যবক্রতা, প্রকরণবক্রতা, প্রবন্ধবক্রতা এই ৬-টি মূলশ্রেণীতে ভাগ করেছেন। বক্রতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে এই বক্রতার ব্যাপক পরিধির মধ্যে ধ্বনির সর্ববিধ প্রভেদ অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। বক্রোক্তি কেবল অলংকার নয় কবিকর্মের সব কিছুই এই বক্রোক্তির প্রকারভেদের মধ্যে নিহিত। কুন্তক প্রতিপাদন করেছেন প্রতিভার বৈচিত্র্য অনুসারে কাব্য রচনার তিনটি মার্গ :- সুকুমার, বিচিত্র ও মধ্যম।

কুন্তিভোজ—কুন্তীর পালক পিতা। সন্তানহীন এক জন যাদব রাজা কুন্তিভোজ। রাজা শূর/শূরসেনের ভাগনে; অন্য মতে কুন্তীর পিসতুতু ভাই কুন্তিভোজ। শূরসেন কুন্তিভোজকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁর প্রথম সন্তানকে কুন্তিভোজের হাতে দিয়ে দেবেন। কুন্তিভোজই স্বয়ংবর সভা ডেকে কুন্তীর বিয়ে দেন। কুরুক্ষেত্রে ইনি পাণ্ডব দলে ছিলেন। কুন্তিভোজের দশ ছেলে অশ্বত্থামার হাতে নিহত হন।

কুন্তী—প্রকৃত নাম পৃথা। যদুবংশে রাজা শূর/শূরসেনের প্রথম সন্তান; কৃষ্ণের পিসি; বসুদেবের বোন। কুন্তিভোজের (দ্র) কাছে পালিত। কুন্তী, মাদ্রী, গান্ধারী তিন জনে যথাক্রমে সিদ্ধি, ধৃতি ও মতির অংশে জন্ম (মহা ১।৬১।৯৮)। রাজপুরীতে বিশেষত মুনিঋষিরা এলে তাঁদের অতিথি সেবার ভার বিয়ের আগে এঁর উপর ছিল। একবার দুর্বাসা আসেন. কুন্তী অতিথির সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। কুন্তীকে পরীক্ষা করবার জন্য দুর্বাসা এক দিন রান্না সারতে বলেন এবং নিজে স্নান করতে যান। স্নান করতে গেলেও তৎক্ষণাৎ ফিরে আসেন; কুন্তী কোন মতে রান্না সেরেছিলেন খেতে দেন। উত্তপ্ত অন্নের পাত্র কুন্তীর পিঠের ওপর রেখে দুর্বাসা খেতে থাকেন; তাপে পিঠ জ্বলে যেতে থাকলেও কুন্তী চুপ করে সহ্য করেন। দুর্বাসা এতে সন্তুষ্ট হয়ে একটি মন্ত্র দান করেন; একটি মতে মন্ত্রটি পাঁচ বার ব্যবহার করা সম্ভব; আর এক মতে এ রকম কোন বাধা ছিল না; আর এক মতে পাঁচটি মন্ত্র দেন; শেষ মন্ত্রটি কুন্তী মাদ্রীকে দিয়েছিলেন। এই মন্ত্রে যে কোন দেবতাকে স্মরণ করলে সেই দেবতা আসবেন। এবং দেবতার প্রসাদে সেই দেবতার সমান সন্তান হবে। দুর্বাসা চলে যাবার পর কৌতূহলী অল্পবয়সী কুন্তী কতকটা যেন পরীক্ষা করার ছলে মন্ত্রপাঠ করে সূর্যকে ডাকেন। সূর্য তৎক্ষণাৎ এসে উপস্থিত হন। কুন্তী ভীত হয়ে পড়েন কিন্তু সূর্য আশ্বাস দেন কুন্তীর সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে। ফলে সহজাত দিব্য কবচকুণ্ডল ধারী একটি ছেলে হয়। এই ছেলে কর্ণ (দ্রঃ); কুন্তী একে কলঙ্কের ভয়ে জলে ভাসিয়ে দেন।

স্বয়ংবরে কুন্তী পাণ্ডুকে গলায় মালা দেন। পরে আর এক জন সপত্নী

আসে মাদ্রী। কুন্তী, মাদ্রী ও পাণ্ডু তিনজনে অত্যন্ত সুখে ছিলেন। এরপর পাণ্ডু এক দিন বনে কিমিন্দম (দ্র) মুনির কাছে অভিশপ্ত হন। রাজা স্ত্রীদের কাছে অভিশাপের কথা জানান এবং সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু দুই রাণী বাধা দেন। পাণ্ডু তখন স্ত্রীদের নিয়ে বনে থেকে যান এবং তপস্যা করতে থাকেন। পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য পাণ্ডু ঋষিদের পরামর্শ চাইলে তাঁরা ভবিষ্যৎ বাণী করেন রাজার দেবতুল্য সন্তান হবে। পাণ্ডু তারপর কুন্তীকে ক্ষেত্রজ সন্তান (দ্বিজাতেঃ তপসাধিকাৎ; মহা ১।১১৩।৩০) ধারণ করতে বলেন এবং দুর্বাসার দেওয়া মন্ত্রের কথা জানতে পেরে সন্তানবতী হবার জন্য ধর্মকে (ধর্মম্ আহ্বয় মহা ১।১১৩।৩৯) ডাকতে বলেন। শতশৃঙ্গ পাহাড়ে ধর্মের সঙ্গে মিলনে যুধিষ্ঠির জন্মান। পরে পাণ্ডুর ইচ্ছায় বায়ুর ঔরসে ভীম এবং ইন্দ্রের ঔরসে অর্জুন হয়। এর পর কুন্তী আর সন্তান ধারণ করতে রাজি হন নি। বলেছিলেন অতঃপরং চারিণী স্যাৎ পঞ্চমে বন্ধকী ভবেৎ (মহা ১।১১৫।৬৫); অন্য মতে ৪-র্থ ও ৫-ম ছেলে থেকে পিতামাতা কষ্ট পাবেন বলা ছিল বলে কুন্তী আর সন্তান লাভের চেষ্টা করেন নি। এবং রাজার ইচ্ছায় মন্ত্রটি বা বাকি মন্ত্রদুটি মাদ্রীকে দান করেন। অন্য মতে মন্ত্রটি একবারের জন্য ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন; পাণ্ডুর অনুরোধেও দ্বিতীয় বার আর দেন নি (বিভেমি অস্যাঃ পরিভবাৎ নারীনাং গতিঃ ঈদৃশী; মহা ১।১১৬।২৩)।

পাণ্ডু মারা গেলে কুন্তী ও মাদ্রী দুজনেই সহমৃতা হতে চান; স্বামীর মৃত্যুর কারণ জেনেও সদ্য বিধবা কুন্তী সপত্নীকে বলেছিলেন ধন্যা ত্বমসি বাহ্লীকি মত্তঃ ভাগ্যতরা তথা (মহ' ১।১১৬।২১); কারণ মূহূর্তের জন্যও স্বামীকে সে সুখী করতে পেরেছিল। কিন্তু মুনিরা বাধা দেন; এক জনকে সন্তানদের দায়িত্ব নিতে বলেন। ফলে কুন্তী ছেলেদের নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে বাস করতে থাকেন। কিন্তু কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে মনোমালিন্য ক্রমশই বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত ছেলেদের নিয়ে বারণাবতে জতুগৃহে এসে ওঠেন। জতুগৃহে (দ্র) আগুন লাগলে গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথে কুন্তী সকলকে নিয়ে বনের মধ্যে পালিয়ে যান; বনের মধ্যে ভীম মাকে কাঁধে নেয়। একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের ঘরে এসে সকলে আশ্রয় নেন। এখানে ব্যাস কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে যান। একচক্রাতে কুন্তী বক রাক্ষসের অত্যাচারের কথা জানতে পারেন এবং ভীমকে নির্দেশ দেন রাক্ষসকে হত্যা করে নগরবাসীদের রক্ষা করতে। বক রাক্ষসের মৃত্যুর পর কুন্তীর পরামর্শে পাঞ্চালে যান। এখানে গিয়ে ভার্গব নামে এক কুমোরের বাড়িতে সকলে আশ্রয় পান। এখানে এক দিন ভিক্ষার জন্য বার হয়ে পাঁচ ভাই সন্ধ্যাবেলাতে দ্রৌপদীকে নিয়ে ফিরে আসেন এবং কুটিরের বার থেকে আনন্দে মাকে ডাক দিয়ে কি এনেছেন দেখে যেতে বলেন। কুন্তী কিছু না দেখেই ভেতর থেকে নির্দেশ দেন যা মিলেছে তা যেন সব ভাই সমান ভাবে ভাগ করে নেন। মায়ের এই কথা রাখবার জন্য পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে (দ্র) বিয়ে করতে বাধ্য হন। এর পর বিদুর এসে পাঞ্চাল সভাতে কুন্তীর সঙ্গে দেখা করেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশ মত সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

অর্জুন সুভদ্রাকে বিয়ে করে আনলে কুন্তী তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। পাণ্ডবরা বনে গেলে কুন্তী বিদুরের কাছে থাকেন। যুদ্ধের আগে সন্ধির জন্য কৃষ্ণ

যুধিষ্ঠিরের দূত হয়ে আসেন ; কুন্তীর সঙ্গে দেখা করেন। কুন্তী এই সময়ে কৃষ্ণকে দিয়ে ছেলেদের যুদ্ধ করবার জন্য বলে পাঠান ; পর অন্নে তিনি আর জীবন ধারণ করতে চান না। বলেন অলাতং তিন্দুকস্য ইব মুহূর্তম্ অপি বিজ্বল—মহা ৫।১৩১।১৩। যুদ্ধের ঠিক আগে মাতৃস্নেহে ব্যাকুল হয়ে কুন্তী গোপনে কর্ণের (দ্রঃ) সঙ্গে দেখা করেন। যুদ্ধের শেষে পাণ্ডবরা যখন আত্মীয়দের সৎকার করেন তখন কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে সব কথা জানিয়ে কর্ণের জন্য তর্পণ করতে বলেন। যুধিষ্ঠির কেঁদে ফেলেন এবং শাপ দেন মেয়েছেলেরা এ ভাবে কোন কথা আর লুকিয়ে রাখতে পারবে না। অভিমন্যু মারা গেলে সুভদ্রা ও উত্তরাকে সান্ত্বনা দেন এবং কৃষ্ণকে অভিমন্যুর তর্পণ ইত্যাদি করতে বলেন। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের পর ধৃতরাষ্ট্র রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে চলে যান ; সঙ্গে কুন্তী গান্ধারীকে হাতে ধরে নিয়ে যান। পাণ্ডবরা কুন্তীকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা, ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীও কুন্তীকে বারণ করেছিলেন। কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে নির্দেশ দিয়ে যান সহদেবকে যেন বিশেষ স্নেহ করা হয় ; কর্ণকে যেন কোন দিন ভুলে না যায় এবং ভীম বা দ্রৌপদীর ওপর যুধিষ্ঠির কোন দিন যেন বিরক্ত না হন। বনে প্রগঙ্গা তীরে কুন্তী, গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। কুন্তী মাসান্তে একবার আহার করতে থাকেন। এর পর এক দিন দাবানলে তিন জনেই মারা যান। ধৃতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কুন্তী কোন দিন কোন প্রতিবাদ করেননি এবং নিজের ছেলেদের তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করতে উপদেশ দিতেন।

কুন্দকুন্দাচার্য—সুপ্রসিদ্ধ দিগম্বর-জৈন দার্শনিক। খৃ পূ ১-শতক থেকে ৫২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মনে হয়। অন্য নাম কুন্দাচার্য, এলাচার্য, পদ্মনন্দী, কুন্দকুন্দ বা কোণ্ডকুন্দ, বক্র-গ্রীব, গৃধ্রপৃচ্ছ ইত্যাদি। সম্ভবত কুণ্ডপুরের অধিবাসী। একটি কাহিনীতে ভারতে দক্ষিণ দিকে পিদথনাড়ু জেলায় কুরুমরৈ গ্রামে করমুণ্ড নামে এক ধনী বণিক ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতীর ছেলে। আর এক মতে মালব দেশে বারাপুর নগরে কুমুদচন্দ্র রাজার রাজ্যে কুন্দশ্রেষ্ঠী নামে এক ধনী বণিক ও তাঁর স্ত্রী কুন্দলতার সন্তান। পরিণত বয়সে বহু সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ লাভ করেন ও দার্শনিক রূপে প্রসিদ্ধ হন। প্রবাদ মোট ৮৪-টি গ্রন্থ লেখেন ; এ গুলিকে পাহুড় (=প্রাভৃত) বলা হয়। অন্য মতে এটি একটি সংকলন মাত্র। এঁর উল্লেখযোগ্য বই পঞ্চাস্তিকায়সার, প্রবচনসার, সময়সার, নিয়ম-সার, ষট্‌প্রাভৃত।

কুবলাই খাঁ—চীনে বিখ্যাত রাজা (১২১৬-৯৪ খৃঃ) ; তদানীন্তন সবচেয়ে বৃহৎরাজ্য ; ভলগা থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত। তিব্বতের লামার কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন ; এবং লামাকে তিব্বতের অধীশ্বর করে দেন ; এই থেকে দালাইলামা পদের উৎপত্তি। তিব্বতী লামার সাহায্যে মোঙ্গল ভাষা লেখবার লিপি উদ্ভাবিত করেন। এই লিপি ভারতীয় লিপি থেকেই তৈরি।

কুবলাশ্ব—কুবলয়াশ্ব। ইক্ষ্বাকু বংশে রাজা বৃহদশ্বের ছেলে। ককুৎস্থ(১)-বিশ্বগাশ্ব(৪) বৃহদশ্ব/শক্রজিৎ(৫)-কুবলাশ্ব(৬)। অন্য নাম ধুন্দুমার। মহর্ষি উত্তঙ্কের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু বর দেন উত্তঙ্কের যোগ বলের জন্য ধুন্দু দৈত্যকে কুবলাশ্ব বধ করতে পারবেন। বৃহদশ্ব বনবাসী হবার সময় উত্তঙ্ক এসে দৈত্যকে মারবার অনুরোধ করলে বৃহদশ্ব ছেলেকে

ভার দিয়ে বনে চলে যান। কুবলাশ্ব একুশ হাজার ছেলে ও সৈন্যদের নিয়ে দৈত্যকে খুঁজতে থাকেন। উত্তঙ্কের অনুরোধে বিষ্ণুও কুবলাশ্বের দেহে ভর করেছিলেন। এক সপ্তাহ ধরে সমুদ্র তীরে খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় ঘুমন্ত দানবের সন্ধান মেলে। ধুন্দু উঠে মুখের আগুনে কুবলাশ্বর ছেলেদের মেরে ফেলেন। কুবলাশ্ব যোগ শক্তির প্রভাবে আগুন নিভিয়ে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে দৈত্যকে নিহত করেন। দেবতারা বহু আশীর্বাদ করে যান এবং নাম দেন ধুন্দুমার। যুদ্ধে নিহত ছেলেগুলি ছাড়াও আরো তিনটি ছেলে ছিল দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব, চন্দ্রাশ্ব/ভদ্রাশ্ব। এই রাজা কুবলাশ্বের অন্য নাম ঋতধ্বজ। দ্রঃ মদালসা।

কুবের—যক্ষরাজ। অন্য নাম ত্র্যম্বকসখ, বৈশ্রবণ, পৌলস্ত্য, নরবাহন, একপিঙ্গল, ধনপতি, গুহ্যকেশ্বর। পুলস্ত্যের স্ত্রী মালিনী (=হবির্ভূ); তৃণবিন্দুর মেয়ে; ছেলে বিশ্রবস্। ভরদ্বাজ মুনি মেয়ে দেববর্ণিণীকে/ইলিবিলাকে বিশ্রবার আশ্রমে বিয়ে দিয়ে যান (রামা ৭।৩।৩)। বিশ্রবার বহুদিন সন্তান হয় নি; ব্রহ্মার বরে দেববর্ণিণীর ছেলে হয় বৈশ্রবণ কুবের। কু=কুৎসিৎ, বের~শরীর; অর্থাৎ কুৎসিৎ গঠন। তিন পা, আট দাঁত, অসুরের মত শক্তি। কুবেরের স্ত্রী আহুতি অন্য মতে ভদ্রা, ছেলে নলকূবর ও মণিগ্রীব, একটি মেয়ে মীনাক্ষী। বাস কৈলাসে অলকাপুরী, রথ-পুষ্পক, উদ্যান চিত্ররথ। কবেরের রথ মানুষে টানে; ফলে নাম নরবাহন। কুবেরের বিগ্রহ দেখা যায় ছাগলের পিঠে বসা; হাতে মুষল।

সত্যযুগে দেবতারা এক দিন বরুণের কাছে যান এবং কুবেরের জন্য এক যজ্ঞ করেন; এবং সাগর ইত্যাদি সমস্ত জলের অধিপতি করে দেন। সাগর ইত্যাদি কুবেরকে তাঁদের সমস্ত ধনরত্ন দিলে অগাধ বিত্তের মালিক হন। কুবের পরে জলে মাথা ডুবিয়ে ১০ হাজার বছর এবং তারপর পঞ্চাগ্নির মধ্যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মার তপস্যা করেন। অপর মতে অল্প বয়সেই হিমালয়ে গিয়ে মাথা নীচু করে হাজার বছর এবং এক পায়ে পঞ্চাগ্নির মধ্যে হাজার বছর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে অমর হবার, উত্তর দিকের দিকপাল ও ধনপতি হবার বর চেয়ে নেন। আর এক মতে লোকপাল হবার বর চেয়েছিলেন। ব্রহ্মা বর দেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধি এবং একটি মতে পুষ্পক ও উপহার দেন। অন্য মতে শিবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং শিবের অনুগ্রহে সমস্ত ধনরত্ন, যক্ষ, কিন্নর ও গুহ্যকদের অধিপতি হন। সকলের ধর্মদাতা, সমস্ত ধনের মালিক ও প্রদাতা। দেবতাদের সমান মর্যাদা দিয়ে ব্রহ্মা এঁকে পুষ্পক রথ দিয়েছিলেন। এই সব পেয়ে খুসি হয়ে বিশ্রবাকে কুবের সব জানালে বিশ্রবা আশীর্বাদ করেন এবং রাক্ষসদের জন্য (রাক্ষসানাং নিবাসার্থং; রামা ৭।৩।২৭) বিশ্বকর্মা/ময়দানব নির্মিত স্বর্ণলঙ্কাতে বাসস্থান ঠিক করে দেন। বিষ্ণুর ভয়ে বর্তমানে রাক্ষসরা এই পুরী ত্যাগ করে চলে গেছে (রামা ৭।৩।২৯)। অন্য মতে কুবের নিজেই ময়কে দিয়ে নির্মাণ করিয়েছিলেন।

রাবণ ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে কুবেরকে তাড়িয়ে দিয়ে লঙ্কাপুরী ও পুষ্পক রথ অধিকার করেন। বিশ্রবার উপদেশে কুবের তখন কৈলাসে অলকাপুরীতে চলে যান এবং অভিশাপ দিয়ে যান পুষ্পক রাবণের ভোগে আসবে না। রাবণকে যে হত্যা করবে তার রথ হবে।

কুবের তারপর যক্ষ, কিন্নর ইত্যাদিকে নিয়ে গন্ধমাদনে গিয়ে আশ্রয় নেন। কুবের সভাতে কিছু অপ্সরা রয়েছে এবং বিশ্বাবসু, হাহা, হূহূ, তুম্বুরু, পর্বত এবং শৈলূষ ইত্যাদি সভাসদ রয়েছেন। হিমালয়ে তপস্যার সময় দৈবাৎ এক দিন শিবের কোলে পার্বতীকে দেখে ফেলেন এবং ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। ফলে এক চোখ অন্ধ হয়ে যায়। পরে পার্বতী সদয় হয়ে চোখটিকে পিঙ্গল করে দেন। অন্য মতে ডান চোখ পিঙ্গল হয়ে যায়। পরে কঠোর তপস্যায় শিবের বন্ধুতা লাভ করেন এবং শিব নাম দেন এক-পিঙ্গল। রাবণের অত্যাচারে বিব্রত হয়ে উঠে দেবতা ও ব্রাহ্মণরা বিষ্ণুর কাছে যখন অভিযোগ করতে যাচ্ছিলেন কুবের তখন দূত মুখে রাবণকে খবর পাঠিয়ে দেন এবং ধর্মপথে থাকতে বলেন। রাবণ ক্ষেপে গিয়ে দূতকে টুকরো টুকরো করে কেটে রাক্ষসদের খাইয়ে দেন এবং অলকাপুরী আক্রমণ করেন। তীব্র যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কুবের অজ্ঞান হয়ে পড়েন ; যক্ষেরা কুবেরকে নিয়ে পালিয়ে যান। রাবণ এই সুযোগে অলকা লুঠ করেন ও পুষ্পরথ নিয়ে চলে আসেন।

মরুত্তের (দ্র) যজ্ঞে রাবণ এলে কুবের অঞ্জনী সেজে পালিয়ে যান। কুবেরের এক জন যক্ষ মন্ত্রী ছিলেন বিরূপাক্ষ। ধনরত্নের ভার ছিল এঁর ওপর। বিরূপাক্ষ আবার এক জন বিরাটকায় যক্ষকে এই পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। পৃথু রাজা হয়ে ধেনু রূপ পৃথিবীকে দোহন করান ; কুবের তখন বৎস সেজেছিলেন। দেবতারা পৃথুকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং অভিষেকের সময় কুবের পৃথুকে সিংহাসন দান করেন। পৃথুকে বরুণ রাজছত্র, ইন্দ্র রাজমুকুট এবং যম রাজদণ্ড দেন।

কুশাবতীতে মন্ত্র পাঠের জন্য দেবতারা কুবেরকে নিমন্ত্রণ করেন মহা ৩।১৫৮।৫১। কুবের মণিমানকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন। যমুনাতে অগস্ত্য তপস্যা করছিলেন। মণিমান থুথু ফেললে অগস্ত্যের মাথায় পড়ে ফলে অগস্ত্য অভিশাপ দেন এক জন মানুষের হাতে মণিমান নিহত হবেন এবং কুবেরকে এ জন্য শোক করতে হবে। এবং ঐ মানুষটির সাক্ষাৎ পেলে তখন শাপ মুক্ত হবেন। ভীমসেন গন্ধমাদন পাহাড়ে সৌগন্ধিক পুষ্প সংগ্রহ করতে এলে মণিমান ভীমের হাতে মারা যান। ভীমের দর্শন পেয়ে কুবের শাপ মুক্ত হন। স্থূণাকর্ণকে (দ্রঃ) কুবের অভিশাপ দিয়েছিলেন (মহা ৫।১৯৩।৪১)। মুচুকুন্দের সঙ্গে কুবেরের একবার যুদ্ধ হয়েছিল। শুক্রাচার্য একবার কুবেরের কিছু ধনরত্ন নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন। শিবের কাছে কুবের গিয়ে অভিযোগ করলে শিব শুক্রকে হত্যা করতে যান কিন্তু পার্বতী শেষ অবধি ঘটনাটা মেটান ; শুক্রাচার্য কিছু ধনরত্ন নিয়ে যেতে সক্ষম হন। দ্রঃ অষ্টাবক্র।

বিশ্রবাকে ত্যাগ করে চলে আসার জন্য বিশ্রবা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে কুবের তিন জন রাক্ষসী নারীকে (কৈকসী দ্রঃ) বিশ্রবার সেবার জন্য পাঠিয়ে দেন।

খৃ-পূ যুগে যক্ষপতি হিসাবে কুবের পূজিত হতেন। অথর্ববেদে (৮,১০,২৮) কুবের-এর উল্লেখ আছে। শিবের সঙ্গে এঁর বিশেষ সংশ্রব ছিল। বেস নগরে প্রাপ্ত প্রায় খৃ-পূ ২-শতকের প্রস্তর নির্মিত কল্পবৃক্ষ থেকে ঝোলান নিধিগুলিকে কুবেরের নিধি বলা হয়। ঐ সময়ের তৈরি ভারহুত স্তূপের বেদীতে ভারবহন ক্লান্ত স্ফীতোদর যক্ষের ওপর দাঁড়ান যুক্তকর পুরুষকেও কুবের বলেই মনে হয়। মহাভাষ্যে ধনপতির মন্দিরের উল্লেখ আছে। মনুসংহিতায় (৭,৪) বলা হয়েছে ইন্দ্র, বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ,

কুবের, সূর্য ও চাঁদের কলা নিয়ে রাজার সৃষ্টি। কালিদাসের রচনায় কুবের ও তাঁর অস্ত্র গদার উল্লেখ দেখা যায়। পরবর্তী যুগে পেটমোটা, হাতে ধনকোষ ও আসনের নীচে ধনপূর্ণ ঘট এবং কখনো কখনো নরবাহন রূপে তাঁকে উৎকীর্ণ করা হত। বৌদ্ধ যক্ষী হারিতীর স্বামী পাঞ্চিক ও বজ্রযানীয় জম্ভল-এর বর্ণনা প্রায় কুবেরের মতই। কুবেরের বাঁ হাতে এই বর্ণনায় রত্নপ্রবর্ষমান নকুলী। জম্ভল মণ্ডলে জম্ভলের দুই সঙ্গীর নাম ধনদ ও বৈশ্রবণ। উনবিংশ তীর্থঙ্কর মল্লিনাথের উপাসক শাসন যক্ষের নাম ও কুবের। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায় মতেই ইনি চতুর্মুখ, ইন্দ্রধনুবর্ণ, গজবাহন ও আটহাত। জৈনরাও কুবেরকে দিকপতি হিসাবে পূজা করেন।

কুব্জা—(১) অতি কুৎসিৎ, বাল্য বিধবা। বহু বছর ধরে পুণ্যকর্ম করছিলেন। সুন্দ উপসুন্দ যখন অত্যাচার করে বেড়াচ্ছিলেন তখন ইনি তিলোত্তমা সেজে এঁদের মুগ্ধ করেন এবং এঁরা নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি করে মারা যান। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে কুব্জাকে সূর্যলোকে স্থান করে দেন। (২) কংসের (দ্রঃ কৃষ্ণ) অনুলেপ বাহিনী। দ্রঃ পিঙ্গলা, কৃষ্ণ।

কুভা—ঋক্ বেদের (৫. ৫৩. ৯, ১০. ৭৫. ৬) প্রাচীন নদী; গ্রীক নাম কোফেন; বর্তমানে কাবুল নদী। কাবুল সহরের ৭৪ কি-মি পশ্চিমে উনাই গিরিসঙ্কটের কাছে উৎপত্তি। প্রাচীন গৌরী ও প্রাচীন সুবাস্তু নদী মিলিত হয়ে পুষ্কলাবতী বা বর্তমান চারসাদ্দার কাছে কুভায় মিশেছে। গৌরী নদীর গ্রীক নাম গুরাইঅস ও বর্তমান নাম পঞ্জকোরা। সুবাস্তু নদীর গ্রীক নাম সোয়াস্তস ও বর্তমানে স্বোয়াৎ। কুভা নদী এটকের কিছু উত্তরে সিন্ধু নদীতে এসে মিলেছে। সমগ্র কুভা নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০৬ কি-মি।

কুমার—(১) ব্রহ্মার চার মানসপুত্র :-সনৎকুমার, সনন্দ, সনক ও সনাতন। এঁরা প্রজা সৃষ্টি করতে চান নি; চিরজীবন অকৃতদার ছিলেন। পরে আর একটি ছেলে বিভুও কুমার বলে পরিচিত হন। (২) কার্তিকেয়। (৩) গরুড়ের এক ছেলে।

কুমার কস্সপ—রাজগৃহের এক বণিক কন্যা গর্ভিণী অবস্থায় সংঘে যোগ দিয়ে এই সন্তানের জন্ম দেন। রাজার কাছে পালিত হয়ে সাত বছর বয়সে কস্সপ সংঘে যোগ দেন। কুড়ি বছর বয়সে উপসম্পদা হয় এবং অচিরে অর্হত্ব পান ও অপূর্বযুক্তি শক্তি লাভ করেন। পায়াসীসুত্রটি তাঁর মনোহর কথকতার নিদর্শন।

কুমারজীব—চীনা ভাষায় ভারতীয় গ্রন্থের প্রসিদ্ধ অনুবাদক। এঁর পিতা ভারত থেকে মধ্য এসিয়ায় কুচা-তে যান এবং কুমারজীব এখানেই জন্মান। যৌবনে কুমারজীব কাশ্মীরে এসে ভারতীয় শাস্ত্রসমূহ পাঠ করেন। কথিত আছে প্রথমে সর্বাস্তিবাদী পরে মহাযানী হন। খৃঃ পূ ৪ শতকে চীনা সম্রাট কুচা নগরী দখল করেন এবং বন্দী কুমারজীবকে অন্য বন্দীদের সঙ্গে চীনে পাঠান। চীনে অল্প দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হিসাবে গণ্য হন এবং চীনের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তার পদ পান। তাঁর জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি একটি বক্তৃতা গৃহে তিনি পড়াতেন এবং প্রায় তিন হাজার ছাত্র ছিল। বিনয়, ব্রহ্মজালসূত্র, বজ্রচ্ছেদিকা, প্রজ্ঞাপারমিতা, গণ্ডব্যূহ ইত্যাদি ৫০ খানি বই চীনা ভাষায় অনূদিত করেন।

কুমারদাস—কুমারভট্ট = ভট্টকুমার। প্রবাদ ইনিই সিংহল রাজকুমার ধাতু সেন (৫১৭-

৫২৬ খৃ)। এঁর গ্রন্থ জানকীহরণ। মূল বই মেলে নি। প্রথম ১৪ সর্গের সম্পূর্ণ ও ১৫ সর্গের আংশিক টীকা থেকে মূল বই তৈরি করা হয়েছে। ২৫ সর্গের পুষ্পিকা ও অন্তিম স্তবকটি অবশ্য পাওয়া গেছে। মনে হয় রামের অভিষেক পর্যন্ত কাহিনী এই বইয়ের বিষয় বস্তু।

কুমারবন—কৈলাসে একটি বন। এখানে হরপার্বতী সম্ভোগ করছিলেন এমন সময় শৌনক ইত্যাদি কয়েকজন ঋষি প্রণাম করতে আসেন। মহাদেব/পার্বতী বিরক্ত হয়ে শাপ দেন ভবিষ্যতে এখানে যে আসবে সে নারীতে পরিণত হবে। দ্রঃ সুদ্যুম্ন/ইলা।

কুমারসম্ভব—(১) কালিদাস রচিত উনিশ (?) সর্গে মহাকাব্য। রাজা দিলীপ থেকে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত ২৭ জন সূর্য বংশীয় রাজার কাহিনী। (২) উদ্ভট রচিত একটি কাব্য গ্রন্থ; কবিত্বের সুন্দর পরিচয় বহন করে; অবশ্য কুমারসম্ভবের ছায়া অনেক শ্লোকের ওপর এসে পড়েছে।

কুমারিলভট্ট—প্রসিদ্ধ মীমাংসা দার্শনিক (খৃ ৭-শতকে)। জন্মস্থান অজ্ঞাত। এঁর শিষ্য ও ভগিনীপতি মণ্ডন মিশ্র। দ্রঃ উভয় ভারতী। কুমারিলের দুই শিষ্য প্রভাকর মিশ্র ও ভট্টোম্বেক; দুটি সুপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ভাট্টমত অর্থাৎ ভট্টপাদ কুমারিলের সিদ্ধান্তই কিন্তু সমধিক সম্মানিত। কুমারিলের প্রথম ও প্রধান প্রতিপাদ্য বেদ স্বতঃ প্রমাণ ও অপৌরুষেয় তবে ঈশ্বর প্রণীত নয়। ধর্ম ও অপবর্গ একমাত্র বেদ বা বেদমূলক শাস্ত্র থেকে জানা সম্ভব, যোগবলে জানা যায় না। মুক্তির কারণ আত্ম-জ্ঞান ও এক মাত্র বেদের জ্ঞান থেকে জ্ঞাতব্য। যোগীমুনিদের উক্তি বেদ বিরোধী হলে গ্রহণীয় নয়। জৈমিনির মীমাংসা দর্শনের ওপর শবরস্বামী যে ভাষ্য লিখেছিলেন তার সমালোচনামূলক ব্যাখ্যার নাম বার্তিক। এই বার্তিক ভাট্টপাদ কুমারিলের রচনা। মীমাংসা শাস্ত্রে ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নি; তবু বার্তিকের প্রথম অংশ শ্লোকবার্তিকের প্রথম শ্লোকে ভাট্টপাদ কুমারিল মহাদেবকে নমস্কার করেছেন।

কথিত আছে মীমাংসাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিরুদ্ধ মতবাদ আয়ত্ত করতে গিয়ে কোন এক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধদার্শনিকের কাছে বৌদ্ধ দর্শন অধ্যয়ন করেন। পরে তাঁর সঙ্গে বেদ প্রামাণ্য বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হন—বিচারে পণ ছিল হারলে স্বধর্ম ত্যাগ বা প্রাণ ত্যাগ করতে হবে। বৌদ্ধ পণ্ডিতটি হেরে গিয়ে স্বধর্ম ত্যাগ না করে ভৃগু পতনে প্রাণত্যাগ করেন। বেদপ্রামাণ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখে কুমারিল তখন গুরু হত্যার প্রায়শ্চিত্তের জন্য তুষানলে প্রবেশ করেন। এই সময়ে শঙ্করাচার্য বিচারের জন্য আসেন এবং কুমারিল তাঁকে মণ্ডনমিশ্রের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হতে বলেন; কারণ মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে বিচার কুমারিলের সঙ্গে বিচারেরই সমান হবে।

কুমারী পর্বত—খণ্ডগিরি।

কুমারী পূজা—তন্ত্রশাস্ত্রে বিহিত ষোল বছরের কম বয়সের অবিবাহিত অনার্তবা কন্যার পূজা। দেবী বুদ্ধিতে যে কোন জাতির কুমারী কন্যা পূজনীয়া। কুমারী পূজা ব্যতীত দেবতার পূজা বা হোম সফল হয় না। এই পূজায় কোটিগুণ ফল লাভ হয়, বিপদ দূরীভূত হয়। কুমারী ভোজনে ত্রিলোক ভোজন ফল। তন্ত্রসার ও প্রাণ-তোষিণীতে বিশেষ বিবরণ আছে। বর্তমানে এই পূজা প্রচলিত না থাকলেও পুণ্য কাজ হিসাবে কুমারীকে দান-ভোজনে সম্বর্দ্ধিত করার প্রথা কচিৎ-কদাচিৎ দেখা যায়।

কুমুদ—(১) বিশিষ্ট একটি সাপ। (২) সুগ্রীবের এক অনুচর। (৩) সুপ্রতীক বংশে একটি বিশেষ হাতী। (৪) গরুড়ের এক ছেলে। (৫) একটি পাহাড়।

কুমুদাদি—ব্যাসের শিষ্য জৈমিনি। জৈমিনি পুত্র সুমন্ত নিজের শিষ্য কবন্ধকে অথর্ব বেদ পড়ান। কবন্ধ অথর্ববেদকে দু ভাগ করে দেবাদর্শ ও পথ্যকে ভাগ করে দেন। দেবাদর্শের শিষ্য মেধা, ব্রহ্মবলি, শৌৎকায়নি, ও পিপ্পলাদ। পথ্যের শিষ্য জাবালি, কুমুদাদি, শৌনক।

কুমুদ্বতী—রামচন্দ্রের পুত্রবধূ। সরযুতে জলক্রীড়া করতে গিয়ে কুশের হাত থেকে অলঙ্কার জলে হারিয়ে যায়। কুশ তখন ক্রোধে সরযূকে বাণবিদ্ধ করতে যান। কিন্তু নাগকুমুদ এই অলঙ্কার তখন ফিরিয়ে দিয়ে যান এবং কুমুদ্বতীকে স্ত্রী হিসাবে দিয়ে যান (আনন্দ রামায়ণ)।

কুম্ভ—(৩) প্রহ্লাদের তিন ছেলে :— বিরোচন, কুম্ভ ও নিকুম্ভ। (২) কুম্ভকর্ণ এবং বজ্রমালার দুই ছেলে কুম্ভ ও নিকুম্ভ। দুজনেই দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা। কুম্ভ সুগ্রীবের হাতে মারা যান।

কুম্ভকর্ণ—বিশ্রবা মুনির ঔরসে নিকষার/কৈকসীর গর্ভে জন্ম। রাবণের পরবর্তী ভাই। মহাভারতে মায়ের নাম পুষ্পোৎকটা। দ্রঃ জয়। বিজয়=হিরণ্যকশিপু= কুম্ভকর্ণ =দন্তবক্র। দৈত্যরাজ বলির (বৈরোচনস্য দৌহিত্রী ; ৭।১২।২৩ রামা) মেয়ে বজ্রমালা/বজ্রজ্বালা স্ত্রী; কুম্ভ ও নিকুম্ভ দুই ছেলে। জন্মেই এক হাজার প্রজা খেয়ে ফেলেন ফলে ইন্দ্র এঁকে বজ্রাঘাত করেন। শৈশবে ভাইদের সঙ্গে পিতার আশ্রমে পালিত হন। কুবের তখন সমৃদ্ধ রাজা, পুষ্পক বিমানের অধিকারী। হিংসায় কুম্ভকর্ণেরা তিন ভাই গোকর্ণ আশ্রমে ব্রহ্মার তপস্যা করে অমরতা চান (দ্রঃ রাবণ)। নন্দনে সাতজন অপ্সরা, ইন্দ্রের দশজন অনুচর, বহুঋষি ও মানুষ খেয়েছিলেন (রা ৭।১১।৩৮) ইত্যাদি নানা কারণে দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা বর দিতে চান না। ব্রহ্মার/দেবতাদের নির্দেশে সরস্বতী কুম্ভকর্ণের কণ্ঠে অধিষ্ঠান করেন। কুম্ভকর্ণ বর চান 'নির্দেবম্ (দেবহীনতা)'. কিন্তু সরস্বতীর জন্য উচ্চারণ বিকৃত হয়ে উচ্চারিত হয় 'নিদ্রাবত্বম্'। অন্য মতে বর চান স্বপ্তুং বর্ষাণি অনেকানি দেবদেব মম ঈপ্সিতম্— রামা ৭।১১।৪৫। পরে অনুনয় করে অন্য মতে রাবণ অনুনয় করে ছয় মাস অন্তর এক দিন জাগবার বর আদায় করেন। কিন্তু ব্রহ্মা বলে যান অকালে ঘুম ভাঙালে মৃত্যু হবে। এঁর ঘুমের জন্য রাবণ দু'যোজন লম্বা ও এক যোজন চওড়া একটি বিচিত্র আবাস তৈরি করে দেন।

লঙ্কাযুদ্ধের সূচনায় কুম্ভকর্ণ জেগেছিলেন এবং রাবণের মন্ত্রণা সভাতে যোগদান করেছিলেন। কামাসক্ত রাক্ষসরাজের দুর্নীতির নিন্দা করেছিলেন বটে তবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাবণের শত্রুকে তিনি নিহত করে দেবেন। লঙ্কার যুদ্ধে রাবণ হীনবল হয়ে পড়লে বহু অনুচর দিয়ে অতি কষ্টে কুম্ভকর্ণকে নতুন ঘুমের নয় দিন পরে জাগিয়ে তোলেন। ঘুম থেকে উঠে ক্ষুধায় প্রচুর মদ্য ও মাংস খেয়ে তারপর সব শুনে রাবণকে এই ঘুম ভাঙাবার জন্য তিরস্কার করলেও সসৈন্যে যুদ্ধে যান। বহু বানর সৈন্য হত্যা করেন, লক্ষ্মণকে পরাজিত করেন, সুগ্রীবকে অজ্ঞান করে ফেলে লঙ্কায় ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে জ্ঞান ফিরে এলে কুম্ভকর্ণকে আঁচড়ে কামড়ে পালিয়ে

আসেন। কুম্ভকর্ণ তারপর গদা নিয়ে ফিরে আসেন এবং রামচন্দ্র বায়ব্য ও ঐন্দ্র অস্ত্রে হাতপা কেটে দিয়ে আবার ঐন্দ্র অস্ত্রে কুম্ভকর্ণের মাথা কেটে ফেলেন।

কুম্ভকার—মধ্য এসিয়া ও উত্তর আফ্রিকাতে আনুমানিক সাত হাজার বছর আগে মৃৎপাত্রের **প্রথম ব্যবহার**। হরপ্পা সভ্যতার সময়ের (খৃ পূ ২৭৫০) চাকে গড়া চিত্রযুক্ত অতি সুন্দর মাটির বাসনের বহু ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে আছে হস্তগঠিত স্থালী ইত্যাদি দৈবিক এবং কুলালচক্র ঘটিত মৃৎপাত্র আসুরিক। সম্ভবত বৈদিক আর্যরা মৃৎশিল্প ভারতে আনেন নি; আগেই এখানে প্রচলিত ছিল।

কুম্ভনাদ—বাণাসুরের মন্ত্রী। উষার সখী চিত্রলেখার পিতা। দ্রঃ কুম্ভাণ্ড।

কুম্ভমেলা—বারো বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম। অন্য নাম কুম্ভযোগ বা পুষ্করযোগ। সূর্য ও বৃহস্পতি মেষ ও কুম্ভরাশিতে গেলে হরিদ্বারে এই মেলা হয়। সূর্য ও বৃহস্পতি যথাক্রমে মকর ও বৃষ রাশিতে গেলে প্রয়াগে; কর্কট ও সিংহ রাশিতে গেলে নাসিকে; তুলা ও বৃশ্চিক রাশিতে গেলে উজ্জয়িনীতে এই মেলা হয়। উল্লিখিত এই চার জায়গাতেই কেবল এই মেলা হয়। সমুদ্র মন্থনে দেবতারা অমৃতকুম্ভ নিয়ে দৈত্যদের মাঝখান থেকে পালাবার সময় এই চার জায়গায় কুম্ভ রক্ষিত হয়েছিল বা এই চার জায়গায় **অমৃত বিন্দু** উছলে পড়েছিল।

কুম্ভযোনি/কুম্ভী—অগস্ত্যের (দ্রঃ) এক নাম। মিত্রাবরুণ (দ্রঃ)। (২) এক জন অপ্সরা।

কুম্ভরেতস্—ভরদ্বাজের ঔরসে স্ত্রী বীরার গর্ভে জন্ম একটি সন্তান; ইনি অগ্নি, অপর নাম রথপ্রভু, রথধ্বান।

কুম্ভাণ্ড—দৈত্যরাজ বাণের মন্ত্রী একজন অসুর। অনিরুদ্ধকে হত্যা করতে কৃতসঙ্কল্প বাণকে ইনি নিবৃত্ত করেন। পরে কৃষ্ণের হাতে বাণ মারা গেলে কুম্ভাণ্ড রাজা হন।

কুম্ভীনসী/কুম্ভনসী—(১) অনলার গর্ভে মাল্যবানের মেয়ে। (২) রাক্ষস সুমালী ও গন্ধর্বী কেতুমতীর মেয়ে (রামা ৭।৫।৪২)/কৈকসীর বোন। (৩) অঙ্গারপর্ণের (দ্রঃ) স্ত্রী। (৪) বিশ্বাবসু ও অনলার মেয়ে (রামা ৭।৬১।৭); সম্পর্কে রাবণের বোন। রাবণ দিক বিজয়ে গেলে কুম্ভকর্ণ ঘুমচ্ছেন ও বিভীষণ তপস্যায় মগ্ন দেখে এই সুযোগে মধুরাক্ষস কুম্ভনসীকে চুরি করে নিয়ে যান। রাবণ মধুকে শাস্তি দিতে গেলে ইনি রাবণকে শান্ত করেন। কুম্ভীনসীর ছেলে লবনাসুর; শত্রুঘ্ন এঁকে নিহত করেন।

কুম্ভীনাদী—সুমালী কেতুমতীর মেয়ে। কুম্ভীনসী (দ্র)। একটি মতে এই মেয়েকে মথুরার রাজা মধুপ অপহরণ করেন। রাবণের হাতে মধুপ মারা পড়েন।

কুম্ভীপাক—নরক। অকারণে জীবজন্তু হত্যা করলে এই খানে শাস্তি পেতে হয়।

কুরু—ঋক্‌বেদে কুরুশ্রবণ ও পাকস্থামা কৌরায়ণ (১০,৩৩,৪ এবং ৮.৩,২১) এই দুটি নাম আছে। কুরুকুলের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। ঐতরেয় ইত্যাদি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পঞ্চালকুলের সঙ্গে কুরুকুলের বার বার উল্লেখ আছে। কিন্তু ঋক্‌বেদে পঞ্চালের উল্লেখ নাই। মনে হয় কয়েকটি প্রাচীন কুলের সংমিশ্রণে কুরু ও পঞ্চালদের উৎপত্তি। পণ্ডিতদের মতে ঋক্‌বেদের ভরত ও পুরু ইত্যাদি বিভিন্ন কুল মিশে গিয়ে পরে কুরুকুল নামে প্রসিদ্ধ হয়। এঁদের মতে ঋক্‌বেদের ক্রিবি ও তুর্বশ কুলের মিশ্রণে পঞ্চাল কুল। ঋক্‌বেদে পুরু ও ভরত কুলকে সরস্বতী নদীর উপত্যকার সঙ্গে যুক্ত দেখা যায়। সম্মিলিত তৃৎসু ভরত কুল পুরুদের হারিয়ে দেন। ভরতদের কুলদেবী ভারতীর সঙ্গে

দেবীরূপা সরস্বতী নদীর সংস্রব থেকে পরে সরস্বতী ভারতীর উদ্ভব। কিন্তু ব্রাহ্মণগুলিতে এই সরস্বতী উপত্যকা অঞ্চল কুরুক্ষেত্র বা কুরুদের ভূমি। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে পরীক্ষিতের ছেলে জন্মেঞ্জয়ের রাজধানী আসন্দীবৎ। কিন্তু মহাভারতে এই রাজধানী হস্তিনাপুর (বর্তমানে মিরাট জেলা) ও ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লির কাছে)। আসন্দীবৎ কোথায় জানা নাই। অর্থাৎ মনে হয় উত্তরবৈদিক যুগে কুরুকুল বর্তমান উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম অংশ পর্যন্ত এগিয়ে আসে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কুরু, পঞ্চাল, বশ ও উশীনর এই চারটি বংশকে মধ্যদেশ বাসী বলা হয়েছে। আবার কুরুদের একাংশ হিমালয় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করলে এই অংশ উত্তরকুরু নামে পরিচিত হয়। পরবর্তী কালে উত্তরকুরু বলতে অবশ্য পৃথিবীর উত্তর অঞ্চলবাসী একটি কাল্পনিক জাতি বুঝাত। মহাভারতে কুরুজনপদ তিন ভাগে বিভক্ত :—(১) কুরুদেশ, (২) কুরুক্ষেত্র, (৩) কুরুজাঙ্গল। সমগ্র কুরুদেশকেও আবার কুরুজাঙ্গল বলা হয়েছে। মহাভারত ও পুরাণ অনুসারে জন্মেঞ্জয় রাওয়ালপিণ্ডিতে তক্ষশীলায় সর্প যজ্ঞ করেছিলেন, কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে রাওয়ালপিণ্ডি কুরুদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কুরুদের বংশ পরিচয় :—বৈবস্বত মনুর মেয়ে ইলার গর্ভে চন্দ্রের ছেলে বুধের ঔরসে পুরূরবা জন্মান। এইভাবে বৈবস্বত মনু (১)-ইলা(২)-পুরূরবা(৩)-যযাতি (৬)-পুরু(৭)-দুষ্মন্ত (২১)-ভরত (২২)-সংবরণ(৩১)-কুরু(৩২) অর্জুন (৫৩)-অভিমন্যু (৫৪)-পরীক্ষিৎ(৫৫)-জন্মেঞ্জয় (৫৬)-নিচক্ষু(৬০)-উদয়ন(৭৯)-ক্ষেমক-(৮৪)। শেষ রাজা ক্ষেমক। বংশটি কৌরব, পৌরব, ভারত বা চন্দ্রবংশ নামেও পরিচিত। পাণ্ডবরাও আসলে কৌরবই ছিলেন।

এই কুরুর মা তপতী। কুরু অত্যন্ত ধার্মিক রাজা ছিলেন। প্রয়াগ ত্যাগ করে সমন্তপঞ্চক তীর্থের কাছে কুরুক্ষেত্রে বাস করতেন। এই কুরুর স্ত্রী সৌদামিনীর ছেলে পরীক্ষিৎ, সুধন্ব (উপরিচর বসু বংশ) এবং আর এক স্ত্রীর ছেলে জহ্নু (ভীষ্ম এই বংশে) ও নিষধাশ্ব। আর এক মতে কুরুর (মভা ১।৮৯।৪৪) ঔরসে বাহিনীর গর্ভে অশ্ববান, অভিষ্যন্, চৈত্ররথ মুনি ও জন্মেজয়।

নিচক্ষু (৬০) পর্যন্ত এঁরা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করতেন। পরে গঙ্গার বন্যায় হস্তিনাপুর বিধ্বস্ত হলে বর্তমান এলাহাবাদের কাছে কৌশাম্বীতে নিচক্ষু রাজধানী নিয়ে আসেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে উদয়ন বুদ্ধের সমসাময়িক অর্থাৎ ৫০০ খৃ-পূ। উদয়নের উর্দ্ধতন ২৪-শ পুরুষ পরীক্ষিৎ খৃ-পূ ৯-১০ শতকের লোক মনে হয়। কারণ ২৪টি রাজার রাজত্বকাল মোটামুটি ৫০০ বছর মত। আর এক মতে পরীক্ষিতের জন্ম থেকে কলিযুগের সূচনা অর্থাৎ পরীক্ষিতের জন্ম ৩১০২ খৃ-পূ। অন্য মতে পরীক্ষিতের জন্ম ২৪৪৯ খৃ-পূ। দ্রঃ কুরুক্ষেত্র।

কুরুবংশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। যুধিষ্ঠির-দুর্যোধন-ভীষ্ম কেন্দ্রিক কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু জানা নাই। বৈদিক সাহিত্যে কুরুকুল, কুরুক্ষেত্র বিচিত্রবীর্যের ছেলে ধৃতরাষ্ট্র, পরীক্ষিতের ছেলে জন্মেঞ্জয় ইত্যাদির উল্লেখ আছে কিন্তু পাণ্ডু ও তাঁর ছেলেদের ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কোন ইঙ্গিত নাই। দ্রঃ- শান্তনু, ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, অভিমন্যু, জন্মেঞ্জয় ইত্যাদি।

আর কয়েক জন নাম উল্লেখযোগ্য কুরু রাজা :—স্বায়ম্ভুব মনু(১)-উত্তানপাদ(২)- ধ্রুব(২)-চাক্ষুষমনু(৬)-কুরু(৭)-বেণ(৯)। এই কুরুর আর দশ ভাই পুরু, উরু, সত্যদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক, শুচি, অগ্নিস্টু্য, অধিরথ/অতিরথ, সুদ্যুম্ন, অভিমন্যু। এই কুরুর স্ত্রী আগ্নেয়ী এবং ছেলে অঙ্গ, সুমনস, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস্, গয় ও শিবি। এ ছাড়া বিশেষ কিছু জানা নাই। এই অঙ্গ + সুনীথা = বেণ। (২) প্রিয়ব্রত বংশে আর এক জন কুরু রয়েছেন। প্রিয়ব্রতের স্ত্রী বহির্ষ্মতী ; ছেলে অগ্নীধ্র, ইধ্মজিৎ, যজ্ঞভানু, মহাবীর, ঘৃতপৃষ্ঠ, সব, হিরণ্যরেত, মেধাতিথি বীতিহোত্র, কবি, উর্জস্পতি, উত্তম, তামস, বৈরত। এবং অগ্নীধ্র + পূর্বচিত্তির ছেলে নাভি, কিম্পুরষ; হরি, ইলাবর্ত, রম্যক, হিরন্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল। এই কুরুর স্ত্রী ছিলেন নারী এবং আর কিছু জানা নাই। (৩) রন্তি দেবের এক ভাইয়ের নাম ছিল কুরু।

কুরুক্ষেত্র—২৯°১৫´ থেকে ৩০° উ × ৭৬°২০´ থেকে ৭৭° পূ। প্রাচীন নাম সমন্তপঞ্চক। পূর্ব পাঞ্জাবে কর্নাল জেলায়। বৈদিক যুগ থেকে পুণ্যভূমি। গীতাতে ধর্মক্ষেত্র বলে অভিহিত। মহাভারতে সরস্বতী নদীর দক্ষিণে ও দৃশদ্বতী (দ্র), বর্তমানে রক্ষী নদীর উত্তরে। মহাভারত মতে এখানে কুরুপাণ্ডবদের যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু মৈত্রায়নী সংহিতা, শতপথব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, জৈমিনী ব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র ইত্যাদি বৈদিক গ্রন্থে পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ আছে, কোন যুদ্ধের ইঙ্গিত নাই। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৫,১,১) কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে খাণ্ডব, উত্তরে তূর্ঘ্ন, পশ্চিমে পরীণঃ। মরুকে (রাজপুতানার মরুভূমি) বলা হয়েছে উৎকর (= যজ্ঞবেদি খোঁড়ার জন্য ওঠা মাটি)। কুরুক্ষেত্রের কাছেই মরুস্থলে সরস্বতী নদী বালিতে মিশে গেছে ফলে কুরুক্ষেত্রের অপর নাম অদর্শন বা বিনশন। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে আর্যাবর্তের পশ্চিম সীমা অদর্শন। মনুতে আর্যাবর্তের নাম মধ্যদেশ এবং পশ্চিম সীমা এই বিনশন। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রকে সমন্তপঞ্চকতীর্থ এবং ব্রহ্মার উত্তরবেদি বলা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের চতুঃসীমায় তরন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদ ও মচক্রুক। সরস্বতী, দৃশদ্বতী, আপয়া (চিটাঙের শাখা) ইত্যাদি নদী ও শরণ্যাবৎ নামে একটি হ্রদ এখানে ছিল। জাবালা উপনিষদে ও শতপথ ব্রাহ্মণে দেবতারা এখানে যজ্ঞ করতেন বলে উল্লিখিত। পুলস্ত্যের মতে কুরুক্ষেত্রের ধূলি যার গায়ে লাগে সেও মুক্তি পায়। পরশুরাম একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে এইখানে পিতৃ-তর্পণ করেছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে কুরু এখানে তপস্যা করে স্থানটিকে পুণ্য ক্ষেত্রে পরিণত করেন। কুরু যখন যজ্ঞ করছিলেন তখন সরস্বতী নদী সুবেণু/ওঘোবতী হয়ে এখানে এসে জমি ভিজিয়ে দিয়ে যান। যজ্ঞ করে এখানে হল চালনা করে কুরু বর পান এখানে যারা প্রাণ ত্যাগ করবে তারা স্বর্গে যাবে। কুরু এখানে সব সময়ই হল চালনা করতেন। ইন্দ্র এক দিন কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে জিনিসটা জানতে পারেন এবং ইন্দ্রের কাছে অন্যান্য দেবতারাও শোনেন। স্বর্গে যাবার এই সহজ পথ রোধ করার জন্য দেবতারা ইন্দ্রকে পাঠান এবং ইন্দ্র কুরুকে হল চালনা করতে বারণ করেন। ঠিক হয় এখানে উপবাস করে বা যুদ্ধ করে মারা গেলে এবং যারা আগের জন্মে মানুষ ছিল এ জন্মে পশু হয়ে জন্মেছে তারাও এখানে মারা গেলে স্বর্গে যাবে। কুরুক্ষেত্রে ইক্ষুমতী নদীর তীরে তক্ষক বাস করত। এখানে গন্ধর্ব চিত্রাঙ্গদের হাতে শান্তনুর ছেলে চিত্রাঙ্গদ নিহত হন। সুন্দ

উপসুন্দ এইখানে বাস করতেন। রাজা মান্ধাতা এখানে একবার যজ্ঞ করেছিলেন। মুদ্গল মুনি এখানে বাস করতেন। ভীষ্ম ও পরশুরামের লড়াই এইখানে হয়েছিল। বনবাসের সময় পাণ্ডবরা এখানে একবার ঘুরে গিয়েছিলেন। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ও ভীষ্মের শরশয্যাও এইখানে হয়েছিল।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ—কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর ছেলেদের মধ্যে ১৮ দিন ব্যাপী প্রচণ্ড সংঘর্ষ। কৌরব পক্ষে ১১ ও পাণ্ডব পক্ষে ৭ অক্ষৌহিণী (দ্রঃ) সৈন্য ছিল। অর্থাৎ মোট ৪৭২,৩৯২০ লোক অর্থাৎ আধকোটি মত লোক যুদ্ধে যোগদান করেছিল। আজকের যুগেও একটি রণক্ষেত্রে এত বড় বাহিনী চালান সম্ভবপর নয়। প্রাচীন কালের যুদ্ধে ২-৪ হাজার সেনা নিয়ে যুদ্ধ করাও খুব কঠিন কাজ ছিল। পূর্বে প্রাগ্-জ্যোতিষপুর এবং দক্ষিণে পাণ্ড্য দেশ/রাজ্য ইত্যাদি থেকে পাঞ্জাবে যুদ্ধ করতে সেই যুগে এসে উপস্থিত হয়েছিল এটা নিছক কল্পনা। এই সব রাজ্যগুলির মধ্যে কোন রাজনীতিক বা অর্থনীতিক সম্পর্ক ছিল তাও কোন প্রমাণ নাই। কোন রাজনীতিক লাভের দাবি না তুলে এই ভাবে যুদ্ধে যোগ দেওয়া একটা অসম্ভব কল্পনা। ঐতিহাসিক সত্য হয়তো সামান্য একটা সংঘর্ষ; কিন্তু কবিরা তাকে মহাকাব্য করে তুলেছেন। যুদ্ধের তারিখ ৩১০২ খৃ-পূ, ২৪৪৯ খৃ-পূ বা ১৯০০-১৪১৫ খৃ-পূর্বের মধ্যে। দুর্যোধন এখানে দ্বৈপায়ন (বর্তমান থানেশ্বর) হ্রদের তীরে আহত হন; এখান থেকে ২৭ কি-মি দক্ষিণে বা-স্থলী হচ্ছে প্রাচীন ব্যাসস্থলী। থানেশ্বরের ৮ কি-মি দক্ষিণে আমীন নামক যায়গায় অভিমন্যু মারা যান এবং অশ্বত্থামাও এইখানে পরাজিত হন। থানেশ্বরের ১৩ কি-মি পশ্চিমে ভোর নামক জায়গায় ভূরিশ্রবা এবং প্রায় ১৮ কি-মি দক্ষিণে নাগদু নামক স্থানে ভীষ্ম নিহত হন। এই যুদ্ধে পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই, কৃষ্ণ ও সাত্যকি, এবং কৌরবদের কৃপাচার্য, কৃপবর্মা, ও অশ্বত্থামা এই দশ জন বেঁচেছিলেন।

কুরুজাঙ্গল—প্রাচীন ভারতে একটি রাজ্য। রাজধানী হস্তিনাপুর। দ্রঃ কুরু।

কুরুপঞ্চাল—উত্তর বৈদিক সাহিত্যে কুরু ও পঞ্চাল এই দুটি কুলকে বহু জায়গায় একত্র উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এঁরা বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। মহাভারতে এঁদের মধ্যেই যেন যুদ্ধ হয়েছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় কুরুদের রাজধানী ছিল হস্তিনাপুর (বর্তমানে মিরাট) এবং বেরিলি জেলাতে অহিচ্ছত্রাতে (বর্তমান রামনগর) পঞ্চালরাজ রাজত্ব করতেন।

কুলাচল—কুলপর্বত। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিযাত্র (বা পারিপাত্র) এবং হিমালয় ধরলে আটটি কুলাচল। ওড়িশার সমগ্র পর্বতমালা ও পূর্বঘাট পর্বত মালার নাম মহেন্দ্র পর্বত। মহেন্দ্র পর্বত দক্ষিণে মলয় গিরির সঙ্গে যুক্ত। কাবেরী নদীর দক্ষিণে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দক্ষিণাংশ মলয়গিরি, ও কাবেরী নদীর উত্তরে পশ্চিম-ঘাট পর্বতমালার উত্তরাংশ সহ্যাদ্রি। শক্তিমান সম্ভবত মধ্যপ্রদেশের পর্বত-মালা। বিন্ধ্য পর্বতের মাঝের অংশ ঋক্ষপর্বত। চম্বল নদীর উৎস থেকে খাম্বাত উপসাগর পর্যন্ত লম্বা বিন্ধ্য পর্বতের পশ্চিমাংশ পারিযাত্র। আরাবল্লী পর্বত ও পারিযাত্রের অংশ।

কুলাচার—শক্তি পূজায় যে আচার বা মার্গ অনুসরণীয়। বামাচার বা বীরাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কুলাচারের অনুষ্ঠানে পঞ্চমকারের (মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুন,)

প্রয়োজন হয়। এগুলি অবৈদিক এবং এই জন্য নিন্দিত। সমর্থকরা বলেন এই মার্গ অতি কঠিন; অত্যন্ত সাবধানতার প্রয়োজন। তবে প্রকৃত অধিকারীর কোন ভয় নাই; এ মার্গ লম্পটের নয়।

কুশ—(১) রামের যমজ ছেলে কুশ ও লব। রাজা হয়ে লোক অপবাদের ভয়ে গর্ভবতী সীতাকে রাম বনে পাঠিয়ে দিলে বাল্মীকি আশ্রমে এঁদের জন্ম হয়। কুশগুচ্ছের অগ্রভাগ ও অধোভাগ দিয়ে তৈরি রক্ষা বন্ধনে সত্তজাত শিশুদের পূতনাদির হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন বলে বড় ছেলের নাম কুশ ও ছোট ছেলের নাম লব রাখেন। এক মতে সীতার একমাত্র এবং প্রথম ছেলে লব; বাল্মীকি আশ্রমে জন্ম। সীতা এক দিন ছেলেকে নিয়ে নদীতে স্নান করতে যান। বাল্মীকি জানতেন না; কোন বন্য জন্তু হয়তো লবকে খেয়ে ফেলেছে ভেবে কুশ দিয়ে একটি শিশু তৈরি করে রাখেন যাতে সীতা ফিরে এসে কিছু যেন বুঝতে না পারেন। নদী থেকে সীতা ফিরে এলে বাল্মীকি নিশ্চিন্ত হন; কুশ সীতার পালিত পুত্রে পরিণত হন। বাল্মীকি এঁদের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং রামায়ণ গান শিখিয়েছিলেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের সভায় বাল্মীকি এদের দুজনকে দিয়ে রামায়ণ গান করান। লক্ষ্মণের মৃত্যুর পর কুশকে রাম কোশল রাজ্যে/কুশাবতীতে এবং লবকে শ্রাবস্তীতে রাজা করে দেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর কুশ অযোধ্যার রাজা হন। কুশের বংশে শেষ রাজা মরু। তারপর বংশ লোপ পায়। দ্রঃ লব। (২) ব্রহ্মার এক ছেলে; প্রখ্যাত ঋষি। বৈদর্ভীর গর্ভে কুশের চার ছেলে হয় কুশাম্ভ, কুশনাভ (দ্রঃ), অমূর্তরজা ও বসু। এঁরা যথাক্রমে কুশাম্বী, মহোদয়পুর, ধর্মারণ্য ও গিরিব্রজ নামে একটি করে নগরী নির্মাণ করে দেশ শাসন করতে থাকেন। এই মহোদয়পুরই কান্যকুব্জ। (৩) পুরাণ মতে বরাহরূপী বিষ্ণুর লোম কুশ, অতি পবিত্র মনে করা হয়। কুশের আসন, কুশ স্পৃষ্ট জল, ধর্মকার্যে প্রশস্ত। এই জন্য হয়ত কুশ বা কুশাঙ্গুরীয় নিতে হয়। বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন ভাবে কুশ বেঁধে বিষ্টর, মোটক, ত্রিপত্র ও ব্রাহ্মণ ইত্যাদি তৈরি করে নিতে হয়; এগুলি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কাজে প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত। কুশের অভাবে কাশ ব্যবহৃত হয়। সধবা মেয়েদের কুশ ব্যবহার নিষিদ্ধ।

কুশণ্ডিকা—হোমের সূচনায় অগ্নি সংস্কার রূপ ক্রিয়া। কুশণ্ডিকা সংস্কৃত অগ্নিতে সমস্ত কার্যের হোম করণীয়।

কুশদ্বীপ—সপ্তদ্বীপের একটি। প্রচুর মুক্তা পাওয়া যেত। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এই সাতটি দ্বীপ। প্রতিটি দ্বীপের পরিমাণ যথাক্রমে আগের দ্বীপটির থেকে দ্বিগুণ বড়। দ্বীপের অধিপতি জ্যোতিষ্মান। এই দ্বীপে দেবতা, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর মানুষ সকলেই বাস করে।

কুশধ্বজ—(১) মিথিলার রাজা সীরধ্বজ-জনকের (দ্র) ভাই, সীতার কাকা। ইক্ষুমতী নদীর তীরে বাস করতেন। কুশধ্বজের মেয়ে মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি। (২) দেবগুরু বৃহস্পতির এক ছেলে। কপর্দক হীন অবস্থায় রাজা সাম্বের সাহায্য চান। কৃপণ রাজা বিশেষ কিছু দেন না। এরপর কুশধ্বজ অর্থের জন্য ভগবতীর ধ্যান করতে থাকেন। এই সময়ে কুশধ্বজের মুখ থেকে বেদবতী/দেববতী নামে একটি বালিকা জন্মায়। অন্য মতে বেদ পাঠ করার সময় মুখ থেকে জন্ম বালিকার

বয়স হলে অসুর শম্ভু (দ্র) তাকে বিয়ে করতে চান ; কিন্তু কুশধ্বজ সম্মত হন না ফলে অসুরের হাতে এক দিন রাত্রিতে নিহত হন এবং বেদবতী অভিশাপ দিয়ে অসুরকে ভস্মে পরিণত করেন। অন্য মতে অভিশাপ দেন লক্ষ্মণের হাতে মারা যাবে। এর পর বেদবতী বিষ্ণুকে বিয়ে করার জন্য তপস্যা করতে থাকেন। এই সময়ে রাবণ এসে একে বিয়ে করতে চান এবং চুলের মুঠি ধরে টানতে থাকেন। বেদবতী নিজের চুল কেটে পালিয়ে যান এবং আগুনে দেহ বিসর্জন করেন। পর জন্মে ইনি সীতা হয়ে জন্মান। (৩) একটি বানর ; শিবের বরে পর জন্মে কুশধ্বজ রাজা হিসাবে জন্মান। অগ্নিবেশ মুনির কন্যা যখন স্নান করছিলেন রাজা তখন মেয়েটিকে হরণ করেন। ফলে মুনি শাপ দিয়ে রাজাকে শকুনিতে পরিণত করেন। মুনি বলে দিয়ে ছিলেন ইন্দ্রদ্যুম্নকে সাহায্য করলে সে দিন আবার মানুষের দেহ ফিরে পাবে।

কুশনাভ—ব্রহ্মার এক ছেলে কুশ (দ্র)। এই কুশ মুনির স্ত্রী বৈদর্ভী এবং চার ছেলে কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্তরজা ও বসু। এই কুশনাভ মহোদয় (=কন্যাকুব্জ দ্র) নামে নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর স্ত্রী ঘৃতাচী এবং ঘৃতাচীর একশত সুন্দরী মেয়ে হয়। কুশনাভ পরে একটি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন এবং কুশ মুনি অন্য মতে ব্রহ্মা এসে সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন ; ছেলে হয় গাধি। অন্য মতে কুশনাভের নাতি গাধি।

কুশপ্লব—একটি পুণ্য স্থান। এখানে দিতি ইন্দ্রের সমান পুত্র লাভের জন্য তপস্যা করেছিলেন। এবং এই খানেই ইন্দ্র দিতির গর্ভে প্রবেশ করে গর্ভ টুকরো টুকরো করেন।

কুশবতী—দেবতারা এখানে মন্ত্রযজ্ঞ করেছিলেন ; কুবের এই যজ্ঞে মনিমানকে নিয়ে আসছিলেন। অগস্ত্য (দ্র) মনিমানকে শাপ দেন। মহ (৩।১৫৮।৫১)।

কুশস্থল—অন্য নাম কান্যকুব্জ।

কুশস্থলী—দ্বারকার প্রাচীন নাম। আনর্ত দেশের রাজধানী। রাজা ইক্ষ্বাকুর ভাইপো এর প্রতিষ্ঠাতা। আনর্তের ছেলে রেবত এখানে প্রথম নগরী স্থাপন করে ছিলেন। কিছু কাল পরে এই নগরী জলে ডুবে যায় এবং স্থানটি পরিত্যক্ত হয়। পরে বাসুদেব/কৃষ্ণ এখানে দ্বারকা নগরী প্রতিষ্ঠা করান। যদুবংশ ধ্বংস হবার পর দ্বারকা আবার জলে ডুবে যায়। এই দ্বারকা মনে হয় গুজরাটের পশ্চিমে একটি দ্বীপ। স্কন্দপুরাণে অবন্তির রাজধানী উজ্জয়িনীকে কুশস্থলী বলা হয়েছে। দ্র কুশাবতী।

কুশাবতী—অপর নাম কুশস্থলী (দ্র)। রামচন্দ্রের ছেলে কুশ কিছু দিনের জন্য বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে কুশাবতীতে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এই কুশাবতী বিন্ধ্যের দক্ষিণে দক্ষিণ-কোশল রাজ্যের অন্তর্গত সম্ভবত। ওড়িশা ও মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত সম্বলপুর-রায়পুর-বিলাসপুর অঞ্চলের প্রাচীন নাম দক্ষিণ কোশল। একটি মতে গুজরাটের অন্তর্গত ভরোচের প্রায় ৬১ কি-মি উ-পূর্বে দাভোই (=দর্ভবতী) হচ্ছে কুশাবতী। অন্য মতে অবধের অন্তর্গত সুলতানপুরে কুশের রাজধানী ছিল। আর এক মতে লাহোরের ৫১ কি-মি দ-পূর্বে কাসুর হচ্ছে এই কুশস্থলী। (২) বুদ্ধের পরি-নির্বাণের ক্ষেত্র কুশীনগর বা কুসিনারার প্রাচীন নাম কুশাবতী ; এই কুশাবতী প্রাচীন মল্লরাজ্যের অন্তর্গত এবং গোরক্ষপুর জেলাতে অবস্থিত।

কুশাম্ব—(১) উপরিচর বসুর ছেলে বৃহদ্রথ, কুশাম্ব, মাভেল্লা, যদু ও রাজন্য। (২) কুশের একটি ছেলে; কৌশাম্বী নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। মেয়ে চার্বাঙ্গী; সূর্যবংশে রাজা ভদ্রশরেণ্যর স্ত্রী, কুশাম্বের দুই ছেলে শক্র ও গাধি। দ্রঃ কুশনাভ, কুশিক।

কুশিক—(১) কুশনাভের ছেলে কুশিক। গাধির পিতা। বিশ্বামিত্রের পিতামহ। ইন্দ্রের সমান ছেলে পাবার আশায় তপস্যা করেন। ইন্দ্র এসে একবার দেখে যান; তারপর হাজার বছর পরে আবার দেখে যান। শেষ কালে স্ত্রী পৌরকুৎসীর গর্ভে ইন্দ্র পুত্র হয়ে জন্মান। এই ছেলে গাধি; অর্থাৎ ইন্দ্রের অবতার। গাধির ছেলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব পাবেন জানতে পেরে চ্যবন বিচলিত হয়ে পড়েন যে কুশিক বংশ থেকে তাঁর নিজের বংশে ক্ষত্রিয়ত্ব সঞ্চারিত হবে। এই জন্য চ্যবন কুশিক বংশ নষ্ট করতে চেষ্টা করেন; কিন্তু সফল হন নি। (২) দুষ্মন্ত(১)-ভরত(২)-অজমীঢ়(৫)-কুশিক(৮)। (৩) সর্পদষ্ট প্রমদ্বরাকে এক জন কুশিক দেখতে এসেছিলেন।

কুশী—অন্য নাম কৌশিকী। রামায়ণ ও বরাহপুরাণে একটি নদী। কথিত আছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখন গঙ্গার একটি উপনদী। নেপালে নাম সপ্তকুশী। বরাহ ক্ষেত্রের ৫-কি-মি উত্তর থেকে সাতটি নদী মিলে সমতলে নেমে এসেছে।

কুশীনগর—২৬°৪৫´ উ×৮৩°৫৫´পূ। উত্তর প্রদেশে দেওড়িয়া জেলায় কাসিয়া। স্থানীয় নাম মাথা-কুঅর-কা-কোট। বর্তমানের কাসিয়া সহরের দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় ৩ কি-মি এবং সদর সহর দেওড়িয়ার উ-পূর্বে প্রায় ৩৫ কি-মি দূরে প্রাচীন কুশীনগরে বৌদ্ধধ্বংসাবশেষ রয়েছে। কুশীনগরের প্রাচীন নাম কুশাবতী (দ্র)। এখানে মল্লবংশীয় রাজা মহাসুদর্শনের রাজধানী ছিল। এটি ছিল গণতন্ত্র। বুদ্ধদেবের সময় কুশীনগরের সমৃদ্ধি বিলুপ্ত প্রায়। পরিনির্বাণের কিছু পরে এই রাজ্য মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে পড়ে। এই সহরের উপবর্তনে হিরণ্যবতী নদীর সমীপে মল্লদের শালকুঞ্জে বুদ্ধদেব পরিনির্বাণ লাভ করেন। এখানকার সংঘারামগুলির মধ্যে মহাপরিনির্বাণ বিহার ও মুকুটবন্ধন বিহার উত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্মের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেদের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

কুষ্মাণ্ড—শিবের অনুচর: এক শ্রেণীর দানব। একটি সাপ।

কুসুমপুর—কান্যকুব্জের আর এক নাম।

কুহূ—দ্রঃ স্মৃতি।

কূর্চামুখ—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে। ব্রহ্মবাদী।

কূর্ম—বৈদিক যুগ থেকে বিভিন্ন দেবতার সঙ্গে জড়িত। (১) শতপথ ব্রাহ্মণে আছে ব্রহ্মা নিজে সৃষ্টির জন্য কূর্মরূপ ধারণ করেছিলেন। (২) বিষ্ণুর দ্বিতীয়, অন্য মতে একাদশ অবতার। প্লাবনে যে সব আবশ্যক বস্তু ডুবে গিয়ে ছিল সত্য যুগে সেগুলি তোলবার জন্য বিষ্ণু কূর্মরূপে নিজেকে ক্ষীরোদ সাগরের নীচে স্থাপন করে পিঠে মন্দার পর্বত ধারণ করেন। মন্দার পর্বত মন্থন দণ্ড হয়েছিল; অমৃত ইত্যাদি দেবতারা লাভ করেন। মন্দার খুব বেশি উঠে গেলে বিষ্ণু আবার শ্যেন হয়ে মন্দারের ওপর এসে বসে মন্দারকে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করেন। দ্রঃ অকূপার। ভাস্কর্যে দশ অবতারের মূর্তির মধ্যে কখনো প্রকৃত কচ্ছপ আকৃতি আবার কখনো উপর ভাগে চার হাত বিষ্ণু এবং নীচের অংশ কচ্ছপ। (৩) জলদেবী যমুনার বাহন। মন্দির ইত্যাদির দরজায়

মকর বাহন গঙ্গা ও কূর্মবাহন যমুনার মূর্তি দেখা যায়। (৪) জৈন তীর্থঙ্কর মুনি সুব্রতের লাঞ্ছন এই কূর্ম।

কৃত—জনক বংশে একজন রাজা। ছেলে শুনক। কৃতের সাতটি অতি সুন্দরী মেয়ে ছিল। এরা অতি বাল্যেই সমস্ত বাসনা ও বন্ধন জয় করে শ্মশানে গিয়ে মাটিতে শুয়ে থাকেন এবং নিজেদের দেহ পশুপাখীদের ভক্ষ্য হিসাবে দান করেন।

কৃতদ্যুতি—রাজা চিত্রকেতুর একটি স্ত্রী। সমস্ত স্ত্রীগুলিই নিঃসন্তান ছিলেন। রাজা অঙ্গিরসের আরাধনা করে বর পান এবং কৃতদ্যুতির একটি সন্তান হয়। কিন্তু সপত্নীরা তাকে বিষ দিয়ে হত্যা করেন। রাজারাণী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লে নারদ ও অঙ্গিরস এসে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেন এবং শেষ অবধি অঙ্গিরস মৃত শিশুর আত্মাকে এনে উপস্থিত করেন। এই আত্মা সকলকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করে বলেন বহু জন্মই তাঁকে জন্মাতে হয়েছে ; সব পিতামাতা চান তাঁদের সন্তান বেঁচে উঠুক ; এদের মধ্যে তিনি কার দাবি পূর্ণ করবেন। রাজা ও কৃতদ্যুতি কোন সদুত্তর দিতে পারেন না ; আত্মা ফিরে যায়। এর পর এঁরা দুজনে পৃথিবী পর্যটনে বার হন। কৈলাসে শিবের কোলে পার্বতীকে বসে থাকতে দেখে চিত্রকেতু নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়েন এবং পার্বতীকে অবজ্ঞা করেন। ফলে পার্বতীর শাপে চিত্রকেতু বৃত্রাসুর হয়ে জন্মান। কৃতদ্যুতি এই শাপ শুনে আত্ম বিসর্জন করেন।

কৃতবর্মা—(১) বৃষ্ণি বংশে এক রাজা। যযাতি(১)-যদু(২)-হেহয়(৫)-ধনক(৯)। ধনকের ছেলে কৃতবর্মা, কৃতবীর্য, (দ্র), কৃতাগ্নি, ও কৃতৌজস্। (২) ভোজ বংশে এক যোদ্ধা। স্যমন্তক মণি নিয়ে কলহের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অভিমন্যু বধের সপ্তরথীর এক জন। অশ্বত্থামা যখন রাত্রি বেলা পাণ্ডব শিবির আক্রমণ করে ছিলেন তখন কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা শিবিরের দরজায় পাহারা ছিলেন। কৌরব পক্ষে যে তিন জন যোদ্ধা বেঁচে গিয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে এক জন। যদুবংশ ধ্বংশের সময় সাত্যকির হাতে নিহত (৩) ভোজের নাতি কৃতবর্মা। কৃতবীর্য(১)-বৃষ্ণি(৪)-সাত্যকি(৮)-ভোজ(১৭)-কৃতবর্মা(১৯)। এই ব্যক্তি কৃষ্ণের পিতামহ শূরসেনের ভাই।

কৃতবীর্য—চন্দ্রবংশে রাজা ধনকের চার ছেলে কৃতবীর্য, কৃতবর্মা (দ্র) কৃতাগ্নি ও কৃতৌজস্।

কৃতমালা—এই নদীতে বিষ্ণু মৎস্যরূপে প্রথম দেখা দেন।

কৃতাগ্নি—দ্রঃ কৃতবীর্য।

কৃতাশ্ব—দক্ষ ও বীরণীর ৬০-টি মেয়ে ; এদের মধ্যে ১৩ জনকে কশ্যপ, ১০ জনকে ধর্ম, ২৭ জনকে চন্দ্র, ২ জনকে ভৃগু, ৪ জনকে অরিষ্টনেমি, ২-জনকে কৃশাশ্ব, (দ্র) এবং ২-জনকে অঙ্গিরস বিয়ে করেন।

কৃতি—(১) জৈমিনির ছেলে সুমন্ত, সুমন্তর ছেলে সুত্বা, সুত্বার ছেলে সুকর্মা। সুকর্মার শিষ্য হিরণ্যনাভ এবং হিরণ্যনাভের শিষ্য কৃতি। সামবেদের ২৪-টি সংহিতা এই কৃতির রচনা। (২) নহুষের কনিষ্ঠ পুত্র। (৩) একজন বিশ্বদেব।

কৃত্তিকা—(১) একটি নক্ষত্র পুঞ্জ (এটা টাউরি। প্লেইডস্)। স্কন্দ জন্মালে দেবতারা অন্য মতে পার্বতী ছয় জন মাতৃকাকে ধাত্রী হিসাবে স্তন্য দেবার জন্য পাঠান। মহাভারত (৯।৪৩।১১) অনুসারে এঁরা নিজেরাই ছুটে এসেছিলেন। একটি মতে শিশুর ছয়টি মুখ

ছিল বলে এরা ছয় জন এসে ছিলেন। আরএকটি মতে এরা ছয় জন এসে ছিলেন বলে শিশুর ছয়টি মাথা হয়েছিল। স্তন্যদান শেষ হলে এঁরা আকাশে উঠে গিয়ে কৃত্তিকা নক্ষত্রে পরিণত হন। (২) দক্ষের একটি মেয়ে কৃত্তিকা ; চন্দ্রের স্ত্রী ; চন্দ্র যক্ষা গ্রস্ত ছিলেন বলে চন্দ্রের কোন স্ত্রীর সন্তান হয় নি।

কৃত্যা—একজন রাক্ষসী। অথর্ব বেদে অভিচার অংশের মন্ত্র বলে এই রাক্ষসী জন্মায় এবং শত্রু ধ্বংস করে। পুরুষ রূপেও জন্মাতে পারে। (১) বনবাসের পর পাণ্ডবদের অর্দ্ধেক রাজত্ব ফিরিয়ে দেবার যখন কথা উঠেছিল তখন অসুররা মন্ত্রপাঠ করে এই কৃত্যাকে সৃষ্টি করে পাঠান। কৃত্যা দুর্যোধনকে পাতালে ধরে নিয়ে যান ; এখানে অসুররা দুর্যোধনকে সমর্থন করেন ; পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে নিষেধ করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন দুর্যোধনকে সব বিষয়ে সাহায্য করবেন। অসুররা তার পর দুর্যোধনকে হস্তিনাপুরে পৌছে দেন। (২) চ্যবন অশ্বিনীকুমারদের সোমপানের অধিকার দিতে গেলে ইন্দ্র বাধা দেন এবং বজ্রাঘাত করবেন স্থির করেন। চ্যবন তখন ইন্দ্রের হাত স্তম্ভিত করে দিয়ে যজ্ঞাগ্নি থেকে এক জন কৃত্যার সৃষ্টি করেন ; নাম ছিল মদ ; অতি ভয়ঙ্কর চেহারা ; একে দেখে ভীত হয়ে ইন্দ্র সোমপানে সম্মতি দেন। (৩) অম্বরীষকে (দ্র) এক কৃত্যা হত্যা করতে যায়। (৪) কৃষ্ণ যখন দ্বারকাতে রাজা তখন কারুষ দেশে পৌণ্ড ক-বাসুদেব রাজা। ইনি এক বার কৃষ্ণকে বলে পাঠান কৃষ্ণ যেন তাঁকে প্রণাম করে যান। কৃষ্ণ রাগে সুদর্শন চক্রে রাজার শিরশ্ছেদ করেন। রাজার ছেলে সুদক্ষিণ তখন কাশীতে এসে শিবের তপস্যা করতে থাকেন এবং শিবের কাছ থেকে কি করে কৃত্যা সৃষ্টি হয় শিখে নেন। সুদক্ষিণ তারপর অগ্নি থেকে কৃত্যার জন্ম দিলে এই কৃত্যা কৃষ্ণকে নিধন করতে ছুটে যান কিন্তু সুদর্শন চক্রে এই কৃত্যা ও সুদক্ষিণ দুজনেই নিহত হন। (৫) প্রহ্লাদের চরিত্র পরিবর্তনের জন্য তাঁর শিক্ষকরা আগুন থেকে কৃত্যার সৃষ্টি করেছিলেন। এই কৃত্যা প্রহ্লাদের গলায় শূলবিদ্ধ করতে চেষ্টা করলে শূল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। কৃত্যা তখন ক্রোধে এই শিক্ষকদের আক্রমণ করে মৃতপ্রায় করে দেন। প্রহ্লাদ এঁদের গায়ে হাত দিয়ে সুস্থ করেন। (৬) বৃষাদর্ভি যাতুধানী নামে এক কৃত্যার সৃষ্টি করে সপ্তর্ষিদের হত্যার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। মহা ১৩।৯৪।৪০।

কৃপ—বা কৃপাচার্য। নহুষ(১)-যযাতি(২)-সঞ্জাতি(১১)-দুষ্মন্ত(১৬)- ভরত(১৭)-অজমীঢ় (২৪)-মুদ্গল(৩২)। মুদ্গলের কন্যা অহল্যা। গৌতমের স্ত্রী, ছেলে শতানন্দ। শতানন্দের ছেলে সত্যধৃতি এবং সত্যধৃতির ছেলে শরদ্বান (দ্রঃ)। শরদ্বান কঠোর তপস্যা করছিলেন ; বেদ পাঠে সে রকম মন ছিল না ; ধনুর্বিদ্যায় অত্যন্ত কুশলী হয়ে ওঠেন। ইন্দ্র/দেবতারা ভয় পেয়ে অপ্সরা জানপদী/রম্ভাকে পাঠান। এক বস্ত্র পরিহিতা অপ্সরা সামনে এসে নাচতে থাকেন। ফলে মুনির বীর্যপাত হয়, পাশেই ধনুর্বাণ ছিল ; এই বাণের ওপর বীর্য পড়ে দুভাগ হয়ে একটি ছেলে ও একটি মেয়েতে পরিণত হয়। রাজা শান্তনু শিকারে এসে এদের দেখতে পান এবং রাজপ্রাসাদে এনে কৃপা করে মানুষ করেন। এই জন্য নাম কৃপ ও কৃপী। শরদ্বান পরে জানতে পেরে হস্তিনাপুরে এসে সব কথা জানান এবং কৃপকে ধনুর্বান শিক্ষা দেন। কৃপ অদ্বিতীয় হয়ে ওঠেন। কৃপের কাছে কুরুপাণ্ডবরা ও যাদবরা ছাড়াও বহু বহু রাজা ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেন। কুরুপাণ্ডবদের অস্ত্র পরীক্ষার সময় কর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে এলে

এই কৃপাচার্যই সূতপুত্র বলে কর্ণকে বাধা দিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ইনি কোষাগারের দায়িত্ব ও দক্ষিণা দেবার ভার নিয়েছিলেন। অজ্ঞাত বাসের সময় দুর্যোধনের নিযুক্ত চরগুলিকে যুধিষ্ঠিরদের খুঁজে বার করবার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন এবং দুর্যোধনকে রাজকার্যে পরামর্শ দিতেন। কুরুক্ষেত্রে বহু পাণ্ডব যোদ্ধা নিহত করেন। অশ্বত্থামাকে এক বার দুর্যোধনকে আটকাতে বলেন যাতে দুর্যোধন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না পারেন। অভিমন্যু বধের সপ্তরথীদের মধ্যে এক জন। দ্রোণ মারা গেলে কৃপ ভয়ে পালিয়ে যান। কর্ণকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে বলেছিলেন। যুদ্ধের শেষে দ্বৈপায়ন হ্রদে পালিয়ে যান এবং যুধিষ্ঠিররা এখানে এলে কৃপ এখান থেকেও পালান। দুর্যোধনের উরু ভঙ্গের পর দুর্যোধনের নির্দেশে অশ্বত্থামাকে সেনাপতি করেন এবং রাত্রি বেলা গোপনে পাণ্ডব শিবির আক্রমণ করেন। যুদ্ধে অবশিষ্ট তিন জন কৌরব বীরের মধ্যে এক জন। দ্রঃ কৃতবর্মা। যুদ্ধের পর পাণ্ডবরা এঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বনে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সঙ্গে নেন নি। মহাপ্রস্থানের সময় পাণ্ডবরা এঁকে পরিক্ষিতের গুরু নিযুক্ত করে যান। শেষ পর্যন্ত বনে গিয়ে দেহত্যাগ করেন।

কৃপী—কৃপের (দ্রঃ) বোন। দ্রোণের স্ত্রী ; অশ্বত্থামার মা।

কৃমি—অঙ্গবংশে এক রাজা। উশীনরের (দ্রঃ) স্ত্রী কৃমী ; কৃমীর ছেলে কৃমি।

কৃমিভোজন—একটি নরক।

কৃশাশ্ব—একজন প্রজাপতি। দক্ষের (দ্রঃ অসিক্নী) কন্যা জয়া ও সুপ্রভাকে বিয়ে করেন। জয়ার মহাতেজস্বী মন্ত্ররূপ ৫০-টি ছেলে হয়। এবং সুপ্রভার সংহার নামে শর রূপ ৫০-টি ছেলে হয়। এরা জৃম্ভকাস্ত্র নামে পরিচিত। বিশ্বামিত্র তপস্যার বলে এই ১০০ ছেলে/শরগুলি নিজের করে নেন ; এবং রামলক্ষ্মণকে এগুলি দান করেছিলেন। কৃশাশ্ব তনয়ান্ রাম ভাস্বরান্ কামরূপিণঃ (রামা ১।২৮।১০)।

কৃষ্ণ—বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার বলে স্বীকৃত। যদুবংশে জন্ম। নহুষ(১)-যযাতি(২)-কার্ত্তবীর্যার্জুন(১২)-শিনি(১৯)-পৃষ্ণি(২৫)-হার্দিক(৩০)-শূরসেন(৩১)-বসুদেব(৩২)। কংসের(দ্র) বোন দেবকীর সঙ্গে বসুদেবের বিয়ে হয়। বরুণের শাপে কশ্যপ (দ্র) অদিতি ও সুরমা যথাক্রমে বসুদেব, দেবকী ও রোহিণী হয়ে জন্মান। ব্রহ্মার হৃদয় থেকে ধর্ম জন্মান এবং দক্ষের মেয়েদের বিয়ে করেন ; সন্তান হয় হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ। হরিও কৃষ্ণ যোগী হয়ে যান ; নর ও নারায়ণ মুনি হয়ে যান। এই নারায়ণ (দ্র) মুনি অপ্সরাদের বর দিয়েছিলেন কৃষ্ণ হয়ে জন্মে এঁদের বিয়ে করবেন। কাব্যমাতাকে (দ্র) হত্যা করার জন্য ও ভৃগুর শাপ ছিল বিষ্ণুকে বার বার জন্মাতে হবে। আর একটি ঘটনা পৃথিবী একবার ধেনুরূপ ধরে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন দেবাসুরের যুদ্ধে যে সব অসুররা মারা গেছেন তাঁরা সকলে দুষ্ট রাজা হয়ে পৃথিবীতে জন্মাচ্ছেন ; পৃথিবী এদের ভার সহ্য করতে পারছেন না। ব্রহ্মা তখন শিবের কাছে এবং শিব বিষ্ণুর কাছে যান। এবং বিষ্ণু আশ্বাস দেন তিনি বসুদেবের ছেলে হয়ে জন্মাবেন ; দেবতারা গোপ হয়ে এবং অপ্সরারা যেন গোপিকা হয়ে জন্মান।

কংসের (দ্র) হাতে দেবকীর প্রথম ছয়টি সন্তান নিহত হয়। সপ্তম সন্তান অনন্তের অংশে ; গর্ভকালে সন্তানটিকে রোহিণীর গর্ভে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গর্ভ

নষ্ট হয়ে গেছে খবর ছড়ায়। অষ্টমবার গর্ভ হলে কারাগারে কঠোর পাহারার ব্যবস্থা হয়। জন্ম রাত্রে কৃষ্ণাষ্টমীতে সিংহ মাসে বসুদেবের সামনে ভগবান এসে নির্দেশ দেন যে শিশু জন্মালেই তাকে নন্দের স্ত্রী যশোদাকে দিয়ে যশোদার সদ্য জাত মেয়েটিকে নিয়ে আসতে হবে। মাঝরাতে মহামায়ার মায়াতে সকলে অচৈতন্য হয়ে পড়লে কৃষ্ণের জন্ম হয়; কারাগারের দরজা খুলে যায়। বসুদেব ছেলেকে নিয়ে বার হয়ে যান; পথে বৃষ্টিতে শেষ নাগ ফণা ধরে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করেন, এবং হেঁটে যমুনা পার হয়ে যশোদার বাড়িতে আসেন। এখানেও সকলে অচৈতন্য, ঘরের দরজা উন্মুক্ত; বসুদেব কৃষ্ণকে রেখে যশোদার মেয়েকে নিয়ে ফিরে আসেন। প্রহরীদের তখন ঘুম ভাঙে; কংস (দ্র) সন্তান হয়েছে খবর পান।

বসুদেব বলরামকেও নন্দালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং দুই ভাইয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ছেলেদের বিপদ হতে পারে এই ভয়ে বসুদেব নন্দকে মথুরা ছেড়ে গোকুলে চলে যেতে বলেছিলেন। ফলে নন্দ এঁদের নিয়ে চলে যান।

এর পর ক্রমাগত কংসের চরেরা কৃষ্ণকে হত্যা করবার জন্য আসতে থাকে। প্রথমে আসে পূতনা (দ্র) এবং মারা যায়। তার পর শকটাসুর (দ্র) ও তৃণাবর্ত (দ্র) আসে। কৃষ্ণ স্তন্য পান করছিলেন, তৃণাবর্ত আসলে কৃষ্ণ ক্রমশ ভারী হয়ে ওঠেন; যশোদা কোলে রাখতে পারেন না; অবাক হয়ে কৃষ্ণকে মাটিতে নামিয়ে দেন; তৃণাবর্ত কৃষ্ণকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন।

এর পর গর্গ মুনি এক দিন এসে দেবকীর ছেলের নাম কৃষ্ণ ও রোহিণীর ছেলের নাম বলরাম রেখে যান। শিশু কৃষ্ণ এক দিন মুখে মাটি পুরলে যশোদা ছুটে আসেন এবং মুখ থেকে মাটি বার করে দিতে গিয়ে কৃষ্ণের মুখের মধ্যে বিশ্ব চরাচর ফুটে রয়েছে দেখে সম্ভ্রমে চোখ বুজিয়ে নেন। এক দিন কৃষ্ণকে স্তন্য দিতে দিতে যশোদা দেখেন উনুনে দুধ ওৎলাচ্ছে; তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে যশোদা দুধ দেখতে গেলে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে ঢিল মেরে দুধের হাঁড়ি ভেঙে দেন। যশোদা তখন রেগে গিয়ে দড়ি দিয়ে কৃষ্ণকে উদূখলের সঙ্গে বাঁধতে চেষ্টা করেন। কিন্তু যতই দড়ি আনেন সব দড়ি ছোট হয়ে যায়। যশোদা শেষ অবধি ক্লান্ত হয়ে পড়লে কৃষ্ণ তাঁকে বাঁধতে দেন। এবং বাঁধা হলে কৃষ্ণ উদূখল নিয়েই ছুটতে থাকেন। দুটি গাছের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় গাছ দুটিতে এই উদূখল আটকে যায়। গাছ দুটি ছিল নারদের শাপগ্রস্থ নলকুবর (দ্র) ও মণিগ্রীব; দুজনেই এঁরা শাপমুক্ত হয়ে যান।

এর পর বৎসাসুর (দ্র) বকাসুর (দ্র) ও অঘাসুর নিহত হন। কৃষ্ণ এক বার গোপাল বালকদের সঙ্গে খেলা করছিলেন; ব্রহ্মা সেই সময় কৃষ্ণকে পরীক্ষা করার জন্য সমস্ত গরু চুরি করেন। কৃষ্ণ তখন গরু খুঁজতে গেলে ব্রহ্মা গোপাল বালকদেরও চুরি করেন। কৃষ্ণ তারপর এদেরও দেখতে না পেয়ে খেয়াল করেন কি ঘটেছে এবং নিজের ক্ষমতায় নতুন করে গরু ও গোপালদের তৈরি করে নেন। এই ভাবে এক বছর কেটে যায়। তারপর ব্রহ্মা এক দিন দেখতে এসে দেখেন এই গোপালরা সকলেই যেন এক এক জন বিষ্ণু এবং দেখেন আর একদল ব্রহ্মা ও আর একটি ব্রহ্মলোক সামনে ফুটে রয়েছে। ব্রহ্মা ভয় পেয়ে স্তব করে কৃষ্ণের কাছে মার্জনা চেয়ে নেন। এর পর কৃষ্ণ কালীয় (দ্র) দমন করেন। যমুনার জল বিষমুক্ত হয়। কালীয় দমন

ঘটার পর সূর্য অস্ত যায়; গোপাল বালকরা যমুনা তীরে সেই খানেই আগুন জ্বেলে রাত কাটাবেন ঠিক করেন। কিন্তু রাত্রিতে ব্যাপক ও ভয়াবহ আগুন ছড়িয়ে পড়ে; কৃষ্ণ এই আগুন গ্রাস করে দমন করেন। এর পর এক দিন প্রলম্ব অসুর (দ্র) আক্রমণ করতে আসে। শ্রীদাম কৃষ্ণকে, বৃষভ ভদ্রসেনকে, বলরাম প্রলম্বকে হারিয়ে দেন। যমুনা তীরে মুঞ্জা বনে এক দিন দাবাগ্নিতে গোপাল বালকরা আটকে পড়ে ভয়ে চিৎকার করতে থাকে। কৃষ্ণ শুনতে পেয়ে ছুটে এসে এদের চোখ বুজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেন এবং সেই দাবাগ্নি গ্রাস করে ফেলেন। এরা চোখ খুলে কোন আগুন দেখতে পায় না। কৃষ্ণ এক দিন তাঁর সাথীদের নিয়ে যমুনার তীর ধরে বহু দূর এগিয়ে যান। ক্ষিদে পায়; এবং এক ব্রাহ্মণের ঘরে গিয়ে এরা তখন খেতে চান। কৃষ্ণকে দেখে ব্রাহ্মণী পরম যত্নে সকলকে পরিতুষ্ট করে খেতে দেন। গোপিকারা একবার যমুনাতে স্নান করতে নামলে কৃষ্ণ এদের সমস্ত বস্ত্র চুরি করে গাছে উঠে যান এবং গাছে বসে বাঁশি বাজাতে থাকেন। এরা নিরুপায় হয়ে স্তবস্তুতি করে বস্ত্র ফিরে পান।

গোকুলে বৃষ্টির জন্য প্রতি বছর ইন্দ্রের পুজা করা হত। কৃষ্ণ বাধা দেন; গোধনের আশ্রয়দাতা গোবর্দ্ধন পাহাড়কে পূজা করতে পরামর্শ দেন। গোবর্দ্ধনের পূজাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে প্রবল বৃষ্টিতে পাহাড়টিকে ডুবিয়ে বা ভাসিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। কৃষ্ণ ইন্দ্রের মতলব বুঝতে পেরে গোবর্দ্ধন পাহাড়টিকে আঙুলে করে সাত দিন ছাতার মত তুলে ধরে থাকেন; নীচে গোকুলের সকলে আশ্রয় নেয়। ইন্দ্র ফলে হেরে গিয়ে কৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন; এবং স্বর্গ থেকে সুরভি এসে গোপালকদের ইন্দ্র বলে কৃষ্ণকে অভিষেক করে যান; এবং দেবতারা নাম দেন গোবিন্দ। নন্দ একবার একাদশী করে যমুনাতে স্নানে এলে বরুণের নির্দেশে বরুণের এক অনুচর নন্দকে চুরি করে বরুণের প্রাসাদে নিয়ে যান। কৃষ্ণ ও বলরাম বুঝতে পেরে যমুনাতে নেমে বরুণের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলে বরুণ জানান কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দেখবার জন্য এই কাজ করেছেন এবং ক্ষমা চেয়ে নেন। নন্দকে নিয়ে এরা দুজনে ফিরে আসেন। বসন্ত এলে গোকুলে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাতেন এবং গোকুলে সমস্ত পুরনারী আকুল হয়ে কৃষ্ণের অনুসরণ করতেন। কৃষ্ণ এঁদের ঘরে ফিরে যেতে বললেও এরা যেতে পারতেন না। কৃষ্ণ এক বার অন্তর্হিত হয়ে যান ফলে সমস্ত গোপিকারা পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকেন এবং রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদতে থাকেন। ফলে কৃষ্ণ বাধ্য হয়ে দেখা দেন এবং সকলকে নিয়ে জলকেলি করেন। গোপালরা একবার দেবী-বনে মহেশ্বর পূজা করে বনেতেই রাত কাটাবার ব্যবস্থা করেন। একটা অজগর সাপ এই রাত্রে নন্দকে গ্রাস করতে থাকে। সাপের গ্রাস থেকে নন্দকে কেউ ছাড়াতে পারে না। তখন কৃষ্ণ এসে এক লাথি মারতে অজগর সাপটি বিদ্যাধর সুদর্শনে পরিবর্তিত হয়ে অঙ্গিরসের দেওয়া শাপ থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে যান।

এরপর কংসের অনুচর অরিষ্ট (দ্র) অসুর নিহত হয়। এর পর কংস কেশীকে (দ্র) পাঠান এবং তারপর ময়াসুরের ছেলে ব্যোমাসুর আসে। ব্যোমাসুর ছাগল সেজে আসে এবং কৃষ্ণের হাতে মারা যায়। সব দিক থেকে বিফল হয় কংস তখন

ধনুর্যজ্ঞের ব্যবস্থা করে কৃষ্ণ বলরামকে সস্নেহে নিমন্ত্রণ করে পাঠান। অক্রূর রথে করে এঁদের নিয়ে যেতে আসেন। মথুরাতে আসার পথে কৃষ্ণ ইত্যাদি সকলে যমুনাতে এক জায়গায় স্নান করেন। এই সময় অক্রূর কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখতে চান। স্নান সেরে ফেরবার সময় অক্রূর কৃষ্ণকে কংসের সব মতলব জানিয়ে দেন। মথুরাতে পৌঁছে দুই ভাই সন্ধ্যাবেলা নগরীর সৌন্দর্য দেখতে বার হয়েছিলেন। এক রজকের সঙ্গে দেখা হয়; কংসের পরিধেয় ইত্যাদি কেচে নিয়ে যাচ্ছিল। এর কাছে কিছু পরিধেয় ইত্যাদি চাইলে রজক এদের গোপালক বলে উপহাস করে। কৃষ্ণ তখন রজককে ভাল ভাবে পিটিয়ে সমস্ত পরিধেয় পথে সমবেত সকলকে ভাগ করে দেন এবং নিজে পীত বস্ত্র পরিধান করেন এবং বলরামকে নীল বস্ত্র পরতে দেন। পর দিন এক কঞ্চুককারের সঙ্গে দেখা হয়; কংসের জামা পোষাক তৈরি করত। কৃষ্ণ বলরামকে লোকটি মহামূল্য পোষাক ও পাগড়ি দেয়। কৃষ্ণ একে মুক্তি পাবে বলে আশীর্বাদ করেন। এর পর দুই ভাই সুদামের বাড়িতে এলে সুদাম এদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেন। এখান থেকে বার হয়ে পথে এগিয়ে যেতে যেতে কুব্জা/ত্রিবক্রাকে দেখেন; সুন্দর একটি পাত্রে অঙ্গরাগ নিয়ে আসছিলেন। কংসের এ প্রধান পবিচারিকা। কৃষ্ণকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে শ্রদ্ধায় পাত্র সমেত অঙ্গরাগ কৃষ্ণকে দান করেন। কৃষ্ণ বলরাম নিজেদের গায়ে এই অঙ্গরাগ মেখে নেন। কৃষ্ণ তারপর এগিয়ে এসে ত্রিবক্রার পায়ের ওপর পা দিয়ে চেপে ধরে ডান হাতে করে তার চিবুক তুলে ধরেন; অন্য মতে পিঠে হাত দেন; সঙ্গে সঙ্গে কুব্জার দেহ স্বাভাবিক হয়ে যায়। ত্রিবক্রা অভিভূত হয়ে পড়েন এবং সেই রাত্রিতে কৃষ্ণকে তার বাড়িতে অতিথি হতে বলেন। কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দেন পরে আসবেন এবং আবার এগিয়ে চলতে থাকেন।

ধনুর্যজ্ঞে এসে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণ বাম হাতে করে ধনুটিকে ভেঙ্গে ফেলেন। প্রহরীরা তখন কৃষ্ণ বলরামকে ধরতে এলে ভাঙা ধনুকের টুকরো দিয়েই এই সব প্রহরীদের পিটিয়ে বিতাড়িত করেন এবং যজ্ঞ স্থান থেকে বার হয়ে দু ভাই চলে যান। সূর্য অস্ত গেলে দু ভাই এক জায়গায় শুয়ে রাত কাটান। কিন্তু ভাল ঘুম হয় না। কংসের দুষ্ট কাজের কথাই ভাবতে থাকেন। কৃষ্ণ বহু দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকেন। পর দিন কংস (দ্র) এক মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা করেন। এখানে কংস ও কংসের আট ভাই নিহত হলে অন্তঃপুরে নারীরা বিলাপ করতে থাকলে কৃষ্ণ এঁদের সান্ত্বনা দিয়ে মৃত-দেহগুলি সৎকারের ব্যবস্থা করেন এবং বসুদেব, দেবকী, উগ্রসেন ইত্যাদিকে কারা-মুক্ত করে দিয়ে উগ্রসেনকে রাজা করে দেন। কৃষ্ণবলরাম নিজেদের পোষাক অস্ত্র শস্ত্র নন্দ ও যশোদাকে দিয়ে এগুলিকে যত্ন করে রাখতে বলেন এবং এঁদের গোকুলে পাঠিয়ে দেন। দুই ভাই মথুরাতে মা বাবার সঙ্গে থেকে যান। যদু বংশকে শক্তিশালী করে তুলবেন মনস্থ করেন। এর পর গর্গের পরামর্শে বসুদেব দুই ছেলেকে সান্দীপনি নামে এক বেদজ্ঞের আশ্রমে লেখাপড়া শিখতে পাঠান। এখানে গুরুর আশ্রমে সুদামের (দ্র) সঙ্গে বিশেষ মিত্রতা হয়। গুরুপত্নীর নির্দেশে এক দিন বনে কাঠ আনতে গিয়ে বৃষ্টিতে পথ হারিয়ে বনেতেই কৃষ্ণ সুদাম রাত কাটান। সান্দীপনি মুনি পর দিন এঁদের বন থেকে খুঁজে নিয়ে আসেন। এখানে চৌষট্টি কলাবিদ্যা ও

ধনুর্বেদ শিক্ষা লাভ করেন। গুরুদক্ষিণা হিসাবে সান্দীপনি মুনি প্রভাসতীর্থে ডুবে যাওয়া ছেলেকে এঁদের কাছে ফিরে পেতে চান। কৃষ্ণ বলরাম সমুদ্র তীরে এসে বরুণের কাছে জানতে পারেন পঞ্চজন (দ্র) অসুর ছেলেটিকে হত্যা করেছে। কৃষ্ণ অসুরকে নিহত করেন; কিন্তু অসুরের আবাস শাঁখটির মধ্যে মৃত ছেলেটিকে খুঁজে পান না। শাঁখটি নিয়ে বাজাতে বাজাতে দুই ভাই যমালয়ে গিয়ে শিশুটিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এইটি বিখ্যাত পাঞ্চজন্য শাঁখ বলে পরিচিত। ছেলেকে ফিরে পেয়ে গুরু এঁদের আশীর্বাদ করেন।

দুই ভাই তার পর মথুরাতে ফিরে এসে বসবাস করতে থাকেন এবং গোকুলের কথা স্মরণ করে উদ্ধবকে দিয়ে গোকুলে খবর পাঠান। উদ্ধব গোকুলে এসে কৃষ্ণবলরামের সংবাদ দেন এবং ৪-৫ মাস এখানে কাটিয়ে নন্দ-যশোদা ও অন্যান্যদের দেওয়া নানা উপহার কৃষ্ণবলরামের জন্য নিয়ে ফিরে আসেন। এর পর ত্রিবক্রাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য কৃষ্ণ তাঁর অতিথি হয়ে তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করেন। এ দিকে পিসিমা কুন্তীর ছেলেরা নানা ভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন জানতে পেরে প্রকৃত খবর জানবার জন্য অক্রূরকে পাঠান। কুন্তীর কাছে ভীমকে হত্যা করার চেষ্টা ইত্যাদি সমস্ত খবর শুনে বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে অক্রূর দেখা করেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে বারণ করে কৃষ্ণকে এসে সমস্ত ঘটনা জানান। কংসের শ্বশুর মগধরাজ জরাসন্ধ এ দিকে জামাতার রাজ্যে দৌহিত্রদের রাজা করার জন্য ও কৃষ্ণবলরামকে শাস্তি দেবার জন্য শাল্ব, চেদিরাজ, দন্তবক্র ও শিশুপাল রাজাদের নিয়ে মথুরা অবরোধ করেন। কৃষ্ণের সঙ্গী বলরাম, উদ্ধব, অক্রূর ও কৃতবর্মাও যুদ্ধ করেছিলেন। বলরামের হাতে জরাসন্ধ নিহত হতেন কিন্তু কৃষ্ণ বলরামকে ছেড়ে দিতে বলেন। অবরোধ মুক্ত হলেও বাণাসুর ইত্যাদির সাহায্যে জরাসন্ধ বার বার মথুরা আক্রমণ করতে থাকেন। বলরাম জরাসন্ধকে আর এক বার হত্যা করতে যান কিন্তু দৈববাণী হয় জরাসন্ধের মৃত্যু হবে অপরের হাতে। বার বার জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধে রাজকোষ শূন্য হয়ে আসে। কৃষ্ণ বলরাম তখন গোমন্তক পাহাড়ে যান; পরে পরশুরামের সঙ্গে দেখা হয় এবং এঁর নির্দেশে গোমন্তক পাহাড়ের পাদদেশে করবীর রাজ্যে রাজা শৃগালবাসুদেবকে নিহত করে তাঁর ধনরত্ন নিয়ে ফেরার সময় প্রবর্ষণ গিরিতে এসে পৌঁছলে এখানে গরুড় কৃষ্ণকে তাঁর মাথার চূড়া এনে দেন; বাণাসুর এটি চুরি করেছিল।

শৃগালবাসুদেবকে নিহত করার জন্য জরাসন্ধ আবার মথুরা আক্রমণ করেন। এই ভাবে আঠার বার মথুরা আক্রান্ত হয়েছিল। মথুরাতে কংসের ছেলেরা রাজা হবে, জরাসন্ধ কংসের শ্বশুর ইত্যাদি নানা কিছু চিন্তা করে কৃষ্ণবলরাম মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকাতে (=কুশস্থলী দ্র) বিশ্বকর্মা নির্মিত নগরীতে নতুন রাজ্য স্থাপন করেন। রাজা কালযবন মথুরা জয় করার চেষ্টায় তপস্যা করে শিবের বর পান যাদবদের হাতে তাঁর মৃত্যু হবে না। মথুরা ত্যাগ করার এটিও একটি কারণ। অবশ্য কালযবন (দ্র) নিহত হন এবং ধনরত্ন নিয়ে কৃষ্ণবলরাম দ্বারকাতে যখন ফিরে যাচ্ছিলেন জরাসন্ধ তখন এঁদের অনুসরণ করেন। এঁরা পালাবার চেষ্টা করেন এবং প্রবর্ষণ পাহাড়ে আত্মগোপন করলে জরাসন্ধ পাহাড়টিকে চারদিক থেকে আগুন লাগিয়ে

দেন। কৃষ্ণ বলরাম গোপনে স্থান ত্যাগ করেন ; জরাসন্ধ মনে করেন এঁরা পুড়ে মারা গেছেন।

কুশস্থলীর (পরে নাম দ্বারকা) রাজা আনর্তের মেয়ে রেবতীকে বলরাম বিয়ে করেন। বিদর্ভ রাজ ভীষ্মকের মেয়ে রুক্মিণী কৃষ্ণের কাহিনী শুনে কৃষ্ণকে বিয়ে করবেন ঠিক করেন। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে (দ্র) হরণ করে বিয়ে করেন। দ্রঃ দুর্বাসা। সত্রাজিতের (দ্র) মণির খোঁজে কৃষ্ণ বনে এসে জাম্ববানকে পরাজিত করলে জাম্ববান (দ্র) কৃষ্ণকে তখন চিনতে পারেন ; স্যমন্তক মণিও নিজের মেয়ে জাম্ববতীকে কৃষ্ণের হাতে তুলে দেন। কৃষ্ণ মণি এনে সত্রাজিতকে দিলে প্রতিদানে সত্রাজিৎ নিজের মেয়ে সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে দেন। সত্রাজিৎ যৌতুক হিসাবে মণিটিও দিতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু কৃষ্ণ নেন নি।

জতুগৃহ থেকে পাণ্ডবরা মুক্তি পেয়েছে খবর পেতে দেরি হলেও খবর পেয়েই সাত্যকি ইত্যাদি যাদব প্রধানদের নিয়ে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতে কৃষ্ণ ছিলেন এবং এই খানেই পাণ্ডবদের সঙ্গে প্রথম সরাসরি আলাপ ও বন্ধুতা হয়। পাণ্ডবরা ন্যায়ত দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন বলে সমবেত রাজন্যদের বুঝিয়ে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করেন। অর্জুন (দ্র) যখন ব্রাহ্মণের গরু রক্ষা করতে গিয়ে তীর্থ যাত্রায় যেতে বাধ্য হন সেই সময় এক মাত্র কৃষ্ণের সাহায্যেই সুভদ্রাকে হরণ করে বিয়ে করেন। এই বিয়ে উপলক্ষ্যে কৃষ্ণ কিছুদিন ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করেছিলেন এবং এই সময়ে খাণ্ডবদাহন ঘটে। খাণ্ডবদাহনের সময়ও কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি ছিলেন। এই সময় কৃষ্ণ কৌমোদকী (দ্র) গদা পান। ময়ের (দ্র) দ্বারা নবনির্মিত ইন্দ্রপ্রস্থে কৃষ্ণ কিছু দিন বাস করেছিলেন। এক দিন কৃষ্ণ ও অর্জুন যমুনার তীরে বেড়াচ্ছিলেন এমন সময় নারী বেশীধারী যমুনার (দ্র) সঙ্গে দেখা হয়। যমুনা কৃষ্ণকে বিয়ে করতে চান ; এবং বিয়ে হয়। ইন্দ্রপ্রস্থে মাস চারেক থাকার পর যমুনাকে নিয়ে কৃষ্ণ দ্বারকাতে ফিরে যান। অবন্তীরাজের স্ত্রী রাজাধিদেবী ছিলেন কৃষ্ণের পিসি ; এঁর মেয়ে মিত্রবিন্দাকে স্বয়ংবরসভা থেকে হরণ করে এনে বিয়ে করেন। কোশল রাজ নগ্নজিতের সাতটি দুর্দ্ধর্ষ বৃষভ ছিল। রাজা ঘোষণা করেছিলেন যে এই বৃষভগুলিকে রজ্জুবদ্ধ করতে পারবে তার সঙ্গে মেয়ে সত্যার বিয়ে দেবেন। বহু রাজা চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অর্জুন ও কৃষ্ণ কোশলে আসেন এবং কৃষ্ণ সাতটি মূর্তি ধরে সাতটি বৃষভকে বেঁধে ফেলেন ; সত্যার সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে হয়। শ্রুতকীর্তি নামে কৃষ্ণের এক পিসি ছিলেন ; এঁর মেয়ে ভদ্রা/কৈকেয়ী ; এঁর সঙ্গেও কৃষ্ণের বিয়ে হয়। মদ্রদেশের লক্ষ্মণা স্বয়ংবর সভাতে কৃষ্ণের গলায় মালা দেন। নরকাসুরের (দ্র) ১৬,০০০ মেয়েকে ব্রহ্মা বর দিয়েছিলেন পরের জন্মে এঁরা কৃষ্ণের স্ত্রী হবেন। কৃষ্ণ ও সত্যভামা গরুড়ের পিঠে চড়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গিয়ে নরকাসুরকে পরাজিত করে এই ১৬,০০০ মেয়েকে নিয়ে দ্বারকাতে ফিরে এসে এদের বিয়ে করেন। কৃষ্ণের মূল স্ত্রী রুক্মিণী, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা, ভদ্রা, লক্ষ্মণা, সত্যভামা। নারদের এক বার জানবার বাসনা হয় কৃষ্ণ কি করে ১৬,০০০+৮ জন স্ত্রীকে খুসি রাখেন। নারদ নিজে এই প্রতিটি নারীর ঘরে গিয়ে সেখানে কৃষ্ণকে যুগপৎ বিরাজ করতে দেখেন।

ঘণ্ট ও কর্ণ দুই ভাই ; এরা অসুর। রুক্মিণীকে বিয়ে করে কৃষ্ণ বদরিকাশ্রমে সন্তান লাভের আশায় শিবের তপস্যা করতে এলে এদের সঙ্গে দেখা হয়। কৃষ্ণ এঁদের বর দেন ; এরা মুক্তি পায়/কৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যেও একবার যুদ্ধ হয় (দ্র গালব)। মুরাসুরকে নিহত করে মুরারি নাম হয়। এক বার নরকাসুর ইন্দ্রের ছত্র ও অদিতির কুণ্ডল কেড়ে নিয়ে যান। কৃষ্ণ ইন্দ্রের সাহায্য চান। কৃষ্ণ সত্যভামাকে নিয়ে গরুড়ের পিঠে চড়ে এসে নরকাসুরকে নিহত করে ছত্র ও কুণ্ডল উদ্ধার করে স্বর্গে ফিরে যান। স্বর্গ থেকে ফেররার সময় সত্যভামার ইচ্ছায় কৃষ্ণ স্বর্গ থেকে পারিজাত গাছ নিয়ে আসতে যান। কিন্তু ইন্দ্র বাধা দেন ফলে যুদ্ধ হয় এবং ইন্দ্র হেরে যান। পারিজাত এনে দ্বারকাতে সত্যভামার প্রাসাদের সামনে বসিয়ে দেন অন্য মতে স্যমন্তক মণি ফেরৎ দেবার জন্য সত্যভামার ভীষণ দুঃখ হয়েছিল এই কারণে সত্যভামাকে খুসি করার জন্য কৃষ্ণ পারিজাত নিয়ে আসেন।

রুক্মিণীকে পরীক্ষা করার জন্য কৃষ্ণ একবার বলেন তিনি উপস্থিত কপর্দক হীন ; এবং শত্রুদের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে দ্বারকাতে চলে এসেছেন। রুক্মিণী এখন বরং উপযুক্ত শক্তিশালী কোন রাজাকে বিয়ে করুক। কিন্তু কৃষ্ণ কথা শেষ করার আগেই রুক্মিণী অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। কৃষ্ণ তখন রুক্মিণীর জ্ঞান ফিরিয়ে এনে ক্ষমা চান। কৃষ্ণ বাণের (দ্র) সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, পৌণ্ড্রককে হত্যা করে ছিলেন এবং স্বয়ংবর সভাতে দৌপদীকে আশীর্বাদ করেছিলেন। কৃষ্ণের বাকি জীবন পাণ্ডবদের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের আগে কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন ছদ্মবেশে মগধে যান এবং কৃষ্ণের পরামর্শে ভীম মল্লযুদ্ধে জরাসন্ধকে বধ করেন। জরাসন্ধের ছেলে সহদেবকে কৃষ্ণ রাজা করে দেন। পৃথিবী কৃষ্ণকে কুণ্ডল দান করেন। যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করতে সম্মতি দেন ; এবং যজ্ঞে বহু অর্থ সাহায্যও করেছিলেন। এই যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে কৃষ্ণকে ভীষ্ম অর্ঘ্য দিলে চেদিরাজ শিশুপাল ঈর্ষায় কৃষ্ণের নিন্দা করেন। কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন এঁর একশ অপরাধ ক্ষমা করবেন। কিন্তু এই নিন্দা শততমের বেশি হওয়াতে কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রে একে বধ করেন। পাণ্ডবদের অক্ষক্রীড়ার সময় কৃষ্ণ শাল্বরাজের সৌভনগর ধ্বংসের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে অলক্ষ্যে শেষহীন বস্ত্র দিয়ে লজ্জা নিবারণ করেন। সুভদ্রা ও অর্জুনকে একবার দ্বারকাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কাম্যক বনে পাণ্ডবদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। পাঞ্চালীর (দ্র) অন্নের পাত্র থেকে সামান্য একটু শাক খেয়ে পরম পরিতৃপ্ত হবার ছলে পাণ্ডবদের দুর্বাসার হাত থেকে রক্ষা করেন। উপলব্য গ্রামে অভিমন্যুর বিয়েতে যোগদান করেছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে এই সময় প্রচুর অর্থ দিয়েছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে কুরুপাণ্ডব উভয়পক্ষই কৃষ্ণকে দলে টানতে দ্বারকাতে আসেন। কৃষ্ণ নিদ্রার ভাণ করে শুয়েছিলেন। প্রথমে দুর্যোধন এসে মাথার দিকে উত্তম একটি আসনে এবং অর্জুন পরে এসে পায়ের দিকে বসে অপেক্ষা করতে থাকেন। ফলে চোখ মেলে কৃষ্ণ অর্জুনকেই প্রথম দেখেন এবং অর্জুনদের/ পাণ্ডবদের পক্ষে যোগ দেন। দুর্যোধনের দাবি ছিল তিনি প্রথমেই এসেছিলেন কিন্তু কৃষ্ণ সে যুক্তি নস্যাৎ করার জন্য বলেন তিনি কিন্তু প্রথমেই অর্জুনকে দেখেছেন। এবং যথাসম্ভব পক্ষপাতহীন হবার চেষ্টায় দশকোটি নারায়ণী সেনা দিয়ে দুর্যোধনকে সাহায্য

করেন এবং দুর্যোধনকে প্রতিশ্রুতি দেন যুদ্ধে তিনি নিজে কোন দিন অস্ত্র ধারণ করবেন না। এক দিকে অস্ত্রধারণ করবেন না প্রতিজ্ঞাবদ্ধ-কৃষ্ণ এবং আর এক দিকে দশ কোটি নারায়ণী সেনা কে কোনটি বেছে নিতে চান বলে অর্জুনকেই প্রথম সুযোগ দিয়েছিলেন এবং অর্জুন কৃষ্ণকেই বেছে নেন। মোটামুটি ঘটনাটা সবটাই কৃষ্ণের পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে যুধিষ্ঠির ইত্যাদি ভাইরা যুদ্ধ এড়াবার জন্য কৃষ্ণকে একটা চেষ্টা করতে বলেন। কৃষ্ণ সাত্যকিকে রথে নিয়ে প্রথমে দ্বারকাতে যান এবং ফিরে এসে হস্তিনাপুরে আসেন। পথে বহু মুনির সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সঙ্গেও আলোচনা করেন। হস্তিনাপুরে বিদুরের গৃহে অতিথি হন। এখানে কুন্তীর সঙ্গে দেখা হয় এবং কুন্তীকে সান্ত্বনা দেন এবং সেইখানেই রাত কাটান। পর দিন ধৃতরাষ্ট্রের সভাতে আসেন। কিন্তু দুর্যোধন ইত্যাদি তাঁর উপদেশে উপহাস করতে থাকেন এবং বন্দী করবার চেষ্টা ও করেন। কৃষ্ণ তখন নিজের বিশ্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন এবং সভা ত্যাগ করে পাণ্ডবদের কাছে ফিরে যান।

যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি ছিলেন। যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে দুই দলের সৈন্য-বাহিনীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে অর্জুন অসংখ্য জ্ঞাতিকুটম্ব ক্ষয়কৃৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার আগে শোকে বিষণ্ণ হয়ে অস্ত্রত্যাগ করেন। কৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বোঝান যা করবার তা তিনি নিজেই করে রেখেছেন; অর্জুন কেবল নিমিত্ত মাত্র হয়ে যুদ্ধ করুক। অর্জুনকে আরো অনেক কিছু বোঝান এবং অর্জুনের অনুরোধে নিজের প্রকৃত পরিচয় দেন এবং অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখান। এই উপদেশ অংশ গীতা নামে প্রসিদ্ধ। অর্জুন শেষ অবধি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধে কৃষ্ণ অস্ত্র ধরবেন না প্রতিশ্রুত ছিলেন কিন্তু ভীষ্ম কৃষ্ণকে বাধ্য করেন এবং কৃষ্ণ চক্রপাণি হয়ে ছুটে যান ভীষ্মকে বধ করতে। ভীষ্ম তখন অস্ত্র ত্যাগ করে এই শ্লাঘনীয় মৃত্যু বরণ করবার জন্য কৃষ্ণের স্তব করতে থাকেন। কৃষ্ণ নিবৃত্ত হয়ে আবার অর্জুনের রথে ফিরে যান। ভগদত্ত অর্জুনের প্রতি যে বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন কৃষ্ণ সেই অস্ত্র নিজের বুকে ধারণ করে অর্জুনকে রক্ষা করেন। অভিমন্যু মারা গেলে সুভদ্রা, ইত্যাদি সকলকে সান্ত্বনা দেন। জয়দ্রথ বধের সময় অকালে সন্ধ্যার ব্যবস্থা করেন এবং অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করলে আবার সূর্যকে প্রকাশিত করে দেন। যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের মধ্যে বিশ্রী একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যায়; ক্রোধে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করতে চান। কিন্তু কৃষ্ণ ঘটনাটার মীমাংসা করে দেন। অর্জুন তখন আত্মহত্যা করবেন স্থির করেন। দ্রোণ ও কর্ণ বধও কৃষ্ণের সাহায্যেই সম্ভব হয়েছিল। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণ নাগাস্ত্র ত্যাগ করলে অর্জুনকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণ রথকে চাপ দিয়ে মাটির মধ্যে কিছুটা নামিয়ে দিলে অস্ত্রে অর্জুনের কিরীট নষ্ট হয়ে যায়; অর্জুন রক্ষা পান। কর্ণের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে শল্যকে নিহত করান। দুর্যোধনকে হত্যা করার সময়ও কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উত্তরার গর্ভস্থ শিশু অশ্বত্থামার অস্ত্রে মারা গেলে একটি মতে কৃষ্ণ তাকে এই সময় আবার বাঁচিয়ে দেন এবং এই কাজের জন্য অশ্বত্থামাকে অভিশাপ দেন। দুর্যোধন মারা গেলে যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিয়ে আসেন। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে অনুরোধ করেন যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিতে এবং বর দেন শরশয্যায় ভীষ্মের ক্ষুধাতৃষ্ণা কিছু থাকবে

না এবং জ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকবে। যুদ্ধের শেষে গান্ধারী যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণকে দেখে অভিশাপ দেন যে এই ভীষণ যুদ্ধ কৃষ্ণ বন্ধ করতে পারতেন কিন্তু করেন নি ; এই কারণে যুদ্ধের ৩৬ বছর পরে যদুবংশও কৌরবদের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং কৃষ্ণের অপঘাতে মৃত্যু হবে ; দ্বারকার পুরনারীরা হস্তিনাপুরের পুরনারীদের মত হাহাকার করবে। অনুশাসন পর্বে কৃষ্ণ মুনিঋষিদের এবং পৃথিবীকে নানা উপদেশ দেন এবং ভীষ্মকে দেহত্যাগের সম্মতি দেন এবং গঙ্গাকেও পুত্রশোকে সান্ত্বনা দেন। আশ্রমিক পর্বে গীতার (যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুনকে দেওয়া উপদেশ) উপদেশগুলির আবার বিশদ ব্যাখ্যা করেন। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে সুভদ্রা ও সাত্যকিকে নিয়ে দ্বারকাতে ফিরে আসেন। পথে উত্তঙ্ক ঋষির সঙ্গে দেখা হয় ; কুরুপাণ্ডবদের সমস্ত কাহিনী এঁকে জানান এবং এঁকেও বিশ্বরূপ দেখান। রৈবতক পাহাড়ে উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। এর পর দ্বারকাতে ফিরে এসে পিতা বসুদেবকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের খবর জানান এবং নিজে অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ ইত্যাদি করেন। এর পর হংসকে হত্যা করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের আগে হস্তিনাপুরে আসেন এবং উত্তরার এই সময়ে একটি মৃত সন্তান হয়। ছেলেটি অশ্বত্থামার অস্ত্রে মারা গিয়েছিল। কুন্তীর অনুরোধে কৃষ্ণ একে জীবিত করে দেন। এই ছেলেই পরিক্ষিৎ। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় ছিলেন এবং যজ্ঞ শেষে আবার ফিরে যান।

গান্ধারীর অভিশাপ মত ৩৬ বছর শেষ হয়ে আসছিল। এই সময় বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ একদিন দ্বারকাতে আসেন। কয়েক জন যাদব যুবক সাম্বকে পেটে লোহার মুষল বেঁধে গর্ভবতী নারী সাজিয়ে ঋষিদের সামনে এনে বলেন ইনি বভ্রুর স্ত্রী ; এবং এঁর কবে সন্তান হবে। অন্য মতে ছেলে হবে না মেয়ে হবে জানতে চান। মুনিরা বিদ্রূপ বুঝতে পেরে অভিশাপ দেন সাম্ব এই মুষলটি প্রসব করবেন এবং এই মুষলে যদুবংশ ধ্বংস হবে। এরা ভীত হয়ে ঘটনাটা কৃষ্ণকে জানান ; সাম্ব পর দিন মুষল প্রসব করেন এবং কৃষ্ণের নির্দেশে সকলে মিলে মুষলটি ঘসে ঘসে খইয়ে ফেলে সামান্য মত অবশিষ্ট অংশটি সমুদ্রে ফেলে দেন। এ ছাড়া কৃষ্ণ, বলরাম ও উগ্রসেন আর একটি ব্যবস্থা করেন ; দ্বারকাতে মদ্যপান নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু দ্বারকাতে নানা অমঙ্গল চিহ্ন চারদিকে ফুটে উঠতে থাকে। কৃষ্ণ বলরাম ও উদ্ধব তীর্থযাত্রা করবেন ঠিক করেন। দেবতাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য কৃষ্ণ সকলকে নিয়ে প্রভাস তীর্থে যান এবং এখানে দেবতাদের পূজা করতে বলেন ও এক দিনের জন্য সুরাপান নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। যাদব, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়েরা সকলে যথেচ্ছ সুরা তৈরি করে পান করতে থাকেন এবং উন্মত্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি সুরু করেন। সাত্যকি উত্তেজিত হয়ে কৃতবর্মার মাথা কেটে ফেলেন। অপরে এতে রেগে গিয়ে সাত্যকি ও প্রদ্যুম্নকে পানপাত্রের আঘাতে কৃষ্ণের সামনেই হত্যা করেন। মুষলের লোহা যেখানে ঘসে ঘসে নষ্ট করা হয়েছিল সেইখানে লোহার পড়ে-থাকা অনুতম কণাগুলি তীক্ষ্ণ নল ঘাসে পরিণত হয়েছিল। কৃষ্ণ এই এক মুঠো তৃণ হাতে নিলে সেই তৃণ/নল লৌহ-মুষলে পরিবর্তিত হয় এবং সেই মুষল দিয়ে কৃষ্ণ বহু যাদবকে হত্যা করেন। যাদবরাও এই তৃণ তুলে নিয়ে পরস্পরকে হত্যা করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত যদুবংশ নিঃশেষ হয়ে যায়। কৃষ্ণ ও বলরাম বনবাসী হবেন

ঠিক করেন। বলরাম এখান থেকে সরে গিয়ে একটি গাছের নীচে বসে ধ্যান করতে থাকেন। কৃষ্ণ পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দারুক ও বভ্রু এখানে এলে কৃষ্ণ দারুককে পাঠান অর্জুনকে খবর দিতে এবং নিয়ে আসতে। কৃষ্ণ তারপর প্রাসাদে গিয়ে স্ত্রীদের সান্ত্বনা দিয়ে বসুদেবের কাছে বিদায় নিয়ে বলরামের কাছে ফিরে যান, এবং দেখেন বলরামের মুখ থেকে একটি সাদা সাপ বার হয়ে সমুদ্রে নেমে গেল। কৃষ্ণ তারপর বনে বনে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে শেষ পর্যন্ত একটি গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে থাকেন। দূর থেকে কৃষ্ণের পা'কে হরিণ মনে করে জরা (মহা ১৬।৫।১৯) নামে একজন অসুর/অন্য মতে ব্যাধ বাণবিদ্ধ করেন। সমুদ্রে ফেলে দেওয়া অবশেষিত মুষল অংশ দিয়ে এই বাণ তৈরি হয়েছিল। বাণবিদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ দেহত্যাগ করে বৈকুণ্ঠে চলে যান (গচ্ছন্ ঊর্দ্ধং রোদসী ব্যাপ্য লক্ষ্ম্যা মহা ১৬।৫।২১)। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে এই মৃত্যু। এক মতে এই ব্যাধ পূর্বজন্মে বালী ছিলেন। দ্রঃ দুর্বাসা। অর্জুন এসে কৃষ্ণ প্রভৃতির সৎকারের ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া বহু প্রক্ষিপ্ত ঘটনা কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে এসে হাজির হয়েছে। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর রুক্মিণী, জাম্ববতী ইত্যাদি কিছু রাণী সহমৃতা হন। বাকি স্ত্রীরা অর্জুনের সঙ্গে হস্তিনাপুরে চলে যাচ্ছিলেন কিন্তু পথে বনদস্যুর আক্রমণে এঁরা দাঁড়িয়ে পড়েন এবং সরস্বতীতে আত্মবিসর্জন করেন ; ধরা দেন না। দ্রঃ নরনারায়ণ অষ্টাবক্র, অর্জুন।

কৃষ্ণ হিন্দুধর্মের প্রধান উপাস্য দেবতা। এঁকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব সম্প্রদায়। উপরের কাহিনী অংশ বাদ দিয়ে কৃষ্ণ সম্বন্ধে আরো বহু আলোচ্য বিষয় রয়েছে। একটি মতে কৃষ্ণ ছিলেন লৌকিক সৌর দেবতা ; উত্তরকাল বৈদিক আদিত্য বিষ্ণুর সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। অন্য মতে কৃষ্ণ ছিলেন অনার্য গোষ্ঠী বিশেষের দেবতা ; পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে মিশে গেছেন এবং এঁকে তখন কেন্দ্র করে পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি। আর একটি মতে কৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ ; এক জন ধর্ম প্রবক্তা, সংস্কারক এবং যোদ্ধা।—পরে ভক্তরা এঁকে দেবতায় পরিণত করেছেন।

ছান্দোগ্যে (৩,১৭,৬) কৃষ্ণকে ঘোর আঙ্গিরস ঋষির শিষ্য এবং দেবকীর ছেলে বলা হয়েছে। উপনিষদে এঁর অভিধা অচ্যুত। পুরাণেও দেবকীপুত্র অচ্যুত। এই ঘোর-আঙ্গিরস সূর্যের পুরোহিত ছিলেন এবং কৃষ্ণকে সূর্যোপাসনার দীক্ষা দিয়ে ছিলেন। ঋক্‌বেদ অনুসারে উপনিষদের কৃষ্ণের গুরুবংশের সঙ্গে ভোজগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ; মহাভারতেও ভোজরা কৃষ্ণের নিকট আত্মীয়। ছান্দোগ্য-কৃষ্ণ গুরুর কাছে যে তত্ত্ব (৩ ১৭,১-৭) শিখেছিলেন সেগুলি মহাভারতে কৃষ্ণের মুখে গীতা রূপে ধ্বনিত হয়েছে। মহাভারতে কৃষ্ণকে মানুষ রূপে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাই বেশি। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে কৃষ্ণ মানুষ। বৌদ্ধ ঘটজাতক মতে তিনি বোধিসত্ত্ব ঘটের ভাই। মধুরা'র (মথুরা) রাজবংশীয় উপসাগর ও দেবগর্ভার (দেবকী) সন্তান এবং অন্ধকবেন্‌হু (অন্ধকবৃষ্ণি বা অন্ধকবিষ্ণু) ও তাঁর স্ত্রী নন্দগোপা কর্তৃক প্রতিপালিত।

জৈন উত্তরাধ্যয়ন সূত্র অনুসারে বসুদেব ও দেবকীর সন্তান বাসুদেব বা কেশব সৌর্যপুর বা সৌরিক নগরীর রাজপুত্র এবং ২২-জৈন তীর্থংকর অরিষ্টনেমির সমসাময়িক। অর্থাৎ উপনিষদের মানব কৃষ্ণ পরে এইভাবে দেবতায় পরিণত হতে চলেছিলেন। বিচিত্রবীর্যের ছেলে ধৃতরাষ্ট্রের উল্লেখও কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত কাঠক

সংহিতাতে আছে। কৃষ্ণ ও ধৃতরাষ্ট্র সমসাময়িক। পণ্ডিতদের মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ (দ্র) হয়ে থাকলে খৃ-পূ নবম বা দশম শতকে হয়েছিল। কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ও কাঠক-সংহিতাতে ঘোর-আঙ্গিরসের উল্লেখ রয়েছে। এই গ্রন্থ দুটি এবং ছান্দোগ্য খৃ-পূ ৬ শতকের কিছু আগে লেখা। বৌদ্ধ জাতকেও কৃষ্ণ বুদ্ধের আগে। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে জৈন তীর্থংকর পার্শ্বের (প্রায় খৃ পূ নবম শতকে) পূববর্তী তীর্থংকর অরিষ্ট-নেমির সমকালীন। সুতরাং কৃষ্ণ দশম-নবম খৃ-পূর্বের লোকই মনে হয়।

কৃষ্ণের বংশ বৃষ্ণি বা সাত্বত কুলের উল্লেখ ঋক্ বেদে নাই কিন্তু পরে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রচুর আছে। পাণিনি (খৃ-পূ ৫ শতক) ও পতঞ্জলি (খৃ-পূ ২ শতক) এই বংশের উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সাহিত্যের যুগ থেকে খৃ-পূ দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত ঐতিহাসিক পুরুষ হিসাবে কৃষ্ণের ধারাবাহিক উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং খৃ-পূ দশম-নবম শতকের মানুষ বলেই মনে হয়। মহাভারতে ও পুরাণে কৃষ্ণ মথুরাতে যদু কুলের বৃষ্ণি বা সাত্বত শাখার সন্তান। বৌদ্ধ ঘটজাতকেও মথুরার রাজবংশের কথাই বলা হয়েছে। এর কিছু পরে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বৃষ্ণিকুলকে সংঘ বলা হয়েছে। অর্থাৎ মথুরা যেন সাধারণ শাসিত দেশ। মহাভারতে, অর্থশাস্ত্রে ও বৌদ্ধ জাতকে ইঙ্গিত আছে এই বৃষ্ণি বংশীয় ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

অর্থাৎ এই বৃষ্ণি বংশে তাঁর জন্ম ; ঘোর-আঙ্গিরসের কাছে তত্ত্ববিদ্যা ও সান্দীপনি মুনির কাছে অস্ত্রবিদ্যা লাভ করেন। হরিবংশ ও কয়েকটি পুরাণে বৃন্দাবন লীলার বর্ণনা আছে ; মহাভারতে ও বৌদ্ধজাতক ইত্যাদিতে কিন্তু নাই। বৈদিক বিষ্ণুর সঙ্গে গোপালদের ও গোচারণের কিছু সম্পর্ক রয়েছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে পূর্ব ইরানের কাছ থেকে আগত আভীরদের কোন এক গো-পালককে কেন্দ্র করে কিছু লৌকিক উপাখ্যান ছিল। এগুলি সব মিলিয়ে কৃষ্ণ কাহিনী গড়ে উঠেছে। কৃষ্ণের গোপী লীলার ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না ; কবি ও দার্শনিকের হাতে পড়ে বর্তমান আকার ধারণ করেছে। উজ্জ্বল রস ও পুরুষ প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই গোপীবিলাস অধ্যায় সৃষ্টি করা হয়েছে স্বীকার করলেও গীতগোবিন্দে চরম বিকৃত এবং অন্ধ দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। কংসের সঙ্গে কৃষ্ণের বিরোধ সম্ভবত ঐতিহাসিক ঘটনা ; কারণ মহাভাষ্যে এর উল্লেখ রয়েছে। এই ভাবে বর্তমান কৃষ্ণের দুটি রূপ :-একটি রণপণ্ডিত, কূটনীতিজ্ঞ, আশ্রিতবৎসল, পরমতত্ত্বজ্ঞ ; আর একটি রূপ প্রেমিক, ভক্তসখা ও গোপীবল্লভ। কৃষ্ণের প্রচারিত শিক্ষা অন্তর্মুখী ও নিরাসক্ত হয়ে জ্ঞানযজ্ঞের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

পাণিনির সময় বাসুদেবভক্তদের পাণিনিতে বাসুদেবক বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেই সময়ে তিনি দেবতা গোছের বা দেবতাতে পরিণত হয়েছেন। পতঞ্জলি পরে স্পষ্ট বলেছেন এই বাসুদেব কোন ক্ষত্রিয় বিশেষ নন ; একজন দেবতা। পতঞ্জলির এই টীকা চিন্তার প্রচুর খোরাক জোগায়। খৃ-পূ ৪ শতকের বিদেশীদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় কৃষ্ণ এখন দেবতা। খৃ পূ ৩ শতকের পালি সাহিত্য ও নিদ্দেশ থেকে বাসুদেব ও বলদেব ভক্ত পৃথক দুটি সম্প্রদায়ের নাম জানা যায়। অর্থাৎ ক্রমশ দেবাতাতে রূপান্তরিত হয়ে চলছেন। বৃষ্ণিবংশীয় সংকর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব ও

অনিরুদ্ধ এই পঞ্চবীরের এক কালে মিলিত ভাবে পূজাও প্রচলিত হয়েছিল ; অথচ বায়ু পুরাণে এঁদের 'মনুষ্যপ্রকৃতি'র বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই ভাবে ক্রমশ দেবতাতে রূপায়ণ হয়েছিলেন।

বৈদিক আদিত্য-বিষ্ণু, ব্রাহ্মণ সাহিত্যের ব্রহ্মাণ্ডপতি রূপে পূজিত নারায়ণ, লৌকিক উপাখ্যান, ঐতিহাসিক কৃষ্ণ, কবির অগাধ কল্পনা ও দার্শনিকের রঙীন প্রকল্প এই সব মিলিয়ে বর্তমানের কৃষ্ণ।

বৈষ্ণব মতে এই কৃষ্ণই ঈশ্বর। ইনি পরমাত্মা, রাধা তাঁর হ্লাদিনী শক্তি। ভক্ত হচ্ছেন জীবাত্মা। বেদে কৃষ্ণ একজন ঋষি ; মহাভারতে কূটরাজনীতিক ও যোদ্ধা, গীতায় দার্শনিক, বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেমাস্পদ পরম-পুরুষ। এই সব মিলে কৃষ্ণ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—ব্যাস।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—বাঙলার প্রসিদ্ধ সাধক ও গ্রন্থকার (১৭-শতক)। জনশ্রুতি শ্রীচৈতন্যের সমকালীন।

কেকয়—(১) বৈদিক যুগে একটি শক্তিশালী রাজ্য। শতপথ ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, রামায়ণ, পুরাণ ইত্যাদিতে উল্লেখ আছে। রামায়ণের যুগে গান্ধার রাজ্যের পূর্ব সীমা থেকে বিপাশা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রামায়ণে এই রাজ্যের রাজধানী গিরিব্রজ বা রাজগৃহ। অন্য মতে ঝিলাম নদীর তীরে জালালপুর (প্রাচীন নাম গির্জাক) এই গিরিব্রজ। মৎস্য ও বায়ুপুরাণে কেকয় জাতি যযাতির ছেলে অনুর বংশধর। ঋক্‌বেদে বহুস্থানে অনু উপজাতির উল্লেখ আছে। অষ্টম-মণ্ডলের একটি সূত্রে আছে পাঞ্জাবে পরুষ্ণী (ইরাবতী) নদীর কাছেই অনু উপজাতিরা বাস করতেন। পরে কেকয়রা এখানে বাস করতেন। কেকয় রাজার থেকে দেশের নাম। (২) সৃঞ্জয়-উশীনর-শিবি। শিবির চার ছেলে ভদ্র, সুবীর, কেকয় ও বৃষাদর্ভ। কেকয় রাজারা অনেক সময় অশ্বপতি উপাধি গ্রহণ করতেন। দশরথের স্ত্রী কৈকেয়ী এক অশ্বপতি কেকয় রাজের মেয়ে। কৈকেয়ীর ভাইও অশ্বপতি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। (৩) মিথিলার এক জনকের (দ্র) সমকালীন এক জন কেকয়রাজ অশ্বপতি পরম পণ্ডিত ছিলেন, শতপথে, ছান্দোগ্যে-এর উল্লেখ আছে। (৪) সূর্য বংশীয় এক রাজা ; মালবের দুটি রাজকুমারী দুই স্ত্রী। এক জনের ছেলে কীচক ও উপকীচক ; আর এক জনের একটি মেয়ে সুদেষ্ণা, বিরাটের স্ত্রী। জৈন গ্রন্থ মতে কেকয় রাজ্যের মাত্র অর্দ্ধেক অংশে আর্য বসতি ছিল এবং এই রাজ্যেই 'সেয়বিয়া' নামে একটি নগরী ছিল।

কেকরলোহিত—একটি বিখ্যাত সাপ। নকুলেশ্বর তীর্থে শিবকে পূজা করে নর্মদাতে স্নান করতে নামলে এই সাপ চ্যবনকে পাতালে নিয়ে যায় এবং কামড়ায়। চ্যবন বিষ্ণুর ধ্যান করতে থাকেন, বিষে কোন ক্ষতি হয় না। সাপ তখন চ্যবনকে ছেড়ে দিলে নাগকন্যারা চ্যবনকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। চ্যবন তারপর পাতালে দানব পুরীর দরজায় এলে প্রহ্লাদ এসে চ্যবনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভেতরে নিয়ে যান। চ্যবন এখানে আসার কাহিনী জানান এবং প্রহ্লাদের প্রশ্নে বলেন পৃথিবীতে নৈমিষ, স্বর্গে পুষ্কর এবং পাতালে চক্রতীর্থ এই তিনটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

কেতকী—দ্রঃ কপালী।

কেতু—কশ্যপের ছেলে। অন্য মতে বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে জন্ম এক দানব। এঁর বড় ভাই রাহু (দ্র)। কেতুর হাতে একটি তরবারি ও প্রদীপ। কেতু অমিতৌজস হয়েই জন্মান। হিন্দু জ্যোতিষে কেতু (ডিসেণ্ডিং নোড) ও রাহু অশুভ গ্রহ নামে পরিচিত।

কেতুগণ—জৈমিনি পুত্র এঁরা ; বামন ; কুশদ্বীপে।

কেতুবর্মা—ত্রিগর্ত রাজকুমার। এঁর বড় ভাই সূর্যবর্মা। বড় ভাইয়ের আদেশে কেতুবর্মা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের ঘোড়া ধরেন। অর্জুনের হাতে দুই ভাই নিহত হন।

কেতুমতী—দ্র হেতি। সুমালীর (দ্র) স্ত্রী।

কেতুমান—(১) সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা পূব দিকে সুধন্বা, দক্ষিণে শঙ্খপাদ, পশ্চিমে কেতুমান এবং উত্তরে হিরণ্যরোমক এই চারজন প্রহরী স্থাপন করেন। (২) কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুধের বন্ধু। কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে মারা যান। (৩) একলব্যের পুত্র, দুর্যোধনের পক্ষে ছিলেন. ভীমের হাতে নিহত হন। (৪) দক্ষকন্যা দনুর একটি ছেলে। (৫) ধন্বন্তরির ছেলে।

কেতুমাল—(১) অগ্নীধ্র পূর্বচিত্তির একটি ছেলে। (২) জম্বুদ্বীপের নবম অংশ। মেরু পর্বতের পূব দিকে।

কেদারনাথ—৩০°৪৪´১৫´´ উ × ৭৯° ৬´ ৩৩´´ পূ। উচ্চতা ৩৫২৫ মি। একটি ৩ বর্গ কি-মি চওড়া. গোল মত উষর উপত্যকা। মাঝখান দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিণী মন্দাকিনী। পূর্বতীরে মন্দির ও বসতি, পশ্চিম তীর বসতিহীন। উপত্যকার তিন দিকে সুমেরু পর্বতমালা—রুদ্র হিমালয়, বিষ্ণুপুরী, ব্রহ্মপুরী, উদ্‌গারীকণ্ঠ ও স্বর্গারোহিণী। এখানে পঞ্চগঙ্গা :—অলকানন্দা (অদৃশ্য), মন্দাকিনী, দুধগঙ্গা, ক্ষীরগঙ্গা ও মৌগঙ্গা এবং পঞ্চকুণ্ড :—উদককুণ্ড, রেতস্‌কুণ্ড, অমৃতকুণ্ড, ঈশানকুণ্ড, হংসকুণ্ড। শীতে ছ মাস তুষারাবৃত থাকে। দীপান্বিতা থেকে অক্ষয়তৃতীয়া পর্যন্ত এখানে কেদারনাথ মন্দির বন্ধ থাকে। বৈশাখের শেষে মত মন্দির খোলা হয়। উপত্যকার উত্তরে কেদারনাথ পাহাড়ের পাদদেশে পাথরের তৈরি এই মন্দির। আকারহীন এক খণ্ড পাথরকে মহিষরূপী মহেশ্বর বলে কল্পনা করা হয়। মন্দিরের উত্তরে অমৃতকুণ্ড ও নীলকণ্ঠ মহাদেব। কাছেই শঙ্করাচার্যের সমাধিক্ষেত্র। ধারণা বৃষরূপী শিবের পৃষ্ঠদেশ কেদারনাথে, বাহু তুঙ্গনাথে, মুখাবয়ব রুদ্রনাথে, জটা কল্পেশ্বরে, নাভি মদমহেশ্বরে। এই পাঁচটি মিলে পঞ্চকেদার। দেহের বাকি অংশ পশুপতি নাথে (কাঠমণ্ডু)।

কেদারনাথ হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ তীর্থ; দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের এবং পঞ্চ কেদারের অন্যতম। কেদারনাথের জ্যোতির্লিঙ্গের উল্লেখ মহাভারতে ও কয়েকটি পুরাণে আছে। চামোলি জেলার উখিমঠ মহকুমাতে। হৃষিকেশ থেকে ১৭৬ কি-মি দূরে কুণ্ডচটি ; এখান থেকে ৫১ কি-মি দূরে ত্রিযুগী নারায়ণ। ত্রিযুগী নারায়ণ থেকে কেদারনাথে পৌঁছতে হয়।

কেবলাভেদাভেদ—দ্র অচিন্ত্যভেদাভেদ।

কেরল—গোকর্ণের দক্ষিণ থেকে কেপ-কমরিন পর্যন্ত এলাকা। এবং প-ঘাট পর্বতমালার প-দিকে। পুরাণও মহাভারতে এর উল্লেখ আছে। ভগীরথ গঙ্গা নিয়ে এলে জলে বহু জায়গা ডুবে যায়। গোকর্ণের মন্দিরের কাছে যে সব ব্রাহ্মণরা থাকতেন

তাঁরা পালিয়ে গিয়ে পরশুরামের কাছে অভিযোগ করেন। পরশুরাম এসে সমুদ্রকে তখন বাণবিদ্ধ করতে চান; কিন্তু বরুণদেব দেখা দিয়ে জল সরিয়ে নিয়ে কিছু জমি মুক্ত করে দিতে রাজি হন। যে এলাকাটি জলমুক্ত হয় সেই অংশটির নাম হয় কেরল। ১৮ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে পরশুরাম যজ্ঞ করেন এবং সমস্ত জমি কশ্যপকে দান করেন। এবং নিজের জন্য সমুদ্রকে বাণবিদ্ধ করে কিছু নতুন দেশ তৈরি করে নিয়ে সেখানে বসবাস করতে থাকেন; সেই দেশের নাম হয় কেরল (দ্রোণপর্ব)। রামায়ণে সুগ্রীব সীতাকে খোঁজবার জন্য কেরল ইত্যাদিতে যেতে বলেছিলেন। মেগাস্থিনিস্ (৪ খৃ-পূ) কেরলের শাসন ব্যবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। ইবন বতুতা (১৩৩৩খৃ) ভারতে আসেন; কেরল সম্বন্ধে তাঁর বর্ণনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন পৃথিবীর এত দেশ দেখলাম; অদ্ভুত এই কেরল; এখানে রাস্তা সম্পূর্ণ দস্যুতস্কর মুক্ত। এখানে একটি নারিকেল চুরি করলেও প্রাণদণ্ড হয়। দ্রঃ কশ্যপ, পরশুরাম।

কেশব—কেশী (দ্র) দানবকে হত্যা করে কৃষ্ণের নাম।

কেশবিন্যাস—মহেঞ্জোদড়োতে তামার নর্তকীমূর্তির মাথায় বেণী রচিত কবরী রয়েছে। ভারতে কবরী রচনার এটি প্রাচীনতম নিদর্শন। সাঁচি ইত্যাদিতে চুল-বাঁধার বহু বিচিত্র উদাহরণ রয়েছে। অজণ্টার অনেকগুলি ছবিতে কবরীর দুপাশে অবেণীবদ্ধ অলকগুচ্ছ ঝুলে রয়েছে। কবরীতে ফুলের শেখরক (নানা ধরণের টিকলি /কল্কা) ও আপীড় (পুষ্পমালা) ব্যবহার ৬৪ কলার একটি (বাৎসায়ন)। দ্রঃ কবরী।

কেশরী—বানররাজ। মেরুপর্বতে থাকতেন। অপ্সরা পুঞ্জিকাস্থলা এক ঋষির শাপে অঞ্জনা বানরীতে পরিণত হন। অন্য মতে অপ্সরা মানগর্বা ব্রহ্মার শাপে অঞ্জনা হন। কেশরীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করেন। অবশ্য বিয়ের পর অঞ্জনা নাম হয়েছিল। এদের কোন সন্তান হয় নি। সন্তানের আশায় অঞ্জনা বায়ুর আরাধনা করছিলেন। এই সময় দেবতারা হরপার্বতীকে জানান রাবণ বধের জন্য তাঁরা পৃথিবীতে জন্মাচ্ছেন এবং মহাদেব যেন বিষ্ণুকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। হরপার্বতী তৎক্ষণাৎ বানর ও বানরী বেশে বনে চলে যান; বহু দিন কোন খোঁজ থাকে না। দেবতারা তখন এঁদের সন্ধানে বায়ুকে পাঠান। বায়ু সমস্ত গাছপালা তুমুল ঝড় তুলে নাড়া দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত একটি অশোক গাছকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বায়ু এই গাছে এঁরা বসে আছেন দেখেন। পার্বতী তখন গর্ভবতী হয়েছেন। এই গর্ভ পার্বতী বায়ুকে দিয়ে দেন এবং বায়ু এই গর্ভ অঞ্জনাকে দান করেন (বনপর্ব)।

কেশিনী—(১) সগর রাজার প্রথমা স্ত্রী। বিদর্ভ কন্যা। পুত্র কামনায় সগর হিমালয়ে গিয়ে একশ বছর তপস্যা করে ভৃগু মুনির বরে একটি ছেলে হয় অসমঞ্জ। (২) নল রাজের স্ত্রী দময়ন্তীর এক জন পরিচারিকা। বাহুক বেশে নল এলে কেশিনী বাহুকের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হন বাহুকই নল রাজা। (৩) অজমীঢ়ের স্ত্রী। পুরু বংশে; ছেলে জহ্নু, জন (মহা ১।৮৯।২৯; অন্য মতে ব্রজ/ব্রজন), রূপিণ। (৪) এক জন অপ্সরা। (৫) দক্ষের একটি মেয়ে; কশ্যপের স্ত্রী। (৬) নিকষার এক নাম (ভাগবত)। (৭) সুধন্বার (দ্র) স্ত্রী।

কেশী—(১) দনুর পুত্র। দেবসেনাকে (দ্র) অপহরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। বিষ্ণুর সঙ্গেও কেশীর এক বার যুদ্ধ হয়েছিল। (২) কংসের অনুচর, এক জন দানব; কংস

কৃষ্ণকে হত্যা করবার জন্য কেশীকে পাঠান। ঘোড়া সেজে গোপদের ওপর নানা অত্যাচার আরম্ভ করতেন এবং মেরে খেয়ে ফেলতেন। কৃষ্ণকেও গিলতে যান; কিন্তু কৃষ্ণ এঁর মুখের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলেন; নাম হয় কেশব। (৩) বসুদেবের স্ত্রী কৌশল্যার ছেলে।

কৈকসী—নিকষা। দ্রঃ সুমালী।

কৈকেয়ী—(১) কেকয় রাজার মেয়ে। যুধাজিতের বোন। দশরথের দ্বিতীয় স্ত্রী, ছেলে ভরত। অযোধ্যা থেকে কেকয় ৭-দিনের পথ। দেবাসুরের যুদ্ধে আহত রাজা দশরথকে সেবায় সুস্থ করে তুললে দশরথ যে কোন দুটি বর দিতে চান। অন্য মতে অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে কৈকেয়ীও দশরথের সঙ্গে গিয়েছিলেন। নিমেষের মধ্যে দশদিকে ঘুরে দশরথকে যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। রথ এই ভাবে পরিচালিত হতে গিয়ে রথের চাকার খিল খুলে যায়। কৈকেয়ী লক্ষ্য করেন এবং নিজের বুড়ো আঙুল দিয়ে চাকা আটকে রাখেন; খুলে যেতে দেন না। দশরথ পরে জানতে পেরে বর দিতে চান। কৈকেয়ী প্রয়োজন হলে চাইবেন বলেছিলেন। রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের ব্যবস্থা হলে দাসী মন্থরার পরামর্শে অভিষেকের আগের দিন কৈকেয়ী এই বর দুটি চান; এক বরে রাম চোদ্দ বছর বনে যাবেন, আর এক বরে ভরতের রাজ্য অভিষেক হবে। কৈকেয়ী অবশ্য প্রথমে মন্থরার প্রস্তাবে রাজি হননি। দশরথ কৈকেয়ীকে বহু অনুনয় বিনয় করেছিলেন; আচার্য, গুরু, মন্ত্রী, ও অযোধ্যাবাসীরাও কৈকেয়ীকে বারণ করেছিলেন। দশরথ তার পর অজ্ঞান হয়ে যান। রাম সব ঘটনা জানতে পেরে পিতৃসত্য রক্ষার জন্য বনে চলে যান; সীতা ও লক্ষ্মণ সঙ্গে যান। ভরত (দ্রঃ) মাতুলালয়ে ছিলেন; ফিরে এসে মাকে তীব্র তিরস্কার করেন। (২) পুরুবংশে অজমীঢ়ের স্ত্রী। (৩) বিরাট রাজার স্ত্রী সুদেষ্ণার অপর নাম।

কৈটভ—প্রলয় সমুদ্রে বিষ্ণু যখন অনন্ত নাগের কোলে যোগ-নিদ্রায় শুয়ে ছিলেন তখন বিষ্ণুর নাভি পদ্মে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মার কর্ণমল থেকে দু জন অসুর উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মার দিন শেষ হয়ে রাত্রি আরম্ভ হয়ে দ্বিতীয় যাম কেটে গেলে এদের জন্ম। দ্রঃ জাম্ববান। অন্য মতে সৃষ্টির পর ব্রহ্মা ঘুমিয়ে পড়েন তখন এদের জন্ম। অসুর দু জন কাঠের মত নিশ্চল হয়ে পড়ে ছিলেন, ব্রহ্মা এঁদের দু'জনের মধ্যে বায়ু চালনা করে জীবিত করেন। এক জনের শরীর কোমল বলে নাম হয় মধু, দ্বিতীয় জন কঠিন বা কীটের মত বলে নাম হয় কৈটভ। আর এক মতে পদ্মে ব্রহ্মা জন্মাবার পর বিষ্ণু দুটি বিন্দু জল সৃষ্টি করেন। একটি বিন্দু মধু মত মিষ্ট এবং এই থেকে মধু জন্মায়; ইনি তমোগুণের আধার। অপর বিন্দু থেকে কৈটভ জন্মান, রজোগুণের আধার। এরা জলেতেই বড় হয়ে এবং ক্রমশ উদ্ধত হয়ে উঠতে থাকেন এবং চিন্তা করতে থাকেন এই বিরাট জল রাশি কোথা থেকে এল। এই সময় মহামায়া/মহাশক্তি দেখা দেন এবং বাক্-বীজ দান করেন। এই বীজ মন্ত্রের দ্বারা এরা হাজার বছর দেবীর আরাধনা করতে থাকেন। দেবী তখন এসে বর দিতে চান এবং এরা ইচ্ছা মৃত্যু বর চান। বর পেয়ে আরো উদ্ধত হয়ে ওঠেন। ব্রহ্মার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে যান। অন্য মতে এদের গর্জনে ব্রহ্মার ঘুম ভেঙে যায়। আর এক মতে এক দিন ব্রহ্মার চারটি বেদ চুরি করে পাতালে গিয়ে লুকিয়ে রাখেন। ব্রহ্মা এদের অনুসরণ করতে চেষ্টা

করেন এবং শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুকে জাগিয়ে দেন। বিষ্ণুর সঙ্গে তখন এদের হাজার/পাঁচহাজার বছর যুদ্ধ হয় তবুও এঁরা ক্লান্ত হন না। এক মতে বিষ্ণু এই সময় বুঝতে পারেন এরা ইচ্ছামৃত্যু বর পেয়েছেন এবং মহামায়ার ধ্যান করে জানতে পারেন বঞ্চনা না করলে এদের নিহত করা যাবে না। অন্য মতে কোন যুদ্ধ হয় নি। বিষ্ণু এঁদের বর দিতে চান কিন্তু এরা সেই বর প্রত্যাখ্যান করে বিষ্ণুকেই বর দিতে চান। বিষ্ণু তখন বর চান লোকের মঙ্গলের জন্য দানব দু জন তাঁর বধ্য হক। একটি মতে মধুকৈটভ এই সময় আরো কিছু যুদ্ধ করতে চান কিন্তু বিষ্ণু রাজি হন না ; পর জন্মে (খর ও অতিকায় হয়ে জন্মালে) যুদ্ধের বাসনা মেটাবেন বলে আশ্বাস দিয়ে বিষ্ণু এঁদের নিহত করেন। আর এক মতে মধুকৈটভ সর্ত করেন কোন জল হীন স্থানে তাদের বধ করতে হবে এবং পর জন্মে যেন তারা বিষ্ণুর ছেলে হয়ে জন্মাতে পারেন। বিষ্ণু কোন জলহীন জায়গা না পেয়ে নিজের ঊরু বিশালতর করে দুজনকে সেই ঊরুর ওপর নিহত করেন। অন্য মতে স্থান না পেয়ে ব্রহ্মাকে বলেন শক্তিরূপিণী শিলা উঁচু করে তুলে ধরতে। ব্রহ্মা এই শিলা ধারণ করলে বিষ্ণু এর ওপর উঠে নিজের ঊরুর ওপর দৈত্য দু জনকে সুদর্শন চক্র দিয়ে হত্যা করেন। অসুরদের মেদ জলে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই মেদ জমা হয়ে ক্রমশ একটি ঢেলা/মেদিনীতে পরিণত হয়। দ্রঃ মধু, ধুন্দু। (২) উলূকের আর এক নাম। শকুনির ছেলে।

কৈবল্য—দ্রঃ পাতঞ্জল।

কৈলাস—মেরু পর্বতের পূব দিকে জঠর ও দেবকূট, পশ্চিম দিকে পবমান ও পারিযাত্র, দক্ষিণে কৈলাস ও করবীর এবং উত্তরে ত্রিশৃঙ্গ ও মকরগিরি। কৈলাসে শিব ও কুবের বাস করেন। কুবেরের সঙ্গে যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর ও রাক্ষস ইত্যাদিও রয়েছেন। শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিষ্ণু একবার কৈলাসে তপস্যা করেছিলেন। রাজা সগর দুই স্ত্রীকে নিয়ে এখানে তপস্যা করেছিলেন। গঙ্গা আনার সময় ভগীরথ শিবকে সন্তুষ্ট করতে এখানে আরাধনা করেন। ভীম এই কৈলাসে কুবেরের পদ্ম বনে এসেছিলেন।

মহাভারতে নাম হেমকূট। কৈলাস পর্বতমালা কাশ্মীর থেকে ভুটান পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বতমালার মাঝখানে লাছু ও ঝংছু দুটি পাহাড় দিয়ে ঘেরা অংশ কৈলাস পর্বত। এই পর্বতের উত্তরাংশে কৈলাস শিখর, তুষারময়, ৬৭১৪ মি। এই শিখর দ-পশ্চিম তিব্বতে এবং লাসা থেকে ১২৮৭ কি-মি দূরে। বর্তমান তিব্বতী নাম কিং-রিম-পোচে। পাহাড়ের ২৬ কি-মি দক্ষিণে রাবণ হ্রদ (বর্তমান রাক্ষস তাল) ও মানস সরোবর। এই অঞ্চলে চারটি নদী সিন্ধু, শতদ্রু, ব্রহ্মপুত্র ও সরযূ। তাপমাত্রা ১৯.৪° সে ও ১৬.৭° সে। প্রচুর বৃষ্টি। কুমায়ুন রাজাদের অবহেলার ফলে এটি তিব্বতের অন্তর্ভুক্ত হয়। একটি তীর্থ স্থান। তিব্বতীদেরও পুণ্যতম শিখর। ভারত থেকে কৈলাস যাবার ৬-টি হাঁটা পথ আছে।

কোগ্রাম—বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত একটি বৈষ্ণব তীর্থ। নিকটে উজানি মহাপীঠ ; এখানে সতীর দ-কনুই পড়েছিল। দেবী সর্বমঙ্গলা, ভৈরব কপিলাম্বর। স্থানীয় মতে এটি কালিদাসের উজ্জয়িনী।

কোঙ্কন—দ-ভারতে একটি দেশ। মহাভারতে উল্লেখ আছে।

কোজাগর—শরৎকালে দুর্গাপূজার পরবর্তী পূর্ণিমাতে লক্ষ্মীপূজা। পুরাণে আছে ঐ রাতে লক্ষ্মী দেবী এসে 'কো জাগর্তি'—কে জেগে আছে—আমি ধন দেব বলেন। এই জন্য নাম কোজাগর।

কোটিকাস্য—রাজা সুরথের ছেলে; ত্রিগর্তরাজ জয়দ্রথের অনুচর। জয়দ্রথের নির্দেশে দ্রৌপদীকে প্ররোচনা দিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। দ্রৌপদী প্রত্যাখ্যান করলে জয়দ্রথ এসে দ্রৌপদীকে অপহরণ করেন।

কোলহাপুর—কোল্লা (=অম্বাবাই বা মহালক্ষ্মী) যে পুরে থাকেন। ১৬°৪২´ উ ×৭৪°১৬´ পূ; মহরাষ্ট্রে একটি জেলা ও সহর। এই জেলার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণা, পঞ্চগঙ্গা ও বেদগঙ্গা ইত্যাদি নদী প্রবাহিত। এখানে প্রসিদ্ধ মন্দির মহালক্ষ্মী মন্দির, নবম শতকের ভাস্কর্যের নিদর্শন। ব্রহ্মপুরী অঞ্চলে মেদাদিত্যের মন্দির রয়েছে। এখানে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মও এক দিন প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

কৌলিক—কোকিল। একটি ধেড়ে ইঁদুর। এক বার গঙ্গাতীরে একটি বিড়াল তপস্যা আরম্ভ করে। কিছু দিন পরে পাখী ইঁদুর সকলেই নির্ভয়ে এর কাছে আসতে থাকে। বিড়াল এদের নেতা হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রত্যহ গোপনে একটি করে ইঁদুর খেতে থাকে এবং ক্রমশ হৃষ্টপুষ্ট হতে থাকে; যুগপৎ ইঁদুর সংখ্যাও কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কৌলিক সব কিছু ধরে ফেলে।

কোশল—কাশীর উত্তরে অযোধ্যা প্রদেশের সন্নিহিত রাজ্য। মোটামুটি রাজধানী অযোধ্যা। ইক্ষ্বাকুর পিতা মনু নির্মাণ করেছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণ ও প্রশ্নোপনিষদে এই দেশের উল্লেখ আছে। সরযূ নদীর উত্তরে উত্তর-কোশল, দক্ষিণে দক্ষিণ-কোশল; রাজধানী যথাক্রমে শ্রাবস্তী ও কুশাবতী। রামের রাজধানী ছিল দক্ষিণ কোশলে। ভীম উত্তর কোশল ও সহদেব দক্ষিণ কোশল জয় করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে এখানে রাজা ছিলেন ক্ষেমদর্শী। মুনি কালকবৃক্ষীয়ের সঙ্গে কোশলরাজ ক্ষেমদর্শীর রাজধর্ম নিয়ে কথোপকথন হয়েছিল। কোশল রাজকে অভিমন্যু হত্যা করেছিলেন। অম্বার স্বয়ংবর কালে ভীষ্ম, দুর্যোধনের সম্মান ও সমৃদ্ধির জন্য কর্ণ, এবং অশ্বমেধের জন্য অর্জুন এই কোশল দেশ জয় করেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে নাম সাকেত। খৃ-পূ ৬-শতকে উত্তর ভারতে যে ১৬-টি মহাজনপদ ছিল তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। বুদ্ধের সমকালীন রাজা প্রসেনজিৎ পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। প্রসেনজিতের আগেই কাশী কোশলের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রসেনজিতের ছেলে শাক্য রাজ্য জয় করেন। প্রসেনজিতের সময় কোশল ও মগধের মধ্যে কলহ দেখা দেয় এবং কোশল দুর্বল হয়ে পড়ে ও শেষ পর্যন্ত মগধের অন্তর্গত হয়ে যায়। স্কন্দপুরাণ অনুসারে কোশলে দশ লক্ষ গ্রাম ছিল।

কোশাম্বী—কুশাম্ব নির্মিত নগরী। বৎস্য রাজ্যের মধ্যস্থানে অবস্থিত। পাণ্ডব বংশে উদয়ন এখানে রাজত্ব করতেন। দ্রঃ কৌশাম্বী।

কোষ—প্রাচীন অর্থে বাছাই করা বিষয়ের (শব্দ) সংগ্রহ। যেমন রত্নকোষ, শব্দকোষ, কথাকোষ। সর্ব প্রাচীন অর্থাৎ প্রথম কোষ গ্রন্থ বৈদিক শব্দের তালিকা নাম নির্ঘণ্টু। নির্ঘণ্টুর ব্যাখ্যা রূপে যাস্ক নিরুক্ত গ্রন্থটি লেখেন। এর পর রচিত প্রসিদ্ধ শব্দকোষ হল অমর সিংহের, নাম লিঙ্গানুশাসন; বইটি অমরকোষ নামে প্রসিদ্ধ। বইটি অভিধান মত সাজান নয়; এটি একটি প্রতিশব্দ কোষ; লিঙ্গানুসারে সাজান।

আধুনিক রীতির কোন কোষ গ্রন্থ প্রাচীন কালে ছিল না।

কোষ্ঠী—এর বিচারে মূল সূত্র ভারত ও পাশ্চাত্য দেশে প্রায় একই। ভারতীয় জ্যোতিষ নিরয়ণ রাশি চক্রের ভিত্তিতে আর পাশ্চাত্য জ্যোতিষ আয়ন রাশি চক্রের ওপর রচিত। এই জন্য ভাবাধিপতি গ্রহ নির্ণয় ইত্যাদি অনেক সময় তফাৎ হয় এবং ফলাদেশও ভিন্ন হয়। ভারতীয় জ্যোতিষে গ্রহগণের দৃষ্টি আলোচনা করা হয়। পাশ্চাত্য জ্যোতিষে দৃষ্টি নাই তার বদলে দুই গ্রহের মধ্যে আসপেক্ট বা প্রেক্ষা কল্পনা করা হয়েছে। জাতকের ভবিষ্যৎ জীবন, কোন বয়সে কি হবে নির্ণয়ের জন্য ভারতীয় জ্যোতিষে দশা গণনা প্রবর্তিত হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে দশা গণনার বদলে ডিরেকসান বা গ্রহচালনা পদ্ধতি রয়েছে। বৈদিক বা পরবর্তী কালে এই ধরণের কোন কোষ্ঠী গণনা ছিল না। খৃষ্ট জন্মের পর এই দেশে রাশিচক্র ও গ্রহভিত্তিক ফলাদেশ পদ্ধতি চালু হয়। অনেকে মনে করেন আলেকজাণ্ডারের পর শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ পরিচয়ে যাঁরা পশ্চিম থেকে ভারতে এসে ছিলেন তাঁরাই গ্রহভিত্তিক ফলশাস্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন। এই ব্রাহ্মণদল গ্রহ-বিপ্র নামেও পরিচিত। বরাহ-মিহিরের (খৃ ৬ শতক) গ্রন্থে ফলিত জ্যোতিষের যে বর্তমান রূপ তার উল্লেখ রয়েছে।

কৌৎস—(১) একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। সর্পযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। (২) বা কৌৎস্য। বরতন্তুর শিষ্য। শিক্ষার পর গুরু-দক্ষিণা দিতে চাইলে গুরু ১৪-কোটি স্বর্ণমুদ্রা চান। কৌৎস রাজা রঘুর কাছে আসেন। রঘু সে সময় বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। রাজা তখন কুবের রাজ্য জয় করবেন মনস্থ করেন। কুবের রাতারাতি তখন রাজ ধনাগার ভরে দেন ; রাজা ও কৌৎসকে প্রার্থিত অর্থ দান করেন।

কৌথুম—ব্রাহ্মণ হিরণ্যনাভের ছেলে। জনক রাজার আশ্রমে গিয়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তর্ক করতে করতে এক জন ব্রাহ্মণকে হত্যা করে ফেলেন। ফলে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন। পিতার নির্দেশে সূর্যের আরাধনা করে শাপ ও রোগমুক্ত হন।

কৌন্তেয়—কুন্তীর যে কোন ছেলে।

কৌমোদকী—অগ্নি প্রদত্ত কৃষ্ণের গদা। খাণ্ডবদাহের সময় বরুণের কাছ থেকে অগ্নি এই গদা ও সুদর্শন চক্র এনে কৃষ্ণকে দান করেন। এই সময়ে ইন্দ্রের সঙ্গে এই গদা নিয়ে কৃষ্ণ যুদ্ধ করেন।

কৌরব—কুরু বংশে জন্ম যে কোন লোক। তবে দুর্যোধনদেরই সাধারণত কৌরব বলা হয়। দ্রঃ কুরু।

কৌরব্য—(১) কদ্রুর গর্ভে কশ্যপের ঔরসে জন্ম একটি সাপ। (২) বশিষ্ঠ বংশে এক জন গোত্র প্রবর্তক মহর্ষি।

কৌশল্যা—(১) কোশলরাজের মেয়ে ; দশরথের প্রথমা স্ত্রী ; রামচন্দ্রের মা। কৌশল্যা প্রথমে রামকে বনে যেতে দিতে চান নি। কিন্তু রামের পিতৃভক্তি দেখে সম্মতি ও আশীর্বাদ দেন। রাজা দশরথ এঁকে এক হাজার গ্রাম দিয়েছিলেন ; এগুলির রাজস্ব থেকে কৌশল্যার ব্যক্তিগত ব্যায় নির্বাহ হত। রাম বনে গেলে কৌশল্যার প্রাসাদে দশরথ দেহত্যাগ করেন। অযোধ্যায় ফিরে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করার পর কৌশল্যার মৃত্যু হয়। (২) অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকার মা। (৩) যাদব কেশীর মা। (৪) যযাতির ছেলে পুরুর স্ত্রী ; ছেলে জনমেজয়। মহা ১।৯০।১১।

কৌশাম্বী—বর্তমান নাম কোসাম। এলাহাবাদ থেকে দ-পশ্চিমে ৫১ কি-মি দূরে যমুনা নদীর বাঁ দিকে অবস্থিত ছিল। দুর্গপ্রাকার ও পরিখা সুরক্ষিত প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের ওপর বর্তমানের কোসাম ও পাশের গ্রামখানি দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাশেই যমুনা। প্রাচীন প্রাকারের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৬·৪ কি, মি; উচ্চতা গড়ে প্রায় ১১ মি; কতকগুলি বুরুজের উচ্চতা ২১ মিটারেরও বেশি। পুরা-কালের প্রাকারের বাইরেও বসবাস ছিল এবং এই বাসস্থান এলাকা ২১ বর্গ কি-মি। প্রাকারের উ-পূর্ব ও পশ্চিমে গাত্রে নিয়মিত ব্যবধানে বুরুজ ও একাদশটি প্রবেশদ্বার ছিল: এদের মধ্যে পাঁচটি মূল দরজা। এই জায়গাটির প্রাচীনতা খৃ-পূ এক হাজার বছরের কাছে হবে এবং বিভিন্ন যুগের বহু প্রত্ন বস্তু এখান থেকে পাওয়া গেছে। আদি প্রতিরক্ষা গড়টির নির্মাণকাল প্রাক্‌বুদ্ধ যুগের। গড়ের মধ্যে পূর্বদিকের দরজার কাছে ইঁটের তৈরি ঘোষিতারাম নামে সংঘারামটি ছিল এই সংঘারামের স্থান ও ধ্বংসাবশেষ নিশ্চিতভাবে পাওয়া গেছে।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর একের পর এক রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন ঘটলেও খৃ ৫-শতক পর্যন্ত কৌশাম্বীর গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। দুর্গ প্রাকারের তৃতীয় পর্যায়ের নির্মাণ হয়েছিল (খৃ-পূ ২ শতক) মিত্র নৃপতিদের সময়। কনিষ্কের সময়ে (খৃ ১ শতক) বুদ্ধমিত্রা নামে একজন ভিক্ষুণী একটি বোধিসত্ত্বের মূর্তি এইখানে প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চমবারে প্রাকার নির্মিত হয় সম্ভবত মঘদের রাজত্ব কালে। খৃষ্টীয় ২-শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে কৌশাম্বীতেই মঘদের রাজধানী ছিল। গুপ্তযুগে কৌশাম্বী গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। গুপ্তযুগের শেষ পর্যায়ে বৌদ্ধবিরোধী হূনদের হাতে কৌশাম্বীর পতন আরম্ভ হয়। হিউ-এন-ৎসাঙ-এর পরিদর্শন কালে কৌশাম্বী ছিল ১৯৩২ কি-মি-এর অধিক আয়তন বিশিষ্ট একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র; রাজধানীর পরিসীমা ছিল ৯·৭ কি-মি।

জৈনদের প্রভাব এখানে বিশেষ ছিল না। জৈনদের মতে মহাবীর বর্দ্ধমান এখানে চন্দ্রসূর্যের দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন এবং চন্দনা এখানে কৈবল্য লাভ করেন। এখানে জীনপ্রভসূরির জন্ম ও সারা জীবন কেটেছিল। এ জন্য জৈনদের কাছেও জায়গাটি পবিত্র। কোসাম থেকে ৪ কি-মি দূরে পাভোসা পাহাড়টি খুব সম্ভবত হিউ-এন-ৎসাঙ বর্ণিত ড্রাগন গুহার পাহাড়। পাহাড়ে অহিচ্ছত্রার রাজা আষাঢ় সেন একটি গুহা কস্‌সপীয় অর্হৎ-দের জন্য খুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন।

খৃ-পূ ৬-শতকে সুপ্রতিষ্ঠিত ষোড়শ জনপদের অন্যতম বৎস রাজ্যের রাজধানী। শতপথ ব্রাহ্মণেও এর উল্লেখ আছে। রামায়ণ ও মহাভারতে আছে কুশাম্ব এই রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাণে আছে গঙ্গার জলে হস্তিনাপুর ডুবে গেলে নিচক্ষু (অর্জুনের পর ৭ম পুরুষ) এখানে রাজধানী নিয়ে আসেন এবং নিচক্ষু থেকে ক্ষেমক পর্যন্ত ২৫ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেন। এই বংশের প্রসিদ্ধ রাজা উদয়ন, বুদ্ধের সমকালীন। ঘোষিত, কুক্কুট, ও পাবারিক তিন জন বিত্তশালী শ্রেষ্ঠী এই নগরীতে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তিন জনে তিনটি বিহার ঘোষিতারাম, কুক্কুটারাম ও পাবারিকারাম বা পাবারিকাম্ববন তৈরি করে দিয়েছিলেন। কৌশাম্বীতে বা এর উপপ্রান্তে চতুর্থ বুদ্ধাবাস বদরিকারাম। উদয়নের দারু-

শিল্পী উত্তর ও একটি বিহার করে দিয়েছিলেন। ঘোষিতারামে বুদ্ধদেব একাধিক বার অবস্থান করেছিলেন। সারিপুত্ত, আনন্দ ইত্যাদি শিষ্যও এখানে এই মঠে বাস করেছিলেন। এই সংঘারামেই সব প্রথম সংঘভেদের সূত্রপাত হয়। বুদ্ধ-দেবের সময় কৌশাম্বী সমৃদ্ধ সম্রান্ত নগরী ছিল। অশোকের সময় বৎস রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নগরী হয়েছিল এবং কৌশাম্বী সমৃদ্ধ ছিল ও অশোকের মহা-মাত্যের কর্মকেন্দ্র ছিল। এলাহাবাদের অশোক স্তম্ভটি প্রথমে কৌশাম্বীতেই ছিল। হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে দশের বেশি সংঘারাম দেখেছিলেন এবং সবগুলিই বিনষ্ট প্রায় তখন; এবং পঞ্চাশের বেশি ব্রাহ্মণ্য মন্দির ও অগণ্য অবৌদ্ধ জনতাকে দেখেছিলেন।

কৌশিক—(১) এক জন ব্রাহ্মণ তপস্বী। এক দিন গাছ তলায় বসে শাস্ত্র পাঠ/তপস্যা করছিলেন। এই সময় এক স্ত্রী বক এঁর মাথায় পুরীষ ত্যাগ করলে ইনি ওপর দিকে চাইতেই বকটি ছাই হয়ে যায়। তখন অনুতপ্ত কৌশিক ভিক্ষা করতে করতে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। এক গৃহস্থের বাড়িতে এলে গৃহিণী তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বলেন কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে গৃহাগত স্বামীকে সেবা করতে ব্যস্ত রয়েছেন। পরে ভিক্ষুকের কথা মনে পড়তে লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি ভিক্ষা দিতে আসেন। এই দেরি হওয়াতে কৌশিক রেগে যান; বলেন স্বামীকে শ্রেষ্ঠ মনে করলে ব্রাহ্মণ অতিথিকে অপমান করা হয় ইত্যাদি। কিন্তু মহিলাটি হাসি মুখে বলেন স্বামী সেবা আগে; বকের মত তাকে ছাই করে ফেলা সম্ভব হবে না। ধর্মের যথার্থ রূপ কৌশিক জানেন না। অক্রোধ ও মোহহীনকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলেন। এবং মিথিলাবাসী ধর্ম-ব্যাধের (দ্র) কাছে গিয়ে কৌশিককে তিনি ধর্ম শিক্ষা করতে বলেন। মিথিলাতে গিয়ে ধর্মব্যাধের কাছে কৌশিক পিতামাতাকে সেবা করার ফল জানতে পারেন এবং বাড়ি ফিরে গিয়ে পিতামাতার সেবায় নিযুক্ত হন। (২) নদীর ধারে বাস কারী জনৈক সত্যবাদী ব্রাহ্মণ তপস্বী। পূর্বোক্ত কৌশিক হতে পারেন। দস্যুর ভয়ে এক বার কয়েক জন লোক তাঁর আশ্রমে আশ্রয় নেয়। দস্যুরা এদের সন্ধানে এলে কৌশিক সত্য কথা বলেন ফলে লোকগুলি মারা পরে। এ জন্য কৌশিককে নরকে যেতে হয়। (৩) এক জন মুনি; কুরুক্ষেত্রে থাকতেন। এর ছেলে স্বসৃপ, ক্রোধন হিংস্র, পিশুন, কবি, বাগদুষ্ট, পিতৃবর্তী। চরিত্র অনুসারে এই নাম রাখা হয়েছিল। ছেলেগুলি গর্গের আশ্রমে শিক্ষা লাভ করেন। কৌশিক মারা গেলে এঁরা ভীষণ দরিদ্র হয়ে পড়েন এবং দেশেও সেই সময় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গর্গ তাঁর দুগ্ধবতী গরুটিকে বনে চরিয়ে আনতে বলেন। এরা ক্ষুধিত ছিল; ঠিক করে গরুটিকে মেরে পিতৃদেবদের পূজা দিয়ে সেই মাংস খাবে। কোন পাপ হবে না। পিতৃবর্তী গরুটিকে মেরে যথারীতি যজ্ঞ করেন এবং গর্গকে জানান গরুটিকে নেকড়ে বাঘে খেয়েছে। বাছুরটি ফিরিয়ে দেন।

কাল ক্রমে এই সাতটি ছেলে মারা গিয়ে দাসপুরে নিম্ন শ্রেণীতে বনবাসী হয়ে জন্ম নেন। পিতৃদেবদের যজ্ঞ করেছিলেন বলে পূর্বজন্মের কথা এদের মনে ছিল। ফলে এরা ধর্মাচরণ করতেন ও দেবতাদের ভক্তি করতেন। এবং মারা গিয়ে তারপর কালঞ্জর পাহাড়ে জন্তু/হরিণ হয়ে জন্মান। এই জন্মেও এঁদের পূর্ব জ্ঞান ছিল এবং পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ে দেহত্যাগ করে মানস সরোবরে লাল-হাঁস হয়ে জন্মান।

চরিত্র অনুসারে এ বার নাম হয় সুমনস্, কুসুম, বসু, চিত্রদর্শী, সুদর্শী, জ্ঞাতা ও জ্ঞান-পারগ। নাম অনুসারে এঁদের চরিত্র। সাতভাই পবিত্র ও নিষ্পাপ জীবনযাপন করতেন এবং ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিন জনের পতন হয়। পাঞ্চাল রাজ অনুহের ভোগ-বিলাসময় জীবন দেখে পিতৃবর্তীরও রাজা হবার বাসনা হয় এবং অনুহের দুজন বিত্তবান, বিলাসী মন্ত্রীদের দেখে আরো দুটি হাঁস এই রকম মন্ত্রী হতে চান। ফলে পিতৃবর্তী অনুহের ছেলে ব্রহ্মদত্ত হয়ে জন্মান; অপর দুজন পুণ্ডরীক ও সুবালক নামে মন্ত্রী পুত্র হয়ে জন্মান। কাম্পিল্যতে পরে ব্রহ্মদত্ত রাজা হন। অত্যন্ত শক্তিশালী, পিতৃভক্ত রাজা পিতৃদেবদের পূজাতে মগ্ন থাকতেন। পূর্ব জন্মের পুণ্যের ফলে রাজা সমস্ত জীবজন্তুর কথা বুঝতে পারতেন। দেবল/সুদেবের কন্যা সন্নতিকে বিয়ে করেন। এই রাণী আগের জন্মে গর্গের গরু ছিলেন। রাণীও অত্যন্ত ধর্মভীরু হন।

এক বার রাজা ও রাণী উদ্যানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এমন সময় কলহরত দুটি পিপীলিকার কথা শুনতে পান। এরা স্বামীস্ত্রী; কলহ মিটে গেলে আবার ভালবাসায় বিভোর হয়ে ওঠে। রাজা সব শুনে হেসে ফেলেন। রাণী হাসির কারণ জানতে চাইলে রাজা সমস্ত ঘটনাটি বলেন কিন্তু রাণী বিশ্বাস করেন না। রাণী জানতে চান ব্রহ্মদত্ত কি করে জীবজন্তুর ভাষা শিখল। রাজা কোন উত্তর দিতে পারেন না; চিন্তা করতে থাকেন। রাজা তখন সাত দিন উপবাস করেন এবং সপ্তম দিনে ব্রহ্মা দেখা দিয়ে বলে যান এক জন ব্রাহ্মণের কাছে রাজা সব জানতে পারবেন। কৌশিকের আর চারটি ছেলে অর্থাৎ বাকি চারটি হাঁস এ জন্মে এক দরিদ্রের ঘরে কাম্পিল্যতেই জন্মেছিলেন। পূর্ব জন্মের কথা এঁদের স্মরণ ছিল। এঁদের নাম এবারে হয়েছিল ধৃতিমান, সর্বদর্শী, বিদ্যাচন্দ্র ও তপোধিক; চরিত্র অনুসারে এই নাম। এরা তপস্যা করার জন্য সংসার ত্যাগের মতলব করলে এদের অসহায় পিতা কান্নাকাটি করতে থাকেন। এরা তখন পিতাকে একটি শ্লোক শিখিয়ে দিয়ে বলেন ব্রহ্মদত্তকে এই শ্লোকটি শোনালে প্রচুর ধনরত্ন পাবেন।

সাত দিন পরে ব্রহ্মদত্ত রাণী ও মন্ত্রীদের নিয়ে পথে বার হয়ে এসে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি এসে শ্লোক শোনান। কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, দাসপুরে সাতজন বনবাসী, কালঞ্জরে হরিণ; মানস সরোবরে লাল হাঁস, বর্তমানে কাম্পিল্যে; শুনেই ব্রহ্মদত্তের পূর্বের সব কিছু মনে পড়ে যায়: অজ্ঞান হয়ে পড়েন; মন্ত্রী দু জনও সব স্মরণ করে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। ব্রহ্মদত্ত জ্ঞান ফিরে পেলে ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধনরত্ন ও গ্রাম দান করেন এবং ছেলে বিষ্বকসেনকে রাজ্য দিয়ে মানস সরোবরে গিয়ে তপস্যা করে এঁরা তিন জনে মুক্তি পান। (৪) এক জন রাজা; রাত্রিতে মোরগ হয়ে যেতেন। রাণী এই দুঃখের কথা গালবকে জানালে গালব বলেন আগের জন্মে রাজা শক্তিমান হবার জন্য মোরগের মাংস খেতেন। মোরগরাজ তাম্রচূড় এই কথা জানতে পেরে শাপ দেন প্রতি রাত্রে রাজা মোরগ হয়ে যাবেন। গালবের উপদেশে রাজা শিবের তপস্যা করে শাপমুক্ত হন। (৫) পুরু বংশে কপিলের ছেলে। গৃৎসপতি এই কৌশিকের ভাই।

কৌশিকা—বর্তমানের কোশী। এই নদীর তীরে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল।

কৌশিকী—(১) উমার দেহজাত এক দেবী। কৃষ্ণের নির্দেশে ইনি যশোদার গর্ভে জন্মান। বসুদেব কৃষ্ণকে বদলে এঁকে নিয়ে আসেন। কংস এঁকে আছাড় মারতে গেলে তাঁর হাত থেকে বার হয়ে আকাশে উঠে গিয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে কংসের ঘাতক জন্ম গ্রহণ করেছে। ইন্দ্র এঁকে বিন্ধ্যবাসিনী রূপে বিন্ধ্যাচলে স্থাপন করেন। (২) মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে কাত্যায়নীর (দ্রঃ কালী) দেহকোষ জাত দেবী ; ফলে নাম কৌশিকী। শুম্ভ নিশুম্ভের দুই সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ড একটি সুন্দরী নারীর কথা শুম্ভকে জানালে সুগ্রীব নামক এক দূতকে শুম্ভ এই দেবীর (কৌশিকী) কাছে পাঠান। শুম্ভ বা নিশুম্ভ যে কোন এক জনের স্ত্রী হবার জন্য সুগ্রীব প্রস্তাব করেন। দেবী জানান তিনি বীর্যশুল্কা। দূতের কাছে এই কথা শুনে দেবীর চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবার জন্য ধূম্রলোচন নামে এক সেনাপতিকে শুম্ভ পাঠান। ধূম্রলোচন এসে দেবীর ক্রোধে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শুম্ভ তখন চণ্ডমুণ্ডকে পাঠান। এঁরা এলে হিমালয়ে সিংহবাহিনী এই দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ হয়। দেবীর ললাট থেকে দেবী চামুণ্ডা (দ্র) বের হয়ে এঁদের নিহত করেন এবং এঁদের দু জনের মাথা কৌষিকী দেবীকে উপহার দেন। এর পর শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধে আসেন এবং মারা যান।

কৌষীতকি—অপর নাম শাঙ্খায়ন (সাঙ্খায়ন) ব্রাহ্মণ। ঋষি কৌষীতকের রচনা। দশপূর্ণ মাসের বিবরণ ইত্যাদি রয়েছে।

কৌস্তুভ—সমুদ্র মন্থনে উত্থিত মণি। বিষ্ণু এই মণি বুকে ধারণ করেন।

ক্রতু—এক জন প্রজাপতি। ব্রহ্মার মানসপুত্র। একজন মহর্ষি বা সপ্তর্ষি। অন্য পুরাণ মতে ব্রহ্মার দেহ থেকে উৎপন্ন। স্ত্রী দক্ষ কন্যা সন্নতি/শান্তি। মহাভারত মতে সন্নতিব বালখিল্য নামে ৬০,০০০ ছেলে। যজ্ঞাদি কাজে বিষম বিপদ দেখা দিলে অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে ইনিও এসে হাজির হতেন। পরাশরের রাক্ষস নিধন যজ্ঞ বন্ধ করে দেন। আর এক মতে শিবের বরে ক্রতুর এক হাজার ছেলে হয়। ভীষ্ম যখন শরশয্যায় তখন এসে দেখা করেছিলেন।

ক্রথ/ক্রাথ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

ক্রব্যাদ—(১) পূর্ব পুরুষদের মধ্যে দেবত্বপ্রাপ্ত একটি দল। মৃতদের আত্মাকে গ্রহণ করেন। (২) শব ভক্ষক অগ্নি বিশেষ।

ক্রমদীশ্বর—বাঙালি, সংস্কৃত বৈয়াকরণ। পিতা চক্রপাণি ; পিতামহ শ্রীপতি। ১০ বা ১২ শতক। আর কিছু জানা নাই। প্রচলিত কাহিনী শৈশবে পিতৃমাতৃহীন বালককে এক পণ্ডিত শিক্ষাদান করেন। ক্রমদীশ্বর তারপর সমস্ত ব্যাকরণের সার সংগ্রহ করে সংক্ষিপ্ত সার লেখেন। এঁর পাণ্ডিত্য দেখে এক সহপাঠী তাঁকে হত্যা করেছিলেন। আর এক মতে গ্রন্থটি জটিল হওয়াতে জনপ্রিয় হতে পারে নি ; এ জন্য ক্ষুব্ধ হয়ে গ্রন্থটি মহারাজ জুমরনন্দীর পুকুরে ফেলে দিয়ে আত্ম হত্যা করেন। জুমর নন্দী পুঁথিটি তুলে এনে সংশোধন করে কৃদন্ত ; উণাদি, ও তদ্ধিত অংশ সংযোজন করে বইটির একটি বৃত্তি রচনা করেন।

ক্রাথ—(১) দ্র ক্রথ। (২) মহাভারতে বিখ্যাত এক রাজা ; রাহুর অংশে জন্ম : কুরুক্ষেত্রে কৌরব পক্ষে। (৩) বিখ্যাত সর্প। বলরাম মারা গেলে বলরামের (দ্র) আত্মাকে পাতালে নিয়ে যায়।

ক্রিয়া—দক্ষের মেয়ে ; ধর্মের স্ত্রী। সন্তান দণ্ড, ন্যায় ও বিনয়।
ক্রূরা—ক্রোধবশার একটি নাম। অপর নাম ক্রোধা।
ক্রোধ—(১) কশ্যপ ও কালার সন্তান ; বিখ্যাত অসুর। (২) ব্রহ্মার ভ্রূ থেকে জন্ম। জমদগ্নি একবার যজ্ঞ করছিলেন। এই সময় ক্রোধ এসে যজ্ঞীয় ধেনুর দুধে তৈরি পায়সে বিষ মিশিয়ে দেন। জমদগ্নি জানতে পারেন কিন্তু একটুও রাগ করেন না। ক্রোধ তখন মুনির কাছে এসে ক্ষমা চান। কিন্তু পিতৃদেবদের সাপে ক্রোধ বেঁজিতে পরিণত হন ; (৩) লোভের ছেলে ; নিজের বোন হিংসাকে বিয়ে করেন। ছেলে কলি, মেয়ে দুরুক্তি।
ক্রোধবশা—দক্ষের মেয়ে। প্রজাপতি কশ্যপের স্ত্রী। সন্তান জলচর ও মাংসাশী পক্ষী ইত্যাদি :—দশটি মেয়ে :—মৃগী, (সন্তান জন্তু), মৃগমন্দা (ভল্লুক ইত্যাদি), মাতঙ্গী (হাতী), হরী (সিংহ ও বানর), ভদ্রমতা (ইরাবতী>ঐরাবত), শার্দূলী (বাঘ ইত্যাদি), শ্বেতা (দিকনাগ), সুরভী (রোহিণী>গবাদি ; গন্ধর্ব>অশ্বাদি), সুরসা (নাগ), কদ্রু (উরগ, সরীসৃপ)। ক্রোধবশার কিছু ছেলে অসুর ; নাম ক্রোধবশ ; কিছু ক্রোধবশ অসুর কুবের-এর পদ্মবনে পাহারা দিতেন ; রাবণের সৈন্যদলেও কিছু ছিলেন। দ্রঃ ক্ষত্রিয়।
ক্রোধহন্তা—কশ্যপ-কালা'র ছেলে ; বৃত্রের ভাই।
ক্রৌঞ্চ—একটি পাহাড় ; এখানে ক্রৌঞ্চ অসুর বাস করত। অগস্ত্য শিবের আরাধনা করে কাবেরী নদীকে লাভ করে কমণ্ডলু করে নিয়ে আসছিলেন ; বিন্ধ্যকে দমন করে দক্ষিণে একটি তীর্থ স্থাপন করবেন। পথে এই অসুর পাহাড় হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রবল বৃষ্টিপাত করাতে থাকে। অগস্ত্য বিব্রত হয়ে বনে বনে ঘুরতে থাকেন এবং তার পর প্রকৃত ঘটনাটা বুঝতে পেরে শাপ দিয়ে অসুরকে ঐ পাহাড হয়েই থাকতে বলেন ; কার্তিকেয়ের বাণে বিদ্ধ হলে তখন মুক্তি পাবে। কার্তিকেয়র সঙ্গে যুদ্ধে বলিরাজের ছেলে বাণাসুর এই ক্রৌঞ্চ পাহাড়ে আশ্রয় নেন। কার্তিকেয় তখন এই ক্রৌঞ্চ পাহাড় বিদীর্ণ করেন ; অসুর মুক্তি পায়। (২) সপ্তদ্বীপের অন্তর্গত একটি দ্বীপ। (৩) একটি মতে ক্রৌঞ্চ পর্বত মৈনাকের ছেলে।
ক্রৌঞ্চব্যূহ—মোটামুটি ক্রৌঞ্চের আকার ব্যূহ। এই ব্যূহে আটটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান :—মুখমণ্ডল, চোখ, মাথা, গলা, উদর, দুটি পার্শ্বদেশ এবং উরু। ভীষ্ম এই ব্যূহ রচনা করে দ্রোণকে মুখমণ্ডলে, অশ্বত্থামা ও কৃপকে চোখে, হার্দিক্যকে মাথায়, শূরসেনকে গলাতে, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজাকে উদরে, যবন শক ইত্যাদিকে বাম পার্শ্বে, শতায়ু ভূরিশ্রবা ইত্যাদিকে উরুদেশে স্থাপন করেছিলেন।
ক্রৌঞ্চী—কশ্যপ তাম্রার সন্তান।
ক্ষণভঙ্গবাদ— দ্রঃ ক্ষণিকবাদ।
ক্ষণিকবাদ—অন্য নাম ক্ষণভঙ্গুরবাদ। সংসারের ক্ষণস্থায়িত্ব ও সদা গতিশীলতাকে ভিত্তি করে গঠিত মতবাদ। সংসার বিমুক্তি হচ্ছে নির্বাণ এবং নির্বাণই নিত্য, নির্গুণ ও অনির্বচনীয়। এবং নির্বাণের পথ নির্বিকল্প জ্ঞান। অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা এই তিনটি ক্ষণস্থায়িত্বের লক্ষণ। ক্ষণস্থায়িত্বের জন্যই জীব দুঃখাপন্ন হয়। জীব অর্থে চিত্ত ও ভৌতিক উপাদানের পরিবর্তনশীল সমষ্টি। আত্মা নামে কোন নিত্য বস্তু নাই। অথর্ববেদে, মহাভারতে ও মৈত্রী উপনিষদের কালবাদ যেন এই

বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদের পূর্বাভাস। তবে ক্ষণিকবাদ কালবাদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বৌদ্ধদর্শনে কোন নিয়তি নাই; পাপপুণ্য আছে। মহাভারতে কালবাদে জরা ও মৃত্যুর কথা আছে। ক্ষণিকবাদের এই ক্ষণ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ক্ষণ। এবং এই সূক্ষ্মতম ক্ষণেই জীবের বা বস্তুর উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ সংগঠিত হচ্ছে। একটি ক্ষণ ত্রিধা হয়ে এই যে কাজ করে এ কথা বিরুদ্ধবাদীরা স্বীকার করেন না। বৌদ্ধ দার্শনিকরা কারণের ও কার্যের সম্বন্ধ স্বীকার করেন; কিন্তু এদের পৌর্বাপর্য মানেন না। বৌদ্ধরা বলেন কার্য থেকেই কারণ নির্ণীত হয়; কার্য অবশ্য কারণকে অনুধাবন করে এবং কার্য তাৎক্ষণিক। বৌদ্ধ মতে কারণ সর্বদাই কার্যপ্রসূ নয়। বৌদ্ধ দর্শন সাংখ্যের সৎকার্যবাদ স্বীকার করে না। বৌদ্ধরা বলেন কারণের বিনশে কার্যের আবির্ভাব। বৌদ্ধরা বলেন দুটি ক্ষণে একই বস্তুর সমাবস্থান হতে পারে না। থাকলে কাল সংকর দেখা দেবে অর্থাৎ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ থাকবে না; সব এক হয়ে যাবে। ক্ষণের মাধ্যমে বস্তুর এই রূপান্তর নির্দিষ্ট নিয়মাধীন এবং এই নিয়মের বৌদ্ধ নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ।

ক্ষত্তা—বিদুর।

ক্ষত্রদেব—শিখণ্ডির ছেলে। কুরুক্ষেত্রে লক্ষ্মণ ও দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। লক্ষ্মণের হাতে নিহত হন।

ক্ষত্রপ—প্রাচীন পারসিক ক্ষথ্রপাবন শব্দই সংস্কৃতে ক্ষত্রপ ও প্রাকৃতে খতপ বা ছত্রপ। ভারতের ক্ষত্রপরা প্রধানত শক। বৈদেশিক রাজার প্রাদেশিক শাসনকর্তা রূপে এঁরা রাজ্য শাসন করতেন; পরে কোন দিন স্বাধীন হয়ে পড়লে রাজা হয়ে বসতেন। সাধারণত এক জন মহাক্ষত্রপ ও তাঁর উত্তরাধিকারী এক জন ক্ষত্রপ শাসন ব্যবস্থায় যুক্ত থাকতেন। এ রকমের বহু ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপের নাম ভারতের ইতিহাসে ছড়িয়ে রয়েছে।

ক্ষত্রবর্মা, ক্ষত্রঞ্জয়, ক্ষত্রধর্মা—ধৃষ্টদ্যুম্নের ছেলে। তিন জনেই কুরুক্ষেত্রে দ্রোণের হাতে মারা যান।

ক্ষত্রিয়—কশ্যপ ও ক্রোধবশার (দ্র) সন্তান। ক্রোধবশার কিছু সন্তানদের নাম ক্রোধবশ। বহু ক্ষত্রিয় রাজা এই ক্রোধবশদের সন্তান বলে নিজেদের দাবি করেন।

ক্ষমা—প্রজাপতি দক্ষের একটি মেয়ে; পুলহের স্ত্রী। ছেলে কর্দম, উর্বরীয়ান ও সহিষ্ণু।

ক্ষয়মাস—দ্রঃ মলমাস।

ক্ষীরগ্রাম—বর্দ্ধমানে কাটোয়া মহাকুমা থেকে ২১ কি-মি দূরে। এখানে সতীর ডান পায়ের আঙুল পড়েছিল। দেবী যোগাদ্যা, ভৈরব ক্ষীরকণ্ঠ। কিংবদন্তী দেবী কুমারী বেশে এক শাঁখারির কাছে শাঁখা পরে জল থেকে শাঁখা পরা হাত পূজারী ও শাঁখারিকে দেখান। এইজন্য প্রতিমা সারা বছর জলে ডোবান থাকে। বৈশাখী সংক্রান্তিতে প্রতিমা তুলে পূজা করা হয়। মেলা বসে। কৃত্তিবাসে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

ক্ষীরোদসমুদ্র- পূর্বদিকে; অপ্সরাদের বিহার স্থান। মন্থন করে চন্দ্র ইত্যাদি (দ্রঃ বারুণী) উঠেছিল। দ্রঃ কামধেনু।

ক্ষুপ-(১) একজন প্রজাপতি। ব্রহ্মা একবার যজ্ঞ করবেন স্থির করেন। সুতরাং একজন উপযুক্ত ঋত্বিক পাবার চেষ্টায় নিজের মাথাতে এক হাজার বছর গর্ভ ধারণ করেন। ক্ষুপ এই ঋত্বিক। (২) ইক্ষ্বাকুর পিতা। নিরামিষাশী। বৈবস্বত মনুর কাছে একটি তরবারি লাভ করেছিলেন। মহা ১৪।৪।৩।

ক্ষুরপ্র—অর্জুন ভীষ্মের প্রতি এই বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন।

ক্ষেত্রপাল—ক্ষেত্রের অধিপতি দেবতা। লিঙ্গপুরাণ মতে শিবের অবতার। শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী ও ডাকিনীতন্ত্রে এঁর উল্লেখ আছে। প্রত্যেক দেবতার পূজার সঙ্গে এঁর পূজার ব্যবস্থা কর্তব্য। এঁর বিভিন্ন রূপ ও বিভিন্ন পূজা-উপকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতে বিভিন্ন প্রান্তে নানা ভাবে সাধারণ লোকের মধ্যে পূজিত হন। একটি ধ্যানে ইনি শিবের ছেলে, ঊর্দ্ধ ত্রিলোচন, জটাকলাপধারী, দিগম্বর, ভুজঙ্গভূষণ, উগ্র-দশন, কেশ পিঙ্গলবর্ণ; ত্রিশূল, ডমরু ও খট্বাঙ্গধারী। চাট, মাংস ইত্যাদি নানা কিছু এঁর নৈবেদ্য। এঁর বরে অল্প পরিশ্রমে প্রচুর শস্য হয়, রোগভয় দূর হয়, বাঘের ভয় থাকে না; চট্টগ্রামে হিন্দু-মুসলমান সকলেই এঁর পূজায় যোগ দিত।

ক্ষেমক—কুরুবংশের (দ্র) শেষ রাজা। (২) কশ্যপ কদ্রু পুত্র।

ক্ষেমদর্শী—দ্রঃ কালকবৃক্ষীয়।

ক্ষেমমূর্তি—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

ক্ষেমা—একজন অপ্সরা।

ক্ষেমেন্দ্র—আলংকারিক ও সাহিত্যিক খৃ ১১ শতক। পিতা প্রকাশচন্দ্র। অভিনব-গুপ্তের কাছে সাহিত্য পাঠ করেন; ক্ষেমেন্দ্রের উপনাম ব্যাসদাস। অন্য মতে শৈব-দার্শনিক ক্ষেমেন্দ্র এবং দার্শনিক ক্ষেমেন্দ্র একই ব্যক্তি। ক্ষেমেন্দ্রের প্রতিভা বহুমুখী। অলংকার, ছন্দ, নাটক, প্রহসন, কামশাস্ত্র ইত্যাদি নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলির বেশির ভাগই অবশ্য সারসংগ্রহ। তাঁর অলংকার বই :—ঔচিত্যবিচার, কবিকণ্ঠাভরণ। ছন্দ :—সুবৃত্ততিলক। কাব্য :—সময়মাতৃকা, দর্পদলন, কলাবিলাস, দেশোপদেশ, নর্মমালা, সেব্যসেবকোপদেশ, চারুচর্যা, চতুর্বর্গসংগ্রহ, দশাবতারচরিত। ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী, রামায়ণ মঞ্জরী ও মহাভারত মঞ্জরী যথাক্রমে গুণাঢ্যের বৃহৎকথা, রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনে রচিত।

অমৃততরঙ্গ, অবসরসার, কনকজানকী, কবিকর্ণিকা, ক্ষেমেন্দ্রপ্রকাশ, দানপারিজাত, রাজাবলী, ললিতরত্নমালা, লোকপ্রকাশ, ব্যাসাষ্টক—এগুলিও ক্ষেমেন্দ্রের রচনা বলে পরিচিত কিন্তু সবগুলির সন্ধান পাওয়া যায় নি।

খ

খগম—সত্যবাদী অত্যন্ত ক্ষমতাবান ব্রাহ্মণ তপস্বী। ঋষিপুত্র সহস্রপাদের বন্ধু। এক দিন খড়কুটো দিয়ে একটা সাপ তৈরি করে অগ্নিহোত্র কাজে ব্যস্ত খগমকে সহস্র-পাদ ভয় দেখান। খগম ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েন জ্ঞান ফিরে পেয়ে ডণ্ডুভ (ঢোঁড়া)

সাপে পরিণত হবার জন্য শাপ দেন। পরে সহস্রপাদের কাতর অনুনয়ে বলেন সুমতির ছেলে রুরু (দ্র) মুনির সঙ্গে দেখা হলে মুক্তি হবে। শাপমুক্ত হয়ে ইনি আবার নিজের দেহ ফিরে পান।

খটবাকু—বৈবস্বত মনুর এক ছেলে। ইক্ষ্বাকুর পূর্বপুরুষ। এই খটবাকুই প্রথম রাজা; অযোধ্যা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা।

খটবাঙ্গ—সূর্যবংশে এক রাজা। একটি মতে কল্মাষপাদ>অশ্মক>মূলক>খটবাঙ্গ। আর এক মতে বিশ্বসহ ও ইলিবিলার ছেলে; নাম দিলীপ। দেবাসুরের যুদ্ধে এক বার দেবতাদের সাহায্য করেন। দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে ইনি নিজের পরমায়ু জানতে চান। দেবতারা জানান তিনি আর মুহূর্ত মাত্র বাঁচবেন। এই শুনে আনন্দিত হয়ে সমস্ত কাজ ত্যাগ করে সথাহিত মনে বিষ্ণুকে ধ্যান করতে করতে দেহ ত্যাগ করেন। দ্র রাজা।

খণ্ডগিরি—অন্য নাম কুমারী পর্বত। ভুবনেশ্বরের ৬ কি-মি পশ্চিমে ২০°১৬´উ× ৮৫°৪৭´পূ বালি পাথর পাহাড়। এর উচ্চতা ৩৮ মি। জৈন সাধুদের তীর্থ- স্থান; বহু শৈলখাত, গুহা ও পুষ্করিণী আছে। খৃ-পূ ১-ম শতকে মহামেঘবাহন বংশের তৃতীয় রাজা খারবেলের নেতৃত্বে স্থানটি জৈনধর্মের কেন্দ্ররূপে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। খৃ ১১ শতকে সোমবংশীয় রাজা উদ্যোতকেসরীর সময়ে এখানকার কয়েকটি গুহায় জৈন ও শাসনদেবীদের মূর্তিগুলি এঁকে গুহাগুলিকে পূজাস্থানে পরিণত করা হয়েছিল; গঙ্গ ও গজপতি রাজবংশের সময়ও খণ্ডগিরি জৈনধর্মের কেন্দ্র ছিল। ১৫-টি দর্শনীয় খাত গুহা আছে। অনন্তগুম্ফা ইত্যাদি গুম্ফার উদগত চিত্রগুলিতে সমসাময়িক মধ্যদেশীয় শৈলীই প্রতিফলিত। শিল্পমান খৃ-পূ ২-শতকের ভারতের শিল্পকৃতি থেকে উচ্চস্তরের এবং খৃ-পূ ১ম শতকের সাঁচির সঙ্গে তুলনীয়। খণ্ডগিরির পাদদেশে প্রত্নাশ্ম যুগের একটি কুঠার পাওয়া গেছে।

খণ্ডপরশু—দক্ষ তাঁর জামাতা শিবকে যজ্ঞে ডাকেন নি। শিব ত্রিশূল ছুঁড়লে দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট হয় এবং ত্রিশূল গিয়ে বদরিকাশ্রমে তপস্যারত নরনারায়ণের মধ্যে নারায়ণের বুকে বিদ্ধ হয়। ফলে নারায়ণের মাথায় সমস্ত চুল মুঞ্জা ঘাসের মত রঙ হয়ে যায়; নাম হয় মুঞ্জকেশ। নারায়ণ তখন হুঙ্কার দিলে এই ত্রিশূল শিবের হাতে ফিরে আসে। ত্রিশূল এই ভাবে অপমানিত হয়েছে দেখে শিব নারায়ণকে বধ করতে আসেন। পাশেই নর ছিলেন; মন্ত্রপাঠ করে বাণ সন্ধান করেন। অন্য মতে নারায়ণ মুনি নিজেই এক মুঠো ঘাস দিয়ে মন্ত্র পড়ে শিবের দিকে ছুঁড়ে দেন। বাণ/ঘাস কুঠারে পরিণত হয়ে এগিয়ে এলে শিব এটি ধরে দু টুকরো করে ভেঙে ফেলেন। একটি টুকরো শিবের পরশুতে পরিণত হয়। এর পর নারায়ণ শিবকে প্রণাম করলে যুদ্ধ বন্ধ হয়। দ্বিতীয় পরশুটি (=বাকি টুকরা) শিব পরশুরামকে দান করেন।

খনক—বিদুর একে দিয়ে জতুগৃহে খবর পাঠান কৃষ্ণাচতুর্দশী রাত্রিতে দুর্যোধন জতুগৃহে আগুন দেবেন ঠিক করেছেন। এই খনকই জতুগৃহ থেকে পালাবার জন্য গুপ্ত-সুড়ঙ্গ কেটে দিয়ে যান।

খনা—কিংবদন্তী সিংহলে রাজার মেয়ে; শুভক্ষণে জন্ম বলে নাম ক্ষণা। এ দিকে বরাহের ছেলে হলে বরাহ গণনা করে দেখেন শিশু মিহিরের আয়ু এক বছর। এই

জন্য শিশুকে একটি পাত্রে করে জলে ভাসিয়ে দেন। পাত্রটি সিংহলে এসে পৌছয় এবং রাজা ছেলেকে পালন করে ক্ষণার সঙ্গে বিয়ে দেন। এঁরা দু জনেই পরে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। পরে মিহির খনাকে নিয়ে জন্মভূমিতে বাবার কাছে ফিরে আসেন। মিহির ও বিক্রমাদিত্যের সভায় প্রতিপত্তি লাভ করেন। আকাশে কত নক্ষত্র আছে রাজা জানতে চাইলে বরাহ বা মিহির গণনা করতে পারেন না ; খনা গুণে দেন। রাজা মুগ্ধ হয়ে খনাকে সভায় আনাবার জন্য আদেশ দেন। প্রতিপত্তি হানির ভয়ে বরাহের আদেশে মিহির তখন খনার জিব কেটে দেন। এর পর খনার মৃত্যু হয়। জিব কাটার অন্য কাহিনীও প্রচলিত আছে।

বরাহ ও মিহির কিন্তু একই ব্যক্তি ; নাম বরাহমিহির। খনার বচনগুলির ভাষা থেকে জানা যায় এগুলির বয়স মাত্র চারশ বছর। কিন্তু বরাহমিহির দেড়হাজার বছর আগেকার ঐতিহাসিক ব্যক্তি। বরাহমিহিরের জাতকাদি জ্যোতিষগ্রন্থের ভাষার সঙ্গে খনার কতকগুলি বচনের অদ্ভুত সাদৃশ্য বর্তমান।

খনীনেত্র—বিংশের নাতি ; বিবিংশের ছেলে। রাজা হয়ে প্রজাদের উৎপীড়ন করতেন। ফলে খনীনেত্রের ছেলে সুবর্চা রাজা হন। মহা ১৪।৪।৬।

খর—শূর্পণখা (দ্র) ও খর যমজ ভাইবোন এবং অপর দুই ভাই দূষণ ও ত্রিশিরা। মধু ও কৈটভ খর ও অতিকায় হয়ে জন্মান। রাবণের এঁরা সৎ ভাই। সুমালীর মেয়ে রাকার ছেলে খর। খরের ছেলে মকরাক্ষ। রাবণরা তিন ভাই যখন তপস্যা করছিলেন তখন খর ও শূর্পণখা রাবণদের দেখাশোনা করতেন। রাবণের অসবধানতায় শূর্পণখার স্বামী মারা গেলে বিধবা বোনকে খরও দূষণের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। রাবণের আদেশে চোদ্দ হাজার রাক্ষস অনুচর নিয়ে এঁরা শূর্পণখার রক্ষক ও আজ্ঞাবহ হয়ে দণ্ডক বনে বাস করতেন। লক্ষ্মণের হাতে শূর্পণখার নাক কান কাটা গেলে খর এক রাক্ষস বাহিনী সঙ্গে দিয়ে দূষণকে পাঠান রামলক্ষ্মণকে মারবার জন্য। রামের হাতে দূষণ সসৈন্যে মারা গেলে খর যুদ্ধে আসেন এবং মারা পড়েন। ত্রিশিরা ও মারা যায়।

খরোষ্ঠী—অশোকের সময় পশ্চিম পাকিস্থানের দিকে প্রচলিত লিপি। ডান থেকে বাঁয়ে লেখা হয়। ঐ সময়ে এই লিপির কি নাম ছিল জানা নেই। পরে খরোষ্ঠী নামে পরিচিত হয়। এই লিপির অ-অক্ষরটি খরের ওষ্ঠের মত বলে এই নাম হয়েছিল। অন্য মতে খরোষ্ঠী কথাটি ভুল আসল নাম খরোষ্ট্রী। পশ্চিম পাকিস্থানের কাছে খরোষ্ট্র নামে ছোট একটি দেশ অনুসারে এই নাম। আর এক মতে খর পোস্ত অর্থাৎ খরের চামড়ার ওপর লিখিত হত বলে এই নাম। খৃ-পূ ৬-শতকের শেষ ভাগ থেকে দুশ বছর মত পশ্চিম পাকিস্থানের অনেকাংশে পারস্যের হখামনিষ-রা রাজত্ব করতেন : এঁদের ভাষা অরামিক, পশ্চিম পাকিস্থানেও চালু হয়েছিল। খরোষ্ঠী এই অরামিক লিপির ভারতীয় রূপ। অরামিক লিপিতে ভারতীয় ভাষা দ্রুত লিখতে গিয়ে এই খরোষ্ঠীর জন্ম। অরামিক ভাষার হারুত্থা বা হিব্রু ভাষায় বারূসেথ্‌ (=উৎকীর্ণ করা) শব্দের বিকার থেকে খরোষ্ঠী উৎপন্ন হয়েছে মনে হয়। পেশোয়ার ও হাজরা জেলায় এই লিপিতে অশোকের লেখা পাওয়া গেছে। খৃ-পূ ২-১ শতকে পশ্চিম

পাকিস্থান ও আফগানিস্থানে গ্রীক, শক, ও পহ্লব-রাজাদের কালে মুদ্রায়ও এই খরোষ্ঠী ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী কুষাণ আমলেও ঐ অঞ্চলের লেখাবলীতে খরোষ্ঠী ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এই বর্ণমালায় আ, ঈ, উ প্রভৃতি দীর্ঘ ও মাত্রা চিহ্নের অভাব থাকায় ভারতীয় ভাষা শেখার অসুবিধা দেখা দিয়েছিল; সেই জন্যই পরে ক্রমশ ব্রাহ্মী লিপি খরোষ্ঠীর স্থান অধিকার করেছিল। মৌর্য যুগের পর আফগানিস্তান ও মধ্য এসিয়ার কয়েকটি জনপদে খরোষ্ঠী চালু হয়েছিল কিন্তু পরে ব্রাহ্মী লিপিও সেখানে ঐ একই কারণে চালু হয়। খরোষ্ঠী লিপিতে কতকগুলি অক্ষর প্রায় এক রকম।

খশ—বা খষ, খস বা খশীর। দ্র খসা। উত্তর ভারতে হিমালয়ের সাহুদেশের অধিবাসী প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষী উপজাতি। মহাভারত, হরিবংশ, মনু ও অথর্ব বেদ পরিশিষ্ট, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে খশ জাতির উল্লেখ আছে। মধ্য এসিয়া ও উত্তর পূর্ব পারস্যের আর্য জাতির কতকগুলি শাখার সঙ্গে এদের যোগ ছিল। খশ জাতি মোটামুটি ভারতে সংস্কৃত ভাষী গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল। পরবর্তী কালে মুখ্যত কাশ্মীরের পূর্বাঞ্চল থেকে আরম্ভ করে পূর্ব নেপালের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এদের ব্রাত্য বা পতিত আর্য বলা হত এবং এদের মৌলিক ক্ষত্রিয়ত্বও স্বীকৃত। নানা কারণে উত্তর ভারতের নানা জায়গা থেকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এদের এখানে এসে বসবাস করতে থাকেন ফলে সভ্যতার ও কৃষ্টির বহু সংমিশ্রণ ঘটে। উত্তর ভারতের সমতল থেকে আনীত প্রাকৃত ও আধুনিক আর্যভাষা, খশেদের নিজেদের আর্যভাষা এবং প্রাক আর্য অধিবাসী ভোটব্রহ্ম (=কিরাত) ও মুণ্ডাকোল (=নিষাদ) ভাষা এই সব মিলিয়ে পাহাড়ি হিমালী ভাষাগুলি তৈরি হয়েছে।

খসা—দক্ষের মেয়ে; কশ্যপের স্ত্রী; খসার গর্ভে যক্ষ, রাক্ষস ও খশ এই তিন জাতির জন্ম। মধ্য এসিয়ার কাসগর নামের সঙ্গে এই আদি খশ জাতির সংস্রব ছিল। এখনও গাড়ওয়াল ও কুমায়ুনের জন সাধারণ খাসিয়া নামে পরিচিত। নেপালে খস শব্দ ছেত্রী বা ক্ষত্রিয় শব্দের সমার্থক। খস জাতির সংস্কৃত নাম খশীর। দ্রঃ খশ।

খাজনা=প্রাচীন ভারতে রাজারা ভূমিদান করতেন। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, যোদ্ধা ও রাজকর্মচারীরা এই ভূমি পেতেন নানা কারণে। বেতনের বদলেও অনেক সময় জমি দেওয়া হত। এঁরা প্রকৃতপক্ষে ভূস্বামিত্ব লাভ করতেন না; পুরুষানুক্রমে রাজার প্রাপ্য দিতেন এবং নিজেদের জীবিকা চালাতেন। ভারতে প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাষ্ট্রই ভূস্বামী ছিল বা রায়তই ছিল ভূস্বামী; জমিদার নয়। ভারতে খাজনার রূপ ছিল ফসল খাজনা। বৈদিক যুগ থেকে মোঘল আমলের আগে পর্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্গাদার বা ভাগচাষ প্রথার অঙ্কুর প্রাচীন ভারতে গড়ে উঠেছিল এবং বর্তমানেও চলে আসছে।

খাজুরাহ—২৪°৫১´ উ × ৮০° পূ। বিন্ধ্য পর্বতের পশ্চিম দিকে প্রাচীন কালঞ্জর রাজ্যের মধ্যে একটি প্রাচীন নগর। এটি মধ্যপ্রদেশের ছতরপুর জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। সদর সহর থেকে ৪৩-কি-মি পূর্বে। চন্দেল্ল রাজবংশের অন্যতম রাজধানী খর্জুর বাহকই বর্তমানে খাজুরাহো। খৃ ১০-১২ শতকে এই রাজাদের সময় এখানে বহু মন্দির তৈবি হয়; এগুলির মধ্যে ২৫টি এখনও বর্তমান। সবচেয়ে প্রাচীন মন্দিরটি

চতুঃষষ্টি যোগিনী মন্দির ; প্রায় নবম শতকের। এটি অনেকগুলি মন্দিরের সমাবেশ। পিছনের সারিতে মধ্যস্থিত মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত বড় ; মূল দেবতা মনে হয় এই মন্দিরেই ছিলেন। বাকিগুলিতে একটি করে যোগিনীমূর্তি ছিল। অনেকগুলি মন্দিরই নষ্ট হয়ে গেছে ; মূর্তিগুলির মধ্যে মাত্র তিনটি অবশিষ্ট। চন্দেলরাজ ধঙ্গ (৯৫০-১০০২ খৃ) শিব মরকতেশ্বর মন্দিরটি রচনা করেন। পরবর্তী কালের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কন্দারিয়া মহাদেব মন্দির। চিত্রগুপ্ত, লক্ষ্মণ, জগদম্বী, বামন, বিশ্বনাথ, চতুর্ভুজ দুলাদেও এবং জৈনদের আদিনাথ ও পার্শ্বনাথ মন্দির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের গা দেবদেবীর মূর্তি, লীলারত সুরসুন্দরী ও নায়িকার মূর্তি, জীবজন্তুর ছবি মানুষের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ, নৃত্যগীত ইত্যাদির অজস্র ছবিতে শোভিত এবং কখনো কখনো পীড়িত। মন্দিরের ভেতরের মূর্তিগুলিও অতুলনীয়। মূর্তি বাহুল্যের বিচারে প্রমাণিত হয় শৈব ও বৈষ্ণব গোষ্ঠীর প্রাধান্যই এখানে বেশি ছিল। মন্দির গায়ে নৃত্যরতা মাতৃকামূর্তির সংখ্যাও প্রচুর। এ ছাড়াও নবগ্রহ, অষ্টদিকপাল, গঙ্গাযমুনা, নাগ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্য দেবতাদি মন্দিরের গায়ে দেখা যায়। জৈন মন্দিরে চক্রেশ্বরী দেবী, শাসন দেবতা, বিদ্যাদেবী, রাম, বলরাম, পরশুরাম মূর্তি রয়েছে। মন্দির এখানে দু ধরণের ; সাধারণ ধরণের এবং মণ্ডপ ধরণের। মণ্ডপ ধরণের মন্দিরেও আরাধ্য বিগ্রহ রয়েছে।

খাণ্ডব—কুরুক্ষেত্রের কাছে যমুনা তীরে প্রাচীন নগর। খাণ্ডব বনের অংশ বিশেষের উপর অবস্থিত এই নগর বর্তমান দিল্লি সহরের অন্তর্গত ফিরোজশাহের কোটলাভূমি ও হুমায়ুনের সমাধি স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। দ্রৌপদীর বিয়ের পর ভীষ্মের উপদেশে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের অর্দ্ধেক রাজত্ব দেন এবং খাণ্ডব প্রস্থে (=খাণ্ডব) বসবাস করতে দেন। এখানে পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী স্থাপিত করেন। দ্রঃ খাণ্ডব দহন, বিজয়।

খাণ্ডবদহন—ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থ নামে নগরী স্থাপন করেন। এখানে কৃষ্ণার্জুন এক দিন অসহ্য গরমে জলবিহারের পর যমুনাতীরে খাণ্ডব বনের কাছে খাওয়াদাওয়া করছিলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণ বেশে অগ্নি (দ্র) এসে নিজের সমস্ত পরিচয় দিয়ে খাণ্ডব বন দহন করবার জন্য এঁদের সাহায্য চান। ব্রহ্মার কথা মত (দ্রঃ শ্বেতকি) অগ্নিমান্দ্য থেকে সেরে ওঠার জন্য অগ্নি এর আগে সাতবার বহু জীবজন্তু পূর্ণ এই বন দহন করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই বনে ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষক সপরিবারে বাস করতেন। ফলে ইন্দ্রের নির্দেশে হাজার হাজার হাতী ও নাগেরা জল সেচ করে সাত বারই বাধা দিয়েছিলেন। ব্রহ্মার কাছে অগ্নি আবার অভিযোগ করলে ব্রহ্মা কৃষ্ণ-অর্জুনের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন সাহায্য করতে রাজি হন। অগ্নি সতর্ক করে দেন খাণ্ডব বনে ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষক রয়েছেন, ইন্দ্র বৃষ্টি দিয়ে আগুন নিভিয়ে দেবেন। এর পর অগ্নি বরুণ দেবের কাছ থেকে গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণ ও কপিধ্বজ রথ এনে নিরস্ত্র অর্জুনকে এবং কৌমোদকী গদা ও চক্র এনে নিরস্ত্র কৃষ্ণকে দান করেন। এঁরা তখন বনের সীমানা পাহারা দিতে থাকেন যাতে কেউ পালাতে না পারে এবং অগ্নি খাণ্ডব বন পোড়াতে থাকেন। বনে যে সব মুনিরা ছিলেন তাঁরা তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে সাহায্য চান এবং ইন্দ্রও অবিলম্বে বৃষ্টি দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু

অর্জুন বাণ দিয়ে মেঘ ঢেকে ফেলেন যাতে একটুও জল না পড়ে। এই সময়ে তক্ষক কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলেন; তক্ষকের ছেলে অশ্বসেন আগুনের তাপে ছটফট করতে থাকলে তার মা ছেলেকে মুখে পুরে পালাতে চেষ্টা করেন। অর্জুন দেখে বাণবিদ্ধ করে অশ্বসেনের মাকে আগুনে ফেলে দেন। কিন্তু ইন্দ্র সেই মুহূর্তে অর্জুনকে অজ্ঞান করে দেন; ফলে অশ্বসেন কোন মতে বেঁচে যান। অর্জুন তখন ক্রুদ্ধ হয়ে সমস্ত জীব জন্তুকে বাণবিদ্ধ করে অগ্নিতে সমর্পণ করতে থাকেন। এবং কৃষ্ণ ও অর্জুন অশ্বসেনকে শাপ দেন কোথাও আশ্রয় পাবে না। সর্প, গৃধ্র ইত্যাদি অর্জুন নিহত করতে থাকেন; অসুরদের কৃষ্ণ নিহত করতে থাকেন। ইন্দ্র তখন ঐরাবতে চড়ে সরাসরি বাধা দিতে আসেন; সঙ্গে বহু দেবতা, কুবের ও অসুররাও আসেন। কিন্তু সকলে পরাজিত হন। ময় দানব এই বনে ছিলেন; কৃষ্ণ অর্জুনের কাছে ইনি প্রাণ ভিক্ষা করেন এবং বেঁচে যান। আর বেঁচে যায় মন্দপালের (দ্র) ছেলে চারটি শার্ঙ্গক পাখী। ইন্দ্রের সশস্ত্র বাধা সত্ত্বেও এবার অগ্নি পনের দিন ধরে এই বন দগ্ধ করে রোগমুক্ত হন।

খারবেল—কলিঙ্গে (দ্র) মহামেঘবাহন বংশে তৃতীয় রাজা। খৃ-পূ ১ শতক। জৈনধর্মী সাধুদের জন্য খণ্ডগিরি পাহাড়ে হাতী গুম্ফা নামে একটি গুহাবাস তৈরি করে দেন। অন্য ধর্মের প্রতিও কোন বিদ্বেষ ছিল না। খারবেলের অপর নাম রাজর্ষি বসু; উপাধি মহাবিজয়। উপরিচর বসুর বংশধর বলে দাবি করতেন।

খাশীর—ভারতে উত্তর পূর্ব কোণে একটি দেশ। দ্রঃ খশ।

খিল—গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশ। যেমন মহাভারতের হরিবংশ। ঋক্‌বেদে কয়েকটি সূক্তকেও খিল বলা হয়। ঋক বেদের পরিশিষ্ট রূপে মূল সংহিতার শেষে ছাপা হয়। বিভিন্ন লুপ্ত শাখার অন্তর্গত বিচ্ছিন্ন মন্ত্রগুলির সংকলন এই অংশে ছিল। খিল অংশের সব মন্ত্রই খুব অর্বাচীন নয়। ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে খিলের অনেক মন্ত্রের উল্লেখ আছে। ঋক্ বেদের বিভিন্ন সংস্করণে খিল সূক্তের সংখ্যা বিভিন্ন। কাশ্মীরে প্রাপ্ত একটি পুঁথিতে সবচেয়ে বেশি খিল সূক্ত পাওয়া গেছে। শ্রীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত, নিবিদধ্যায়, প্রৈষাধ্যায় ইত্যাদি মন্ত্রগুলি খিল অংশের অন্তর্গত।

খেমা—মদ্রদেশের সাগল নগরের রাজার মেয়ে বিম্বিসারের স্ত্রী। অসামান্যা রূপসী। বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতেন না পাছে ভগবান বুদ্ধ তাঁর রূপযৌবনের নিন্দা করেন। এই জন্য বিম্বিসার এক বার সভাকবিকে বেণুবন আশ্রমের সৌন্দর্য শোনাতে বললে খেমা মুগ্ধ হয়ে আশ্রম দেখতে যান। ভগবান বুদ্ধ ঐ সময়ে বেণুবনে ছিলেন এবং খেমার চেয়ে সুন্দরী এক জন অপ্সরা সৃষ্টি করেন। অপ্সরা বুদ্ধদেবকে বাতাস করতে থাকেন। বুদ্ধদেব তার পর এই অপ্সরার দেহে ক্রমশ জরা এনে দেহের চরম পরিণতি ক্ষেমাকে দেখালে খেমার চৈতন্য হয় এবং রাজার অনুমতি নিয়ে ভিক্ষুণী সংঘে যোগ দেন এবং বুদ্ধের উপদেশ পেয়ে অর্হত্ব লাভ করেন। জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির জন্য ক্ষেমা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। মার খেমার মনে কামভাব জাগাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন।

খোটান—৩৭°৪´ উ×৮০°২´ পূ। মধ্য এসিয়াতে পূর্ব তুর্কিস্থানে কুয়েনলুন পাহাড়ের উত্তর পাদদেশে ও তাকলামাকান মরুভূমির দক্ষিণ প্রান্তের মধ্যে অবস্থিত প্রসিদ্ধ সহর। স্থানীয় প্রবাদ অশোকের ছেলে কুস্তন (=কুণাল) এখানে রাজ্য স্থাপন করেন। কুস্তন থেকে বর্তমান নাম খোটান। চীনা ও তিব্বতী গ্রন্থে এই রাজাদের

নামের তালিকা আছে। খৃষ্টীয় প্রথম চার শতকে এটি সমৃদ্ধ হিন্দু উপনিবেশ ও বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র ছিল। একটি খরোষ্ঠী লিপিতে মহারাজ রাজাতিরাজ দেব বিজিত সিংহের নাম পাওয়া যায়। এঁদের সকলের নামে এই 'বিজিত' শব্দটি ব্যবহার হত। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। গোমতী বিহার ইত্যাদি অনেক বড় বড় বৌদ্ধ মন্দির ও বিহার এখানে ছিল। ফাহিয়েন ও হিউ-এন-ৎসাঙ দু জনেই গোমতী বিহারের ও খোটানের সমৃদ্ধির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন; এ সময়ে এখানে প্রায় ১০০ বিহার ও পাঁচ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল। বহু ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত ও ভিক্ষু এখানে ছিলেন। চীন থেকে ভারতে না গিয়ে এখানে এসে বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাঠ নেওয়া হত। গোমতী বিহারে রচিত অনেক গ্রন্থ বৌদ্ধ ত্রিপিটকের মর্যাদা লাভ করেছিল। এখানকার মুদ্রায় চীনা ও খরোষ্ঠী লিপিতে প্রাকৃত ভাষায় লেখা থাকত।

খ্যাতি—(১) দক্ষের মেয়ে। ভৃগুর স্ত্রী। ছেলে ধাতা, বিধাতা ও মেয়ে লক্ষ্মী। (২) ধ্রুব বংশে কুরু রাজার একটি মেয়ে।

খ্যাতিবাদ—ভারতীয় দর্শনের ভ্রমের বিভিন্ন আলোচনার নাম। খ্যাতি অর্থে জ্ঞান। কোন বস্তুর তদ্ভিন্ন রূপ খ্যাতিকে ভ্রম বলা হয়। মোট ছয় প্রকার খ্যাতি স্বীকার করা হয়:—অখ্যাতিবাদ, অন্যথাখ্যাতিবাদ, আত্ম খ্যাতি-বাদ অসৎখ্যাতিবাদ, অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ, সৎখ্যাতিবাদ।

গ

গঙ্গা—মধ্য হিমালয়ের গাড়ওয়াল পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত গঙ্গোত্রী (দ্র) নামে পরিচিত একটি হিমবাহ থেকে উৎপন্ন একটি ধারা ভাগীরথী; গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ (৩৮৩১ মি) নামে গুহা বা তুষারগুহা থেকে বার হয়েছে। এবং গোমুখ থেকে ২৮ কি-মি দ-পশ্চিম দিকের তিব্বত থেকে আগত জাহ্নবী বা জাড়গঙ্গা ভাগীরথীতে এসে মিশেছে। এই মিলিত ধারা বন্দরপুঁছ ও শ্রীকণ্ঠ এই দুই গিরি শ্রেণীর মধ্যবর্তী গভীর খাদের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে। সুকী গ্রামের পর থেকে এর বেগ প্রবল। টিহরি সহরের দক্ষিণে দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা এসে এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। দেবপ্রয়াগের পরবর্তী অংশের নাম গঙ্গা। গঙ্গার দৈর্ঘ্য ২৪৬৪ কি-মি। ঋক্-বেদে (১০।৭৬।৫) গঙ্গা ও অন্য কয়েকটি নদীর স্তব আছে। গঙ্গা মকরবাহিনী, শুক্লবর্ণা, চতুর্ভুজা। এক হাতে একটি পাত্র ও এক হাতে পদ্মফুল। জ্যৈষ্ঠ শুক্লা-দশমীতে এর পূজা হয়। এই দিনে গঙ্গা স্নানে দশ রকম পাপ নষ্ট হয়; তাই এই তিথির নাম দশহরা। গঙ্গার জল স্নানে, পানে ও স্পর্শে পুণ্য এনে দেয়। গঙ্গাতীরে বাস ও মৃত্যু গৌরব জনক। মৃতের দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি গঙ্গা জলে দেওয়ার নিয়ম আছে। গঙ্গার মাহাত্ম্য হিসাবে কাহিনীর সীমা নাই।

রাগরাগিণীতে নারদ সুদক্ষ বলে অভিমানী ছিলেন ; নিজের ত্রুটি জানতেন না। নারদের গর্ব খর্ব করবার জন্য রাগরাগিণীরা বিকলাঙ্গ নরনারী আকারে পথে পড়ে থাকেন। এঁদের এ ভাবে পড়ে থাকতে দেখে নারদ এঁদের জিজ্ঞাসা করে নিজের ত্রুটি জানতে পারেন এবং এঁদের সুস্থ হবার উপায় কি জানতে চান। এঁরা জানান মহাদেব নিজে গান শোনালে এঁরা সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন। নারদ তখন মহাদেবকে গাইতে রাজি করেন এবং উপযুক্ত শ্রোতার দরকার বলে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে উপযুক্ত শ্রোতা হিসাবে নিয়ে আসেন। মহাদেবের গান শুনতে শুনতে রাগরাগিণীরা সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু এই সঙ্গীতের ব্রহ্মা কিছুই বুঝতে পারেন না। বিষ্ণু কিছুটা পেরেছিলেন এবং গান শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে দ্রবীভূত হয়ে যান। ব্রহ্মা তখন এঁকে কমণ্ডলুতে ধরে ফেলেন। গঙ্গার উৎপত্তির এই এক কাহিনী। দ্রঃ দেবকন্যা।

দেবী ভাগবৎ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে রাসের সময় মহাদেব কৃষ্ণের গান করতে থাকেন। গান শুনে রাধাকৃষ্ণ মুগ্ধ হয়ে গলে যান। ফলে গঙ্গার উৎপত্তি। এক সময় গঙ্গা কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লে রাধা রাগে ও ঈর্ষায় গঙ্গাকে খেয়ে ফেলতে যান। গঙ্গা তখন কৃষ্ণের চরণে আশ্রয় নেন। এর ফলে পৃথিবী জলশূন্য হয়ে পড়লে দেবতাদের অনুরোধে নিজের পায়ের আঙুলের নখ থেকে গঙ্গাকে মুক্ত করে দেন। সেই থেকে গঙ্গার নাম হয় বিষ্ণুপদী। পরে ব্রহ্মার অনুরোধে গন্ধর্ব মতে কৃষ্ণ গঙ্গাকে বিয়ে করেন। ভাগবত পুরাণ মতে ত্রিবিক্রিম রূপী বিষ্ণুর বাঁ পায়ের আঙুলের নখের আঘাতে ব্রহ্মাণ্ড গর্ত ছিন্ন গঙ্গার জলধার পৃথিবীতে নেমে এসেছিল। এই গঙ্গা বহু দিন আকাশে (=বিষ্ণু পদে) আটকে ছিলেন। ফলে নাম হয় বিষ্ণুপদী। যেখানে আটকে ছিলেন সেই বিশেষ স্থানটির নাম ধ্রুব মণ্ডল। এই ধ্রুব মণ্ডলে ধ্রুব তপস্যা করেন। বিষ্ণু পদ থেকে গঙ্গা আসেন চন্দ্রলোকে। চন্দ্রলোকে গঙ্গা সীতা, চক্ষুষ, অলকানন্দা ও ভদ্রা চার ভাগে ভাগ হয়ে ব্রহ্মলোকে নেমে আসেন। সীতা ব্রহ্মলোকে মেরু পাহাড়ে নেমে ভদ্রাশ্ব-বর্ষ পার হয়ে পূর্ব সমুদ্রে গিয়ে পড়েন। চক্ষুষ মাল্যবান পাহাড়ে এসে কেতুমালবর্ষ পার হয়ে পশ্চিম সমুদ্রে গিয়ে পড়েন। অলকানন্দা হেমকূট পাহাড় হয়ে ভারতবর্ষ অতিক্রম করে দক্ষিণ সমুদ্রে এবং ভদ্রা শৃঙ্গবান পাহাড় হয়ে উত্তরকুরু অতিক্রম করে উত্তর সমুদ্রে গিয়ে যোগ দেন।

লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা তিন জনেই বিষ্ণুর স্ত্রী। বিষ্ণু ও গঙ্গার পরস্পরের প্রতি বেশি আসক্তি ফুটে ওঠে। লক্ষ্মী ক্ষমা করেন কিন্তু সরস্বতী সহ্য করতে পারেন না ; গঙ্গাকে প্রহার করতে থাকেন। লক্ষ্মী তারপর সরস্বতীকে থামাতে চেষ্ট করেন ; সরস্বতী গঙ্গাকে প্রহার করা বন্ধ করলেও লক্ষ্মীকে পৃথিবীতে জন্মাবার জন্য শাপ দেন। লক্ষ্মীকে শাপ দেবার জন্য রেগে গিয়ে গঙ্গা সরস্বতীকে নদী হবার শাপ দেন এবং সরস্বতীও গঙ্গাকে নদী হয়ে জীব লোকের সমস্ত পাপ গ্রহণ করতে হবে বলে শাপ দেন। বিষ্ণু তখন বলেন লক্ষ্মী ধর্মধ্বজের গৃহে তাঁর কন্যা হয়ে জন্মাবেন ; পর জন্মে তুলসী হয়ে জন্মাবেন এবং বিষ্ণুর অংশে জন্ম শঙ্খচূড়ের সঙ্গে বিয়ে হবে ; এবং তারপর লক্ষ্মী পদ্মাবতী নদীতে পরিণত হবে। গঙ্গাকে বলেন রাজা ভগীরথ তাঁকে পৃথিবীতে নিয়ে যাবেন ; নাম হবে ভাগীরথ। পৃথিবীতে রাজা শান্তনুর সঙ্গে

বিয়ে হবে ; গঙ্গা তারপর কৈলাসে ফিরে গিয়ে শিবের স্ত্রী হবেন। সরস্বতীও নদী হয়ে জন্মাবেন এবং পরে ব্রহ্মলোকে ফিরে গিয়ে ব্রহ্মার স্ত্রী হবেন। দ্র বলি।

আর এক মতে বিষ্ণুর দেহ থেকে জন্ম। আর এক মতে হিমালয়ের স্ত্রী মেনকার দুই মেয়ে উমা ও গঙ্গা। কোন এক বিশেষ কারণে দেবতারা এই গঙ্গাকে ভিক্ষা করে চেয়ে নেন।

ইক্ষ্বাকু বংশে রাজা মহাভিষ সত্যলোকে এসে ব্রহ্মার আরাধনা করতে থাকেন। গঙ্গাও এখানে ছিলেন। এক দিন বাতাসে গঙ্গার বস্ত্র সামান্য অসংবৃত হয়ে যায়। মহাভিষের চোখে পড়ে। গঙ্গা ও রাজা দু জনেই কামার্ত হয়ে পড়েন। ব্রহ্মা এই দেখে দু জনকে অভিশাপ দেন; মহাভিষ পৃথিবীতে রাজা হয়ে জন্মাবেন এবং গঙ্গা তাঁর স্ত্রী হবেন। গঙ্গা তখন কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা বলেন অষ্ট বসু জন্মালে গঙ্গা মুক্তি পাবেন। মহাভিষ রাজা শান্তনু হয়ে জন্মান।

বশিষ্ঠ এক বার বসুগণকে (দ্র) শাপ দেন। মহাভিষ শান্তনু হয়ে জন্মালে গঙ্গা নারী মূর্তিতে দেখা দিয়ে রাজাকে মুগ্ধ করে বিয়ে করেন। বসুদের (দ্র) সঙ্গে গঙ্গার যে কথাবার্তা হয়ে ছিল সেই কথা মত প্রথম সাতটি সন্তানকে গঙ্গা জলে ডুবিয়ে হত্যা করেন। বিয়ের সর্ত অনুসারে রাজা কোন বাধা দেন নি। কিন্তু অষ্টম বারে বাধা দিলে এই সন্তানটিকে (দ্র) রাজার অনুমতিতে নিজের সঙ্গে নিয়ে অন্তর্হিত হয়ে যান এবং রাজোচিত শিক্ষা দানের পর আবার ফিরিয়ে দিয়ে যান। এই শিশু ভীষ্ম (দ্র)। দ্র প্রতীপ।

সগর রাজার অশ্বমেধের ঘোড়ার সন্ধানে অংশুমান পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে আসেন। এখানে সগর রাজার ৬০,০০০ ছেলেকে ভস্মীভূত দেখতে পান, ঘোড়াও পান, কপিল মুনিই এঁকে বলে দিয়েছিলেন গঙ্গা জলের স্পর্শে এরা উদ্ধার পাবে। আর এক মতে গরুড় বলে ছিলেন। কপিল বলে দিয়ে ছিলেন গঙ্গাকে আনতে পারবে অংশুমানের নাতি ভগীরথ। সগর এই খবর পেয়ে গঙ্গাকে আনবার উপায় চিন্তা করতে থাকেন কিন্তু ত্রিশ হাজার বছর রাজত্ব করেও তিনি কিছু করতে পারেন নি। এর পর অংশুমান ও অংশুমানের ছেলে দিলীপও চেষ্টা করেন কিন্তু বিফল হন। দিলীপের ছেলে ভগীরথ তারপর কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে আনবার অনুমতি পান। কিন্তু গঙ্গার জলবেগ এক মাত্র মহাদেবই ধারণ করতে পারবেন ফলে মহাদেবকেও আরাধনা করে সম্মত করতে হয়। গঙ্গা তখন স্বর্গ থেকে ভীষণ বেগে মহাদেবের মাথায় নেমে আসেন এবং মহাদেবকে পাতালে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। এতে মহাদেব রেগে গিয়ে গঙ্গাকে নিজের জটার মধ্যে এক হাজার বছর আটকে দেন। ভগীরথ তখন আবার তপস্যা করেন এবং মহাদেব গঙ্গাকে বিন্দু সরোবরে ছেড়ে দেন। গঙ্গা তখন পশ্চিমে হ্লাদিনী, প্লাবনী ও নলিনী, পূব দিকে সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু, এবং ভগীরথের পেছু পেছু মূলধারা এই সাতটি ভাগে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েন। পথে জহ্নু (দ্র) মুনির কাছে বাধা পান। এর পর গঙ্গা কপিল মুনির আশ্রমে পাতালে এসে সগরের ছেলেদের পাপ মুক্ত করেন এবং তারপর সাগরে গিয়ে পড়েন। ব্রহ্মার বরে গঙ্গা

ভগীরথের মেয়ে বলে গঙ্গার অপর নাম ভাগীরথী ; স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে প্রবাহিত বলে নাম ত্রিপথগা, এবং আর এক নাম উর্বশী (দ্র প্রতীপ, ঐরাবত)।

গঙ্গাধর—মাথা পেতে গঙ্গাকে (দ্র) শিব ধারণ করে ছিলেন। ফলে শিবের নাম।

গঙ্গাসাগর—২১°৩৬´-২১°৫৬´ উ, ৮৮°২-৮৮°১১´ পূ ; সাগর দ্বীপের দক্ষিণে একটি গ্রাম। আয়তন ৫৯৪ বর্গ কি-মি। সমস্ত দ্বীপটি গঙ্গাসাগর নামে পরিচিত। উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গা এগিয়ে এসে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। কপিল মুনি এই খানে তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করেন ; ভগীরথ (দ্র) এইখানে সগর রাজার ছেলেদের উদ্ধার করেন। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তিতে এখানে মেলা হয়। দ্বীপটির একটি প্রান্তে একটি মন্দিরে কপিল মুনি ও ভগীরথের একটি মূর্তি আছে। প্রাচীন মন্দির ডুবে গেছে ; সম্প্রতি আর একটি মন্দির করা হয়েছে।

গঙ্গেশ উপাধ্যায়—তত্ত্বচিন্তামণি প্রণেতা প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক কাশ্যপ গোত্রীয় ছাদন বংশে মিথিলায় জন্ম। তাঁর গ্রন্থ রচনাকাল ১৩০০-১৩৫০ খৃ। ন্যায়-বৈশেষিক-প্রস্থান অবলম্বী বটে তবু নতুন এক চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। এই চিন্তাধারাই পরে নব্যন্যায় বলে পরিণত হয়। এর প্রভাব পরবর্তী সমস্ত দর্শন গ্রন্থে, ভাষা, চিন্তা ও অলংকার শাস্ত্রের ওপর ছড়িয়ে পড়েছিল।

গঙ্গোত্রী—৩০°৫৯´ উ × ৭৮°৫৯´ পূ ; উচ্চতা ৩৩৯৬। এটি মধ্য হিমালয়ের গাড়ওয়াল অঞ্চলের চারটি তীর্থস্থানের মধ্যে একটি। উত্তর প্রদেশে উত্তর কাশী জেলার অন্তর্গত। হিমবাহ গলে পরিণত গঙ্গার (ভাগীরথী) প্রাচীন উৎপত্তি স্থান। গঙ্গোত্রীর দক্ষিণ পূর্বে এই গঙ্গোত্রী হিমবাহ বর্তমানে যেখানে গলে নদীরূপে পরিণত হয়েছে সেই জয়গাটির নাম গোমুখ। গঙ্গোত্রী হিমবাহ ভারতের বৃহত্তম হিমবাহ ; ও পাশ থেকে মন্থনী, স্বচ্ছন্দ, গহন ও কীর্তি হিমবাহ এসে মিশেছে। কীর্তি হিমবাহের কাছে কেদারনাথ শৃঙ্গ ৬৮ ৩১ মি। এর বাঁ দিকে শিবলিঙ্গ পার্বতমালার তিনটি এবং ডান দিকে ভগীরথ পর্বত মালার তিনটি শিখর। ভগীরথ শিখরগুলি গঙ্গোত্রী শিখর নামে ও পরিচিত। গ্রীষ্ম কালে এখানে তাপ ২১°-২৪° সে, শীতে ৩°-৭° সে। কিছু বসতি ও আছে। গঙ্গোত্রীর পথ বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত খোলা থাকে। উত্তর কাশী থেকে হাঁটা পথে ৯২ কি-মি।

গজ—(১) রামের এক জন বানর যোদ্ধা। (২) শকুনির ছোট ভাই। সুবলের ছেলে; কুরুক্ষেত্রে ইরাবানের হাতে নিহত হন।

গজকচ্ছপ—বিভাবসু এক জন রাগী মুনি। ছোট ভাই সুপ্রতীক বার বার পিতৃধন বিভাগের জন্য অনুরোধ করেন। বিভাবসু ভিন্ন হবার কুফল বোঝাতে চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে ভাইকে হাতী হবার শাপ দেন সুপ্রতীক ও তখন কচ্ছপ হবার জন্য পাল্টা শাপ দেন। এর পর গজ ও কচ্ছপ দু জনে বহু কাল ধরে এক সরোবরের ধারে মারামারি করে কাটাচ্ছিলেন। গরুড় (দ্রঃ) অমৃত আনতে বার হয়ে এদের দু জনকে খেয়ে ফেলেন।

গজকুম্ভীর—দ্রঃ ইন্দ্রদ্যুম্ন।

গজলক্ষ্মী—অন্য নাম অভিষেক লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর একটি বিশিষ্ট রূপ ; দু পাশে দুটি হাতী দেবীর মাথায় অভিষেক বারি ঢালছে। গুপ্ত বা গুপ্ত পরবর্তী যুগে রচিত বিষ্ণু

ধর্মোত্তরম-এ এই রূপ কল্পনার প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। খৃ-পূ যুগের ভারহুত, সাঁচি, বুদ্ধগয়া, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ শিল্প কলায় দেখা যায়। দেবী পদ্ম হস্তা, প্রশস্তজঘনা, ক্ষীণকটি ও পীনপয়োধরা। দেবী মূলত উৎপাদিক শক্তির এবং পৃথিবীর প্রতীক। পরবর্তী কালে শ্রীসম্পদের দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়েন। অর্থাৎ বৌদ্ধদের এই দেবী হিন্দুদের লক্ষ্মীর সঙ্গে অভিন্ন ছিলেন। পরে এক হয়ে পড়েছেন। খৃ-পূ ৩-২ শতকের বহু মুদ্রায় এই মূর্তি পাওয়া যায়। অয়িলিস্, রজুবুল, শোডাস ইত্যাদি বিদেশী শাসকদের মুদ্রায় ও এই মূর্তি আছে। আরো বহু জায়গা থেকে এই মূর্তি পাওয়া গেছে। ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত খিচিঙে একটি মধ্যযুগীয় সুন্দর মূর্তি পাওয়া গেছে; দেবী বিশ্বপদ্মের ওপর ললিতাক্ষেপে সমাসীন ; ডান হাত ডান হাঁটুর ওপর বরদামুদ্রা যুক্ত ; বাঁ হাতে পদ্ম ; দুটি হাতী দুপাশে দুটি পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে মাথায় অভিষেক বারি ঢালছে। প্রাচীন কালে হাতী শ্রীসম্পদের প্রতীক ছিল। বৈদিক সাহিত্যে ও হাতীকে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছিল ; এই জন্যই বোধ হয় লক্ষ্মীর সঙ্গে দুটি হাতী থাকে

গজাসুর—দুর্দ্ধর্ষ এক অসুর। মহেশ নামে এক রাজা নারদকে এক বার যথাযোগ্য সম্মান না দেখালে পর জন্মে নারদের শাপে গজাকার দানবে পরিণত হন। ইনি দেবদ্বেষী। এঁর অত্যাচারে সকলে পীড়িত হয়ে পড়লে মহাদেব এঁকে বধ করে এঁর চামড়া নিজে পরিধান করেন (স্কন্দ)।

গণ—শিব ও পার্বতীর অনুচর ও ভৃত্যগণ। নন্দীকে বহু সময় গণদের অধিপতি বলা হয়। শিব ও গণেশের কঠোর শাসনে এঁরা থাকতেন। অন্যায় আচরণের জন্য কৈলাস থেকে এঁদের পৃথিবীতে নির্বাসিত করা হত।

গণতন্ত্র—দুই জাতের ; প্রত্যক্ষ ও প্রাতিনিধিক। প্রাচীন ভারতে খৃ পূ ৭-৪ শতকে ভারতে বহু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। এদের গণ বা সংঘ বলা হত। সাধারণত এক একটি সংঘ ছিল ক্ষত্রিয়কুলের অভিজাতক গণতন্ত্র। প্রভুস্থানীয় ক্ষত্রিয় বংশের সভ্যেরা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত আলোচনা করে গ্রহণ করতেন। দ-পশ্চিম ভারতের কয়েকটি সংঘের সভায় কৃষক, গোপালক ও বণিকরাও স্থান পেত। সেনাপতি ও প্রধান কার্যনির্বাহক সভার দ্বারা নির্বাচিত হতেন। সংঘের মাথায় নামে মাত্র এক জন রাজা (নির্বাচিত বা পুরুষানুক্রমিক) থাকত। ভারতের প্রাচীন গণতন্ত্রগুলি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ছিল। এদের কয়েকটি আবার একক সংঘ ছিল এবং কয়েকটি ছিল মিলিত সংঘ যেমন বজ্জি (বৃজি), ত্রিগর্ত, যাদব ইত্যাদি। সংঘ শাসিত উপজাতিদের অরাষ্ট্রক বা আরট্ট বলা হত। বুদ্ধের সময় (খৃ পূ ৭-৬ শতক) বৈশালীর বজ্জি বা লিচ্ছবিরা, এবং কুশীনগরের মল্লেরা ছিল শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক। কপিলাবস্তুর শাক্যেরা ও পিপ্পলি বনের মৌর্যেরা ছিল তুলনায় একটু নীচে। লিচ্ছবি ও মল্ল গণরাজ্যের আদর্শ বৌদ্ধ সংঘের সংগঠনকে প্রভাবিত করেছিল। খৃ পূ ৫-৩ শতকে পঞ্চ নদের দেশে প্রতিষ্ঠিত গণরাজ্য ছিল যৌধেয়, ক্ষুদ্রক, মালব, বসাতি, শিবি, অম্বষ্ঠ, উডুম্বর, ত্রিগর্ত, মদ্র, কেকয়, অগ্রেয় ও প্রস্থল। এ ছাড়াও পাণিনি ও কৌটিল্যের গ্রন্থে অন্ধক-বৃষ্ণি (সৌরাষ্ট্রে যাদবদের সাত্বত শাখা), কুকুর (উত্তর গুজরাত), কুরু (রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ), পাঞ্চাল (রাজধানী কাম্পিল বা কাম্পিল্য, উত্তর প্রদেশ), বৃক

(শকগণ ?), সাম্ব (অযোধ্যা অঞ্চলে), কাম্বোজ (গান্ধারের কাছে), মধুমন্ত ও অপ্রীত (সম্ভবত উ-পশ্চিম সীমান্তের মোহমান্দ ও আফ্রিদিদের পূর্বপুরুষ)। ইন্দো-গ্রীক, শক ও কুষাণদের পর যৌধেয়, মালব, শিবি, অর্জুনায়ন প্রভৃতি গণতন্ত্রগুলি আবার পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল।

গণদেবতা—মিলিত দেবতা ; এঁদের নয়টি ভাগ :—(১) আদিত্য-বার জন। (২) বিশ্ব বা বিশ্বদেব দশ জন। (৩) বসু আট জন। (৪) তুষিত ছত্রিশ জন। (৫) আভাস্বর ৬৪ জন। (৬) বায়ু উনপঞ্চাশজন। (৭) মহারাজিক দুশ কুড়ি জন। (৮) সাধ্য বার জন। (৯) রুদ্র এগারজন। এঁরা সকলেই দেবতাদের নীচে এবং শিবের অনুচর। এঁদের নেতা গণেশ।

গণিত—এক জন বিশ্বদেব। সময় ইত্যাদির হিসাব করতেন।

গণেশ—হরপার্বতীর ছেলে। অপর নাম গণপতি, বিনায়ক, মহাগণপতি, বিরিগণ-পতি, শক্তিগণপতি, বিদ্যাগণপতি, হরিদ্রাগণপতি, উচ্ছিষ্টগণপতি, লক্ষ্মীবিনায়ক, হেরম্ব, বক্রতুণ্ড, একদন্ত, মহোদর, গজানন, লম্বোদর, বিকট, ও বিঘ্নরাজ। মূর্তি অনুসারে ধ্যান ও পূজার প্রকার ভেদ আছে। গণেশের বাহন ইঁদুর ; এই ইঁদুর ধর্মের অবতার ; মহাবল ও পূজাসিদ্ধির অনুকূল। কিন্তু হেরম্বের বাহন সিংহ। নেপালে হেরম্ব মূর্তির বাহন অবশ্য ইঁদুর। হেরম্ব মূর্তিতে পাঁচটি মাথা ; মাঝখানের মাথাটি আকাশের দিকে ঊর্দ্ধমুখ। গণেশের কোন কোন রূপভেদকে কেন্দ্র করে মারণাদি ষট্‌কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। মহাগণপতি, শক্তিগণপতি, বিরিগণপতি এঁরা শক্তি যুক্ত ও আদিরসাশ্রিত। বিরিগণপতি মূর্তি নরকপাল থেকে মদ্যপান করছেন। গণপতির একটি মূর্তিতে শুঁড় বামদিকে, অন্যমূর্তিতে ডানদিকে। এঁর বিশাল ভুঁড়ির মধ্যে বিশ্ব অবস্থান করছে।

যে কোন পূজার আগে গণেশ পূজনীয় ; শুভকার্যে, ব্যবসায়ে নববর্ষে সিদ্ধি-দাতা হিসাবে এঁর পূজা করা হয়। গণেশ ভক্ত সম্প্রদায়ের নাম গাণপত্য। দুর্গা পূজার সময় ও ভাদ্র এবং মাঘ মাসে শুক্লা চতুর্থীতে গণেশের পূজার বিশেষ ব্যবস্থা হয়। ভাদ্র শুক্লা চতুর্থীকে গণেশচতুর্থী বলা হয়। এই দিন মহারাষ্ট্রে সাড়ম্বরে এই পূজা হয়। আনুমানিক খৃ ৫-শতকে গণেশের একক পূজার প্রচলন হয় ; কিন্তু গাণপত্য সম্প্রদায় আরো দু-এক শতক পরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। গাণপত্যদের ক্রমশ ছটি শাখা গড়ে ওঠে ; মহা, হরিদ্রা, উচ্ছিষ্ট, নবনীত, স্বর্ণ-ও সন্তানগাণপত্য। বর্তমানে গাণপত্য সম্প্রদায় লুপ্তপ্রায়। গণেশ গায়ত্রী :-মহৎকায়ায় বিদ্মহে, বক্র-তুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ।

আদিম জাতির পূজিত হস্তী দেবতা, লম্বোদর যক্ষ দেবতা এই দুটি মিলে গণেশের জন্ম মনে হয়। ইঁদুরও আদিম জাতীয় কোন এক সংস্কার-প্রতীক। পুণাতে ছিঞ্চবাড়ের গণেশ মন্দির প্রসিদ্ধ। কপিলাশ রোড স্টেসনের অদূরে গণেশক্ষেত্র নামে মহাবিনায়ক পর্বত একটি তীর্থক্ষেত্র। সিংহলে (খৃ-পূ ১-খৃ—১-শতক) মিহিনটালে প্রাপ্ত শিলাফলকে গুড়ি মারা অবস্থায় গজমুণ্ড ও রদ-বিশিষ্ট মূর্তিকে গণপতির প্রাচীন-তম শিল্পরূপ ধরা হয়। উত্তর প্রদেশে ফররুখবাদ জেলায় প্রাপ্ত আনুমানিক ৪-শতকের একটি দ্বিভুজ গণেশ শিলামূর্তি পাওয়া গেছে ; দেবতার বাঁ হাতে সম্ভবত মোদক

ভাণ্ড; শুঁড় দিয়ে মোদক খাচ্ছেন। খৃ ৫-শতকে উদয়গিরির (মধ্যপ্রদেশে) গুহা-গাত্রে এবং ভূমারা (মধ্যপ্রদেশ) ও ভিতরগাঁও (উত্তরপ্রদেশে) মন্দিরে প্রাপ্ত ফলকেও গণেশ শুঁড় দিয়ে মোদক খাচ্ছেন। উদয়গিরির গণপতি মূর্তি উর্দ্ধলিঙ্গ বলে মনে হয়। এই সব মূর্তিগুলির সাধারণত তিনটি ভাগ :-বসা (সবচেয়ে বেশি), দাঁড়ান ও নৃত্যরত। নৃত্যরত মূর্তিগুলিতে বাহনের ওপর দেবতা নাচছেন। গজমুণ্ড, তিন চোখ, বেঁটে দেহ, মস্ত ভুঁড়ি, হাত চার, ছয়, আট বা দশ। দ্বিভুজ মূর্তি কম। মিসনে (আনাম) প্রাপ্ত মূর্তি দ্বিভুজ, দাঁড়িয়ে মোদক খাচ্ছেন। যেন একজন সুখী স্বচ্ছল ভদ্রলোক। হাতে মোদক ভাণ্ড ছাড়াও পরশু, অক্ষমালা, মূলকদন্ত, অঙ্কুশ, পাশ, দণ্ড, শূল, সর্প, ধনু ও শর ইত্যাদি দেখা যায়। বর্তমানে হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, ও পদ্ম থাকে। জাভাতে বাড়া নামক স্থানে আবিষ্কৃত মূর্তিটি নরকপাল যুক্ত আসনে বসা; মাথায় জটাতেও নরকপাল। এটি ১১-শতকে মূর্তি এবং তান্ত্রিকতার প্রভাব সুস্পষ্ট।

শক্তিপূজা ও তান্ত্রিকতার প্রভাব এক সময় গণেশ পূজার মধ্যে বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তান্ত্রিক গণেশ মূর্তিতে সঙ্গে শক্তি আছেন; যেমন শক্তিগণেশ, লক্ষ্মীগণেশ, উচ্ছিষ্টগণেশ ইত্যাদি। লক্ষ্মীগণেশের লক্ষ্মী অর্থের দেবী নন। দক্ষিণ ভারতে উচ্ছিষ্ট গণেশের কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে। জব্বলপুরের কাছে গজমুণ্ড বিশিষ্ট একটি নারীমূর্তি পাওয়া গেছে; মনে হয় এটি গণেশের স্ত্রী গণেশানী।

পৌরাণিক কাহিনী :—হিমালয়ের কন্যা পার্বতীর সঙ্গে শিবের বিয়ে হয়। কিন্তু বহু বৎসর সন্তান না হওয়ায় বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করবার জন্য পুত্রক ব্রত করেন। এক বছর ব্রত করলে বিষ্ণু বর দেন এবং যথা সময়ে একটি শিশু হয়। শিশুকে সব দেবতারা ও শনিও দেখতে আসেন। শনির স্ত্রীর অভিশাপ ছিল শনি যে দিকে চাইবেন সব পুড়ে যাবে; এই জন্য শনি এসে ও শিশুকে দেখছিলেন না। পার্বতী অনুযোগ করলে শনি (দ্রঃ) কি কারণ জানান কিন্তু পার্বতী তবু পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। ফলে চেয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মাথা খসে যায়। খবর পেয়ে বিষ্ণু ছুটে আসেন এবং পথে একটি ঘুমন্ত হাতীর মাথা সুদর্শনে কেটে এনে শিশুর দেহ জুড়ে দেন এবং নিয়ম করে দেন এই মাথার জন্য গণেশ কোনদিন অনাদৃত হবেন না এবং সব কাজে আগে এঁর পূজা হবে। ব্রহ্মবৈবর্ত মতে মালী ও সুমালী নামে দুই শিবভক্ত সূর্যকে ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করেন। সূর্য এতে অচৈতন্য হয়ে যান এবং সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে পড়ে। সূর্যের পিতা কশ্যপ ছেলের অবস্থা দেখে মহাদেবকে শাপ দেন তাঁর ছেলের মাথাও খসে যাবে। এই জন্য গণেশের মাথা যায় এবং ইন্দ্রের ঐরাবতের মাথা এনে লাগিয়ে দেওয়া হয়। অন্য মতে হরপার্বতী বানর রূপে বনে বিহার করার সময় হনুমান (দ্রঃ কেশরী) জন্মান। এর পর ঐরাবত বেশে বনে বিহার করার সময় (পদ্মপুরাণ) গণেশ জন্মান। আর এক মতে পার্বতী একবার এক বস্ত্রে স্নান করতে যান। স্নান ঘরে সেই সময় শিব প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন গণেশ বাধা দেন; শিব রেগে গিয়ে গণেশের মাথা কেটে ফেলেন; পরে শান্ত হয়ে হাতীর মাথা জুড়ে দেন। স্কন্দপুরাণে গণেশ খণ্ডে সিন্দুর নামে এক দৈত্য পার্বতীর গর্ভে আটমাসে প্রবেশ করে গণেশের মাথা কেটে দেন। শিশু মারা যায় না; এবং

জন্মাবার পর নারদ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে গণেশ ঘটনাটি জানান। নারদ তখন বালককে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে বলেন। বালক নিজের তেজে গজাসুরের মাথা কেটে এনে নিজের দেহে লাগিয়ে নেন। ব্রহ্মবৈবর্তে আছে পরশুরাম একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে মহাদেবের সঙ্গে দেখা করতে এলে দ্বাররক্ষক গণেশ বাধা দেন। ফলে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং পরশুরাম কুঠারের আঘাতে গণেশের একটি দাঁত সমূলে উৎপাটিত করেন। শিব পুরাণে রুদ্র সংহিতাতে আছে পার্বতীর গাত্র মল থেকে গণেশের জন্ম। আর এক মতে পার্বতীর গাত্রমল থেকে তৈরি একটি পুতুলে, পার্বতীকে খুসি করার জন্য মহাদেব একটি গজমুণ্ড জুড়ে দেন। এবং মহাদেবের করুণায় এই পুতুল জীবন্ত হয়ে পার্বতীকে প্রদক্ষিণ ও পাদবন্দনা করে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় দেন। শিবের অনুগ্রহে গণেশ সমস্ত দেবতাদের আগে পূজা পাবার অধিকারী। পার্বতীও মহাদেবের বরে ইনি গণদের অধিপতি, বিঘ্ননাশক ও সর্বসিদ্ধি দাতা। কার্তিকেয়কে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করতে গিয়ে ইন্দ্রের হাত স্তম্ভিত হয়ে যায়। ইন্দ্র শিবকে কি ব্যাপার জানতে চান। শিব বলেন আগে গণেশকে পূজা না করার জন্য এই অবস্থা হয়েছে। গণেশের স্ত্রী সিদ্ধি ও বুদ্ধি। অন্য মতে তুলসী গণেশকে বিয়ে করতে চান। গণেশ সর্বদা তপস্যায় মগ্ন থাকতেন; তুলসীর এই বিকল চিত্ততায় তুলসীকে শাপ দেন দানব পত্নী হতে হবে। তুলসীও শাপ দেন; ফলে পুষ্টি নামে একটি মেয়েকে গণেশ বিয়ে করতে বাধ্য হন। একটি কাহিনীতে আছে কার্তিক ও গণেশের বিয়ের বয়স হলে শিবপার্বতী এদের দু জনকে পরীক্ষা করতে চান। ঠিক হয় পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে কে আগে ফিরতে পারে। কার্তিক তখনই ময়ূরে চড়ে বার হয়ে পড়েন। এবং গণেশ ধীরে সুস্থে শিবপার্বতীকে প্রদক্ষিণ করে নিয়ে বলেন তাঁর পৃথিবী পরিক্রমা হয়ে গেল। কার্তিক এর বহু পরে ফিরে আসেন। গণেশ জয়ী হবার জন্য আগে গণেশের বিয়ে হয়। কৌরব ও পাণ্ডবদের মৃত্যুর পর ব্যাস ধ্যান করতে থাকেন। মহাভারতের সমস্ত কাহিনী তাঁর মনের মধ্যে ফুটে ওঠে। মহাভারত লেখার জন্য ব্যাস লিপিকার খুঁজতে খুঁজতে ব্রহ্মার কাছে যান এবং ব্রহ্মা গণেশের কাছে যেতে বলেন। গণেশ সর্ত করেন লিখতে লিখতে তিনি থামবেন না। এবং থামলে আর লিখবেন না। ব্যাসদেবও সর্ত করেন কোন শ্লোক লেখার আগে অর্থ বুঝে তবে লিখতে হবে। এতে ব্যাসদেবের সুবিধা হয়। প্রয়োজন মত কঠিন শ্লোক তৈরি করে গণেশকে দেরি করিয়ে নিয়ে নিজে ইতিমধ্যে প্রস্তুত হয়ে নিতেন। তিন বছর এই বই লেখা হয়। দ্র কাবেরী, গণেশচতুর্থী।

গণেশ—কালপুরুষ (দ্র) নক্ষত্রের অন্তর্গত।

গণেশচতুর্থী—শুক্লা চতুর্থী; সিংহ মাসে; গণেশের জন্ম দিন। গণেশ অত্যন্ত মোদক প্রিয়। এক বার তাঁর জন্ম তিথিতে প্রতি বাড়িতে মোদক খেয়ে ভরা পেটে মূষিক বাহনে ফিরছিলেন। পথে একটি সাপের সামনে এসে পড়লে মূষিক ভয়ে কাঁপতে থাকে; গণেশ মাটিতে পড়ে যান এবং পেট ফেটে সব মোদক বার হয়ে পড়ে। গণেশ তখন সেই সব মোদক কুড়িয়ে নিয়ে পেটের মধ্যে ভরে পেটের চামড়া ঠিক মত চাপা দিয়ে সাপটি দিয়ে পেট জড়িয়ে বেঁধে নেন। চন্দ্র এই দেখে আকাশে হেসে ফেলেন এবং গণপতি শাপ দেন এই চতুর্থীর দিনে কেউ যেন চাঁদ না দেখেন।

গণেশ পুরাণে আছে মহাদেব এই দিন গণেশকে লুকিয়ে কার্তিককে একটি ফল দেন ; ফলে চন্দ্র হেসেছিলেন ও অভিশপ্ত হয়েছিলেন ইত্যাদি।

গণ্ডক—পুরাণে নাম সদানীরা। নেপালে নাম শালগ্রামী। নেপালে পার্বত্য উপত্যকাতে জন্ম। ধৌলগিরি ও গোঁসাইথান পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী নেপাল রাজ্যের পার্বত্য উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত কয়েকটি ছোট ছোট ধারার মিলিত প্রবাহ। শোণপুরে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সমস্ত তীর্থ সলিল মিলে এই গণ্ডক/গণ্ডকীর জল। সমুদ্র মন্থনের পর মোহিনী মূর্তিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে মহাদেব আলিঙ্গন করেন। এই আলিঙ্গনে উৎপন্ন ঘর্ম এই নদীতে পরিণত।

গদ—যদু বংশীয় বীর ; কৃষ্ণের ছোট ভাই। রোহিণীর ছেলে। সুভদ্রার বিয়েতে যৌতুক নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছিলেন। শাম্বের আক্রমণ থেকে দ্বারকা রক্ষার সময় যুদ্ধ করেছিলেন। যদুবংশ ধ্বংশের সময় সকলে যখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করছিলেন তখন গদ প্রহৃত হতে থাকলে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। (২) কশ্যপের ছেলে একটি অসুর ; দ্র গদাধর।

গদাধর—গদ (দ্র) অসুর বিষ্ণুর হাতে নিহত হলে বিশ্বকর্মা অসুরের অস্থিতে একটি আদি গদা তৈরি করে দেন। এই গদাতে বিষ্ণু হেতি ইত্যাদি রাক্ষসকে বিনাশ করেন। তাই নাম গদাধর। অন্য মতে হিমালয়ে কালঞ্জর পাহাড়ের উত্তরে গদ নামক স্থানে রাজা গয় অশ্বমেধ, নরমেধ, ও মহামেধ যজ্ঞ করেন। বিষ্ণু এই সময় দরজাতে গদা হাতে পাহারা দিয়েছিলেন ফলে নাম গদাধর।

গন্ধবতী—(১) সত্যবতী (দ্র)। (২) বায়ুর বাসস্থান। দ্রঃ মেরু।

গন্ধমাদন—হিমালয়ে স্বর্ণময় ঋষভ পর্বত ও কৈলাস পর্বতের মাঝখানে দীপ্তিমান ভেষজ পর্বত। ইলাবৃতবর্ষ ও ভদ্রাশ্ববর্ষের সীমানাতে ; নীল ও নিষধ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী, অস্থি সঞ্চারিণী ও মৃতসঞ্জীবনী এই চার প্রকার ভেষজ গাছ পাওয়া যেত। লঙ্কার যুদ্ধের সময় হনুমানকে দু বার এখান থেকে ভেষজ গাছ আনতে হয়। প্রথম বার এই গাছের গন্ধে রামলক্ষ্মণ শল্যমুক্ত হয়। দ্বিতীয়বার শক্তিশেলে লক্ষ্মণ মৃতপ্রায় হলে হনুমান গাছ চিনতে না পেরে পাহাড়ের চূড়াটি তুলে নিয়ে আসেন। ভেষজ গাছের গন্ধে সকলে মত্ত হয়ে পড়ত বলে নাম গন্ধমাদন। মহাভারতে আছে এই পাহাড়ে কদলীবনে হনুমান বাস করতেন। (২) ভগবতীর একটি পীঠস্থান ; এখানে ভগবতীর নাম কামুকী (দেবী ভাগবত)। লঙ্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে কুবের এখানে আশ্রয় নেন। কশ্যপ এখানে তপস্যা করেছিলেন। (৩) কুবেরের এক ছেলে। (৪) কুবের সভায় এক রাক্ষস। (৫) রামের এক সেনাপতি।

গন্ধর্ব—আদি গন্ধর্ব ছিলেন প্রথম নর ও নারী যম ও যমীর পিতা (ঋক্ ১০,১০,৪)। শতপথে আছে গন্ধর্বরা বাচের কাছে বেদ ব্যক্ত করেন। পরবর্তী সাহিত্যে গন্ধর্বরা দেবযোনি ও স্বর্গীয় গায়ক। সঙ্গীত শাস্ত্রের অপর নাম গন্ধর্ববেদ। গন্ধর্ববেদে গন্ধর্বদের অমঙ্গল সাধনের ক্ষমতাও আছে বলা হয়েছে। এদের বাসস্থান গুহ্যলোক ও বিদ্যাধর লোকের মাঝখানে। এঁরা অত্যন্ত রূপবান ; বৈদিক যুগে এঁরা স্বর্গের উপদেবতা। পরে সংখ্যায় বাড়লে নিম্ন শ্রেণীতে নেমে যান। এঁরা গাছ গাছড়া

সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এবং দেবতাদের বিশ্বস্ত অনুচর। এঁরা সোমরস তৈরি করে রক্ষা করতেন। সোমরস সর্বরোগহর বলে এঁদের স্বর্গবৈদ্যও বলা হয়েছে। এঁরা সূর্যের রথ চালাতেন এবং অগ্নি ও বরুণের দাস ছিলেন। সুগায়ক ও বাদক হিসাবে দেবতাদের উৎসবে এঁরা যোগ দিতেন।

এঁদের মধ্যে নরনারীর অবাধ মেলামেশা ও নারীদের প্রতি বিশেষ আসক্তি ছিল। পুরাণে এঁদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কাহিনী আছে। অরিষ্টা ও কশ্যপের সন্তান বলা হয়েছে। বেদের পরবর্তী যুগে অপ্সরারা এঁদের স্ত্রী বা সঙ্গিনী রূপে উল্লিখিত। ইন্দ্র সভায় এঁরা অপ্সরাদের সঙ্গে গায়ক হিসাবে যোগ দিতেন। অন্তরীক্ষে স্বচ্ছন্দচারী। সুন্দরী মেয়েছেলে দেখলে কখনো কখনো পৃথিবীতে নেমে আসতেন। এঁদের বিবাহপ্রথা গন্ধর্ব বিবাহ (দ্র)। বিষ্ণু পুরাণ মতে ব্রহ্মার কান্তি থেকে জন্ম। অন্য মতে কশ্যপের দুই স্ত্রী মুনি ও প্রধার গর্ভে ১৬-টি ও ১০-টি গন্ধর্বের জন্ম হয়েছিল। মুনির ছেলে চিত্ররথ (দ্র)। হরিবংশে স্বরোচিষ মন্বন্তরে অরিষ্টার গর্ভে এঁদের জন্ম। এঁরা প্রায় সকলেই ধনী, এঁদের নগরী সমৃদ্ধ। হাহা, হূহূ, হংস, চিত্ররথ, বিশ্ববসু, গোমায়ু, তুম্বরু, নন্দি ইত্যাদি কয়েকটি বিখ্যাত গন্ধর্ব।

গন্ধর্ববিদ্যা—সঙ্গীত বিদ্যা।

গন্ধর্ববিবাহ—নিজেরা প্রণয়াসক্ত হয়ে সরাসরি বিবাহ করা। এই বিবাহে দেবতা বায়ুই একমাত্র সাক্ষী ও উপকরণ।

গন্ধর্ববেদ—সঙ্গীত শাস্ত্র।

গন্ধর্বলোক—গুহ্যলোকের ওপরে এবং বিদ্যাধরলোকের নীচে। এখানে গন্ধর্বদের বাস।

গন্ধর্বী—সুরভী কামধেনুর সন্তান। গন্ধর্বীর সন্তান সমস্ত অশ্বজাতি।

গন্ধেশ্বরী—বণিকদের শত্রু গন্ধাসুরকে বৈশাখী পূর্ণিমাতে বধ করে এই নাম। ঐ দিন পূজা হয়। মূর্তি সিংহবাহিনী, চতুর্ভুজা ; পূজা হয় দুর্গার ধ্যানে। পূজার সংকল্পে বাণিজ্য বৃদ্ধির কামনা থাকে।

গন্দল গণ—সঞ্জয়ের পিতা।

গবাক্ষ—(১) রামের একজন দুর্দ্ধর্ষ সেনামুখ্য। (২) শকুনির ছোট ভাই ; ইরাবানের হাতে নিহত হন।

গবিজাত—শমীক (=নাগভূষণ) মুনির ছেলে শৃঙ্গী।

গবিষ্ঠ—বিখ্যাত অসুর। দ্রুমসেন রূপে জন্মান।

গভস্তিমান—একটি দ্বীপ।

গয়—(১) সুগ্রীবের অনুচর। সীতার সন্ধানে যাবার জন্য সুগ্রীব ডেকে পাঠালে বহু বানর সৈন্য নিয়ে ইনি কিষ্কিন্ধ্যায় আসেন। (২) এক জন রাজর্ষি। অমূর্তরজসের ছেলে। আমিষ স্পর্শ করতেন না। একশ বছর ধরে আহুতির অবশিষ্ট খেয়ে অগ্নির পূজা করেছিলেন। অগ্নি তার পর বর দিতে চাইলে ইনি বেদ পাঠের অধিকার চান। অগ্নির বর পেয়ে পৃথিবীর ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন। ক্রমশ আরো ধর্ম নিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং বৃহৎ যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। এই যজ্ঞের ফলে একটি বট গাছ চিরজীবী হয়ে রয়েছে ; এটি অক্ষয় বট। একটি যজ্ঞে সরস্বতী বিশালা নামে

যোগদান করেন। রাজা মান্ধাতার কাছে এক বার পরাজিত হন। বিরাটের গোধন চুরির সময় অর্জুন ও কৃপাচার্যের যুদ্ধ দেখতে বিমানে করে উপস্থিত হয়েছিলেন। (৩) বিখ্যাত বিষ্ণু ভক্ত অসুর। এঁর নাম থেকে গয়া। কঠোর তপস্যা করতেন। দেবতারা ভয়ে ব্রহ্মার কাছে যান এবং ঠিক হয় কোন একটা বর দিয়ে এঁকে নিবৃত্ত করতে হবে। গয় বর চান ব্রাহ্মণ, তীর্থশালা, দেবতা, যোগী, মন্ত্র ইত্যাদি সব কিছু থেকে তাঁর দেহ যেন পবিত্র হয়। ফলে এই পবিত্র দেহ স্পর্শ করে সকলেই বৈকুণ্ঠে যেতে থাকেন এবং দেশ জনশূন্য হয়ে পড়ে। যম পুরীতে কোন পাপী নাই। যম এ কথা বিষ্ণুকে জানালে দেবতারা তখন এক দিন গয়াসুরের কাছে এসে তাঁর দেহ ভিক্ষা চান; দেহের ওপর যজ্ঞ করবেন; গয় সম্মত হলে ব্রহ্মা গয়ের দেহের ওপর যজ্ঞ করতে থাকেন। গয় নড়ছিল; দেবতারা তখন মস্ত বড় একটা পাথর গয়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তার ওপর চেপে বসেন। এতেও গয়াসুর বেঁচে ছিল। বিষ্ণু তখন নিজে পাথরে ওপর বসেন। গয়াসুর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অভিযোগ করেন তাঁর সঙ্গে এ ভাবে চালাকি করা উচিত নয়। গয়াসুরের বিনয়ে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে আবার বর দিতে চান। গয়াসুর বর চান যাবৎ চন্দ্রসূর্য পৃথিবীতে থাকবে দেবতারা যেন তাবৎ তাঁর বুকের ওপর বসে থাকেন। যজ্ঞ শেষ হলে ব্রহ্মা যজ্ঞের পুরোহিতদের নানা কিছু দান করেন। এখানে সোনার পাহাড় তৈরি করে দেন, নদীতে দুধ ও মধু বয়ে যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণরা ক্রমশ লোভী হয়ে পড়তে থাকলে ব্রহ্মার শাপে এঁরা নিরক্ষর ও দুষ্টবুদ্ধি হয়ে যান। গয়ের পুণ্যে গয়া বিখ্যাত তীর্থ। (৪) পুরূরবার ছেলে আয়ুস্। আয়ুসের ছেলে গয় ও নহুষ। (৫) পৃথুর পৌত্র হবির্ধানের একটি ছেলে। (৬) ধ্রুবের বংশে এক অসুর।

গয়া—২৪°৪৮´৪৪´´ উ × ৮৫°৩´১৬´´ পূ। ফল্গু নদীর দক্ষিণ তীরে। অন্য নাম গয়াধাম; গয়াক্ষেত্র, গয়াপুরী। গয় (দ্র) অসুরের নামে নাম। গয়া থেকে ৮-৯ কি-মি দূরে বুদ্ধ-গয়াতে প্রসিদ্ধ বোধিদ্রুমের নীচে গৌতম বুদ্ধ বোধি লাভ করেন। বোধিদ্রুমের পাশেই যে বিশাল মন্দিরটি রয়েছে তার নির্মাণ কাল জানা নাই। তবে খৃ ১১ শতকে ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ রাজা এর সংস্কার করে দেন। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ গুপ্তবংশের দ্বিতীয় রাজা সমুদ্র গুপ্তের অনুমতি নিয়ে সিংহলীয় বৌদ্ধ যাত্রীদের বাসের জন্য একটি বাড়ি ও বোধিদ্রুমের উত্তর দিকে একটি বিহার তৈরি করে দিয়েছিলেন। হিউ-এন-ৎসাঙ এই বিহার ও অন্যান্য মন্দির চৈত্য, স্তূপ ও বিহার ইত্যাদির অতুল সমৃদ্ধি ও মনোহারিত্বের বর্ণনা করেছেন। সিংহলীয় বৌদ্ধ বিহারে তখন হাজারের বেশি ভিক্ষু ছিলেন। খৃ ১৩ শতকেও এখানে সিংহলীয় ভিক্ষুদের এখানে বিশেষ প্রভাব ছিল।

গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দির একটি তীর্থস্থান। আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষে এখানে মেলা বসে। বৈশাখী পূর্ণিমাতে বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধ মন্দিরের কাছেও একটি মেলা হয়।

গরুড়—ঋক্‌বেদে ইনি তার্ক্ষ্য ও গরুত্মান্। গায়ত্রী যখন গন্ধর্বদের কাছ থেকে সোম চুরি করেছিলেন তখন গরুড় পথ প্রদর্শন করেন (ঐতরেয়)। ঋক্‌বেদে আছে কশ্যপ পুত্র কামনায় যজ্ঞ করলে ইন্দ্র, বালখিল্য মুনিরা ও দেবতারা যজ্ঞের কাঠ নিয়ে আসতে থাকেন। ইন্দ্র বড় বড় কাঠ আনতে থাকেন; অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বালখিল্যরা

সকলে মিলে একটি পলাশ পাতা বয়ে নিয়ে আসতে গিয়ে জলপূর্ণ একটি গোষ্পদে পড়ে যান। এতে ইন্দ্র এঁদের উপহাস করেন। এর ফলে বালখিল্যরা অন্য কোন দেবতাকে ইন্দ্রের জায়গায় ইন্দ্র করবেন ঠিক করে যজ্ঞ করতে থাকেন। ইন্দ্র তখন ভয়ে কশ্যপের শরণ নেন। কশ্যপ এদের বোঝান যে ব্রহ্মার নির্দেশে ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব করেছেন ; সুতরাং ব্রহ্মার এ নির্দেশ ঠিক থাকুক। বালখিল্যরা বরং আর এক জন ইন্দ্র বেছে নিক ; যজ্ঞ সফল হক এবং এই ইন্দ্র পক্ষীদের ইন্দ্র হয়ে জন্মাক। এবং ইন্দ্র এই শিশুর কাছে পরাজিত হবেন। বালখিল্যরা এতে সন্তুষ্ট হন। এই সময়ে বিনতা ঋতু স্নান করে পুত্রলাভের জন্য স্বামীর কাছে এলে কশ্যপ বর দেন তাঁর বাসনা পূর্ণ হবে এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুটি সন্তান হবে। কশ্যপের যজ্ঞ ফলে বালখিল্যদের যজ্ঞের ফল যুক্ত হয়ে অতি শক্তিধর দুটি শিশুর জন্ম হবে। যথাকালে বিনতার দুটি ডিম হয় এবং ডিম থেকে অরুণ (দ্র) ও গরুড় দুটি সন্তান হয়। অন্য মতে কশ্যপের স্ত্রী তাম্রার মেয়ে নলা এবং নলার মেয়ে বিনতা ; অর্থাৎ কশ্যপের নাতনি। কদ্রু ও বিনতা দু জনে কশ্যপের সেবা করেন ; কদ্রু এক হাজার ছেলে হবে বর পান ; বিনতা এই এক হাজার ছেলে থেকে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ দুটি ছেলে চান।

গরুড় বিষ্ণুর বাহন। একটি ডিম থেকে অকালে অরুণ (দ্র) হয় এবং অপর ডিমটি থেকে আরো পাঁচ শত বছরের পর গরুড়ের জন্ম হয়। গরুড় আধখানা পাখী, আধখানা মানুষ। জন্মের পর দেহ থেকে সূর্যের মত দীপ্তি ছড়িয়ে পড়তে থাকে ; দেবতারা এসে সকলে আশীর্বাদ করেন। গরুড়ের মুখ সাদা, ডানা রক্তবর্ণ, দেহ স্বর্ণাভ। পাখীর মত ঠোঁট ও নখ। খাদ্য জীবজন্তু ও ফলমূল। এঁর ছেলে সম্পাতি, ময়ূর।

রমণীয়ক (মহা ১।২১।৪) দ্বীপে কদ্রু (দ্র) ও নাগদের নিয়ে যেতে বাধ্য হন। এর পর বিমাতার দাসীত্ব থেকে মার মুক্তি জন্য অমৃত আনবেন স্থির করেন। বিনতা আশীর্বাদ করেন গরুড়ের ডানা মারুত, পৃষ্ঠ চন্দ্র, মাথা বহ্নি এবং সর্ব অংশ ভাস্কর (মহা ১।২৪।৮) রক্ষা করবেন। গরুড় তার পর বার হন ; পথে ক্ষিধে মেটাবার জন্য নিষাদদের খেয়ে ফেলেন। নিষাদদের সঙ্গে এক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকেও মুখে পুরে ফেলে ছিলেন। কিন্তু বিনতা জানিয়ে রেখেছিলেন গলামুখ জ্বলে যাবে ; গরুড় এঁদের দু জনকে তাড়াতাড়ি মুখ থেকে বার করে দেন। তারপর গন্ধমাদন পাহাড়ে কশ্যপের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং সব কথা জানান ও কিছু খেতে চান। অদূরে হ্রদে গজকচ্ছপ (দ্র) দুটিকে কশ্যপ খেতে বলেন। গরুড় এদের দু জনকে দু হাতে করে নিয়ে উড়তে থাকে এবং সুবিধা মত একটি বট গাছের ডালে গিয়ে বসলে ডালটি ভেঙ্গে যায়। ঐ ডালে বালখিল্য মুনিরা নীচের দিকে মাথা করে ঝুলছিলেন। মুনিদের পাছে কোন ক্ষতি হয় ডালটিকে ঠোঁটে করে ধরে নিয়ে আবার উড়তে থাকেন এবং উপযুক্ত কোন স্থান না পেয়ে কশ্যপের কাছে আবার ফিরে আসেন। কশ্যপের স্তবে বালখিল্যরা ডাল থেকে নেমে হিমালয়ে তপস্যা করতে চলে যান এবং কশ্যপের উপদেশে এক নির্জন তুষারাচ্ছন্ন পাহাড়ে শাখাটি ফেলে দিয়ে আর একটি পাহাড়ের চূড়ায় বসে এ পর্যন্ত হাতে ধরে রাখা গজকচ্ছপ দুটিকে খেয়ে নেন।

গরুড় আসার আগেই দেবলোকে নানা অশুভ লক্ষণ দেখা দিতে থাকে।

দেবতারা বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করেন এবং বৃহস্পতি জানান গরুড় অমৃত নিতে আসছে। দেবতারা তখন অমৃত পাহারা দেবার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। দেবলোকে এলে তুমুল যুদ্ধ হয়। অমৃত রক্ষক বিশ্বকর্মা প্রথমেই যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হন। দেবতারা এমন কি চন্দ্রসূর্যও তারপর পরাজিত হন। ইন্দ্রের সঙ্গেও যুদ্ধ হয় এবং ইন্দ্র বজ্রাঘাত করেন; কিন্তু গরুড় একটুও আহত হন না এবং বজ্রের সম্মান রক্ষার জন্য ঠোঁটে করে একটি পালক ছিঁড়ে নিয়ে ফেলে দেন। ইন্দ্র বিস্মিত হয়ে গরুড়কে নাম দেন সুপর্ণ এবং অমৃত নিয়ে যেতে দেন। স্বর্ণময় ছোট্ট একটা দেহ ধারণ করে গরুড় অমৃত কক্ষে গিয়ে ঢোকেন। অমৃত ছিল অগ্নি বেষ্টিত এবং সামনে ঘুরন্ত দুটি ক্ষুরচক্র ছিল। চক্র দুটির নীচে দুটি ভয়ঙ্কর সর্প অবস্থিত রয়েছে। এই সময়ে গরুড় নিজের দেহ সঙ্কুচিত করে চাকার ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে ভয়ঙ্কর সাপ দুটিকে নিহত করে অমৃত নিয়ে আকাশে ওঠেন/বিষ্ণুর কাছে যান। গরুড়ের এই বীরত্বে এবং গরুড় অমৃত পানের লোভ সংবরণ করেছেন দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু বর দিতে চান। গরুড় অমরত্ব ও বিষ্ণুর রথে থাকার বর চান। বিষ্ণু বর দিলে গরুড় তখন বিষ্ণুকে বর চাইতে বলেন। বিষ্ণু গরুড়কে তাঁর বাহন হবার এবং তাঁর রথধ্বজে গরুড় অবস্থান করবে বর চেয়ে নেন। একটি মতে এর পর ইন্দ্র বজ্রাঘাত করেছিলেন এবং দধীচি, বজ্র ও ইন্দ্রের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য নিজের ডানা থেকে একটি পালক তুলে ফেলে দেন, সুপর্ণ নাম দিয়ে ইন্দ্র মিত্রতা স্থাপন করেন ইত্যাদি। ইন্দ্র অমৃতকুম্ভ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। গরুড় সব কথা জানান এবং বলেন বিনতার মুক্তির জন্য অমৃতকুম্ভ তাকে নিয়ে যেতে হবেই সাপেদের এই অমৃত দিলে ইন্দ্র পারেন যদি চুরি করুন। ইন্দ্র তখন বর দিতে চাইলে গরুড় বর চান নাগকুল যেন তাঁর ভক্ষ্য হয়।

নাগলোকে ফিরে এসে কুশাসনের ওপর অমৃতকুম্ভ স্থাপন করে নাগেদের স্নান করে আসতে বলেন এবং নিজের মায়ের মুক্তি চেয়ে নেন। সাপেরা বিনতাকে মুক্তি দিয়ে অমৃত খাবার লোভে দেহ পবিত্র করে নেবার জন্য স্নান করতে যান। ইন্দ্র/বিষ্ণু এই সুযোগে অমৃত চুরি করে পালিয়ে যান। সাপেরা ফিরে এসে অমৃত না পেয়ে কুশাসন চাটতে থাকে ফলে এদের জিব দ্বিধা হয়ে যায়।

একটি মতে অমৃত আনতে যাবার সময় যে গাছে বসলে ডালটি ভেঙেছিল সেই গাছটির নাম সুভদ্র; ডালটিকে গরুড় সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলেন; এবং সমুদ্রে সেইখানে মাটি পাহাড় হয়ে উঁচু হয়ে উঠে ত্রিকূট/লঙ্কা গঠিত হয়।

ইন্দ্রের বরে গরুড় যথেচ্ছ নাগকুল ধ্বংস করতে থাকলে নাগেরা শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে গরুড়ের সঙ্গে একটা আপোষ করে প্রতিদিন একটি করে সাপ গরুড়কে খেতে দেওয়া হবে। গরুড়ের যথেচ্ছ অত্যাচার বন্ধ হয় বটে কিন্তু কালীয় (দ্র) নাগ এই প্রস্তাবে রাজি হন না।

গরুড়ের বড় বোন সুমতি। বিনতা যখন কদ্রুর দাসী ছিলেন তখন এক দিন বনে কদ্রুর জন্য কাঠ আনতে যান। বনে ঝড় বৃষ্টিতে পথ হারিয়ে গিয়ে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে আশ্রয় নেন। সন্ন্যাসী বিনতার কষ্ট দেখে আশীর্বাদ করে ছিলেন একটি শক্তিশালী ছেলে হবে এবং দাসীত্ব থেকে মুক্ত করে দেবে। গরুড়ের জন্মের অনেক পরে বিনতা তথা গরুড় সুমতির (দ্র) বিয়ের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লে

বিনতা তখন গরুড়কে এই সন্ন্যাসীর কাছে পাঠান এবং সন্ন্যাসী গরুড়কে ঔর্বের কাছে পাঠান। ঔর্বের পরামর্শে গরুড় সুমতির সঙ্গে সগরের বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

মাতলির মেয়ে গুণকেশী ; বিয়ে হয় সুমুখ নাগের সঙ্গে। ঠিক ছিল গরুড় এই নাগকে এক মাসের মধ্যে ভক্ষণ করবেন। মাতলির পরামর্শে সুমুখ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেন। গরুড় এসে ইন্দ্রকে অনুরোধ করেন তাঁর ভক্ষ্যকে ছেড়ে দিতে। ইন্দ্র জানান বিষ্ণু সুমুখ-কে দীর্ঘ জীবন বর দিয়েছেন। রাগে গরুড় বিষ্ণুর কাছে গিয়ে আস্ফালন করেন তিনি বিষ্ণুকে তাঁর ডানার প্রান্তে বসিয়ে বহন করেন ইত্যাদি। বিষ্ণু তখন গরুড়কে তাঁর বাঁ হাতের ভার সইতে বলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতটি গরুড়ের ওপর রাখলে ভারে গরুড় অজ্ঞান হয়ে যান এবং জ্ঞান ফিরলে ক্ষমা চেয়ে নেন। বিষ্ণু তখন পায়ের আঙ্গুলে করে সুমুখকে গরুড়ের বুকে ছুঁড়ে দেন ; সেই থেকে গরুড় আর সুমুখকে হিংসা করেন না।

গালব যখন গুরু দক্ষিণা দেবার চিন্তায় বিপন্ন তখন গরুড় এসে প্রথমে গালবকে পিঠে নিয়ে ঋষভ পর্বতে যান। এখানে ব্রহ্মবাদিনী শাণ্ডিলী এদের অতিথি সৎকার করেন এবং সেই রাত্রিতে এখানে এঁরা কাটান। পর দিন সকালে উঠে গরুড় দেখেন তাঁর সমস্ত পালক ঝরে গেছে। মুখপাদান্বিত একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছেন (মহা ৫।১১১।৫)। সিদ্ধা শাণ্ডিলীকে এই পাহাড় থেকে প্রজাপতি, মহাদেব, বিষ্ণু, বা ধর্মের কাছে অর্থাৎ উপযুক্তধামে নিয়ে যাবার কথা গরুড় চিন্তা করে ছিলেন। ফলে শাণ্ডিলী মনে করেন গরুড় তাঁকে নিন্দা করেছে। ফলে এই অবস্থা। গরুড় ক্ষমা চাইলে (মহা ৫।১১১।১০) সাণ্ডিলীর আশীর্বাদে গরুড়ের আবার পালক গজায়। এখান থেকে গালবকে নিয়ে গরুড় যযাতির কাছে পৌছে দেন। পারিজাত নিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে ইন্দ্রের যখন যুদ্ধ হয় সেই সময়ে গরুড়ের প্রহারে ঐরাবত অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। সমুদ্র মন্থনের সময় মন্থনদণ্ড হিসাবে মন্দার পর্বতকে তুলে আনতে কেউ যখন পারলেন না তখন বিষ্ণুর নির্দেশে গরুড় গিয়ে ঠোঁটে করে পাহাড়টিকে তুলে আনেন। এর পর বাসুকি নাগকে গরুড় আনতে গিয়ে বিফল হন। দ্র সমুদ্র মন্থন।

বনবাসের সময় মহর্ষি আর্ষ্টিসেনের (মহা ৩।১৫৭।১১) আশ্রমে পাণ্ডবরা যখন আসেন সেই সময় গরুড় সমুদ্রের তলদেশ থেকে ঋদ্ধিমান নাগকে তুলে আনেন ; পাখার ঝাপটায় কুবেরের উদ্যান থেকে পঞ্চবর্ণ কহ্লারপুষ্প দ্রৌপদীর গায়ের কাছে এসে পড়ে। দ্র উপরিচর বসু। এক বার এক দানব কৃষ্ণের মুকুট চুরি করলে গরুড় এই মুকুট উদ্ধার করে এনে দেন। ভাগবত মতে গরুড় দক্ষের চারটি মেয়েকে বিয়ে করেন। লঙ্কাতে লক্ষ্মণ যখন নাগপাশে বদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন গরুড় এসে মুক্ত করেন। কার্তিকেয়ের জন্ম হলে গরুড় নিজের ছেলে ময়ূরকে কার্তিকেয়ের বাহন হবার জন্য দান করেন।

গরুড়-অস্ত্র—এই অস্ত্র ছুঁড়লে নাগপাশের নাগেরা ভয়ে পালিয়ে যায়।

গর্গ—গর্গ্য। বৃহস্পতি বংশে জন্ম ; ভরদ্বাজের (দ্রঃ) বংশে বৃহৎক্ষেত্রের ছেলে জয় ; জয়ের ছেলে গর্গ এবং গর্গের ছেলে শিনি। বিষ্ণু পুরাণে এই শিনির ছেলে গার্গ্য ও শৈন্য এঁরা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ। গর্গের ছেলে গার্গ ও মেয়ে গার্গী। গর্গের ভাই নর এবং

নরের নাতি রন্তিদেব। শিবের আরাধনার চৌষট্টি অঙ্গ জ্যোতিষ ইত্যাদি জ্ঞান লাভ করেন। যাদবদের কুলপুরোহিত হয়েছিলেন। এই গর্গের পরামর্শেই কৃষ্ণ বলরাম সান্দীপনি আশ্রমে যান। রাম রাজা হলে গর্গ দেখা করতে এসেছিলেন। পৃথুর সভাতে প্রধান জ্যোতির্বেত্তা। অন্য মতে ব্রহ্মার ছেলে গর্গ।

গার্দভি—গার্দভি (মহা ১৩।৪।৫৮)। বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবাদী এক ছেলে।

গর্ভ—ভরতের এক ছেলে।

গাঙ্গেয়—ভীষ্ম।

গাণ্ডীব—অর্জুনের ধনুক। ব্রহ্মা এই ধনুক প্রথমে তৈরি করে প্রজাপতিকে দেন; প্রজাপতি ইন্দ্রকে; ইন্দ্র সোমকে; সোম বরুণকে দেন। অন্য মতে ব্রহ্মার থেকে চন্দ্র এবং চন্দ্র থেকে বরুণ। দেবতা ও মানুষ সকলের সঙ্গে এই ধনুকে যুদ্ধ করা যেত এবং ১ নিমিষে ১ লক্ষ শত্রু নিধন করা যেত। খাণ্ডব (দ্রঃ) দাহের সময় অগ্নি এই ধনুক বরুণের কাছ থেকে চেয়ে এনে অর্জুনকে দেন। অর্জুন এটি ৬৫ বৎসর ব্যাবহার করেন। গণ্ডারের মেরুদণ্ড দিয়ে তৈরি বলে এই নাম। এই ধনুকে অর্জুন কুরুক্ষেত্রে জয়লাভ করেন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল কেউ যদি তাঁকে গাণ্ডীব অপরকে দিয়ে দিতে বলেন তাহলে তাঁর শিরচ্ছেদ করবেন। কুরুক্ষেত্রে ১৭ দিনের দিন কর্ণের হাতে অর্জুন নিপীড়িত হলে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে তিরস্কার করে উপযুক্ত লোকের হাতে গাণ্ডীব তুলে দিতে বলেন। অর্জুন তখন যুধিষ্ঠিরের শিরচ্ছেদ করতে যান কিন্তু কৃষ্ণ থামান এবং অর্জুনকে উপদেশ দেন যুধিষ্ঠিরকে তুমি বলে সম্বোধন করতে। তুমি সম্বোধন মৃত্যুর সমান অপমান হবে এবং অর্জুনের প্রতিজ্ঞা এই ভাবে রক্ষা হবে। অর্জুন এ ভাবে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলে বড় ভাইকে অপমান করার জন্য অনুতাপে আত্মহত্যা করতে যান। কৃষ্ণ বাধা দেন এবং অর্জুনকে নিজের গুণকীর্তন করতে বলেন এবং বোঝান সেইটাই অত্মহত্যার সমান হবে। অর্জুন পরে যুধিষ্ঠিরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর অর্জুন যখন যাদব নারীদের নিয়ে ফিরছিলেন তখন পথে আভীর দস্যুদের বাধা দেবার জন্য গাণ্ডীব তুলতে পারেন নি। মহাপ্রস্থানে যাবার সময় পর্যন্ত গণ্ডীব ও অক্ষয় তূণ-দুটি ব্যবহার করতে না পারলেও অর্জুনের কাছেই ছিল। মহাপ্রস্থানর পথে অগ্নি এসে এগুলি বরুণকে ফিরিয়ে দিতে বলেন। অর্জুন তখন এগুলি সমুদ্রে ফেলে দেন।

গাথা—বৈদিক শব্দ; অর্থ গীতি বা গেয় পদ। গাথ-গাথা শব্দের অর্থ সায়ণাচার্য মতে গাতব্য স্তোত্র; স্তুতিরূপা বাক; সকলের দ্বারা গীত যোগ্য গীতি। প্রাচীন ইরানীয় ভাষাতেও গাথা অর্থ গীত। আবেস্তার একটি অংশের নাম গাথা, জরথুশ্‌ত্র রচিত বৈদিক ছন্দের অনুরূপ প্রাচীন ছন্দে লেখা কতকগুলি স্তোত্র সংগ্রহ। এই গাথা অংশের ভাষা আবেস্তার অন্য অংশের ভাষার চেয় প্রাচীনতর।

পরে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ইত্যাদির মধ্যে গাথার অর্থ অনেকটা বদল হয়েছে। এই গাথাগুলিতে কেবল গীত নয়; উক্তি ও প্রত্যুক্তির মাধ্যমে পুরাতন উপাখ্যানের সারাংশ উপস্থিত করা হয়েছে। পালি ও মিশ্র-সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে ও গাথা এই ভাবে গীত ও কাহিনী মিলিয়ে রচিত।

গাথাসপ্তশতী—প্রাকৃত ভাষায় গাহা (গাথা) ছন্দে লেখা শ্লোকের সংকলন। প্রকৃত

নাম গাহাসত্তসই। মোটামুটি ৮০০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী সংকলন নয়। কোন কোন পুঁথিতে কোন কোন শ্লোকের রচয়িতায় নাম ও দেওয়া আছে। মেয়েদের ও নাম রয়েছে। গ্রাম্য কবি, মেয়েলি রচনা, পণ্ডিত, কবি সকলের রচনাই এতে আছে। বেশির ভাগ শ্লোক আদি রসের। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় লেখা সাধারণ লোকের উপভোগ্য কবিতা।

গাথি—কোসলে গাথি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। এক পুষ্করিণীর জলে গলা ডুবিয়ে বসে তপস্যা করছিলেন। আট মাস এই ভাবে থাকার পর বিষ্ণু দেখা দেন; গাথি মায়াকে প্রত্যক্ষ করবেন বর চান। এর পর বহু বছর কেটে যায়। গাথি এক দিন স্নান করতে জলে ডুব দেন এবং উঠে এসে মন্ত্র ইত্যাদি সব কিছু ভুলে যান এবং মন সম্পূর্ণ বদলে যায়। তিনি প্রত্যক্ষ দেখেতে পান বাড়িতে তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছেন। তার-পর দেখেন সকলে কাঁদছে, তাঁর দেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে অগ্নি সংকার করা হল। গাথি তারপর অনুভব করতে থাকেন তিনি বিদেহী আত্মা। ঘুরতে ঘুরতে এই আত্মা/গাথি এক চণ্ডাল রমণীর গর্ভে আশ্রয় পান। প্রত্যক্ষ দেখতে থাকেন কৃষ্ণকায় এক শিশু হয়ে জন্মালেন, ক্রমশ তার পর বড় হয়ে বলিষ্ঠ এক পুরুষে পরিণত হলেন এবং এর পর সুন্দরী একটি চণ্ডাল কন্যার সঙ্গে জীবন কাটাচ্ছেন। মাটিতে পর্ণশয্যায়, কুঁড়ে ঘরে, ঝোপে, গুহাতে এই ভাবে জীবন কাটছে দেখতে পান এবং বহু দুষ্ট সন্তান হচ্ছে প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। এর পর অনুভব করতে থাকেন ক্রমশ তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙছে এবং একটি কুটির বেঁধে গাথি বৃদ্ধচণ্ডাল তপস্বীর মত কাটাতে থাকেন। তার পর এক দিন দেখেন হঠাৎ তাঁর সামনে স্ত্রী, সন্তানগুলি ও পরিবারে যে যেখানে ছিল মারা গেল। গাথি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন এবং কুটির থেকে বার হয়ে নিরুদ্দেশে ঘুরতে ঘুরতে কীরমণ্ডল নগরীতে এসে উপস্থিত হন। সুন্দর সাজান নগরী; এখানে রাজা মারা গেছেন। এই রাজ্যের নিয়ম অনুসারে রাজপ্রাসাদের হাতী নতুন রাজা খুঁজতে বার হয়েছিল; গাথিকে দেখে পিঠে তুলে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এল। গাথির এখানে অভিষেক হল; নতুন নাম হল গালব এবং মৃত রাজার স্ত্রীদের বিয়ে করে আর এক জীবন কাটাতে থাকেন। গাথি এ সব স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছিলেন। আট বছর এই ভাবে রাজত্ব করার পর এক দিন সাধারণ বেশে প্রাসাদ থেকে বার হলে প্রাসাদের দরজায় বসে থাকা এক দল চণ্ডাল গাথিকে চণ্ডাল বলে চিনতে পারে এবং ধরে ফেলে এবং এত দিন চণ্ডাল গাথি কোথায় ছিল জানতে চায়। রাজা গাথি কিন্তু এই চণ্ডালদের চিনতে পারেন না। এ দিকে প্রাসাদে সকলে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে; সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে গালব এক জন চণ্ডাল। ফলে সব ছেড়ে দিয়ে গাথি রাজ্য থেকে পালিয়ে যান। পথে দেখেন এক জন চণ্ডালকে রাজা করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে বহু প্রজা পথে স্থানে স্থানে অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করছে। তাঁর জন্য এত প্রজা মৃত্যু বরণ করছে দেখে গালব/গাথি ও অনুশোচনায় একটি অগ্নিকুণ্ডে আত্মত্যাগ করেন।

এই ভাবে প্রাণ ত্যাগের পর গাথির আবার সব মনে পড়ে; তিনি এখানে স্নান করতে এসেছিলেন মাত্র। সমস্ত ঘটনা কিন্তু গাথির মনে থাকে; কোন নাটকের নায়কের মত যেন পর পর অভিনয় করেছিলেন। অথচ অভিনয় নয়;

জীবনে এগুলি সত্যই তাঁর ঘটে গিয়েছিল। গাথি তারপর কৌতূহলে কীরমণ্ডল নগরীতে গিয়ে যাচাই করে আসেন প্রতিটি ঘটনা বাস্তব; একটুও স্বপ্ন নয়। গাথি তখন বুঝতে পারেন বিষ্ণুর বরে মায়াকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। এর পর গাথি সব কিছু ত্যাগ করে এক গুহাতে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন।

গাদি—কামসূত্রে লবনবীথিকা নামে খেলাটির অনুরূপ খেলা।

গাধি—অন্য নাম গাধিরাজ। দুষ্মন্ত (১)—ভরত (২)—অজমীঢ় (৫)—বলাকাশ্ব (৭) কুশিক (৮)—গাধি (৯)। কুশ (দ্র)। কুশনাভের ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে এক শত মেয়ে হয়। পরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে, অন্য মতে ইন্দ্রের কাছে পুত্র প্রার্থনা করলে ইন্দ্র নিজে গাধি রূপে জন্মান। গাধি যখন বনে তপস্যা করছিলেন তখন গাধির সত্যবতী নামে একটি মেয়ে হয়। ঋচীকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার পর গাধির ছেলে বিশ্বামিত্র (দ্রঃ) জন্মান। বিশ্বামিত্রকে রাজা করে দিয়ে গাধি বনে তপস্যা করতে যান। বনে ঋচীকের আশ্রমে বহু দিন ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সমাধি লাভ করে স্বর্গে যান।

গাধিনগর—কান্যকুব্জের আর এক নাম।

গান্ধিনী—কাশীরাজ কন্যা; শ্বফল্কের স্ত্রী। দ্রঃ গান্ধিনী।

গান্ধার—প্রাচীন ভারতে ভরত মুনির কাল পর্যন্ত যে শ্রেষ্ঠ সংগীত প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে রাগ সংগীতের জন্ম হয় এবং রাগ সংগীতের শ্রেষ্ঠ পদগুলি গান্ধারের সঙ্গে মিশে মার্গ সংগীত নামে পরিচিত। ভরত মুনি কৃত সংজ্ঞা :-তন্ত্রী বাদ্যের অন্তর্গত অপরাপর বাদ্য সমাশ্রিত স্বর, তাল ও পদযুক্ত রচনা। এই রচনা দেবতাদের বিশেষ প্রার্থিত এবং গন্ধর্বদের প্রীতিকর। এই গান্ধারে বীণার প্রাধান্য থাকলেও কণ্ঠ সংগীত ও যোজিত হত।

গান্ধার/গন্ধার—সিন্ধু নদের পশ্চিম তীর থেকে আফগানিস্তানের অধিকাংশ। বর্তমানের কান্দাহার প্রাচীন গান্ধার নগরী। অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতের সঙ্গে নানা ভাবে যুক্ত। ঋক্ বেদে (১।১২৬।৭) অথর্ব বেদে (৫।২২।১৪) গান্ধারের উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে গান্ধার রাজ নগ্নজিৎ ও ঐ বংশের স্বর্জিতের কাহিনী আছে। ছান্দোগ্যে এই দেশ ও এখানকার অধিবাসীদের আলোচনা আছে। যযাতি ও শর্মিষ্ঠার ছেলে দ্রুহ্যু; দ্রুহ্যুর প্রপৌত্র গন্ধার এবং এর থেকে এই দেশের নাম গান্ধার। বায়ু পুরাণে গন্ধারের পিতা অরুদ্ধ; মৎস্য পুরাণে শরদ্বাজ ও বিষ্ণু পুরাণে সেতুর পৌত্র গন্ধার। ভাগবত ছাড়া অন্য পুরাণে দ্রুহ্যুর ছেলে সেতু। আর এক মতে যযাতি(১)—তুর্বসু(২)—দুষ্যন্ত(১০)—বরূথ (১১)—গাণ্ডীর(১২)—গান্ধার(১৩)। গান্ধার, কেরল, চোল, কোল ও পাণ্ড্য এঁরা ভাই। গান্ধারের এক রাজা সুবলের ছেলে শকুনি, মেয়ে ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী। অভিমন্যুর নাতি জনমেজয় গান্ধারে তক্ষশীলা জয় করেন। গান্ধারের কাছে কেকয় দেশের রাজকন্যা কৈকেয়ী ভরতের মা। রাম রাজা হলে কেকয়রাজ যুধাজিৎ রামকে গান্ধার জয় করতে বলেন ফলে রাম ভরতকে দিয়ে জয় করান। ভরতের ছেলে পুষ্কর ও তক্ষ, এদের নাম অনুসারে গান্ধারে এঁদের রাজধানী হয় পুষ্করাবতী ও তক্ষশীলা।

গান্ধারে সালাতুরে (৬০০ খৃ-পূ মত) পাণিনি জন্মান। খৃ-পূ ৬ শতকের প্রথমার্ধে গান্ধার ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম ছিল। ৬ শতকের শেষার্ধে গান্ধার

পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আলেকজান্দারের আক্রমণ কালে উত্তর পশ্চিম ভারত, পুষ্কলাবতী, তক্ষশীলা, গান্ধার ইত্যাদি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এর পরে এগুলি মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীন হয়। অশোকের রাজত্বকালে (২৭৩-২৩২ খৃ-পূ) গান্ধারের সীমা ছিল সিন্ধু নদের পশ্চিম পর্যন্ত; তক্ষশীলা তখন গান্ধারের অন্তর্গত ছিল না। সে যুগে গান্ধারের সীমানা ছিল উত্তরে সোয়াত ও বুনের-এর পাহাড়। দক্ষিণে কালবাগের পাহাড়, পূর্বে সিন্ধু এবং পশ্চিমে লমঘান ও জালালাবাদ। পূর্ব সীমা অনেক সময় আরো এগিয়ে আসত এবং পাঞ্জাবের রাওলপিণ্ডি জেলাও এক সময় গান্ধারের অন্তর্গত ছিল। গান্ধারের রাজধানী হিসাবে তিনটি নগরী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল: পুষ্কলাবতী (পেশোয়ারের ২৭ কি-মি, উত্তর পূর্বে চারসাদা ও প্রাঙ্গা), পুরুষপুর (পেশোয়ার) ও তক্ষশীলা। প্রথম দুটি সিন্ধু নদের পশ্চিমে; তক্ষশীলা পূর্বে। সম্ভবত অশোকের সময় এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হয়। ভারতের প্রবেশ পথে গান্ধার; ফলে বহু বিদেশী আক্রমণ এখানে হয়েছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পর ইন্দোগ্রীক, শক, পহ্লব ও কুষাণেরা এসেছিল। এই বিদেশীরা কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি দেখিয়ে ছিলেন এবং এই সময়ে এখানে বহু বৌদ্ধ সৌধ তৈরি হয়েছিল। ইন্দো-গ্রীক রাজা মেনান্দের বৌদ্ধ ধর্ম নিয়েছিলেন। থেওদোরুস নামে একজন গ্রীক সোয়াত উপত্যকায় বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের ওপর স্তূপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ক্ষত্রপ পুত্র শক-পতিক (খৃ-পূ ১-শতক) তক্ষশীলাতে শাক্য মুনির দেহাবশেষ প্রতিষ্ঠা ও সংঘারাম তৈরি করে দিয়েছিলেন। ফা-হিয়েন ও সুংযুন্ (৬ শতকের প্রথমপাদে) ও হিউ-এন-ৎসাঙ (৭ শতকের মধ্য ভাগে) এই তিন জনেই বলেছেন মহারাজ কনিষ্ক তাঁর রাজধানী পুরুষপুরে ভারতের উচ্চতম স্তূপ তৈরি করেছিলেন। ফা-হিয়েন এসেছিলেন একটি সমৃদ্ধ দেশে এবং বহু বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান দেখেছিলেন। হিউ-এন-ৎসাঙ ও বহু বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান দেখেছিলেন কিন্তু গান্ধারের রাজপরিবার তখন লুপ্ত; দেশ কপিশির (কাফিরিস্তান) অধীন, নগর ও গ্রাম জনহীন, বৌদ্ধদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। অধিবাসীরা বেশির ভাগ ভিন্ন ধর্মী। জনগণ সাহিত্য অনুরাগী। প্রায় সহস্র সংঘারাম তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত ও লোকশূন্য; অবৌদ্ধ মন্দির সংখ্যা ১০০ মত। এদের মধ্যে পো-লু-ষের উত্তর পূর্বে একটি উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে মহাদেবের মন্দির ও মহাদেবের স্ত্রী ভীমা দেবীর অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মূর্তিরও উল্লেখ করেছেন। এই ভীমা দেবী পর্বতই সম্ভবত মহাভারতের ভীমাস্থান। হিউ-এন-ৎসাঙ এ দেশের পূর্বতন শাস্ত্রকারদের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করতেন যেমন: নারায়ণদেব, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, ধর্মত্রাতা, মনোরথ ও পার্শ্ব।

আফগানিস্তান ও মধ্য এসিয়াতে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের মূলে বিদেশী রাজাদের পৃষ্টপোষকতায় গান্ধারের অবদান অপরিসীম। এখানে প্রচুর বৌদ্ধ প্রত্নকীর্তি রয়েছে এবং এগুলি মোটামুটি খৃ ১-৫ শতকে নির্মিত। জালালাবাদ, হাড্ডা, বামিয়ান, পেশোয়ার, তখৎ-হি-বাহি, সাহরিবাহ্‌লোল, জামালগড়ি, তক্ষশীলা, মানিকিয়ালা প্রত্নকীর্তিতে সমৃদ্ধ; বামিয়ান-এ গুহাচিত্র ও অতিকায় বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। একটি মূর্তির উচ্চতা ৫১ মিটার।

নানা রীতি এসে মিশে গান্ধারের এক অভুতপূর্ব শিল্পকলা গড়ে তুলেছিল।

এখানকার বুদ্ধ প্রতিমা বাহ্যত যবনরীতি অনুগ; কিন্তু তবুও এতে ভারতীয় ভাবাদর্শ অনুযায়ী মহাপুরুষের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান। কোন কোন পণ্ডিতের মতে গান্ধারেই প্রথম বুদ্ধমূর্তি তৈরি হয়েছিল। সুদীর্ঘ ৪-শত বছর ধরে গান্ধার পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে বুদ্ধের জন্ম থেকে মহানির্বাণ পর্যন্ত ঘটনাগুলিকে অজস্র ভাস্কর্যে রূপ দিয়েছে। উপজীব্য ঘটনা কখনও সত্য কখনও কিংবদন্তি। জাতক কাহিনীর চেয়ে বুদ্ধদেবের জীবন কাহিনী গান্ধারকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। অবশ্য মৈত্রেয় প্রমুখ কয়েক জন বোধিসত্ত্ব, হারিতী ও তাঁর স্বামী পাঞ্চিকও কোথাও কোথাও শিল্পের কিছু উপজীব্য হয়েছেন।

এখানে স্তূপ ছিল মুখ্য উপাস্য। বর্তমানে সামান্য কিছু স্তূপ বাদে অধিকাংশ স্তূপগুলিরই কেবল নিম্নাংশ পড়ে আছে। স্তূপ অর্ধগোলক বা স্তম্ভের আকার দু রকম হত। স্তূপের গা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উপস্তম্ভ, বুদ্ধপ্রতিমা ও অন্যান্য মূর্তি দিয়ে অলংকৃত। বেশির ভাগ মুখ্য স্তূপের পাশে ছোট ছোট গৌণ দেবায়তন রয়েছে। প্রতি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানে এক বা একাধিক স্তূপ এবং সংঘারাম ছিল। একাধিক তল বিশিষ্ট সংঘারামও ছিল। এখানকার সংঘারামগুলির বিন্যাস রীতি মোটামুটি ভারতীয় সংঘারামগুলির মত।

গান্ধারী—গান্ধার (দ্র) দেশের রাজা সুবলের মেয়ে; ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী। দেশের নাম অনুসারে নাম। গান্ধারীর ভাই শকুনি, বৃষক, অচল। গান্ধারী শৈশব থেকে শিব ভক্ত এবং বর পান এক শত ছেলে হবে। ভীষ্ম এই বরের কথা জানতে পেরে রাজা সুবলের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান এবং শকুনি বোনকে হস্তিনাপুরে নিয়ে আসেন এবং এই খানেই বিয়ে হয়। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলে গান্ধারী বিয়ের পর চোখে কাপড় বেঁধে অন্ধ হয়ে থাকতেন। ক্ষুধায় কাতর ব্যাসকে খাইয়ে তৃপ্ত করে ব্যাসের কাছেও ১০০ ছেলে হবে বর পান। গর্ভবতী হয়ে দু বছরেও কোন সন্তান না হওয়াতে এবং কুন্তীর ছেলে হবার সংবাদে ঈর্ষায় গর্ভকে ভৎর্সনা করেন বা স্বামীকে না জানিয়ে গর্ভপাত করেন। একটি মাংস পিণ্ড প্রসব হওয়াতে গান্ধারী ফেলে দিচ্ছিলেন। কিন্তু ব্যাসদেবের পরামর্শে এটিকে ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে একশ-এক ভ্রূণে ভাগ করে ঘি র কলসী করে রেখে দিলেন। এর এক বছর পরে দুর্যোধন এবং এক বছর এক মাসের মধ্যে অন্য ৯৯-টি ছেলে ও দুঃশলা নামে একটি মেয়ে হয়। এদের নাম :—অনুবিন্দ, অয়োবাহু, অনুদার, অপরাজিত অনোলুপ, অভয়, অনাধৃষ্য, অপ্রমাথী, আদিত্যকেতু, উগ্রায়ুধ॥ উগ্রশ্রবস্, উগ্রসেন, উগ্রশায়ী, উপচিত্র, উপানন্দ, ঊর্ণনাভ, কবচী, কাঞ্চনধ্বজ, কর্ণ, কুণ্ডোদর, কুণ্ডভেদী, কুণ্ডশায়ী কুণ্ডাশী, কুণ্ডী, ক্রথন, চারুচিত্র, চিত্র, চিত্রবান, চিত্রকুণ্ডল, চিত্রচাপ,॥ চিত্রবর্মা, চিত্রাক্ষ, চিত্রাঙ্গ, চিত্রায়ুধ, জলগন্ধ, জরাসন্ধ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুর্দ্ধর্ষ.॥ দুষ্প্রধর্ষ, দুর্মর্ষণ, দুর্মুখ, দুষ্কর্ণ, দুর্মদ, দুর্বিগাহ, দুর্বিমোচন, দুষ্পরাজয়, দুরাধার, দুঃশল॥ দীর্ঘরোম, দীর্ঘবাহু, দৃঢ়বর্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, দৃঢ়সন্ধ, দৃঢ়কর্মা, দৃঢ়হস্ত, দৃঢ়রথাশ্রয়, ধনুর্ধর, নন্দ॥ নাগদন্ত, নিষঙ্গী, পাশী, প্রমথ, বলবর্দ্ধন, বালকী, বিন্দ, বিকর্ণ, বিবিৎসু, বিকটানন.॥ বিশালাক্ষ, বৃন্দারক, বাতবেগ, বহ্বাশী, বিরজস্, বিরাবী, বীরবাহু, ভীমবেগ, ভীমবল, ভীমবিক্রম॥ মহাবাহু, মহোদর, শল, শরাসন, যম, সহ, সত্ত্ব, সত্যসন্ধ, সদাসুবাক, সুবাহু॥ সুলোচন,

সুনাভ, সুবর্মা, সুষেণ, সোমকীর্তি, সুহস্ত, সুবর্চস, সুবর্মা, সুবীর্যবান, সেনানী।

পাশা খেলায় জয়লাভ করে দ্রৌপদীকে সভামধ্যে অপমান করলে গান্ধারী একাধিক বার স্বামীর কাছে দুর্যোধনকে ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। অজ্ঞাত বাসের পর সন্ধি স্থাপনের জন্য পাণ্ডবরা দূত পাঠালে তখনও গান্ধারী রাজ সভায় এসে দুর্যোধনকে তিরস্কার করে বলেছিলেন ধর্মহীন ঐশ্বর্যের পরিণাম মৃত্যু। ফলে দুর্যোধন অবজ্ঞায় সভা ত্যাগ করেন। দুর্যোধনকে প্রশ্রয় দেবার জন্য স্বামীকে তিনি সকলের সামনে দায়ী করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আরম্ভের আগে দুর্যোধন মার কাছে আশীর্বাদ চাইতে এলে গান্ধারী বলেছিলেন ধর্ম যেখানে সেখানে জয়। যুদ্ধের পর কৃষ্ণ সান্ত্বনা দিতে আসেন। গান্ধারী তার পর স্বামী ও পুত্রবধূদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন এবং পাণ্ডবদের শাপ দিতে উদ্যত হন। ব্যাসদেব গান্ধারীকে তখন শান্ত করেন এবং ভীম ক্ষমা চান। গান্ধারী তখন রাগে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করতে চান। যুধিষ্ঠির এগিয়ে এসে সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নিয়ে অভিশপ্ত হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গান্ধারীর পায়ে হাত দিলে চোখে বাঁধা কাপড়ের ফাঁক দিয়ে গান্ধারী যুধিষ্ঠিরের পায়ের আঙুলের মাথার দিক দেখতে পান। ফলে যুধিষ্ঠিরের আঙুলগুলি কালো কুৎসিত হয়ে ওঠে। যুদ্ধ বন্ধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণ তা করেন নি এই জন্য গান্ধারী কৃষ্ণকে শাপ দেন ছত্রিশ বছর পরে আত্মীয় স্বজন হারিয়ে বনের মধ্যে কৃষ্ণকে নিকৃষ্ট ভাবে নিহত হতে হবে এবং যাদব নারীরাও কুরু-নারীদের মত হাহাকার করবে।

পাণ্ডবরা রাজা হবার পর গান্ধারীরা ১৫ বছর পাণ্ডবদের কাছেই ছিলেন। সকলেই গান্ধারীকে শ্রদ্ধা করত। এর পর পাণ্ডবদের মত নিয়ে গঙ্গাতীরে রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে ধৃতরাষ্ট্র বাণপ্রস্থে চলে যান। সঙ্গে গান্ধারী; কুন্তী, বিদুর ও বহু কৌরব রমণীও গিয়েছিলেন। পাণ্ডবরা এক দিন কুন্তীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন পথে ব্যাসদেবও এঁদের সঙ্গী হন। ধৃতরাষ্ট্রের শোক লাঘব করার জন্য গান্ধারীর অনুরোধে ব্যাসদেব তপোবনে কুরুক্ষেত্রে নিহত সমস্ত যোদ্ধাদের এক দিনের জন্য পুনর্জীবিত করে সকলকে দেখান। ধৃতরাষ্ট্র সাময়িক ভাবে দৃষ্টি ফিরে পেয়ে এঁদের দেখেন। বন বাসে গান্ধারী কেবল মাত্র জল খেয়ে তপস্যা করতেন। বাণ-প্রস্থের তৃতীয় বৎসরে এঁরা বনের মধ্যে গিয়ে বাস করতে থাকেন। বনে এক দিন অন্য মতে ব্যাসের কৃপায় আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা হবার দুদিন পরে, হঠাৎ দাবানল জলে উঠলে ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী ইত্যাদি পূর্বাস্য হয়ে বসে প্রাণ বিসর্জন করেন। গান্ধারী কুবের লোক প্রাপ্ত হন। (২) অজমীঢ়ের স্ত্রীর নামও গান্ধারী।

গান্ধারী—ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশের প্রাকৃতের নাম। এই ভাষার যাবতীয় নিদর্শন খরোষ্ঠী লিপিতে। অশোকের শাহ্‌বাজগড়ি ও মনসেরা শিলালিপি, ইন্দো-গ্রীক রাজাদের ও শক-ক্ষত্রপদের কিছু অনুশাসন, মধ্য এসিয়া থেকে প্রাপ্ত ধর্মপাদ ও অন্যান্য গ্রন্থ এবং কাঠ, চামড়া বা রেশমের ওপর কিছু দলিল এই গান্ধারী প্রাকৃতে লেখা।

গান্দিনী—কাশীরাজের মেয়ে। শ্বফল্কের স্ত্রী ও অক্রূরের মা। হরিবংশে এঁর নাম নিরুক্তি। ব্রাহ্মণদের রোজ ইনি গোদান করতেন বলে নাম গান্দিনী। বহু বছর

ইনি মায়ের পেটে ছিলেন ; শেষকালে এঁর বাবা এঁকে শীঘ্র ভূমিষ্ঠ হতে বলেন। মেয়ে তখন জানান প্রতি দিন গোদান করতে পেলে তিনি জন্মাবেন। পিতা এই কথা স্বীকার করলে গান্ধিনী জন্মান।

গায়ত্রী—(১) বৈদিক ছন্দ। (২) সূর্যের ঘোড়া। (৩) বেদের কয়েকটি শ্লোক। ঋক্‌বেদে (৩।৬২।১০) শ্লোকটিকে গায়ত্রী বলা হয়। শ্লোকটি :—ওঁ ভূর্ভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধীয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। এটির অন্য নাম সবিতা মন্ত্র। এর অর্থ সর্বলোক প্রকাশক সর্বব্যাপী সেই সবিতা মণ্ডল জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি ; যিনি আমাদের সকল বুদ্ধিবৃত্তি দিয়েছেন।

দেবীরূপী এই গায়ত্রী ব্রহ্মার স্ত্রী ও চতুর্বেদের জননী। গায়ত্রীর ধ্যানে আছে ইনি সূর্যমণ্ডল মধ্যস্থা, ব্রহ্মরূপা, বিষ্ণুরূপা বা শিবরূপা, হংসস্থিতা, বা গরুড়াসনা, বা বৃষবাহনা। গায়ত্রী একাধারে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এবং তিন বেদ। দ্বিজগণের উপাস্য মন্ত্র এই গায়ত্রী। সকালে, দুপুরে ও সন্ধ্যায় এই মন্ত্রে সবিতাকে ধ্যান করতে হয়। যাঁরা এই মন্ত্র গান বা পাঠ করেন তাঁরা মুক্তি পান এই জন্য এই মন্ত্রের নাম গায়ত্রী :-গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা। বেদজ্ঞ আচার্যের কাছে এই মন্ত্রে দীক্ষিত হলে তখন পুনর্জন্ম হয় বা দ্বিজপদবাচ্য হয়। বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্রের অনুকরণে বিভিন্ন দেবতার গায়ত্রী মন্ত্র রয়েছে। যেমন নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি, তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ বা শ্রীমদ্দক্ষিণাকালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ বা পশুপাশায় বিদ্মহে ইত্যাদি ইত্যাদি। তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে তান্ত্রিক গায়ত্রী জপের ব্যবস্থা আছে।

ব্রহ্মার যজ্ঞে সমস্ত যখন প্রস্তুত তখন ব্রহ্মার স্ত্রী সাবিত্রী একা যজ্ঞ স্থলে আসতে রাজি হন না। লক্ষ্মী, সতী ইত্যাদি সকলে এলে তিনি এক সঙ্গে আসবেন ; যজ্ঞ কিছু ক্ষণের জন্য বন্ধ থাকুক বলে পাঠান। ব্রহ্মা তখন কুপিত হয়ে অন্য কোন নারীকে তাঁর পত্নী হিসাবে নিয়ে আসতে বলেন যাতে যজ্ঞের শুভ মুহূর্ত যেন চলে না যায়। ইন্দ্র তখন বার হয়ে পড়েন এবং সুরূপা, সুভাষা, চারুলোচনা এক আভীর কন্যাকে পথে বসে দুধ ইত্যাদি গোরস বিক্রি করছে দেখতে পান। ইন্দ্র এঁকে জোর করে ধরে নিয়ে আসেন এবং বিষ্ণুর অনুরোধে ব্রহ্মা (দ্র) এঁকে গন্ধর্ব মতে বিয়ে করে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করেন। ইনিই গায়ত্রী।

গার্গী—বা গার্গীবাচক্নবী। বৈদিক যুগে এক জন বিদুষী ঋষি কন্যা। গর্গ মুনির মেয়ে। বেদের বহু মন্ত্রের রচয়িতা। আজীবন ব্রহ্মচারিণী ছিলেন এবং শাস্ত্রচর্চা করতেন। ঋক্ বেদের গৃহ্যসূত্রে আছে ব্রহ্মযজ্ঞ করার সময় এঁকেও শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। জনক রাজা মিথিলায় এক যজ্ঞ করে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের নিয়ে আসেন। যজ্ঞ শেষে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ ও বেদজ্ঞ কে জানবার ইচ্ছায় এবং দক্ষিণা দেবার জন্য ঘোষণা করেন যিনি শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মিষ্ঠ তিনি দানের এক হাজার গরু নিতে পারেন ; এগুলির শিঙ সোনা দিয়ে বাঁধান। যাজ্ঞবল্ক্য তখন এই দান নিতে যান। রাজ-পুরোহিত অশ্বল ইত্যাদি তখন যাজ্ঞবল্ক্যকে পরীক্ষা করতে চান ; কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য

অনায়াসে জয়ী হন। এর পর গার্গী এগিয়ে এসে প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্যকে জর্জরিত করে তোলেন। বৈদিক অনুশাসন লঙ্ঘন করে উত্তেজনায় গার্গী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রশ্ন করতে থাকেন। যাজ্ঞবল্ক্য তখন গার্গীকে থামতে বলেন নতুবা বেদ বিধি অনুসারে গার্গীর মাথা খসে পড়বে। এর পরেও গার্গী দুটি প্রশ্ন করেন। তার একটি প্রশ্ন আকাশ কি কারণে ওতপ্রোত হয়ে আছে। এর উত্তর যাজ্ঞবল্ক্য সঠিক দিতে পারেন। দু জনের পাণ্ডিত্য দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়ে যান এবং গার্গী নিজেও যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন।

গার্গ্য—মহর্ষি। অন্ধক ও বৃষ্ণিদের গুরু। বৃষ্ণি বংশেই বিয়ে করেন। ব্রহ্মচারী; স্ত্রী সহবাস কবতেন না। ফলে গার্গ্য ঊর্দ্ধরেতা হয়েছিলেন। এক বার এক শালা গার্গ্যের পুরুষত্ব পরীক্ষা করবার জন্য বীর্যপাত হয় কিনা প্রমাণ চান। কিন্তু ঊর্দ্ধরেতা বলে বীর্যপাত হয় না এবং নপুংসক বলে অপবাদ রটে যায়। গার্গ্য তখন রেগে গিয়ে লোহা চুর খেয়ে বারো বছর মহাদেবের তপস্যা করে বর পান যে অন্ধক ও বৃষ্ণি ধ্বংসকারী তাঁর এক অজেয় ছেলে হবে। এক জন যবন রাজা এই বর লাভের কথা জানতে পেরে গোপালী নামে এক অপ্সরাকে তাঁর সঙ্গে মিলিত করে দেন। গোপালীর গর্ভে কালযবন (দ্র) জন্মায় এবং যবন রাজের মৃত্যু হলে রাজা হন। (২) বিশ্বামিত্রের এক ছেলে। (৩) ত্রিজট নামে মুনি। এঁর বহু সন্তান হয়েছিল। ইনি যখন পুত্র পরিবার নিয়ে বনে বাস করছিলেন তখন রামচন্দ্র বনে যাবার প্রাক্কালে বহু ব্রাহ্মণকে সাধ্য মত দান করছিলেন। গার্গ্যের স্ত্রী খবর পেয়ে স্বামীকে তৎক্ষণাৎ রামের কাছে পাঠিয়ে দেন। যমুনার তীরে কিছু গরু চরছিল, রামচন্দ্র এই গরুগুলি এঁকে দান করেন। (৩) বেদের এক শাখার প্রবর্তক এক জন ঋষি। দ্র ব্যাস।

গালব—বিশ্বামিত্রের প্রিয় শিষ্য। অন্য মতে ছেলে। ত্রিশঙ্কুর (দ্র) কারণে যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় তখন বিশ্বামিত্র কৌশিকী নদীর তীরে তপস্যা করছিলেন। বি- । মিত্রের পরিবারে সকলে বিশেষ বিপন্ন হয়ে পড়লে বিশ্বামিত্রের স্ত্রী তিনটি ছেলেকে নিয়ে ভীষণ চিন্তায় পড়েন এবং মেজ ছেলেটিকে গলায় কুশের/দর্ভ ঘাসের দড়ি বেঁধে বিক্রি করবার জন্য বাজারে নিয়ে যান; এই জন্য নাম হয় গালব। একে বিক্রি করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন। মা ও ছেলে দু জনেই কাঁদছিলেন। ত্রিশঙ্কু দেখতে পান; সব শুনে বিক্রি করতে নিষেধ করেন এবং বিশ্বামিত্র না ফেরা পর্যন্ত প্রতিদিন এঁদের সকলের আহারের ব্যবস্থা করবেন প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতি দিন মৃগয়া করে আশ্রমে একটি গাছে এই মাংস ঝুলিয়ে রেখে আসবেন কথা দেন।

শিক্ষা শেষে বিশ্বামিত্রকে গালব গুরুদক্ষিণা নেবার জন্য বার বার অনুরোধ করলে বিশ্বামিত্র রেগে গিয়ে চাঁদের মত সাদা এবং একটি কাণ শ্যামবর্ণ এই রকম আটশত ঘোড়া চান। গালব চিন্তিত হয়ে বিষ্ণুর আরাধনা করতে থাকেন এবং সারা দেশ ঘুরে বেড়ান। এই সময় গালবের বাল্য বন্ধু গরুড় (দ্র) এসে পরামর্শ দিয়ে যযাতির কাছে পৌঁছে দেন। কিন্তু রাজা যযাতির সামর্থ্য ছিল না। যযাতি ঘোড়ার বদলে নিজের মেয়ে মাধবীকে দান করেন এবং বলে দেন যে কোন রাজার হাতে এই মাধবীকে শুল্ক হিসাবে দিলে সেই রাজা গালবকে আট শত ঘোড়া দিয়ে দেবেন। গালব তখন সন্তানার্থী অযোধ্যারাজ হর্যশ্বের কাছে যান। রাজা শুল্ক হিসাবে মাত্র

দুশো ঘোড়া আছে দেবেন বলেন। মাধবী তখন গালবকে জানান এক মুনির বর আছে প্রতি বারে সন্তান হবার পর আবার তিনি কুমারী হয়ে যাবেন। সুতরাং গালব ক্রমান্বয়ে চার জন রাজার হাতে মাধবীকে দিয়ে আটশো ঘোড়া সংগ্রহ করতে পারেন। এবং ফলে মাধবীরও চারটি ছেলে হবে। গালব তখন হর্যশ্বের কাছ থেকে দুশো ঘোড়া নেন। হর্যশ্বের ছেলে হয় বসুমনা। এর পর ক্রমান্বয়ে গালব মাধবীকে কাশীরাজ দিবোদাস (ছেলে হয় প্রতর্দন) এবং ভোজরাজ উশীনরের (ছেলে হয় শিবি) হাতে দেন। এর পর গরুড় এসে জানান আর ঘোড়া পাওয়া যাবে না। কারণ এই রকম এক হাজার ঘোড়া ঋচীক বরুণের কাছে পেয়েছিলেন এবং কান্যকুব্জরাজ গাধিকে দিয়ে গাধির মেয়ে সত্যবতীকে বিয়ে করেন। গাধি এই সব ঘোড়া ব্রাহ্মণদের দান করেন এবং ব্রহ্মাণদের কাছ থেকে হর্যশ্ব, দিবোদাস ও উশীনর দুশো করে ঘোড়া কিনে নিয়েছিলেন। বাকি ৪০০ ঘোড়া চুরি গেছে। এর ফলে উপায়ন্তর কোন কিছু না পেয়ে গালব তখন বিশ্বামিত্রকে ৬০০ ঘোড়া ও বাকি ২০০ ঘোড়ার বদলে মাধবীকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন; বিশ্বামিত্র মাধবীর চতুর্থ পুত্রের জনক হতে পারেন। বিশ্বামিত্র স্বীকৃত হন; ছেলে হয় অষ্টক। পরে বিশ্বামিত্র এই ছেলেকে ধর্ম অর্থ ও ঘোড়াগুলি দিয়ে এবং মাধবীকে গালবের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বনে চলে যান তপস্যা করতে।

গালব যেখানে আশ্রমে তপস্য করতেন সেখানে অসুর পাতালকেতু তাঁকে নিয়মিত উৎপীড়ন করছিলেন। মুনি এক দিন হতাশ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন; সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে একটি ঘোড়া নেমে আসে, (দ্রঃ বিভাবসু) এবং দৈববাণী হয় ঘোড়াটি দিনে হাজার যোজন যেতে পারবে। মুনি ঘোড়াটিকে কুবলাশ্বের (দ্রঃ) হাতে তুলে দেন।

গালব এক দিন নদীতে স্নান করছিলেন এমন সময় আকাশ পথে চিত্রসেন যাবার সময় থুথু ফেলেন। গালবের পূজার দ্রব্যে এই থুথু এসে পড়লে গালব কৃষ্ণের কাছে অভিযোগ করেন এবং কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দেন সূর্যাস্তের আগেই চিত্রসেনের মাথা এনে দেবেন। নারদ এই কথা তৎক্ষণাৎ চিত্রসেনকে জানিয়ে আসেন এবং বলে আসেন চিত্রসেনের স্ত্রী সন্ধ্যা ও বলী সুভদ্রার কাছে শরণ নিক। চিত্রসেন স্ত্রী দু জনকে নিয়ে সুভদ্রার প্রাসাদের সামনে এসে একটি অগ্নিকুণ্ড করে নিজে আত্মবিসর্জন করতে যান এবং সন্ধ্যা ও বলী কাঁদতে থাকেন। অর্জুন তখন প্রাসাদে ছিলেন না। সুভদ্রা প্রাসাদ থেকে বার হয়ে আসেন এবং সন্ধ্যা ও বলী সুভদ্রার কাছে মঙ্গল ভিক্ষা বর চান। এই বরে সুখী দম্পতী জীবন কাটান যাবে। সুভদ্রা বর দেবার পর ওদের সব কাহিনী শুনতে পান। ইতি মধ্যে কৃষ্ণ ও অর্জুনও এসে পড়েন। কৃষ্ণ চিত্রসেনকে আক্রমণ করতে গেলে অর্জুন বাধা দেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়; পৃথিবী ধ্বংস হতে যায়। সুভদ্রা তখন নিজে এসে যুদ্ধ থামান। কৃষ্ণ চিত্রসেনকে গালবের পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতে বলেন এবং গালবও ক্ষমা করেন। গালব নিজের পুণ্যের অষ্টমাংশ যযাতিকে দান করেছিলেন। রাজা প্রতীপের গাঢ় বন্ধু ছিলেন এই গালব। যুধিষ্ঠিরের এক জন সভাসদ। অগস্ত্যের পদ্মচুরি করার দলে ইনি ছিলেন না। গালবের স্ত্রী সুভদ্র; ছেলে প্রাকৃশৃঙ্গবান অন্য মতে শৃঙ্গব। শৃঙ্গবের স্ত্রী বৃদ্ধকন্যা।

গিরনার—২১°৩১´ উ × ৭০° ৪২ পূ। গুজরাটে জুনাগড় সহরের ১৬ কি-মি পূর্বে একটি গিরিতীর্থ। বৃহৎ সংহিতার এর নাম গিরিনগর। মহাভারতে পুণ্যগিরি বা উজ্জয়ন্তী। অনেকের মতে প্রাচীন রৈবতক। অন্যান্য নাম পুষ্পগিরি, বৈজয়ন্ত, গিরিবর। স্কন্দপুরাণে এই অঞ্চল শিবের পর্যটন ক্ষেত্রের অন্তর্গত। কিংবদন্তি কৃষ্ণের সময়ে যাদবদের ক্রীড়াভূমি ছিল এবং বলরাম এখানে দ্বিবিদকে বধ করেন। ঐতিহাসিক কালে ক্রমিক নতুন নাম মণিপুর, চন্দ্রকেতুপুর, রৈবতনগর, পুরাতনপুর।

৫ শতকে স্থানীয় শাসক চক্রপালিত গিরিনগরে চক্রভৃতের (বিষ্ণু) একটি মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন। মন্দিরটি অধুনা লুপ্ত। গিরনার পাহাড় জৈনদের তীর্থস্থান। পাহাড়ের মাথায় অনেকগুলি মন্দির আছে। এগুলির মধ্যে নেমিনাথ (১০৯৪-১১৪৪ খৃঃ) ও বস্তু পালের (১২৩১ খৃ) মন্দির উল্লেখ যোগ্য। পুরাণে এই পাহাড়ে ২১টি শিখরের উল্লেখ আছে। বর্তমানের উল্লেখ যোগ্য প্রথম শিখর অম্বাদেবী। ইনি গিরনারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ১২-শ শতকে তৈরি অম্বাদেবীর মন্দির এখানে উপস্থিত সবচেয়ে প্রাচীন হিন্দু মন্দির; একান্ন পীঠের একটি। এখানে সতীর উদরদেশ পড়েছিল। গোরখনাথ সব চেয়ে উঁচু চূড়া (১১১৭ মি); শিখর মন্দিরটি কানফাটা যোগী সম্প্রদায়ের আদি গুরু শিবভক্ত গোরক্ষনাথের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। গুরু দত্তাত্রেয় শিখর মন্দিরে দত্তাত্রেয়-র পায়ের ছাপ ও একটি বড় ঘণ্টা আছে। নেমি-নাথ শিখরে সিঁড়ি বা মন্দির নাই; কেবল কালো পাথরে নেমি-নাথের মূর্তি আছে। মহাকালী শিখর স্থানীয় পাহাড়ী জাতি অঘোরীদের প্রিয় জায়গা। এ ছাড়া এখানে গোমুখী, হনুমানধারা ও কমণ্ডলু কুণ্ড নামে তিনটি কুণ্ড আছে। পাহাড়ের উত্তরতম প্রান্তে আছে ভৈরব ঝম্প; এখান থেকে লোকে আত্মহত্যা করত।

গিরনারের কাছেই প্রত্নকীর্তির ধ্বংসাবশের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে জুনাগড়ে উপরকোট ও বাবা পিয়ারা নামে জৈন শৈলখাত গুহারাজি (খৃ ১-৭ শতক) এবং ইণ্টোয়া (গিরনার পাহাড় থেকে প্রায় ৩ কি-মি উত্তরে) ও বোরিয়ার (গিরনার পাহাড় থেকে প্রায় ৩ কি-মি দক্ষিণে) অঞ্চলের ব্যাপক বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ। ইণ্টোয়াতে শক ক্ষত্রপ রুদ্রসেনের (১৯৯-২২২) নামানুসারে রুদ্রসেন বিহার নামে একটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।

গিরিকা—দ্রঃ উপরিচর বসু।

গিরিজা—দক্ষকন্যা সতী, পর জন্মে হিমালয় গিরির কন্যা পার্বতী।

গিরিব্রজ—রাজগৃহ। ধার্মিক কুশের (দ্রঃ) ছেলে বসু এই নগরী স্থাপন করেন। গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমে। বসুর ছেলে ভদ্ররথের ছেলে জরাসন্ধ। জরাসন্ধের সময় মগধের রাজধানী, অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বহু রাজাকে এখানে জরাসন্ধ বন্দী করে রেখেছিলেন। ধুন্ধুমার এইখানে এসে এক বার ঘুমিয়ে ছিলেন। মহা ১৩।৬।৩৯।

গিলগিট—৩৫°৫৫´ উ, ৭৪°২২´ পূ। কাশ্মীরে বহু হিমবাহ যুক্ত ও তুষারপূর্ণ স্থান। হুনজা ও গিলগিট নদীর সঙ্গমে অবস্থিত। অনেকগুলি গিরিপথ দিয়ে এখান থেকে মধ্য এসিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চলে। গিলগিটের ৩৮ কি-মি দক্ষিণে সিন্ধু নদ। অধিবাসী বর্তমানে অধিকাংশই মুসলমান। প্রাচীন কালে এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত

ছিল। মাটির নীচের একটি স্তূপের থেকে ভূর্জবল্কলে এবং কয়েকটি-মাত্র কাগজে লেখা পুঁথি পাওয়া গেছে। এগুলি খৃ ৬-শতকের এবং এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে গিলগিট পাণ্ডুলিপি। এই পুঁথিগুলির মধ্যে বহু সূত্র, প্রজ্ঞাপারমিতা, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক ও মূল সর্বাস্তিবাদের বিনয়পিটক বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধদেবের প্রস্তরমূর্তি স্তূপ ও অন্যান্য বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ গিলগিটের কাছে নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

গীতগোবিন্দ—দ্রঃ জয়দেব।

গীতবিদ্যাধর—এক গন্ধর্ব। গীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত। পুলস্ত্য মুনি গান ভালবাসতেন না; সেই জন্য মুনিকে বিরক্ত করার জন্য শূকরের মত মুখে শব্দ করতেন। ফলে মুনির শাপে শূকরে পরিণত হন। রাজা ইক্ষ্বাকুর হাতে মৃত্যু হলে শাপ মুক্ত হন।

গীতা—মহাভারতে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত একটি অধ্যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রথম অস্ত্র ধরবার আগের মুহূর্তে অর্জুন এই বিরাট আত্মীয় হত্যা যুদ্ধের জন্য বিমর্ষ হয়ে ভেঙে পড়লে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন সেই অংশ। সব সমেত ৭-শত শ্লোক, ফলে অপর নাম সপ্তশতী। গীতা পাঠে পুণ্য হয়; সম্প্রদায় ভেদে গীতার ব্যাখ্যা বিভিন্ন হয়েছে। এই গীতার আদর্শে শিবগীতা, রামগীতা, অনুগীতা ইত্যাদি নানা গীতা বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে পাওয়া যায়। গীতার ভাষ্যগুলির মধ্যে শংকর ভাষ্য অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ। শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা বৈষ্ণব সমাজে আদৃত। শংকরাচার্য সম্প্রদায়ের মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদ মিশিয়ে একটি প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা আছে। আকবরের অনেক আগে আরবিতে অনূদিত হয়েছিল। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষাতেই এর অনুবাদ পাওয়া যায়। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখে অর্জুনের স্তব বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়।

গীতাতে প্রধান শিক্ষার বিষয় ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। গীতার মধ্যে বেদ উপনিষদের আদর্শ এবং সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত ও ভাগবত দর্শনের চিন্তাধারা এসে মিশেছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সমাজের চিন্তার প্রায় সবটা এর মধ্যে রয়েছে। গীতাকে এই জন্য সমন্বয় গ্রন্থ বলা হয়। বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবও (?) কিছু আছে। কিন্তু মূলত উপনিষদভিত্তিক; বেদান্ত, তত্ত্ব ও ভক্তি এর বিষয় বস্তু।

গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্ব; এবং মায়া মোহাচ্ছন্ন সংসার পার হয়ে অভয় লোক পাবার পথ। অর্থাৎ সাধন ও সাধ্য দুটি জিনিসই গীতায় রয়েছে। এখানে বক্তব্য জীব স্বভাবতই পূর্ণ কিন্তু মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন বা পরিচ্ছিন্ন; ফলে কর্মফলাসক্তি। জীব পূর্ণতার স্বরূপ জানে না। ফলে কর্ম ও ভোগ চক্রের বন্ধনে সে নিপীড়িত। কর্মই সব দুঃখের মূল। কর্মের মূল অজ্ঞান। এক মাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানকে ধ্বংস করতে পারে সুতরাং, জ্ঞানই শরণ্য। কর্ম বন্ধন কি ভাবে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে এবং কি ভাবে এই বন্ধন ছিন্ন করা যায় গীতায় দেখান হয়েছে। আসক্তি থেকে কাম, কাম থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে মোহ, মোহ থেকে স্মৃতি-ও-বুদ্ধিনাশ এবং ফলে জীব ধ্বংস্ হয়। সুতরাং কর্মবন্ধন মুক্ত হতে হলে বুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। নিষ্কাম কর্ম ও জ্ঞানানুশীলন হচ্ছে কর্ম যজ্ঞ। কর্ম থেকে জ্ঞান ও জ্ঞান থেকে ভক্তি। এই তত্ত্ব বুদ্ধির ফলে জীব আত্মস্বরূপে স্থিত হয়ে পরমানন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। পুরুষোত্তম ঈশ্বর এই জগৎ প্রপঞ্চের আদি সনাতন বীজ। কর্মের

ভূমিতে ইনি বিধি রূপে, শক্তির ভূমিতে প্রকৃতি রূপে এবং জ্ঞানের ভূমিতে পুরুষোত্তম রূপে বিদ্যমান।

এই গীতাই ভারতের সমস্ত দুঃখের মূল কারণ। মানুষকে কর্ম বন্ধন ত্যাগ করিয়ে মুমুক্ষা এনে দিয়ে চরম ক্ষতি করে দিয়েছে। সারা দেশটা—'নিমিত্ত মাত্রঃ ভব সব্যসাচী' হয়ে বসে পড়েছিল। একটি মতে গীতা খৃ-পূ ৪-৩ শতকে লেখা হয়েছিল; পরে মহাভারতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মহাভারতে মঙ্কি গীতা ইত্যাদি আরো বহু গীতা আছে। রামগীতা, দ্রঃ রামায়ণ। হংস গীতা, দ্রঃ হংস।

গুজরাত—ভারতের পশ্চিম উপকূলে ২০°১´—২৪°৭´ উ × ৬৪°৪´—৭৪°৪´ পূ। পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তরপূর্বে রাজস্থান, উত্তরপশ্চিমে পাকিস্থান, দক্ষিণে মহারাষ্ট্র। গুজরাট উপদ্বীপের নাম সৌরাষ্ট্র। প্রাচীন অধিবাসী গুর্জর উপজাতির নাম থেকে নাম। খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষের পর প্রস্তর যুগ তারপর সিন্ধু সভ্যতা এখানে গড়ে উঠেছিল। মৌর্যবংশই এখানে প্রথম ঐতিহাসিক রাজবংশ। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রদেশপাল পুষ্যগুপ্ত জুনাগড়ের কাছে সুদর্শন হ্রদ নামে একটি জলাধার তৈরি করে দিয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পর গ্রীক, ক্ষত্রপ, সাতবাহন ক্ষত্রপ, গুপ্ত, বাকাটক ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে এখানে সমগ্র গুজরাতে বা আংশিক ভাবে রাজত্ব করেছেন। ১২৯৯ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথম তুর্কি অনুপ্রবেশ ঘটে। এখানে নর্মদা নদীর মোহনায় ব্রোচ প্রাচীন সহর; পেরিপ্লাসে এর নাম বারুগুজ; এখান থেকে রোম ইত্যাদির সঙ্গে বাণিজ্য হত। এখানে ভৃগু মুনির একটি মন্দির আছে। আরব সাগর তীরে দ্বারকা একটি তীর্থস্থান। জুনাগড় জেলায় গিরনার (দ্র)একটি তীর্থস্থান। দ্বারকা থেকে ৬৪ কি-মি দক্ষিণে প্রভাসপত্তনে বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির রয়েছে।

গুড়াকেশ—নিদ্রা ও আলস্য বিজয়ী বলে অর্জুনের এক নাম।

গুণ—ন্যায় বৈশেষিক মতে লাল রং গুণ; এবং এই গুণ কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে অবস্থিত। কিন্তু তবুও দ্রব্য ও গুণ বিভিন্ন পদার্থ; একত্রে থাকলেও ভিন্ন পদার্থ রূপেই তাদের প্রতীতি। এই ভাবে গুণ ২৪ প্রকার :-রূপ. রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা. পরিমাণ, পৃথকত্ব. সংযোগ. বিয়োগ, পরত্ব. অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ. দুঃখ, ইচ্ছা দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, সংস্কার। বৈদান্তিকরাও দ্রব্য ও গুণ পৃথক পদার্থ বলে স্বীকার করেন অবশ্য এই স্বীকৃতি সবটাই ন্যায় বৈশেষিকদের অনুরূপ নয়। অভিজ্ঞতাবাদী বৌদ্ধরা দ্রব্য ও গুণ পৃথক পদার্থ স্বীকার করেন না। সাংখ্য দর্শনে গুণ পদার্থ দ্রব্য নির্ভর কোন ধর্ম নহে নিজেরাই দ্রব্য। সাংখ্যে সত্ব, রজঃ, তমঃ এ তিনটিই গুণ।

গুণকেশী—মাতলির রূপসী ও গুণবতী মেয়ে: মা সুধর্মা। ভোগবতী নগরীতে ঐরাবত নাগের বংশে রাজা আর্যক নাগের ছেলে চিকুর; এবং চিকুরের ছেলে সুমুখ। মেয়ের জন্য পাত্রের সন্ধানে নারদের সঙ্গে ত্রিভুবন ঘুরতে ঘুরতে মাতলি পাতালে এসে বাসুকির পুরীতে এই সুমুখকে পছন্দ করেন এবং বিয়ে হয়। রাজা আর্যক কিন্তু জানিয়ে দেন গুরুড় কিছু দিন আগে চিকুরকে খেয়েছেন এবং এক মাস পরে সুমুখকেও খাবেন ঠিক করেছেন। নারদ সামনেই ছিলেন; সুমুখকে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের কাছে নিয়ে যান এবং ইন্দ্র সুমুখকে আশীর্বাদ করে দীর্ঘ জীবন দান করেন।

গরুড় (দ্রঃ) এ কথা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন। সুমুখ রক্ষা পায়।

গুণনিধি—কোশল রাজ্যে এক জন বিত্তবান পণ্ডিত ছিলেন নাম গিরিনাথ; লোকে এঁকে শ্রদ্ধায় গিরিনাথ দীক্ষিত বলতেন। এঁর ছেলে গুণনিধি। গুণনিধি গুরুর কাছে বিদ্যা শিখতে যান এবং ক্রমশ গুরুপত্নী মুক্তাবলীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত বিষ খাইয়ে গুরুকে হত্যা করেন। গুণনিধির পিতামাতা ঘটনাটি জানতে পেরে ছেলেকে ভৎর্সনা করেন। মুক্তাবলী ও গুণনিধি দু জনে তখন পরামর্শ করে বিষ দিয়ে গুণনিধির পিতামাতাকেও হত্যা করেন। এর পর গুণ নিধি ও মুক্তাবলীর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে; গুণনিধি সুরাসক্ত হয়ে পড়ে চুরি করতে থাকেন। গ্রাম থেকে সকলে এদের তাড়িয়ে দেয়। বনে গিয়ে এঁরা দস্যুতে পরিণত হন এবং পথিক-দের লুণ্ঠন করে জীবন কাটাতে থাকেন। এর পর এক রুদ্রাক্ষ গাছের নীচে এই পাপিষ্ঠ গুণনিধি এক দিন মারা যান এবং এত পাপ করা সত্ত্বেও রুদ্রাক্ষের মাহাত্ম্যে শিবলোক প্রাপ্ত হন।

গুণবতী—দ্রঃ চন্দ্রাবতী।

গুণবরা—একজন অপ্সরা।

গুণমুখ্যা—একজন অপ্সরা।

গুণাঢ্য—পার্বতী এক বার শিবের কাছে একটি মৌলিক গল্প শুনতে চান; এমন গল্প যা কেউ কোন দিন শোনে নি। নন্দীকে দরজাতে পাহারা বসিয়ে বলে দেন কেউ যেন ভেতরে না আসে। মহাদেব বিদ্যাধরদের সম্বন্ধে গল্প বলছিলেন এমন সময় পুষ্পদন্ত নন্দীর কথা না শুনে সেখানে গিয়ে হাজির হন। গল্পটি এত কৌতূহলদীপক যে পার্বতী কিছুই টের পান না; পুষ্পদন্ত আড়ালে দাঁড়িয়ে গল্প শুনে অলক্ষ্যেই স্থান ত্যাগ করেন। পুষ্পদন্ত পরে নিজের স্ত্রী জয়াকে গল্পটি বলেন; জয়া আবার পার্বতীকে এই গল্প শোনান। পার্বতী শুনে শিবের কাছে অভিযোগ করেন পুরাণ গল্প শুনিয়েছেন। অভিমানে পার্বতী কাঁদতে থাকেন। শিব বুঝতে পারেন কি হয়েছে এবং পার্বতীকে সব খুলে বলেন। পার্বতী তৎক্ষণাৎ পুষ্পদন্তকে ডেকে পাঠান এবং পুষ্পদন্ত সব কথা স্বীকার করেন। পুষ্পদন্তের স্বপক্ষে মাল্যবানও অনুরোধ করতে এসেছিলেন। পার্বতী এদের দু জনকে অভিশাপ দেন মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে। এদের প্রার্থনায় পার্বতী তার পর বলেন সুপ্রতীক নামে এক যক্ষকে বৈশ্রবণ অভিশাপ দিয়েছিলেন; এই যক্ষ কাণভূতি পিশাচ হয়ে বিন্ধ্যপর্বতে গভীর অরণ্যে বাস করছে। তাঁর সঙ্গে দেখা করে পুষ্পদন্ত কাণভূতিকে আগে নিজের কাহিনী ও এই গল্প বলবে এবং তার পর মুক্তি পাবে। কাণভূতি তার পর মাল্য-বানকে বহু কাহিনী শোনাবেন এবং তখন মুক্তি পাবেন। মাল্যবান এই সব গল্প জন-সাধারণের মধ্যে প্রচার করলে মাল্যবান তবে মুক্তি পাবেন। এর পর পুষ্পদন্ত বররুচি নামে কৌশাম্বীতে এবং মাল্যবান গুণাঢ্য নামে সুপ্রতিষ্ঠিত নগরে জন্মান।

যক্ষ সুপ্রতীক শূলশিরস্ নামে এক রাক্ষসের সঙ্গে মিত্রতা করলে বৈশ্রবণ এতে ক্রুদ্ধ হয়ে সুপ্রতীককে শাপ দিয়েছিলেন। সুপ্রতীকের বড় ভাই দীর্ঘজঙ্ঘ এসে বৈশ্রবণের কাছে ক্ষমা চাইলে বৈশ্রবণ বলেন পুষ্পদন্ত মানুষ হয়ে জন্মালে তার কাছে

অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী শুনবেন ও শোনাবেন তার পর মুক্তি পাবেন।

প্রতিষ্ঠান দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত নগরীতে সোমশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। এঁর দুই ছেলে বৎস ও গুল্মক এবং একটি মেয়ে শ্রুতারথা। মা বাবা মারা গেলে মেয়েটি ভাইদের কাছে মানুষ হয় এবং বাসুকির ভাই কীর্তিসেন একে গন্ধর্ব মতে বিয়ে করেন। সন্তান হয় গুণাঢ্য। গুণাঢ্য বড় হয়ে দক্ষিণ দেশে গিয়ে এক ব্রাহ্মণের কাছে সমস্ত কিছু বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং সাতবাহন রাজার মন্ত্রী হন। এক দিন গুণাঢ্যের স্ত্রী রাজা সাতবাহনকে ব্যাকরণ গত কিছু ভুলের জন্য ভৎর্সনা করেন। রাজা অত্যন্ত ম্লান ও দুঃখিত হয়ে পড়েন। ইতি মধ্যে সর্ববর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে প্রতিশ্রুতি দেন ছমাসের মধ্যে রাজাকে সমস্ত ভাষাতে সুপণ্ডিত করে দেবেন। গুণাঢ্য বলেন এ সম্ভব নয়। দু জনে তার পর বাজি রাখেন ; গুণাঢ্য বলেন তিনি যদি হেরে যান তাহলে তাঁর সংস্কৃত, প্রাকৃত ও স্থানীয় ভাষার জ্ঞান তিনি পরিত্যাগ করবেন। সর্ববর্মা বলেন তিনি হেরে গেলে গুণাঢ্যের পাদুকা বার বছর মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন। সর্ববর্মা তারপর কার্তিকের আরাধনা করে রাজাকে সংস্কৃতে পণ্ডিত করে দেন। গুণাঢ্য হেরে গিয়ে সব কিছু ত্যাগ করে বিন্ধ্য পর্বতে চলে যান। বনে পিশাচদের ভাষা শুনতে থাকেন এবং কিছু দিনের মধ্যে এই ভাষা শিখে নেন। এর পর পিশাচরাজ কাণভূতি এলে কথা বলতে কোন অসুবিধা হয় না। কাণভূতি সাতটি বিদ্যাধরদের কাহিনী শোনান এবং সাত বছর ধরে গুণাঢ্য এটি লিখতে থাকেন ; লিখেছিলেন পাতার ওপর রক্ত দিয়ে।

গুণাঢ্য তারপর এই গ্রন্থ পাঠ করতে থাকেন, সমস্ত দেবতারা এসে কাহিনী শুনতে থাকেন। এই গ্রন্থ বৃহৎ-কথা ; কাণভূতি এই কাহিনী শুনে মুক্তি পান। এই গ্রন্থকে কি ভাবে রক্ষা করা যায় গুণাঢ্য যখন ভাবছিলেন তখন তাঁর দু জন সঙ্গী গুণদেব ও নন্দীদেব এই গ্রন্থটিকে রাজা সাতবাহনের নামে উৎসর্গ করতে বলেন। রাজা সবটা পড়েন কিন্তু বইটা তাঁর পছন্দ হয় না। সঙ্গী দু জন গ্রন্থটি গুণাঢ্যের কাছে ফিরিয়ে আনেন। গুণাঢ্য হতাশ হয়ে পড়ে নরবাহনের কাহিনীটি বাদ দিয়ে বাকি অংশ আগুনে পোড়াতে থাকেন। একটি করে পাতা পড়তে থাকেন এবং আগুনে দিতে থাকেন। শিষ্যরা পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে এবং বনের পশুরাও এসে কাহিনী শুনতে থাকে। এই সময়ে রাজা সাতবাহনের অসুখ করে। বৈদ্য রাজাকে পরীক্ষা করে বলেন শুষ্ক মাংস খেয়ে এই অসুখ হয়েছে। শিকারী যারা মাংস আনে তারা জানায় এ ছাড়া ভাল মাংস মিলছে না। কারণ বনে সব পশুপাখী একটি লোকের গল্প শুনছে ; নিজেদের খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। লোকটি একটি করে পাতা পড়ে শোনাচ্ছে তার পর পাতাটি আগুনে পুড়িয়ে ফেলছে। শুনে সাতবাহন তৎক্ষণাৎ শিকারীদের সঙ্গে গুণাঢ্যের কাছে এসে উপস্থিত হন এবং গুণাঢ্যের পায়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করেন। পুষ্পদন্ত থেকে আরম্ভ করে তাঁর নিজের গ্রন্থ পোড়ান পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী গুণাঢ্য বর্ণনা করেন। গুণাঢ্যের সঙ্গীরা এই সব কথা অনুবাদ করে রাজাকে শোনান। এই সময়ে ছ-টি গ্রন্থ পোড়ান হয়ে গিয়েছিল ; রাজা বাকিটুকু নিয়ে যান ; গুণাঢ্য আগুনে আত্মবিসর্জন করেন।

নরবাহন দত্তের কাহিনীটুকু নিয়ে সাতবাহন ফিরে আসেন। এইটি বৃহৎ

কথা। গুণদেব ও নন্দীদেব গ্রন্থটি সংস্কৃতে অনুবাদ করে রাজাকে শোনান।

গন্টুর—অন্ধ্রপ্রদেশের জেলা ও সহর। ১৫°১৮′—১৬°৫০′ উ×৭০°১০′—৮০°৫৫′ পূ। এখানে ভট্টিপ্রোল ও অমরাবতীতে বিখ্যাত বৌদ্ধস্তূপ আছে। পালনাদ তালুকে নাগার্জুন কোণ্ডার প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য অনেক; এখানে সম্প্রতি একটি জলাধার তৈরি হওয়াতে কিছু কিছু প্রত্নসম্পদ পাহাড়ের মাথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গুপ্তচর—প্রাচীন ভারতে গুপ্তচর নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। কৌটিল্য, কামন্দক, যজ্ঞবল্ক্য তিন জনেই এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। গুপ্তচর বৃত্তির ওপর কৌটিল্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এই বৃত্তির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। কামন্দক ও মহাভারতে আছে গুপ্তচররাই রাজার চক্ষু। শুক্র নীতিসারে আছে রাজা প্রতি দিন রাত্রিতে প্রজাদের, অমাত্যদের, আত্মীয় এবং অন্তঃপুরিকাদের মনোভাব চরের কাছ থেকে জেনে নিতেন।

এই কাজের জন্য তীক্ষ্ণধী, মধুরালাপী, বিচক্ষণ লোককেই কাজে নিয়োগ করা হত। চরেরা ছাত্র, উদাসী পুরুষ, গৃহস্থ, বণিক, তপস্বী ইত্যাদি ছদ্মবেশ নিত। সন্ন্যাসিনী, পরিব্রাজিকা, গণিকা, জ্যোতিষী ইত্যাদিকেও চর নিযুক্ত করা হত। কৌটিল্য এদের দু ভাগে ভাগ করতেন; (১) যারা এক স্থানে বসে কাজ করবে এবং (২) যারা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে খবর আনবেন। এ ছাড়াও ব্যবস্থা ছিল পাষণ্ড, তাপস ইত্যাদিদের পররাষ্ট্রে নিয়োগ করা হবে। একই খবরের জন্য একাধিক চরও নিয়োগ করা হত এবং চরেরা বহু ক্ষেত্রেই পরস্পরকে চিনত না।

সমাজ বিরোধী অর্থাৎ ভেজাল দেওয়া, জালমুদ্রা তৈরি, চুরি ইত্যাদি থেকে রাজদ্রোহী কাজকর্ম ইত্যাদি সব খবরই রাজা এদের কাছ থেকে পেতেন। রাজ্য চালাবার এরা একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল। খবর মিথ্যা প্রমাণ হলে গুপ্তচরদের শাস্তি দেওয়া হত; খবর তথ্যের দ্বারা সমর্থিত হলে পুরস্কার দেওয়া হত। কৌটিল্য এমন কি এদের সাহায্যে কোথায় কি মতবাদ মাথা তুলছে তাও জানবার কথা বলেছেন। এবং বলেছেন রাজা এই ভাবে খবর সংগ্রহ করে প্রয়োজন মত বিপথগামী প্রজাদের শাস্তি দেবেন; প্রয়োজন মত বিবাদ ও বিভেদের বীজ বপন করে বিপক্ষকে দুর্বল করে দেবেন। বিচারের কাজেও কৌটিল্য চর নিয়োগের কথা বলেছেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের খবর আনার জন্য পাষণ্ড, প্রচ্ছন্ন তাপস, বণিক এমন কি বিদেশে অবস্থানকারী রাজদূতও গুপ্তচরের কাজ করত এবং এটি একটি সুপ্রচলিত ব্যবস্থা ছিল। বিদেশের অন্তর্বিভেদের সুযোগ নিয়ে সেই দেশের রাজার বিরোধীদেরও কাজে লাগান হত। কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষেরই চর বিরোধী সৈন্যদের মধ্যে কাজ করেছিল। বিদেশ থেকে চরেরা গুপ্তলিপিতে খবর পাঠাত। এ ছাড়া অন্তর্ঘাতী কাজ ও উস্কানির কাজেও চর পাঠান হত। অজাতশত্রুর মন্ত্রী বস্‌সকার সফলতার সঙ্গে উস্কানি দেওয়ার কাজ করেছিলেন।

গুরলামান্ধাতা—৩০°২৬′১৮″ উ, ৮১°১৭′৫৭″ পূ; উচ্চতা ৭৭২৮ মি। এটি লদাখ পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু শিখর। গার্বিয়ঙ ও লিপুলেখ গিরিপথ দিয়ে যেতে যেতে দেখা যায়। মানস সরোবরের দক্ষিণে অবস্থিত। রাজা মান্ধাতা এই শিখরমূলে আজও তপস্যা করছেন এই রকম কিংবদন্তি।

গুরু—ভারতীয় জীবনে প্রাচীন কালে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। এঁদের কাজ ছিল পঠন পাঠন এবং যজ্ঞ পূজা ইত্যাদি। শিক্ষার জন্য সে সময়ে শিষ্যকে গুরুগৃহে গিয়ে বাস করতে হত। বহু সময়ে শিষ্যদের গুরুর কাছে কঠিন পরিশ্রম করতে হত। সাধারণতঃ গুরুর কাছ থেকে ফেরার সময় গরুকে তাঁর বাসনা অনুযায়ী দক্ষিণা দিতে হত। গরুর দক্ষিণার বহু অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচলিত আছে। বলা হয় গুরুর ঋণ শোধ করা যায় না। তন্ত্রে আছে গুরু হবেন শান্ত, দান্ত, সদ্বংশীয়, বিনীত, শুদ্ধাচার, শুদ্ধবেশ, সুবুদ্ধি এবং তন্ত্রমন্ত্র বিশারদ। রোগী অধিকাঙ্গ, হীনাঙ্গ, বহুভোক্তা, বহুভাষী, পুত্রহীন ও শঠ ব্যক্তিকে গুরুরূপে বরণ করা উচিত নয়। অন্য মতে গুরু দেবতা স্বরূপ। গুরু ইষ্টদেব। গুরু সামনে থাকলে নিত্য পূজা বা অন্য দেবতার পূজা না করে গুরুর পূজা করাই কর্তব্য। যেখানে কুল-গুরু প্রথা চলিত আছে সেখানে গুরু নির্বাচনের কোন প্রশ্ন নাই। বর্তমান সমাজে কেবল মন্ত্রগুরু অর্থাৎ তান্ত্রিক দীক্ষাগুরুই আছেন এবং গুরুর সম্মান পেয়ে থাকেন। শিক্ষাগুরু ইত্যাদির কোন সম্মান নেই।

গুরুদার—গরুড়ের এক ছেলে।

গুর্জর—একটি মতে বৈদেশিক জাতি; হুনদের পর ভারতে আসে এবং পাঞ্জাব ও রাজপুতানায় বসবাস করে। অন্য মতে এরা গুর্জর দেশেরই আদিবাসী; বিদেশী কেউ নয়। গুর্জর রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় ৬ শতকের মাঝে; রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন মন্দরে (=যোধপুর)। এই হরিশ্চন্দ্রের ছোট ছেলে প্রথম দদ্দ সম্ভবত গুজরাতে রাজ্য স্থাপন করেন। হিউ-এন-ৎসাঙ বর্ণিত কিউ-চো-লো সম্ভবত গুর্জর দেশেরই নাম এবং রাজধানী পি-লো-মো-লো (বর্তমানে ভিনমাল বা বাড়মের)।

গুলিক—এক ব্যাধ। বিষ্ণু মন্দিরের ছাদ থেকে সোনার পাত চুরি করতে চেষ্টা করেন। উত্তঙ্ক মুনি সে সময়ে মন্দিরে ছিলেন ব্যাধ, এঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করলে মুনি একে অভিশাপ দিয়ে হত্যা করেন। পরে করুণা হয় এবং এঁর দেহে গঙ্গা জল ছিটিয়ে দিলে ব্যাধ বৈকুণ্ঠে চলে যান।

গুহ—(১) বা গুহক। গঙ্গাতীরে শৃঙ্গবের পুরে এক নিষাদরাজ। অযোধ্যা ত্যাগ করে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রথমে এঁর রাজ্যে এলে গুহক এগিয়ে এসে ভক্তিভরে অতিথি সেবা করেন; জটার জন্য বটের আটা জোগাড় করে দেন এবং নৌকা করে গঙ্গা পার করে দেন। পরে ভরত সসৈন্যে এসে এঁরই অতিথি হয়েছিলেন এবং এঁর সাহায্যে নদী পার হয়েছিলেন। লঙ্কা থেকে ফেরার পথে হনুমানকে দিয়ে রামচন্দ্র আগে এঁকে খবর পাঠান। (২) দক্ষিণ ভারতে একটি নদী।

গুহাচিত্র—প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতে গুহার গায়ে ছবি আঁকা হয়েছে। এই ছবি আঁকার প্রেরণা এসেছিল ধর্ম বা সৌন্দর্য সাধনা থেকে। মধ্য ভারত থেকে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশে বেত্রবতী ও চম্বল উপত্যকায়, ছত্রিশগড়ের সিংহানপুর ও রায়গড় ইত্যাদিতে, উত্তর মির্জাপুরের লিখুনিয়া, কহবর ও ভালদরিয়ায়, ওড়িশার চক্রধরপুরে প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিক যুগে গুহাচিত্র ভারতে শিল্পের একটি বিশেষ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ভারতে অজন্তা, বাঘ, বাদামি, সিত্তনবসাল,

পিঠালখোড়া, এলোরা;সিংহলে সিগিরিয়া, পোলান্নারুয়া; মধ্য এসিয়াতে খোটান, এবং আফগানিস্তানে বামিয়েন এগুলি ঐতিহাসিক যুগের গুহাচিত্র যুক্ত গুহা। আর খোদিত চিত্র রয়েছে বিহারে লোমশঋষি; ওড়িশায় খণ্ডগিরি, ললিতগিরি; গুজরাতে জুনাগড়, কাঠিয়াওয়াড়, তলাজ, ডঙ্ক, ও সান; মহারাষ্ট্রে কার্লে, ভাজা, বেদসা, নাসিক, জুনার; পুনার পাতালেশ্বর গুহা, কান্হেরি, মহাকাল, যোগীশ্বর, এলিফ্যাণ্টা, ঔরঙ্গাবাদ, আইহোলি ইত্যাদি; অন্ধ্রে শংকরম, কোট্টপল্লী, উণ্ডবল্লী, পেনমগ, সীতারামপুরম প্রভৃতি; মাদ্রাজে মহাবলীপুরম, তিরুক্কলু-ক্কুনরম, সিংহপেরুমলকোবিল, সিংহবরম এবং মাদুরাই প্রভৃতি স্থানের গুহাতে। এই সমস্ত চিত্রে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের নানা কিছু বিষয় চিত্রিত হয়েছে।

গুহামন্দির—অতি প্রাচীন কাল থেকে দেবমন্দির, চৈত্যগৃহ ইত্যাদি রূপে পাহাড়ের গুহার ব্যবহার ভারতে প্রচলিত ছিল। পাহাড়ের স্বাভাবিক ফাটল ইত্যাদি সন্ন্যাসীরা ব্যবহার করতেন। খৃ-পূ ৩-শতকে অশোক ও তাঁর পৌত্র দশরথ গয়ার কাছে বরাবর পাহাড়ে ভারতের প্রাচীনতম গুহামন্দির তৈরি করেন। অনুমান হয় পারস্য রাজের আদর্শে অশোক এইগুলি নির্মাণ করান ও আজীবিক সন্ন্যাসীদের দান করেন। এই ভাবে মন্দির বা চৈত্য নির্মাণ খৃ-৯ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত চলেছিল। ভারতে এই জাতীয় মন্দির প্রায় ১২০০ মত।

হিন্দু, জৈন, হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধ এই চার সম্প্রদায়ের গুহামন্দির পাওয়া যায়। হীনযান চৈত্যে বুদ্ধপ্রতিমা থাকে না। মহাযান মন্দিরে বুদ্ধের মূর্তি ও ছবি দুই আছে। অনেক সময় হীনযান চৈত্য গৃহকে পরে মহাযান চৈত্য গৃহে পরিণত করা হয়েছে; বৌদ্ধ মন্দিরে থাকে একটি প্রার্থনা ঘর বা চৈত্যগৃহ এবং ভিক্ষুদের বাসস্থান বা বিহার। চৈত্যগৃহে একটি স্তূপ থাকত। বিহারগুলিতে প্রথমে একটি চারকোণা হলঘর এবং চারপাশে ভিক্ষুদের থাকবার অসংখ্য ছোট ছোট চার-কোণা কক্ষ। সেই সময়ে বিহার ও চৈত্য প্রচলিত কাঠের ঘরের অনুকরণে তৈরি হত। গয়ার কাছে বরাবর পাহাড়ে গুহার পাঁচিল যেন কাঠের তক্তা জুড়ে জুড়ে তৈরি। হীনযান বৌদ্ধ মন্দিরগুলি খৃ-পূ ২-শতকের থেকে খৃ ২-শতকের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। পশ্চিম ভারতের এই হীনযান মন্দিরগুলি নির্মাণকাল অনুসারে সাজালে ভাজা, কোণ্ডণ, পিঠালখোড়া, অজণ্টা (১০ নং গুহা), বেদসা, অজণ্টা (৯ নং), নাসিক ও কার্লা। মহাযান সম্প্রদায়ের চৈত্য ও বিহার প্রধানত অজণ্টা ও ইলোরাতে। এদের নির্মাণ কাল ৪৫০-৬৪২ খৃ। অজণ্টা ও এলোরা ভাস্কর্যের জন্য প্রসিদ্ধ; দারুশিল্পের অনুকরণ নেই।

মাদ্রাজে পল্লব যুগের মন্দিরগুলি উচ্চশ্রেণীর ভাস্কর্যের ও কৌশলের জন্য প্রসিদ্ধ। এক একটি বড় পাথর কেটে এক তলা বা দু তলা মন্দির করা হয়েছে। এলোরাতে কৈলাস মন্দির একটি পাহাড়ের গা কেটে তৈরি। জৈনদের, এলোরাতে ৫-টি গুহামন্দির, এগুলিতে অলংকরণের উৎকর্ষতা আছে কিন্তু গঠন স্বচ্ছন্দ নয়। এগুলির মধ্যে ইন্দ্রসভা নামে দু তলা গুহামন্দিরটি উল্লেখ যোগ্য।

গুহ্যক—দেবযোনি বিশেষ। কুবেরের অনুচর। বাসস্থান পিশাচ লোকের ওপরে এবং গন্ধর্বলোকের নীচে।

গৃৎসপতি—পুরুবংশে রাজা কপিলের ছেলে। এঁর চার ছেলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চার ছেলে থেকে চতুর্বর্ণের জন্ম।

গৃৎসমদ—(১) বিখ্যাত মুনি। বীতহব্যের ছেলে। বৃহস্পতির সমান পণ্ডিত ইন্দ্রের বন্ধু এবং যুধিষ্ঠিরকে একবার উপদেশ দিয়েছিলেন। অসুররা এঁকে একবার ইন্দ্র মনে করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছিলেন। এঁর ছেলে কুচেতা। (২) ভৃগুবংশে রাজ সুহোত্রের ছেলে; এক রাজা। (৩) ইন্দ্রের ঔরসে মুকুন্দার পুত্র। রাজা রুক্মাঙ্গদ এক বার প্রাসাদে ছিলেন না; ইন্দ্র এই সময় রুক্মাঙ্গদের বেশে এসে রুক্মাঙ্গদার স্ত্রী মুকুন্দার সঙ্গে রাত্রি যাপন করেন। সন্তান হয় গৃৎসমদ। বিখ্যাত পণ্ডিত হয়ে ওঠেন; তর্কে অপরাজেয় হন। একবার মগধরাজের প্রাসাদে এক শ্রাদ্ধে এসে যোগদান করেন সঙ্গে বশিষ্ঠ ইত্যাদি ছিলেন। অত্রি মহর্ষি এখানে গৃৎসমদের পিতার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। গৃৎসমদ বাড়িতে এসে মাকে ব্যাপারটা জানতে চাইলে মা সব কথা বলেন। ফলে গৃৎসমদ কুপিত হয়ে মাকে শাপ দেন কণ্টকগাছে পরিণত হবেন। মুকুন্দাও শাপ দেন গৃৎসমদের ছেলে রাক্ষস হবে।

গৃধ্রিকা—কশ্যপের ঔরসে তাম্রার একটি মেয়ে।

গৃহনির্মাণ—গৃহ্যসূত্রে গৃহ তৈরি ও গৃহ প্রবেশকে শালাকর্ম বলা হয়েছে। প্রথমে স্থান নির্বাচন প্রয়োজন। গৃহ্যসূত্রগুলিতে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। গৃহ্যসূত্রের এই অংশের নাম বাস্তু পরীক্ষা। জমিতে মালিকের পূর্ণ সত্ত্ব থাকা চাই। মাটি যেন ঊষর না হয়; প্রচুর লতাগুল্ম এবং কুশ ও বেনা ঘাস হয় এবং জল বার হয়ে যেতে পারে এই রকম জমি বাসগৃহের উপযুক্ত। পাশে অপরের বাড়ির আলো বাতাস যেন বন্ধ না হয়; জমির পূর্ব বা উত্তরে নদী বা জলাশয় থাকা দরকার। জলাশয়ের কারণে মাটি ধসে যাবে কিনা তাও সাবধান হতে বলা হয়েছে। কাছে ক্ষীরী, কণ্টকী ও কটুবৃক্ষ শ্রেণী যেন না থাকে। জমি যেন সমতল হয়। গৌরবর্ণ, বালুকা যুক্ত মাটিতে ব্রাহ্মণরা, রক্তবর্ণ, বালুকা যুক্ত মাটিতে ক্ষত্রিয়েরা এবং কালো মাটিতে বৈশ্যরা গৃহ তৈরি করবেন। প্রথমে হাল দিয়ে সমস্ত আগাছা তুলে ফেলে দিতে হবে। বাসগৃহ পূর্ব, উত্তর বা দক্ষিণদ্বারী করণীয়; পশ্চিমদ্বারী নয়। ভাদ্র আশ্বিন ও কার্তিক মাসে গৃহ নির্মাণ করলে উত্তর মুখে, অগ্রহায়ণাদি তিন মাসে পূর্ব মুখে ফাল্গুনাদি তিন মাসে করলে দক্ষিণ মুখে এবং জ্যৈষ্ঠাদি তিন মাসে করলে পশ্চিম মুখে করতে হবে।

গৃহ নির্মাণের প্রশস্ত মাস বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্তিক, ও ফাল্গুন। শুক্লপক্ষে গৃহ আরম্ভ করলে সুখ, কৃষ্ণপক্ষে ভয়। রিক্তা ইত্যাদি ছাড়া অন্য তিথিতে গৃহারম্ভ মঙ্গল জনক। রবি ও মঙ্গলবারে কাজ আরম্ভ করা উচিত নয়। শুভ দিনে বাস্তু ও অন্যান্য দেবতার পূজা করে গৃহারম্ভ কাজ বিধেয়। নতুন ঘরে স্ত্রী পরিবার সকলকে নিয়ে শুভ দিনে গৃহকর্তাকে প্রবেশ করতে হয়। কন্যা, কুম্ভ, বৃষ, বৃশ্চিক, সিংহ, মিথুন লগ্নে সোম, বুধ, বৃহ, শুক্রবারে গৃহপ্রবেশ শুভ। সকাল বেলা সঙ্গে ধান নিয়ে স্ত্রীর পিছু পিছু গৃহ প্রবেশ করতে হয়। স্ত্রীর কাঁখে জলপূর্ণ কলসী থাকবে। যজুর্বেদীয় মতে স্ত্রী আগে যাবে; সামবেদীয় মতে স্ত্রী পাশে পাশে যাবে। ঋক্‌ বেদের মতে স্ত্রী ও বড় ছেলেকে নিয়ে গৃহ প্রবেশ করতে হয়। বাড়িতে প্রবেশ

ঘরে বাস্তুপূজা ও আনুষঙ্গিক পূজা, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ও হোম ইত্যাদি করণীয়।

গৃহপতি—এক জন মুনি। পিতা বিশ্বানর, মা শুচিষ্মতী ; নর্মদা তীরে আশ্রমে বাস করতেন। সন্তান ছিল না। স্ত্রী স্বামীকে সন্তানের জন্য কিছু একটা করতে বলেন ; বিশ্বানর কাশী গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন সন্তান হবে। এর পর শুচিষ্মতীর সন্তান হয় নাম হয় গৃহপতি। বালকের নয় বছর বয়স হলে নারদ এসে সাবধান করে দেন অগ্নি ভয় আছে। বিশ্বানর তৎক্ষণাৎ আবার শিবের আরাধনা করেন এবং ছেলের আগুনের মত ক্ষমতা হয় অর্থাৎ আগুন আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এর ফলে গৃহপতি কাশীতে এক শিব মূর্তি স্থাপন করে নাম দেন অগ্নীশ্বর।

গৃহ্যসূত্র—জাতকর্ম, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি সংস্কার ও গৃহস্থের কর্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা এই গ্রন্থে আছে। বেদাঙ্গ কল্পসূত্রের অঙ্গ। বিভিন্ন বেদ বা তার শাখার জন্য বিভিন্ন গৃহ্যসূত্র। আবার কোন কোন বেদের একাধিক শাখার জন্য একটি গৃহ্য সূত্র রয়েছে। ঋক্‌বেদের গৃহ্যসূত্র দুটি শাঙ্খায়ন ও আশ্বলায়ন। শাঙ্খায়ন বাস্কল শাখার গৃহ্যসূত্র। কৌষীতকী মনে হয় শাঙ্খায়নেরই একটি সংস্করণ। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ঋক্‌বেদের আশ্বলায়ন শাখার গ্রন্থ। সামবেদের গৃহ্যসূত্র তিনটি গোভিল, খাদির, জৈমিনীয়। খাদির গৃহ্যসূত্র আসলে গোভিলের সার সঙ্কলন। জৈমিনীয় গৃহ্য সূত্র সামবেদের জৈমিনীয় শাখার গ্রন্থ।

শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার গৃহ্যসূত্রের নাম পারস্কর বা কাতীয়। রচয়িতা পারস্কর অর্থাৎ কাত্যায়ন। কৃষ্ণযজুর্বেদের গৃহ্যসূত্র নয়টি :-বৌধায়ন, ভারদ্বাজ. আপস্তম্ভ, হিরণ্যকেশি, বৈখানস, আগ্নিবেশ্য, মানব, কাঠক ও বারাহ। বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র প্রাচীন গ্রন্থ ; বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র এর অংশ বিশেষ। আপস্তম্ভীয় শ্রৌত-সূত্রের সপ্তবিংশতি প্রশ্ন (=অধ্যায়) হচ্ছে আপস্তম্ভীয় গৃহ্যসূত্র। হিরণ্যকেশির অপর নাম সত্যাষাঢ় এবং হিরণ্যকেশি শৌত্রসূত্রের অন্তর্গত। বৈখানসের মন্ত্রগুলি তৈত্তিরীয় সংহিতা আগত নয় ; বৈখানসীয় মন্ত্রসংহিতা থেকে গৃহীত। রচয়িতা অগ্নিবেশের নাম অনুসারে আগ্নিবেশ্য ; এই গৃহ্যসূত্রটিতে 'নারায়ণ বলি,' 'যতিসংস্কার' 'বানপ্রস্থ-বিধি ইত্যাদি কতকগুলি বিধি আছে ; অন্য কোন গৃহ্যসূত্রে এগুলি নাই। মানব গৃহ্যসূত্রের অপর নাম মৈত্রায়ণী মানব গৃহ্যসূত্র ; মৈত্রায়ণী সংহিতার মন্ত্র থেকে রচিত। কাঠক গৃহ্যসূত্রের অপর নাম লৌগাক্ষী গৃহ্যসূত্র ; এটিও স্বতন্ত্র একটি মন্ত্রসংহিতার অনুসারী। বরাহ গৃহ্যসূত্র মৈত্রায়ণী শাখার অবান্তর ভেদ।

অথর্ব বেদের একটি মাত্র গৃহ্যসূত্র নাম ; কৌশিক গৃহ্যসূত্র ; এই গৃহ্যসূত্রে সাধারণ কাজ ছাড়াও শান্তিক, পৌষ্টিক, ও আভিচারিক কাজেরও বিবরণ আছে।

গো—পুলস্ত্যের স্ত্রী। ছেলে বিশ্রবণ।

গোকর্ণ—(১) শিবের এক অবতার। বরাহ কল্পে শিব গোকর্ণ রূপে জন্মান ; সন্তান কশ্যপ, উশনস, চ্যবন, ও বৃহস্পতি।

(২) তুঙ্গভদ্রা তীরে একটি গ্রাম। এখানে যে সব ব্রাহ্মণরা বাস করতেন তাঁরা এটিকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। এখানে আত্মদেব নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, এঁর স্ত্রী অত্যন্ত কলহপ্রিয়া ; নাম ধুন্দুলী। বহু দিন এঁদের সন্তান হয়নি। দুঃখে

আত্মদেব বনে চলে যান ; বনে একটি জলাশয়ের ধারে যখন বসেছিলেন তখন এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়। সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়। সন্ন্যাসী ধ্যানে জানতে পারেন এবং বলেন পর পর সাত জন্ম তার কোন সন্তান হবে না। আত্মদেবকে সে জন্য সন্ন্যাস নিতে বলেন। কিন্তু আত্মদেব সম্মত হন না ; সন্ন্যাসীকে কোন একটা উপায় করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। সন্ন্যাসী তখন একটি ফল দেন এবং বলে দেন ধুন্দুলী যেন ফলটি খায় এবং এক বছর যেন উপবাস করেন। আত্মদেব ফিরে এসে স্ত্রীকে সব কথা বলেন এবং ফলটি দেন। ধুন্দুলী ফলটি খেতে চায় বটে কিন্তু উপবাস করতে চায় না। এই সময়ে ধুন্দুলীর বোন এসে গোপনে জানায় তার সন্তান হবে ; সন্তানটিকে সে দিয়ে দেবে। আত্মদেবও প্রকৃত ঘটনা জানতে পারবে না। এবং ফলটি একটি গরুকে খেতে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যাবে। এদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ধুন্দুলী গর্ভবতী হয়েছে বলে প্রচার করা হয় এবং যথা সময়ে বোনের ছেলে হলে ধুন্দুলীর ছেলে বলেই লোকে বিশ্বাস করে। ধুন্দুলীর সে রকম দুধ হচ্ছে না বলে ধুন্দুলীর বোন এসে স্তন্য দিতে থাকেন। ছেলের নাম হয় ধুন্দুকারী।

ফলটি যে গরু খেয়েছিল তিন মাস পরে তারও একটি শিশু হয় ; মানুষের মত দেখতে শিশু ; কান দুটি কেবল গরুর মত। ফলে নাম হয় গোকর্ণ। ধুন্দুকারীও গোকর্ণ এক সঙ্গে পালিত হতে থাকেন। ধুন্দুকারী ক্রমশ দুর্বৃত্ত হয়ে উঠতে থাকেন এবং গোকর্ণ ক্রমশ পণ্ডিত হয়ে ওঠেন। ধুন্দুকারী পিতামাতার জীবন পর্যন্ত দুর্বিষহ করে দেন। আত্মদেব বনে গিয়ে তপস্যা করে মুক্তি লাভ করেন। পুত্রের অত্যাচারে ধুন্দুলি কূপে আত্মবিসর্জন করেন। গোকর্ণ তীর্থযাত্রায় বার হয়ে যান।

ধুন্দুকারী বেশ্যাদের নিয়ে দিন কাটাতে থাকেন। বৃত্তি হয়ে দাঁড়ায় চুরি করা। রাজপুরুষরা জানতে পেরে ধুন্দুকারীকে পুড়িয়ে হত্যা করে। ধুন্দুকারীর আত্মা প্রেতে পরিণত হয়। গোকর্ণ খবর পেয়ে ফিরে আসেন এবং গয়াতে শ্রাদ্ধ করেন। কিন্তু প্রেত শান্তি পায় না ; গোকর্ণকে অনুরোধ করে তার শান্তির ব্যবস্থা করতে। গোকর্ণ তখন পণ্ডিতদের পরামর্শে সূর্যের আরাধনা করেন। সূর্য এসে উপদেশ দেন সাত দিন ভাগবত পাঠ করতে। অপরের সঙ্গে ধুন্দুকারীর আত্মাও ভাগবত শুনতে আসে এবং এক সপ্তাহ শেষে মোক্ষ লাভ করে। ধুন্দুকারী যখন স্বর্গে যাচ্ছেন তখন গোকর্ণ জানতে চান সে একা কেন স্বর্গে যাচ্ছে ; অপরে কেন যেতে পাচ্ছে না। ধুন্দুকারী জানান অপরে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শোনেনি। গোকর্ণ তখন আবার আর এক সপ্তাহ ভাগবত পাঠ করেন এবং সকলে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং সকলেই স্বর্গে যান।

রাজা কল্মাষপাদ এই গোকর্ণে তপস্যা করে মুক্তি পান। কেরল রাজ্যের জন্ম এই গোকর্ণকে কেন্দ্র করে। দ্রঃ গঙ্গা, পরশুরাম। ভগীরথ গঙ্গা আনবার জন্য এই গোকর্ণে তপস্যা করেছিলেন। তীর্থ যাত্রা কালে অর্জুন গোকর্ণে এসেছিলেন। ভানুমতীকে অপহরণকারী নিকুম্ভকে কৃষ্ণ, অর্জুন ও প্রদ্যুম্ন এই গোকর্ণে নিহত করেন।

গোকুল—মথুরার পূর্ব ও দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। যমুনার বাঁ দিকে পুণ্যস্থান। এখানে নন্দ বাস করতেন। কৃষ্ণ বলরাম এখানে বাল্যে পালিত হয়েছিলেন। পূতনা

ইত্যাদিকে কৃষ্ণ (দ্রঃ) এইখানেই নিহত করেন। বৈষ্ণবদের পরম তীর্থ।

গোখলি—ব্যাসের শিষ্য পরম্পরার মধ্যে এক জন। শাকল্যের সরাসরি শিষ্য। শাকল্য বেদের যে অংশ পেয়েছিলেন সেই অংশ ভাগ করে বাৎসায়ন, মৌদ্গল্য, শালি, আদিশিশির, গোখলি ও জাতুকর্ণকে ভাগ করে দেন।

গোভিল—(১) ইনি উতথ্যকে শাপ দিয়ে সর্পে এ পরিণত করেন। পরে উতথ্য সত্যতপসে পরিণত হন। (২) বৈশ্রবণের একজন যক্ষ ভৃত্য। এক বার আকাশ পথে যাবার সময় বিদর্ভরাজ উগ্রসেনের স্ত্রী পদ্মাবতীকে সখীদের সঙ্গে স্নান করতে দেখেন। পদ্মাবতীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে পাশে একটি ছোট পাহাড়ে উগ্রসেনের বেশ ধরে গান করতে থাকেন। পদ্মাবতী স্বামী মনে করে এগিয়ে এলে যক্ষ পদ্মাবতীকে সম্ভোগ করেন। কিন্তু যক্ষের আচরণে পদ্মাবতীর সন্দেহ হয়: পদ্মাবতী প্রশ্ন করলে যক্ষ নিজের পরিচয় দিয়ে পালিয়ে যান। দ্রঃ কংস।

গোতম—ঋক্ বেদে বহু মন্ত্রের রচয়িতা। ঋক্ বেদে বহু জায়গায় এঁর নাম আছে। প্রথম মণ্ডলে ১৩-শ অনুবাকে ৭৪-তম সুক্ত এঁর রচনা। আরো অনেকগুলি সুক্তে এঁর নাম আছে। মরুভূমির মধ্যে তৃষ্ণায় একবার মরুৎদের/অশ্বিনীকুমাদের কাছে জল চান। এঁরা একটি কূপ তুলে এনে কাৎ করে কূপ থেকে এঁকে জল ঢেলে দেন। এঁর প্রণীত আইনের বইয়ের নাম ধর্মশাস্ত্র। অপর নাম শতানন্দ। অহল্যার স্বামী অন্য ব্যক্তি। দ্রঃ গৌতম।

গোতমী—(১) জনৈকা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী। এঁর ছেলে সাপের কামড়ে মারা গেলে অর্জুনক নামে একটি ব্যাধ সাপটিকে গোতমীর সামনে এনে হত্যা করবার অনুমতি চান। গোতমী রাজি হন না; কারণ এতে তাঁর ছেলে বেঁচে উঠবে না; ধর্মনিষ্ঠ হতে হলে শোক জয় করতে হবে; ব্রাহ্মণের রাগ করা অন্যায়। অর্জুনক পীড়াপীড়ি করলেও ইনি মত দেন না। এই সময় সাপটি জানায় বালককে কামড়াবার জন্যই মৃত্যু তাকে পাঠিয়েছে; পাপেতে এর মৃত্যু হয়েছে। এই বলার পর মৃত্যু এসে জানান তিনি কালের অধীন; সাপকে পাঠাতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন; তিনি নিজে নির্দোষ। এর পর স্বয়ং কাল আসেন এবং জানান বালকের মৃত্যুর জন্য তার কর্মই দায়ী। গোতমী তখন স্বীকার করেন কর্মবশেই বালক মারা গেছে; কর্মবশেই তিনি পুত্রহীনা হয়েছেন; অর্জুনকের উচিত সাপকে ছেড়ে দেওয়া। কাল ও মৃত্যু তখন চলে যান; অর্জুনক সাপকে ছেড়ে দেন এবং গোতমী শোকশূন্যা হন। (২) দ্রোণাচার্যের স্ত্রী কৃপী।

গোত্র—বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রে আটজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষির নাম আছে:-ভরদ্বাজ, জমদগ্নি, গৌতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অগস্ত্য। গোত্র এই ঋষিদের বংশ সূচিত করে; যেমন কাশ্যপ গোত্র অর্থে কশ্যপ ঋষির বংশ। আবার মূল গোত্র বলা হয়েছে আঙ্গিরস কাশ্যপ, ভৃগু, ও বশিষ্ঠ। এ ছাড়াও আরো অনেকগুলি ঋষির নামে পরে আরো অনেকগুলি গোত্র চালু করা হয়েছিল। দ্রঃ প্রবর। সমান গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের গোত্র কুলপুরোহিতের গোত্র অনুসারে ঠিক হয়। বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যেও গোত্র বিচার রয়েছে। প্রাচীন রোমানদেরও কিছুটা গোত্র বিচার ছিল। (২) উর্জার (দ্রঃ) ছেলে।

গোদাবরী—দাক্ষিণাত্যের নদী। সিদ্ধপুরুষ সেবিত এই নদীতে স্নান করলে গোমেধ

যজ্ঞের ফল এবং বাসুকি লোক লাভ হয়। রাজা যুধিষ্ঠির এই নদী তীরে তীর্থ যাত্রায় এসেছিলেন। রামচন্দ্র গোদাবরী তীরে পঞ্চবটীতে দীর্ঘকাল বাস করেন। ধর্মকার্যে অন্যান্য নদীর সঙ্গে গোদাবরীকেও আহ্বান করা হয়। পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে বার হয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে পড়েছে। এর তীরে প্রতিষ্ঠান (বর্তমানে পাইথান) প্রাচীন নগরী। রাজমন্ত্রীর কিছু পরে নদী দুটি শাখায় ভাগ হয়েছে; পূর্ব শাখা গৌতমী গোদাবরী, পশ্চিম শাখা বশিষ্ঠ গোদাবরী; দুটি শাখার মাঝে বদ্বীপ।

গোপথ ব্রাহ্মণ—অথর্ব বেদের এক মাত্র ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যজ্ঞীয় বিধির আলোচনা এবং যজ্ঞের স্তুতি থাকে। কিন্তু গোপথ এর কিছুটা ব্যতিক্রম। অথর্ববেদে আভিচারিক মন্ত্রের প্রাচুর্য রয়েছে কিন্তু গোপথে অভিচার কর্মের কোন প্রসঙ্গ নেই। এটি বৈদিক যুগের একেবারে শেষে রচিত মনে হয়। অনেকের মতে কল্পসূত্রগুলিরও পরে এর রচনা। গোপথ শৌনক শাখার ব্রাহ্মণ বটে তবু পৈপ্পলাদ শাখার মন্ত্রও এতে আছে। দুটি ভাগ। পূর্ব ভাগে সৃষ্টিতত্ত্ব, অথর্ববেদীয় ঋত্বিক ব্রহ্মার মহিমা, ওঁকার ও গায়ত্রী মন্ত্রের মহিমা, ব্রহ্মচারীর কর্তব্য এবং ভৃগু, অঙ্গিরা, অথর্বা ইত্যাদি ঋষি সম্বন্ধে আলোচনা। কয়েকটি যজ্ঞের তাৎপর্যেরও ব্যাখ্যা আছে। এই গোপথের প্রথম ভাগে বলা হয়েছে ঘোর ও শান্ত দুটি উপাদানে অথর্ব বেদ গঠিত। উপনিষদের ভাবধারারও বেশ কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

উত্তর ভাগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নাই; অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত বিষয় নিয়ে রচিত। নানা কাজ ও আথর্বন মন্ত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আছে।

গোপতি—(১) কালকেতু অসুরের সহকর্মী এক জন অসুর। ইরাবতীর তীরে মহেন্দ্র-পর্বতে কৃষ্ণের হাতে নিহত হন। (২) মুনির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে জন্ম এক জন গন্ধর্ব। (১) শিবির ছেলে। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করলে এক পাল গরু এই শিশুকে পালন করে।

গোপা—বুদ্ধের স্ত্রী। সুপ্রবুদ্ধ নামে এক শাক্যের কন্যা। গায়ের রঙ সোনার মত ছিল বলে অপর নাম ভদ্দা কচ্চানা। ছেলে রাহুল যে দিন জন্মায় সেই দিনই বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করেন। গোপা সন্ন্যাসিনী বেশে রাজ পরিবারে অবস্থান করতেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর গোপা ভিক্ষুণী সঙ্ঘে যোগদান করেন।

গোপালী—একজন অপ্সরা। দ্রঃ গার্গ্য। কালযবনের জন্মের পর গোপালী স্বামীকে ত্যাগ করে ফিরে যান।

গোপী—বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের সৃষ্টি। রাধাই অসংখ্য গোপী রূপে প্রকাশ। কৃষ্ণ ও গোপীদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বৈষ্ণব দৃষ্টিতে এই যৌন সম্পর্কের অসংখ্য কূট আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। গোপীদের দুটি শ্রেণী; একটি ভাগ নিত্যসিদ্ধা এদের বলা হয় সখী; আর একটি ভাগ সাধন সিদ্ধা, এদের বলা হয় মঞ্জরী। মঞ্জরীরা দেহদান করতেন না; রাধা কৃষ্ণের মিলনের ও সেবায় সহায়তা করতেন। ললিতা বিশাখা ইত্যাদিরা রাধার সমজাতীয়।

পুরুষ দেহে পুরুষ রস ক্ষরণ কম হলে এবং অগ্নিদা রসের আধিক্যে যে বিকার দেখা দেয় সেই বিকার থেকেই বৈষ্ণব সাহিত্যের গোপী শাখা ও রাধাকৃষ্ণের

মিলন শাখার সৃষ্টি ; সঙ্গে অবশ্য কিছুটা নন্দনতত্ত্ব রয়েছে।

গোপুর—বা গোপুরম। মন্দির বা প্রাসাদের দরজায় অট্টালিকা বিশেষ। দ্বারশালা। নানা পরিকল্পনা অনুসারে তৈরি হত ; এবং প্রচুর কারুকার্য থাকত। পনের রকমের গোপুরমের বিশদ বিবরণ প্রাচীন স্থাপত্য শাস্ত্র মানসারে রয়েছে। এক থেকে ১৭ তলা পর্যন্ত হতে পারে। অনেক সময় সমকেন্দ্রিক পাঁচমহলা প্রাসাদ রূপেও দেখা যায়। প্রতি তলের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা অলংকরণ ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। ভেতরের কক্ষ, জানালা দরজা ইত্যাদিরও বিশদ বিবরণ আছে। গোপুরম দক্ষিণী স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্য ; সম্ভবত পল্লবশৈলী থেকে জন্ম। দক্ষিণ ভারত ছাড়া অন্য কোথাও নাই। মাদুরায় মীনাক্ষী ও তাঞ্জোরে নটরাজের মন্দিরে গোপুরম অতুলনীয়। এলোরায় কৈলাস মন্দিরেও গোপুরম আছে।

অগ্নিপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, কামিকাগম, অর্থশাস্ত্র, মানসার লিপি ইত্যাদি বহু জায়গায় এই গোপুরমের উল্লেখ ও বিবরণ রয়েছে।

গোবর্দ্ধন—মথুরা জেলার বৃন্দাবন থেকে ২৯ কি-মি দূরে একটি পাহাড়। অপর নাম গিরিরাজ। ভাগবতে আছে ব্রজে এক বার অনাবৃষ্টি হলে দেশের লোকেরা ইন্দ্রযজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। অন্য মতে বৃন্দাবনে চিরাচরিত প্রথা ছিল ইন্দ্রকে পূজা করা। কিন্তু কৃষ্ণের কথায় ইন্দ্রের বদলে গোবর্দ্ধন পাহাড়কে সকলে পূজা করেন। ইন্দ্র এতে অপমানিত হয়ে সপ্তাহ ধরে শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতে বৃন্দাবন ধ্বংস করে ফেলতে চেষ্টা করেন : কৃষ্ণ তখন গোকুল ও গোপদের রক্ষা করার জন্য বাঁ হাতের এক আঙুলে গোবর্দ্ধন পাহাড় মাটি থেকে তুলে ছাতার মত ধরে বৃন্দাবন বাসীদের রক্ষা করেন। কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে বৈষ্ণবরা পূর্বাহ্ণে গোবর্দ্ধন পূজা করেন। মথুরাতে গোবর্দ্ধন পাহাড়কে অর্চনা ও প্রদক্ষিণ করা হয়। অন্যত্র অন্ন বা গোময় দিয়ে পাহাড় তৈরি করে অর্চনা করা হয়।

গোবাসন—শিবি দেশের রাজা ; মেয়ে দেবিকা ; যুধিষ্ঠিরকে (দ্র) স্বয়ংবরে বিয়ে করেন।

গোবিতত—বিশেষ এক ধরণের অশ্বমেধ। ভরতের জন্য কণ্ব এই যজ্ঞ করেন।

গোভিল—সামবেদীয় কৌথুমী শাখার গৃহ্যসূত্রকার। এঁর অন্য গ্রন্থ সামবেদের নৈগেয় সূত্র ও পুষ্পসূত্র।

গোভিলগৃহ্যসূত্র—এই গ্রন্থে চার প্রপাঠক ও উনচল্লিশ কাণ্ডিকা, মোট সূত্র সংখ্যা ১০৬৯। প্রথম প্রপাঠকে সামান্য বিধি, গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য ব্রহ্মযজ্ঞ ও অন্যান্য যজ্ঞের বিধি আছে। দ্বিতীয় প্রপাঠকে বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তকরণ, জাতকর্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন ইত্যাদি। তৃতীয় প্রপাঠকে গোদান, আদিত্য ব্রত, বেদাধ্যয়ন ব্রত, সমাবর্তন, গোযজ্ঞ, অশ্বযজ্ঞ, শ্রাবণী আশ্বযুজী, আগ্রহায়ণী, অষ্টকা প্রভৃতির বিবরণ। চতুর্থ প্রপাঠকে রয়েছে বিবিধ অম্বষ্টকা, নানা কার্য সিদ্ধির উপায় ও গৃহারম্ভ ইত্যাদি।

এই গ্রন্থের মন্ত্রগুলি আংশিক ভাবে সামবেদ থেকে নেওয়া ; অবশিষ্ট অংশ মন্ত্রব্রাহ্মণ থেকে। সামবেদীয় কৌথুমী শাখার ব্রাহ্মণদের বিবাহ উপনয়ন ইত্যাদি সংস্কারের মন্ত্রগুলির চয়নিকা এই মন্ত্রব্রাহ্মণ। সায়ণাচার্যের মতে গোভিল গৃহ্যসূত্র

সামবেদীয় আটখানি ব্রাহ্মণের অন্যতম। সামবেদীয় গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে এটি প্রাচীনতম এবং সেই সময়ের আচার অনুষ্ঠানের বর্ণনা এতে পাওয়া যায়।

গোমন্ত—একটি পর্বত। অপর নাম গোম বা রৈবতক।

গোমতী—একটি নদী। অপর নাম কৌশিকী। ঋচীকের স্ত্রী ছিলেন কৌশিকী। ঋচীক এক বার ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সঙ্গে দেখা করতে যান। কৌশিকী বিরহে কাতর হয়ে স্বামীকে অনুসরণ করেন। পথে ঋচীক জানতে পারেন এবং শাপ দিয়ে নদীতে পরিণত করেন। একটি মতে এই কৌশিকী বিশ্বামিত্রের বোন। গোমতী নদীর অধিপতি গোমতী দেবী বরুণের সভাতে থাকেন। (২) বিশ্বভুক নামে অগ্নিদেবের স্ত্রী গোমতী নদী (গোপতি। মহা ৩।২০৯।১৯)।

গোমুখ—গঙ্গোত্রী (দ্র) হিমবাহ গঙ্গোত্রীর দ-পূর্বে বর্তমানে যেখানে গলে নদীরূপ পরিণত। আগে হিমবাহ গঙ্গোত্রীতে গলে নদীতে পরিণত হত। গোমুখের (৩৮৩১মি) কাছে রক্তবর্ণ নামে একটি ছোট হিমবাহ এসে মিশেছে। এই গোমুখের কাছে একটি পাথরের ওপর বসে রাজা ভগীরথ গঙ্গার তপস্যা করেছিলেন; এই পাথরটির নাম ভগীরথ শিলা। এখানে নদীগর্ভ থেকে একটু উঁচুতে গঙ্গার মন্দির আছে এবং গঙ্গার পায়ের কাছে ভগীরথের মূর্তি আছে। মন্দির দ্বারে বিভিন্ন রঙের কাপড়ের ফালি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। শীত কালে এখানে জল জমে যায়। এখানকার বাড়ির ছাদ আলগা ভাবে বসান শ্লেট পাথর দিয়ে তৈরি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা এখানে থাকেন। শীতকালে জায়গাটি জনশূন্য হয়ে যায়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে পশু-চারণের জন্য বহু পশু আনা হয়। এখানকার সামরিক গুরুত্ব আছে। স্থানীয় লোকেরা মঙ্গোলীয়, তিব্বতী ও ভারতীয় জাতিগুলির মিশ্রণে উদ্ভূত। (২) এক জন অসুর। (৩) ইন্দ্রের সারথি মাতলির ছেলে।

গোম্মটেশ্বর—শ্রবণবেলগোলায় প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেবের ছেলে বাহুবলির বিশাল মূর্তি স্থাপিত করেন (৯৮০-৯৮৩ খৃ) চামুণ্ড রায়। চামুণ্ড রায়ের আর এক নাম ছিল গোম্মট। ফলে এই মূর্তির নাম গোম্মটেশ্বর। চামুণ্ড রায় ছিলেন গঙ্গাবংশীয় রাজা দ্বিতীয় মারসিং ও দ্বিতীয় রাজমল্লের মন্ত্রী ও সেনাপতি। গোম্মট শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট, চিত্তাকর্ষক।

গোম্মটসার—নেমি চন্দ্র সিদ্ধান্ত চক্রবর্তী কৃত জৈনতত্ত্বের বই পঞ্চসংগ্রহ। চামুণ্ড রায়কে এই বই উৎসর্গ করার জন্য এর নাম গোম্মটসার।

গোলক—বিষ্ণুর আবাসস্থল। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত লোকের ওপর একটি লোক। ব্রহ্মবৈবর্ত মতে বৈকুণ্ঠের ওপর গোলক। আয়তনে পঞ্চাশ কোটি যোজন। এই গোলক বায়ুর ওপর অবস্থিত। এখানে একটি বৃন্দাবন নামে বন আছে এবং এখানে কৃষ্ণ রাধিকা বিহার করেন।

গোয়া—১৪°৫৩´-১৫°৪৮´ উ ৭৩°৪৫´-৭৪°২৪´ পূ। ভারতের পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই থেকে ৪০০ কি-মি দ-পূ। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণে নাম গোমনচালা, গোয়াপুরী, গোপকাপুর, গোপকা পাটনা ইত্যাদি। পরবর্তী যুগে বাণাভসির কদম্ব রাজ্যের অন্তর্গত হয়। পরে বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের অধীনে আসে।

গোয়ালিয়র—মধ্যপ্রদেশের একটি জেলা ও সহর। ২৫°৩৪´—২৬°২১ উ, এবং ৭৭°৪০´—৭৮°৫৪ পূ। পৌরাণিক নাম গোপ পর্বত, গোপগিরি বা গোপাদ্রি। এক পাহাড়ি সাধুর কৃপায় সুরয মেন নামে জনৈক ব্যক্তি কুষ্টরোগ মুক্ত হয়ে প্রতিদানে পাহাড়ের ওপর গোয়ালিপ্বার নামে একটি দুর্গ তৈরি করে দেন। গোয়ালিপ্বার ক্রমে গোয়ালিয়রে পরিণত হয়েছে। এই দুর্গ অতি প্রাচীন; ৫২৫ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপিতে এর উল্লেখ আছে। গোয়ালিয়রের শাসক মণ্ডলী নাগেরা খৃ ১-শতকে রাজত্ব করতেন। রাজধানী ছিল পদ্মাবতী (বর্তমানে পদম পওয়ায়া)। এর পর কুষাণ, গুপ্ত, হুন, প্রতীহার বংশ যথাক্রমে এখানে রাজত্ব করেন।

গোরক্ষনাথ—নাথ বা যোগী সম্প্রদায়ের সুপ্রতিষ্ঠাতাদের এক জন। কিংবদন্তি ৮ শতক থেকে ১৬ শতক পর্যন্ত বার বার তিনি আভির্ভূত হয়েছিলেন। নাথপন্থীদের বিশ্বাস সত্যযুগে পাঞ্জাবে, ত্রেতায় গোরক্ষপুরে, দ্বাপরে হরমুজ-এ এবং কলিতে কাঠিওযাড়ের গোরক্ষমটীতে বাস করতেন। নেপালেও কিছু দিন বাস করে ছিলেন। ঐতিহাসিক সাক্ষ্যে ১১ শতকের লোক মনে হয়। কিংবদন্তি প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন পরে আদিগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য হন। গোরক্ষনাথ সম্ভবত কবীরের মত কোন অখ্যাত বংশের সন্তান। কাহিনী আছে ঈশ্বরের সন্তান; অন্য মতে মহাদেবের জটা থেকে জন্ম। আর এক মতে একটি পুত্রকামা নারী শিবের বরপূত ভস্ম গোবরগাদায় ফেলে দিলে বার বছর পরে সেই স্তুপ থেকে জন্ম; এই জন্য নাম গোরক্ষ নাথ।

বিশ্বাস উত্তর পশ্চিম ভারতের কোথাও জন্ম। উত্তর প্রদেশে গোরক্ষপুরে তাঁর মন্দির আছে। তাঁর লিখিত যা কিছু পাওয়া গেছে সেগুলির ভাষা মিশ্রিত হিন্দি। তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত স্থানগুলির বেশির ভাগই উত্তর ভারতে। তাঁর শিষ্যা ময়নামতী (বাংলার কোন রাজমহিষী হলেও) উজ্জয়িনীর রাজকন্যা এবং ভর্তৃহরি জালন্ধর ইত্যাদি শিষ্যরাও বাঙালী নন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কানফাটা যোগী সম্প্রদায় এখনও হিমালয়েই বেশি দেখা যায়। নাথপন্থীদের বিশ্বাস তিনিই পরমপুরুষ। শিবের অবতার রূপে পূজিত হতেন। নেপালের দেবতা পশুপতি নাথ হলেও মুদ্রায় গোরক্ষনাথের নাম থাকে। গোর্খা জাতির ইনি ইষ্টদেবতা এবং এঁর নাম থেকেই গোর্খা নাম। মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাব শেষ হলে সমগ্র নেপালে তিনি পূজিত হতেন।

হঠযোগ বা কায়সাধনার দ্বারা দেহকে পরম সত্য উপলব্ধির উপযোগী করে তোলা হচ্ছে নাথপন্থদের তপস্যা। হঠযোগ গ্রন্থে ও গোরক্ষবোধ গ্রন্থে নাথ পন্থদের হঠযোগসাধনের ইঙ্গিত আছে। তাঁর নাদানুসন্ধানও সাধনার অঙ্গ। নাথ মার্গে তন্ত্র ও রহস্যবাদ এসে মিশেছে এবং গোরক্ষনাথের অবদানও এখানে প্রচুর। তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'গোরক্ষনাথ কী গোষ্ঠী'। হিন্দি ভাষারও তিনি অন্যতম স্রষ্টা বলে ধরা হয়। গোরক্ষবোধ গ্রন্থ নাথ সম্প্রদাযের গীতা; এতে তাঁর ধর্মমত আলোচিত হয়েছে; বইটি ১১ শতকের।

গোরক্ষপুর—২৫°৩৮´-২৭°৩০´ উ ৮২°১৩-৮৬°২৬´ উত্তরপ্রদেশের একটি জেলা। গোরক্ষ পুরবিভাগের অন্তর্গত। গোরক্ষপুর সহর ২৬°৪৫´ উ, ৮৩°২২´ পূ; রাপ্তী নদীর তীরে। ১৪০০ খৃ এই সহরে গোরক্ষনাথের মন্দির স্থাপিত হয়। এই জেলায় বহু বৌদ্ধ স্তুপ

ও বিহার আছে। সবগুলি খনন করা হয় নি। কাসিয়ার স্তূপটি বিখ্যাত ; এখানে মন্দিরের ভেতর বুদ্ধের শায়িত মূর্তি আছে। জেলার দক্ষিণে স্কন্দগুপ্তের একটি স্তম্ভ (খৃ-পূ ৬৬০) আছে। কনৌজ হিন্দুরাজদের বহু তাম্রলিপি এখানে পাওয়া গেছে।

গোরু—মিশরে, সুমেরীয় সভ্যতায়, ক্রিটে, হিত্তি রাজ্যে গাভী ও ষাঁড় বিশেষ ভাবে পূজিত হয়েছে। হরপ্পা সংস্কৃতিতে ভারতীয় গরুর প্রাচীনতম নির্দশন পাওয়া যায়। সেখানে ককুদ সহ ও ককুদ হীন দু রকম ষাঁড়েরই সিল পাওয়া গেছে। বৈদিক যুগে জীবন যাত্রা গোপালকের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল। সে যুগে গরুর মাধ্যমে সম্পদের পরিমাণ হত। গোত্র শব্দটির মূল অর্থ গোশালা। পূষা ছিলেন হারান গোরুর উদ্ধারকারী দেবতা। কার গোরু চিনবার জন্য গোরুর কাণে চিহ্ন করে দেওয়া হত। ঋক বেদের পরের সংহিতা গুলিতে কৃষিতে ও শকটে গোরুর ব্যবহার ক্রমবর্দ্ধমান হিসাবে দেখা যায়। ছয়, আট বার বা চব্বিশটি গরু জুড়েও হাল চালনা করা হত। বলদেরও ব্যবহার ছিল। বসিষ্ঠ ইত্যাদি মুনির হাজার হাজার গরু রীতিমত বড় দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। শিষ্যেরা এই গরুগুলির দেখা শোনা করত। সার হিসাবে গোবরও ব্যবহৃত হত। গোচর্ম থেকে ধনুকের ছিলা হত। রাজারা বহু গরু এক সঙ্গে দান করতেন। বিরাট রাজার গরু চুরি করতে ভীষ্ম নিজেও গিয়েছিলেন। গরু অভুক্ত থাকলে অনধ্যায় বিহিত ছিল। মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে গরুর উপস্থিতি কম নয়। বৃহৎ-সংহিতার (খৃ ৬-শতক) গোরুর অবযব সংস্থান বিষয়ক কিছু আলোচনা আছে। গোরুর মলমূত্রও পবিত্র বলে পরিগণিত হয় ও নানা দেবকার্যে ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত। পঞ্চগব্য পান ও পুণ্য জনক। গোবর জল দিয়ে মুছে জায়গা পবিত্র করা হয়।

গোরুর দাঁতে মরুৎ, জিবে সরস্বতী, চোখে চন্দ্রসূর্য, মূত্রে জাহ্নবী নদী বর্তমান। যেখানে গোরু সেখানেই লক্ষ্মী বিরাজিত। গাভীকে স্বয়ং ভগবতী স্বরূপা মনে করা হয়। গাভী সপ্ত মাতার এক জন। কার্তিকী শুক্লা প্রতিপদ ও অষ্টমীতে গোপূজার বিশেষ বিধান আছে। এই পূজার বিশিষ্ট অঙ্গ গোগ্রাম দান। চান্দ্রায়ণ ও প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে ও গোগ্রাম দানের নিয়ম আছে। এই উপলক্ষ্যে কচিঘাস, বাঁশ পাতা ইত্যাদি মাথায় নিয়ে গোরুকে দিলে গোরু যদি স্বচ্ছন্দে খায় তাহলে শুভ। শাস্ত্রে গোদানের মাহাত্ম্য ও প্রকার ভেদ বর্ণিত রয়েছে। সমস্ত পাপ মুক্ত হয়ে যম দ্বারে তপ্ত বৈতরণী অনায়াসে পার হবার উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পূর্বে সবৎসা ধেনু দানের বিধান আছে। মৃতের স্বর্গ কামনায় ষোড়শ দানের মধ্যে গোদান অন্যতম। বৃষোৎসর্গ ও চন্দনধেনু দান শ্রাদ্ধের অঙ্গ।

বৈদিক যুগে শূলগব, গবাময়ন প্রভৃতি নানা যজ্ঞে গরু মারা হত ও মাংস খাওয়া হত। বাড়িতে বিশেষ অতিথি এলে মধুপর্কের মাংসের জন্য গরু বধ করা হত। এ জন্য অতিথির আর এক নাম গোঘ্ন। দ্রঃ চর্মণ্বতী। কালক্রমে এই গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ পাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দৈবাৎ কোন কারণে গরু মেরে ফেললে বা কোন ত্রুটির জন্য বা বাড়িতে দৈবদুর্বিপাকে গরু মারা গেলে নানা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা রয়েছে।

গোসাল মঙ্খলিপুত্র—পিতা মঙ্খলি, মা ভদ্দা (=ভদ্রা)। একদিন ভিক্ষার জন্য ঘুরতে

ঘুরতে বর্ষাতে শ্রাবস্তী নগরের কাছে সরবণ নামে একটি জায়গায় গোবহুল নামে এক ধনী ব্রাহ্মণের গোশালায় আশ্রয় নেন এবং এখানে জন্ম বলে নাম হয় গোসাল মঙ্খলিপুত্ত। মহাবীরের সন্ন্যাস গ্রহণের তৃতীয় বছরে নালন্দায় গোসালের সঙ্গে মহাবীরের দেখা হয় এবং পণিয়ভূমী নামে গ্রামে গোসাল এঁর শিষ্য হয়ে সন্ন্যাসী হন এবং দু জনে এক সঙ্গে এখানে ছয় বছর কাটিয়ে দেন। এর পর এঁদের মত ভেদ হলে গোসাল শ্রাবস্তীতে চলে যান। এখানে হলাহল নামে এক কুম্ভকারের বাড়িতে ছয় মাস কঠোর তপস্যা করে জিনত্ব পান। জিনত্ব পেয়ে আজীবিক নামে নতুন এক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠান করেন ও মহাবীরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। এর পর এক দিন শ্রাবস্তীতে আবার মহাবীরের সঙ্গে দেখা হয় এবং তার সাত দিন পরে গোসাল মারা যান। চব্বিশ বছর গোসাল সন্ন্যাসী হয়ে জীবন যাপন করেছিলেন।

গৌড়—পশ্চিম বাংলা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের প্রাচীন নাম। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এর উল্লেখ আছে। গুড় উৎপাদনের প্রাচুর্যের জন্য নাম। খৃষ্টীয় ৭-শতকে শশাঙ্ক এখানে রাজা ছিলেন।

গৌড়পাদ—প্রাচীন অদ্বৈত সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ আচার্য। শঙ্করাচার্যের পরম গুরু। অথর্ব বেদের মাণ্ডুক্যোপনিষদের ওপর একটি বিবরণাত্মক কারিকা রচনা করেন। তবে এই গৌড়পাদ এক ব্যক্তি নাও হতে পারেন। সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তির মিলিত প্রচেষ্টাও এই কারিকা হতে পারে। সাংখ্যকারিকা ভাষ্য, উত্তরগীতাবৃত্তি ইত্যাদি আরো বহু গ্রন্থ আছে।

গৌড়ী—সংস্কৃতে একটি বিশেষ রচনা রীতির নাম। পূর্ব ভারতের কবিরা (বাংলা বিহার, আসাম, ওড়িশা) এই রীতি অনুসরণ করতেন। দণ্ডী এই রীতির ব্যখ্যা করে চারটি বিশেষত্ব দেখিয়েছেন : অনুপ্রাস প্রিয়তা, অতিশয়োক্তি, দুরূহ শব্দের আধিক্য ও শ্লেষ। দণ্ডীর কাব্যাদর্শে এই অঞ্চলের প্রাকৃতকে গৌড়ী প্রাকৃত বলা হয়েছে এবং একটি প্রধান আঞ্চলিক প্রাকৃত বলে গণ্য করা হয়েছে।

গৌতম—ন্যায় সূত্রকার অক্ষপাদ (দ্রঃ) গৌতম। মন্ত্রদ্রষ্টা, গোত্রপ্রবর্তক, সংহিতাকার গৌতমের অপর নাম গোতম (দ্রঃ)। রামায়ণে অহল্যার (দ্রঃ) স্বামী ও গৌতম। শরদ্বানের এবং তার ছেলে কৃপ ও কৃপীও গৌতম এবং গৌতমী বলে অভিহিত। জনক বংশের পুরোহিত শতানন্দও গৌতম। মৎস্য পুরাণে ঋষি দীর্ঘ-তমার নামও গোতম। অক্ষপাদকে বহু জায়গায় গোতম বলা হয়েছে। অন্য মতে দীর্ঘতমা সুরভির প্রসাদে অন্ধতা মুক্ত হয়ে গোতম নাম পান এবং তপস্যায় ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। ইনিই অক্ষপাদ নাম পেয়েছিলেন। গোত্র-প্রবর্তক সংহিতাকার গৌতমের, একটি মতে, প্রকৃত নাম ভরদ্বাজ; সম্ভবত ইনি হিন্দু যুগের মধ্য বা শেষ ভাগের লোক। গৌতম জন্মালে গৌ (=আলো) ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে তম (অন্ধকার) সরে যায় ফলে নাম গৌতম। কোন গৌতমেরই বংশ পরিচয় জানা নাই।

অহল্যার স্বামী গৌতম, ছেলে শতানন্দ, শরদ্বান ও চিরকারী। হাতে শর নিয়ে জন্ম বলে নাম শরদ্বান, প্রতি কাজ করার আগে দীর্ঘ সময় চিন্তা করতেন বলে নাম চিরকারী। গৌতমের একটি মেয়ের নাম পাওয়া যায় না; উত্তঙ্ক মাথায় করে সমিধের বোঝা নিয়ে এলে এই মেয়েটি উত্তঙ্কের কষ্টে কেঁদে ফেলেছিল। অপর

তিনটি মেয়ে জয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা। এই গৌতমের অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র এক বার আশ্রমে আসেন এবং অহল্যা (দ্রঃ) অতিথি সৎকার করেন। ইন্দ্র তারপর ফিরে গেলে গৌতম আসেন এবং অহল্যাকে সন্দেহ করে ছেলে চিরকারীকে গোপনে ডেকে অহল্যার শিরচ্ছেদের আজ্ঞা দিয়ে বনে চলে যান। চিরকারী কিন্তু ভাবতেই থাকেন কি করা উচিত। গৌতম এদিকে বনে গিয়ে চিন্তা করে দেখেন নিরপরাধ অহল্যাকে তিনি ঈর্ষায় এভাবে সন্দেহ করেছিলেন। ফলে তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরে আসেন এবং চিরকারী পিতাকে ফিরতে দেখে গৌতমের আদেশের কুফল বোঝাতে চেষ্টা করেন। গৌতম খুসি হয়ে ছেলেকে আশীর্বাদ করেন। ইন্দ্র পরে অহল্যার (দ্রঃ) সতীত্ব নষ্ট করলে ইন্দ্র ও অহল্যা দুজনকেই গৌতম শাপ দেন। গৌতমের প্রিয় শিষ্য উত্তঙ্ক (দ্র); শিক্ষা শেষেও একে বাড়ি ফিরে যেতে দেন নি। উত্তঙ্ক বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। রাজা কল্মাষপাদ শাপগ্রস্ত অবস্থায় শেষ দিকে গৌতমের কাছে এসে আশ্রয় নেন এবং এঁরই পরামর্শে গোকর্ণে গিয়ে শিবের তপস্যা করেন।

নোধা ঋষি ওরফে গৌতম/কাক্ষীবান ঋক্‌বেদে প্রথম মণ্ডলে ৫৮-শ-সূক্ত রচনা করেন। সপ্তর্ষিদের একজন। সত্যবানের পিতা দ্যুমৎসেনকে মতান্তরে দৃষ্টি ফিরে পাবার বর দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মাঝে দ্রোণকে উপদেশ দিয়েছিলেন যুদ্ধ বন্ধ করতে। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের সঙ্গেও দেখা করে গিয়েছিলেন। পারিযাত্র পর্বতের শিখরে আশ্রম নির্মাণ করে বহু বছর এখানে তপস্যা করেছিলেন এবং এখানে কাল এঁর অতিথি হন। বৃষাদর্ভিকে উপদেশ দিয়েছিলেন সৎকাজের জন্য কোন পুরস্কার আশা করা উচিত নয়। (২) যুধিষ্ঠিরের এক জন সভাসদ। এই গৌতম যখন গিরিব্রজে ছিলেন তখন উশীনরের দেশে এক শূদ্রা রমণীর সঙ্গে বাস করেছিলেন; কাক্ষীবান নামে এক ছেলে হয়েছিল। (৩) এক জন পণ্ডিত মুনি। ছেলে একত, দ্বিত ও ত্রিত। (৪) একজন মুনি; ইনি একবার বনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় একটি ক্লান্ত হস্তী শিশু দেখতে পান। আশ্রমে এনে একে পালন করেন। এটি বড় হয়ে উঠলে ইন্দ্র ধৃতরাষ্ট্রের বেশে এসে গোপনে হাতীটিকে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ধরা পড়ে যান এবং এক হাজার গরু ও প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে হাতীটিকে নিতে চান। তবু গৌতম দিতে চান না। পালিত জীবটির প্রতি এই প্রগাঢ় ভালবাসা দেখে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে দু জনকেই স্বর্গে নিয়ে যান। (৫) এক জন অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পিতামাতাকে ত্যাগ করে নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে এক বনে আসেন। এখানে বনবাসীদের সঙ্গে/ দস্যুদের সঙ্গে কুটির বেঁধে বাস করতে থাকেন এবং একটি বনবাসী বিধবা নারীকেও বিয়ে করেন। এই ভাবে বাস করার সময় এক দিন এক ব্রাহ্মণ বালক/এক বেদজ্ঞ বন্ধু এসে উপস্থিত হয়। রাত্রিতে কোন ব্রাহ্মণ গৃহস্বামী না পেয়ে এঁর কাছে অতিথি হন এবং এই ভাবে জীবন যাপন করতে দেখে নিজের গৃহে ফিরে যাবার জন্য উপদেশ দেন। পর দিন সকালবেলা অতিথি কোন অন্নগ্রহণ না করে চলে গেলে গৌতম অতিথির উপদেশের কথা ভাবতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত এখানকার জীবন যাত্রা ফেলে রেখে আবার বার হয়ে পড়েন। পথে একটি সার্থবাহ দলে যোগ দেন; কিন্তু পথে বুনো হাতীর আক্রমণে বহু বণিক নিহত হয়; গৌতম দল থেকে পালিয়ে যান।

একা যেতে যেতে এক বট গাছের নীচে আশ্রয় নেন। সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মার সখা কশ্যপ পুত্র বকরাজ নাড়িজঙ্ঘ ব্রহ্মলোক থেকে নেমে আসেন ; পৃথিবীতে ইনি রাজধর্মা নামে প্রসিদ্ধ। ইনি গৌতমের অতিথি হন। অন্য মতে গৌতম এঁর অতিথি হয়েছিলেন ; বিশেষ বন্ধুতা হয়ে গিয়েছিল ; নদী থেকে মাছ এনে খাওয়াতেন এবং নিজের পাখা দিয়ে ব্রাহ্মণকে বাতাস দিতেন। আর এক মতে ঐ বট গাছে শকুনি নাড়িজঙ্ঘ বাস করত ; গৌতম একে ধরে খেতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু নাড়ি জঙ্ঘ ব্রাহ্মণকে খেতে দিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। গৌতম অত্যন্ত গরিব, কিছু অর্থ চান। নাড়িজঙ্ঘ তখন মেরুব্রজ নগরে তাঁর বন্ধু রাক্ষস বিরূপাক্ষের কাছে যেতে বলেন। কার্তিক পূর্ণিমার দিন ঐখান থেকে তিন যোজন দূরে এসে বিরূপাক্ষের সঙ্গে গৌতম দেখা করলে প্রথমে বিরূপাক্ষ পরিচয় চান। গৌতম আচার ভ্রষ্ট জেনে রাক্ষসরাজ অত্যন্ত দুঃখিত হন কিন্তু তবুও হাজার ব্রাহ্মণের সঙ্গে বসিয়ে তাঁকেও ভোজন করান এবং প্রচুর ধনরত্ন দেন। গৌতম বহু কষ্টে এই সব দান মাথায় নিয়ে আবার বটগাছের নীচে ফিরে আসেন। বকরাজ রাজধর্মা গৌতমের পরিচর্যা করেন রাত্রে দু জনে এক জায়গায় শুয়ে পড়েন। কিন্তু মাংস খাবার লোভে/বা পথের খাবার হিসাবে বন্ধুকে হত্যা করে তার মাংস নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। বিরূপাক্ষ এর পর দু দিন নাড়িজঙ্ঘকে দেখতে না পেয়ে অন্যমতে পরদিনই ছেলেকে বন্ধুর খোঁজে পাঠান। ছেলে এসে বকরাজের হাড় পালক ইত্যাদি পড়ে আছে দেখে কি হয়েছে বুঝতে পারেন এবং অনুসরণ করে গৌতমকে পিতার কাছে ধরে নিয়ে যান। বকরাজের জন্য বিরূপাক্ষ অভিভূত হয়ে পড়েন এবং রাক্ষসদের বলেন গৌতমকে খেয়ে ফেলতে। কিন্তু গৌতমের পাপ-দেহ কেউ খেতে চায় না। গৌতমকে তখন টুকরো টুকরো করে দস্যুদের খেতে দেওয়া হয় কিন্তু এরাও খায় না। শেষ কালে কাকদের খেতে দেওয়া হল।

বিরূপাক্ষ এর পর নাড়িজঙ্ঘের সৎকারের আয়োজন করলে দক্ষ কন্যা সুরভি আসেন এবং তাঁর মুখের ফেনা চিতার ওপর পড়লে বকরাজ আবার বেঁচে ওঠেন। অন্য মতে ব্রহ্মার নির্দেশে স্বর্গ থেকে সুরভি দুধ বৃষ্টি করেছিলেন। এই সময় ইন্দ্র এসে জানান ব্রহ্মার সভায় এক বার না যাবার জন্য ব্রহ্মার শাপে বকরাজের এই মৃত্যু হয়েছিল। তার পর বকরাজের অনুরোধে ইন্দ্র গৌতমকেও বাঁচিয়ে দেন।

গৌতম এরপর শবরালয়ে গিয়ে আবার একজন শূদ্রা মহিলাকে বিয়ে করেন এবং বহু দুষ্ট সন্তানদের জন্ম দিতে থাকেন। ফলে দেবতাদের অভিশাপে নরকে গতি হয়।

গৌতমী—গোতমী (দ্র)।

গৌরপ্রভা—ব্যাসের ছেলে শুক ; শুকের স্ত্রী পীবরী ; এঁদের চার ছেলে কৃষ্ণ, গৌরপ্রভা, ভূরি ও দেবশ্রুত এবং একটি মেয়ে কীর্তি।

গৌরমুখ—শমীক মুনির ছেলে রাজা পরীক্ষিৎ-কে শাপ দিলে শিষ্য গৌরমুখকে দিয়ে শমীক রাজার কাছে শাপের কথা জানিয়ে দেন।

গৌরী—(১) ব্রহ্মা নিজের দেহ থেকে গৌরীকে সৃষ্টি করে রুদ্রকে দান করেন। তপস্যার জন্য রুদ্র জলে ডুব দিলে গৌরীকে ব্রহ্মা নিজের দেহে বিলীন করে নেন এবং

পরে দক্ষের হাতে তুলে দেন। এ দিকে দীর্ঘকাল তপস্যা করে জল থেকে উঠে রুদ্র পৃথিবীর সৌন্দর্য ও মানুষের পরিপূর্ণতা দেখে রাগে চিৎকার করতে থাকেন। ফলে তাঁর কাণ থেকে ভূত, প্রেত, বেতাল ইত্যাদি ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে দক্ষযজ্ঞ, নষ্ট করে এবং দেবতাদের ওপর অত্যাচার করতে থাকে। বিষ্ণু তখন রুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ব্রহ্মা এই যুদ্ধ মিটিয়ে দিয়ে গৌরীকে ফিরিয়ে দিতে বলেন এবং কৈলাসে রুদ্রের বাসস্থান ঠিক করে দেন। দক্ষ যজ্ঞ ও অমৃত নষ্ট করে দিয়েছিলেন রুদ্র। গৌরী এ জন্য দুঃখে হিমালয়ে কঠোর তপস্যায় রত হলে তাঁর দেহ ছাই হয়ে যায় এবং উমা হয়ে হিমালয়ের ঘরে জন্মান এবং মহাদেবকে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। তুষ্ট হয়ে মহাদেব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে ভিক্ষা করতে আসেন। উমা বৃদ্ধকে স্নান করে আহার করতে বলেন। গঙ্গায় স্নান করতে নামলে এক মকর আক্রমণ করলে সাহায্যের জন্য বৃদ্ধ উমাকে ডাকতে থাকেন। উমা এগিয়ে এসে বৃদ্ধের হাত ধরলে দেখেন স্বয়ং মহাদেবের হাত ধরেছেন। এর পর হিমালয় এঁদের বিয়ে দেন (বরাহ)। (২) পার্বতীর অন্য নাম গৌরী। হিরণ্যাক্ষের ছেলে অন্ধক মন্দার পাহাড়ে গৌরীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে হস্তগত করবার চেষ্টা করেন। প্রহ্লাদের নিষেধেও অন্ধক কাণ দেন না। ফলে গৌরী শতরূপা হয়ে অন্ধককে নির্যাতন করেন। (৩) বরুণের স্ত্রী। (৪) দ্রঃ কুভা।

গৌহাটি—আদি নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। মহাভারতের রাজা ভগদত্তের রাজধানী। পরে কোচ প্রভৃতি জাতির অধিকারে আসে। এখানে শাক্ত বৈষ্ণব ও শৈব মন্দির আছে। এর মধ্যে নীলাচলে কামাখ্যা দেবীর মন্দির একটি পীঠস্থান। উত্তর গৌহাটিতে অশ্বক্রান্ত কুণ্ড আছে। সহরের দক্ষিণে বশিষ্ঠ আশ্রম।

গ্রন্থাগার—প্রাচীন ভারতে নালন্দা, তক্ষশীলা ও বিক্রমশিলার গ্রন্থাগার বিখ্যাত ছিল।

গ্রন্থিক—পাণ্ডবদের অজ্ঞাত বাসের সময় নকুল এই নামে বিরাট ভবনে ছদ্মবেশে বাস করতেন।

গ্রহ—পুরাণ ও জ্যোতিষশাস্ত্রে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতুকে গ্রহ বলা হয়েছে। এই নয়টি নবগ্রহ। বিজ্ঞানে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহ নয়; সূর্য একটি নক্ষত্র; চন্দ্র উপগ্রহ এবং রাহু ও কেতু (দ্রঃ) দুটি নভো বিন্দু। রাহু ও কেতু বিষুব বৃত্ত ও ভূবৃত্তের ছেদ বিন্দু; এবং যেহেতু বিন্দু সেই হেতু এদের কোন ভরও নাই।

গ্রহণ—পুরাণ অনুসারে রাহু (দ্র) আক্রোশ বশে সূর্য বা চন্দ্রকে গ্রাস করতে যান। বিষ্ণু অমৃত পরিবেশন করছিলেন। সূর্য ও চন্দ্র রাহুকে ধরিয়ে দিলে বিষ্ণু চক্রের আঘাতে রাহুর মাথা কেটে ফেলেন। কিন্তু যেহেতু অমৃত রাহুর গলা পর্যন্ত গিয়েছিল সেই হেতু রাহুর মাথা অমর হয়ে থাকে এবং চির দিন চন্দ্র সূর্যকে গ্রাস করতে এসেছে। গ্রহণের সময় অতি পুণ্যকাল; স্নানদান শ্রাদ্ধ ইত্যাদি প্রশস্ত। এই সময় যে কোন জল গঙ্গাজল তুল্য; সমস্ত ব্রাহ্মণ ব্যাসের সমান। এই সময়ে ভোজনের ও বিদেশ যাত্রা ইত্যাদির নানা বিধি নিষেধ আছে।

গ্রীবা—তাম্রার একটি মেয়ে।

ঘ

ঘট কর্পর—ঘট ও কর্পর দুই বন্ধু ; চোর। কর্পর এক বার রাজকুমারীর ঘরে চুরি করতে ঢোকে ; ঘট দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। কর্পর ঘরে ঢুকে রাজকুমারীকে সম্ভোগ করে ; রাজকুমারী খুসি হয়ে কিছু অর্থ দান করে এবং আবার আসতে বলে। কর্পর বার হয়ে এসে ঘটকে সব কথা জানায় এবং প্রাপ্ত অর্থ সবটাই দিয়ে দেয়। এর পর কর্পর আবার রাজকুমারীর ঘরে এসে সারা রাত সম্ভোগ করে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে এবং সকালবেলা প্রহরীর হাতে রাজকুমারী ও কর্পর দুজনেই ধরা পড়ে যায়। কর্পরের মৃত্যু দণ্ড হয়। বধ্যভূমিতে যাবার সময় ঘটের সঙ্গে দেখা হয় এবং কর্পর অনুরোধ করে যায় রাজকুমারীকে রক্ষা করতে। ফলে ঘট রাজকুমারীকে চুরি করে নিয়ে যায়। রাজা চার দিকে খোঁজ করতে থাকেন এবং প্রহরীদের নির্দেশ দেন কর্পরের শব যদি কেউ দেখতে আসে তাকেও যেন বন্দী করা হয়। কারণ নিশ্চয়ই কর্পরের সে ঘনিষ্ঠ কেউ ; এবং রাজকুমারীর খবর তার কাছে পাওয়া যেতে পারে। ঘট রাজার নির্দেশ জানতে পারে এবং পর দিন মাতাল সেজে সঙ্গে দুটি ভৃত্যকে নিয়ে এসে ধুতরা বীজ মেশান অন্ন কর্পরের শব প্রহরারত প্রহরীকে খেতে দেয়। প্রহরী অজ্ঞান হয়ে পড়লে ঘট মৃতদেহের অগ্নি সৎকার করে ফিরে যায়। খবর পেয়ে রাজা আবার পাহারা বসান কর্পরের অস্থি যে নিতে আসবে তাকে যেন ধরা হয়। কিন্তু ঘট এক সন্ন্যাসীর কাছে শেখা মন্ত্রের ফলে প্রহরীদের ঘুম পাড়িয়ে অস্থি নিয়ে চলে যায়। এর পর ঘট স্থির করে সেখানে থাকা নিরাপদ নয়। ঘুম-পাড়ান মন্ত্র যে দিয়েছিল সেই সন্ন্যাসীও রাজকুমারীকে নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। এ দিকে রাজকুমারী সন্ন্যাসীর প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে ঘটকে বিষ দিয়ে হত্যা করেন। (২) কিংবদন্তি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক জন। ঘটকর্পর কাব্যের রচয়িতা। ২৩-টি শ্লোকে শৃঙ্গার রসাত্মক এই কাব্য। প্রথম ছয় শ্লোকে বর্ষার বর্ণনা ; পরের শ্লোকগুলিতে বিরহিণী স্ত্রী মেঘকে দূত করে স্বামীর কাছে খবর পাঠাচ্ছেন। যমক ও অলঙ্কার সমৃদ্ধ ; এই জন্য নাম যমক-কাব্য। অভিনবগুপ্ত এর একটি টীকা লেখেন। অন্য মতে ভাসই ঘট-কর্পর। এঁর বিখ্যাত শ্লেষঃ—একঃ হি দোষঃ গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতি ইন্দুঃ ইতি যঃ বভাষে॥ নূনং ন দৃষ্টঃ কবিনাপিতেন দারিদ্র্যদোষঃ গুণরাশিনাশী। এখানে কবি নাপিতেন অর্থে কবিনা-অপি তেন এবং কবি রূপ নাপিতেন।

ঘটিকা—২৪ মিনিট। ছিদ্র যুক্ত ঘটে জল ভরে সময় হিসাব হত ফলে এই নাম। দ্র ঘড়ি।

ঘটোৎকচ—ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার (দ্র) গর্ভে জন্ম এক জন রাক্ষস। পাণ্ডব। ঘট অর্থে হাতীর মাথা ; উৎকচ অর্থে কেশহীন অর্থাৎ কেশহীন বিরাট মাথা। বিশাল দেহ, বিকৃত চোখ, শঙ্কুর মন কাণ, তীক্ষ্ণ দাঁত, ও বিকট কণ্ঠস্বর। রাক্ষসীদের নিয়ম গর্ভবতী হয়েই প্রসব করা। ঘটোৎকচ এই ভাবে জন্মেই যৌবন লাভ করে সব রকম

অস্ত্র প্রয়োগে দক্ষ হয়ে ওঠেন। ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞ বিদ্বেষী এবং ইন্দ্রের বরে ইন্দ্রের সমান শক্তিমান। ঘটোৎকচ তার পর পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান; কুন্তী এই সময়ে স্মরণ করিয়ে দেন পাণ্ডবদের সে বড় ছেলে। ঘটোৎকচও কথা দিয়ে ছিলেন স্মরণ করলেই ফিরে আসবেন। বদরিকাশ্রমের পথে ভীম স্মরণ করতেই ঘটোৎকচ এসে পরিশ্রান্ত দ্রৌপদীকে কাঁধে করে নরনারায়ণের আশ্রমে পৌঁছে দেন। কুরুক্ষেত্রে অলম্বুষ, অলায়ুধ, ও অকাসুর ইত্যাদি ও বহু বিপক্ষ সৈন্যকে নিহত করে ছিলেন। দুর্যোধন ও ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং কৌরবদের বহু ক্ষতি করেন। ছেলে অঞ্জনপর্বাকে অশ্বত্থামা নিহত করেন। যুদ্ধের ১৪-দিনের দিন কৌরবদের একান্ত চাপে অন্য মতে কর্ণ নিজে বিপর্যস্ত হয়ে বৈজয়ন্তী/একাঘ্নী অস্ত্রে একে নিহত করেন। এই অস্ত্র কর্ণ অর্জুনের জন্য রেখে দিয়েছিলেন। মরবার মুহূর্তে ঘটোৎকচ নিজের শরীরকে বহু গুণ বড় করে কৌরব সেনাদের ওপর গিয়ে পড়েন; ফলে বহু সৈন্য পিষে যায়। ঘটোৎকচের আর এক ছেলে বর্বরিক; কুরুক্ষেত্রেই মারা যায়। মৃত্যুর পর যক্ষলোকে যান। ব্যাস যখন মৃত আত্মীয় স্বজনদের এক দিনের জন্য দেখা করাতে এনেছিলেন তখন ঘটোৎকচও এসেছিলেন।

ঘটোদ্ভব—অগস্ত্য।

ঘড়ি—বৈদিক যুগে সময় নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা ছিল। সূর্য সিদ্ধান্ত ও নিদান সূত্রে কাল পরিমাণের উল্লেখ আছে; এগুলি ত্রুটি, লব, নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা নালিকা, মুহূর্ত, প্রহর ইত্যাদি। সূর্যের আলোতে ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ একটি শঙ্কুর ছায়া যখন বারো অঙ্গুলি দীর্ঘ হয় তখন তাকে এক ছায়া পুরুষ বলা হত। ছায়ার দৈর্ঘ্য ৭২ অঙ্গুলি হলে দিনের ১/১৪ এবং ৯৬ হলে দিনের ১/১৮ ধরা হত। ছায়া না পড়লে মধ্যাহ্ন ধরা হত। এর নাম ছিল শঙ্কুপট বা রবিচক্র। আর এক রকম ঘড়ি ছিল জলঘড়ি। কপালের মত দেখতে জলপূর্ণ একটি পাত্রের নাম ছিল কপালক। ৪-মাষা সোনা দিয়ে তৈরি জলপূর্ণ পাত্রের নির্দিষ্ট একটি ফুটো দিয়ে জল বার হয়ে যেতে যে সময় লাগত তাকে বলা হত ৪০ কাল বা ১ নালিকা (=২৪ মিনিট) =এক ঘটিকা (দ্র)।

ঘনট—বশিষ্ঠ বংশে এক ব্রাহ্মণ। শিবের তপস্যা করতেন। দেবলের মেয়েকে বিয়ে করতে চান। কিন্তু কুৎসিত পাত্রকে দেবল প্রত্যাখ্যান করলে মেয়েটিকে চুরি করে ঘনট বিয়ে করেন। ফলে দেবল শাপ দিয়ে পেচকে পরিণত করে দেন এবং বলেন ইন্দ্র-দ্যুম্নকে যে দিন সাহায্য করবে সে দিন মুক্তি পাবে।

ঘনপাঠ—বেদপাঠের বিশেষ একটি পদ্ধতি। জটাপাঠের মধ্যে যাতে কোন ভুল না হয় তার জন্য ঘনপাঠ। পদপাঠ ও ক্রমপাঠ মিলে এই ঘন পাঠ।

ঘণ্টাকর্ণ—ঘণ্ট ও কর্ণ দুই ভাই; এঁরা অসুর। অনেক সময় বড় ভাই ঘণ্টকে ঘণ্টা-কর্ণ নামেই অভিহিত করা হয়েছে। বিষ্ণুদ্বেষী কিন্তু শিবভক্ত। দারুক অসুর ব্রহ্মার বলে বলীয়ান হয়ে সারা পৃথিবীতে অত্যাচার করতে থাকেন। শিব তখন তাঁর তৃতীয় নেত্র থেকে ভদ্রকালীকে সৃষ্টি করেন এবং ভদ্রকালী অসুরকে নিহত করেন। ময়ের মেয়ে মন্দোদরী দারুকের স্ত্রী; শোকে বিহ্বল হয়ে তপস্যা করতে থাকে এবং শিব দেখা দিয়ে নিজের গায়ের কয়েক ফোঁটা ঘাম মন্দোদরীকে দেন। এই ঘাম যার গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হবে তার ছোট-বসন্ত হবে; এবং রোগীরা তখন মন্দোদরীকে

আরাধনা করবে। অর্থাৎ মন্দোদরীকে ছোট বসন্তের দেবীতে পরিণত করে দেন। পৃথিবীতে আসবার পথে মন্দোদরী ভদ্রকালীকে দেখতে পান এবং প্রতিহিংসায় ভদ্রকালীর গায়েই সেই ঘাম ছিটিয়ে দেন। ভদ্রকালী ভীষণ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। মহাদেব জানতে পেরে তখন ঘণ্টাকর্ণকে সৃষ্টি করেন; এই রাক্ষস ভদ্রকালীর গা থেকে বসন্তের সমস্ত গুটি চেটে পরিষ্কার করে নেন। এবং দুজনেই যেহেতু শিবের সন্তান সেই হেতু ভদ্রকালী তাঁর ভাই ঘণ্টাকর্ণকে মুখ চাটতে দেন না। সেই থেকে ভদ্রকালীর মুখে বসন্তের গুটি রয়েছে।

এই ঘণ্টাকর্ণ প্রথম দিকে কাণে ঘণ্টা বেঁধে রাখতেন এবং সব সময় মাথা নেড়ে ঘণ্টা বাজাতেন পাছে হরিনাম কোন মতে তাঁর কাণে ঢুকে যায়। এই জন্য নাম ঘণ্টাকর্ণ। অর্থাৎ বিষ্ণুদ্বেষী। ঘণ্টাকর্ণ পরে কুবের-এর অনুচর হন এবং মুক্তির জন্য তপস্যা করতে থাকেন। শিব দেখা দিলে মুক্তি চান এবং মহাদেব তখন বদরিকাতে নারায়ণের আশ্রমে গিয়ে বিষ্ণুর আরাধনা করতে বলেন। ফলে ঘণ্টাকর্ণ বিষ্ণু ভক্ত হন। অন্য মতে সাত্যকিকে/যাদবদের দ্বারাবতীর ভার দিয়ে কৃষ্ণ যখন কৈলাসে দেখা করতে যান তখন বদরিকাতে এক বার থামেন। এখানে কৃষ্ণ যখন ধ্যান করছিলেন তখন ঘণ্টাকর্ণ পিশাচদের সঙ্গে নিয়ে শিকারে বার হয়েছিলেন এবং কৃষ্ণের নাম করতে করতে এগিয়ে আসছিলেন। দেখে কৃষ্ণের করুণা হয় এবং জানতে চান সে কি চায়। ঘণ্টাকর্ণ জানান মহাদেব বর দিয়েছেন: বদরিকাতে এক দিন দেখা হবেই; বিষ্ণুকে সে দেখতে চায়। কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণুমূর্তিতে দেখা দিলে ঘণ্টাকর্ণ আনন্দে বিহ্বল হয়ে মৃত এক ব্রাহ্মণের দেহার্দ্ধেক বিষ্ণুকে উপহার দেন। রাক্ষস নীতিতে এই উপহার শ্রেষ্ঠ উপহার। বিষ্ণু খুসি হয়ে ঘণ্টাকর্ণের পিঠে হাত রাখেন; ঘণ্টাকর্ণ মুক্ত হয়ে যান। আর এক মতে কৃষ্ণ এসেছিলেন পুত্র লাভের আশায় হরপার্বতীর আরাধনা করতে। ঘণ্টাকর্ণ এঁকে দেখতে পেয়ে স্তব করে মুক্তি লাভ করেন।

ঘণ্টাকর্ণের বিগ্রহ মূর্তিতে আঠার হাত দেখা যায়। ডান দিকের হাতে বজ্র, তরবারি, চক্র ও বাণ রয়েছে; বাম দিকের হাতে কাঁটা, তরবারি, দড়ি, ঘণ্টা ও গাঁইতি রয়েছে। ছোট বসন্ত বিস্ফোটক ইত্যাদি চর্মরোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য এঁর পূজা করা হয়। বর্তমানে বাঙলাতে ঘেঁটু নামে পরিচিত। কালিপড়া মাটির হাঁড়িকে ঘেঁটু বলে পূজা করা হয়; পরে হাঁড়িটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। চৈত্র সংক্রান্তি বা অন্য সময়ে এই পূজা।

ঘূর্ণিকা—দেবযানীর পালিতা মাতা।

ঘৃতপৃষ্ঠ—প্রিয়ব্রতের স্ত্রী বিশ্বকর্মার মেয়ে সুরূপা। সুরূপার দশ ছেলে অগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, রুক্মশুক্র, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি ও বীতিহোত্র এবং একটি মেয়ে উর্জস্বতী।

ঘৃতাচী—একজন অপ্সরা। মহাভারত মতে ছ জন শ্রেষ্ঠ অপ্সরার মধ্যে এক জন। বহু ঋষির তপস্যা নষ্ট করেছেন এবং সন্তানের কারণ হয়েছেন। বিশ্বকর্মার ঔরসে ঘৃতাচীর মেয়ে চিত্রা/চিত্রাঙ্গদা (দ্রঃ)। দ্রঃ শুকদেব, ইন্দ্রপ্রমিতি, রুরু, কুশনাভ, রৌদাশ্ব, দ্রোণ, ভরদ্বাজ, নল, কান্যকুব্জ।

ঘোষযাত্রা—প্রাচীন কালে নিজেদের রাজ্যে ঘোষপল্লীগুলি রাজারা দেখতে যেতেন। রাজা সেখানে গরু বাছুর ও ষাঁড় সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য নিতেন এবং যা কিছু করণীয় উপদেশ দিতেন এবং গোয়ালাদের প্রয়োজনীয় অর্থ ও দ্রব্যাদি সাহায্য করতেন। গোয়ালারা ও তাঁদের স্ত্রীরা নাচ গানে এবং আতিথ্যে রাজাকে প্রীত করতেন। এর নাম ছিল ঘোষযাত্রা। এক দুষ্ট ব্রাহ্মণ ধৃতরাষ্ট্রকে বনে পাণ্ডবদের দুরবস্থার কথা জানালে কর্ণ শকুনি ইত্যাদির পরামর্শে এই রকম ঘোষযাত্রার ছলে পাণ্ডবদের দুর্দশা দেখবার জন্য/বা বিদ্রূপ করার জন্য দুর্যোধন সপরিবারে ও সসৈন্যে দ্বৈতবনে পাণ্ডবদের দেখতে এসেছিলেন। এখানে গন্ধর্ব চিত্ররথের সঙ্গে দ্বৈতবন সরোবরে দুর্যোধনের কলহ হয় এবং যুদ্ধে হেরে গিয়ে সপরিবারে বন্দী হন। দ্র অর্জুন।

ঘোষা—ঋক্‌বেদে বিখ্যাত এক তপস্বিনী। দীর্ঘতমা মহর্ষির নাতনি এবং কক্ষীবানের মেয়ে। শৈশবে কুষ্ঠ হয়েছিল। অশ্বিনী দেবতাদের একটি স্তব রচনা করে রোগমুক্ত হন; তখন বিয়ে হয়।

ঘোষিতারাম—দ্রঃ কৌশাম্বী।

চ

চক্রমন্দ—একটি সাপ। অনন্তের নির্দেশে বলরামের আত্মাকে নিয়ে যেতে এসে ছিলেন।

চক্ষুষ—গঙ্গার (দ্র) একটি শাখা।

চক্র—(১) গোল মত; প্রান্ত ধারাল, কোণযুক্ত। নীল জলের মত রঙ। কাজ ছেদন, ভেদন, নিপাতন, ও শায়িত করা। (২) বাসুকির এক ছেলে। সর্পযজ্ঞে নিহত হন। (৩) সুদর্শন চক্র। (৪) তান্ত্রিক ক্রিয়া ইত্যাদি। (৫) গাড়ির চাকা।

চক্রক—বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবাদী এক ছেলে। মহা ১৩।৪।৫৩।

চক্রব্যূহ—সেনা সন্নিবেশের বিশেষ একটি ব্যবস্থা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দ্রোণাচার্য এই ব্যূহ রচনা করেন। অভিমন্যু এটি ভেদ করে ভেতরে গিয়েছিলেন; কিন্তু বার হয়ে আসার উপায় জানতেন না। দুর্যোধনের ছেলে লক্ষ্মণ আক্রমণের নেতা হয়েছিলেন। ব্যূহের মাঝখানে কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও কৃপ ছিলেন। দ্রোণ ছিলেন ব্যূহের নেতা। ব্যূহের পাশে ছিলেন শল্য ও ভূরিশ্রবা। সিন্ধুরাজ ও অশ্বত্থামাও ছিলেন।

চট্টগ্রাম—২০°৩৫´-২২°৫৯´ উ × ৯১°৩০´-৯২°২৩পূ। একটি জেলা। এই জেলার পূর্বে অনুচ্চ তিনটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী। মধ্যের শ্রেণীটির উত্তরাংশের নাম সীতাকুণ্ড। জেলার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পাহাড় চন্দ্রনাথ। পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে চট্টগ্রামের নাম চট্টল। বৌদ্ধ শ্রমণরা একে রমাবতী বলেছেন। চট্টগ্রাম থেকে ৩০·৪ কি-মি দূরে ধর্মঘাট; চণ্ডীতে বর্ণিত মেধস্ মুনির সমাধির জন্য বিখ্যাত।

চট্টল—দ্রঃ চট্টগ্রাম।

চণ্ড—দৈত্য শুম্ভের প্রধান অনুচর ও সেনাপতি। ছোট ভাই মুণ্ড। শুম্ভের আদেশে কৌশিকী (দ্র) দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে চামুণ্ডার হাতে নিহত হন।

চণ্ডকৌশিক—(১) কক্ষীবানের ছেলে; গৌতমের নাতি, উদার প্রকৃতির এক জন মহাতপস্বী। সন্তানহীন মগধরাজ বৃহদ্রথকে আশীর্বাদ করলে ছেলে হয় জরাসন্ধ। (২) বিশ্বামিত্রের (কোপন স্বভাবের জন্য) আর এক নাম।

চণ্ডনায়িকা—অষ্ট নায়িকার এক জন। ভগবতীর এক সখী। অপর নাম চণ্ডা ও চণ্ডী।

চণ্ডপ্রদ্যোত—বুদ্ধদেবের জীবিত কালে ষোড়ষ মহা জনপদের অন্যতম অবন্তির রাজা। রাজধানী উজ্জয়িনী। বিম্বিসার ও তাঁর ছেলে অজাতশত্রুর সঙ্গে চণ্ডপ্রদ্যোত মহাসেনের যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। বিম্বিসার এক বার নিজের চিকিৎসক জীবককে চণ্ডপ্রদ্যোতের চিকিৎসার জন্য পাঠান। কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন প্রদ্যোতের শত্রু ছিলেন এবং প্রদ্যোতের মেয়েকে হরণ করে বিয়ে করেন। প্রদ্যোতের অনুরোধে বুদ্ধদেব মহাকচ্চায়ন নামে এক শিষ্যকে অবন্তিরাজ্যে ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত করেছিলেন। পাশের রাজ্যগুলির ওপর নিজ আধিপত্য স্থাপন করে চণ্ডপ্রদ্যোত শক্তিশালী হয়ে উঠে ছিলেন।

চণ্ডাল—স্মৃতিতে হিন্দু সমাজের নিম্নতম অস্পৃশ্য জাতি। মনু অনুসারে শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে জন্ম। কিন্তু সম্ভবত কোন অনার্য জাতি থেকে এদের উৎপত্তি। বৌদ্ধ জাতকে বহু স্থানে এদের ছায়া পর্যন্ত অশুদ্ধ। স্মৃতিতে আছে এদের স্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। ফা-হিয়েন লিখে গেছেন এরা সহরের বাইরে বাস করত; সহরে আসতে হলে দুটি কাঠি বাজিয়ে অপরকে সাবধান করে দিয়ে এগিয়ে আসত।

চণ্ডিকা—পার্বতীর উগ্রমূর্তি। অনেক সময় ২০ হাত। ১০ বা ১২ হাতও দেখা যায়।

চণ্ডী—(১) শিবের শক্তি। অন্য নাম চণ্ডিকা (দ্র) অর্থাৎ প্রচণ্ডা। (২) মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটি অধ্যায়; মন্ত্র সংখ্যা ৭০০; অন্য নাম সপ্তশতী। মেধস্ মুনি সুরথরাজ ও সমাধি নামে এক বৈশ্যের কাছে দেবীর স্বরূপ বর্ণনা করে এই কাহিনী বলেন। যুগে যুগে দেবী আবির্ভূত হয়ে কি ভাবে অসুরদের মেরে দেবতাদের উদ্ধার করেন তার তিনটি ঘটনা এই অংশে রয়েছে। মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ এবং মহিষাসুরের অনুচর ধূম্রলোচন-চণ্ডমুণ্ড-রক্তবীজ-শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ।

ঋকবেদে রুদ্রের মূর্ত ক্রোধকে 'মনা' বলা হয়েছে; এই মনাই যেন চণ্ডী। উমা-হৈমবতী নাম পাওয়া যায় প্রথমে কেন উপনিষদে। দুর্গা নাম প্রথম মেলে তৈত্তিরীয় উপনিষদে। ঋক্‌বেদের একটি সূক্তে এই দেবীকে অরণ্যানী বলা হয়েছে। উমা-হৈমবতী সুবেশা, সুন্দরী; ব্রহ্মের মর্মজ্ঞা, শিবের স্ত্রী। দুর্গা, চণ্ডী ঠিক সরাসরি শিবের স্ত্রী নন; ইনি দেবতাদের তেজ থেকে উৎপন্ন, বহুপ্রহরণধারিণী, সুন্দরী, সুসজ্জিতা, আট বা দশভুজা এবং সিংহবাহিনী। উমা-হৈমবতী আর্য কল্পনা; দুর্গা, চণ্ডী অনার্য কল্পনা, দুই মিলে এক হয়ে গেছে। দ্রঃ দুর্গা, কৌষীতকী।

চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস; জীবনের এই চারটি আশ্রম।

চতুরাস্য—এক জন অসুর। রম্ভার প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। স্বয়ংপ্রভা রম্ভার সখী; রম্ভাকে প্ররোচিত করে অসুরের সঙ্গে মিলন ঘটায়। এর পর রম্ভা ও চতুরাস্য দাক্ষিণাত্যে ময়ের তৈরি প্রাসাদে বাস করতে থাকেন। কিন্তু রম্ভার জন্য ইন্দ্র ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং চতুরাস্যকে হত্যা করে রম্ভাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং স্বয়ংপ্রভাকে শাপ দেন পৃথিবীতেই বাস করতে হবে; সীতার খোঁজে বানররা এলে তাদের ঠিক

মত অতিথি সৎকার করলে তখন মুক্তি পাবে।

চতুরিকা—এক ব্রাহ্মণ দক্ষিণা হিসাবে এক বার এক খণ্ড সুবর্ণ পান। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই সোনা দিয়ে কি করবেন ভেবে পান না। এই সময় এক বন্ধু উপদেশ দেন বিদেশে পর্যটন করে আসতে। কিন্তু ব্রাহ্মণ কোথায় যাবেন, কি ভাবে যাবেন কিছুই ঠিক করে উঠতে পারেন না। বন্ধুটি তখন কাছাকাছি বাস করে চতুরিকা নামে দেহোপজীবিনীর কাছে যেতে বলেন; চতুরিকাকে সুবর্ণ খণ্ডটি দিয়ে সাম-ভাবে কথা বললেই সে সব কিছু বুঝিয়ে দেবে। সরল ব্রাহ্মণ উপহাসটি বুঝতে পারেন না; চতুরিকার কাছে যান এবং সুবর্ণ খণ্ডটি দিয়ে পর্যটনে যাবার উপদেশ চান। চতুরিকাও সেখানে আর যারা উপস্থিত ছিল সকলে শুনে হাসতে থাকে। ব্রাহ্মণ তখন হাতে গোকর্ণ মুদ্রা তৈরি করে সাম গান করে শোনাতে থাকেন। চার পাশে সকলে আরো হাসতে থাকে। ব্রাহ্মণ কোন মতে পালিয়ে এসে বন্ধুকে আবার সব কথা জানালে বন্ধু ব্রাহ্মণটিকে নিয়ে চতুরিকার কাছে যান এবং ব্রাহ্মণটিকে দেখিয়ে চতুরিকাকে বলেন এই আস্ত-গরুর সামান্য ঘাসটুকু সে যা নিয়েছে ফিরিয়ে দিক। চতুরিকা হাসতে হাসতে ব্রাহ্মণকে তখন তাঁর সুবর্ণ খণ্ডটি ফিরিয়ে দেয়।

চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নামে চারটি পুরুষার্থ। পুরুষের প্রয়োজন বা এই চারটির জন্যই জীব ক্রিয়াশীল। সুখই জীবনের অভীষ্ট এবং সুখের মূল এই চারটি জিনিস।

চতুর্বর্ণ—মনু প্রবর্তিত চারটি জাতি: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। অন্য মতে ব্রহ্মা এঁদের সৃষ্টি করেন এবং এদের কাজ ভাগ করে দেন। ব্রাহ্মণরা জন্মান ব্রহ্মার মুখ থেকে; এঁরা সব প্রথম। দ্বিতীয় দফায় বুক থেকে জন্মান সাহসী যোদ্ধা/ক্ষত্রিয়েরা; এদের মধ্যে রজ গুণের আধিক্য। এর পর উরু থেকে জন্মান বৈশ্যেরা; এঁদের মধ্যে রজ ও তম গুণ মিশিয়ে অবস্থিত। শেষ কালে পাদদেশ থেকে জন্মান শূদ্রেরা; এঁদের তমঃ গুণই বেশি।

অহিংসা, সত্যকথা, দয়া, দান, তীর্থযাত্রা, ব্রহ্মচর্যা, মাৎসর্যহীনতা, দেবতা-ব্রাহ্মণ ও গুরুসেবা, ধর্মপালন, পিতৃপূজা, রাজভক্তি, শাস্ত্রপথে চলা, নিষ্ঠুর না হওয়া, তিতিক্ষা, ঈশ্বরে বিশ্বাস এগুলি প্রতিবর্ণের সকলেরই সব সময়েরই কর্তব্য।

ব্রাহ্মণদের কাজ যজ্ঞ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান করা ও দান গ্রহণ করা। উপনয়নের সময় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় জন্ম হয়। ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের সন্তান চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়ের সন্তান সূত এবং বৈশ্যের সন্তান বৈদেহিক। ব্রাহ্মণরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাষ, গোরক্ষা বাণিজ্য ও সুদের ব্যবসায় করতে পারেন। তবে দুধ, লবন, ও মাংস বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অবশ্য ব্রাহ্মণরা যে কাজই করুন যজ্ঞ ইত্যাদি জাতিগত কাজগুলি অবশ্য পালনীয়। ঋত (দ্রঃ) এবং অমৃত (দান প্রাপ্ত) অন্নে জীবন রক্ষা করবেন। উপনয়ন হবে আট বছর বয়সে। পশুচর্ম পরিধান করবেন এবং ভিক্ষা চাইবেন যখন তখন ভগবন্/ভগবতি ভিক্ষাং দেহি বলবেন। পদবী শর্মা। ব্রাহ্মণ যে কোন বর্ণে বিয়ে করতে পারলেও কেবল মাত্র ব্রাহ্মণী স্ত্রীর সহযোগে যাগযজ্ঞ ইত্যাদি করবেন।

ক্ষত্রিয়ের কাজ দান, বেদ অধ্যয়ন ও যজ্ঞ করা। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ও ক্ষত্রিয়ের একটি বিশেষ কাজ। এঁদের উপাধি হবে বর্মা। উপনয়ন হবে।

ব্যাঘ্র চর্ম পরিধান করবেন ; ভিক্ষা করলে ভগবন্/ভগবতি শব্দটি দ্বিতীয় স্থানে ব্যবহার করবেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া যে কোন বর্ণে বিয়ে করতে পারবেন। বিয়ের সময় স্ত্রীর হাতে একটি বাণ থাকবে।

বৈশ্যদের কাজ চাষ, গোসেবা ও বাণিজ্য ; পদবী গুপ্ত ; উপনয়নের পর মেষ চর্ম পরিধান করবেন। বৈশ্য বা শূদ্র বর্ণে বিয়ে করতে পারেন। বিয়ের সময় স্ত্রীর হাতে বেত থাকবে। শূদ্রের কাজ অপর বর্ণের সেবা করা ও শিল্প কর্ম ; ক্ষত্রিয় স্ত্রী হলে সন্তান হবে পুক্কস বা ক্ষত্তা এবং বৈশ্য স্ত্রী হলে সন্তান হবে আয়োগব

চণ্ডালের কাজ মৃত্যুদণ্ডে অপরাধীকে হত্যা করা এবং মেয়েদের উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করা। পুক্কস-রা শিকার করবেন ; আয়োগবরা নাটক এবং শিল্প-কর্ম করবেন। চণ্ডালেরা কেবল নিজেদের বর্ণেই বিয়ে করবেন। দ্রঃ বর্ণসঙ্কর।

চতুর্ব্যূহ—পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে বিষ্ণুকে চতুর্ব্যূহ বা চার জন রূপে কল্পনা করা হয়েছে। বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ মিলে চতুর্ব্যূহ। বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত মতে পরম-ব্রহ্ম বাসুদেব জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য, শক্তি ও তেজ ষড়গুণে পরিপূর্ণ। সংকর্ষণ অনন্ত জ্ঞান ও বলযুক্ত, প্রকৃতিলীন, জীবতত্ত্বের অন্তর্যামী ও জগৎস্রষ্টা। অনিরুদ্ধ অনন্ত শক্তি ও তেজ যুক্ত মিশ্রসৃষ্টিকর্তা এবং রক্ষাকর্তা। প্রদ্যুম্ন অনন্ত ঐশ্বর্য বীর্যযুক্ত মনস্তত্ত্বের অন্তর্যামী ও শুদ্ধবর্ণের স্রষ্টা। মাধ্ব বেদান্ত মতে এঁরা সকলেই তুল্য গুণ সম্পন্ন। গৌড়ীয় মতে ভগবানের নিরুপাধি অবস্থা হচ্ছে বাসুদেব ; অন্যেরা তাঁর প্রকাশ। সঙ্কর্ষণ প্রকৃতি ও জীবতত্ত্বের অন্তর্যামী, প্রদ্যুম্ন সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতের অন্তর্যামী, অনিরুদ্ধ স্থূলব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী। এঁরা তুল্য রূপ হলেও বাসুদেব শ্রেষ্ঠ। এঁরা অজ, অমর, অবুদ্ধ, অমুক্ত, পূর্ণ, পরম ও নিত্যানন্দ।

চতুর্বেদ—বৈরাজ, অগ্নিষাত্ত, গার্হপত্য, সোমপা, একশৃঙ্গ, চতুর্বেদ ও কাল এঁরা পিতৃদেব।

চতুর্মুখ—তিলোত্তমা (দ্রঃ) অপরূপ সুন্দরী ; দেবতাদের যখন প্রদক্ষিণ করছিলেন তখন তিলোত্তমা যে দিকে যাচ্ছিলেন সেই দিকেই তাঁকে দেখবার জন্য ব্রহ্মার চার-দিকে চারটি মাথা বার হয় ; অর্থাৎ চতুর্মুখ হন।

চতুর্যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি চার যুগ। এদের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৮০০, ৩৬০০, ২৪০০, এবং ১২০০ দৈব বৎসর। অর্থাৎ ১২০০০ দৈব বৎসরে চার যুগ=এক দৈব যুগ। চতুর্যুগের শেষে বেদ নষ্ট হয়ে যায় ; সপ্তর্ষিরা এসে আবার বেদ সৃষ্টি করেন।

চন্দ্র—চন্দ্র মণ্ডলের দেবতা। কল্পে কল্পে বহু চন্দ্রের উৎপত্তি ও লয় হয়েছিল। প্রথম স্বায়ম্ভুব মনুর সময়ে সমুদ্র মন্থন কালে চন্দ্র, অমৃত পারিজাত, লক্ষ্মী, ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা ইত্যাদি উঠেছিলেন। মহাদেব হলাহল পান করেছিলেন বলে তাঁর বিষের জ্বালা কমাবার জন্য চাঁদ রূপ এই স্নিগ্ধ রত্নটিকে তাঁকে মাথায় ধারণ করতে দেওয়া হয়। আর এক মতে ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রি ; অত্রির ছেলে চন্দ্র। অন্য মতে ব্রহ্মা নিজে অত্রি অনসূয়ার সন্তান হয়ে জন্মান। অত্রি (দ্রঃ) বহু বছর অনিমেষ নয়নে তপস্যা করছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ থেকে চন্দ্ররশ্মি বার হতে থাকে। দিগঙ্গনারা পর্যন্ত কেউ এই রশ্মিকে ধারণ করতে পারেন না। ব্রহ্মা নিজে তখন এই রশ্মি বা চন্দ্রকে

তিন চাকার রথে চড়িয়ে একশ বার পৃথিবী পরিক্রমা করান। এতে চন্দ্রের তেজ পৃথিবীতে অনেকটা ছড়িয়ে পড়ে এবং এই তেজে ওষধিবর্গের জন্ম হয়। চন্দ্র নিজে অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়েন। ব্রহ্মা তারপর চন্দ্রকে ওষধিবর্গ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণদের রাজা রূপে অভিষিক্ত করেন। এই জন্য নাম অত্রিজ। চন্দ্র তার পর রাজসূয় যজ্ঞ করে অপ্রতিহত তেজে রাজত্ব করতে থাকেন (স্কন্দ, প্রভাস খণ্ড)। অন্য মতে সৃষ্টির মানসে ব্রহ্মা যখন পরম ব্রহ্মের ধ্যান করছিলেন সেই সময়ে ব্রহ্মার মনে কাম ভাব জেগে ওঠে এবং তৎক্ষণাৎ এই মন থেকে সরস্বতীর জন্ম হয়। সরস্বতী ব্রহ্মাকে প্রণাম করেন। কিন্তু ব্রহ্মা সরস্বতীকে দেখে আরো কামোন্মত্ত হয়ে পড়েন। সরস্বতীর জন্য স্থান করে দেন সকলের জিবে, বিশেষত পণ্ডিতদের জিহ্বাগ্রে। এর পর সরস্বতীকে ভোগ করেন। পরে শান্ত হয়ে এই কাম ভাব জাগাবার জন্য মদনকে অভিশাপ দেন শিবের তৃতীয় নেত্রের আগুনে ভস্মীভূত হতে হবে। এর পর ব্রহ্মা নিজের মনের কামভাব অত্রিকে দান করেন ; অত্রি এই কামভাব স্ত্রী অনসূয়াকে দান করেন। অনসূয়ার মধ্যে এই কামভাব ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে চন্দ্ররূপে জন্মলাভ করেন। অন্য মতে অনসূয়া কামভাব সহ্য করতে না পেরে অত্রিকে এই কাম ফিরিয়ে দেন এবং অত্রির চোখ থেকে চন্দ্র রূপে এই কাম জন্মলাভ করেন।

আর এক মতে মহর্ষি অত্রিকে সৃষ্টি করতে বললে অত্রি তপস্যা করতে থাকেন। কয়েক বছর তপস্যার পর অত্রির হৃদয়ে দীপ্ততেজ সচিদানন্দ ব্রহ্ম ফুটে ওঠেন। আনন্দে অত্রির চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। এই অশ্রুবিন্দু দিকেরা নারী বেশে পান করেন যাতে তাঁদের সন্তান হয়। কিন্তু গর্ভ হলে এই গর্ভ তাঁরা ধারণ করতে পারেন না ; পরিত্যাগ করেন। ব্রহ্মা তখন এগুলিকে নিয়ে একত্র করে একটি যুবা পুরুষে পরিণত করেন এবং বিমানে ব্রহ্মলোকে নিয়ে আসেন। ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব সকলে সামগান করে এই উজ্জ্বল যুবার স্তব করতে থাকেন। ব্রহ্মর্ষিরা এঁকে নিজেদের অধিপতি করে নিতে চান। এঁর থেকেই সমস্ত ঔষধির সৃষ্টি হয়।

চন্দ্র বিষ্ণুর তপস্যা করেন প্রায় দশ বছর ধরে। বিষ্ণু দেখা দিয়ে বর দিতে চান। চন্দ্র বলেন স্বর্গে তিনি যজ্ঞ করবেন ; যজ্ঞে ব্রহ্মা যেন নিজে যজ্ঞভাগ নিতে আসেন এবং মহাদেব যেন যজ্ঞশালার দ্বারী হন। বিষ্ণু বর দেন ; যজ্ঞ হয়। যজ্ঞে অত্রি, ভৃগু, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেবতারা, বসুরা, মরুৎরা ও বিশ্বদেবরা আসেন। দক্ষিণা হিসাবে ঋত্বিকদের চন্দ্র ত্রিভুবন দান করেন। যজ্ঞ শেষ হলে চন্দ্র স্নান করে উঠলে লক্ষ্মী, সিনীবালী (কর্দম), দ্যুতি (বিবস্বান), পুষ্টি (ধাতা), প্রভা (সূর্য), কুহূ (হবিষ্মান) কীর্তি (জয়ন্ত), অংশুমালা (কশ্যপ), ধৃতি (নন্দ) চন্দ্রের প্রণয়াসক্ত হয়ে চন্দ্রের অভিসারে আসেন এবং চন্দ্র এঁদের সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। চন্দ্রের এই অধর্ম আচরণে সকলে স্তম্ভিত হয়ে যান। বৃহস্পতির (দ্র) স্ত্রী তারাও (দ্র) চন্দ্রের কাছে চলে আসেন।

চন্দ্রের স্ত্রীগুলির মধ্যে রোহিণী চাঁদের প্রিয়তমা হয়ে ওঠাতে অন্য মেয়েরা দক্ষের কাছে অভিযোগ করেন। দক্ষ প্রথম বার চন্দ্রকে বোঝাতে চেষ্টা করেন কিন্তু কিছু হয় না। দ্বিতীয় বার অভিযুক্ত হয়ে চন্দ্র আবার ভৎ র্সিত হন এবং তৃতীয় বার মেয়েরা আবার অভিযোগ করলে দক্ষ শাপ দেন চন্দ্রের কোন সন্তান হবে না এবং

চন্দ্র যক্ষ্মাগ্রস্ত হবেন। মেয়েরা তখন ভয় পেয়ে দক্ষকে শাপ তুলে নিতে বলেন। এবং দক্ষ শাপ পরিবর্তন করে বলেন এক পক্ষ ক্ষয় হবে; পর পক্ষে চন্দ্র ক্রমশ সুস্থ বা পূর্ণ হয়ে উঠবে (কালিকা)। অন্য মতে অভিশপ্ত চন্দ্র শিবের শরণ নেন এবং রোগমুক্ত হয়ে শিবের মাথায় আশ্রয় পান। দক্ষ তখন শিবকে বার বার অনুরোধ করেন চাঁদকে ত্যাগ করতে। শেষে বিষ্ণুর মধ্যস্থতায় রোগমুক্ত চাঁদ ফিরে গিয়ে স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হন (শিব, ব্রহ্মবৈ)। অন্য মতে শাপমুক্তির জন্য চন্দ্র বহু যজ্ঞ করেন কিন্তু কোন ফল হয় না। চন্দ্র রোগগ্রস্ত হবার ফলে পৃথিবীতে ওষধি ইত্যাদি গাছ ঠিক মত জন্মায় না; এবং জীবগণও যক্ষ্মাগ্রস্ত হয়ে পড়তে থাকে। দেবতারা তখন দক্ষের শরণ নিলে দক্ষ বলেন সরস্বতী নদীর প্রধান তীর্থ প্রভাসে স্নান করলে প্রতিমাসে চন্দ্র পনের দিনের জন্য রোগমুক্ত হবেন। অমাবস্যায় স্নান করে শীতল কিরণ ফিরে পান।

সমুদ্র মন্থনে অমৃত উঠলে সিংহিকার ছেলে রাহু এই অমৃত নিয়ে সকলের অজ্ঞাতে পাতালে পালিয়ে যান। কিন্তু বিষ্ণু মোহিনী (দ্রঃ) মূর্তি ধরে উদ্ধার করে আনেন। এর পর অমৃত পানের সময় রাহু দেবতার বেশে অমৃত পান করতে যাচ্ছিলেন; চন্দ্র, অন্য মতে চন্দ্র ও সূর্য্য ঘটনাটা বিষ্ণুকে জানিয়ে দেন এবং বিষ্ণু সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণপাত্র/চক্র দিয়ে রাহুর মাথা কেটে ফেলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অমৃত রাহুর গলা পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল। ফলে রাহুর মাথা অমর হয়ে যায়। সেই থেকে মস্তক রূপী রাহু সুযোগ পেলেই চন্দ্রকে গ্রাস করে ফেলেন; কিন্তু কাটা গলা দিয়ে চন্দ্র বার হয়ে যান। একে চন্দ্রগ্রহণ বলা হয় (পদ্ম, ভাগবত)। দেহ অংশ কেতু। গলা যখন কাটা হয় যখন কয়েক ফোঁটা রক্ত ও গিলে ফেলা কয়েক ফোঁটা অমৃত মাটিতে পড়ে। এই রক্ত থেকে পিঁয়াজ এবং অমৃত থেকে রশুন জন্মায়।

রাজসূয় যজ্ঞ করে চন্দ্র অত্যন্ত অহঙ্কারী ও কামাসক্ত হয়ে পড়েন। এবং ভাদ্র মাসের চতুর্থী তিথিতে বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে চুরি করেন। তারা অপমানিতা হয়ে শাপ দেন চন্দ্র কলঙ্কী, মেঘাচ্ছন্ন, রাহুগ্রস্ত ও ক্ষয়রোগাক্রান্ত হবেন। এর পর বৃহস্পতির অনুরোধে ব্রহ্মা তারাকে ফিরিয়ে দিতে বলেন কিন্তু চন্দ্র শোনেন না। বহু দৈত্য দানব চন্দ্রের দলে যোগ দেন। ইন্দ্র, শুক্র ও দেবতারা বৃহস্পতির দলে আসেন। ইন্দ্র কথা দেন তারাকে ফিরিয়ে আনবেন কিন্তু চন্দ্র দূতকে ফিরিয়ে দেন। ফলে ক্ষীরোদ সাগরের তীরে ভীষণ যুদ্ধ হতে যায়। ব্রহ্মা/মহাদেব এসে সকলকে শান্ত করে তারাকে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। মহাদেব তখন চন্দ্রকে ক্ষীরোদ সাগরে স্নান করে পাপমুক্ত হতে বলেন এবং নির্মল অর্দ্ধ চন্দ্রকে নিজের মাথাতে ধারণ করেন। কিন্তু কলঙ্কিত অর্দ্ধচন্দ্র লজ্জায় ক্ষীরোদ সমুদ্রে প্রাণ ত্যাগ করেন। মহর্ষি অত্রি করুণায় সেই জলে অশ্রুত্যাগ করলে চাঁদের নতুন দেহ হয়। শিব ও ব্রহ্মা আবার তাঁকে রাজা করে দেন। কিন্তু তারার শাপে চন্দ্রে কলঙ্ক থেকে যায়। ভাদ্র মাসের চতুর্থী এই জন্য নষ্ট চন্দ্র নামে বিখ্যাত। দ্রঃ গণেশচতুর্থী।

আর এক মতে তারা এক দিন বেড়াতে বেড়াতে চন্দ্রের গৃহে যান। দু জনে দু জনকে দেখে মুগ্ধ হন এবং বিয়ে হয়। খুঁজতে খুঁজতে সন্ধান পেয়ে বৃহস্পিত বার বার শিষ্যদের পাঠান এবং শেষ কালে নিজে যান। কিন্তু তারা আসেন না। এমন

কি চন্দ্র জানিয়ে দেন তারা নিজের ইচ্ছায় এসেছেন এবং তৃপ্ত হয়ে নিজের ইচ্ছায় ফিরে যাবেন। কিছু দিন পরে বৃহস্পতি আবার আনতে যান কিন্তু চন্দ্রের দ্বাররক্ষীরা তাঁকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই দেন না। বৃহস্পতি তখন ইন্দ্রকে জানান এবং ইন্দ্র তারাকে ফিরিয়ে দিতে বলেন নতুবা যুদ্ধ করবেন স্থির করেন। দেবতাদের মধ্যে তখন মত বিরোধ দেখা দেয়। অসুররা খবর পায়; শুক্র চন্দ্রকে আশ্বাস দেন এবং তারাকে দিয়ে দিতে নিষেধ করেন। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মা এসে চন্দ্র ও শুক্রকে ভৎর্সনা করে তারাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেন।

তারা এই সময় গর্ভবতী ছিলেন। বৃহস্পতির আদেশে তারা তৎক্ষণাৎ এই গর্ভ শরস্তম্ভে ত্যাগ করেন এবং এই গর্ভ থেকে একটি ছেলের জন্ম হয় তারা স্বীকার করেন এটি চন্দ্রের ছেলে। চন্দ্র তখন একে গ্রহণ করেন ও নাম রাখেন বুধ। আর এক মতে ছেলে হলে বৃহস্পতি নিজের ছেলে হিসাবে জাতকর্ম ইত্যাদি করান। চন্দ্র খবর পেয়ে নিজের ছেলে হিসাবে দাবি করেন। ফলে আবার দেবাসুরের যুদ্ধ বাঁধবার উপক্রম হয় এবং ব্রহ্মা এসে মধ্যস্থতা করে তারার স্বীকারোক্তি অনুসারে ছেলেটিকে চন্দ্রের হাতে সমর্পণ করেন। আর এক মতে বৃহস্পতির শাপে চন্দ্র যক্ষা-গ্রস্ত হলে পিতা অত্রির শরণাপন্ন হন এবং অত্রির অনুগ্রহে শাপমুক্ত হয়ে আবার দীপ্তি-মান হয়ে ওঠেন। বুধ (দ্র) চন্দ্রের এক ছেলে; এবং চন্দ্র বংশের প্রথম পুরুষ। দাক্ষিণাত্যের চোল, কেরল ও পাণ্ডু রাজারা নিজেদের তুর্বসুর সন্তান অর্থাৎ চন্দ্র বংশ বলে দাবি করেন। আকাশে বুধ চন্দ্রের বিপরীত দিকে ওঠেন।

দক্ষের সাতাশটি কন্যা চন্দ্রের স্ত্রী :—অশ্বিনী, ভরণী, রোহিণী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, আর্দ্রা, অশ্লেষা, অনুরাধা, পুনর্বসু, পুষ্যা, পূর্বাষাঢ়া, শতভিষা, পূর্বপ্রোষ্ঠপদা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, হস্তা, চিত্রা, উত্তরপ্রোষ্ঠপদা, বিশাখা, স্বাতী, শ্রাবণা, ধনিষ্ঠা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, রেবতী। আর এক মতে চন্দ্রের স্ত্রী মনোহরা; ছেলে বর্চস্ (দ্র) শিশির, প্রাণ, রমণ। চন্দের মেয়ে ভদ্রা, মারিষা, জ্যোৎস্নাকালী। কাব্যে কুমুদিনী চন্দ্রের আর এক স্ত্রী।

গো-রূপা ভূমি দেবীকে পৃথু যখন দোহন করেন তখন ব্রহ্মা নিজে বৎস সেজেছিলেন। পৃথুর পর ঋষিরা যখন দোহন করেন চন্দ্র তখন বৎস সেজে ছিলেন। ব্রহ্মা এই সময়ে সন্তুষ্ট হয়ে চন্দ্রকে তারাদের ও ওষধির অধিপতি করে দেন।

নবগ্রহের সঙ্গে চন্দ্রের পূজা হয়; আলাদা পূজা হয় না। চন্দ্রের ধ্যানে আছে দু হাতে গদা ও বর; শুভ্রবর্ণ ও শ্বেতবস্ত্র। রথে দশ অশ্ব, শ্বেত পদ্মে অবস্থিত। তন্ত্রে চন্দ্র পূজার নিয়ম ও ফল বর্ণিত আছে। পূর্ণিমাতে চন্দ্র উদিত হলে তাম্র পাত্রে রুটি ও মধু মিশিয়ে চন্দ্রকে উৎসর্গ করলে সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ হয়। দ্রঃ চন্দ্রভাগা।

চন্দ্রের একটি করে কলা দেবতারা দিনে পান করেন এবং সূর্য তারপর সুষুম্না রশ্মিতে চন্দ্রকে প্রবৃদ্ধ করে দেন। যখন দুটি কলা মাত্র অবশিষ্ট থাকে চন্দ্র তখন সূর্য পথে এসে উপস্থিত হন; এবং সূর্যের অমা (দ্রঃ তুষ্টি) রশ্মিতে অবস্থান করেন। এই দিন অমাবস্যা। অমাবস্যায় চন্দ্র জলে প্রবেশ করেন এবং তারপর গাছে ও লতায় অবস্থান করেন। এই সময়ে গাছ কাটলে ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয়। অমাবস্যার দিন ১৫-শ কলায় যেটুকু অবশিষ্ট থাকে পিতৃগণ সেইটুকু পান করেন। একটি কলা তখনও অবশিষ্ট থাকে।

চন্দ্রকীর্তি—প্রাচীন ভারতে এক জন বৌদ্ধ দার্শনিক। আচার্য দিঙ্‌নাগের পর খৃ ৬-শতকে দক্ষিণ ভারতে সমন্ত দেশে জন্ম। নালন্দার একজন আচার্য্য; চন্দ্রগোমী ও ধর্মকীর্তির সম সাময়িক। নাগার্জুনের মাধ্যমিক শূন্যবাদের টীকা প্রসন্নপদা এঁর রচনা। অন্যান্য গ্রন্থ শূন্যতাসপ্ততি টীকা। যুক্তিষষ্টিকারিকা টীকা, মধ্যমাবতার, প্রদীপদ্যোতনা।

চন্দ্রকেতু—ছত্রকেতু। লক্ষ্মণের (দ্র) ছোট ছেলে। ভরতের কথায় রাম এঁকে উত্তর দিকে চন্দ্রকান্ত দেশ দান করেন। দ্রঃ চন্দ্রমতী।

চন্দ্রকেতুগড়—২৪ পরগণায়। কলকাতা থেকে ৪০ কি-মি দূরে। বর্তমান নাম বেড়াচাঁপা। খৃ ১-শতকে রচিত পেরিপ্লাস গ্রন্থে 'গাঙ্গে' এবং টলেমির উল্লিখিত 'গাঙ্গেরিদাই' সহর এই চন্দ্রকেতুগড় বলেই মনে হয়। ৩ কি-মি থেকে বেশি একটি জায়গা। প্রাচীন নগর বেষ্টন কারী প্রাচীর ও বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে। আনুমানিক গুপ্ত যুগের একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও খৃ ৩-৪ শতকের এবং পরবর্তী যুগের বহু বহু মৃন্ময়মূর্তি ও মুদ্রা পাওয়া গেছে। ২০ সে-মি ব্যাস পোড়া মাটির নল যুক্ত পয়ঃপ্রণালী মাটির নীচে দেখা যায়। মৌর্যযুগের ব্রাহ্মী লিপিরও নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই সভ্যতা মনে হয় খৃ পূ ৭-৬ শতকের আর্য সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত ছিল। দে-গঙ্গাও অনেকের মতে এই চন্দ্রকেতুগড়।

চন্দ্রগুপ্ত—কার্তবীর্যার্জুনের (দ্র) মন্ত্রী।

চন্দ্রনাথ—চট্টগ্রামে একটি পাহাড়। ৭০০'ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে ১১৫৫-ফু ওপরে চন্দ্রনাথ শিবের মন্দির। পাহাড়টি বৌদ্ধদেরও তীর্থক্ষেত্র। বলা হয় এখানে বুদ্ধদেবের আঙুলের হাড় সমাহিত আছে। চৈত্রসংক্রান্তিতে এখানে বৌদ্ধ মেলা হয়। বড়বা কুণ্ডের জলে সব সময়ই যে আগুনের শিখা দেখা যায় তাকে মহাদেবের তৃতীয় চক্ষু বলা হয়।

চন্দ্রদ্বীপ—বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ব্যাপিয়া সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল। অন্য নাম ছিল বঙ্গাল। গুপ্তযুগেই এখানকার বৌদ্ধদেবী তারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন। খৃ ৫-৬ শতকে ব্যাকরণাচার্য চণ্ডগোমী এখানে বাস করার সময় তারা স্তোত্র রচনা করে ছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের তারা মূর্তিই সম্ভবত পাল রাজাদের পতাকাতে শোভা পেত।

চন্দ্রবংশ—চন্দ্র (দ্র) থেকে উদ্ভূত বংশ। চন্দ্র>বুধ>পুরূরবা>আয়ুস>নহুষ>আযাতি, যযাতি। যযাতি+শর্মিষ্ঠা=দ্রুহ্য, অনুদ্রুহ্য ও পুরু; যযাতি+দেবযানী=যদু, তুর্বসু। দ্রুহ্য>বভ্রু>সেতু>আরণ্য>গন্ধর্ব>ধর্ম>ঘৃত>দুর্দম>ম্লেচ্ছ। অনুদ্রুহ্য> সভানর, চক্ষুষ, পরোক্ষ। সভানর>কালানর>সৃঞ্জয়>জন্মেঞ্জয়, মহামনস, উশীনর, তিতিক্ষ। উশীনর>শিবি, বেণ, কৃমি, উশী, দর্প। শিবি>ভদ্র, সুবীর, কেকয়, বৃষদর্প, কপটরোম। কেকয়>কীচক। তিতিক্ষ>কৃষৎরথ, হোম, সুতপস্, বলি। বলি>অনঘাভু, অঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গ, অন্ধ্রপ। অঙ্গ>দধিবাহন>রবিরথ ধর্মরথ> চিত্ররথ> সত্যরথ> লোমপাদ>চতুরঙ্গ>পৃথুলাক্ষ>চম্প>হর্যঙ্গ>ভদ্ররথ। ভদ্ররথ>বৃহৎরথ, বৃহৎকর্মা, বৃহৎভানু।

এই বংশের যদু থেকে যাদব বংশ (কৃষ্ণ এই বংশে), পুরু থেকে পৌরব, কুরু থেকে কৌরব ইত্যাদি বংশের উৎপত্তি।

চন্দ্রবতী—দ্রঃ চন্দ্রাবতী।

চন্দ্রবর্মা—কাম্বোজ নরপতি। চন্দ্র নামে অসুর অংশে জন্ম। কুরুক্ষেত্রে ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে মারা যান।

চন্দ্রভাগা—পঞ্চনদের একটি; বর্তমান নাম চেনাব। এখানে স্নান করে চন্দ্র দক্ষের শাপ থেকে মুক্ত হন; তাই নাম চন্দ্রভাগা। গ্রীক নাম আকেসিনেস্, বৈদিক, নাম অশিক্নী। বাড়লাচ গিরিবর্ত্মের দক্ষিণ পূর্বে ৪৮৬৬ মি উচ্চে তুষার স্তূপ থেকে উৎপন্ন চন্দ্রনদী এবং ঐ গিরিবর্ত্মের উত্তরপশ্চিম থেকে আগত ভাগা নদীর সঙ্গে তাণ্ডিতে মিলিত হয়েছে। ঝঙ জেলার ট্রিমু'র কাছে বিতস্তার সঙ্গে মিশে এই মিলিত ধারাও চন্দ্রভাগা নামেই পরিচিত। মুলতানে চন্দ্রভাগার তীরে মহাভারতের রাজা শাম্বের স্মৃতি জড়িত সূর্যমন্দির রয়েছে।

চন্দ্রভানু—(১) কৃষ্ণের সখী চন্দ্রাবলীর পিতা। মহীভানুর ঔরসে মাতা সুখদার গর্ভে রত্নভানু, চন্দ্রভানু, বৃষভানু, সুভানু ও ভানু ৫-টি ছেলে ও একটি মেয়ে ভানুমুদ্রা জন্মায়। চন্দ্রভানুর স্ত্রী বিন্দুমতী। (২) কৃষ্ণের এক ছেলে; সত্যভামার গর্ভে জন্ম।

চন্দ্রমতী—চন্দ্রকেতুর রাজ্য। দ্রঃ লক্ষ্মণ।

চন্দ্রলেখা—বাণরাজের মন্ত্রী কুষ্মাণ্ডের মেয়ে। উষার সখী। এঁর চেষ্টায় উষা অনিরুদ্ধকে বিয়ে করতে সক্ষম হন।

চন্দ্রশেখর—রাজা পুষ্যের বহু দিন ছেলে হয় নি। শিবের আরাধনা করেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে একটি ফল দেন। পুষ্যের তিন জন স্ত্রী ফলটি ভাগ করে খান এবং যথাকালে গর্ভবতী হয়ে, তিনটি মাংস-পিণ্ডের জন্ম দেন। এই তিনটি অংশ জুড়ে গিয়ে একটি বালক হয়, নাম চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখরের স্ত্রী ককুৎস্থ রাজার মেয়ে তারাবতী। একটি শাপের ফলে বেতাল অংশে ভৃঙ্গি, ভৈরব অংশে মহাকাল দুটি ছেলে হয়। চন্দ্রশেখরের ঔরসে জন্মায় দম, উপরিচর বসু ও অলর্ক।

চন্দ্রসেন—(১) বঙ্গদেশের রাজা সমুদ্রসেনের ছেলে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে উপস্থিত ছিলেন। ভীমের হাতে এঁরা পিতাপুত্রে এক বার পরাজিত হন। তারপর পাণ্ডবদের দলে ছিলেন। অশ্বত্থামার হাতে চন্দ্রসেন কুরুক্ষেত্রে মারা যান। (২) কৌরব পক্ষে এক রাজা। শল্যের রথের বাহক। যুধিষ্ঠিরের হাতে নিহত হন।

চন্দ্রহাস—রাবণের খড়্গ। দিগ্বিজয়ে রাবণ কৈলাসে এসে সমূল পাহাড় তুলে নিতে চেষ্টা করেন। পাহাড় কাঁপতে থাকে। পার্বতী শিবের কাছে ছুটে যান। শিব পার্বতীকে আশ্বাস দিয়ে কৈলাসকে মাটিতে চেপে ধরেন। রাবণের হাত পাহাড়ের ভারে থেঁৎলে পাহাড়ের তলায় আটকে যায়। এই অবস্থায় রাবণ হাজার বছর মত আটকে থাকেন ও শিবের স্তব করতে থাকেন। শিব তখন সন্তুষ্ট হয়ে রাবণকে চন্দ্রহাস খড়্গ দান করেন। (২) এক জন রাজা। বাল্য কালে বাপ মা মারা গেলে ধাত্রী এঁকে নিয়ে বনে পালিয়ে যান। পরে ধাত্রীও মারা যান। মন্ত্রী রাজ্য শাসন করতে থাকেন। রাজপুত্রকে কেউই চিনতেন না। এক দিন এই ছেলে মন্ত্রীর বাড়ির সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন তখন এক জন দৈবজ্ঞ জানান যে এই ছেলে সসাগরা পৃথিবীর রাজা হবেন এক দিন। ফলে মন্ত্রীর ভয় হয় এবং গুপ্তঘাতক দিয়ে ছেলেটিকে হত্যা করাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ঘাতকরা একে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়েও সদয়

হয়ে ছেড়ে দেয়। এর পর চন্দ্রহাস এক সম্ভ্রান্ত লোকের আশ্রয়ে বাস করতে থাকেন। মন্ত্রী আবার এক দিন এঁকে চিনতে পারেন এবং বন্ধ চিঠি দিয়ে চন্দ্রহাসকে নিজের ছেলের কাছে পাঠিয়ে দেন। নির্দেশ ছিল একে যেন হত্যা করা হয়। চিঠি নিয়ে মন্ত্রীর বাগানে এসে ক্লান্ত চন্দ্রহাস ঘুমিয়ে পড়েন। মন্ত্রিকন্যা বিষয়া ঘুমন্ত যুবককে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় এবং মন্ত্রীর চিঠি দেখতে পেয়ে কৌতূহলে চিঠি খুলে পড়ে চিঠিটি সরিয়ে নিয়ে আর একটি চিঠি লিখে দেন বিষয়ার সঙ্গে যেন চন্দ্রহাসের বিয়ে দেওয়া হয়। মন্ত্রীর ছেলে চিঠি পেয়ে বিয়ে দেন। এর পর মন্ত্রী এসে এই সব দেখে দেবালয়ে ঘাতক নিযুক্ত করে পূজার অছিলায় চন্দ্রহাসকে পাঠান। কিন্তু দৈবের বশে চন্দ্রহাসকে আটকে দিয়ে মন্ত্রীপুত্র নিজেই দেবালয়ে গিয়ে ঘাতকের হাতে মারা যান। চন্দ্রহাস শেষপর্যন্ত সসাগরা পৃথিবীর রাজা হয়েছিলেন।

চন্দ্রাঙ্গদ—নলের নাতি। আর্যাবর্তের রাজা চিত্রবর্মার মেয়ে সীমন্তিনীকে বিয়ে করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ীর সহায়তায় এই বিয়ে সম্ভব হয়। যমুনাতে চন্দ্রাঙ্গদ একবার নৌকায় রেস খেলছিলেন। এমন সময় ঝড়ে নৌকা ডুবে যায়। চন্দ্রাঙ্গদের বহু অনুচর ডুবে মারা যায়। চন্দ্রাঙ্গদও ডুবে যান; তক্ষক এঁকে পাতালে নিয়ে যান এবং নাগকন্যাদের সঙ্গে কিছুদিন কাটাতে থাকেন। এ দিকে রাজ্যে শ্রাদ্ধ ইত্যাদি করে সীমন্তিনী বিধবার বেশ ধারণ করেন। শত্রুরা ইতিমধ্যে এসে রাজ্য দখল করে এবং চন্দ্রাঙ্গদের পিতা ইন্দ্রসেনকে বন্দী করেন। এ দিকে নাগরাজ চন্দ্রাঙ্গদকে নাগকন্যা বিয়ে করে পাতালে বসবাস করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু চন্দ্রাঙ্গদ সীমন্তিনীর কথা ইত্যাদি জানালে নাগরাজ এঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। শত্রু রাজা তখন পালিয়ে যান; চন্দ্রাঙ্গদ রাজ্য ও স্ত্রী সীমন্তীনিকে ফিরে পান।

চন্দ্রাপীড়—কাশীরাজ কন্যা বপুষ্টমা জনমেজয়ের (দ্র) স্ত্রী। বপুষ্টমার ছেলে চন্দ্রাপীড় সূর্যাপীড়। চন্দ্রাপীড়ের বড় ছেলে সত্যকর্ণ এবং সত্যকর্ণের ছেলে শ্বেতকর্ণ।

চন্দ্রাবতী—সুনাভের দুই মেয়ে চন্দ্রাবতী ও গুণবতী। এঁরা দু জনে এক দিন প্রদ্যুম্ন ও প্রভাবতীকে (দ্র) প্রেমালাপ করতে দেখে প্রভাবতীকে অনুরোধ করে তাদের জন্যও উপযুক্ত যাদব স্বামী নির্বাচিত করে দিতে। প্রভাবতী তখন এই দুই বোনকে দুর্বাসা দত্ত মন্ত্র শিখিয়ে দেন। এই মন্ত্র পাঠ করে কোন পুরুষকে স্মরণ করলে তাকে বিয়ে করা যায়। এঁরা গদ ও সাম্বকে স্মরণ করে এবং চন্দ্রাবতী গদকে ও গুণবতী সাম্বকে বিয়ে করেন। সুনাভের বড় ভাই বজ্রনাভের মেয়ে প্রভাবতী।

চন্দ্রাবলী—কৃষ্ণের এক সখী। চন্দ্রভানুর (দ্র) মেয়ে; মা বিন্দুমতী। রাধিকা চন্দ্রাবলীর নিজের, খুড়তুতো বোন। গোবর্দ্ধন মল্লের স্ত্রী। ইনিও কৃষ্ণের এক প্রেমিকা। এঁর কুঞ্জে কৃষ্ণ এক বার রাত কাটান ফলে রাধিকা চন্দ্রাবলীর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

চন্দ্রাশ্ব—কুবলাশ্বের তিন ছেলে: চন্দ্রাশ্ব, দৃঢ়াশ্ব, ও কপিলাশ্ব।

চমর—কশ্যপের ঔরসে ক্রোধবশার সন্তান মৃগমদা। মৃগমদার সন্তান স্মর ও চমর।

চমস—প্রিয়ব্রত বংশে রাজা ভরতের ছোট ভাই। এই ভরত থেকে নাম ভারতবর্ষ। ভরতের ভাই কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, আর্যাবর্ত, মলয়, ভদ্রকেতু, সেন, চন্দ্রস্পৃক

ও কীকট। ভরতের অপর নয়টি ভাই নবযোগী: কবি, হরি, অম্বরীষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রমিড়, চমস ও করভঙ্গ।

চম্পকারণ্য—বর্তমানে চম্পারণ। তীর্থ স্থান। এখানে এক রাত বাস করলে হাজার গোদানের ফল হয়।

চম্পা—(১) চম্পা নামে রাজার স্থাপিত প্রসিদ্ধ নগরী। গঙ্গাতীরে। পুরাণে বহু উল্লেখ আছে। ত্রেতা যুগে এখানে লোমপাদ বাস করতেন। দ্বাপরে সূত অধিরথ/অতিরথ এখানে রাজত্ব করতেন। বর্তমানের ভাগলপুরের কাছে। অঙ্গরাজ কর্ণের রাজধানী। (২) ভিয়েৎনামের মাঝখানে অনাম প্রদেশে প্রাচীন চম্পা একটি হিন্দু রাজ্য। খৃ ২-৩ শতকে ভারতীয় লিপিতে সংস্কৃত ভাষা এখানে চালু ছিল। ১৫ শতক পর্যন্ত এই দেশ স্বাধীন হিন্দু রাজ্য ছিল। এর পর অনাম জাতি এই দেশ জয় করেন এবং চম্পা ধ্বংস হয়। ভারতের ভাষা, শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্ম, ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্য, সামাজিক রীতিনীতি শিল্পকলা ও শাসনপ্রণালী এখানে প্রচলিত ছিল। এখানে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। এই রাজ্যের চারটি প্রদেশ উত্তর থেকে দক্ষিণে নাম ছিল অমরাবতী, বিজয়, কৌঠার ও পাণ্ডুরঙ্গ।

চম্পু—গদ্য ও পদ্যময় সংস্কৃত কাব্য। ৮ শতকে দণ্ডীর কাব্যাদর্শে এর প্রথম উল্লেখ আছে। বর্তমানে দশম শতকের আগে লেখা কোন চম্পুকাব্য পাওয়া যায় না। ত্রিবিক্রম ভট্টের রচনা নলচম্পু বা দময়ন্তীকথা, সোমপ্রভসূরির যশস্তিলকচম্পু, জীব গোস্বামীর গোপাল চম্পু, কবিকর্ণপুরের আনন্দবৃন্দাবন চম্পু ইত্যাদি কয়েকটি প্রসিদ্ধ চম্পুকাব্য।

চরক—আয়ুর্বেদ শাস্ত্র চরক সংহিতার লেখক। মৎস্য অবতার হয়ে নারায়ণ বেদ উদ্ধার করলে অনন্ত দেব অথর্ব বেদের অন্তর্গত আয়ুর্বেদ অংশ পান। অনন্তদেব তার পর চর বেশে অর্থাৎ গুপ্তবেশে পৃথিবীতে এসে মানুষের ব্যাধি ও যন্ত্রণা দেখে করুণার্দ্র হয়ে এক মুনির ঘরে জন্মে মানুষের রোগ সারাতে থাকেন। চর রূপে এসেছিলেন বলে নাম হয়েছিল চরক। ব্রহ্মা, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরি, ইন্দ্র ভরদ্বাজ, আত্রেয়, ও অগ্নিবেশের কাছে যথাক্রমে সূত্র, শারীরস্থান, ঐন্দ্রিয়, চিকিৎসা, নিদান, বিমান, বিকল্প ও সিদ্ধি এই অষ্টস্থান শিক্ষা করে চরক সংহিতা প্রণয়ন করেন।

প্রাচীন কাল থেকে কায় চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা নামে দুটি ধারা চলে আসছিল। কায় চিকিৎসার অন্যতম প্রবর্তক আত্রেয় মুনি। আত্রেয়-এর ছ-জন ছাত্র অগ্নিবেশ, ভেড়, জাতুকর্ণ; পরাশর, ক্ষারপাণি, হারীত। এই ছ-জন ঋষিই নিজের নিজের নামে একটি করে চিকিৎসা গ্রন্থ লেখেন। কিন্তু এই বইগুলি এখন ঠিক পাওয়া যায় না। অগ্নিবেশ রচিত বইটিকে স্পষ্ট করে এবং সম্পূর্ণ করে চরক তাঁর গ্রন্থটি লেখেন। এই চরক যে কে জানা যায় না। রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থের কপিলবলকে অনেকে চরক বলে মনে করেন। ইনি কনিষ্কের সমসাময়িক। বর্তমানের গ্রন্থটি আচার্য দৃঢ়বল সম্পাদিত। দৃঢ়বল মনে হয় কপিলবলের ছেলে। এই বইয়ের সিদ্ধিস্থানের সপ্তদশ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশ দৃঢ়বলের লেখা। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে একজন চরকের উল্লেখ আছে। ফলে অনেকে মনে করেন ইনি খৃ-পূ

৪ শতকের আগের লোক। আবার অনেকের মতে চরক ছিলেন গোত্রপ্রবর্তক। এঁদের বংশধরদের সকলেরই উপাধি চরক। এঁদের বহু লোকের সাধনায় এই চরক সংহিতা রচিত।

চরকের নাম দেশ বিদেশের প্রাচীন গ্রন্থে শ্রদ্ধার সঙ্গে বার বার উল্লিখিত হয়েছে। আরবিতে চরকের নাম সরক। চরকের উপদেশ রোগীকে চিকিৎসক সমস্ত অন্তর দিয়ে যত্ন করবেন এবং নিজের জীবন সংশয় হলেও রোগীর যেন কোন অপকার না করেন। রোগীর পারিবারিক খবরও যেন বাইরে প্রকাশ না করেন।

চরকসংহিতা—চরক (দ্রঃ) লিখিত চিকিৎসা শাস্ত্র। বইটি আটটি ভাগ: সূত্রস্থান, নিদানস্থান, বিমানস্থান, শারীরস্থান, ইন্দ্রিয়স্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান এবং সিদ্ধিস্থান। গ্রন্থের অংশ বিশেষে আত্রেয় ও অগ্নিবেশকে বক্তা ও শ্রোতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বইটিতে পড়বার জন্য নির্দেশ আছে। গুরু সূত্র অংশটিকে গুরু আদিষ্ট বলে গ্রহণ করতে হবে; শিষ্যসূত্র অংশ গুরু শিষ্যের প্রশ্ন উত্তর হিসাবে সাজান। এবং একীয় সূত্র বা প্রতিসংস্কার সূত্র হচ্ছে গুরুসূত্র ও শিষ্যসূত্রের মিলিত অংশ।

সূত্রস্থানে খনিজ, উদ্ভিজ ও প্রাণীজ দ্রব্যগুলিকে যথা সম্ভব শ্রেণী বিভাগ করে সাজান হয়েছে যাতে এগুলি স্পষ্ট চেনা যায়। এর পর এগুলির রোগ সারানর ক্ষমতা ও ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। নিদান স্থানে ব্যাধির মুখ্য ও গৌণ কারণ এবং কি ভাবে রোগ ছড়ায় এবং রোগ কি ভাবে অন্য রোগে পরিণত হয় ইত্যাদি আলোচনা রয়েছে। বিমান স্থানে মানুষের দেহ ও মনের উপাদান, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া বাইরের প্রকৃতির প্রভাব উল্লিখিত হয়েছে। এই অংশে সে সময়ের রাজতন্ত্র ও জনপদেরও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালে মনঃসমীক্ষার পদ্ধতিও এতে জানা যায়। নানা দিক দিয়ে অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ। শারীর স্থান ও একটি বিস্ময়কর অধ্যায়। ইন্দ্রিয়স্থান অধ্যায়ে শরীর ও মনের বর্তমান লক্ষণ দেখে ভবিষ্যতে কি রোগ হতে পারে বা মৃত্যু হবে কিনা আলোচিত হয়েছে। চিকিৎসা স্থানে রোগ কত প্রকার ও রোগের প্রকৃতি আলোচিত হয়েছে। ভেষজ সম্বন্ধেও বিশেষ আলোচনা আছে। কল্পস্থান ও সিদ্ধিস্থানে কায় চিকিৎসকদের জন্য নানা উপদেশ আছে এবং দুর্ঘটনার রোগীদের জন্য কি করণীয় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

এ ছাড়াও বইটিতে আয়ুপুরুষবাদ নামে একটি দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মতবাদটি আস্তিক, যৌগিক, সাংখ্যিক, চিন্তাধারায় সমন্বয় সাধন করে বস্তুবাদের অস্তিত্ব, স্থাপন করেছে। চরক সংহিতার ওপর বহু টীকা আছে। এদের মধ্যে চরক টীকা, পরিহার বর্তিকা, নিরন্তরপদ ব্যাখ্যা, তত্ত্বপ্রদীপিকা, জল্পকল্পতরু ও চরকোপস্কার উল্লেখযোগ্য।

চরু—যজ্ঞীয় পায়সান্ন। হোমের জন্য এই অন্ন পাক করা হত। দেবতারা এই চরু খান। এর উপকরণ চাল যব ও গবেধুকা নামে এক জাতীয় নিকৃষ্ট চাল। যজ্ঞীয় প্রয়োজন হিসাবে ও দেবতা হিসাবে উপকরণ ও প্রস্তুত বিধি বিভিন্ন হয়। যেমন গবেধুক চরু পশুপতি রুদ্রদেবকে দেওয়া হয়। মাটির বা তামার পাত্র যাতে চরু তৈরি হয় তার নাম চরুস্থালী। অধ্বর্যু-রা চরু পাক করতেন। ধান থেকে চাল-ও বিভিন্ন

বৈদিক শাখার বিধি অনুসারে তৈরি করতে হয়। এর পর চাল দুধ ও জল ভাপে সেদ্ধ করতে হয় এবং সাবধান থাকতে হয় গলে না যায় বা পুড়ে না ওঠে; ভাতগুলি যেন আস্তই থাকে; নামাবার সময় গলা ঘি দিয়ে নামাতে হয়। এই চরু দিয়ে হোম করতে হয়। বহু গৃহ্যকর্মে চরু হোম করণীয়। বিয়েতে করতে হয় না কিন্তু বিয়ের পর চতুর্থীতে চরুপাক করা যায়। সীমন্তোন্নয়ন, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, গৃহপ্রবেশ বৃষোৎসর্গ, এবং শুভকামনায় ও আয়ুষ্কামনায় চরুহোমের বিধি আছে।

চর্ম্মণ্বতী—মহারাজ রন্তিদেব প্রতি দিন কয়েক হাজার ষাঁড় কেটে ব্রাহ্মণ ও অতিথিদের খাওয়াতেন। এদের রক্ত ও ক্লেদে এই নদীর উৎপত্তি। অন্য মতে রাজা শশবিন্দু যজ্ঞ করেন; এত পশু হত্যা করেন যে পশুচর্ম জমা হয়ে গাদা হয়ে ওঠে। এর পর বৃষ্টিতে চামড়া ধোওয়া জলে নদী তৈরি হয়। এই নদীতে স্নান করলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। বর্তমানে বুন্দেলখণ্ড অন্তর্গত চম্বল নদী।

চর্মবান—শকুনির ভাই। অর্জুনের ছেলে ইরাবানের হাতে নিহত হন।

চাক্ষুষ—উত্তানপাদের ছেলে ধ্রুব ও স্ত্রী শম্ভুর ছেলে শিষ্টি ও ভব্য। শিষ্টি ও স্ত্রী সুচ্ছায়ার ছেলে রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজস্। এই রিপু ও স্ত্রী বৃহতীর ছেলে চাক্ষুষ। চাক্ষুষ ও স্ত্রী পুষ্করিণীর (মেরুবংশে জন্ম। বীরণ প্রজাপতির মেয়ে) ছেলে চাক্ষুষ মনু।

চাক্ষুষমনু—চাক্ষুষের (দ্র) ছেলে। স্ত্রী নড্‌লা; বৈরাজ প্রজাপতির মেয়ে। ছেলে কুরু/উরু, পুরু, সত্যদ্যুম্ন/শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবান/সত্যবাক, সুদ্যুম্ন, শুচি/সুচী, অগ্নিষ্টোম/অগ্নিষ্টু, অতিরাত্র/অধিরাজ, অভিমন্যু/অতিমন্যু। একটি কাহিনীতে অনমিত্রের ছেলে আনন্দ (দ্র) চাক্ষুস মনু হয়ে জন্মান। আর এক মতে অঙ্গের ছেলে। পুলহের কাছে বর চান এবং পুলহের উপদেশে তপস্যা করে দেবীর বরে মনু হন। চাক্ষুস মনুর রাজত্ব কালে ইন্দ্র মনোজব। দেবতা পাঁচ ভাগ:- অক্ষয়, প্রসূত, ভব্য, পৃথুক ও লেখ। প্রতি ভাগে ৮ জন দেবতা। সপ্তর্ষি:- সুমেধস্, বিরজস, হবিষ্মান, উত্তম, মধু, অতিনামন্, ও সহিষ্ণু। চাক্ষুষ মনুর রাজত্ব কালে ধর্মের পুত্র নারায়ণ জন্মান। ব্রহ্মা চন্দ্র হয়ে, বিষ্ণু দত্তাত্রেয় হয়ে, শিব দুর্বাসা হয়ে অত্রি ও অনসূয়ার সন্তান হিসাবে জন্মান।

চাণক্য—চণকের ছেলে বা বংশধর। অপর নাম বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্য। তক্ষশীলাতে জন্ম। উপার্জনের আশায় কাঞ্চীপুর থেকে পাটলীপুত্রে এসে নন্দবংশের রাজসভাতে অপমানিত হন। চাণক্য তখন নন্দবংশ ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করেন এবং ধ্বংস করে চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করে নিজে মন্ত্রী হন (খৃ-পূ ৪০০ ?)। চাণক্য কাহিনী নিয়ে রচিত মুদ্রারাক্ষস। রাজনীতিতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর গ্রন্থ অর্থশাস্ত্র ও চাণক্য রাজনীতি শাস্ত্র। বাংলাদেশে চাণক্য শ্লোক নামে বিভিন্ন বই পাওয়া যায়; এগুলি কার লেখা নিশ্চয়তা নাই।

চানূর—দ্রঃ কংস।

চান্দ্রমসী—বৃহস্পতির স্ত্রী তারার অপর নাম।

চান্দ্রায়ণ—চাঁদের কলার বাড়া কমা অনুসারে এক গ্রাস করে খাদ্য বাড়ান কমান রূপ ব্রত। কৃষ্ণপ্রতিপদে ১৪ গ্রাস থেকে আরম্ভ, কৃষ্ণচতুর্দশীতে মাত্র এক গ্রাস ও

অমাবস্যায় উপবাস, শুক্লপ্রতিপদে আবার এক গ্রাস এবং বাড়তে বাড়তে পূর্ণিমাতে ১৫-গ্রাস। এই ভাবে যখন খাদ্য গ্রহণ করা হয় তখন বলা হয় পিপীলিকা-মধ্য চান্দ্রায়ণ। কারণ মাঝখানে খাদ্যের পরিমাণ পিপীলিকার কটিদেশের মত ক্ষীণ। শুক্লপক্ষে আরম্ভ করলে শুক্ল প্রতিপদে একগ্রাস, পূর্ণিমায় ১৫ গ্রাস এবং তারপর কমতে কমতে অমাবস্যায় উপবাসঃ-এব নাম যবমধ্য-চান্দ্রাযণ। কারণ মাঝে পূর্ণিমাতে খাদ্যের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। যতি চান্দ্রায়ণে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে আটগ্রাস করে হবিষ্যান্ন; শিশু চান্দ্রায়ণে প্রতিদিন প্রাতে ৪ গ্রাস এবং সন্ধ্যায় ৪ গ্রাস; ঋষি চান্দ্রায়ণে প্রতিদিন তিন গ্রাস। আর এক চান্দ্রায়ণে মাসে মোট ২৪০ গ্রাস অন্ন গ্রহণীয়। এক গ্রাস অন্ন একটি ময়ূরের ডিমের মত। এ ছাড়া শুদ্ধাচারে থাকা, প্রতি দিন তিন বার স্নান ও মন্ত্র জপাদি কর্তব্য। যে পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই তাও চান্দ্রায়ণে দূর হয়। দেবতারাও এই ব্রত করতেন।

চামুণ্ডা—দুর্গার (ত্র কৌষিকী) কপাল থেকে আবির্ভূতা। চণ্ড ও মুণ্ডকে নিধন করে এদের দু জনের মুণ্ড দুর্গাকে উপহার দেন। এই থেকে নাম চামুণ্ডা। মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে চণ্ডমুণ্ড তাদের সৈন্যদল নিয়ে দেবীকে আক্রমণ করলে দেবী বার হয়ে আসেন দুর্গার কপাল থেকে। রক্তবীজ অসুরের প্রতি রক্ত বিন্দু মাটিতে পড়লে সেই বিন্দু সমান শক্তিমান আর একটি অসুরে পরিণত হত। যুদ্ধে আহত রক্তবীজের রক্ত যাতে মাটিতে পড়তে না পারে সেই জন্য এই দেবী রক্তবীজের দেহ নির্গত রক্ত পান করতে থাকেন। রক্তবীজ এই ভাবে অন্য অসুরের জন্ম দিতে না পেরে মারা যান।

চামুণ্ডা কালো, করালবদনা, গায়ের চামড়া দড়িপাকান, ভীষণ দেখতে, বিরাট মুখ, লকলকে জিব, লাল এবং কোটর গত চোখ, পরণে বাঘছাল, গলায় মুণ্ডমালা। অস্ত্র হচ্ছে অসি, পাশ ও খট্বাঙ্গ। তন্ত্রসারে বাঁ হাতে পাশ ও নরমুণ্ড, ডান হাতে বজ্র ও খট্বাঙ্গ। মুখ মণ্ডল সুন্দর ও কোটি দাঁত। মাথায় চুল পিঙ্গল, বাহন শব। বিভিন্ন পুরাণ মতে মাতৃকারা সাত, আট বা নয়। মাতৃকাদের নাম ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বরাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা, শিবদূতী ও নারসিংহী। অর্থাৎ চামুণ্ডা এক জন মাতৃকা। অগ্নি পুরাণে মাতৃকাদের নাম চামুণ্ডা ব্রহ্মাণী, চামুণ্ডা মাহেশ্বরী ইত্যাদি; এখানে চামুণ্ডা একক নাম নেই। চামুণ্ডাকে অনেক জায়গায় যমের শক্তি যামী বলা হয়। আবার শিবের ঘোর রূপ ভৈরবের শক্তিকেও চামুণ্ডা বলাও হয়। ব্রহ্মাণী ইত্যাদি যেমন ব্রহ্মা ইত্যাদির শক্তি। বাজসনেয় সংহিতায় মনোজবস্ মনে হয় মণ্ডুকোপানিষদের যমের পত্নী যামী; এবং ইনিই চামুণ্ডা। মনোজবাকে চামুণ্ডা ধরলে খৃ-পূর্বের সময়ের দেবী। মনে হয় চামুণ্ডা ও দেবীর বিভিন্ন রূপের অনেকগুলি রূপ অনার্যদের কাছ থেকে এসে আর্য ধর্মের সঙ্গে মিশেছে। চামুণ্ডা, ব্রহ্মাণী, কালিকা ইত্যাদি দেবীকে ফল-শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও মনে করা হয় এবং চামুণ্ডা মানকচুর দেবী। এই দৃষ্টি ভঙ্গিও অনার্য জাতির কাছ থেকে পাওয়া।

উড়িষ্যার যাজপুরে প্রাচীন বিরজা ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত মূর্তি ও ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলে চামুণ্ডার ভীষণ রূপের পরিচয় আছে। যাজপুরে আর একটি মূর্তি পাওয়া গেছে; এটি চামুণ্ডার দন্তুরা মূর্তি। বৌদ্ধ নিষ্পন্নযোগাবলীতে চামুণ্ডার

উল্লেখ আছে ; পিকিঙেও একটি মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তি সম্ভবত তান্ত্রিক-সাধকদের মধ্যেই অধিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। বশীকরণ ইত্যাদি আভিচারিক কাজেও চামুণ্ডার পূজা হয়।

চারণ—পশ্চিম ভারতের একটি জাতি। স্কন্দপুরাণে আছে বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জন্ম। রাজা ও ব্রাহ্মণদের গুণকীর্তন, সংগীত ও কামশাস্ত্র এদের উপজীবিকা। প্রাচীন ভারতে রাজসভায় নানা কাজে এঁরা বীরদের কাহিনী গান করতেন। এই কাহিনীর নাম ছিল 'নারাশংসি'। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীও এদের মুখেই প্রচারিত হত। মনে হয় এঁরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন এবং পরে চারণ, ভাট, নট, কুশীলব নামে পরিচিত হন। চারণরা নিজেদের শিবের বংশে জন্ম বলে দাবি করতেন। বহু সময় এঁরা পথিকদের সঙ্গে থাকতেন এবং পথে দস্যু আক্রমণ করলে এঁরা এগিয়ে গিয়ে নিজেকে শিবের সন্তান বলে পরিচয় দিয়ে পথিককে বাঁচাতে চেষ্টা করতেন। বাঁচাতে না পারলে দস্যুকে শাপ দিয়ে আত্মহত্যা করতেন। এই আত্মহত্যাকে বলা হত ত্রাগা। লুঠেরদের হাত থেকে গৃহস্থের সম্পত্তিও এই ভাবে বাঁচাতে চেষ্টা করতেন। আত্মবিসর্জনকারী চারণদের উদ্দেশ্যে স্থাপিত প্রস্তর ফলক পশ্চিম ভারতে বিশেষত কাঠিওয়াড় অঞ্চলে প্রচুর রয়েছে। চারণদের দুটি শাখা : কাচিলি শাখা ব্যবসা করেন ; মরুশাখা চারণ গান করে বেড়ান।

চারু—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে নিহত হন।

চারুগুপ্ত—রুক্মিণীর (দ্রঃ) এক ছেলে।

চারুদেষ্ণ—রুক্মিণীর (দ্রঃ) এক ছেলে।

চারুনেত্রা/চারুনেত্রী—অপ্সরা। কুবের সভাতে।

চারুমৎস্য—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে। ব্রহ্মবাদী।

চার্বাক—অন্য নাম বার্হস্পত্য বা লোকায়ত। মৈত্রায়ণী উপনিষদ ও বিষ্ণুপুরাণ মতে অসুরদের অধঃ পতিত করার জন্য দেবগুরু প্রচারিত মোহজালই বার্হস্পত্য। ত্রিপিটক, রামায়ণ ও মহাভারতে লোকায়ত ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, দিব্যাবদান ইত্যাদিতে লোকায়তদের যজ্ঞ ও মন্ত্রের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। গীতায় নামেই-যজ্ঞকারী অসুররাও লোকায়ত সম্প্রদায়। গুণরত্নের বর্ণনায় লোকায়তিকরা কাপালিক ও ভস্মমণ্ডিত যোগী।

লোকায়ত দর্শনের আদিরূপ হচ্ছে (১) ভারতীয় চিন্তাধারার স্বাধীনতার মুখপাত্র। (২) প্রাচীন সুমেরীয় অন্ত্যেষ্টি পদ্ধতির অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের ভারতীয় সংস্করণ। (৩) ভারতীয় রাষ্ট্র বিস্তার আদিরূপ ; (৪) সাধারণ গ্রাম্য মানুষের কাহিনী (৫) দেহতত্ত্ব ও কায়সাধনায় আস্থাবান সহজিয়া সম্প্রদায়ের আদি সংস্করণ। মধ্যযুগে চার্বাক সম্প্রদায়ের নামে বিশেষ একটি মতবাদ গড়ে উঠেছিল। এই মতবাদ : ক্ষিতি অপ, তেজ, মরুৎ এই চারটি ভূত নশ্বর দেহ তৈরি করেছে ; আত্মা বলে কিছু নাই। কর্মফল, জন্মান্তর ও পরলোক সম্পূর্ণ ধাপ্পা। স্বভাবই জগৎ কারণ এবং প্রত্যক্ষই প্রমাণ। চার্বাকরা লৌকিক অনুমানকে স্বীকার করেন ; অলৌকিক ও প্রত্যক্ষাতীত অনুমান (অর্থাৎ আত্মা ইন্দ্রিয় ইত্যাদি) স্বীকার করেন না। চার্বাকদের নিজস্ব কোন বই অবশ্য পাওয়া যায় না। দ্রঃ জড়বাদ।

এঁদের মোটামুটি চারটি সম্প্রদায়। এঁদের এক মাত্র লক্ষ্য ছিল পর মত খণ্ডন। কোন তত্ত্বকেই এঁরা তত্ত্ব মনে করতেন না। সর্বত্র সন্দেহ জাগিয়ে তোলাই এঁদের কাজ ছিল। ঈশ্বর বেদ ইত্যাদি মানতেন না। এঁরা নাস্তিক, বৈতণ্ডিক, হৈতুক, লোকায়ত, তত্ত্বোপপ্লববাদী ইত্যাদি নামে পরিণত ছিলেন। এঁদের একটি সম্প্রদায়ের নাম ধূর্তচার্বাক বা উচ্ছেদবাদী বা দেহাত্মবাদী। এঁদের মতে পরিদৃশ্যমান জগৎ আকস্মিক ও চাতুর্ভৌতিক। অনুমানকে এঁরা মানতেন না। ইন্দ্রিয় সুখই পুরুষার্থ এবং ঐহিক দৈহিক ক্ষণিক সুখই স্বর্গ। সুশিক্ষিত চার্বাক নামে আর একটি দল গড়ে উঠেছিল। লোকযাত্রার জন্য এঁরা অনুমান ইত্যাদি কিছু কিছু মানতেন অবশ্য ঈশ্বর জন্মান্তর ইত্যাদি প্রমাণের জন্য যে সব অনুমান দরকার হয় তা স্বীকার করতেন না। পশু সুলভ ঐহিক ও ক্ষণিক সুখের পরিবর্তে পবিত্রতর ও সূক্ষ্মতর মানসিক সুখকে এঁরা পুরষার্থ বলতেন। এঁদের আবার তিনটি উপসম্প্রদায় ছিল: ইন্দ্রিয়াত্মবাদী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে যাঁরা আত্মা বলতেন; মন-আত্মবাদী অর্থাৎ যাঁরা মনকে আত্মা বলতেন এবং দেহাত্মবাদী অর্থাৎ দেহকে যাঁরা আত্মা বলতেন। আর এক শ্রেণীর চার্বাক দল আকাশকে পঞ্চমভূত হিসাবে স্বীকার করেছিলেন। এঁরা কতকটা অধ্যাত্মবাদী হয়ে উঠেছিলেন।

বৃহস্পতিকে চার্বাক মতের প্রবর্তক বলা হয় বটে কিন্তু ইনি যে কে এ নিয়ে মত ভেদ আছে। ঋক্ বেদে (১০/৭২/৩) লৌক্যবৃহস্পতির মত অসৎ থেকে সৎ উৎপন্ন হয়েছে। এবং এই লৌক্য বৃহস্পতিই মনে হয় লোকায়ত মত-বাদের আদি জনক। (২) বৃহস্পতির শিষ্য এক জন দার্শনিক মুনি। এঁর মত সচেতন দেহের অতীত আত্মা বলে কিছু নেই। সুখই চরম পুরুষার্থ। প্রমাণ প্রত্যক্ষভিত্তিক। (৩) মহাভারতে দুর্যোধনের এক রাক্ষস বন্ধু। বদরিকাতে তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে দর্পিত হয়ে দেবতাদের উৎপীড়ন করতেন। দেবতারা শেষ অবধি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলে ব্রহ্মা বলেন চার্বাক ব্রাহ্মণদের অপমান করলে ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর আত্মীয় বধের গ্লানিতে ম্রিয়মান যুধিষ্ঠির যখন সিংহাসনে উঠতে যাচ্ছিলেন তখন সমবেত ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে ছদ্মবেশী এই রাক্ষস যুধিষ্ঠিরকে বলেন আত্মীয় ও গুরু-জনদের হত্যার জন্য ব্রাহ্মণরা তাঁকে ধিক্কার দিচ্ছেন ও মৃত্যুবরণ করতে বলছেন। এই কথায় যুধিষ্ঠির আরো মর্মাহত হয়ে পড়েন। কিন্তু ব্রাহ্মণরা চার্বাক রাক্ষসকে চিনতে পেরে সক্রোধে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন এবং এই হুঙ্কারে দগ্ধ হয়ে চার্বাক মারা যায়।

চিকিৎসা—ঋক্ ও অথর্ব বেদে বিভিন্ন রোগ ও তার ভেষজের উল্লেখ আছে। এর পর কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, শল্য, শালাক্য, অগদ, রসায়ন ও বাজীকরণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের এই প্রতিটি শাখায় প্রচুর চর্চা হয়েছিল। সেই যুগের তুলনায় অতি উন্নত ধরণের জ্ঞান অধিগত হয়েছিল। শালিহোত্রসংহিতা, পালকাপ্য-সংহিতা, বৃক্ষায়ুর্বেদ ইত্যাদি বই থেকে নিশ্চিত রূপে জানা যায় যে পশুপাখী ও গাছ-পালার চিকিৎসাও সে যুগে প্রচলিত হয়েছিল। পরে বহু বই লুপ্ত হয় এবং সংকলন গ্রন্থ হিসাবে চরক ও সুশ্রুত সংহিতা তৈরি হয়।

চিতল—উই। বিষ্ণু একবার লক্ষ্মীকে দেখে হেসে ফেলেন। লক্ষ্মী উপহাস মনে করেন এবং সন্দেহ হয় হয়তো কোন অধিকতর সুন্দরীর প্রতি আসক্ত হয়ে এই হাসি। ফলে

অভিশাপ দেন বিষ্ণুর মাথা ছিন্ন হবে। শাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে অসুররা আক্রমণ করে এবং বহু দিন ধরে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ধনুকের এক প্রান্ত মাটিতে রেখে অপর প্রান্তের ওপর চিবুক স্থাপন করে বিশ্রাম করতে করতে বিষ্ণু ঘুমিয়ে পড়েন। দেবতারা এ দিকে এই সময় যজ্ঞ আরম্ভ করেন। যজ্ঞে বিষ্ণুকে না পেয়ে ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারা বৈকুণ্ঠে যান এবং সেখানেও না পেয়ে সব বুঝতে পারেন এবং বিষ্ণু যেখানে ঘুমাচ্ছিলেন সেইখানে অপেক্ষা করতে থাকেন। বিষ্ণুকে জাগাবার কি ব্যবস্থা করা যায় ভাবতে ভাবতে ব্রহ্মা উই পোকা সৃষ্টি করেন। এরা ধনুকের নীচের অংশ খেয়ে ফেললে ধনুকের গুণ কেটে যাবে; ধনুক ছিটকে উঠে বিষ্ণুর ঘুম ভাঙিয়ে দেবে। কিন্তু উই পোকারা রাজি হয় না; দেবতাদের লাভ হলেও তাদের পাপ হবে যুক্তি দেখায়। ব্রহ্মা তখন উই পোকাদের যজ্ঞের হবির একটা ভাগ দেবেন বলেন; অগ্নিকুণ্ডের পাশে মাটিতে যে হবি পড়বে চিতলরা সেই হবি খাবে। উই পোকারা তখন সম্মত হয়; কিন্তু গুণ মুক্ত ধনুকের তীব্র আঘাতে বিষ্ণুর মাথাও ছিন্ন হয়ে যায়। দেবতারা তখন নিরুপায় হয়ে একটি ঘোড়ার মাথা এনে বিষ্ণুর দেহে লাগিয়ে দিয়ে বিষ্ণুকে জীবিত করে তোলেন। বিষ্ণুর নির্দেশে উই পোকারা হয়গ্রীব অসুরের ধনুও এই ভাবে কেটে দেয়; অসুর মারা পড়ে।

চিৎপাবন—শাকান্নভোজী দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের ৫-টি শাখার অন্যতম। কোঙ্কন অঞ্চলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে অন্য নাম কোঙ্কনস্থ। অধিকাংশ মতে এঁরা বিদেশী; এখানকার সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছেন। স্কন্দ পুরাণে আছে কোঙ্কন উপকূলে ১৪-টি বিদেশীয় মৃতদেহ ভেসে আসে। পরশুরাম এঁদের চিতার আগুনে পূত করে নিয়ে জীবন দান করেন। এই জন্য নাম চিৎপাবন। এঁরা গৌরবর্ণ, শ্রীমণ্ডিত ও বৈদিক ঐতিহ্য পুষ্ট। পশ্চিম উপকূলে বিভিন্ন জেলাতে বাস। আগে এঁরা মুখ্যত শৈব ছিলেন পরে অন্য দেবদেবীরও পূজা করেন। দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে এঁদের অনেক মিল ও অমিল রয়েছে। বালাজি বিশ্বনাথ, পরে প্রথম বাজিরাও, প্রথম মাধবরাও, নানা ফড়নবিশ ইত্যাদি বহু ভারত বিখ্যাত লোক এই সম্প্রদায়ের সন্তান।

চিত্র—চিত্রবাণ/চিত্রক। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত।

চিত্রকলা—ভারতে চিত্রকলার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশে রামগড়ের নিকট যোগীমারা গুহাগাত্রের ও অজন্তার প্রথম পর্যায়ের ছবিগুলি খৃ পূ ২-১ শতকের। এই শিল্পীরা টেম্পেরা পদ্ধতি অনুসরণ করতেন মনে হয়। ভারতীয় শিল্পীর প্রভাব তার পর ছড়িয়ে পড়ে এবং সিংহলের সিগিরিয়া, মধ্য এসিয়ার দণ্ডন-উলিখ, চীনের তুন হুয়াঙ; জাপানের হোরিউজি মন্দিরের দেওয়ালে এই শৈলী স্পষ্ট। অজন্তা, বাঘ, বাদামি, সিত্তনবাসল, এলোরা, তাঞ্জোর মন্দির, তিরুপতি কুন্দরম্ মন্দির, পদ্মনাভপুর প্রাসাদ, জয়পুর, নেপাল ইত্যাদি স্থানের ভিত্তি চিত্রের মধ্য দিয়ে বিংশ শতকেও এই ভারতীয় ধারা এগিয়ে চলেছে। চিত্রিত পুঁথিও ভারতে বেশ কিছু পাওয়া গেছে। জৈন, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থতে, গীতগোবিন্দ ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থে এই ছবি পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশিল্প শাস্ত্রের অনেকাংশই আজ লুপ্ত। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ, চালুক্যবংশীয় রাজা সোমেশ্বর বা সোমদেবের অভিলষিতার্থ-চিন্তামণি (আলেখ্য কর্ম প্রসঙ্গ), শ্রীকুমার-কৃত শিল্পরত্ন (চিত্রলক্ষণ প্রসঙ্গ), যশোধর রচিত

কামসূত্রের জয়মঙ্গল টীকা ইত্যাদি কয়েকটি বই থেকে অনেক তথ্য জানা যায়। চিত্রশিল্প সম্বন্ধে গভীর অনুশীলন হত। ভারতীয় শিল্পবিদদের মতে ছবির ছয়টি অঙ্গ রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য, বার্ণিক ভঙ্গ। চীন দেশে শিল্প শাস্ত্রেও অনুরূপ ছয়টি অঙ্গের উল্লেখ আছে ; অবশ্য চীনা শিল্প অন্য জিনিস। প্রাচীনকালে চিত্রশিল্পীরা অনেক সময় পেশাদার ছিলেন। বংশানুক্রমিক ভাবেও এই পেশা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যেও বহু সুদক্ষ চিত্রকর ছিলেন।

মধ্য ভারতে বিন্ধ্য ও কৈমুর অঞ্চলে, রায়গড়ের সিংহনপুর গ্রামের কাছে, উত্তরপ্রদেশে মির্জাপুর জেলায়, মধ্য প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলে বিশেষত বেতোয়া ও চম্বল নদীর উপত্যকায় চিত্রযুক্ত গুহাবাস রয়েছে ; এগুলি মধ্য ও নব্য প্রস্তরযুগীয় মনে করা হয়। এগুলির সময় খৃ-পূ ৬০০০-৪০০। এই ছবিগুলি মানুষ ও পশুর চিত্র ; কিছু কিছু হাতী বাঘ ও গণ্ডার আছে এবং তীর ধনুক ও বর্শা দিয়ে হরিণ, মহিষ ইত্যাদির শিকার চিত্রও আছে। লাল পাথরের গুঁড়ার রঙ তৈরি করে, গাছের সরু ডাল দিয়ে আঁকা। ছবিগুলি দ্বিমাত্রিক, বাস্তবানুগ ও প্রাণবন্ত। এর পর ভারতের তাম্রপ্রস্তর যুগের ছবি মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা, লোথাল ও কালিবাঙ্গানের মৃৎ-পাত্রে দেখা যায়। এগুলি খৃ-পূ ৩০০০-২০০০ সময়ের ছবি। এখানে পশুপাখী গাছপালা ও কিছু বোনার নক্সাও পাওয়া যায়। মধ্য ভারতের সরগুজা'র রামগড় পাহাড়ে যোগীমারা গুহার ছবিকে ঐতিহাসিক চিত্র বলা হয়। এর মধ্যে কিছু ছবি খৃ-পূ ১ শতকের ছবি। পশু, মানুষ নানা সামুদ্রিক প্রাণী ইত্যাদি এই সব ছবিতে দেখা যায়। অজন্তার ৯ এবং ১০ নং গুহার ছবি ও ঐ সময়ের। বিষয়বস্তু বৌদ্ধ, ছবিগুলি ভারতীয় চিত্রকলার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি। ছবিতে নানা কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গুপ্তযুগের এই ছবিগুলি ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না এবং এগুলি নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল শিল্পকর্ম। ১নং গুহাতে অবলোকিতেশ্বরের ছবি, ১৭ নং গুহাতে বুদ্ধের সামনে রাহুল যশোধরার ছবি, সুন্দরী নারী বা সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে আঁকা হয়েছে। এই ছবিগুলির মধ্যে বহু ছবিতে শাস্ত্রোক্ত মুদ্রা ও ভঙ্গির মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। বাঘ গুহার (গুহা ৩নং ও ৪নং) ছবি শৈলীর বিচার অজণ্টার দ্বিতীয় পর্যায়ের চিত্রাবলীর সমগোত্রীয়। বাঘের চিত্রগুলির বিষয়বস্তু বৌদ্ধ ও বাস্তবানুগ। কিছু ছবি যেন সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ। অবশ্য অজন্তার ছবির রসমাধুর্য এখানে নেই। বাদামির গুহামন্দিরের ছবির রীতি ও আঙ্গিক অজন্তা ও বাঘগুহা চিত্রের সমগোত্রীয় কিন্তু তবুও শৈলী স্বতন্ত্র। অজন্তা, বাঘ ও বাদামির রীতি হল ভারতীয় ক্লাসিক রীতি। এই রীতির চারিত্রিকতা হল রেখা ও বর্ণের বর্তুলতা সৃষ্টিকারী প্রয়োগ এবং বহিঃ-রেখার প্রবহমান ও ছন্দোময় সতেজতা ও নমনীয়তা। মাদ্রাজে সিত্তনবসাল-এ জৈন মন্দিরের ছবিগুলিও এই রীতিতে রচিত। গুপ্ত পরবর্তী যুগে এলোরার কৈলাস মন্দিরে (খৃ ৮ শতক), তিরুমলয় পুরমের বিষ্ণু মন্দির (খৃ ৭ শতক), কাঞ্চিপুরমে কৈলাসনাথ মন্দিরে (খৃ ৮ শতক) এবং তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দিরে (খৃ ১১ শতক) এই ক্লাসিক রীতিই অনুসৃত হয়েছে। ১০-১৩ শতকের বাংলা বিহার ও নেপালের বৌদ্ধ পুঁথি চিত্রণেও এই ক্লাসিক রীতি দেখা যায়।

এর পর মধ্য যুগে ভারতে চৈত্রশৈলীতে নতুন একটা ধারা দেখা যায়।

অনেকের মতে মধ্য এসিয়ার যাযাবর জাতিগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে এই শৈলী ভারতে আনেন। এই জন্য মধ্য যুগের এই ধারার নাম উত্তর আগত বা উদীচী ধারা। এলোরায় ও চোল ভাস্কর্যের আদর্শে রচিত ছবিগুলিতে এই উদীচী প্রভাব আছে। গুজরাতের জৈন পুঁথিচিত্রেও এই মধ্য যুগীয় রীতির পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। খৃ ১২-১৫ শতক পর্যন্ত এই রীতি চালু ছিল এবং তালপাতার ওপরে, কাগজের পুঁথির পাতায় এই ছবি দেখা যায়। মুসলমান আক্রমণের সময় বহু শিল্পী মালব, রাজপুতানা, গুজরাতের পূর্ব অঞ্চল থেকে চলে এসে হিন্দু ও জৈন শাসকদের আশ্রয়ে ছড়িয়ে পড়েন এবং জৈন ধর্মাধিষ্ঠানগুলিতে পুঁথিচিত্র আঁকতে থাকেন। এগুলি সবই ক্ষুদ্রাকার ছবি। এই ছবিগুলির চারিত্রিকতা রেখার সূচ্যগ্রতা ও তীক্ষ্ণতা, অবয়বের দ্বিমাত্রিকতা এবং দেহের বহু অংশে কনুই, হাঁটু, নাক, চোখ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কৌণিকতার প্রয়োগ। গুজরাতি পুঁথিচিত্রের আর একটি বিশেষত্ব সাচীকৃতি ছবিতেও দুটি চোখের উপস্থিতি। ছবিতে নানা জ্যামিতিক অলংকরণও দেখা যায়। গুজরাতি এই ছবিগুলি প্রায় সর্বত্রই প্রাণহীণ ও অবাস্তব, এবং সোনালি রঙের প্রাচুর্যযুক্ত। বাঙলা বিহার ও নেপালের বৌদ্ধ পুঁথিচিত্রগুলিতে (খৃ ১০-১৩ শতক) কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় ক্লাসিক রীতিই দেখা যায়। এই পর্যন্তকে ভারতীয় প্রাচীন যুগের শেষ বলা চলে।

কপিশ (কাফিরিস্তান) থেকে বাহ্লীক যাবার পথে বামিয়েন একটি সমৃদ্ধ দেশ। এই উপত্যকার পূর্ব ও পশ্চিমে হিন্দুকুশ পাহাড়ের গায়ে বহু গুহা মন্দির রয়েছে। এই গুহাগুলির ছবিতে বিষয়বস্তু, পরিকল্পনা ও রচনাশৈলী সম্পূর্ণ ভারতীয় ; রচনাকাল খৃ ৫-৬ শতক ; সামান্য কিছুটা অবশ্য গ্রীক ইরান বা কুশান প্রভাব আছে। খোটানের চিত্রকলাও ভারতীয় প্রভাবান্বিত। খোটান থেকে নিয়া'র পথে দণ্ডন-উলিক-এর ছবিগুলি সম্পূর্ণ ভারতীয় শৈলীতে আঁকা। নিয়া থেকে দক্ষিণ-বাহী পথে মিরানের ছবিতে প্রথমে গ্রীক ও ভারতীয় প্রভাব ও পরে (৮-৯ শতকে) চীনা ও তিব্বতীয় প্রভাব দেখা যায়। কিজিলের গুহামন্দিরগুলির নাম হাজার মন্দির এবং এখানে অন্য প্রভাব থাকলেও আদর্শ এখানে সুস্পষ্ট। তুর্ফান, তোযুক, চিকগান-কোয়ল, বাজাকলিক ইত্যাদি স্থানে বৌদ্ধ শিল্পের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাতেও ভারতীয় ধর্ম ও শিল্পের অনুপ্রেরণা বেশ খানিকটা রয়েছে। মধ্য এসিয়ার দক্ষিণবাহী ও উত্তরবাহী দুই পথের সংযোগ স্থলে চীনের পশ্চিম সীমান্তে তুন হুয়াং। তুন-হুয়াং-এর অপর নাম হাজার বুদ্ধের গুহা। এখানে বৌদ্ধ সংস্থার গুহামন্দিরে ছবিগুলি টেম্পেরা। শিল্পীরা স্টেনসিল বা পাউনস্ দিয়ে ছবি এঁকে পরে রঙ করে দিতেন। এখানে ৫০০ গুহামন্দিরের মধ্যে ৩০০টি ভাস্কর্য ও চিত্রশোভিত ; গুহাতে সারি সারি শত শত বুদ্ধের ছবি, রচনাকাল ৩-১০ শতক। শিল্পের ইতিহাসে এই গুহাগুলি অবিস্মরণীয়। ছবিগুলির পরিকল্পনা ও মূর্তিতত্ত্ব ভারতীয় ; শৈলী চৈনিক। তবে ভারতীয় শৈলীও চোখে পড়ে ; সাধারণত এগুলি মিশ্রিত শৈলী। কয়েকটি ছবিতে এখানে ত্রিমাত্রিক রীতি-গঠন ভারত ও পশ্চিম থেকে এখানে এসেছিল।

চিত্রকূট—২৫°১৫' উ, ৮০°৪৬'পূ ; উত্তর প্রদেশে বান্দা জেলার একটি পাহাড়। করবী ষ্টেসন থেকে ৮ কি-মি দূরে সীতাপুর গ্রামই প্রাচীন চিত্রকূট। প্রয়াগ থেকে দশ ক্রোশ দূরে। বনে এসে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এখানে কুটির তৈরি করে কিছু

দিন বাস করেছিলেন। এইখানে ভরত এসে দেখা করেছিলেন।

চিত্রকেতু—সুরসেন/শূরসেন দেশের সন্তানহীন রাজা। বহু পত্নীক। অঙ্গিরা ঋষির বরে বা যজ্ঞের চরু খেয়ে এঁর প্রথমা স্ত্রী কৃতদ্যুতি/কেতুদ্যুতির একটি রূপবান ছেলে হয়। কিন্তু শিশুটি পরে মারা যায় অন্য মতে সপত্নীরা বিষ দিয়ে হত্যা করেন। শোক সন্তপ্ত রাজা অঙ্গিরার কাছে মৃত শিশুকে নিয়ে যান। অঙ্গিরা শিশুটিকে জীবিত করে অন্য মতে শিশুর আত্মাকে ডেকে চিত্রকেতুর সন্তান হয়ে বাস করতে/জন্মাতে বলেন। দ্রঃ কৃতদ্যুতি। আত্মা, অন্য মতে অঙ্গিরা ও নারদ চিত্রকেতুকে বহু তত্ত্বকথা শুনিয়ে সান্ত্বনা দেন। চিত্রকেতু বিষ্ণু ভক্ত হয়ে ওঠেন এবং রাজা ও স্ত্রী কৃতদ্যুতি দুজনেই গন্ধর্ব দশা প্রাপ্ত হন। এঁরা তার পর স্বর্গে যাচ্ছিলেন; অন্য মতে চিত্রকেতু নিজেকে জিতেন্দ্রিয় মনে করে একটু অহঙ্কারী হয়ে পড়েছিলেন এবং স্বর্গে যাবার পথে কৈলাসে শিবের কোলে পার্বতীকে বসে থাকতে দেখে শিবকে উপহাস করেন। পার্বতী ফলে শাপ দেন এবং চিত্রকেতু বৃত্রাসুর হয়ে জন্মান। (২) গরুড়ের এক ছেলে। (৩) পাঞ্চাল রাজপুত্র; পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। (৪) শিশুপালের ছেলে।

চিত্রকেশী—এক জন অপ্সরা।

চিত্রগুপ্ত—যমের মন্ত্রী। মানুষের কৃতকর্মের হিসাব রাখেন।

চিত্রচাপ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে নিহত হন।

চিত্রবর্মা—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে মারা যান। (২) পাঞ্চাল দেশে রাজা সুচিত্রের চার ছেলে চিত্রকেতু, সুধন্বা, চিত্ররথ ও বীরকেতু। চার জনেই কুরুক্ষেত্রে মারা যান। (৩) চন্দ্রাঙ্গদের স্ত্রী সীমন্তিনীর পিতা।

চিত্রবর্হ—গরুড়ের এক ছেলে।

চিত্রবাহু—চিত্রায়ুধ। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে নিহত হন।

চিত্রবেগিক—ধৃতরাষ্ট্র বংশের একটি সর্প। সর্প যজ্ঞে নিহত হয়।

চিত্রভানু—মণিপুরের রাজা। অর্জুনের স্ত্রী চিত্রাঙ্গদার পিতা।

চিত্ররথ—দ্রঃ অঙ্গারপর্ণ। (২) রাজা পুরু ও স্ত্রী বাহিনীর ছেলে। (৩) জনৈক সাম্ব রাজা; এর জন্যও রেণুকার (দ্র) আশ্রমে ফিরতে দেরি হয়। (৪) এক জন পাঞ্চাল রাজপুত্র। (৫) দশরথের এক মন্ত্রী। (৬) যাদব বংশে উশঙ্কুর ছেলে; ; শূরের পিতা। (৭) একটি বন; এই বনে রাজা যযাতি বিশ্বাচী সঙ্গে বাস করেছিলেন। রাজা পাণ্ডু স্ত্রীদের নিয়ে এখানে কিছু দিন কাটিয়েছিলেন।

চিত্রলেখা—(১) দ্রঃ চন্দ্রলেখা। বাণরাজার মন্ত্রী কুম্মাণ্ডের মেয়ে; উষার সখী। স্বপ্নে দৃষ্ট নায়কের প্রণয়াসক্ত হয়ে উষা ম্লান হয়ে পড়েন। পর দিন চিত্রলেখা স্বপ্নের কথা শুনে নানা দেশের রাজপুত্রের ছবি দেখিয়ে উষার প্রণয়ী কে জেনে নিয়ে দ্বারকায় চলে যান। নারদের তামসী বিদ্যার প্রভাবে নিজেকে অদৃশ্য করে অনিরুদ্ধকে সমস্ত কথা জানিয়ে এবং ঐ বিদ্যার বলে অনিরুদ্ধকে বাণরাজার অন্তঃপুরে গোপনে এনে দেন। (২) এক জন অপ্সরা।

চিত্রশরাসন—শরাসন = চিত্রচাপ। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে নিহত হন।

চিত্রশিখণ্ডী—মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। এঁরা শিখা ধারণ করতেন বলে নাম চিত্রশিখণ্ড/ণ্ডী।

চিত্রসেন—গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর ছেলে। ইন্দ্রের সভাসদ ; নাচগান ও বাজনায় বিশেষ দক্ষ। স্বর্গে নাচ গানের অধ্যক্ষ। পাণ্ডবরা দ্বৈত বনে থাকার সময় দুর্যোধনরা ঘোষ যাত্রায় (দ্র) আসেন। সেই সময়ে দ্বৈতবনে সরোবরের তীরে জল ক্রীড়ার জন্য চিত্রসেন সদল বলে অবস্থান করছিলেন। দুর্যোধনদের এঁরা দ্বৈতবনে প্রবেশ করতে বাধা দেন ; ফলে যুদ্ধ হয়ে এবং হেরে গিয়ে দুর্যোধনরা সস্ত্রীক বন্দী হন। দুর্যোধনের মন্ত্রীরা তখন পাণ্ডবদের শরণাপন্ন হলে যুধিষ্ঠির চার ভাইকে পাঠান। ভীম অবশ্য প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। অর্জুনের কাছে চিত্রসেন হেরে যান এবং অর্জুনের সখা বলে নিজের পরিচয় দিয়ে জানান দুর্যোধনরা পাণ্ডবদের বিদ্রূপ করতে এসেছিল ; ইন্দ্রের আদেশে তিনি এদের বন্দী করেছেন। অর্জুনের অনুরোধে চিত্রসেন সকলকে ছেড়ে দেন। কৌরব রমণীদের মর্যাদাহানি না করার জন্য যুধিষ্ঠির এঁকে ধন্যবাদ দেন। অমৃত বর্ষণ করে মৃত গন্ধর্বদের ইন্দ্র বাঁচিয়ে দেন।

অর্জুন ইন্দ্রলোকে এসে এঁর কাছে নাচগান ও বাজনা ইত্যাদি শেখেন। এই চিত্রসেনই উর্বশীকে বলেছিলেন অর্জুন উর্বশীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে উর্বশী অর্জুনের কাছে অভিসারে গিয়েছিলেন। দ্রঃ গালব। (২) যুধিষ্ঠিরের এক জন সভাসদ। যম ও ইন্দ্রের সভাসদও। (৩) অপর নাম উগ্রসেন। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত হন। (৪) অপর নাম শ্রুতসেন। ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার ভাই। (৫) কর্ণের ছেলে নকুলের হাতে নিহত। (৬) কর্ণের ভাই ; যুধামন্যুর হাতে নিহত।

চিত্রসেনা—একটি অপ্সরা।

চিত্রা—(১) একটি নক্ষত্র (আলফা ভার্জিনিস্)। (২) কুবের সভাতে একজন অপ্সরা। অষ্টাবক্রকে নাচ দেখিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

চিত্রাক্ষ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত হন।

চিত্রাঙ্গদ—(১) সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর ছেলে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। ভীষ্ম এঁদের বৈমাত্রেয় ভাই। শান্তনু মারা গেলে সত্যবতীর মত নিয়ে ভীষ্ম এঁকে রাজা করেন। চিত্রাঙ্গদ অমিত বলশালী ছিলেন এবং দেবাসুর, গন্ধর্ব, সকলকেই হেয় জ্ঞান করতেন। নানা দেশ জয় করে রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এক বার মৃগয়াতে যান এবং চিত্রাঙ্গদ নামে এক গন্ধর্বরাজ এঁকে নাম পাল্টাতে বলেন। ফলে তিন বছর যুদ্ধ হয় এবং কৌরব চিত্রাঙ্গদ মারা যান। (২)=চিত্রাঙ্গদ=শ্রুতান্তক। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমসেনের হাতে মারা যান।

চিত্রাঙ্গদা—চিত্রভানু/চিত্রবাহন/চিত্রাঙ্গদের মেয়ে। এই বংশে এক পূর্বপুরুষের নাম প্রভঞ্জন/প্রভংকর ; ইনি মহাদেবের তপস্যা করে বর পান যে তাঁর বংশে প্রতি পুরুষে একটি করে সন্তান হবে। অর্থাৎ চিত্রভানুর একটি মাত্র সন্তান চিত্রাঙ্গদা। মেয়েকে ছেলের মত মানুষ করেন। অর্জুন একা যখন বনে যেতে বাধ্য হন সেই সময়ে প্রথমে উলুপীকে বিয়ে করেন তার পরে মণিপুরে (মণলুর/মানালুর) এলে রাজা এঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেন। বিয়ের সর্ত হয় চিত্রাঙ্গদা ও চিত্রাঙ্গদার সন্তান মণিপুরেই থাকবে, ও রাজত্ব করবে। বিয়ের পর অর্জুন আবার তীর্থ যাত্রায় বার হয়ে যান। মণিপুরে অর্জুন তিন বছর ছিলেন এখান

থেকে পঞ্চতীর্থে আসেন ইত্যাদি। ফের যখন মণলুরে আসেন তখন চিত্রাঙ্গদার ছেলে হয়েছে বভ্রুবাহন। এর পরবর্তী কাহিনী যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের ঘোড়া মণিপুরে এলে উলূপীর (দ্র) প্ররোচনায় বভ্রুবাহন এই ঘোড়া ধরেন। ঘোড়ার রক্ষক অর্জুনের সঙ্গে ফলে তুমুল যুদ্ধে অর্জুন মারা যান। উলূপী তারপর বাঁচিয়ে দিলে চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অর্জুনের মিলন হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞে উলূপী, চিত্রাঙ্গদা ও বভ্রুবাহন হস্তিনাপুরে আসেন। এখানে কুন্তী, পাঞ্চালী ইত্যাদির পায়ের ধূলা নিয়ে সুভদ্রা ইত্যাদির সঙ্গে চিত্রাঙ্গদা বাস করতে থাকেন। কুন্তী, পাঞ্চালী ও সুভদ্রা চিত্রাঙ্গদাকে বহু উপহার দিয়েছিলেন। গান্ধরীকে চিত্রাঙ্গদা পরিচারিকার মত সেবা করতেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী যখন বনে যান তখন চিত্রাঙ্গদা'ও এঁদের জন্য অশ্রুপাত করেছিলেন। মহাপ্রস্থানের পর চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে ফিরে যান। (২) রাবণের এক স্ত্রী। বীরবাহুর মা। (৩) ঘৃতাচীর গর্ভে বিশ্বকর্মার এক মেয়ে। নৈমিষারণ্যে এক দিন চিত্রাঙ্গদা সখীদের নিয়ে স্নান করতে গেলে রাজা সুদেবের ছেলে সুরথের সঙ্গে দেখা হয়। চিত্রাঙ্গদা সখীদের কথা না শুনে সুরথের সঙ্গে কথা বলেন এবং দু জনেই প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। বিশ্বকর্মা ঘটনাটা জানতে পেরে চিত্রাঙ্গদাকে শাপ দেন বিয়ে হবে না ; কোন দিন স্বামী পুত্র পাবে না। অভিশাপের সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী নদী সুরথকে ভাসিয়ে নিয়ে যান এবং চিত্রাঙ্গদা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। সখীরা মুখে চোখে জল দিয়ে জ্ঞান ফেরাতে চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত মারা গেছে মনে করে অগ্নিসৎকারের চেষ্টা করেন। ইতি মধ্যে চিত্রাঙ্গদার জ্ঞান ফিরে আসে এবং কাউকে কাছে দেখতে না পেয়ে সরস্বতীতে ঝাঁপ দেন। স্রোতে ভাসতে ভাসতে গোমতী নদীতে এবং গোমতী থেকে ভাসতে ভাসতে একটি শ্বাপদ সঙ্কুল বনে এসে ওঠেন।

এক জন যক্ষ গুহ্যক আকাশ পথে যেতে যেতে চিত্রাঙ্গদাকে দেখতে পান। গুহ্যক প্রশ্ন করে সব কিছু শুনে উপদেশ দিয়ে যান কাছেই শ্রীকান্তেশ্বর মন্দির আছে, সেখানে গিয়ে দেবতা আরাধনা করলে সব বিপদ থেকে মুক্তি পাবেন। গুহ্যক আশীর্বাদ করে চলে যান। উপদেশ অনুসারের যমুনার দক্ষিণে এই মন্দিরে এসে নদীতে স্নান করে মন্দিরে মহেশ্বরের আরাধনা করতে থাকেন। এই সময় সামবেদী ঋতধ্বজ মুনি স্নান করতে এসে চিত্রাঙ্গদাকে দেখে প্রশ্ন করে সব কিছু জানতে পেরে বিশ্বকর্মাকে অভিশাপ দেন নিজের মেয়ের প্রতি এই রকম দুর্ব্যবহারের জন্য বানর হয়ে জন্মাতে হবে। এবং চিত্রাঙ্গদাকে সপ্তগোদাবরে গিয়ে হাটকেশ্বর মহাদেবের আরাধনা করতে বলেন। এবং বলেন কন্দারমালী অসুরের মেয়ে দেববতী, গুহ্যক অঞ্জন/আঞ্জন কন্যা তপস্বিনী দময়ন্তী এবং পর্জন্য কন্যা বেদবতী এই তিনটি মেয়ের সঙ্গে হাটকেশ্বরের মন্দিরে চিত্রাঙ্গদার দেখা হলে চিত্রাঙ্গদার ও স্বামী মিলন হবে। চিত্রাঙ্গদা মুনির উপদেশ পালন করতে থাকেন।

বিশ্বকর্মা অভিশপ্ত হয়ে বানর রূপে বনে ভীষণ উৎপাত করতে থাকেন। এক দিন ঋতধ্বজের ৫-বছরের ছেলে জাবালি নদীতে স্নান করতে এলে এই বালককে তুলে নিয়ে গিয়ে এক বট গাছের মাথায় বসিয়ে লতাপাতা দিয়ে বেঁধে ফেলেন। এর পর বিশ্বকর্মা অঞ্জনের কাছ থেকে দময়ন্তীকে বিচ্ছিন্ন করেন। অঞ্জন-গুহ্যক ও প্রম্লোচার মেয়ে এই দময়ন্তী। মুদ্গল মুনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন প্রসিদ্ধ এক

রাজার সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে হবে। দময়ন্তী এই কথা শুনে পুণ্যতোয়া হিরণবতী নদীতে স্নান করতে গেলে বিশ্বকর্মা দময়ন্তীকে তেড়ে যান। দময়ন্তী ভয়ে জলে নেমে গিয়ে স্রোতে ভাসতে ভাসতে জাবালি যে বনে বাঁধা ছিল সেই বনেই এসে উপস্থিত হন। জাবালির সঙ্গে দময়ন্তীর দেখা হয় এবং দু জনে পরস্পরের দুর্ভাগ্যের কাহিনী বর্ণনা করেন। জাবালি তখন উপদেশ দেন যমুনা তীরে শ্রীকান্তেশ্বর মন্দিরে গিয়ে আরাধনা করতে। দময়ন্তী মন্দিরে এসে মন্দিরের দেওয়ালে নিজের ও জাবালির দুর্ভাগ্যের কথা একটি শ্লোকে লিখে রাখেন এবং এই মন্দিরেই দেবতার আরাধনা করে দিন কাটাতে থাকেন। ঘৃতাচী ও পর্জন্যের মেয়ে বেদবতী। বেদবতী বনে খেলা করছিলেন বিশ্বকর্মা এক দিন দেখতে পান। এবং ইচ্ছা করে বেদবতীকে দেববতী বলে ডাকেন এবং ধরতে যান। সন্ত্রস্ত বেদবতী একটি গাছে উঠে পড়েন। বানর বিশ্বকর্মা লাথি মেরে গাছটি ভেঙ্গে ফেলেন। বেদবতী গাছের একটি শাখা প্রাণপণে ধরে রাখেন। বিশ্বকর্মা শাখাটিকে সমুদ্রে ফেলে দেন। বেদবতীকে এই অবস্থায় দেখে এক জন গন্ধর্ব বলেন ব্রহ্মার কথা মত এই বেদবতী মনুর ছেলে ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রধানা মহিষী হবেন। গন্ধর্বের কথা শুনে ইন্দ্রদ্যুম্ন শর সংযোগে গাছের ডালগুলি টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেন কিন্তু বেদবতীকে দেখতে পান না। বেদবতী জলে ভাসতে ভাসতে এক বনে এসে ওঠেন এবং হাঁটতে হাঁটতে শ্রীকান্তেশ্বরের মন্দিরে এসে উপস্থিত হন এবং দময়ন্তীর সঙ্গে এখানে দেখা হয়। এই সময় গালবও এই মন্দিরে আসেন এবং এঁদের কাহিনী শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পড়েন। পর দিন গালব সপ্তগোদাবরে স্নান করতে যান এবং দময়ন্তী ও বেদবতী ও সঙ্গে যান। স্নান করবার জন্য জলে ডুব দিয়ে গালব দেখতে পান কতকগুলি কুমারী মৎস্য একটি হাঙ্গরকে ঘিরে ধরে প্রণয় ভিক্ষা করছে। হাঙ্গর রূঢ় ভাষায় এদের প্রত্যাখ্যান করলে এরা তখন বোঝাতে থাকেন গালবের মত ধার্মিক মুনি যদি দুটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে সর্বসাধারণের সমক্ষে ঘুরে বেড়াতে পারেন তাহলে জলের নীচে সকলের অগোচরে হাঙ্গরের কোন কলঙ্কের ভয় থাকতে পারে না। হাঙ্গর পাল্টা জবাব দেন গালবের দুঃসাহস আছে এবং প্রেমে গালব অন্ধ হয়ে পড়েছেন। এই সব শুনে গালব বিমূঢ় হয়ে জলের নীচেই অবস্থান করতে থাকেন। দময়ন্তী ও বেদবতী স্নান করে তীরে উঠে গালবকে দেখতে পান না এবং গালবের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এ দিকে চিত্রাঙ্গদা আগেই এখানে এসেছিলেন; এঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। চিত্রাঙ্গদা মনে মনে ভাবতে থাকেন ঋতধ্বজের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে কন্দারমালীর মেয়ে দেববতী কখন আসবেন। ইতিমধ্যে বিশ্বকর্মা বানরের তাড়া খেয়ে দেববতীও ঐ স্থানে এসে উপস্থিত হন।

এ দিকে দুপুরে ঋতধ্বজ শ্রীকান্তের মন্দিরে এসে দেওয়ালে লেখা শ্লোকটি দেখেন। ইতিমধ্যে ৫০০ বছর কেটে গেছে। ঋতধ্বজ বুঝে দেখেন রাজা ইক্ষ্বাকুর ছেলে শকুনি জাবালিকে মুক্ত করে নামিয়ে আনতে পারবেন। ঋতধ্বজ তৎক্ষণাৎ অযোধ্যায় এসে সব কথা জানিয়ে শকুনিকে নিয়ে আসেন। শকুনি শর সন্ধানে জাবালির বন্ধন কেটে ফেলতে থাকেন; এ দিকে ঋতধ্বজ গাছে উঠে যান ছেলেকে নামিয়ে আনবেন বলে। শেষ পর্যন্ত শকুনিও গাছে উঠে যান এবং সযত্নে ডালটি

কেটে দু জনে মিলে জাবালিকে নামিয়ে আনেন। ডালটি জাবালির পিঠে আটকে লেগে গিয়েছিল। এরা তার পর তিন জনে প্রায় ১০০ বছর দময়ন্তীকে খুঁজতে খুঁজতে হতাশ হয়ে জাবালি ও ঋতধ্বজ কোশলে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে আসেন। জাবলির পিঠে ডালটি তখনও আটকে ছিল। ইন্দ্রদ্যুম্ন জানান তিনি একটি মেয়েকে ভেসে যাওয়া এক গাছের ডাল থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নও এই অনুসন্ধানে যোগ দেন। এরা তারপর বদরী আশ্রমে এলে এখানে তপস্যারত সুরথের সঙ্গে দেখা হয়। সমস্ত শুনে সুরথও এদের দলে জুটে যান এবং খুঁজতে খুঁজতে সপ্তগোদাবরে এলে চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এ দিকে ঘৃতাচী মেয়ের জন্য দুঃখে অরুণাচলে চিত্রাঙ্গদাকে খুঁজতে খুঁজতে বানর বিশ্বকর্মাকে দেখতে পান। ঘৃতাচী প্রশ্ন করেন কোন মেয়েকে সে দেখেছে কিনা। বানর সব কিছু বলেন। ঘৃতাচী তখন সপ্তগোদাবরে আসেন; বিশ্বকর্মাও পেছু পেছু আসেন। জাবালি বানরকে দেখেই ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে যান শাস্তি দেবার জন্য; ঋতধ্বজ বাধা দিয়ে বিশ্বকর্মার কাহিনী বর্ণনা করেন। বিশ্বকর্মা তখন জাবালির পিঠ থেকে হাজার বছর আটকে থাকা ডালটি খুলে দেন। ঋতধ্বজ সন্তুষ্ট হয়ে বানরকে বর দিতে চাইলে বানর শাপমুক্তি চান। ঋতধ্বজ বলেন ঘৃতাচীর গর্ভে একটি শক্তিমান শিশু জন্মালে তবেই বিশ্বকর্মা মুক্তি পাবেন। এই কথা শুনেই ঘৃতাচী পালিয়ে যান; বানর বিশ্বকর্মাও পেছু পেছু ছুটে যান। কোলাহল পর্বতে এসে দু জনে দীর্ঘকাল বাস করেন তার পর বিন্ধ্য পর্বতে চলে যান। এখানে গোদাবরী তীরে এঁদের ছেলে হয় নল। বিশ্বকর্মা এবার নিজের চেহারা ফিরে পান এবং ঘৃতাচীকে নিয়ে সপ্তগোদাবরে ফিরে আসেন। গালবও আসেন। দেববতী ও জাবালি, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও বেদবতী, দময়ন্তী ও শকুনি এবং চিত্রাঙ্গদা ও সুরথের বিয়ে হয়।

চিত্রায়ুধ—চিত্রবাহু। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমসেনের হাতে মারা যান।

চিত্রায়ুধ—দৃঢ়ায়ুধ। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমসেনের হাতে মারা যান।

চিত্রাশ্ব—সত্যবান (দ্রঃ) (মহা ৩।২৭৮।১৩)।

চিত্রোপচিত্র—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমসেনের হাতে নিহত হন।

চিৎশক্তি—পরম ব্রহ্ম চিৎ-স্বরূপ; তাঁর শক্তি।

চিনি—সংস্কৃত নাম শর্করা। জন্মভূমি ভারত। সুদূর অতীতে ভারতে চিনি প্রস্তুত হয়েছে। বিখ্যাত প্লিনি ও সেনেকা দুজনে ভারতীয় চিনির প্রশংসা করে গেছেন। খৃ ৭ শতকে চীন সম্রাট তাই হাং ভারতীয় আখ চাষ ও চিনি তৈরি পদ্ধতি শেখবার জন্য এক দল চীনা ছাত্রকে বিহারে পাঠান।

চিন্তা—দ্রঃ শ্রীবৎস।

চিবুক—নন্দিনীর দেহ জাত সৈন্য; বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। দ্রঃ চীনার।

চিরকারী—গৌতম (দ্রঃ) অহল্যার পুত্র।

চিরজীবী—বিষ্ণু, মার্কণ্ডেয়, ব্যাস, বলি, কৃপ, অশ্বত্থামা, পরশুরাম, বিভীষণ, হনুমান ও কাক।

চিরন্তক—গরুড়ের এক ছেলে।

চীনার—নন্দিনীর দেহ জাত সৈন্য; বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুধিষ্ঠিরকে এঁরা

কর দিয়েছিলেন। একটি মতে এঁরা চীন দেশ বাসী।

চুঞ্চু—(১) হেহয় বংশে এক রাজা। রোহিতাশ্বের নাতি ; হারীতের ছেলে। (২) ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈদেহ মায়ের সন্তান।

চুনার—উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলার একটি সহর। কিংবদন্তি উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের ভাই ভর্তিনাথ চুনার দুর্গটি স্থাপন করেন। দুর্গ সমেত সহরটি গঙ্গার ধারে বিন্ধ্য পর্বতের একটি অংশে অবস্থিত। এই অংশের চেহারা মানুষের পায়ের মত বলে প্রাচীন নাম চরণাদ্রি। চুনার দুর্গ ৩৬০ মি×১২০-২৭০ মি। এই দুর্গের বেশির ভাগই হিন্দু গৃহ ও মন্দিরাদির উপকরণ দিয়ে প্রস্তুত। রেল স্টেসনের ধারে দুর্গাকুণ্ড ও জীর্ণা নালার ধারে কামাক্ষীর মন্দির অবস্থিত। নিকটে পাহাড়ের গায়ে বহু মূর্তি খোদিত আছে ; পেছনের দেওয়ালের শিলালিপি গুপ্ত যুগের মনে হয়। আরো উত্তরে দুর্গাখো গুহাতে গুপ্ত যুগের শিলালিপি আছে।

চুল্লবগ্‌গ—বিনয় পিটকের দ্বিতীয় বিভাগের নাম। চুল্ল অর্থে তার পর। বিনয় পিটকে ভিক্ষু জীবনের সমগ্র নিয়মাবলী দেওয়া আছে। চুল্লবগ্‌গে প্রথম অধ্যায়ে আছে বিনয়ের সামান্য নিয়মাদির ব্যতিক্রমের জন্য ভিক্ষুকে কি ভাবে বিচার করতে হবে এবং কি শাস্তি হবে। প্রাতিমোক্ষ সূত্রের (=পাতিমোক্‌খ) ১৩-টি বিশেষ নিয়মের ব্যতিক্রমকে সংঘাদিশেষ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে এই বিষয় আলোচিত হয়েছে ; অর্থাৎ ভিক্ষু দোষী কি না বিচার ও কি পরিবাস হওয়া উচিত তার ব্যবস্থা। পরিবাস অর্থে কত দিন দোষী ভিক্ষুকে সংঘের অধিকারাদি থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে এবং সঙ্গে ভিক্ষু জীবনের আরো কি কি প্রতিবন্ধক পালন করতে হবে। শাস্তির আদেশ মত ঠিক ভাবে চললে ভিক্ষুকে আবার সব অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়। চতুর্থ অধ্যায় সংঘের ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাদ হলে তা আপোষে মেটাবার ৭টি পন্থা দেওয়া আছে। পঞ্চম অধ্যায় ভিক্ষুদের জীবন যাত্রার সুষ্ঠু আচার বিচারের নিয়মাবলী দেওয়া আছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিহার নির্মাণের ও বিহারের শয্যা ও আসবাব পত্রের নিয়মাবলী। সপ্তম অধ্যায়ে অজাতশত্রুর সহায়তায় ভগবান বুদ্ধকে হত্যার প্রচেষ্টা কাহিনী। অষ্টম অধ্যায়ে আগন্তুক ভিক্ষুদের প্রতি বিহার বাসীরা কি রকম ব্যবহার করবেন ও অরণ্যবাসী ভিক্ষুরা গ্রামে বা সহরে এসে কি করবেন বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষে উপাধ্যায় ও শিষ্যদের পারস্পরিক কর্তব্য দেওয়া আছে। নবম অধ্যায়ে রয়েছে পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপসোথ ক্রিয়ার প্রাতিমোক্ষ সূত্র আবৃত্তি করতে কোন কোন ভিক্ষুকে দেওয়া হবে না। এই ক্রিয়ার সময় প্রত্যেক ভিক্ষুকে জানাতে হবে যে তিনি গত চোদ্দ দিনের মধ্যে প্রাতিমোক্ষ সূত্রের ২২৭-টি নিয়ম পালন করেছেন। লঘু নিয়মের ব্যতিক্রম হলে অন্য ভিক্ষুদের কাছে দোষ স্বীকার করে দোষ স্খালন করে নিতে পারেন ; গুরু নিয়মের ব্যতিক্রম হলে ভিক্ষুকে উপসোথগার থেকে বার করে দেওয়া হবে। দশম অধ্যায়ে আছে ভিক্ষুণীসংঘ কি ভাবে এবং কবে তৈরি হয়েছিল এবং কি কি কাজ ভিক্ষুণীদের করণীয়। একাদশ অধ্যায়ে প্রথম ধর্ম সংগীতির বিবরণ আছে। অজাতশত্রুর সময় স্থবির মহাকাশ্যপের সভাপতিত্বে রাজগৃহের সপ্তপর্ণি গুহায় ৫০০ অর্হৎ ভিক্ষু মিলে এই ধর্ম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয় এবং এইখানে বিনয়পিটক সংকলিত হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ে বৈশালীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সংগীতির

বিবরণ রয়েছে। প্রথম সংগীতির একশ বছরেরও বেশি পরে হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মে সাম্প্রদায়িক ভেদের সূত্রপাত এই খানে সুরু হয়।

চূড়াকরণ—দশটি সংস্কারের মধ্যে একটি। মোটামুটি শিশুর চুল কাটা।

চূড়ামণি যোগ—রবিবারে সূর্য গ্রহণ বা সোমবারে চন্দ্র গ্রহণ।

চূলি—গন্ধর্বা উর্মিলার মেয়ে সোমদা। সোমদা এই চূলি নামে মুনির পরিচর্যা করতেন। সেবায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে মুনি বর দিতে চাইলে সোমদা একটি পুত্র সন্তান চান। চূলির বরে সোমদার ছেলে হয় ব্রহ্মদত্ত। কুশনাভের (দ্রঃ) এক শত মেয়েকে ব্রহ্মদত্ত বিয়ে করেন।

চেকিতান—সাত্বত, বাষ্ণেয়। পাণ্ডব পক্ষে একজন বীর যোদ্ধা। রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরকে তূণ উপহার দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে প্রচণ্ড যুদ্ধ করেছিলেন। দুর্যোধনের হাতে মারা যান। ব্যাসের বরে মৃত যোদ্ধাদের সঙ্গে চেকিতানও এসেছিলেন।

চেতনা—কোন কোন দার্শনিকের মতে সম্পূর্ণ অনন্য এবং এর সংজ্ঞা নিরূপণ অসম্ভব। জড়বাদী মতে চৈতন্য জড়েরই উচ্চস্তর। চৈতন্যকে অনেকে দ্রব্যরূপে গ্রহণ করেন, কেউ আবার নিছক গুণ রূপে গণ্য করেন। আত্মা বা মনের স্বরূপ চৈতন্য। সাংখ্য অনুসারে একমাত্র পুরুষই চেতনা। মন, অহং ও ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃতির পরিণাম মাত্র। বৈদান্তিক মতে ব্রহ্মই এক মাত্র চৈতন্য স্বরূপ পরম তত্ব।

চেদি—প্রাচীন ভারতে একটি জনপদ ও জাতি। ঋকবেদে একটি স্তোত্রে চেদি ও তাদের রাজার দানশীলতার বিশেষ প্রশংসা আছে। খৃ-পূ ৬ শতকে উ-ভারতের ১৬ টি মহা জনপদের একটি। বর্তমানে বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে যমুনা নদীর শাখা শুক্তি-মতী (বর্তমানে কেন; পালিতে সোৎথিবতী) নদীর তীরে চেদির রাজধানী ছিল। মহাভারতে চেদিরাজ শিশুপালের কাহিনী আছে। শিশুপালের মৃত্যুর পর ধৃষ্টকেতু রাজা হন। ধৃষ্টকেতু পাণ্ডব পক্ষে ছিলেন। নকুলের স্ত্রী করেণু-মতী (চেদি রাজকন্যা)। নল রাজার সময় চেদি রাজ্যে রাজা ছিলেন সুবাহু। পুরাণে এঁরা যদু বংশীয়: যযাতি (১)—যদু (২)—উশিক (১৭)—চেদি (১৮)। কৌরব রাজা উপরিচর বসু চেদি রাজ্য জয় করে এই দেশের রাজা হন। কলিঙ্গের রাজা খরবেল চেদি বংশীয় বলে পরিচিত। ২৪৮-২৪৯ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম ভারতে চেদি অব্দ বা কলচুরি অব্দ নামে নতুন একটি অব্দ চালু হয়েছিল। পরে কলচুরি (দ্রঃ) রাজারা চেদি রাজ্য-কে কেন্দ্র করে পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য গড়েছিলেন; রাজধানী ছিল তখন ত্রিপুরী।

চৈত্রবংশ—ব্রহ্মা—অত্রি—চন্দ্র। রাজসূয় যজ্ঞ করে চন্দ্র সম্রাট হন। চন্দ্র—বুধ—চৈত্র (চৈত্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা)—বিরথ—সুরথ (দ্রঃ)।

চোল—দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন রাজ্য। রুক্মিণী স্বয়ংবরে চোল রাজা উপস্থিত ছিলেন। যুধিষ্ঠিরকে চোল রাজা উপহার দিয়েছিলেন। তুর্বসুর বংশ: মরুত্ত—সুষ্মন্ত—বরূথ—গাণ্ডীর। গাণ্ডীরের সন্তানেরা চোল কেরল, পাণ্ড্য রাজ্য গঠন করেন। কাত্যায়নের বার্তিক (খৃ পূ ৪-শতক) ও অশোকের শিলালিপিতে (খৃ পূ ৩-শতক) চোল বংশের উল্লেখ আছে। প্রাচীন তামিল কিংবদন্তিতে চোল রাজ করিকালের নামে সুপ্রসিদ্ধ। দীর্ঘকাল চোল রাজ্যের আয়তন অতি ছোট ছিল। কাঞ্চির পল্লব বংশের সময় চোলরা পল্লব সম্রাটদের সামন্ত বা লঘুমিত্র ছিলেন।

উত্তরকালে ৯ শতক থেকে এঁদের ক্রমশ বিস্তৃতির ইতিহাস পাওয়া যায়।

চৌরপঞ্চাশিকা—বসন্ততিলক ছন্দে ৫০-শ্লোকে রচিত একটি সংস্কৃত খণ্ড কাব্য। অন্য নাম চৌরীসুরত পঞ্চাশিকা বা চোরপঞ্চাশৎ বা বিহ্লন কাব্য। অধিকাংশ পুঁথিতে আরো কয়েকটি শ্লোক বেশি আছে। বিষয় বস্তু হচ্ছে বিরহী নায়ক বর্ণনা করছেন নায়িকার মিলন বিলাসের স্মৃতি। বিহ্লন (খৃ ১১ শতক) রচিত বলে প্রসিদ্ধ। অন্য মতে চোরকবি, সুন্দরকবি অথবা বররুচি এর রচয়িতা।

কাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কাহিনী আছে এক রাজকুমারীর সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়ে জড়িত এক যুবক রাজদ্বারে অভিযুক্ত এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বধ্য ভূমিতে নীত হলে যুবকটি তাঁর প্রণয়লীলার বিবরণপূর্ণ কাব্যটি আবৃত্তি করেন। রাজা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে কন্যা দান করেন।

চৌর্যশাস্ত্র—৬৪-কলার অন্যতম একটি। প্রবর্তক স্কন্দ বা কার্তিকেয়। অন্য মতে মূলদেব রচিত। মূলদেবকে ধূর্তপতি ও বলা হয়েছে এবং ইনি বাকপটু ও সংগীত বিশারদ। চোরদের উপাস্য দেবতা কালী। যুবরাজদেরও এই বিদ্যা শিক্ষণীয় বলা হয়েছে। বর্তমানে ষন্মুখকল্প ও চৌরচর্যা নামে দুটি পুঁথি পাওয়া যায়। ষন্মুখকল্পে প্রধান আলোচ্য বিষয় অন্তর্ধান, মার্গসংহরণ, ভেলকি, দরজাখোলা, দৃষ্টি স্তম্ভন, দেবনরাদি বশীকরণ, বন্ধনমোক্ষ, ইত্যাদি। অন্য বহু জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে নানা তথ্য রয়েছে। চোরদের সাতটি শ্রেণী বলা হয়েছে; প্রকৃত চোর, চোরের বিশ্বাস-ঘাতক, মন্ত্রী, ভেদজ্ঞ, চোরাই মালের ক্রেতা, চোরের অন্নদাতা ও আশ্রয়দাতা। চৌর্যপ্রসঙ্গে নানা রকমের সুড়ঙ্গের উল্লেখ আছে, যেমন পদ্মব্যাকোশ, ভাস্কর, বালচন্দ্র, বাপী, বিস্তীর্ণ, স্বস্তিক, ও পূর্ণকুম্ভ। চোরের যন্ত্রপাতি হিসাবে সন্দংশনিকা ও কর্কটরজ্জু ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়। উল্লিখিত আছে যোগচূর্ণ সাহায্যে চোর নিজেকে অদৃশ্য করতে পারে; যোগবর্তিকা সাহায্যে সব কিছু দেখতে পায়। এক রকম কজ্জলের সাহায্যে অন্ধকার রাত কোটি সূর্যের আলোতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবস্বপ্নিকা মন্ত্রে অপরকে এরা ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে এবং তালোদ্ঘাটিনী বিদ্যায় অনায়াসে তালা খুলতে পারে। এ ছাড়া ঘরে কেউ আছে কিনা জানবার জন্য ব্যবস্থা ছিল। সিঁধের গর্তের মধ্য দিয়ে প্রথমে একটি প্রমাণকার পুতুল ঢুকিয়ে দিতে হবে। সঙ্গে ভ্রমর বা প্রজাপতি ভর্তি বাক্স থাকবে; বাক্স খুলে দিলে এরা উড়ে গিয়ে গৃহস্থের দ্বীপ নিবিয়ে দেবে।

চ্যবন— মহর্ষি ভৃগু ও পুলোমার ছেলে। গর্ভকালে পুলোমার প্রাক্তন বহু দিনের পাণি-প্রার্থী এক রাক্ষস (এর নাম ও পুলোমা) পুলোমাকে চুরি করে পালাতে চেষ্টা করেন। মায়ের বিপদ দেখে সূর্যের মত উজ্জ্বলকান্তি শিশু গর্ভচ্যুত হয় এবং শিশুর তেজে রাক্ষস পুড়ে ছাই হয়ে যান। অন্য মতে রাক্ষস পালিয়ে যান (দ্রঃ বধূসরা)। গর্ভচ্যুত বলে নাম হয় চ্যবন। নর্মদার কাছে বৈদূর্য পাহাড়ে বাল্যকাল থেকেই তপস্যা করতে করতে জরা গ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং দেহ বল্মীক ও লতাপাতায় চাপা পড়ে যায়। এক দিন শর্যাতি তাঁর চার হাজার স্ত্রী ও মেয়ে সুকন্যাকে নিয়ে সেখানে বিহার করতে আসেন। সুকন্যাকে চ্যবন ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকেন। কিন্তু সুকন্যা শুনতে পান না বরং উই-ঢিপির মধ্যে টিপ-টিপ করছে চোখ দুটি দেখে কৌতূহলী হয়ে

উই-ঢিপি ভাঙতে যান কিন্তু ভেতর থেকে মানুষের গলায় কে যেন বারণ করেন। সুকন্যা নিরস্ত হলেও কাঁটা ফুটিয়ে দু চোখ নষ্ট করে দেন। চ্যবন এতে রাগে রাজার সৈন্যদের মলমূত্র নিঃসরণ রুদ্ধ করে দেন। অন্য মতে চ্যবন রাগ করেন নি; কিন্তু সুকন্যার পাপে দেশে নানা দুর্ঘটনা দেখা দিতে থাকে। স্ত্রী পুরুষ সকলের এবং ক্রমশ জীবজন্তুর মলমূত্র রোধ হয়ে যায়। এই অবস্থার কারণ কি রাজা সহজে বুঝে উঠতে পারেন না। পরে খেয়াল হয় চ্যবনের প্রতি নিশ্চয়ই কেউ কোন দুর্ব্যবহার করেছে। শেষ পর্যন্ত রাজার কাছে সুকন্যা নিজের অপরাধ স্বীকার করেন। রাজা তখন ক্ষমা চাইতে এলে সুকন্যাকে বিয়ে করার সর্তে চ্যবন ক্ষমা করতে রাজি হন। রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন কিন্তু সুকন্যা নিজেই প্রজাদের স্বার্থে চ্যবনকে বিয়ে করতে রাজি হন।

বিয়ের পর সুকন্যা স্বামীকে কায়মনোবাক্যে সেবা করতে থাকেন। এক দিন সদ্য স্নাতা সুকন্যার নিরাভরণ দেহের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে অশ্বিনীকুমার দুজন এসে সুকন্যাকে পরিচয় চান এবং বৃদ্ধ অন্ধ চ্যবনকে ত্যাগ করে তাঁদের যে কোন এক-জনকে বিয়ে করতে বলেন। কিন্তু সুকন্যা রাজি হন না। এঁরা সুকন্যাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন তাঁরা যুবা ইত্যাদি এবং নিজেদের পরিচয় দিয়ে সর্ত করেন চ্যবনকে তাঁরা চোখ ও যৌবন ফিরিয়ে দেবেন; তিন জনেই একই রূপ ধরবেন এবং সুকন্যাকে তখন এই তিন জনের মধ্য থেকে যে কোন এক জনকে বেছে নিতে হবে। সুকন্যা কি করবেন বুঝতে পারেন না। চ্যবন আবার চোখ ফিরে পাবেন এই আশাতেই অধীর হয়ে ওঠেন। সব কথা জানালে চ্যবন সম্মতি দেন। অশ্বিনী-কুমার দু জন চ্যবনকে নিয়ে নদীতে ডুব দিয়ে একই রূপ ধরে তিনটি যুবা পুরুষ হিসাবে উঠে আসেন। নিজের ইষ্ট দেবীকে স্মরণ করে স্বামীকে চিনতে সুকন্যার কোন কষ্ট হয় না। অশ্বিনীকুমার দু জন সন্তুষ্ট হয়ে সুকন্যাকে আশীর্বাদ করেন এবং চ্যবনকে জানান তাঁরা কি ভাবে সোমপানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। চ্যবন প্রত্যুপকার হিসাবে এঁদের সোমপায়ী করে দেবেন ঠিক করে শর্যাতিকে দিয়ে সোম যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। চ্যবন পুরোহিত হন, সমস্ত দেবতারা আসেন এবং তার পর এঁদের দু জনকে সোমপাত্র দিতে গেলে ইন্দ্র বাধা দেন এবং বোঝাতে চান এঁরা দেবতাদের চিকিৎসক বা কর্মচারী; সোমপানের অধিকারী এঁরা নন। চ্যবন এ কথায় কাণ না দিলে ইন্দ্র বজ্রাঘাত করতে যান। চ্যবন তখন মন্ত্র বলে ইন্দ্রের হাত পা স্তম্ভিত করে দিয়ে মন্ত্র পড়ে আহুতি দিয়ে আগুন থেকে মদ নামে এক ভীষণ শক্তি-শালী দৈত্য সৃষ্টি করেন। মদ আক্রমণ করলে দেবতারা সব পালিয়ে যান কিন্তু ইন্দ্র পালাতে পারেন না। মদ ইন্দ্রের নিক্ষিপ্ত বজ্র গিলে ফেলে ইন্দ্রকেও গিলতে যান। দেবতারা তখন ফিরে এসে চ্যবনকে শান্ত করেন। অন্য মতে ইন্দ্র নিজেই ক্ষমা চান; এবং অশ্বিনীকুমার দু জনকে সোমপানের অধিকারী বলে স্বীকৃতি দেন। আর এক মতে ইন্দ্র বৃহস্পতির উপদেশ চান এবং এই উপদেশ অনুসারে দেবতারা সকলে ক্ষমা চান। আর এক মতে চ্যবনের সঙ্গে তর্কে পরাজিত হয়ে ইন্দ্র এঁদের সোম-পানের অধিকার দেন। দ্রঃ মদ।

পরশুরাম একবার চ্যবনের আশ্রমে কিছু দিন ছিলেন। ভৃগু সেই সময়ে

এখানে ছিলেন এবং এঁরা দুজনে পরশুরামকে উপদেশ দেন কৈলাসে গিয়ে শিবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করতে। চ্যবন এক বার ব্রত নিয়ে বারো বছর গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে জলের মধ্যে বাস করতে থাকেন। এই সময়ে এক দিন জেলেদের জালে ধরা পড়েন। মুমূর্ষু মাছেদের দেখে দুঃখে তিনি জানান মাছেদের সঙ্গে তিনিও মরতে চান। জেলেদের কাছে খবর পেয়ে নহুষ ছুটে আসেন। চ্যবন মাছের দাম জেলেদের দিয়ে দিতে বলেন। নহুষ হাজার মুদ্রা দাম দিতে চান; কিন্তু চ্যবন বলেন তাঁর দাম আরো বেশি এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত রাজ্যই দাম হিসাবে দিতে চান কিন্তু চ্যবন তাতেও রাজি হন না। তখন গো-গর্ভজাত এক ব্রাহ্মণের পরামর্শে নহুষ গাভী দিয়ে চ্যবনকে কিনে নেন। জেলেরা চ্যবনকে এই গাভীটি নিতে বলে এবং চ্যবন গাভী নিয়ে রাজাকে ও জেলেদের আশীর্বাদ করে আশ্রমে ফিরে যান।

চ্যবন জানতে পেরেছিলেন ক্ষত্রিয় কুশিক বংশ থেকে তাঁর ব্রাহ্মণ বংশে ক্ষত্রাচার সংক্রামিত হয়। এই ভয়ে তিনি কুশিক বংশ ধ্বংস করবার জন্য কুশিকের কাছে গিয়ে বাস করবেন অভিলাষ প্রকাশ করেন। কুশিক তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করেন। চ্যবন কুশিককে এক ব্রত করতে বলেন এবং তাঁর নিজের সেবার জন্য সস্ত্রীক কুশিককে নির্দেশ দেন। এর পর চ্যবন এঁদের নানা ভাবে নির্যাতন করতে থাকেন। ঘোড়ার বদলে রাজা ও রাণীকে দিয়ে রথ টানান; কশাঘাতে জর্জরিত করে তোলেন; কিন্তু সব কিছু এঁরা হাসি মুখে সহ্য করেন। শেষ কালে চ্যবন রথ থেকে নেমে জর্জরিত দেহ রাজা ও রাণীকে স্পর্শ করে সুস্থ করে দিয়ে নিজের আশ্রমে ফিরে যান এবং আশ্রমে এসে এঁরা যেন দেখা করেন বলে যান। পর দিন গঙ্গাতীরে চ্যবনের আশ্রমে গিয়ে এঁরা গন্ধর্বপুরীর মত সুন্দর প্রাসাদ ইত্যাদি দেখতে পান। একটু পরে সব অদৃশ্য হয়ে যায়। ব্রাহ্মণের ক্ষমতা দেখে রাজা ও রাণী মুগ্ধ হয়ে যান। চ্যবন এঁদের সংযমে সন্তুষ্ট হয়ে এঁদের বর দিতে চান। রাজা জানান দীপ্ততেজা ব্রাহ্মণের সংস্পর্শে এসেও তাঁরা দগ্ধ হন নি এইটাই যথেষ্ট। চ্যবন তখন বলেন ব্রহ্মার কাছে জানতে পেরেছিলেন যে কুশিকের বংশ থেকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বংশের মধ্যে কুল সংকর দেখা দেবে। এই জন্য কুশিক বংশ ধ্বংস করবার চেষ্টায় চ্যবন এঁদের ওপর এই রকম অত্যাচার করেছিলেন। কিন্তু অভিশাপ দেবার মত কোন ছিদ্র খুঁজে পান নি। অনুতাপে রাজারাণীকে কিছু ক্ষণের জন্য স্বর্গ সুখ দেবার ইচ্ছায় গঙ্গা তীরে এই স্বর্গোদ্যান রচনা করেছিলেন। কুশিক ব্রাহ্মণত্বে বাসনা করেন চ্যবন জানেন। এবং বলেন কুশিকের তৃতীয় পুরুষে অর্থাৎ কুশিকের পৌত্র বিশ্বামিত্র ব্রহ্মণত্ব লাভ করবেন। ভৃগুবংশে ঔর্ব নামে এক ঋষি জন্মাবেন। ঔর্বের ছেলে ঋচীক সমগ্র ধনুর্বেদ আয়ত্ত করে নিজের ছেলে জমদগ্নিকে তা শিখিয়ে দেবেন। এই ঋচীকের সঙ্গে কুশিকের পৌত্রী অর্থাৎ গাধির মেয়ের বিয়ে হবে। ঋচীকের ছেলে জমদগ্নি এবং জমদগ্নির ছেলে পরশুরাম।

চ্যবন সুকন্যার ছেলে প্রমতি, প্রমতির ছেলে রুরু। চ্যবনের এক স্ত্রী আরুষী; মনুর মেয়ে; ছেলে হয় ঔর্ব। ঔর্বের ছেলে ঋচীক। চ্যবনের একটি মেয়ে সুমনস্; সোমশর্মার স্ত্রী। আস্তিক চ্যবনের কাছে বেদ অধ্যয়ন করেন। চ্যবন ভীষ্মের গুরু ছিলেন এবং ব্রহ্মার সভায় এক জন সভাসদ ছিলেন। সন্তানহীন বেদশর্মা (কৌশিক

গোত্র) এঁর আশ্রমে এলে চ্যবনের আশীর্বাদে এঁর সন্তান হয়। দ্রঃ মান্ধাতা, কেকরলোহিত, প্রহ্লাদ।

ছ

ছন্দ—ছন্দের মূল উপাদান চারটি দল বা সিলেবল, কলা বা কালমাত্রা, প্রস্বর বা এক-সেণ্ট ও মিল। এর যে কোন একটি উপাদান ছন্দ সৃষ্টি করে। প্রাচীন আর্য ভাষায় দল সংখ্যার নানা বিভাগের ওপর ভিত্তি করে দলবৃত্ত ছন্দ গড়ে উঠেছিল। প্রস্বর দু জাতের ; বল প্রস্বর অর্থাৎ উচ্চারণের ঝোঁক জাত এবং গীতি প্রস্বর অর্থাৎ কণ্ঠস্বরের তীব্রতা প্রসূত। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে গীতি প্রস্বর ছন্দও পাওয়া যায়। অর্বাচীন সংস্কৃতে কিছু কালমাত্রাগত ছন্দও পাওয়া যায় এবং এই ছন্দের নাম কলা-বৃত্ত, বা মাত্রাবৃত্ত বা জাতি ছন্দ। আর্যা, পজ্‌ঝটিকা, ও পাদাকুলকও এই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। প্রাচীন সংস্কৃত ছন্দ দল সংখ্যাত হলেও কালমাত্রা নিরপেক্ষ নয়। এগুলি মুখ্যত দলসংখ্যাত এবং গৌণত কলাসংখ্যাত ; এই গুলিকে সেই জন্য নিয়ন্ত্রিত দলবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত বা বর্ণবৃত্ত বলা হয় ; ইন্দ্রবজ্রা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, স্রগ্ধরা এই জাতীয় ছন্দ। ভারতীয় মাত্রাবৃত্ত বা জাতিবর্গের ছন্দে ও মিলের গুরুত্ব কম নয়।

বৈদিক ছন্দ মূলত দল সংখ্যাত। লঘুগুরু দল বিন্যাস ঋক্‌বেদের ছন্দেও দেখা যায়। ছন্দ পংক্তির শেষাংশে এই রকম দল বিন্যাস রয়েছে। পরবর্তী কালে এই ভাবে দল বিন্যাস সমস্ত পংক্তিতেই ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বৈদিক প্রধান ছন্দ অনুষ্টুভ প্রায় অবিকৃতই থেকে গিয়েছিল। এই ভাবে অনুষ্টুভ ছন্দ অপেক্ষাকৃত মুক্ত থাকার ফলে অনুষ্টুভ ছন্দ সংস্কৃতে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করে আছে। ঋক্‌বেদের যুগেই অনুষ্টুভ ছন্দের উৎপত্তি। ঋক্‌বেদের পনেরটি ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, অনুষ্টুভ, ত্রিষ্টুভ ও জগতী এই চারটিই প্রধান। এর মধ্যে ত্রিষ্টুভ ছন্দই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে তারপর গায়ত্রী এবং তারপর অনুষ্টুভ। উত্তর কালে গায়ত্রী আর ব্যবহৃত হত না ; অনুষ্টুভ ছন্দই সামান্য একটু রূপান্তরিত হয়ে ব্যাপক ছন্দ হয়ে ওঠে এবং এরই নাম হয় শ্লোকছন্দ। বাল্মীকিকে এই শ্লোকছন্দের প্রবর্তক বলা হয়। দ্রঃ অনুষ্টুপ।

গায়ত্রী ছন্দ ত্রিপঙ্‌ক্তিক, প্রতি পংক্তিতে দল সংখ্যা আট। অনুষ্টুভ, ত্রিষ্টুভ, জগতী ইত্যাদি ছন্দ চতুষ্পংক্তিক। অনুষ্টুভ, ত্রিষ্টুভ ও জগতী ছন্দে দলসংখ্যা যথাক্রমে আট, এগারো, বারো। জগতী ছন্দ ত্রিষ্টুভের একটি সংস্করণ। অনুষ্টুভ ইত্যাদি বৈদিক ছন্দ থেকে পরে ইন্দ্রবজ্রা, মালিনী, প্রভৃতি অক্ষর বৃত্তবর্গীয় সমস্ত ছন্দ উৎপন্ন হয়েছে। লঘুগুরু দল বিন্যাসের বৈচিত্র্য ও পংক্তি দৈর্ঘের সাহায্যে এই সব অক্ষর বৃত্ত ছন্দের জন্ম। আর্যা, পজ্‌ঝটিকা ইত্যাদি মাত্রা বর্গীয় ছন্দগুলি প্রাকৃত ভাষার প্রভাবে এবং গানের তাল বিভাগের প্রভাবে উৎপন্ন।

সংস্কৃত সাহিত্যে ছন্দ ও ছন্দশাস্ত্র অনেক। ছন্দকে বেদাঙ্গ বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং বেদাঙ্গ হিসাবে পঠিত হত। ঋক্‌বেদের প্রাতিশাখ্য সূত্রে, সামবেদের নিদান-সূত্রে, শাঙ্খায়নের শ্রৌতসূত্রে ইত্যাদিতে এই ছন্দ চর্চার পরিচয় রয়েছে। ভারতী

ছন্দ শাস্ত্রগুলি অনেকাংশে সাংকেতিক পদ্ধতিতে রচিত এবং ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানই এদের উদ্দেশ্য ছিল। পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র, গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী, কেদারভট্টের বৃত্ত-রত্নাকর এবং মধ্য যুগের প্রাকৃত-পৈঙ্গলম্ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছন্দ গ্রন্থ।

ছান্দোগ্য—সামবেদীয় ব্রাহ্মণের অংশ। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের দশটি প্রপাঠক (=অধ্যায়)। প্রথম দুটি অধ্যায় গৃহ্যকর্ম উপযোগী মন্ত্রের সংকলন ; নাম মন্ত্র ব্রাহ্মণ শেষ আটটি ছান্দোগ্য উপনিষদ ; প্রতি অধ্যায় বহু খণ্ডে বিভক্ত। প্রধানতম উপনিষদ গুলির মধ্যে ছান্দোগ্য একটি ; এবং বহু জায়গায় এটি আরণ্যক ধর্মী। বেদান্ত দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি ছান্দোগ্যে স্পষ্ট। প্রথম অংশে আরণ্যকধর্মিতা বিশেষভাবে স্পষ্ট।

প্রথম অধ্যায়ে উদ্গীত উপাসনার কথা বলা হয়েছে। যজ্ঞে গেয় সামের প্রধান অংশ উদ্গীত এবং এই উদ্গীতকে এখানে ওঁ-কার বলে প্রতিপাদিত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শেষে সামগানের অন্তর্গত স্তোভ অক্ষরের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাম উপাসনা এবং নানা ধরণের রূপক বহুল ব্যাখ্যা। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথমে আদিত্য উপাসনা ; শেষ অংশে রূপক ও রহস্য মাধ্যমে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা। এই অধ্যায়েই সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম মন্ত্রটি রয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে রৈক্ক-জানশ্রুতি, জাবাল সত্যকাম ও গৌতম এবং সত্যকাম ও উপকোসল কামায়নের কাহিনী রয়েছে। এই অধ্যায়ে আছে ব্রহ্মপ্রাপ্তির পর মানবলোকে আর ফিরতে হয় না। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমে কর্ম ফল ও পুনর্জন্ম তত্ত্ব রয়েছে এবং শ্বেতকেতু প্রবাহণ সংবাদ, অশ্বপতি কৈকেয় ও আরুণি প্রভৃতির কথোপকথন রয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে আরণ্যক ধর্মিতা নেই ; কেবল দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত। ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্দালক শ্বেতকেতু সংবাদের মাধ্যমে এক অদ্বিতীয় চিন্ময় সৎ থেকে দৃশ্যমান জগতের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। দেহ ত্যাগে আত্মার বিনাশ হয় না এ তত্ত্বও এখানেই রয়েছে। তত্ত্বমসি মন্ত্রও এই অধ্যায়ে। সপ্তম অধ্যায়ে নারদ ও সনৎ কুমারের কথোপকথনের মধ্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে অসুরদের প্রচারিত মতবাদ দেহ ও আত্মা অভিন্ন এই-দেহ-সর্বস্ববাদের খণ্ডন। আত্মা অবিনশ্বর এখানে প্রমাণ করা হয়েছে।

ছায়া—সূর্যের স্ত্রী সংজ্ঞা (দ্রঃ) স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে মায়াতে নিজের অনুরূপ একটি মেয়েকে তৈরি করে সূর্যের কাছে রেখে দিয়ে পালিয়ে যান। এই মেয়ের নাম ছায়া। নিজের ছেলে মেয়েদের ভারও সংজ্ঞা এই ছায়ার হাতে দিয়ে যান। ছায়াকেই সূর্য সংজ্ঞা বলে জানতেন। ছায়ার সন্তান সাবর্ণিমনু, শনি, তপতী, বিষ্টি ইত্যাদি। সংজ্ঞার ছেলে যমের চেয়ে নিজের সন্তানদের বেশি ভালবাসতেন। ফলে যম এক বার রেগে গিয়ে সৎমাকে লাথি মারতে যান। ছায়া তখন শাপ দেন যে তার পা খসে যাবে। যম তখন সূর্যের কাছে সব জানালে সূর্য ছেলেকে ঠিক শাপ মুক্ত করে দেন না ; বলেন যমের পায়ের মাংস কিছু খসে যাবে ; কৃমিকীটরা এই মাংস খাবে। সূর্য তার পর ছায়াকে তিরস্কার করলে ছায়া আরো রেগে গিয়ে সংজ্ঞার সমস্ত কথা এবং নিজের পরিচয় সূর্যকে জানিয়ে দেন।

ছায়াগ্রাহী—সিংহিকা (দ্র)।

ছিন্নমস্তা—দশ মহাবিদ্যার এক জন। অন্য নাম প্রচণ্ড চণ্ডিকা। ইনি বাঁ হাতে নিজের কাটা মাথা ধরে আছেন এবং নিজের কাটা গলা থেকে রক্তধারা পান করছেন। এঁর বাঁ দিকে সহচরী ডাকিনী ও দক্ষিণে সহচরী বর্ণিনীকেও দেবী রক্ত পান করাচ্ছেন। এঁরা সকলেই দিগম্বরী, মুণ্ডমালিনী ও মুক্তকেশী। দেবীর মাথার চুল নানা ফুল দিয়ে সাজান; গলায় মুণ্ডমালা ও নাগ উপবীত। রতি ও কামের ওপর ইনি দাঁড়িয়ে আছেন। অন্য হাতে নর কপাল ও খড়্গ। ইনি প্রসন্ন হয়ে উপাসক-দের শিবত্ব দেন; অপুত্রক পুত্র পায়; নির্ধন ধন পায়, মূর্খ বিদ্বান হয়। ছিন্নমস্তার উৎপত্তি কাহিনী হচ্ছে এক দিন পার্বতী দুই সহচরী নিয়ে নদীতে স্নান করতে যান। সহচরী দু জনের ক্ষিধে পেলে তাঁরা বার বার দেবীর কাছে খাবার কথা বললে দেবী বাঁ নখ দিয়ে নিজের মাথা ছিঁড়ে ফেলে তিন জনেই রক্ত ধারা পান করে ক্ষিধে মেটান। মহাভাগবত পুরাণ মতে দক্ষ যজ্ঞে মহাদেব যেতে বারণ করলে নিজের বিভূতি দেখাবার জন্য মহাদেবকে সতী দশটি মহাবিদ্যা রূপ দশটি মূর্তি দেখিয়ে অভিভূত করে দক্ষ যজ্ঞে যাবার অনুমতি আদায় করে নেন।

জ

জগৎ—পৃথিবী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব কিছু মিলে জগৎ। চার্বাক প্রভৃতির মতে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ এই চারটি ভূতই থেকে অর্থাৎ জড় থেকে জগতের উৎপত্তি এবং জড়েতে এর বিলুপ্তি।

বেদবাদী দার্শনিকরা তিনটি ভাগে বিভক্ত সাংখ্য-যোগ, বৈশেষিক-ন্যায় ও মীমাংসা-বেদান্ত। এই তিনটি ভাগের প্রতিটির পূর্বভাগে অর্থাৎ সাংখ্য, বৈশেষিক ও মীমাংসাতে জগতের মূল স্বরূপ এবং উত্তর ভাগে জগতের সূক্ষ্ম স্বরূপ আলোচনা করে জগতের সংজ্ঞা ঠিক করতে চেষ্টা করা হয়েছে।

সাংখ্য মতে দৃশ্যমান বিশ্ব হচ্ছে চেতন (=পুরুষ) ও জড়ের (=প্রকৃতি) বিলাস। পঞ্চ, ভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র, পাঁচটি জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্ম ইন্দ্রিয় এবং এই দশটি ইন্দ্রিয়ের অধিপতি একাদশ ইন্দ্রিয় মনকে স্বীকার করা হয়েছে। এবং এই সব কিছুর মূলে এদের কারণ রূপ একটি অহংকার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই অহংকার চেতন ও জড়ের গ্রন্থি ও জগতের মূল কারণ। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণ যুক্ত প্রকৃতি (=জড়) ক্রিয়াশীল নয়। পুরুষ ও অমূর্ত, ফলে ক্রিয়া সমর্থ হলেও সৃষ্টি কর্মে অসমর্থ। ফলে 'পঙ্গু, অন্ধ' রীতিতে জড়ও চেতন জগৎ সৃষ্টি করছে। প্রকৃতি ও পুরুষ বিরুদ্ধ স্বভাব যুক্ত বলে এদের মধ্যে অহংকার তত্ত্ব হচ্ছে বন্ধন রজ্জু। সাংখ্যে এই ভাবে জগতের জড় অংশ এবং যোগে জগতের চেতনাংশের বিচার করা হয়েছে।

বৈশেষিকরা ছয়টি পদার্থ স্বীকার করেন এবং ষষ্ঠ পদার্থটির নাম বিশেষ। এই জন্য এই সম্প্রদায়ের নাম বৈশেষিক। এবং এই বিশেষ পদার্থই অন্য পদার্থ গুলির সঙ্গে মিলে জগৎ সৃষ্টি করছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈশেষিকের প্রভাব

প্রচুর। বৈশেষিক অংশে স্থূল জগতের এবং ন্যায় অংশে সূক্ষ্ম অর্থাৎ জ্ঞান রহস্যের বিচার করা হয়েছে। মীমাংসা মতে জীবের জন্ম মৃত্যু আছে কিন্তু বিশ্বের নেই। অতএব মহাপ্রলয় বা বিশ্ব ধ্বংস স্বীকৃত নয়। এই ভাবে মীমাংসা অংশে জগতের ব্যাখ্যা রয়েছে; বেদান্ত অংশে আছে জ্ঞানের বিচার।

জৈন মতে জগতের উপাদান কারণ হিসাবে ঈশ্বর স্বীকৃত নন। জড় জগৎ অজীব; ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও পুদ্গল সবই অজীব অর্থাৎ দ্রব্য। অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম দ্রব্য অণু; অণু মিলে স্কন্দের সৃষ্টি। জীব ভিন্ন সব কিছুই অজীব। জগৎ সৃষ্টি ব্যাপারে জৈনেরা জড়বাদী। বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে জগতের ধারণা বিভিন্ন। বৈভাষিক সম্প্রদায় সর্বাস্তিবাদী; এঁদের মতে বাহ্য জগৎ প্রত্যক্ষগম্য। সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের মতে বাহ্য জগৎ আমাদের অনুমানের ওপর নির্ভর করে; অর্থাৎ এরা অনুমেয় বাদী। বৌদ্ধ যোগাচার সম্প্রদায় মতে বাহ্য জগৎ অলীক; স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই; 'বিজ্ঞান' প্রসূত সৃষ্টি মাত্র। বৌদ্ধ মাধ্যমিক সম্প্রদায় মতে জগৎ নাই, আত্মা নাই, সবই শূন্য, সবই অলীক; কাল্পনিক প্রবাহ মাত্র। এই চারটি বৌদ্ধ মতেই প্রমেয় জগৎ বলে কিছু স্বীকৃত হয় না।

বৈশেষিক মতে নিত্য পদার্থ পরমাণু এবং নিমিত্ত ঈশ্বর থেকে পরিদৃশ্যমান জগতের জন্ম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় দুটি পরমাণু যোগে একটি দ্ব্যণুক, এবং তিনটি দ্ব্যণুক যোগে একটি ত্রসরেণু। ত্রসরেণুই সবচেয়ে ছোট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য। এক একটি খণ্ড প্রলয়ের পর ঈশ্বরের ইচ্ছা ও জীবগণের অদৃষ্টবশত পরমাণু যাতে সংযুক্ত হতে পারে সেইরূপ অনুকূল ক্রিয়া পরমাণুতেই দেখা দেয় এবং ক্রমশ স্থূল জগৎ সৃষ্টি হয়। ন্যায়েরও এই মত। সাংখ্যযোগ মতে জগতের মূল উপাদান হচ্ছে অব্যক্ত প্রকৃতি; অবস্থা বিশেষে প্রকৃতি পুরুষের কাছে এসে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং জগতের সৃষ্টি হয়। অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে ২৪-টি তত্ত্ব সাংখ্যে স্বীকৃত হয়েছে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায় অর্থাৎ শুদ্ধাদ্বৈত মতে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ সবই ঈশ্বর। জগৎ ব্রহ্মের স্বরূপ ও পরিণাম এবং ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। নিম্বার্ক অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত মতে অচিৎ থেকে জগতের উৎপত্তি। মধ্ব অর্থাৎ দ্বৈত মতে বিষ্ণুর সৃজনী শক্তির প্রকাশ ও তাঁর সর্বকর্তৃত্বের বিকাশ এই জগৎ। বিভিন্ন বস্তু ও চেতন আত্মা নিয়ে জগৎ গঠিত। ঈশ্বর নিজে ক্রিয়া করেন ও অপরকে করান; এই থেকে জগতের জন্ম। রামানুজ অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ঈশ্বর নাম-রূপহীন এক ও অভেদ; তিনি বহু হবার বাসনায় এবং অন্তরস্থ সৃষ্টি প্রেরণায় নানা রূপে জগতে পরিণত হন। রামানুজ মতে এই বিশ্ব জগৎ জড় ও নৈতিক নিয়মের অধীন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় চালিত। শঙ্কর বেদান্ত (অদ্বৈত) মতে ব্রহ্মাশ্রিত মায়া বা প্রকৃতি থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। এই মতবাদে কখনো কখনো জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণও ইশ্বর। অদ্বৈত বেদান্ত মতে জগৎ পূর্ণ সৎ নয়; আবার অসৎও নয়; একটি ব্যবহারিক সত্তাযুক্ত। এই জগৎ অনির্বচনীয়, মায়িক ও মিথ্যাভূত। এই মতবাদে ব্রহ্মকে বাদ দিলে জগতের কোন অস্তিত্ব থাকে না। শঙ্কর মতে জগৎ স্বপ্ন নয়; নিয়মের অধীন ও কতকগুলি ঘটনা সমারোহের সুসংহত রূপ। এই সব ঘটনার পেছনে দেশ কাল ও কারণের সংযুক্ত প্রভাব রয়েছে। শৈব দার্শনিক মতে স্থলকে জগতের মূল কারণ ও

আধার বলে স্বীকার করা হয় ; প্রাত্যহিক জগৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ, শাশ্বত সংবিদ্ বা স্থলের অপূর্ণ কালিক প্রকাশ। কাশ্মীরের শৈববাদ অনুসারে বিশ্বাত্মার ইচ্ছারূপ বৈশিষ্ট্যের স্থূল অভিব্যক্তি থেকে বিশ্বের প্রকাশ। শৈব সিদ্ধান্তীদের মতে জগতের উপাদান কারণ মায়া, জগৎ জড় বা অচিৎ।

ভারতীয় চিন্তায় দৃশ্যমান ভোগ্য জগতের ধারণার সঙ্গে কর্মবাদ অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। বিশ্ব জগৎকে নৈতিক বলা হয়েছে। জীব তার কর্মানুসারে দেহ ইন্দ্রিয়াদি পরিবেশ ও ভোগ্য দ্রব্য লাভ করে ও সংসার আবর্তে ঘুরে বেড়ায়। কর্ম ফল ভোগের জন্যই ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। দেশ ও কালের দিক থেকে জগৎ অনাদি। বিষ্ণু পুরাণে ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে চতুর্দশ লোক ; ভূতল এদের মধ্যে একটি ; এই লোকগুলির মধ্যে কোটি কোটি যোজন দূরত্ব। লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড মিলে এই বিশ্ব-জগৎ।

জগৎ-গ্রাম—উত্তর প্রদেশে দেরাদূন জেলায়। খৃ ৩-শতকের কয়েকটি ইষ্টক নির্মিত অশ্বমেধ চৈত্য পাওয়া গেছে। বহু ইঁটে লেখা আছে রাজা শীলবর্মা চারটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

জগতী—(১) একটি ছন্দ। (২) সূর্যের একটি অশ্ব।

জগদ্দল—গঙ্গা ও করতোয়া সংগম স্থলে রামপালের (১০৭৭-১১২০) গড়ামহাচম্পা রাজধানী রামাবতীর একাংশে দ্বাদশ শতকের একটি বৌদ্ধ বিহার এই জগদ্দল। বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি অন্যতম পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। ভারত তিব্বত ইত্যাদির বহু পণ্ডিত এখানে মিলিত হতেন। মুসলমান আক্রমণে এটি ধ্বংস হলেও এর যশ বহু দিন অক্ষুণ্ণ ছিল।

জগদ্ধাত্রী—সিংহবাহিনী, চার হাত, রক্ত বস্ত্র, দেহে নানা অলংকার, দেহের রঙ অরুণ সূর্যের মত, সর্প এঁর যজ্ঞোপবীত, বাঁ হাতে শঙ্খ ও ধনুক, ডান হাতে চক্র ও পঞ্চবাণ। এক বার অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ও চন্দ্র এই চারজন ঠিক করেন তাঁরাই শ্রেষ্ঠ এবং তাঁরাই পরমেশ্বর। এই অহঙ্কারের কথা শুনে দুর্গা কোটি সূর্যের মত জ্যোতির্ময়ী হয়ে এঁদের সামনে এসে উপস্থিত হন। এঁরা ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে পবন দেবকে সামনে পাঠিয়ে দেন। জ্যোতির্ময়ী, একটি তৃণ রেখে পবনকে তুলতে বলেন কিন্তু বহু চেষ্টাতেও পবন পারেন না। এর পর অগ্নি এলে, এটিকে পুড়িয়ে ফেলতে বলেন ; অগ্নিও চেষ্টা করে অকৃতকার্য হন। চার জনই এই ভাবে হেরে গিয়ে জ্যোতির্ময়ীর আরাধনা করতে থাকেন এবং ইনিই জগদ্ধাত্রী। কার্তিক শুক্লা নবমীতে এঁর পূজা হয়। একই দিনে তিন বার পূজা বা কোথাও কোথাও দুর্গার মত তিন দিন পূজা হয়। মায়াতন্ত্রে ও তন্ত্রসারে দুর্গা প্রসঙ্গে এঁর কথা বলা হয়েছে।

জগন্নাথ—বিষ্ণু বা কৃষ্ণের অবতার। সারা ভারতবর্ষে পূজিত। উড়িষ্যায় পুরীতে এঁর মন্দির। জ্যৈষ্ঠে স্নানযাত্রায় ও আষাঢ়ে রথের সময় বিশেষ ভাবে পূজিত হন। স্নান যাত্রায় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা তিন মূর্তিকেই স্নান করান হয় ; রথ যাত্রায় এঁদের রথে তুলে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।

যদুবংশ ধ্বংসের পর কৃষ্ণের মৃত্যু হলে তাঁর মৃতদেহ একটা গাছের নীচে পড়ে ছিল। এই সময়ে কয়েক জন ভক্ত কৃষ্ণের কয়েকটি অস্থি সংগ্রহ করে বাক্সে

ভুলে রাখেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণু পূজা করবেন ঠিক করেন কিন্তু কি মূর্তির পূজা করবেন ভেবে পান না। বিষ্ণু এই সময়ে এসে ইন্দ্রদ্যুম্নকে (দ্র) তাঁর সনাতন মূর্তি নির্মাণ করে মূর্তির মধ্যে কৃষ্ণের অস্থি রক্ষা করতে বলেন। বিশ্বকর্মা এই মূর্তি নির্মাণের ভার নিয়েছিলেন। সর্ত ছিল যত দিন না মূর্তি তৈরি শেষ হবে তত দিন যেন কেউ তাঁকে বিরক্ত না করেন। কিন্তু পনের দিন পরে রাজা অস্থির হয়ে পড়েন এবং কি রকম মূর্তি হল দেখবার জন্য এসে উপস্থিত হন। ফলে বিশ্বকর্মা রাগ করে অসম্পূর্ণ-হাত-পা মূর্তি ফেলে রেখে চলে যান। ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন ব্রহ্মার কাছে এর একটা বিহিত করার জন্য প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা প্রীত হয়ে মূর্তির চক্ষু ও প্রাণ দান করে নিজে পুরোহিত হয়ে পূজা করেন।

পুরীর এই বর্তমান মন্দির অনুমান খৃ-১২ শতকের মাঝামাঝি তৈরি হয়েছিল। এঁদের মূর্তি নিম কাঠের। মাছে মাঝে এই মূর্তি তিনটিকে সমাধিস্থ করে নতুন প্রতিমা স্থাপন করা হয় এবং পুরাতন বিগ্রহ থেকে কোন একটি পদার্থ নিয়ে নতুন মূর্তির মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। পদার্থটি কি পুরোহিতও জানেন না; চোখে ও হাতে কাপড় ঢাকা দিয়ে পদার্থটিকে স্থানান্তরিত করা হয়।

প্রবাদ বসু শবর নামে একজন অনার্য নীলাচলে নীলমাধবের পূজা করতেন। পরে এই নীলমাধব জগন্নাথে পরিণত হন। বসু শবরের মেয়ের বংশের লোকেরা দইতাপতি নামে পরিচিত এবং এখনও জগন্নাথের বিশেষ বিশেষ সেবায় নিযুক্ত আছেন। বহু পণ্ডিতের মতে এই ত্রিমূর্তি বৌদ্ধ ত্রিরত্নের প্রতীক; পরে ব্রাহ্মণ্য দেবতায় পরিণত। ওড়িশার লোক গীতিতে জগন্নাথ ও বুদ্ধ অভিন্ন। জয়দেব বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর নবম অবতার বলেছেন। ওড়িশা ও বাঙলার কোন কোন মন্দিরে বিষ্ণুর নবম অবতার হিসাবে জগন্নাথকে দেখা যায়। জগন্নাথকে নানা বেশ ভূষায় সাজিয়ে নানা উৎসব পালন করা হয়েছে এবং এখনও হয়। তাঁকে নাকি বুদ্ধ বেশেও সাজান হত জনশ্রুতি আছে।

পুরীর মন্দিরে পীঠস্থান হিসাবে বিমলা দেবীর মন্দির আছে। শক্তি মূর্তি বিমলার ভৈরব জগন্নাথ। জগন্নাথকে এখানে পঞ্চ মকারের বিকল্প নিত্য সেবায় নিবেদন করা হয়। শৈব ও শাক্ত মতে জগন্নাথ ভৈরব।

জটাধর—দেবাসুরের যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু ও পিতৃগণ কার্তিকেয়ের কাছে যে সব সেনাধ্যক্ষ পাঠান তাঁদের মধ্যে এক জন।

জটায়ু—অরুণের স্ত্রী শ্যেনী, দুই ছেলে বড় সম্পাতি ও ছোট জটায়ু। অন্য মতে মায়ের নাম মহাশ্বেতা। শ্যেনী ও মহাশ্বেতা নামে পরিচিতা। জটায়ু সমস্ত পাখীদের অধিপতি এই জন্য অন্য নাম পক্ষিরাজ। দশরথের বন্ধু। দুই ভাই ইন্দ্রকে জয় করবার জন্য আকাশ পথে এগিয়ে যেতে গিয়ে অন্য মতে সূর্যের দিকে যেতে গিয়ে দুপুরে সূর্যের তাপে জটায়ু অবসন্ন/ঝলসে যাবার অবস্থা হলে সম্পাতি নিজের ডানা দিয়ে এঁকে রক্ষা করেন। পঞ্চবটীতে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা এলে জটায়ুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং জটায়ু এই গহন বনে এঁদের সহায় হবেন ও সীতাকে রক্ষা করবেন কথা দেন। সীতাকে নিয়ে পালাবার সময় রাবণকে জটায়ু বাধা দেন এবং যুদ্ধ হয়। রাবণের হাতে জটায়ুর ডানা কাটা যায় এবং মৃতপ্রায় হয়ে মাটিতে পড়ে যান।

সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে রাম এঁকে দেখতে পেয়ে প্রথমে ভেবেছিলেন এই পাখীই সীতাকে খেয়ে ফেলেছে। রাম জটায়ুকে বধ করতে যান কিন্তু প্রকৃত ঘটনা জানতে পেয়ে নিরস্ত হন। রামকে খবর জানিয়ে জটায়ু মারা যান। রাম-লক্ষ্মণ তখন পিতৃসখা জটায়ুর সৎকার করেন।

জটাসুর—এক জন রাক্ষস, দুর্যোধনের বন্ধু, অলম্বুষের পিতা। পাণ্ডবদের বন বাসের সময়ে অর্জুন যখন স্বর্গে ছিলেন সেই সময়ে দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হয়ে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলে নিজের পরিচয় দিয়ে ইনি পাণ্ডবদের অতিথি হন। যুধিষ্ঠির সরল মনে আশ্রয় দেন। এক দিন ভীম মৃগয়াতে গেলে এবং ঘটোৎকচ প্রভৃতি আশ্রমে না থাকাতে জটাসুর ভীষণ রূপ ধরে যুধিষ্ঠিরদের তিন ভাই ও দ্রৌপদীকে এবং পাণ্ডবদের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন। সহদেব বাধা দিতে যান ; ইতিমধ্যে ভীম এসে পড়েন এবং ভীমের সঙ্গে বাহু যুদ্ধে জটাসুর নিহত হন।

জটিলা—(১) জাবট গ্রামে গোল নামে এক গোপের স্ত্রী ; রাধিকার স্বামী অভিমন্যু বা আয়ানের মা। জটিলার আর এক ছেলের নাম দুর্মদ এবং একটি মেয়ে কুটিলা। জটিলা কাকের মত কালো এবং বিরাট ভুঁড়ি ছিল। ইনি সাধ্য মত চেষ্টা করেছিলেন যাতে অভিমন্যুর প্রতি রাধিকার ভালবাসা জন্মায়। রাধিকার সখী ললিতা ও কুন্দলতাকেও কাতর অনুরোধ করেছিলেন রাধিকাকে বোঝাবার ও বাধা দেবার জন্য। (২) গৌতম বংশে একটি ধার্মিক মহিলা ; স্বামী সাত জন ঋষি।

জড়ভরত—ঋষভ দেবের ছেলে ভরত (দ্রঃ) হরিণ হয়ে জন্মে মারা যান এবং তার পর এক ব্রাহ্মণের দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জাতিস্মর হয়ে জন্মান এবং যাতে আর অধোগতি না হয় সেই জন্য সম্পূর্ণ অনাসক্ত ভাবে জীবন কাটাতে থাকেন। জড়-বুদ্ধি উন্মত্তের মত থাকতেন, জড়িত স্বরে কথা বলতেন এবং কাজ কর্মে বিমুখ ছিলেন বলে জড়ভরত নামে পরিচিত হন। এই অবস্থা হলেও শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ছিল। ব্রাহ্মণের প্রথমা স্ত্রীর নয়টি ছেলে। ব্রাহ্মণ মারা গেলে দ্বিতীয়া স্ত্রী সহমৃতা হন। এবং ভরত সৎ-ভাইদের হাতে দাসে পরিণত হন। এক দিন মধ্য রাত্রে ভাইদের ক্ষেত পাহারা দিচ্ছেন এমন সময় দেখেন কাছেই চণ্ডালরা উৎসব করছে নররলি দেবে। নরবলির মানুষটি কিন্তু সুযোগ মত পালিয়ে যায়। চণ্ডালরা ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে খুঁজতে ভরতকে পেয়ে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু কালী বিগ্রহের সামনে এই দৃপ্ততেজ ভরতকে নিয়ে এলে দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে চণ্ডালদের খেয়ে ফেলেন। ভরত মুক্তি পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক রাজ্যে আসেন। জড়বুদ্ধি দেখে এখানেও লোকে তাঁকে অপমান করত এবং খেতে দিয়ে নানা কাজ করিয়ে নিত। এখানে এক দিন সিন্ধু সৌবীরপতি রাহুগণ এঁকে বলিষ্ঠ দেখে শিবিকা বহন করতে বাধ্য করেন। ইক্ষুমতী নদীর ধার দিয়ে রাজা কপিল মুনির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। জীব হিংসার ভয়ে ভরত সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে চলতে থাকেন ফলে গতি ব্যাহত হতে থাকে এবং ঝাঁকানি লাগতে থাকে। রাজা তখন ভৎ'সনা করলে অন্য মতে শাস্তি দেবার ভয় দেখালে ভবত হেসে রাহুগণের প্রতিটি কথা অবলম্বনে দর্শন ও পরমার্থ তত্ত্ব নিয়ে নানা উপদেশ দিতে থাকেন। রাজা বিস্মিত হয়ে ভরতকে ব্রহ্মজ্ঞ বলে বুঝতে পেরে পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে নেন। ভরত বিষ্ণুর স্তব করতে করতে বনে চলে যান। জড় ভরত শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে

সেই জন্মেই মোক্ষ লাভ করেন।

জতুগৃহ—লাক্ষা ধুনা ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ দিয়ে বারণাবতে এক বাড়ি তৈরি করিয়ে দুর্যোধন পিতার অনুমতি নিয়ে মন্ত্রী পুরোচনকে সঙ্গে দিয়ে এখানে পাণ্ডবদের পাঠান। এঁরা আসেন অষ্টমে অহ্নি রোহিণ্যাং প্রয়াতাঃ ফল্গুনস্য তে (মহা ১।১৩৩।১০)। ঠিক ছিল সুযোগ মত পুরোচন এখানে আগুন দিয়ে এদের হত্যা করবেন। বিদুর কিন্তু এ বিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন এবং বিদুরের পাঠান খনকের সাহায্যে পাণ্ডবরা এই বাড়ি থেকে গঙ্গা পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ কাটিয়ে রাখেন। এখানে এক বছর থাকার পর কুন্তী এক দিন ব্রাহ্মণও অন্যান্যদের ভোজন করান। একটি নিষাদী ও তার ৫ ছেলে পানাহারে মত্ত ও অজ্ঞান হয়ে এই দিন এখানেই পড়ে থাকে। গভীর রাত্রিতে পাণ্ডবরা নিজেরাই বাড়িতে আগুন দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে বার হয়ে যান। গঙ্গাতে বিদুরের পাঠান নৌকা করে ওপারে পালিয়ে যান। আগুন লাগাবার আগে যত দিন পাণ্ডবরা এ বাড়িতে ছিলেন তত দিন রাত্রি বেলা পুরোচনের অজ্ঞাতে এই সুড়ঙ্গের মধ্যে কাটাতেন। পুরোচন, ও নিষাদরা ছ জন পুড়ে মারা যায়; এবং সকলে মনে করে পাণ্ডবরাই মারা গেছেন। এই সংবাদ অনুসারে ধৃতরাষ্ট্র এঁদের শ্রাদ্ধশান্তিও করেছিলেন।

জনক—ইক্ষ্বাকু(১)-নিমি(২)-মিথি(৩)- উদাবসু(৪)- সীরধ্বজ(২৩)। জনক এই বংশে বহু রাজার উপাধি/নাম। নিমির দেহ মন্থন করে মিথি নামে এক ছেলে হয়। বিচেতন দেহ থেকে জন্ম বলে নাম বিদেহ এবং মিথির রাজ্যের নাম হয় মিথিলা। মিথির বংশে সব রাজাই জনক নামে পরিচিত। রামায়ণ অনুসারে মিথির ছেলে প্রথম জনক, এই জনকের ছেলে উদাবসু। জনক হ্রস্বরোমার ছেলে জনক সীরধ্বজ। ক্রমশ দেশের নাম হয় বিদেহ এবং রাজধানী মিথিলা বলে পরিচিত হয়। জনক সীরধ্বজের ভাই কুশধ্বজ। জনক সীরধ্বজ যজ্ঞ করবার জন্য এক দিন লাঙ্গল দিচ্ছিলেন এই সময় লাঙ্গলের ফলাতে একটি মেয়ে উঠে আসে। সীরধ্বজ (দ্রঃ) নাম রাখেন সীতা এবং পালন করে বড় হলে এঁকে বীর্যশুল্কা করেন। কিন্তু সাংকাশ্যর রাজা সুধন্বা সীতাকে বিয়ে করতে চান এবং মিথিলা অবরোধ করেন (রাম ১।৭১।১৬)। যুদ্ধে সুধন্বা নিহত হলে সীরধ্বজ নিজের ভাই কুশধ্বজকে সাংকাশ্যর রাজা করে দেন। জনক তারপর পণ করেন হরধনু (দ্র) যে ভাঙতে পারবে তার সঙ্গে সীতার বিয়ে দেবেন। রামচন্দ্র এই ধনুক ভেঙ্গে বিয়ে করেন। সীরধ্বজের তনুজা উর্মিলার সঙ্গে লক্ষ্মণের বিয়ে হয়। এই সীরধ্বজ জনক শেষ বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে যান।

এক জন জনক এক বার যোগবলে নিজের দেহ ত্যাগ করেন এবং বিমানে করে দেবলোকে যাবার পথে যমালয়ে নীত হন। জনকের দেহের বায়ু নিশ্বাস নিয়ে এখানে নরকে পাপীরা যন্ত্রণা থেকে একটু আরাম পান। জনক তার পর এখান থেকে চলে যেতে গেলে পাপীরা জনকের কাছে প্রার্থনা করে এখানে থাকতে বলে, তাহলে তাদের নরক ভোগ কিছুটা লাঘব হবে। জনক পাপীদের কথা চিন্তা করে যমপুরীতেই থাকবেন স্থির করেন। সেই সময়ে যম এসে জনককে সেখানে দেখে বিস্মিত হয়ে যান এবং এখান থেকে জনককে ফিরে যেতে বলেন। জনক পাপীদের মুক্তি চান তবে তিনি যাবেন। যম তখন সেখানে প্রতিটি পাপীর পাপ জীবনের পরিচয় দিতে

থাকেন। শেষ অবধি ঠিক হয় জনক যদি তাঁর পুণ্য দান করেন তবেই এরা মুক্তি পাবে। জনক এক দিন সকালে উঠে রাম নাম জপ করেছিলেন, সেই পুণ্য দান করেন, পাপীরা মুক্তি পায়। জনক তখন তাঁর নিজের কথা জিজ্ঞেস করেন; যম বলেন জনক এক বার একটি গাভীকে ঘাস খেতে বাধা দিয়েছিলেন সেই কারণে এখানে সাময়িক এক বার এসেছেন। এক জন জনকের শাস্ত্রগুরু ছিলেন সাংখ্যাচার্য পঞ্চশিখ; মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হবার পন্থা এঁর সঙ্গে এই জনক আলোচনা করেন এবং এঁর উপদেশে বহু সংশয় জয় করেন। শুকদেব এক বার ভাগবত পাঠ করে স্থানে স্থানে বুঝতে না পেরে জনকের কাছে এসে এই সব ব্যাখ্যা জেনে নেন এবং মোক্ষশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। ব্যাসদেবও নিজেও এই সব ব্যাখ্যা জানতেন না; তাই ছেলেকে এঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। জনক ধর্মধ্বজকে সুলভা নামে এক বিদুষী মহিলা পরীক্ষার জন্য সুন্দরী নারী সেজে আসেন; ব্রহ্মচারিণী সুলভার সঙ্গে মোক্ষ তত্ত্ব ও নানা শাস্ত্র আলোচনা হয়েছিল। সুলভা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যান। যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি ঋষিরা প্রায়ই এক জনকের সভায় আসতেন। দেবরাট্ জনকের ছেলে বসুমান জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে বহু প্রশ্ন করেছিলেন। দেবরাট্ জনক হরধনু (দ্র) লাভ করেছিলেন। এক জনক ও রাজা প্রতর্দনের সঙ্গে যুদ্ধে জনকের সৈন্যরা ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে জনক নিজের সৈন্যদের স্বর্গ ও নরকের দৃশ্য দেখিয়ে যুদ্ধে প্ররোচিত করেন। এক জন জনক ক্ষেমদর্শী রাজার কাছে যখন প্রায় হেরে যাচ্ছিলেন তখন কালকবৃক্ষীয়ের (দ্র) পরামর্শে নিজের মেয়ের সঙ্গে ক্ষেমদর্শীর বিয়ে দিয়ে সন্ধি করেন। এক জন জনক ও মাণ্ডব্য তৃষ্ণা সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেছিলেন। এক জন জনক পরাশরের সঙ্গে সমৃদ্ধি লাভের বিষয় আলোচনা করেন। অশ্মক এক জনককে কিছু উপদেশ দিয়ে ছিলেন। ভীমসেন এক জনককে পরাজিত করেছিলেন। করাল জনক, বসুমান জনক, জনদেব জনক ইত্যাদি নামও পাওয়া যায়। দ্রঃ কহোড়, অষ্টাবক্র। জনকেরা সকলেই বিদ্বান, বিদ্যোৎসাহী, ব্রহ্মবিদ ও জীবন্মুক্ত রাজর্ষি। এবং এই জনকগুলি সকলেই যে বিভিন্ন ব্যক্তি সে রকম বিশেষ কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না।

জনকবংশ—ইক্ষ্বাকু বংশের একটি শাখা। বিষ্ণু পুরাণ মতে এই বংশে ৫৬ জন এবং ভাগবত মতে ৫৩ জন রাজা জন্মেছিলেন।

জন-লোক—ধ্রুবপদ/লোক থেকে তিন কোটি যোজন দূরে অবস্থিত।

জন-স্থান—দণ্ডকারণ্যের একটি অংশ। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এখানে বাস করেছিলেন। এখানে শূর্পণখার নাক কাণ কাটা যায়। খরদূষণ ত্রিশিরা এখানে নিহত হন এবং এখান থেকেই সীতা চুরি যান। দ্রঃ দণ্ডকারণ্য।

জনা—মাহিষ্মতী-রাজ নীল/নীলধ্বজের স্ত্রী। অত্যন্ত গঙ্গা ভক্ত এবং গঙ্গার বরে শিবের এক অনুচর জনার গর্ভে প্রবীর নামে জন্মান। জনার মেয়ে স্বাহা/সুদর্শনা (দ্রঃ নীল)। পাণ্ডবদের অশ্বমেধের ঘোড়া এলে প্রবীর এই ঘোড়া আটকান। নীলধ্বজ ঘোড়া ছেড়ে দিতে বলেন; কিন্তু জনা প্রবীরকে যুদ্ধে পাঠান। কৃষ্ণের সাহায্যে অতিকষ্টে পাণ্ডবরা জয়লাভ করেন; প্রবীর মারা যান। যুদ্ধের শেষে অত্রির পরামর্শে নীলধ্বজ অর্জুনের সঙ্গে সন্ধি করলে জনা স্বামীকে তীব্র ভৎর্সনা করে ভাইয়ের কাছে সাহায্য চান। ভাই সাহায্য করতে রাজি না হলে জনা নিজেই যুদ্ধে আসেন এবং

জনার তেজে সকলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে থাকে। কৃষ্ণের চেষ্টায় বহু কষ্টে পাণ্ডবরা রক্ষা পান। পুত্রশোকে জনা গঙ্গায় আত্মহত্যা করেন। জৈমিনী ভারতে জনার নাম জ্বালা এবং আগুনে আত্মহত্যা করেন এবং অর্জুনের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য ভয়ঙ্কর বাণরূপে বভ্রুবাহনের তূণে আশ্রয় নেন (দ্রঃ নীল)।

জন্মান্তরবাদ—মৃত্যুর পর জীবের আবার জন্ম। ভারতীয় চিন্তাধারার বিশেষ একটি সর্বগ্রাসী মতবাদ। এক মাত্র চার্বাক জড়বাদীরা স্বীকার করেননা; আত্মা ও পরলোক এঁরা কিছুই মানেন না। জন্মান্তর বাদের উর্বর মাটিতে জাতিস্মর শব্দটির জন্ম।

ন্যায় বৈশেষিক মতে আত্মার একটি গুণ অদৃষ্ট এবং এই অদৃষ্ট দ্বারাই নতুন দেহ ধারণ করা (উপসর্পণ) নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রারব্ধ শেষ হলে আত্মার মুক্তি আসে। সাংখ্য যোগ-সম্প্রদায় মতে বিবেক জ্ঞান উদয় হবার পূর্বে জীব বার বার জন্ম নেয়। কৃত-কর্মের জন্য বার বার বিভিন্ন জীব রূপে এই জন্ম হতে পারে। মীমাংসক মতে জীব যথাসময়ে উপযুক্ত শরীর পায়। এই জীবকে স্বর্গ লাভের আগে পর্যন্ত কর্ম অনুসারে বিভিন্ন জন্মের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ভৃগু গণনাতেও জন্মান্তর বাদ স্বীকৃত।

শৈব ও শাক্তরাও সকলেই, জন্মান্তরবাদী। জন্মের ক্রম অনুসারে জীব বিভিন্ন অবস্থার ও দেহান্তরের মধ্য দিয়ে মুক্তির দিকে এগিয়ে চলে। স্থূলদেহ বিশিষ্ট সংসার বদ্ধ জীবকে স-কল জীব বলা হয়। দেহ বিলীন দ্বিতীয় দশা প্রলয়কল; এটি কর্ম সংস্কার ও মূল অবিদ্যাযুক্ত অশরীরী অণু। তৃতীয় অবস্থা বিজ্ঞান কল: এটি কৈবল্যদশা।

জৈনরাও জন্মান্তর বাদী। জৈন মতে দেহ পুদ্গল সৃষ্ট। অতীত জীবনের কর্ম, ভাবনা, ও বাক্য আত্মাতে এক অন্ধ আবেগের সৃষ্টি করে এবং এই আত্মা তখন বিশেষ বিশেষ দেহ ধারণের উপযোগী বিশেষ বিশেষ পুদ্গল আকর্ষণ করে। জন্ম জাতি, কুল ও স্বভাব জৈন মতে সবই কর্ম নির্দ্ধারিত। জৈন তীর্থংকররা জাতিস্মর ছিলেন। বৌদ্ধরা আত্মার স্থায়ী সত্ত্বা স্বীকার না করলেও জন্মান্তরবাদী। বৌদ্ধ মতে কর্মভোগের জন্য জীব বার বার জন্মায়। ভগবান বুদ্ধ নিজের কর্ম ও পুনর্জন্ম স্বীকার করেছেন, জাতকে তাঁর পূর্ব জন্মগুলির বৃত্তান্ত রয়েছে।

পৃথিবীর সমস্ত জীবকে এক সূত্রে বাঁধবার জন্য আর্য ঋষিদের কল্পিত এই জন্মান্তর বাদ। পলায়নী বৃত্তির এটি রঙীন ফানুস। কর্মফল ও জন্মান্তর বাদ মিলিয়ে জীবনের বালক সুলভ ব্যাখ্যা চিত্তচমৎকারী। এই মতবাদ সমাজের নৈতিক উন্নতির জন্য কিছুটা হয়তো সাহায্য করেছিল; ক্ষতি করেছিল অপরিসীম।

জন্মাষ্টমী—কৃষ্ণের জন্মতিথি। এ দিন কৃষ্ণের পূজা ও উৎসব হয়। বৈষ্ণবদের ও গোয়ালাদের এটি আনন্দের দিন।

জন্মেজয়—বা জনমেজয় অভিমন্যুর ছেলে পরীক্ষিত; পরীক্ষিতের ছেলে জন্মেজয়। জন্মেজয়ের আরো তিন ভাই উগ্রসেন, ভীমসেন ও শ্রুতসেন; মা মদ্রবতী। পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর মন্ত্রীরাই রাজার শেষকৃত্য করেন এবং রাজপুরোহিত ও মন্ত্রীরা এঁকে ১১ বছর বয়সে সিংহাসনে বসান। কাশীরাজ সুবর্ণ বর্মার মেয়ে বপুষ্টমার সঙ্গে বিয়ে হয়; ছেলে শতানীক (দ্র) ও শঙ্কু (মহা ১।৯০।৯৪)। দ্বিতীয় স্ত্রী কাশ্যার দুই ছেলে চন্দ্রাপীড় ও সূর্যাপীড়। সূর্যাপীড়ের এক শত ধনুর্দ্ধর ছেলে; বড় ছেলে সত্যকর্ণ জন্মেজয়ের পর রাজা হন।

সত্যকর্ণের ছেলে শ্বেতকর্ণ। জন্মেজয় কৃপাচার্যের কাছে ধনুর্বিদ্যা লাভ করেন। এক দিন উত্তঙ্কের (দ্র) কাছে কথা প্রসঙ্গে পিতার শাপগ্রস্ত হওয়া ও মৃত্যুর বিবরণ শুনে প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন। এর পর পুরোহিত, ঋত্বিক, উত্তঙ্ক ইত্যাদি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে সর্পনাশের জন্য তক্ষশীলাতে সর্পসত্র যজ্ঞ করেন। যজ্ঞে যখন দীক্ষা নিচ্ছেলেন তখন নানা অশুভ লক্ষণ দেখা দিতে থাকে, মুনিরা জানান এক ব্রাহ্মণ এসে এই যজ্ঞ পূর্ণ হতে দেবেন না। অন্য মতে যজ্ঞ ভূমি যখন মাপা হচ্ছিল তখন সূত নামে এক পুরাণ কথক ভবিষ্যৎবাণী করেন। ফলে রাজা কঠোর ব্যবস্থা করেন যজ্ঞস্থলে যেন কোন অপরিচিত ব্রাহ্মণ আসতে না পায়। যজ্ঞে ঋত্বিক ছিলেন অসিত, আত্রেয়, উত্তঙ্ক, উদ্দালক, কুটিঘট, কহোড়, কুণ্ডজঠর, কৌৎস, চণ্ডভার্গব, জৈমিনি, দেবল, দেবশর্মা, নারদ, পর্বত, পিঙ্গল, প্রমত্তক, ব্যাস, বাৎস্য, মৌদ্গল্য, শার্ঙ্গরব, শ্বেতকেতু, শ্রুতশ্রবা, সমসৌরভ। (মহা ১।৪৮।৮) আহুতি দিলে বহু সাপ এসে আগুনে মারা পড়তে থাকে। তক্ষক ভয়ে ইন্দ্রের কাছে শরণ নেন। এ দিকে বাসুকিও ক্রমশ মন্ত্রের বশীভূত হয়ে পড়তে থাকেন এবং বোন জরৎকারুকে বলেন আস্তিককে পাঠাতে। আস্তিক এসে নানা স্তবস্তুতি করে জন্মেজয়ের কাছে বর চান। কিন্তু পরিষদ ও হোতারা রাজাকে নিবারিত করেন। তক্ষক আসছে না দেখে উত্তঙ্ক দিব্যচক্ষে দেখেন তক্ষক ইন্দ্রের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। ঋত্বিকরা তখন ইন্দ্র, ইন্দ্রের সিংহাসন ও তক্ষক তিন জনকেই আহুতি দেবার জন্য মন্ত্র পাঠ করেন। মন্ত্রের বলে সিংহাসন সমেত ইন্দ্র ও তক্ষক এগিয়ে আসতে থাকেন। আর এক মতে তক্ষক আসছে না দেখে ঋত্বিকরা ইন্দ্রকে আহ্বান কবেন; ইন্দ্র আসতে বাধ্য হন; তক্ষক ইন্দ্রের উত্তরীযের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন। জন্মেজয় তখন ইন্দ্রকেও আহুতি দিতে বলেন ফলে ইন্দ্র তক্ষককে ফেলে রেখে পালিযে যান এবং তক্ষক আগুনের দিকে এগিযে আসতে বাধ্য হন। ঋত্বিকরা তখন যজ্ঞ সফল হয়েছে মনে কবে রাজাকে অনুমতি দেন আস্তিককে বর দিতে। আস্তিক তখন সুযোগ পেয়ে তিষ্ঠ বলে তক্ষককে দাঁড় করিয়ে দিযে রাজাকে যজ্ঞ থেকে নিবৃত্ত হবার বর চান। রাজা প্রথমে অসম্মত হলেও সকলের অনুরোধে আস্তিককে বব দিয়ে যজ্ঞে নিবৃত্ত হন। এই ভাবে তক্ষক ও অবশিষ্ট সাপেরা বেঁচে যায়। দ্রঃ জবৎকারু। এর পর জন্মেজয় কলিযুগে নিষিদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। যজ্ঞস্থানে কোন কারণে এক ব্রাহ্মণ কুমারকে জন্মেজয় সর্পে পরিণত করে দেন এবং সাপটি তার পর নিহত হয়। এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন মহাভাবতে পাঠ করে শুনিয়ে রাজাকে পাপ মুক্ত করেন। অন্য মতে সর্প যজ্ঞের সময় ব্যাস জন্মেজয়ের অনুরোধে মহাভারত কাহিনী শোনান। অশ্বমেধের সময় জন্মেজয়ের অনুরোধে ব্যাস পরীক্ষিৎকে স্বর্গ থেকে নিয়ে এসে দেখান। শমীক ও শৃঙ্গীও এই সময় উপস্থিত ছিলেন।

জন্মেজয় এক বার ভাইদের সঙ্গে মিলে কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করছিলেন; এই সময় অদৃষ্ট ভয় (দ্রঃ) শাপগ্রস্ত হন। জন্মেজয় তক্ষশীলার রাজাকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য জয় করে নেন। জন্মেজয়ের গুরু ছিলেন বেদ।

একটি মতে ৩১৩৮ খৃ-পূ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়েছিল। পাণ্ডবরা তার পর ৩৬ বছর

রাজত্ব করে মহাপ্রস্থানে যান। পরীক্ষিৎ ৬০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। অর্থাৎ ৩০৪২ খৃ-পূ জন্মেজয় যেন রাজা হন। (২) মান্ধাতার হাতে পরাজিত এক রাজা ; ইনি যমের এক জন সভাসদ। (৩) ক্রোধবশ অসুর জন্মেজয় নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা হয়ে জন্মান ; ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে দুর্মুখের হাতে নিহত হন। (৪) রাজা কুরুর স্ত্রী বাহিনীর এক ছেলে রাজা জন্মেজয়। কুরুর স্ত্রী কৌশল্যারও এক ছেলের এই নাম ; এবং অপর নাম প্রবীর। (৫) পরীক্ষিত বংশে এক রাজা ; এঁর ছেলে ধৃতরাষ্ট্র ; ইনি এক বার ব্রহ্মহত্যা করে বসেন এবং পাপ মোচনের জন্য শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রোত মুনিকে দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করান (মহা ১২।১৪৬।২)। (৬) রাজা দুর্মুখের ছেলে ; যুধিষ্ঠিরের মিত্র ; কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। (৭) বরুণের সভাতে একটি সাপ।

জপ—কোন একটি দেবতার নাম বা মন্ত্র বার বার উচ্চারণ করা। উপাসনার একটি বিশেষ অঙ্গ। বৈদিক যুগে স্বস্ত্যয়নেরও একটি অঙ্গ। তান্ত্রিক উপাসনায় জপ মস্ত বড় স্থান অধিকার করে আছে। মন্ত্রের অর্থ বুঝে পবিত্র ভাবে জপ করা বিধেয়। অবশ্য মন্ত্রের অর্থ না বুঝলেও জপে ফল লাভ হয়। যেমন রত্নাকর দস্যুর লাভ হয়েছিল।

মন্ত্র সিদ্ধির জন্য হাজার, লক্ষ, কোটি ইত্যাদি সংখ্যক জপ করণীয়। একাসনে বসে জপ করা কর্তব্য। তবে যেখানে দশ কোটি বা আরো বেশি জপ করা হয় যেখানে আসন ভঙ্গ করতেই হয় এবং পর পর কয়েক দিন ধরেই জপ হয়। আবার দিনের পর দিন সংখ্যা হীন জপও আছে। জপ চার রকম বাচিক, উপাংশু, জিহ্বা ও মানস। বাচিক অর্থে উচ্চৈঃস্বরে জপ করা ; এটি নিম্নস্তরের জপ। জিব ও ঠোঁটের সাহায্যে জপ অর্থাৎ অপরে শুনলেও শুনতে পেতে পারে এবং নিজে শুনতে পাচ্ছেই এ রকম জপকে উপাংশু বা দ্বিতীয় শ্রেণীর জপ বলা হয়। বাচিক জপ থেকে এটি দশ গুণ শ্রেষ্ঠ। কেবল জিবের দ্বারা জপকে জিহ্বা জপ বলা হয় : বাচিক জপ থেকে এক শত গুণ শ্রেষ্ঠ। মনে মনে জপ অর্থাৎ কোন শব্দ যখন উচ্চারিত হয় না তাকে মানস জপ বলা হয় এবং এ জপ বাচিক জপের দেড় হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ।

জপের সময় বুকের ওপর ডান হাত রেখে অঙ্গ বস্ত্র চাপা দিয়ে জপ করতে হয়। আঙুল গুলি এক সঙ্গে থাকে ; বুড়ো আঙুলটি কেবল অনামিকায় মধ্য পর্ব স্পর্শ করে তারপর অনামিকার নিম্ন পর্ব এবং ক্রমে কনিষ্ঠার নিম্ন মধ্য অগ্রপর্ব, তার পর অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনীর অগ্রপর্ব এবং তার পর তর্জনীর মধ্য ও নিম্ন পর্বে এসে শেষ হয়। এতে দশটি পর্ব স্পর্শ করা হয় এবং দশবার জপ বলা হয়। শক্তি মন্ত্রের জপ আরম্ভ হয় ঐ একই ভাবে কিন্তু বুড়ো আঙুল মধ্যমার অগ্রভাগ স্পর্শ করে নীচের দিকে নেমে গিয়ে শেষকালে তর্জনীর নিম্নপর্ব স্পর্শ করে শেষ হয়। আঙুলে জপের চেয়ে মালা জপ আরো প্রশস্ত। এক এক দেবতার জন্য এবং এক এক কাজে এক এক রকমের মালা প্রশস্ত। রুদ্রাক্ষ, জীবপুত্রিকা, তুলসীকাঠ, পদ্মবীজ, স্ফটিক ইত্যাদি মালা প্রসিদ্ধ। মানুষের কপালের হাড় বা কাণ ও চক্ষুর মধ্যস্থিত হাড়কে মহাশঙ্খ বলা হয়। মহাশঙ্খের মালা তান্ত্রিক কাজে ব্যবহৃত। মানুষের আঙুলের মালা নাড়ি দিয়ে গেঁথে ব্যবহার করাও হয়।

অন্যান্য ধর্মেও মালা জপের ব্যবস্থা রয়েছে। দীর্ঘ জপের একটা মনস্তাত্ত্বিক

দিক আছে। বাস্তব নিরপেক্ষ একটি ওরিয়েন্টেসান গড়ে ওঠে। মন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে; মনের এই বিরাম একটা অনাস্বাদিত বিরতির স্বাদ এনে দেয়। বাচিক জপে যান্ত্রিক ভাবে জপ করে গেলেও মন সেই সময় অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত থাকতে পারে। এই জন্য বাচিক জপ নিকৃষ্ট। (৩) তৃতীয় মন্বন্তরে এক দল দেবতা। এই মন্বন্তরে মনু=উত্তম, ইন্দ্র=সুশান্তি, এবং দেবগণের ৫-টি ভাগ=সুধর্মা, সত্য, জপ, প্রতর্দন ও বনাবর্তিন। এই প্রতি ভাগে ১২ জন করে দেবতা।

জবলপুর—বা জব্বলপুর। মধ্যপ্রদেশের একটি বিভাগ; ২২°৪৯´-২৪°৮´ উ× ৭৯°২১´-৮০°৫৮´ পূ। মহাভারতের চেদি রাজাদের রাজধানী ত্রিপুরীতে (=তেওয়ার) প্রাপ্ত শিলালিপিতে জবালি পট্টানা বা জাউলি-পট্টানা নাম। একটি মতে দার্শনিক ব্রাহ্মণ জাবালির নাম অনুসারে নাম। আর এক মতে আরবি শব্দ জবল (=পাথর) থেকে জবলপুর। এখানে সিহরা তহসিলের রূপনাথে প্রাপ্ত শিলালিপিতে অশোকের নাম আছে। গুপ্ত যুগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন হলেও স্থানীয় রাজার শাসনে ছিল। একাদশ শতকে অলবীরুনীর সময় হৈহয়-কলচুরি বংশীয় চেদি রাজের শাসনে ছিল। এর পর এখানে গণ্ড রাজবংশ স্থাপিত হয়।

জবালা—মহর্ষি সত্যকাকের মা। যৌবনে বহু চারিণী ছিলেন এবং সেই সময়ে সত্যকামের জন্ম হয়। বিদ্যার্থী সত্যকাম মায়ের কাছে নিজের গোত্র জানতে চাইলে জবালা ছেলেকে অকপটে নিজের জীবনের কথা জানান এবং বলেন সত্যকামের গোত্র তিনি জানেন না। এই সত্যবাদিতার জন্য স্মরণীয়া। অন্য মতে অল্প বয়সে বিয়ে করেছিলেন এবং সন্তান হবার পর বিধবা হন ফলে গোত্র জানতেন না।

জমদগ্নি—এক জন বৈদিক ঋষি। ভৃগু(১)- চ্যবন(২)- ঔর্ব(৩)- ঋচীক(৪)-জমদগ্নি (৫)। ঋচীকের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম। এই সত্যবতী (দ্র) কুশাস্তের রাজা গাধির মেয়ে। সস্ত্রীক ভৃগু এক বার প্রপৌত্র (অন্য মতে) ঋচীক ও সত্যবতীকে দেখতে এলে সত্যবতী নিজের জন্য এবং নিজের মায়ের জন্য পুত্রার্থে বর চান। ভৃগু বলে যান ঋতু স্নানের পর সত্যবতীর মা যেন অশ্বত্থ গাছ এবং সত্যবতী যেন উড়ুম্বর গাছ আলিঙ্গন করেন এবং তারপর যেন চরু খান। ভৃগু তারপর খাবার জন্য ব্রহ্মতেজ যুক্ত চরু সত্যবতীকে এবং ক্ষাত্র তেজ যুক্ত চরু সত্যবতীর মায়ের জন্য দিয়ে যান। অন্য মতে সত্যবতী ঋচীককে অনুরোধ করেছিলেন এবং ঋচীকই এই চরুর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মহিলা দুজন চরু বদল করে খেয়ে ফেলেন বা পাত্র অজ্ঞাতে বদল হয়ে গিয়েছিল। ভৃগু যোগবলে ঘটনাটা জানতে পেরে, অন্য মতে ঋচীক স্ত্রীর মুখে ক্ষত্র তেজ ফুটে উঠতে দেখে এবং শাশুড়ির মুখে ব্রহ্মতেজ দেখে ঘটনাটা জানতে পেরে সত্যবতীকে জানান তাঁরা উল্টপাল্টা কাজ করেছেন; সত্যবতীর মা সত্যবতীকে বঞ্চিত করেছেন। এই বদলাবদলির জন্য সত্যবতীর ছেলে ব্রাহ্মণ হয়েও ক্ষত্রিয় ধর্মাবলম্বী এবং সত্যবতীর মায়ের ছেলে ক্ষত্রিয় হয়েও ব্রাহ্মণ হবে। সত্যবতী ক্ষত্রিয়াচারী ছেলে চান না; ভৃগুকে/ঋচীককে অনুরোধ করলে বর পান পৌত্র তাহলে ক্ষত্রিয়ধর্মী হবে। এর পর সত্যবতীর ছেলে হয় জমদগ্নি। একটি মতে আবার জমদগ্নি ও বিশ্বামিত্র দুই ভাই।

জমদগ্নির বয়স হলে তীর্থ যাত্রায় যান। পথে ইক্ষ্বাকু রাজা প্রসেনজিতের

সমুদ্র বেষ্টিত ; তারপর প্লক্ষ দ্বীপ ইক্ষু সমুদ্র বেষ্টিত ; তারপর শাল্মলি দ্বীপ সুরা সমুদ্র বেষ্টিত ; এর পর কুশদ্বীপ ঘৃত সমুদ্র বেষ্টিত ইত্যাদি। এই জম্বু দ্বীপের কেন্দ্রে সুমেরু পর্বত ও চারদিকে ইলাবৃত বর্ষ। এর উত্তর ও দক্ষিণে বর্ষ পর্বত দিয়ে বিচ্ছিন্ন তিনটি করে ছয়টি বর্ষ। দক্ষিণে ভারত, কিম্পুরুষ, ও হরিবর্ষ ; উত্তরে রম্যক, হিরন্ময় ও উত্তর কুরু। সুমেরুর পূর্বে ভদ্রাশ্ব, পশ্চিমে কেতুমাল। অর্থাৎ জম্বু দ্বীপে নয়টি বর্ষ :-ইলাবৃত, ভারত, কিম্পুরুষ, হরি, রম্যক, হিরন্ময়, উত্তর-কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। এবং সাতটি বর্ষ পর্বত :-হিমবান, হেমকূট, নিষধ, মেরু, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান। দ্রঃ জম্বু।

জম্বুমালী—প্রহস্তের ছেলে। সীতার অভিজ্ঞান নিয়ে ফেরবার পথে হনুমান অশোক বন ধ্বংস করতে থাকলে রাবণ অন্যান্য বীরদের সঙ্গে এঁকেও পাঠান। যুদ্ধে হনুমানের হাতে নিহত হন।

জম্ভ—অনেক গুলি জম্ভ অসুরের নাম দেখা যায়। ধন্বন্তরীর হাত থেকে যারা অমৃত কেড়ে নিয়েছিলেন তাদের নেতা ছিলেন। কৃষ্ণ এক জম্ভকে নিধন করেন। রাবণের অনুচর এক জন জম্ভাসুর হনুমানকে এক বার আক্রমণ করেছিলেন। অর্জুন এক জন জম্ভাসুরকে নিহত করেন। মহিষাসুরের বাবার নামও অনেক সময় জম্ভ বলা হয়েছে। একটি মতে এক জম্ভ ইন্দ্রের কাছে এক বার হেরে গিয়ে তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে পৃথিবী বিজয়ী ছেলে হবে বর পান। বর পেয়ে ফেরবার পথে ইন্দ্রের সঙ্গে আবার দেখা হলে যুদ্ধে ডাক দেন। তার পর স্নান করবার অছিলাতে সরোবরে গিয়ে সেখানে স্ত্রীকে পেয়ে স্ত্রীকে গর্ভবতী করে ফিরে এসে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। এই ছেলে মহিষাসুর।

জয়—(১) বিরাট গৃহে অজ্ঞাত বাসের সময় যুধিষ্ঠিরের নাম। (২) জয় ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। বিরাট গৃহে গরু চুরির পর অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ভীমের হাতে কুরুক্ষেত্রে নিহত হন। (৩) বৈকুণ্ঠের দ্বারী ; দ্রঃ জয় ও বিজয়। (৪) বিরাধ রাক্ষসের পিতা জয় ; জয়ের স্ত্রী শতহ্রদা। এই বিরাধ দণ্ডক বনে রামের হাতে নিহত হন। (৪) মূল বা প্রথম মহাভারত।

জয় ও বিজয়—দুই ভাই। স্বর্গে বিষ্ণুর দ্বার রক্ষক। এক দিন সনকাদি ঋষিরা বিষ্ণু দর্শনে এলে এঁরা ঋষিদের উচিত মত সমাদর করে ভেতরে ঢুকতে দেন না। ফলে শাপগ্রস্ত হন পৃথিবীতে জন্মাতে হবে। তখন অনুনয় বিনয় করলে এঁরা বলেন বিষ্ণুকে মিত্রভাবে ভজনা করলে সাত জন্মে এবং শত্রুভাবে ভজনা করলে তিন জন্মে শাপ মুক্তি হবে ; এবং স্বর্গে ফিরে আসতে পারবে ; আশু মুক্তির আশায় এঁরা শত্রু ভাবেই জন্মাতে চান। সত্য যুগে জয় হিরণ্যাক্ষ, বিজয় হিরণ্যকশিপু, ত্রেতায় জয় রাবণ বিজয় কুম্ভকর্ণ এবং দ্বাপরে জয় শিশুপাল এবং বিজয় দন্তবক্র রূপে জন্মান। বিষ্ণুর হাতে নিহত হয়ে এঁরা স্বর্গে ফিরে যান।

জয়ৎসেন—(১) মগধের রাজা ; জরাসন্ধের ছেলে ; (২) অজ্ঞাতবাস কালে নকুলের নাম। (৩) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত।

জয়দুর্গা—দুর্গার একটি বঙ্গীয় লৌকিক রূপ। মাথায় চন্দ্রকলা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, প্রলয়ের মেঘের মত রঙ, সিংহস্কন্ধে আসীনা ; হাতে শঙ্খ, চক্র, কৃপাণ ও ত্রিশূল।

জয়দেব—গীতগোবিন্দ রচয়িতা। পিতা ভোজদেব মাতা বামাদেবী, স্ত্রী পদ্মাবতী। বীরভূমে অজয় নদীর তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্ম। অন্য মতে মিথিলা বা ওড়িশা বাসী। খৃ ১২-শতকের শেষে লক্ষ্মণ সেনের সভায় গোবর্দ্ধন, শরণ, ধোয়ী, উমাপতি, ও জয়দেব পঞ্চরত্ন বর্তমান ছিলেন। গীতগোবিন্দে এই নামগুলি আছে কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের নাম নাই। ঐ যুগের কোশকাব্য 'সদুক্তি কর্ণামৃতে' গীতগোবিন্দের ৫-টি শ্লোক ও জয়দেবের নামে আরো ২৬-টি শ্লোক আছে। প্রসন্নরাঘব, চন্দ্রালোক, ও রতিমঞ্জরীর রচয়িতা জয়দেব অপর ব্যক্তি।

জয়ৎবল—বিরাট রাজগৃহে সহদেবের ছদ্ম নাম।

জয়দ্রথ—সিন্ধুরাজ। হস্তী(১)-অজমীঢ়(২)-বৃহৎকায়/বৃত্রক্ষত্র(৫)-জয়দ্রথ(৬)। বহু ব্রত-উপবাস করে এই ছেলে হয়। ছেলের জন্মের সময় দৈববাণী হয় যুদ্ধে জয়দ্রথের মাথা কাটা যাবে। শুনে বৃদ্ধক্ষত্র অভিশাপ দেন তাঁর ছেলের মাথা যে মাটিতে ফেলবে তার মাথাও তখনই শতধা বিদীর্ণ হয়ে যাবে। অন্য মতে দৈববাণী হয় এর মাথা যে মাটিতে ফেলবে তার মাথাও শতধা হবে। অল্প বয়সে রাজা হন এবং দুঃশলার (দ্র) স্বামী। জয়দ্রথের ছেলে সুরথ। প্রথম থেকেই পাণ্ডবদেব সঙ্গে তীব্র শত্রুতা সুরু হয়: হয়তো স্বয়ংবরে পাঞ্চালীকে বিয়ে করতে না পারার জন্য এই শত্রুতা। আর এক বার বিয়ে করবার জন্য জয়দ্রথ যখন শাল্ব রাজ্যে যাচ্ছিলেন। তখন পাণ্ডবরা কাম্যক বনে ছিলেন। আশ্রমে দ্রৌপদী সে সময় একা আছেন জানতে পেরে প্রথমে ত্রিগর্ত রাজ কোটিকাশ্য-কে দূত হিসাবে পাঠান, পাঞ্চালীকে বোঝাতে। মহা ৩।২৪৮।১২। কিন্তু পাঞ্চালী একে তাড়িয়ে দিলে জয়দ্রথ এসে বোঝাতে চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত জোর করে রথে তুলে নিয়ে পালিয়ে যেতে যান। ইতি মধ্যে পাণ্ডবরা মৃগয়া থেকে ফিরে এসে দ্রৌপদীর ধাত্রীকন্যার (ধাত্রেয়িকা; মহা ৩।২৫৩।১০) কাছে সব শুনে জয়দ্রথের অনুসরণ করেন। জয়দ্রথের সৈন্যেরা হেরে গেলে দ্রৌপদীকে রথ থেকে জয়দ্রথ পালাতে চেষ্টা করেন। ভীম ও অর্জুন ধরে ফেলেন। ভীম হত্যা করতে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত এঁর মাথায় জায়গায় জায়গায় কামিয়ে পাঁচচুড়া করে দিয়ে এবং নিজেকে সর্বত্র পাণ্ডবদের দাস বলে পরিচয় দেবার নির্দেশ দিয়ে এবং নানা ভাবে লাঞ্ছিত করে ছেড়ে দেন। দুঃশলার স্বামী বলে হত্যা করেন নি। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে করদ রাজা হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন এবং পাণ্ডবদের পাশা খেলায়ও উপস্থিত ছিলেন।

দ্রৌপদীকে চুরি করতে গিয়ে অপমানিত হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য মহাদেবের তপস্যা করে অর্জুন ভিন্ন সমস্ত পাণ্ডবদের অন্তত এক দিনের জন্য হারাবেন বর পান। কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যু বধের চক্রব্যূহের দরজায় পাহারা ছিলেন; অর্জুন তখন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। এইখানে জয়দ্রথ চারজন পাণ্ডবকেই পরাজিত করেন। এই দিন সন্ধ্যাবেলা যুদ্ধের শেষে অর্জুন খবর পান অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুকে হত্যা করা হয়েছে; অর্জুন তখন প্রতিজ্ঞা করেন পর দিন সূর্যাস্তের আগেই জয়দ্রথকে তিনি বধ করবেন; নয়তো আগুনে আত্মহত্যা করবেন। প্রতিজ্ঞা শুনে জয়দ্রথ বাড়ি পালিয়ে যাচ্ছিলেন; কিন্তু দ্রোণ দুর্যোধন ইত্যাদি তাঁকে আশ্বস্ত করেন। পর দিন দ্রোণ শকটব্যূহ তৈরি করেন। শকট ব্যূহের পেছনে গর্তব্যূহ এবং গর্তব্যূহের

মধ্যে সূচীব্যূহ এবং সূচীব্যূহের মধ্যে বহু সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে জয়দ্রথ অবস্থান করেন। যুদ্ধ করতে করতে বিকেল হয়ে আসে। কৃষ্ণ তখন যোগবলে সূর্য ঢেকে ফেলে অকাল সন্ধ্যা সৃষ্টি করেন। অর্জুন আত্মহত্যা করবেন এই আনন্দে কৌরবরা ব্যূহ ছেড়ে দিয়ে অর্জুনকে দেখতে আসেন। সুযোগ পেয়ে অর্জুনও শরাঘাতে জয়দ্রথের মাথা কেটে ফেলেন। কৃষ্ণ ঠিক এর আগের মুহূর্তে আকাশে সূর্যকে প্রকাশিত করে দেন।

কৃষ্ণ স্মরণ করিয়ে দেন জয়দ্রথের কাটা মাথা যেন মাটিতে না পড়ে। এই জন্য অর্জুন আরো কয়েকটি বাণে কাটা মাথা উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সমন্তপঞ্চক দেশের বাইরে (সমন্ত পঞ্চকাৎ অস্মাৎ বহিঃ মহা ৭।১২১।২৪) আর একমতে সমন্তপঞ্চক বনে বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে নিয়ে গিয়ে ফেলেন। বৃদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যা বন্দনা করছিলেন ; চমকে উঠে দাঁড়াতে কাটা মাথা মাটিতে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধক্ষত্রের মাথাও শতধা হয়ে যায়।

জয়ধ্বজ—কার্তবীর্যার্জুনের এক শত ছেলের মধ্যে একটি ; তালজঙ্ঘের পিতা।

জয়সেন—(১) বিরাট ভবনে অজ্ঞাতবাস কালে নকুলের গুপ্ত নাম ; দ্রঃ জয়ৎসেন। (২) অবন্তীরাজ ; স্ত্রী রাজাধি দেবী ; ছেলে বিন্দানুবিন্দ ; মেয়ে মিত্রবিন্দা কৃষ্ণের স্ত্রী।

জয়া—(১) অন্ধক অসুরের রক্ত পান করার জন্য মহাদেব যে মাতৃকাদের সৃষ্টি করেন তাঁদের এক জন। (২) চতুঃষষ্টি যোগিনীর এক জন। (৩) লক্ষ্মীর এক জন সহচরী। (৪) গৌতমের স্ত্রী অহল্যার চার মেয়ে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা। এঁরা সকলেই মহাদেবের স্ত্রী ; সতীর সহচরী। এই জয়ার কাছে পার্বতী দক্ষযজ্ঞের খবর পান। (৫) পার্বতীর আর এক সহচরী ; প্রজাপতি কৃশাশ্বের মেয়ে। (৬) দক্ষের দুই মেয়ে জয়া ও সুপ্রভা ; এঁদের প্রত্যেকের পঞ্চাশটি করে ছেলে।

জয়ন্ত—ইন্দ্র ও শচীর ছেলে। রাবণ স্বর্গ আক্রমণ করলে জয়ন্ত রাক্ষস সেনাদের পরাজিত করেন। কিন্তু মেঘনাদের মায়া যুদ্ধে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। জয়ন্তের মাতামহ পুলোমা এই সময় সকলের অজ্ঞাতে জয়ন্তকে পাতালে নিয়ে গিয়ে রক্ষা করেন। পারিজাত হরণের সময় জয়ন্ত প্রদ্যুম্নের হাতে পরাজিত হন। দ্রঃ অগস্ত্য। (২) অযোধ্যার রাজা দশরথের মন্ত্রী। (৩) বিরাট ভবনে ভীমের ছদ্ম নাম। (৪) এক জন আদিত্য। (৫) এক জন রুদ্র। (৬) রামচন্দ্র যখন চিত্রকূটে বাস করছিলেন তখন এক দিন ক্লান্ত হয়ে সীতার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন এই সুযোগে কাকের বেশ ধরে জয়ন্ত এসে সীতার স্তনে আঁচড়ে নেয়। সীতা চিৎকার করে উঠলে রামচন্দ্র উঠে পড়েন এবং ব্রহ্মাস্ত্র বাণ সন্ধান করেন। কাকরূপী জয়ন্ত পালাতে চেষ্টা করে ত্রিভুবনে কোথাও আশ্রয় পান না এবং শেষ পর্যন্ত রামের কাছে এসে আশ্রয় চান। কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র বৃথা যায় না ; জয়ন্তের ডান চক্ষু নষ্ট করে দেয়। দ্রঃ একাক্ষ।

জয়ন্তী—ইন্দ্রের মেয়ে ; জয়ন্তের বোন। দৈত্যরা এক বার দেবতাদের কাছে হেরে গেলে গুরু শুক্রাচার্য দৈত্যদের জন্য নতুন শক্তি সংগ্রহের চেষ্টায় কৈলাসে শিবের আরাধনা করতে থাকেন। এই সময় ইন্দ্র নিজের মেয়েকে পাঠান শুক্রের সেবা করার ছলে তপস্যা নষ্ট করতে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জয়ন্তী রাজি হন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে অনুগত শিষ্যা হিসাবে সেবা করতে থাকেন। কোন বাধা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন

নি। আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব এসে বর দিলে তারপর জয়ন্তীর অনুরোধে দশ বছর জয়ন্তীকে শুক্র স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন। জয়ন্তীর মেয়ে হয় দেবযানী। দ্রঃ ঋষভদেব।

জয়াশ্ব—(১) দ্রুপদের এক ছেলে; অশ্বত্থামার হাতে নিহত। (২) বিরাটের এক ভাই।

জরৎকারু—ভৃগু বংশে এক মুনি। জরা যাঁর কারু (=দারুণ); কঠোর তপস্যায় দেহ জরাগ্রস্ত হয়েছিল বলে এই নাম। অন্য মতে ব্রহ্মার বংশে যাযাবর নামে ঋষির একটি মাত্র ছেলে। ইনি ব্রহ্মচারী, মহাতপা ও পরিব্রাজক। বায়ু মাত্র ভক্ষণ করে তপস্যা করতেন। ঘুরতে ঘুরতে এক দিন কতকগুলি লোককে গাছের ডাল থেকে/ ঘাসের পাতা থেকে মাথা নীচের দিকে করে ঝুলতে দেখেন; এবং এই ঘাসের মূল ইঁদুরে কাটছে; এঁরা নরকে গিয়ে পড়বেন। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন এঁরা তাঁর পিতৃপুরুষ; বংশ লোপের সূচনায় এই অবস্থায় ঝুলছেন। জরুৎকারুকে এঁরা বিয়ে করতে বলেন। জরুৎকারু বাধ্য হন। কিন্তু সর্ত থাকে সম-নামা মেয়ে চাই; স্বেচ্ছায় মেয়ের আত্মীয়েরা বিয়ে দেবেন এবং স্ত্রীকে তিনি ভিক্ষা হিসাবে নেবেন। এর পর মুনি বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় উচ্চৈঃস্বরে তিন বার কন্যা ভিক্ষা চান। বাসুকি এই কথা শুনে এবং সব ঘটনাটা জানতে পেরে নিজের বোনকে (দ্রঃ জরৎকারু স্ত্রী) দান করেন। বিয়ের সময় স্থির হয় স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামী নেবেন না এবং স্ত্রী কোন অন্যায় করলে তিনি স্ত্রীকে ত্যাগ করবেন। দু জনে তার পর বহু দিন পুষ্করতীর্থে এক সঙ্গে জীবন কাটান।

মুনি এক দিন স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছেন। এমন সময় সন্ধ্যা হয়ে যায় দেখে সান্ধ্যকৃত্যের জন্য কি করবেন বুঝে উঠতে না পেরে স্বামীকে ডেকে তোলেন। মুনি রেগে যান; তিনি ঘুমিয়ে থাকলে সূর্যের অস্ত যাবার কোন ক্ষমতাই নেই। এই অপরাধের জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যান; কোন অনুনয়ে কাণ দেন না। স্ত্রী এই সময় গর্ভবতী ছিলেন; জরৎকারু তাঁর পেটে তিন বার হাত রেখে বলেন অস্তি; ফলে নাম হয় আস্তিক। অন্য মতে স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন না; এই বিপদে ব্রহ্মাকে অন্য মতে পিতা কশ্যপ ও ইষ্ট গুরু মহাদেবকে স্মরণ করলে তাঁরা এসে মুনিকে বোঝান পুত্রোৎপাদন না করে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে নাই। স্বামী তখন স্ত্রীর নাভিদেশ স্পর্শ করেন; গর্ভে এক তেজস্বী ও তপস্বী পুত্রের সঞ্চার হয়।

জরৎকারু(স্ত্রী)—কশ্যপের মেয়ে, বাসুকির বোন, জরৎকারু মুনির স্ত্রী, আস্তিকের মা; সাপে কামড়ে বহু মৃত্যু হচ্ছিল। সকলে তখন কশ্যপের কাছে প্রতিকার চাইলে কশ্যপ ব্রহ্মার কাছে যান এবং ব্রহ্মার উপদেশে কশ্যপ সর্প বিষের মন্ত্র সৃষ্টি করেন এবং কশ্যপের মন থেকে এই সব মন্ত্রের দেবীর জন্ম হয়। কশ্যপের মন থেকে জন্ম ফলে নাম মনসা। অন্য মতে কৃষ্ণকে ইনি মনে করে রেখেছিলেন বলে নাম মনসা। আর এক মতে শিব বীর্যে পদ্ম বনে জন্ম; ফলে নাম পদ্মা। অত্যন্ত শান্ত ও সুন্দর দেখতে এবং সকলের পূজিত বলে নাম জগৎগৌরী। কুমারী অবস্থায় কৈলাসে মহাদেবের তপস্যা করে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। মহাদেব এঁকে সামবেদ শিক্ষা দেন, অষ্টাক্ষরী কৃষ্ণ মন্ত্র এবং ত্রৈলোক্যমঙ্গল নামে কৃষ্ণ কবচ দান করেন। এই কবচ ধারণ করে পুষ্করে ইনি তিন যুগ ধরে তপস্যা করেন; কৃষ্ণ তারপর দেখা দিয়ে

এঁকে প্রার্থিত বর দেন এবং এঁর দেহ ও পরিধেয় জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল বলে কৃষ্ণ নাম দেন জরৎকারু। কদ্রুর বড় ছেলে বাসুকি মায়ের শাপ থেকে বাঁচবার কথা যখন ভাবছিলেন তখন এলাপত্র নামে এক নাগ জানান কদ্রু যখন শাপ দিয়েছিলেন তখন ব্রহ্মা দেবতাদের বলেছিলেন জরৎকারুর গর্ভে মুনি জরৎকারুর ঔরসে আস্তিক জন্মে সাপেদের সর্পযজ্ঞে রক্ষা করবেন। এলাপত্রের কথা শুনে বাসুকি বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। আস্তিকের জন্ম হলে মনসাদেবী কৈলাসে হরপার্বতীর কাছে চলে যান। অপর নাম বিষহরি। মনসা দেবীর মন্ত্রে সিদ্ধ হলে সাধক ধন্বন্তরীর সমান হয়ে দাঁড়ান; বিষ তাঁর কাছে অমৃত হয়ে দাঁড়ায়।

জরথুশ্‌ত্র—বা-ষ্‌ত্র। ইরানে এক তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ; খৃ-পূ ১০০০ মত। ইরানে আর্যধর্ম সংস্কারকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। নিজের রচিত গাথা সমূহ মাধ্যমে একেশ্বর বাদ প্রচার করেন। গাথার ভাষা উপনিষদের ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত। পশ্চিম ইরানের মিডিয়া বা 'মদ' নামক প্রদেশে জন্ম। শৈশবে গোত্রনাম ছিল স্পিতম (=সং, শ্বিতম বা শ্বেত)। পিতা রাজবংশ জাত ছিলেন এবং পুরোহিত গোষ্ঠীতে যোগদান করেন। পিতার নাম পৌরুষস্‌প (= সং, পুরু+অশ্ব), মায়ের নাম 'দুঘ্‌দ্‌হেবা (=দুগ্ধবতী গাভী); স্ত্রী হেবা স্বো = গবী। জরথুশ্‌ত্র (সং, জরৎ উষ্ট্র) বুড়ো উট। জরথুশ্‌ত্র নামের অন্য ব্যাখ্যা স্বর্ণময় উষার কিরণ অর্থাৎ যিনি প্রদীপ্ত জ্ঞান লাভ করেছেন। মনে হয় এই পরিবার কৃষিকর্মে নিযুক্ত ছিল এবং প্রচুর গবাদি পশু ছিল।

পনের বছর বয়সে উশিদারায়ণ পাহাড়ে তপস্যা করতে যান। এখানে ত্রিশ বছর মত বয়সে পরমেশ্বর অহুর মজদা (= অসুর মেধস্‌) তাঁকে দেখা দেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করতে গিয়ে দীর্ঘ দিন তাঁকে নির্যাতন ভোগ করতে হয়। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে পূর্ব ইরানের বাক্‌ট্রিয়া বা বাহ্লীক প্রদেশে পালিয়ে কবি বিষ্‌তাস্‌প (বিষ্টাশ্ব) নামে রাজা ও তাঁর রাণী হুতোষার কাছে আসেন। এখন থেকে পঁয়ত্রিশ বছর ধর্ম প্রচার করেন এবং সাতাত্তর বছর বয়সে তুরব্রাতুর নামে এক জন তুরানি ধর্মান্ধ ব্যক্তির হাতে বাল্‌খ্‌ বা বাহ্লীকের অগ্নি মন্দিরে নিহত হন। জরথুশ্‌ত্র-এর তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। তাঁর বড় ছেলে মগ; জরথুশ্‌ত্রীয় পুরোহিত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এই মগ শব্দই লাতিনে মাগুস, বহুবচনে মাগি—প্রাচ্যের জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থে প্রযুক্ত। খৃষ্ট জন্মের ২-১ শতকের মধ্যে এই মগরা ভারতে আসেন এবং মগব্রাহ্মণ বা শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ নামে জোতিবিদ হিসাবে হিন্দু সমাজে গৃহীত হন। এই মগরা ইরানের সমাজে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের অনুরূপ কাজ করতেন।

জরথুশ্‌ত্র ধর্ম—জরথুশ্‌ত্রের প্রবর্তিত ধর্ম। অহুর মজদা (=অসুর মেধস্‌ = শক্তিময় বা জ্ঞানময় ঈশ্বর) নামে এক পরমেশ্বরে বিশ্বাস রূপ একেশ্বর বাদ। ইন্দো-ইরানীয় আর্যেরা সূর্য, চন্দ্র, জল, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি বহু কিছুকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতেন। ক্রমশ এই ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে বলিদান এবং নানা কুসংস্কার ও অত্যাচার জমতে থাকে এবং এই সবের মাধ্যমে পুরোহিতরা এবং কবি নামে শাসকবর্গ লাভবান হতে থাকেন। এই সময়ে গোধনের রক্ষক রূপে, সমাজের সংস্কারক রূপে এবং কবিদের নেতা ও শিক্ষা গুরু রূপে জরথুশ্‌ত্র জন্মান। জরথুশ্‌ত্র বললেন বিশ্ব জগতের সব

কিছু ঈশ্বরের নিয়ম 'অর্ত' (প্রাচীন পারসিক) অনুযায়ী। এই অর্ত আর সংস্কৃত ঋত এক জিনিস। অবেস্তার ভাষায় অর্ত = অষ। ঈশ্বর মানুষকে চিন্তা শক্তি দিয়েছেন। এই শক্তিতে মানুষকে স্পেন্ত মইন্যু (শুদ্ধ শক্তি) ও অঙ্গ্র মইন্যু (অসৎ শক্তি) এই দুটির যে কোন একটিকে বেছে নিয়ে চলতে হয়। সৎ মানুষের ছটি আদর্শ অবলম্বন করা উচিত: (১) বোহুমনো = সংস্কৃতে বসুমনস্ বা শ্রেষ্ঠ মনন; (২) অষ = ঋত; (৩) খ্ষত্র = ক্ষত্র = দৈবশক্তি; (৪) আরমইতি = ভক্তি; (৫) হউর্বতাৎ = সর্বতাৎ অর্থাৎ পরিপূর্ণতা; (৬) অমেরেতাৎ = অমৃতাৎ বা অমৃতত্ব। মানুষের তিনটি নীতি হুমত (= সুমত); হুখ্ত (= সুউক্ত); ও হ্বর্স্ত (= সুবৃত্ত) অর্থাৎ শুভমনস্, শুভ বচন, ও শুভ কর্ম করা উচিত।

জীবন শেষে মানুষ উর্বন (= নির্বাণ) বা আত্মা সুবিচার লাভ করে পইরিদএজ (= প্যারাডাইজ) স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। প্রতি যুগের শেষে ফ্রষোকেরেতি বা আত্মার পুনর্জীবন লাভ ঘটে। পরবর্তী যুগে আবার এক জন সওষ্যন্ত (সংসন্ত ?) = ত্রাণ কর্তার আবির্ভাব হবে। এই নতুন মতবাদ যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম হয় 'মজদা-য়সনান্'; আর যাঁরা পুরাতন পথে রয়ে গেলেন তাঁদের নাম হল দএব য়সনান্ (= দেব যজমান)। নতুন মতবাদে মূর্তিপূজা, বলি বা কর্মবাদ কিছুই থাকল না। জরথুশ্ত্রের এই স্বর্গ ও নরক কল্পনা পরে ক্রমে ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মে গিয়ে পৌছয়। গাথায় আছে মৃত্যুর পর মানব আত্মাকে 'চিন্বৎ পেরেতু' নামে সেতুর ওপর দিয়ে ঈশ্বরের কাছে বিচারের জন্য এগিয়ে যেতে হয়। ইসলামের পুল্-সিরাত এই জরথুশ্ত্রীয় সেতু।

জরথুশ্ত্রের পর তাঁর ছেলে প্রধান আথ্রবান (আথর্বান) ধর্মনেতা ও পুরোহিত হন। প্রাচীন আর্য দেবদেবীর কোন উল্লেখ গাথাতে ছিল না। কিন্তু পুরোহিতরা পরে নানা কারণে প্রাচীন দেবদেবীদের য়জত (সংস্কৃত যজত) বা দেবদূত নামে আবার প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু মূর্তিপূজা ও বলিদান বাদই থেকে যায়। এই দেবদূতদের নাম মিথ্র (= মিত্র), বেরেথ্রঘ্ন (= বৃত্রঘ্ন), অর্তবহিশ্ত (= ঋত বশিষ্ঠ), অর্দ্বি-সুর, অনাহিত ইত্যাদি। জরথুশ্ত্র আতর (সং অথর্ = অথর্বান = অগ্নি) মন্দির স্থাপন করেন। গ্রীকরাজ আলেকজান্দার পারস্য জয়ের সময় ইরানের সুবিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলি ধ্বংস করেন। খৃ ৭-শতকে আরবীয় মুসলমান আক্রমণে এই ধর্ম, সংস্কৃতি মন্দির ইত্যাদি সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়। মগ পুরোহিতদের গ্রন্থাবলী ২১ নস্ক (= খণ্ড) নষ্ট হয়ে মাত্র দেড় খণ্ডে পরিণত হয়। এই সময় জরথুশ্ত্র বাদীরা ভারতে পালিয়ে এসে সন্-জান্-এর হিন্দু রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এঁরাই পার্সি।

জরা—একজন ব্যাধ; কৃষ্ণকে (দ্র) হত্যা করেছিল।

জরা—এক জন রাক্ষসী। মানুষকে ভালবাসেন। প্রতি বাড়িতে ঘুরে বেড়াতেন বলে ব্রহ্মা এঁকে গৃহদেবী নাম দিয়েছিলেন। বিশ্বাস ও ভক্তিভরে এঁকে ঘরের দেওয়ালে এঁকে রাখলে শ্রীবৃদ্ধি হয়। ইনিই ষষ্ঠী। জরাসন্ধের জন্মের পর ফেলে দেওয়া দু টুকরো দেহ জুড়ে দিয়ে জরাসন্ধকে (দ্রঃ) জীবিত করেন।

জরাসন্ধ—চন্দ্রবংশীয় মগধরাজ বৃহদ্রথের ছেলে। রাজার প্রাসাদে জরা (দ্র) রাক্ষসীর

কালনেমির মেয়ে বৃন্দার (দ্র) সঙ্গে জলন্ধরের বিয়ে হয়েছিল। একটি কাহিনীতে আছে দেবতারা জলন্ধরের অত্যাচারে শিবের স্মরণ নিলে শিব দেবতাদের স্বর্গে স্থাপন করে জলন্ধরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। বৃন্দা স্বামীর প্রাণ রক্ষার জন্য এ দিকে বিষ্ণুর পূজা করতে থাকেন। বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধরে প্রাসাদে ফিরে এলে অক্ষত দেহ স্বামীকে দেখে বৃন্দা আনন্দে উঠে পড়েন। একটি মতে জলন্ধর বেশী বিষ্ণু বৃন্দর সতীত্ব নাশ করেন। কারণ ছিল বৃন্দার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকলে জলন্ধরের মৃত্যু হবে না। অন্য মতে বৃন্দাকে প্রাসাদে না পেয়ে খবরটা যুদ্ধ ক্ষেত্রে শুম্ভকে জানালে জলন্ধরও সংবাদ পান এবং আবার যুদ্ধে এসে যোগ দিয়ে মারা যান।

জলসন্ধি—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে নিহত। (২) কৌরব পক্ষে এক যোদ্ধা; সাত্যকির হাতে নিহত।

জলেপু—পুরুর ছেলে রুদ্রাশ্ব। রুদ্রাশ্বের ঔরসে মিশ্রকেশীর গর্ভে জলেপু জন্মান।

জহ্নু—এক জন রাজর্ষি। উর্বশীর গর্ভে পুরূরবার সাত ছেলের মধ্যে একজন অমাবসু। অমাবসু > ভীম > কাঞ্চনপ্রভ > সুহোত্র। সুহোত্র + কেশিনী > জহ্নু। আর এক মতে দুষ্মন্ত(১) > ভরত(২) > বৃহৎপুত্র(৪) > অজমীঢ়(৫)। অজমীঢ়ের স্ত্রী ধূমিনী, নীলী ও কেশিনী। কেশিনীর ছেলে জহ্নু (মহা ১৷৮৯৷২৮)। যুবনাশ্বের মেয়ে কাবেরীর সঙ্গে জহ্নুর বিয়ে হয়; ছেলে সুনহ। আর এক মতে জহ্নু ছেলে বলাকাশ্বকে রাজ্য দান করেন। সর্বমেধ যজ্ঞ করে জহ্নু বিখ্যাত হয়েছিলেন। গঙ্গা এঁকে পতিরূপে পাবার জন্য এলে প্রত্যাখ্যাত হন এবং তখন এঁর যজ্ঞস্থল ভাসিয়ে দেন। রাজা রেগে গিয়ে গণ্ডূষে গঙ্গাকে খেয়ে ফেলেন। সেই থেকে মহর্ষিরা গঙ্গাকে জহ্নুর মেয়ে বলে স্বীকার করেন; নাম হয় জাহ্নবী। অন্য মতে ভগীরথ (দ্রঃ) গঙ্গাকে নিয়ে যখন এগিয়ে চলেছিলেন তখন গঙ্গা জহ্নুর যজ্ঞস্থল ভাসিয়ে দেন ইত্যাদি। তার পর ভগীরথ ইত্যাদির স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে কাণ দিয়ে অন্য মতে জানু থেকে বার করে দেন; ফলে নাম হয় জাহ্নবী।

জাজলি—এক জন ঋষি। অথর্ববেদ বেত্তা পথ্যের শিষ্য। কঠোর তপস্যা করতেন। শৈশব থেকে রৌদ্র বৃষ্টি সব উপেক্ষা করতে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। এক বার বনের মধ্যে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করছিলেন দুটি পাখী এসে মাথাতে বাসা বাঁধে। এরা তার পর ডিম পাড়ে, বাচ্ছা হয় এবং বাচ্ছাগুলি বড় হয়ে আসা যাওয়া করতে থাকে। এর পর এক দিন এরা সব পাখী উড়ে যায়; ৬ দিন পরে আবার ফিরে আসে; জাজলি কিন্তু চুপ করে এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর পর পাখীগুলি আবার চলে যায় এবং এক মাস পরেও আর ফেরে না। জাজলি তখন সমুদ্রে গিয়ে ডুব দিয়ে স্নান করেন এবং মনে মনে গর্বের সঙ্গে ভাবতে থাকেন তাঁর মত ধার্মিক আর কেউ নেই। কিন্তু জল থেকে এক দৈত্য তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে দৈববাণী করে জানান (অন্য মতে তপস্যায় ত্রিভুবন ভ্রমণ করার ক্ষমতা পেয়ে গর্বিত হয়ে উঠলে অন্তরীক্ষবাসী রাক্ষসরা তাঁর মনোভাব জানতে পেরে গর্ব করতে বারণ করেন এবং বলেন) বারাণসীতে বণিক তুলাধর তার থেকে অনেক বেশি ধার্মিক। জাজলি তখন এঁর কাছে এসে নানা উপদেশ গ্রহণ করেন।

জাঠ—ধৈর্য, শ্রম ও অসীম বীরত্ব ইত্যাদির জন্য বিখ্যাত জাতি। নিজেদের এরা

যাদব বলে দাবি করেন। আফগানিস্তান থেকে মালব পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাতে ছড়িয়ে আছেন। সাধারণ কৃষিজীবী।

জা:ক—পালি ভাষাতে সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের দশম গ্রন্থ এবং প্রাচীন নবাঙ্গ বিভ:গের একটি অঙ্গ। জাতক অর্থে বৌদ্ধ সাহিত্যে গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্ম বৃত্তান্ত। জাতকের কাহিনী গুলিতে বুদ্ধ অবশ্য সব সময় নায়ক নন; অনেক কাহিনীতে গে ণ চরিত্র হিসাবেও দেখান হয়েছে। বৌদ্ধদের বিশ্বাস কোটিকল্প কাল বোধিসত্ত্ব রূপে বার বার জন্মের মধ্য দিযে দানশীলাদি দশপারমিতার পরাকাষ্ঠা লাভ করে এবং শেষে পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করে বুদ্ধত্ব পাওয়া যায়।

জাতকত্থবণ্ণনা অনেকের মতে বুদ্ধ ঘোষের রচনা। কাহিনীগুলি দীঘ-মজ্ঝিম সংযুত্তাদি নিকায় গ্রন্থে ও বিনয়পিটকে মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গ ইত্যাদি অংশে ছড়ান রয়েছে। কাহিনীগুলির কিছু কাহিনী বোধিসত্ত্ব হীন; আবার কিছু কাহিনীতে নায়ককে বোধিসত্ত্ব বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই কাহিনীগুলি থেকে নির্বাচিত সংকলন হচ্ছে জাতকত্থবণ্ণনা। অনেকের মতে পিটকভুক্ত খুদ্দ-নিকায়ের যে অংশ জাতক নামে অভিহিত তাতে কেবল গাথাই সংকলিত রয়েছে। পরে এই গাথাগুলিকে স্পষ্ট করবার জন্য গাথার বিষয় বস্তুকে সম্প্রসারিত করে গল্প-গুলি রচিত হয়েছে এবং এই গল্প সংগ্রহ হচ্ছে জাতকত্থবণ্ণনা। ভগবান বুদ্ধ নিজে কিছু কাহিনী রচনা করেছিলেন; তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যরা কিছু রচনা করেছিলেন। ধর্ম প্রচারের জন্য এই ভাবে জাতক সমৃদ্ধ ও পরিমার্জিত হতে থাকে। চুল্লনিদ্দেশ নামক গ্রন্থে জাতকের সংখ্যা বলা হয়েছে ৫০০; ফা-হিয়েনের মতে ৫০০; ফৌসবোলের জাতক গ্রন্থে ৫৪৭ কাহিনী আছে; বুদ্ধ ঘোষ এদের সংখ্যা বলেছিলেন ৫৫০। খৃষ্ট জন্মের ২ বা ৩ শতক পূর্বে অনেকগুলি জাতক কাহিনী প্রচলিত ছিল। ভারহুত ও সাঁচী স্তূপ প্রাচীরের গায়ে কিছু কাহিনীর শিলা চিত্র দেখা যায়।

প্রতিটি জাতকে কযেকটি ভাগ দেখা যায়। প্রথম ভাগের নাম প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বা বর্তমান কাহিনী অর্থাৎ কোথায় কোন প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব কাহিনীটি বর্ণনা করে ছিলেন। দ্বিতীয় ভাগের নাম অতীত বস্তু এই অংশ বুদ্ধের অতীত জন্মের কাহিনী। কোন কোন প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ও অতীত বস্তুর সঙ্গে কিছু পদ্যাংশ আছে; এগুলির নাম গাথা। প্রত্যুপন্ন বস্তুর টীকা সমন্বিত গাথা অংশের নাম বেয্যাকরণ বা ব্যাকরণ। প্রতিটি জাতকের শেষে উপসংহার অংশটির নাম সমোধান অর্থাৎ সমবধান। এই সমবধান অংশে প্রত্যুৎপন্ন বস্তুর পাত্রদের সঙ্গে অতীত বস্তুর পাত্রদের অনন্যতা দেখান হয়েছে। অতীত বস্তুর বহু কাহিনীর আরম্ভ হয়েছে 'অতীতকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তের রাজত্ব কালে এই উক্তিটি দিয়ে। এই উক্তির বিশেষ কোন অর্থ আছে মনে হয় না। ব্রহ্মদত্ত শব্দটি কাশী রাজদের গোত্র নাম বলে মনে হয়।

জাতকত্থবণ্ণনা গ্রন্থের মুখবন্ধ অংশের নাম 'নিদান কথা'। এটির তিনটি অংশ; দূরে নিদান, অবিদূরে নিদান, এবং সন্তিকে নিদান। দূরে নিদান অংশে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় বুদ্ধদেবের সুমেধ ব্রাহ্মণ রূপে জন্ম থেকে তুষিত স্বর্গে উৎপত্তি পর্যন্ত বিস্তৃত বিবরণ। অবিদূরে নিদান অংশে তুষিত স্বর্গ থেকে পতিত হয়ে সিদ্ধার্থ রূপে জন্ম ও বোধিত্ব পাওয়া পর্যন্ত ঘটনা। সন্তিকে নিদান অংশে বুদ্ধদেবের জীবনের

পরবর্তী ঘটনাগুলি সঞ্চিত রয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্ম জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এই জাতক। সাহিত্য শিল্প ও ঐতিহাসিক উপাদানে জাতক কাহিনীগুলি সমৃদ্ধ।

জাতি—(১) বিভিন্ন ব্যক্তিতে বা দ্রব্যে বিদ্যমান অনুগত ধর্মকে জাতি বলা হয়। বৈশেষিক দর্শনে সাতটি পদার্থের একটি। জাতি একটি নিত্য পদার্থ; বহুর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ভাবে বর্তমান একটি ধর্ম। ভাট্ট ও প্রাভাকর মীমাংসকরা জাতি স্বীকার করেন কিন্তু জাতি ও ব্যক্তিকে ভিন্ন পদার্থ বলে মানেন না। মীমাংসকদের মতে জাতি ব্যক্তি থেকে ভিন্নও বটে আবার অভিন্নও বটে। প্রাভাকরদের মতে ব্যক্তির উৎপত্তির সঙ্গে জাতি ও ব্যক্তি সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়। বৌদ্ধ দার্শনিকরা জাতি মানেন না। সামাজিক ব্যবস্থায় জাতি বর্ণের অন্তর্গত বিভাগ।

(২) রাগসঙ্গীতে যখন স্বরগ্রামে সাতটি স্বরের প্রয়োগ হয় তখন তাকে 'সম্পূর্ণ' বলা হয়; ছয়টি স্বরের প্রয়োগ হলে ষাড়ব এবং পাঁচটি স্বরের প্রয়োগ হলে তাকে ঔড়ব বলা হয়। রাগসঙ্গীতে ঔড়ব থেকে কম স্বর ব্যবহার হয় না। স্বরের আরোহন ও অবরোহন ক্রম অনুসারে রাগ সঙ্গীতের জাতি সংখ্যা নয়টি :-সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ-ষড়ব, সম্পূর্ণ-ঔড়ব, ষাড়ব-সম্পূর্ণ, ষাড়ব-ষাড়ব, ষাড়ব-ঔড়ব, ঔড়ব-সম্পূর্ণ, ঔড়ব-ষাড়ব, ঔড়ব-ঔড়ব। রাগ সঙ্গীতের আগে প্রাচীন ভারতে জাতি গানই প্রচলিত ছিল। পরে জাতির লক্ষণগুলি রাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মতঙ্গের মতে শ্রুতি, স্বর ও গ্রাম সমূহ থেকে যে গীতরূপ তার নাম জাতি। শুদ্ধ জাতি সাত :-ষাড়বী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী ধৈবতী, নৈষাদী। এছাড়াও ১১টি বিকৃত জাতি ছিল ষড়্জ-কৈশিকী, ষড়্জোদীচ্যবা, ষড়জমধ্যমা, গান্ধারোদীচ্যবা, রক্তগান্ধারী, কৈশিকী, মধ্যমোদীচ্যবা, কার্মারবী, গান্ধারপঞ্চমী, আন্ধ্রী, ও নন্দয়ন্তী। জাতির প্রধান লক্ষণ দশটি :—গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ্র, ন্যাস, অপন্যাস, সংন্যাস, বিন্যাস, বহুত্ব, অল্পত্ব।

জাতিব্যবস্থা—হিন্দুর সমাজে বর্ণ সংখ্যা চার; জাতি প্রায় তিন হাজারেরও বেশি; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এগুলি জাতি নয়; বর্ণ। সত্ব, রজো, তমো গুণের কম বেশি হিসাবে চারটি বর্ণের জন্ম। বেদের ব্রাহ্মণাংশের রচনা খৃ-পূ ৫-শতকে শেষ হয়। ব্রাহ্মণাংশে জাতি চারটি; যজন যাজন বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও দাস বা দস্যু জাতি। এই দস্যুরা পরে শূদ্রে পরিণত হন। সে যুগে একই বর্ণের মধ্যে বিভিন্ন বৃত্তি প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন জাতির সঙ্গে পরিচিত হলেই এই জাতির গুণ ও কর্ম অনুসারে কোন না কোন বর্ণের মধ্যে একে স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই জাতির গুণ ও কর্ম যদি কোন বর্ণের সঙ্গে না মিলত তখন মিশ্র গুণ যুক্ত এই জাতিকে নিয়ে স্মৃতিকাররা বিব্রত হয়ে পড়তেন; এই জাতিকে সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন জটিল হয়ে উঠত।

বৈদিক যুগে বৃত্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা ছিল; যে কোন বর্ণের যে কোন বৃত্তি হতে পারত। স্মৃতির যুগে বৃত্তি থেকে জাতি হত। কোন জাতি কোন বর্ণের অন্তর্গত হবে স্মৃতিকাররা ঠিক করে দিতেন। পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্নব/পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ এই সকল দেশে জন্ম ক্ষত্রিয়েরা কর্ম

দোষে শূদ্রে পরিণত হয়েছেন এ কথাও তাঁরা বলে গেছেন। ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণের ক্রিয়ালোপ হেতু তাদের বাহ্য জাতি বলা হয়েছে ; এবং সাধুভাষী বা ম্লেচ্ছভাষী যাই হোক তাদের দস্যু জাতি বলা হত। অর্থাৎ বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিভিন্ন জাতি (বর্তমান অর্থে) এসে হিন্দু সমাজের চতুবর্ণকে শক্তিশালী ও বিরাট করে তুলেছিল। ভারতীয় অর্থে জাতি ছিল বৃত্তিগত ; নতুন কোন জীবিকার পথ পেলে চার বর্ণের লোকই এই জীবিকাতে যোগ দিয়ে নতুন বৃত্তিগত নতুন জাতি গড়ে তুলত। এবং এই নতুন জাতিকে চারটি বর্ণের মধ্যে যে কোন একটি বর্ণের মধ্যে ধরে নেওয়া হত।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি কয়েকটি বৃত্তিকে উত্তম ও কয়েকটি হেয় মনে করেছিল এবং সেই অনুসারে ঐ বৃত্তিগত জাতিকে উওম বা হেয় বলে স্বীকার করা হয়েছে।

জাতিস্মর—যে ব্যক্তি পরবর্তী এক বা একাধিক জন্ম স্মরণ করতে পারে। জন্মান্তর বাদের ওপর এই জাতিস্মরতার ভিত্তি। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এসিয়ায় এই মতবাদ চালু আছে। মহাভারতে জাতিস্মর নামে এক হ্রদের কথা আছে ; এখানে স্নান করলে জীব জাতিস্মর হত। সূর্যোদয়ের সময় সমাহিত চিত্তে অষ্টোত্তর শতবার সূর্য নাম পাঠ করলেও জাতিস্মর হওয়া যেত। গীতাতেও জাতিস্মরবাদ স্বীকৃত। হরিবংশে আছে কুরুক্ষেত্রের সাতজন ব্রাহ্মণ পথে গোহত্যা করে পাপ স্খালনের জন্য সেই মাংস পিতৃ-দেবদের উৎসর্গ করে খান। এর ফলে পর জন্মে এঁরা সাত জন জাতিস্মর ব্যাধ হয়ে জন্মান এবং পরের জন্মে এঁরা সাতটি জাতিস্মর হরিণ হয়ে জন্মান। দ্রঃ কৌশিক-৩।

মনুতে আছে বেদপাঠ, তপস্যা ইত্যাদির দ্বারাও জাতিস্মর হওয়া যায়। যোগসূত্রে আছে অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা পূর্বজন্মের জ্ঞান জন্মাতে পারে। পশু পক্ষীও জাতিস্মর হত। দ্রঃ জড় ভরত। অভিনবত্ব আনবার মোহেও লেখককুল বহু জায়গায় এই জাতিস্মরতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। বর্তমানেও এক দল লোক জাতিস্মরতাকে বিশ্বাস করেন এবং নানা পরীক্ষা করতে চেষ্টা করেন।

জানপদী—এক জন অপ্সরা। কৃপ (দ্র) ও কৃপীর মা।

জাবালা—দ্রঃ জবালা।

জাবালি—(১) জবালার (দ্র) ছেলে। অন্য নাম সত্যকাম। গৌতমের কাছে বিদ্যার্থী হয়ে এসে সরল মনে সত্য কথা বলে ছিলেন বলে নাম সত্যকাম। গৌতম সন্তুষ্ট চিত্তে বালককে ছাত্র রূপে স্বীকার করে নেন। কারণ ব্রাহ্মণ না হলে এ ভাবে সত্য কথা বলার সাহস নিশ্চয় থাকত না। ছান্দোগ্য উপনিষদের ঘটনা। গৌতম ৪০০ শীর্ণকায় গাভীর পরিচর্যা করতে দেন। সত্যকাম প্রতিশ্রুতি দেন ১০০০ হৃষ্টপুষ্ট গাভী করে এদের নিয়ে আসবেন। বনে গরু চরাতেন। বায়ু, সূর্য, অগ্নি, প্রাণ এঁকে জ্ঞান দান করেন। এর পর হাজার গাভী করে নিয়ে এলে সত্যকামের কাছে সব ঘটনা শুনে গৌতম এঁকে পরমাত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন। সত্যকামের প্রসিদ্ধ শিষ্য উপ-কোশল। ১২ বছর গুরুর পরিচর্যা করেন ও গুরুর অগ্নি রক্ষা করেন। তবু সত্যকাম উপকোশলকে জ্ঞান দান করেন না ; সত্যকামের স্ত্রী অনুরোধ করলেও চুপচাপ থাকেন। এর পর অগ্নি এসে উপকোশলকে আশ্বাস দেন। শেষ পর্যন্ত সত্যকাম এঁকে জ্ঞান দান করেন।

(২) বিশ্বামিত্রের ছেলে। অথর্ব বেদের ব্যাখ্যাতা। সারা জীবন বশিষ্ঠের

সঙ্গে জড়িত। শাস্ত্রজ্ঞ, এবং ব্যবহার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্রহ্মর্ষি। দশরথের এক উপদেষ্টা। বন থেকে রামকে ফিরিয়ে আনতে ভরতের সঙ্গে গিয়েছিলেন। রামকে বোঝাতে চেষ্টা করেন পিতামাতার প্রতি অন্ধ ভক্তি বা বৃথা ধর্ম পরায়ণ হয়ে বৃথা কষ্ট পাওয়া নিরর্থক। পরলোক ইত্যাদি নাই; রামচন্দ্রের উচিত ফিরে আসা। এতে রাম জাবালিকে নাস্তিক বলে ভৎর্সনা করলে জাবালি বোঝান যে প্রয়োজন বোধে তিনি নাস্তিক বা আস্তিক হয়ে থাকেন। (৩) ব্যাস সুমন্তকে অথর্ববেদ শেখান। সুমন্ত থেকে কবন্ধ এবং কবন্ধ অধীত অংশ দুভাগ করে দেবাদর্শ ও পথ্যকে দেন। দেবাদর্শের শিষ্য মগধ, ব্রহ্মবলি সৌৎকায়নি ও পিপ্পলাদ। পথ্যের শিষ্য জাবালি, কুমুদ ও সৌনক। (৪) এক জন মুনি। এঁর সন্তানরাও জাবালি নামে পরিচিত। ইনি এক বার বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে এক সুন্দর যুবককে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন দেখেন। বেশ কয়েক বছর পরে যুবকের ধ্যান ভাঙলে জাবালি এর কাছে জানতে পারেন কৃষ্ণের ধ্যানে এ বিভোর ছিল। জাবালির বাকি জীবন কৃষ্ণের আরাধনাতে কাটে। পর জীবনে চিত্রগন্ধা নামে গোপিকা হয়ে জন্মান। (৯) এক জন মুনি। কঠোর তপস্যাতে ভয় পেয়ে ইন্দ্র রম্ভাকে পাঠান। একটি মেয়ে হয়। রাজা চিত্রাঙ্গদ এই মেয়েকে নিয়ে পালান। ফলে জাবালির শাপে চিত্রাঙ্গদ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়।

জামদগ্ন্য—পরশুরামের অন্য নাম।

জাম্ববতী—জাম্ববানের মেয়ে। দ্রঃ স্যমন্তক/জাম্ববান। কৃষ্ণের স্ত্রী। কৃষ্ণের অন্যান্য স্ত্রীর সন্তান হয় কিন্তু জাম্ববতী নিঃসন্তান থাকেন। এবং শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। কৃষ্ণ তখন পর্বতে শৈব উপমন্যুর আশ্রমে গিয়ে উপমন্যুর কথা মত শিবের তপস্যা করতে থাকেন। ছ মাস তপস্যা করার পর মহাদেব এসে বর দেন কৃষ্ণের প্রতিটি স্ত্রীর দশটি করে ছেলে হবে। এই জন্য জাম্ববতীর প্রথম ছেলের নাম শাম্ব। অন্য ছেলে গুলি :- সুমিত্র, পুরুজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান দ্রবিণ ও কেতু ইত্যাদি। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর অর্জুনের সঙ্গে হস্তিনাপুরে এসে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আগুনে দেহ ত্যাগ করেন।

জাম্ববান—ব্রহ্মার ছেলে। বানর বা ঋক্ষ। দুর্দ্ধর্ষ বীর। রাবণের অত্যাচারে বিব্রত হয়ে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে এলে ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে আসেন। বিষ্ণু আশ্বাস দেন তিনি রাম হয়ে জন্মাবেন এবং ব্রহ্মাকে বানর সৈন্য সৃষ্টি করতে বলেন। ব্রহ্মা তখন অনেক ক্ষণ বসে বসে চিন্তা করতে থাকেন এবং তার পর হাই তোলেন এবং মুখের মধ্যে থেকে ঋক্ষ-জাম্ববান বার হয়ে আসেন। অন্য মতে মধুকৈটভ যখন ব্রহ্মাকে আক্রমণ করতে যান তখন ব্রহ্মার মাঝখানের মুখ দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে এবং এই ঘাম গড়িয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে এলে জাম্ববানের জন্ম হয়। ত্রেতাতে সুগ্রীবের মন্ত্রী ও সেনাপতি। সীতা অন্বেষণে লঙ্কাতে যাবার জন্য যখন কথা হচ্ছিল তখন সমবেত বানররা প্রত্যেকে নিজেদের অক্ষমতা জানান; হনুমান চুপ করে বসে ছিলেন। জাম্ববান তখন হনুমানকে অনুরোধ করেন এবং হনুমানের জীবন বৃত্তান্ত ও তাঁর ক্ষমতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হনুমানকে লঙ্কায় যেতে রাজি করেন। লঙ্কার যুদ্ধে রামের সঙ্গে ছিলেন। বামন অবতারে বামনকে এই জাম্ববান প্রদক্ষিণ করে ছিলেন। তখন যে ক্ষমতা ছিল রাম অবতারের সময় অবশ্য ক্ষমতা অনেক কমে

গিয়েছিল। এই জাম্ববানই স্যমন্তক (দ্রঃ) মণি সিংহের কাছ থেকে সংগ্রহ করে-ছিলেন। প্রসেনজিৎকে হত্যার অপবাদ দূর করার জন্য কৃষ্ণ মণির সন্ধান করেন এবং জাম্ববানের সঙ্গে একুশ দিন যুদ্ধ করে পরাজিত করেন। জাম্ববান মণি দিয়ে দেন এবং রামই কৃষ্ণ (দ্রঃ) হয়ে জন্মেছেন জানতে পেরে নিজের মেয়ে জাম্ববতীর সঙ্গে বিয়ে দেন। জাম্ববান বিষ্ণুর নটি অবতার দেখেছিলেন এবং বিষ্ণু আরাধনা রত হয়ে দেহত্যাগ করেন।

জাম্বুনদ—(১) একটি পর্বত ; মেরু পর্বতের অংশ। (২) উশীর বীজ পর্বতে স্বর্ণময় একটি শৃঙ্গ। (৩) সোনা : দ্রঃ জম্বু।

জাহাজ—প্রাচীন ভারতে জাহাজের প্রচুর ব্যবহার ছিল। অশোকের সময় সিরিয়া, মিসর, গ্রীস ও ইহুদি দেশগুলিতে নিয়মিত ভারতীয় জাহাজ যাতায়াত করত। যবদ্বীপে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল উন্নততর জাহাজ শিল্পের ও সুদক্ষ নাবিকদের কারণে। বরোবুদরের মন্দিরের গায়ে আঁকা ছবি থেকে ভারতীয় জাহাজ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। অল-বিরুনি ও মার্কোপোলো ভারতীয় নৌ শিল্প সম্বন্ধে বহু বিবরণ লিপি বদ্ধ করে গেছেন। দ্রঃ দত্তাত্রেয়।

জাহ্নবী—দ্রঃ জহ্নু।

জিতবতী—উশীনরের (দ্র) মেয়ে। পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দরী। দ্যু (দ্রঃ) নামে বসুর স্ত্রী। এই জিতবতীর জন্যই বসুরা বশিষ্ঠের গরু চুরি করতে গিয়েছিলেন।

জিনেন্দ্রবুদ্ধি—দ্রঃ পাণিনি।

জিপসি—যাযাবর। ইউরোপ ও এশিয়ার ইতস্তত প্রান্তে যে সব যাযাবর আছে তাদের ভাষায় ও আচার ব্যবহারে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন ভাষা ও স্থানের ছাপ পড়লেও এরা মূলত অবিসংবাদিত ভাবে ভারতীয় আর্য। ভারত থেকে বার হয়ে প্রথমে ইরানে এবং সেখান থেকে এসিয়া মাইনর হয়ে ইউরোপে যায়। অনুমান খৃ ৫-শতকের কাছাকাছি এরা একাধিক দলে ভারতবর্ষ থেকে বার হয়ে গিয়েছিল। ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, গান্ধার ইত্যাদির অধিবাসী। এবং অন্য মতে এরা ভারতীয় প্রাচীন ডোম জাতি।

জিম্ভকাস্ত্র—ঘুম পাড়ানি অস্ত্র। দ্রঃ জৃম্ভিকা।

জিষ্ণু—অর্জুনের আর একটি নাম। যুদ্ধকালে কেউ অর্জুনের কাছে যেতে পারতেন না ; কারণ যে কোন দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকেও অর্জুন জয় করতেন।

জীব—বা জীবাত্মা। দেহ বিশিষ্ট আত্মার নাম। দ্রঃ জগৎ, জন্মান্তর। কর্ম অনুসারে জীব সুখ দুঃখ ভোগ করে এবং গতি পায়। অদ্বৈত বেদান্ত মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন।

জীবক—বুদ্ধের সমসাময়িক বিখ্যাত চিকিৎসক। জনশ্রুতি বিম্বিসারের রাজত্ব কালে রাজগৃহের বারবনিতা শালবতীর গর্ভে জন্মান ও আবর্জনা স্তূপে পরিত্যক্ত হন। রাজকুমার অভয় অন্য মতে বিম্বিসার একে নিয়ে এসে পালন করেন। নাম হয়েছিল কুমার ভৃত্য। অন্য মতে কুমার-তন্ত্র অর্থাৎ শিশু চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন বলে ঐ নাম। বয়স কালে জীবক তক্ষশীলায় গিয়ে আচার্য আত্রেয়ের কাছে ৭ বছর চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন। শিক্ষার পর তাঁর বিশ্বাস হয় পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদকেই

কোন না কোন রোগে ভেষজ হিসাবে ব্যবহার করা যায় বা যাবে। ফিরে এসে জীবক এক জন চিকিৎসক, অস্ত্রোপচারক ও ভেষজবিশারদ রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তথাগত বুদ্ধের পিত্তাধিক্য ও পায়ের ক্ষত সহজেই আরোগ্য করে দেন। বুদ্ধের শিষ্য হয়ে ভিক্ষুদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। এমন কি নিজের আম বাগানে প্রচুর খরচায় বুদ্ধকে একটি মন্দির তৈরি করে দেন। রুগ্ণ ভিক্ষুদের জন্য জীবকের দেওয়া বিনয়-নিয়ম বহির্ভূত বহু বিধান বুদ্ধদেব সাদরে স্বীকার করে নিয়ে ছিলেন। পরবর্তী কালে রাজা অজাতশত্রুর মন্ত্রী ও প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। চিন্তা জর্জরিত অজাতশত্রুকে বুদ্ধের সমীপে এনে তাঁর চিত্তকে শান্ত করে তোলেন।

জীবন—ব্রাহ্মণ্য ধর্মে জীবন যাত্রাকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল :-(১) ব্রহ্মচর্য ; এই সময়ে গুরু গৃহে বাস করে গুরু সেবা করে শিক্ষা লাভ করতে হত। (২) গার্হস্থ্য জীবন ; গুরুগৃহে থেকে ফিরে বিয়ে করে সংসার পালন, পূজা ও বেদ পাঠ ইত্যাদি। (৩) বাণপ্রস্থ ; ৫০ বছরের পর বনে গিয়ে দুঃখকষ্ট সহ্য করে ভগবৎ চিন্তায় দিন কাটান। (৪) সন্ন্যাস ; শেষ বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে দেশ ভ্রমণ, ভিক্ষান্নে দিনপাত এবং সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের হাতে নিজেকে তুলে দেওয়া।

জীবল—ঋতুপর্ণ রাজার নিজের সারথি। নল রাজা বাহুক নামে সারথি হলে জীবল বাহুকের অধীনে কাজ করতেন। (মহা ৩৬৪।৭)

জীবাত্মা—পর-ব্রহ্ম হচ্ছেন ঈশ্বর। পরব্রহ্ম থেকে অপরব্রহ্ম সব দিকে সীমিত। এই অপরব্রহ্ম হচ্ছেন জীবাত্মা। দেহে অন্নময় কোষের মধ্যে প্রাণময় কোষ অবস্থিত ; প্রাণময় কোষের মধ্যে মনোময় কোষ এবং মনোময় কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষ ; বিজ্ঞানময় কোষের মধ্যে আনন্দময় কোষ এবং এই আনন্দময় কোষের মধ্যে অবস্থান করেন জীবাত্মা। আনন্দময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও প্রাণময় কোষ তিনটি মিলে সূক্ষ্ম শরীর।

জীমূত—বিরাট রাজের এক মল্ল। বিরাট রাজ্যে ব্রহ্মোৎসবের সময় কয়েক জন মল্লকে পরাজিত করলে বিরাট রাজ বল্লভকে (ছদ্মবেশী ভীম) জীমূতের সঙ্গে লড়তে বলেন। জীমূত ভীমের হাতে নিহত হন।

জীমূতকেতু—এক বার বর্ষায় পার্বতী ক্ষোভে মহাদেবের কাছে অনুযোগ করতে থাকেন জলবৃষ্টি থেকে কোথায় নিরাপদে থাকা সম্ভব। মহাদেব হাসেন এবং তারপর পার্বতীকে নিয়ে আকাশে মেঘের ওপারে/মধ্যে বাস করতে থাকেন। বৃষ্টি হলেও শিব পার্বতীর কোন অসুবিধা হয় না। সেই থেকে নাম জীমূতকেতু।

জীমূতবাহন—বাঙালী স্মৃতিকার ; ১১-১৬ শতক। সম্ভবত রাঢ় দেশে পারিভাদ্রিক কুলে জন্ম। মীমাংসা ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত। তিনটি গ্রন্থ প্রণেতা :-কালবিবেক, ব্যবহারমাতৃকা ও দায়ভাগ।

জুনাগড়—গুজরাটে রাজকোট বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও সহর। ২০°৪৪´-২১°৫৩´ উ × ৭১°৭´-৬৯°৪৯´ পূ। এখানে এক মাত্র উচ্চভূমি গিরনার (দ্র) অঞ্চল। চৌদা-সামা উপজাতির অধীনে জুনাগড়ে একটি রাজপুত রাজ্য ছিল। ৮৭৫ খৃ গিরনার সহরের কাছে এর রাজধানী স্থাপিত হয়। জেলার মধ্যে সরস্বতী নদীকে অতি

পবিত্র মনে করা হয়। এখানে উপরকোট বা প্রাচীন দুর্গের পরিখার কাছের অঞ্চলটি বৌদ্ধযুগের বহু গুহায় পরিপূর্ণ। সহরের উত্তরে খাপ্রাখোদিয়া গুহামণ্ডলী উল্লেখযোগ্য। ২ বা ৩ তলা বিহারও ছিল। চৌদাসামাদের শাসন কালে উপরকোটে অপরূপ কারুকার্যযুক্ত ছয়টি থামের ওপর তৈরি অলিন্দ বেষ্টিত পুকুর ও প্রকোষ্ঠ সহ একটি দুতলা বাড়ি প্রসিদ্ধ।

জুয়া—সংস্কৃত দ্যূত খেলা, অক্ষবতী, কৈতব, পণ, দেবল। পণ রেখে অক্ষ, চর্ম পট্টিকা হাতীর দাঁতের গুটি ইত্যাদি দিয়ে প্রতিযোগিতা মূলক খেলা। মুরগি, পায়রা, ভেড়া মোষ, ষাঁড়, ঘোড়া, মল্ল ইত্যাদি দিয়েও প্রতিযোগিতা হত নাম ছিল সমাহ্বয। দ্যূত ক্রীড়ার অধ্যক্ষের নাম সভিক ;ইনি খেলার জিনিসপত্র যোগান দেওয়া,কোন গোলমাল হলে মেটান এবং পণের টাকা ভাগ করে দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত দায়িত্ব পালন করতেন। ঋক্ বেদে অক্ষ সূক্তে (১০।৩৪) আছে এক জুয়াড়ি পাশায় সর্বস্বান্ত হয় ; বাপ মা ও স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে এবং চরম দুর্দশায় পড়ে। ঋক্ বেদের আরো অনেক গুলি মন্ত্রে পাশাখেলার উল্লেখ আছে। অথর্ব বেদে ৪।১৬।৫ এবং ৪।৩৮ মন্ত্রে পাশা খেলায় সৌভাগ্য লাভের কথা আছে। শুক্লযজুর্বেদের বাজসনীয় সংহিতায় পুরুষমেধ যজ্ঞে অক্ষ রাজের বলি হিসাবে জুয়াড়িকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। রাজসূয় যজ্ঞে সভ্যাগ্নি স্থাপনের অন্যতম অঙ্গীয় কার্য যজমানের দেওয়া গাভী পণ রেখে ঋত্বিকদের পাশা খেলা। উত্তর কালে বিশেষ বিশেষ দিনে পাশাখেলা বিশেষ ভাবে অনুমোদিত হয়। কার্তিক মাসে শুক্লা প্রতিপদের নাম দ্যূত প্রতিপদ। এই দিনে পাশাখেলে পার্বতী মহাদেবকে সর্বহারা করে দিয়েছিলেন। নল (দ্রঃ) ও যুধিষ্ঠির (দ্রঃ) পাশা খেলেছেন। স্মৃতিকাররা পাশা খেলাকে ঠিক একেবারে বর্জন করতে বলেন নি। মনু অবশ্য বলেছেন দ্যূত ও সমাহ্বয় কে রাজা যেন একেবারে বন্ধ করে দেন ; কারণ জুয়া খেলা প্রত্যক্ষ চুরি ও রাষ্ট্র নাশের কারণ। রাজা যেন জুয়াড়িদের এবং যারা এই খেলাকে প্রশ্রয় দেয় তাদের শাস্তি দেন এবং নির্বাসিত করেন। যেখানে কোন প্রতারণার প্রশ্ন নেই এ রকম আনন্দোৎসবেও জ্ঞানী ব্যক্তিদের যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। নারদ স্মৃতি মতে রাজার নিয়ন্ত্রণে প্রকাশ্য স্থানে জুয়া খেলা চলতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্য রাজার নিয়ন্ত্রণে নগরের মাঝখানে জুয়া খেলা অনুমোদন করেছিলেন কারণ এই জুয়া খেলার মাধ্যমে রাজকোষে টাকা আসে এবং চোর ধরবার সুবিধা হয়।

জৃম্ভকাস্ত্র—দ্রঃ জৃম্ভিকা।

জৃম্ভিকা—একটি অস্ত্র। তাড়কা ও অন্য রাক্ষসদের মারার পর বিশ্বামিত্র সন্তুষ্ট হয়ে রামকে এই অস্ত্র দান করেন। কঠোর তপস্যা করে বিশ্বামিত্র এটি অত্রির কাছে পেয়েছিলেন। এই অস্ত্রে লোক ঘুমিয়ে পড়ত। বিশ্বামিত্রের বরে লবকুশ আপনা থেকেই এই অস্ত্র আয়ত্ত করেছিলেন। দ্রঃ কৃশাশ্ব।

জেতবনবিহার—বর্তমানে সাহেট ; অচিরবতী নদীর তীরে ; গোরক্ষপুর গোণ্ডা লাইনে বলরাম পুর স্টেসন থেকে ১৬ কি-মি দূরে। এখানে এখনও বিহারের ধ্বংশাবশেষ আছে। রাজকুমার জেত-এর উদ্যানে শ্রেষ্ঠী অনাথ পিণ্ডিক কিনে নিয়ে এখানে বুদ্ধের জন্য একটি বিহার তৈরি করেন। কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তীর (বর্তমানে মাহেট) দক্ষিণ উপকণ্ঠে এই জেতবন। সারিপুত্ত নিজে এর নির্মাণের

তত্ত্বাবধান করেছিলেন। এখানে ভিক্ষুদের বাসগৃহ, উপস্থান শালা, অগ্নিশালা ইত্যাদি সব ব্যবস্থা ছিল। গন্ধকুটি, করোরি-মণ্ডলমাল, কোসম্বকুটি, চন্দনমাল ইত্যাদি কুটি-গুলি অনাথপিণ্ডিক নিজে তৈরি করিয়েছিলেন। রাজকুমার জেত উত্থান বিক্রির সমস্ত মূল্য ফেরৎ দিয়ে এই অর্থে এখানে দোতলা প্রবেশ তোরণ করে দিয়েছিলেন। তৈরির পর জাঁকজমকের সঙ্গে এই বিহার বুদ্ধদেবকে অনাথপিণ্ডিক উৎসর্গ করেন। এখানে গন্ধকুটিতে বুদ্ধদেব পঁচিশ বছর মত কাটান। বহু সূত্র, জাতক-দেশনা ও বিনয়নীতি এইখানে বুদ্ধদেব রচনা করেন। রাজা প্রসেনজিৎ জেতবনে 'সললঘর' নামে একটি বড় কুটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। বিহারের বাইরে একটি আম বাগান ছিল। প্রবেশ পথের কাছে অনাথ পিণ্ডিক একটি বোধিবৃক্ষের চারা বসিয়ে ছিলেন; এই গাছটি পরে আনন্দ বোধি নামে পরিচিত। অশোকের সময় জেতবন অতি পবিত্র স্থান ছিল। ফা-হিয়েন দেখেছিলেন জেতবন বিহার সাত তলা এবং পূজার জিনিস ও ধ্বজ পতাকা শোভিত।

জেন—সংস্কৃত ধ্যান থেকে অপভ্রংশ। খৃ ৫ শতকের শেষার্ধে বোধিধর্ম নামে এক জন ভিক্ষু চীনে গিয়ে জেন পন্থা প্রচার করেন। চীনে প্রাচীনতর তাও মতের দ্বারা প্রভাবিত মহাযানের একটি শাখা। এই মতে বাহ্য ক্রিয়া কলাপে বুদ্ধত্ব লাভ হয় না। চিত্তকে শূন্যতার চরম গভীরে স্থাপিত করলে তবে বোধি লাভ হতে পারে। খৃ ১২ শতকে এই মতবাদ জাপানে যায়। ক্রিয়াকাণ্ড বিবর্জিত এই আত্মবিদ্যা জাপানে যোদ্ধা সম্প্রদায়কে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে এবং তাদের সাহায্যে জাপানে ছড়িয়ে পড়ে। বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে যে সমস্যা পূরণ করা যায় না সেই সব জিনিস একাগ্র ভাবে ভাবতে ভাবতে শূন্যতার গভীরে ডুবে গেলে অনেক সময় নিস্তরঙ্গ মনে ক্ষণিকের জন্য অকস্মাৎ সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই ভাবে ধ্যানকে জেন বলা হয়।

জেলা—গুপ্তযুগে প্রথম জেলার (= বিষয়) হিসাব পাওয়া যায়। সমগ্র দেশ কতকগুলি প্রদেশে এবং প্রদেশ কতকগুলি বিষয়ে (= জেলা) ভাগ ছিল। অনেক সময় বিষয় ও মণ্ডল একই অর্থে ব্যবহৃত। আবার বহু স্থানে বিষয় মণ্ডলের অন্তর্গত বা মণ্ডল বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। গুপ্ত যুগে বিষয় পতি ছিলেন জেলা শাসক। সাধারণত কুমারামাত্য, আযুক্তক, সামন্ত মহারাজগণ বিষয়পতি হতেন। কোন কোন বিষয়-পতি সরাসরি রাজার অধীন হতেন। তবে সাধারণত তাঁরা প্রাদেশিক শাসনের অধীন থাকতেন। বিষয়পতিকে সাহায্যের জন্য বিষয়াধিকরণও ছিল। কোটিবর্ষ নামক বিষয়ের অধিকরণে এই বিষয়পতিকে সাহায্য করার জন্য শ্রেষ্ঠী, প্রথম কুলিক, প্রথম কায়স্থ, প্রথম সার্থবাহের উল্লেখ আছে।

জৈগীষব্য—হিমালয়ের ঔরসে মেনার অপর্ণা, একপর্ণা ও এক একপাটলা তিন মেয়ে হয়। দেবল মুনি এক পর্ণাকে এবং জৈগীষব্য একপাটলাকে বিয়ে করেন। অসিতের ছেলে দেবলকে জৈগীষব্য বহু উপদেশ দিয়েছিলেন। দ্রঃ দেবল। এঁর মতে গার্হস্থ্য ধর্ম ও মোক্ষ ধর্মের মধ্যে মোক্ষধর্মই বড়।

জৈত্রম—রাজা হরিশ্চন্দ্রের রথ। ধৃষ্টদ্যুম্নের শঙ্খ।

জৈন—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত। (২) নাস্তিক দর্শন। এই দর্শনে বেদ স্বীকৃত নয়। জিনের প্রবর্তিত। অন্য নাম অর্হৎ ধর্ম বা নিগ্রন্থ

ধর্ম। বিশ্বে যে অংশে জীব ও জড় বস্তু থাকে তাকে লোক বলা হয়; এবং লোকের চার দিকে বিস্তৃত শূন্য অংশ অলোক। জৈন মতে বিশ্ব অনাদি অনন্ত; কোন ঈশ্বর বা অবতার নাই। ফলে কর্মফলকে কেউই বদলাতে পারে না; জীবকে নিজেরই মুক্তির চেষ্টা করতে হবে। জৈনরা জীবন্মুক্তিতে বিশ্বাসী। জৈন মতে তীর্থংকররা জীবন্মুক্ত। তীর্থ অর্থে সংঘ ও বোঝায় এবং এই অর্থে তীর্থংকর হচ্ছে সংঘ প্রতিষ্ঠাতা। জৈন দর্শনে অর্হৎ-রা তীর্থংকর পরমেষ্ঠী; বিদেহী মুক্তাত্মারা সিদ্ধ-পরমেষ্ঠী। আর তিনটি পরমেষ্ঠী হচ্ছেন আচার্য পরমেষ্ঠী, উপাধ্যায় পরমেষ্ঠী ও সাধু পরমেষ্ঠী; এই তিন পরমেষ্ঠী মুক্তাত্মা নন। সব সমেত পাঁচ শ্রেণীর পরমেষ্ঠী। জৈনরা বিশ্বাস করেন কর্মই কর্মের ফলদাতা; সাধনার ফলে কর্মক্ষয় হয় এবং মোক্ষ আসে। এ জন্য এঁদের উপাসনায় কোন করুণা চাওয়া নেই। তীর্থংকরদের কোন ক্ষমতা নেই কারও কর্মক্ষয়ে সাহায্য করা। জৈনদের উপাসনার উদ্দেশ্য নিজের কর্মক্ষয় করতে চেষ্টা করা।

জৈন ও বৌদ্ধ মতে বহু মিল থাকলেও জৈন মত বৌদ্ধ মতের শাখা নয়। বৌদ্ধরা ক্ষণ ভঙ্গুরবাদী; জৈনরা তা নন এবং আত্মার স্থায়িত্বে বিশ্বাস করেন। জৈন দর্শনে পুদ্গল নামে একটি নতুন জড় স্বীকৃত। জৈনদের প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেব (দ্রঃ) এবং শেষ তীর্থংকর মহাবীর (দ্রঃ)। পার্শ্বনাথ (দ্রঃ) আর একজন তীর্থংকর। পরে জৈনদের আচারগত দুটি সম্প্রদায় দেখা দেয় একটি দিগম্বর আর একটি শ্বেতাম্বর।

জৈন মতে জ্ঞান আত্মার ধর্ম। আত্মা স্বরূপত অনন্ত জ্ঞান যুক্ত; কিন্তু কর্মফলের জন্য দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা এই আত্মা সংকুচিত বা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কর্মফল বা আবরণ শেষ হলে আত্মা নিজের অনন্তকাল স্বরূপ অনুভব করতে পারে। জ্ঞানকে জৈন দার্শনিকরা দু ভাগে ভাগ করেছেন পরোক্ষ জ্ঞান ও অপরোক্ষ জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগে ব্যবহারিক বা অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে। আর আত্মা যখন ইন্দ্রিয় বা মন ব্যতীত কোন বস্তুর পরিচয় পায় তখন সেটিকে প্রকৃত বা পরমাত্মিক অপরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়। কিছুটা কর্ম প্রভাব মুক্ত হয়ে আত্মা আর এক রকম জ্ঞান লাভ করতে পারে। রাগদ্বেষ ইত্যাদি জয় করে আত্মা যে জ্ঞান লাভ করে, অপরের মনের যে প্রত্যক্ষ পরিচয় পায় তার নাম মনঃপর্যায় জ্ঞান। ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে জ্ঞানের আর এক নাম মতি। জৈন মতে লৌকিক, প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা ও অনুমান সমস্তই মতির অন্তর্গত। জৈনরা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র বাক্যের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন। তীর্থংকরদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানই এঁদের শাস্ত্র।

জৈন মতে প্রতি বস্তুই অনন্ত ধর্ম ও বহু বিভাব যুক্ত। মানুষের চোখে বস্তুটির একটি দিক প্রকাশ পায়। অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান অপূর্ণ ও আপেক্ষিক। এই অপূর্ণ জ্ঞানের নাম 'নয়'। এক মাত্র জিনদের জ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞান। এই জন্য জৈনরা প্রতিটি নয়ের আগে স্যাৎ এই শব্দটি ব্যবহার করেন; অর্থাৎ এটি একটি আপেক্ষিক অপূর্ণ জ্ঞান। জৈনরা জ্ঞাতার দৃষ্টি বৈচিত্র্য ও বস্তুর বিভাব ও বহুত্বে বিশ্বাসী। অর্থাৎ এঁদের সমস্ত কিছুই আপেক্ষিক সত্য। এই আপেক্ষিকতা থেকে 'সপ্তভঙ্গি' নয় এর জন্ম:-স্যাৎ অস্তি, স্যাৎ নাস্তি, স্যাৎ অস্তি নাস্তি চ। স্যাৎ অবক্তব্যম্, স্যাৎ অস্তি চ অবক্তব্যম্ চ, স্যাৎ নাস্তি চ অবক্তব্যম্, স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যম্। অর্থাৎ

জৈন মতে কোন প্রশ্ন করলে যেমন ঘট আছে কিনা উত্তরে এঁরা হাঁ বা না বলেন না বলেন স্যাৎ অস্তি বা স্যাৎ নাস্তি। অর্থাৎ উত্তর দাতার দৃষ্টি ভঙ্গিতে আছে বা নাই। স্যাৎ অবক্তব্যম্ অর্থে বক্তার দৃষ্টি ভঙ্গিতে অবক্তব্য। যেমন ঘট কাঁচা থাকলে এক রঙ থাকে পোড়ালে বিভিন্ন রঙ হয়। সুতরাং ঘটের সকল অবস্থার রঙ এক সঙ্গে বলতে গেলে অবক্তব্য। এই ভাবে এই নয় গুলির উৎপত্তি।

জৈনরা বস্তু স্বাতন্ত্র্যবাদী। এঁদের মতে বস্তু বহু এবং দু রকম জীব ও অজীব। জীব আত্মায় যুক্ত। প্রতি বস্তুই অনেকান্ত; মানুষ তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বস্তুটির একটি বা কয়েকটি বিভাব দেখতে পায়। বস্তুর পূর্ণস্বরূপের জ্ঞান কেবল সিদ্ধপুষদেরই আছে। জৈন মতে প্রতি দ্রব্যে দু রকমের ধর্ম আছে। একটি ধর্ম দ্রব্যটি যত দিন থাকে ধর্মগুলিও তত দিন বর্তমান থাকে; এই শ্রেণীর ধর্মের নাম গুণ। এই অর্থে চৈতন্য আত্মার ধর্ম বা গুণ। আর এক শ্রেণীর ধর্ম দ্রব্যে কখনো থাকে না; এরা আগন্তুক এবং এদের নাম 'পর্যায়'। জৈনরা তাই বলেন দ্রব্য হচ্ছে গুণ ও পর্যায় যুক্ত এবং সৎ-বস্তু। সৎ-বস্তুর জন্ম, মৃত্যু ও স্থায়িত্ব আছে অর্থাৎ বস্তু সৎ হলেও তার কতকগুলি ধর্মের উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা যায়। জীবাত্মা নিত্য; এক এক জন্মের মধ্য দিয়ে উৎপত্তি ও বিনাশের মাধ্যমে তার কতকগুলি ধর্মের উৎপত্তি ও বিনাশ ঘটতে থাকে। দ্রব্যের আবার দুটি শ্রেণী ভাগ রয়েছে; একটি শ্রেণী অস্তিকায়; অর্থাৎ এদের কায়া আছে। আকাশের কায়া অনুমান সিদ্ধ ফলে আকাশও অস্তিকায়। আর একটি অনস্তিকায় অর্থাৎ কায়া হীন। যেমন কাল। কাল অবশ্য দ্রব্য; কারণ কালের গুণ ও পর্যায় আছে। অস্তিকায় দ্রব্যকে ভাগ করা যায়, অনস্তিকায়কে করা যায় না। কাল জৈন মতে দু রকম; মানুষের গড়া কাল ও প্রকৃত কাল বা পারমার্থিক কাল। পারমার্থিক কাল নিত্য, অরূপ ও অনুমানগম্য। অস্তিকায় দ্রব্যের দুটি ভাগ জীব ও অজীব এবং জীবের দুটি ভাগ বদ্ধজীব ও মুক্তজীব। বদ্ধজীব আবার দুটি ভাগ 'এস' ও স্থাবর। 'এস' জীব জঙ্গম এবং নানা ইন্দ্রিয় যুক্ত। উচ্চতর 'এস' জীবের পঞ্চ ইন্দ্রিয়। অনস্তিকায় দ্রব্য অজীব; অজীবেরও নানা শ্রেণী ভাগ আছে। আবার অনস্তিকায় অজীব দ্রব্যের অতিরিক্ত এবং অস্তিকায় শ্রেণীর অন্তর্গত চারটি অজীব দ্রব্য স্বীকার করেন; এগুলি ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও পুদ্গল।

জৈন দর্শনে আত্মাকে জীব বলা হয়। সকল জীবের চেতনা সমান নয়। কর্ম বন্ধন অনুসারে জীব এক বা একাধিক ইন্দ্রিয় যুক্ত। উচ্চ শ্রেণীর জীব পঞ্চেন্দ্রিয় যুক্ত; কর্মমুক্ত জীব মুক্তাত্মা। জীব জ্ঞাতা; তার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব আছে। জীব প্রদীপের মত স্বপ্রকাশ ও অপরের প্রকাশক। জীব নিত্য; জরা মৃত্যু ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। জীবের নিজের কোন মূর্তি নাই; কর্ম অনুসারে মূর্তি পায়। জীব বিভু বা অণু নয়; দেহপরিমাণ। পুদ্গল ও আত্মা সংযোগে দেহ তৈরি হয়। পুদ্গল আত্মায় সংলগ্ন হতে পারে আবার খসে যেতেও পারে। পুদ্গলের তিনটি গুণ স্পর্শ, রস ও বর্ণ। পুদ্গল দু রকম। সূক্ষ্ম, অবিভাজ্য এবং ভোগ্য নয় এমন পুদ্গলকে অণু বলা হয়; একাধিক অণু মিলে সংঘত বা স্কন্দ। বহির্জগতের দ্রব্যাদি এমন কি মানুষের দেহ মন বাক্য শ্বাসবায়ু প্রভৃতিও পুদ্গল

গঠিত। জীব স্বরূপত অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত আনন্দের অধিকারী। কিন্তু দেহ অর্থাৎ কর্ম বন্ধন তাকে সীমিত করে রাখে। পূর্ব জন্মের বাসনা কামনা অনুসারে পুদ্গল গঠিত দেহ আত্মায় যুক্ত থাকে। দুধ ও জলের মত কর্ম ও জীব এমন ভাবে থাকে যে কোন স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকে না। বাসনার আবির্ভাবের সঙ্গে আসে বন্ধন। জীবের ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ ইত্যাদিকে কষায় বা আঠা বলা হয়। বার থেকে কর্মগুলি এসে কষায়ের সাহায্যে জীবে সংলগ্ন থাকে। কর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার নাম মুক্তি। মুক্ত হতে হলে আত্মায় সঞ্চিত পুদ্গল পরমাণুদের বিতাড়িত করতে হবে এবং নতুন কর্ম-পুদ্গল আসা বন্ধ করতে হবে। আত্মায় সঞ্চিত কর্ম-রাশির ক্ষয়কে নির্জরা বলা হয়; এবং কর্ম পুদ্গলের নতুন আগমন রোধ করাকে সম্বর বলা হয়। বাসনার কারণ অবিদ্যা; এই অবিদ্যাকে দূর করতে হলে জিনদের উপদেশ পালনীয়।

কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হলে জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, পুণ্য, পাপ, নির্জরা, সংবর ও মোক্ষ এই নয়টি তত্ত্বের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। প্রথম তত্ত্ব জীব; জীবের লক্ষণ চেতনা, জ্ঞান, দর্শন, বীর্য, আনন্দ ইত্যাদি। একেন্দ্রিয় প্রাণী থেকে মুক্ত আত্মা সব কিছুই জীব। দ্বিতীয় তত্ত্ব অজীব বা জড়; ধর্ম (জৈন অর্থে) অধর্ম (জৈন অর্থে) আকাশ, পুদ্গল ও জ্ঞান এই পাঁচটি অজীব। তৃতীয় তত্ত্ব আস্রব; জীবে বা আত্মায় কর্ম-পুদ্গলের আসার নাম আস্রব। অবিদ্যা, অবিরতি, কষায়, প্রমাদ ও যোগ এইগুলির কারণে আত্মায় কর্ম পুদ্গল আসে। চতুর্থ তত্ত্ব বন্ধ; আত্মার সঙ্গে কর্মপরমাণুর যুক্ত হওয়ার নাম বন্ধ। বন্ধ আবার চার রকম : প্রকৃতি বন্ধ, স্থিতিবন্ধ, অনুভববন্ধ, প্রদেশবন্ধ। প্রকৃতি বন্ধে আত্মায় বিশেষ বিশেষ গুণ আবৃত হয়। এই প্রকৃতি বন্ধ আট রকম :-জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, বেদনীয়, মোহনীয়, আয়ু, নাম, গোত্র, অন্তরায়। স্থিতি বন্ধ অর্থে বন্ধনের কাল নিরূপিত হওয়া। অনুভব বন্ধে কর্ম কি ফল দেবে নিরূপিত হয়। প্রদেশ বন্ধে কি পরিমাণ কর্মপরমাণু আসবে নির্ধারিত হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ তত্ত্ব পাপ ও পুণ্য। সপ্তম তত্ত্ব সংবর, অষ্টম তত্ত্ব নির্জরা। নতুন কর্মের আগমন বন্ধ করা সংবর। আর পূর্বকর্ম বন্ধ স্বভাবত শেষ হবার আগেই ধ্যান উপবাস আদির দ্বারা পূর্বকর্ম বন্ধকে শেষ করা (= নির্জরা) যাতে আর নতুন কর্ম বন্ধ না ঘটে। নবম তত্ত্ব মোক্ষ অর্থে পুরাতন কর্ম বন্ধের শেষ হওয়া; ও নতুন কর্ম বন্ধ না ঘটে আত্মার স্বরূপত্ব লাভ। এই অবস্থায় জীব সিদ্ধিশালায় গমন করে এখানে অনন্তকাল বাস করে। এই বাস করা নির্বাণ। মোক্ষ লাভের জন্য এই নয়টি তত্ত্বের জ্ঞানের সঙ্গে সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান, ও সম্যক চরিত্র ও প্রয়োজন। এই তিনটির নাম ত্রিরত্ন। আত্মা ও অনাত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের নাম সম্যক জ্ঞান। কর্ম ও সংস্কার মুক্ত হলে সম্যক দর্শন ও জ্ঞান অভ্যাসে পরিণত হয়ে সম্যক চারিত্রের পথ তৈরি হয়।

ধর্ম ও অধর্ম এ দুটি শব্দ জৈন শাস্ত্রে পারিভাষিক। ধর্ম সচল দ্রব্যকে গতি দেয়। অধর্ম স্থিতির সহায়ক। অধর্ম স্থির বস্তুগুলিকে ধারণ করে থাকে এবং চলমান বস্তুর গতিরোধ করে না। ধর্ম ও অধর্ম উভয়েই নিত্য, নিরবয়ব, স্থির ও লোকাকাশ পরিব্যাপ্ত করে বিদ্যমান। ধর্ম ও অধর্ম যথাক্রমে গতি ও স্থিতির কারণ

কিন্তু কোন কিছুতে লিপ্ত নয়। ধর্ম ও অধর্মকে সেইজন্য উদাসীন কারণ বলা হয়।

আত্মার ক্রমিক বিকাশের মধ্য দিয়ে জীব মুক্তি লাভ করে। জৈন দর্শনে এই বিকাশের স্তর ১৪ টি। একে গুণস্থানে সমারোহ বলা হয়। শেষ গুণস্থান নির্বাণ। এই পথে এগোতে হলে প্রয়োজন পঞ্চ মহাব্রত, সমিতি, গুপ্তি, দশবিধ ধর্ম, আত্মতত্ত্বানুসন্ধান, শম, দম, তিতিক্ষা ও সমতা। গৃহী জৈনদের শ্রাবক বলা হয়। জৈন শাস্ত্রে কালকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে উৎসর্পিনী (অর্থাৎ ক্রমিক অভ্যুদয়ের) ও অবসর্পিনী (ক্রমিক অবনতির) কাল। প্রতি উৎসর্পিনী বা অবসর্পিনী ছয়টি অরে (=ভাগে) বিভক্ত ; এবং প্রতি উৎসর্পিনী বা অবসর্পিনীর ৩ ও ৪ অরে ২৪ জন করে তীর্থংকর জন্মান। বর্তমান অবসর্পিনীর প্রথম তীর্থংকর ঋষভ দেব।

জৈন ধর্মের এই দর্শন থেকে দেখা যায় এর প্রতিটি তত্ত্ব হচ্ছে প্রকল্প এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মত সবটাই পলায়নী বৃত্তি।

জৈমিনী—পূর্ব মীমাংসা দর্শনের প্রণেতা ঋষি। বাদরায়নের সমকালীন খৃ ৩ শতকে মনে হয়। বেদের কর্মকাণ্ডের সূত্রগুলিকে সুসংবদ্ধ ও সংশোধিত করেন। এ জন্য প্রাথমিক সূত্রকার বলে পরিগণিত। ভাগবতে জৈমিনি ব্যাসের শিষ্য ; অশ্বত্থামার কাছে মার্কণ্ডেয় পুরাণ শুনেছিলেন। সুমন্তু'র গুরু ও সাম বেদের সংকলয়িতা। অন্য মতে জৈমিনির ছেলে সুমন্তু ও সুমন্তুর ছেলে সুত্বান। আর এক মতে ব্যাসের ৫টি বিখ্যাত শিষ্য সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন, এবং শুক। এই ৫ জনেই ব্যাস প্রণীত জয় (মূল মহাভারত) প্রচার করেন। নৈমিষারণ্যে হিরণ্যনাভকে জৈমিনি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ শোনান। শর শয্যায় ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করেন। সর্প যজ্ঞে ও উপস্থিত ছিলেন। এঁর মীমাংসা সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বেদের কর্ম-কাণ্ডের ব্যাখার নিয়ম ও ধর্ম। জৈমিনি মতে বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য ও স্বতঃ প্রমাণ ; ঈশ্বরকৃত নয়। যজ্ঞ কর্তা স্বর্গ পান এই সূত্রে আত্মার অমরতা স্বীকার করেছেন। মোক্ষ ও ঈশ্বরের কথা কোথাও বলেন নি। এঁর ভারত সংহিতা জৈমিনি ভারত নামেও পরিচিত। ছান্দোগ্যানুবাদ ও এঁর প্রণীত বলা হয়। পূর্ব মীমাংসা ষড় দর্শনের অন্যতম। জৈমিনি বেশম্পায়ন ইত্যাদি ৫ জন বজ্রবারক নামে প্রসিদ্ধ।

জৌগড়—উড়িষ্যাতে গঞ্জাম জেলায়। এরও ইতিহাস শিশুপাল গড়ের মত। এখানকার প্রতিরক্ষা প্রাচীর কাঁচা। এখানে নগর পত্তনের আগে নবাশ্মীয় সংস্কৃতির একটি বসতি ছিল

জ্ঞান—চার্বাক মতে ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ ; এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান। প্রতক্ষের মাধ্যমে কেবল বর্তমানকেই জানা যায়। ফলে অতীত ও ভবিষ্যৎ বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলে সর্ব দেশ কালিক জ্ঞান সম্ভব নয়। জৈন মতে জ্ঞান দু রকম অপরোক্ষ অর্থাৎ আপেক্ষিক জ্ঞান ও পরোক্ষ জ্ঞান। সংস্কার দূর হলে আত্মা যে জ্ঞান লাভ করে সেটি জৈনদের পারমার্থিক জ্ঞান ; কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই পাওয়া নয়। এ ছাড়াও মতি ও শ্রুতি বলে দুটি ব্যবহারিক জ্ঞান এঁরা স্বীকার করেন। বৌদ্ধ মতে জ্ঞান চার রকম : ইন্দ্রিয় জ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, আত্মসংবেদন ও যোগী জ্ঞান—জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা না রেখেই এ জ্ঞান লাভ করা যায়। প্রমাণ না থাকলেও প্রমেয় থাকতে পারে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বলক্ষণ যুক্ত নির্বিকল্প

প্রত্যক্ষকে স্বীকার করেন। অবশ্য বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় জ্ঞানের আলোচনায় বিভিন্ন লক্ষণের কথা বলেছেন।

ন্যায় মতে জ্ঞান চারটি প্রমাণের ওপর নির্ভর করে। প্রথমত জ্ঞানের স্বরূপ; জ্ঞান সামনের বিষয়াদিকে প্রকাশ করে দেয়। দ্বিতীয় হচ্ছে জ্ঞানের দুটি প্রকার; প্রমা ও অপ্রমা। প্রমা বা প্রমিতি চার ভাগে বিভক্ত; প্রত্যক্ষ অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দ। অর্থাৎ প্রমা হচ্ছে যথার্থ বিষয়ানুভব। স্মৃতি, সংশয়, ভ্রম, তর্ক ইত্যাদি অপ্রমা।

অপ্রমা সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্পর্ক হলে প্রতক্ষ্য জ্ঞান হয়। জ্ঞানের বাস্তব কার্যকারিতা অংশে ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মত বহুলাংশেই এক। ন্যায় মতে জ্ঞান বিষয়ানুগ, এবং জ্ঞান আলোচনা ও মুক্তি অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। সাংখ্য মতে জ্ঞান বা প্রমার পক্ষে তিনটি স্বতন্ত্র প্রমাণ হচ্ছে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি সাংখ্যে স্বীকৃত নয়। সাংখ্য মতে প্রত্যেক প্রমায় তিনটি অংশ প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমাণ। প্রমাতা হচ্ছে চিন্ময় আত্মা; ইন্দ্রিয়াদি মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয় প্রমেয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি হল প্রমাণ। আত্মার নিকটতম অচিৎ অথচ স্বচ্ছ সাত্বিক বুদ্ধির ওপর আত্মার চেতন রশ্মি প্রতিবিম্বিত হয়ে জ্ঞেয় বিষয়কে প্রকাশ করে। সাংখ্য মতে জ্ঞান প্রকাশত্মক ও আত্মগত ব্যাপার। আত্মা জ্ঞান স্বরূপ সাক্ষী চৈতন্য। আত্মা ও অনাত্মার অবিবেক জনিত অজ্ঞান জীবের ত্রিবিধ দুঃখের কারণ। বিবেক-জ্ঞান হলেই জীব কৈবল্য পায়।

বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মীমাংসকরা জ্ঞানের আলোচনা করে ছিলেন। এঁরা পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দুটি জ্ঞান স্বীকার করেন। এঁদের প্রাত্যক্ষিক জ্ঞানের বিষয় সৎ-বস্তু। জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ এঁদের যুক্তির ভিত্তি। শ্রুতিও এঁদের কাছে স্বতঃপ্রমাণ। প্রভাকর সম্প্রদায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ত্রিপুরী স্বীকার করেন। এক মাত্র প্রভাকর সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য মীমাংসা সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই ছটি স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করেন। প্রভাকর মতে অনুপলব্ধি প্রমাণ নয়।

মধ্বাচার্যের মতে জ্ঞেয় স্বরূপে যদি জ্ঞানের গোচর হয় তবেই সেই জ্ঞান প্রমা। এঁদের মতে সব রকম প্রত্যক্ষই আপেক্ষিক বা সবিকল্পবোধ। নির্বিকল্প বোধ অসম্ভব। মধ্ব মতে যথার্থ জ্ঞান অর্থে বুদ্ধি ও প্রকৃতির সামঞ্জস্য। সামঞ্জস্যের অভাব হলে মিথ্যাত্ব আসে। প্রত্যক্ষের আলোচনায় মধ্বগণ ন্যায় মত অনুসরণ করেন এবং ন্যায়ের ছয়টি প্রত্যক্ষ ছাড়াও সাক্ষী প্রত্যক্ষ বলে আর একটি প্রত্যক্ষ স্বীকৃত। স্মৃতি জ্ঞান একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। নিম্বার্ক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিনটিকে স্বীকার করেন। এঁদের প্রত্যক্ষ দু রকম লৌকিক ও অলৌকিক। প্রত্যক্ষ আলোচনায় নিম্বার্ক সম্প্রদায় ন্যায়ের ধারাই মানেন।

অদ্বৈত বেদান্তে ছয় প্রকার বৃত্তি-জ্ঞান। এঁদের মতে জ্ঞানের বৃত্ত্যংশ পরিবর্তনশীল; জ্ঞানাংশ অপরিবর্তনীয়। অপরিবর্তনীয় জ্ঞানই সৎ এবং এই সৎ-ই চিৎ। এঁদের মতে জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ। দ্র; জৈন, বৌদ্ধ।

জ্ঞানশ্রীমিত্র—গৌড়ীয় বৌদ্ধাচার্য (খৃ ১১ শতকে) ; বিক্রমশীলা মহাবিহারের অন্যতর মহাস্তম্ভ। হিন্দু ও বৌদ্ধ ন্যায়ের বিবাদে ইনি এক দিকে শঙ্কর, ভাসর্বজ্ঞ, ত্রিলোচন, বাচস্পতি, বিত্তোক ইত্যাদি হিন্দু নৈয়ায়িকদের মত এবং অপর দিকে বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মোত্তরের মত খণ্ডন করে নিজের মত স্থাপন করেন। বৌদ্ধ ন্যায় প্রস্থানে জ্ঞানশ্রীমিত্র শেষ মৌলিক গ্রন্থকার। ধর্মকীর্তি রচিত 'প্রমাণ বার্তিকের' অন্যতম ভাষ্যকার প্রজ্ঞাকর গুপ্তের প্রধান অনুসরণকারী। জ্ঞানশ্রীমিত্রের রচনা ক্ষণভঙ্গাধ্যায়, অপোহ-প্রকরণ, ঈশ্বরবাদ এবং সাকার-সিদ্ধি-শাস্ত্র প্রধান। জৈন বাদিদেবসূরি ও মৈথিল নৈয়ায়িক শংকর মিশ্র এঁর গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

জ্বর—মেরু পর্বতে জ্যোতিষ্ক তীর্থে শিব পার্বতী বসে ছিলেন। সেই দিন কনখলে (গঙ্গাদ্বারে) দক্ষ যজ্ঞ করছিলেন। দেবতারা যজ্ঞে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন দেখে পার্বতী জানতে চান ওঁরা কোথায় যাচ্ছেন। শিব সব কিছু বলেন এবং পার্বতী পিতার আচরণে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পড়েন। পার্বতীর দুঃখে শিব অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। তাঁর তৃতীয় নেত্র থেকে এক ফোঁটা জল পড়ে। অন্য মতে ঘাম থেকে আর এক মতে নিশ্বাস থেকে উৎপন্ন এক পুরুষ। তিন পা, তিন মাথা, বেঁটে মত চেহারা ; এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা নয়টি চোখ ; যমের মত দেখতে। মাথায় খাড়া খাড়া চুল, কেশ সোনালি ; দাড়ি গোঁফ লাল/সবুজ। পরিধানে রক্তাম্বর। অস্ত্র ভস্ম ; সর্বদা ছাই ছড়ান ; নখের স্পর্শ বজ্রের ন্যায় কঠিন। শিব নাম দেন জ্বর। সুরাসুর সকলে একে ভয় করেন। বৈষ্ণব জ্বরাসুরের ও তিন পা ছয় হাত ইত্যাদি। কালো কুচ কুচে রঙ ; প্রলয়ের মেঘের মত এঁর গর্জন। ইনি সকলের ভয় দূর করেন। শৈব জ্বরাসুর দক্ষের যজ্ঞে গিয়ে দেবতাদের আক্রমণ করলে তাঁরা এসে শিবের শরণ নেন। মহাদেব তখন (অন্য মতে ব্রহ্মার অনুরোধে) দেবতাদের দেহ থেকে এই জ্বরকে বার করে এনে টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন জীবের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। হাতীর মাথার তাপ, শিলাজতু, জলীয় শৈবাল, সাপের খোলস, গোজাতির ক্ষুর-রোগ, ভূমির উর্বরতা, পশুর দৃষ্টি রোগ, অশ্বের গলরোগ, ময়ূরের শিখা উদ্ভেদ, কোকিলের চক্ষুরোগ, মেষের পিত্তভেদ, শুকের হিক্কা, এবং শার্দুলের ক্লান্তিকে জ্বর বলা হয়। বৃত্র বধের সময় ইন্দ্রের দেহে তেজ ও বৃত্রের দেহে জ্বর এনে দিয়ে মহাদেব ইন্দ্রকে বৃত্র বধ করার জন্য আদেশ দেন।

জ্বালামুখী—৩১°৫২´ উ × ৭৬°২০´ পূ ; কাংড়া জেলার একটি গ্রাম। কাংড়া থেকে নাদাউন যাবার পথে। বিতস্তা নদীর উত্তর সীমান্তে হিমালয়ে উত্তুঙ্গ পর্বত শ্রেণীর পাদদেশে। এখানে পাহাড়ের গা থেকে স্বাভাবিক গ্যাস বার হয়। গুপ্ত যুগেই তীর্থস্থান বলে প্রসিদ্ধ। যেখানে গ্যাস বার হয় সেখানে একটি স্বর্ণ মন্দির আছে। মন্দিরটি অবশ্য প্রাচীন নয়। মন্দিরে কোন মূর্তি নাই। মন্দিরের মাঝে কুণ্ডের চার পাশে জ্বলিত স্বাভাবিক গ্যাসকে দেবীর তেজ বলা হয়। প্রতি বছর এপ্রিল মাসে এখানে নওরাত্রির বড় মেলা হয়। এক সময়ে সমৃদ্ধ সহর ছিল ; ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে।

জ্যামঘ—পুরু বংশীয় রাজা। স্ত্রী শৈব্যা। অপুত্রক। স্ত্রীর ভয়ে দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে পারেন নি। এক দিন এক শত্রুকে হারিয়ে শত্রুর মেয়ে ভোজ্যাকে কেড়ে

এনে স্ত্রীকে জানান এই মেয়েটি তাঁদের পুত্রবধূ হবে। শৈব্যার ছেলে হলে তার সঙ্গে বিয়ে হবে। পিতৃগণ ও দেবগণের আশীর্বাদে শৈব্যা পরে গর্ভধারণ করেন। এবং বিদর্ভ নামে একটি ছেলে হয়। বিদর্ভের সঙ্গে পরে ভোজ্যার বিয়ে হয়।

জ্যামিতি—পৃথিবীকে মিতি করার শাস্ত্র। প্রধানত জমি ও যজ্ঞ বেদি মাপবার জন্য কতকগুলি বিচ্ছিন্ন সূত্র সমষ্টি হিসাবে ভারতে এর সৃষ্টি। এই প্রাচীন জ্যামিতি অংশ বর্তমানে মেনসুরেসান নামে পরিচিত। খৃ-পূ ৮ শতকে রচিত কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতার অন্তর্গত শূল্ব সূত্রে ভারতে জ্যামিতি চর্চার নিদর্শন রয়েছে। অবশ্য আরো আগে থেকেই এই চর্চা আরম্ভ হয়েছিল। মোট সাতটি শূল্ব সূত্র বর্তমানে পাওয়া যায়। এগুলিতে ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত সূত্রাবলী, বর্গকে আয়ত ক্ষেত্রে বা ত্রিভূজকে বর্গক্ষেত্রে রূপান্তরের নিয়ম, সদৃশ চিত্র (সিমিলার ফিগারস) সম্বন্ধে বিবিধ সূত্র, সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ সম্পর্কিত উপপাদ্য ; এবং এই অতিভুজের ওপর বর্গ অপর দুই বাহুর ওপর অঙ্কিত দুটি বর্গের যোগফলের সমান উপপাদ্যটিও রয়েছে। বৌধায়নের শূল্ব সূত্রেও অনুরূপ প্রতিজ্ঞা আছে।

আর্যভট (৬ শতক) বরাহমিহির (৬ শতক), ব্রহ্মগুপ্ত (৭ শতক) মহাবীরাচার্য (৯ শতক) এবং ভাস্করাচার্য (১২-শতক) ভারতে সেই যুগের জ্যামিতি গবেষক। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হিসাবের একটি নিয়ম বার করেন আর্যভট। ব্রহ্মগুপ্ত ও মহাবীর আচার্য আর্যভটের সূত্র থেকে বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের এবং তা থেকে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র বার করেন। আর্যভট ও ভাস্করাচার্যের হিসাবে π = ৩·১৪১৬। মহাবীরের রচনায় কনিক সেকসান সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

জ্যেষ্ঠা—(১) অলক্ষ্মী (দ্রঃ)। (২) নক্ষত্র ; আলফা স্কর্পি।

জ্যোতির্বিদাভরণ—রচনাকার কালিদাস।

জ্যোতির্বিদ্যা—জ্যোতিষ্কদের অবস্থান ইত্যাদি গণনা। বৈদিক কাল থেকে ভারতে চর্চা হয়েছে। তখন কেবল সূর্য ও চন্দ্রের গতিই পর্যবেক্ষণ করা হত। সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দিয়ে ঋতুকাল ও বছর ঠিক হত। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা দিয়ে বছরকে মাসে ভাগ করা হত। বেদে ঋষিরা সূর্যগ্রহণের উল্লেখ করেছেন এবং চন্দ্র পথকে ২৭ বা ২৮ নক্ষত্র-বিভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রায় ১৩০০ খৃ পূর্বে চন্দ্র সূর্য গতিকে ভিত্তি করে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের বর্ষপঞ্জী রাখার পদ্ধতি চালু হয়। গ্রহ গতির হিসাবের কোন উল্লেখ এই সময়ে নাই। গ্রহ গতি সম্বন্ধে জ্ঞান মনে হয় মধ্য প্রাচ্য অর্থাৎ পশ্চিম এসিয়া আগত। ভারতীয় জ্যোতিষিক জ্ঞান কিছু পৃথক এবং কিছু উন্নতও ছিল বটে। আর্য ভট (৪৭৬ খৃ ?) কৃত আর্যভটীয়, বরাহ মিহির (৫২৭ খৃ ?) কৃত পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা, ব্রহ্ম গুপ্ত (৫৯৮ খৃ ?) কৃত ব্রাহ্ম-স্ফুট সিদ্ধান্ত, ভাস্করাচার্য (১১৫০ খৃ ?) কৃত গণিতাধ্যায় ও গোলাধ্যায় এবং ময়দানব (প্রকৃত নাম অজ্ঞাত) কৃত সূর্য-সিদ্ধান্ত নাম করা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এই বইগুলিতে রবি, চন্দ্র ইত্যাদির আবর্তন কাল, গ্রহগণের পাত, ও মন্দোচ্চের অবস্থান ও গতি, মধ্য গ্রহ থেকে স্পষ্ট গ্রহ আনয়ন, সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ গণনা, উদয়াস্ত গণনা প্রভৃতি আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার সমস্ত বিষয়গুলিই আছে। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রন্থে ভূকেন্দ্রিক মতবাদই ভিত্তি করা হয়েছে। আর্যভট পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির কথা বলেছিলেন বটে কিন্তু

খৃ-পূ ৬ শতকের প্রথমার্দ্ধে গান্ধার পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। খৃ-পূ ৪-শতকে গান্ধারে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যের উৎপত্তি হয়; তক্ষশীলা এদের একটি। তক্ষশীলার রাজা আম্ভি আলেক- জান্দারের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন খৃ-পূ ৩২৬ সালে। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময় তক্ষশিলা রাজপ্রতিভূর প্রধান কর্মস্থান ছিল।

তক্ষশিলা তিনটি বাণিজ্য পথের সংগমে অবস্থিত ছিল। মধ্য ও পশ্চিম এসিয়ার পথের মিলন কেন্দ্র। বহুবার বিদেশী আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল। মৌর্যদের পর বাহ্লীক, ইন্দোগ্রীক, ও শক-পহ্লব রাজারা এখানে নিজেদের অধিকার স্থাপন করেছিলেন। কনিষ্কের সময় রাজধানী পুরুষপুরে সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তবুও খৃ ৪-শতক পর্যন্ত তক্ষশিলার সমৃদ্ধি ও গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়ে তক্ষশিলা ভারতে একটি বিশিষ্ট বৌদ্ধ-কেন্দ্র রূপে পরিচিত হয়। খৃ ৫-শতকে হূণদের আক্রমণে নগরটি নষ্ট হয়। খৃ ৭-শতকে হিউ-এন-ৎসাঙের সময় তক্ষশিলা কাশ্মীরের অন্তর্গত ছিল।

এখানে খনন কার্যের ফলে তিনটি প্রাচীন সহরের চিহ্ন পাওয়া গেছে। প্রাচীন সহরটির বর্তমান নাম ভিড়-ঢিপি; রেল স্টেসন ট্যাকসিলার পূর্বে এবং তাম্র-নালা নদীর পশ্চিমে। সম্ভবত খৃ-পূ ৬-শতকে এর পত্তন হয়েছিল; আয়ু খৃ-পূ ২-শতক পর্যন্ত। নগর বিন্যাস ও গৃহ নির্মাণে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না। বেশির ভাগ গৃহই পাথরে তৈরি। খৃ-পূ ২-শতকে নতুন রাজধানী হয় সিরকাপে; এই নগরীর আয়ু মনে হয় চারশো বছর। ভিড়-ঢিপির কিছু দূরে এবং তাম্রনালার পূর্বতীরে ইন্দো-গ্রীকরা এটি তৈরি করেন। পহ্লবদের সময় নতুন ভাবে গ্রীক নগর পরিকল্পনার আদর্শে পরিমণ্ডিত। নতুন প্রতিরক্ষা প্রাচীর তৈরির সময় গ্রীক আদর্শ মত একটি গিরিদুর্গও তৈরি করা হয়েছিল। প্রাচীর ঘেরা সহরের মধ্যে একটি দেওয়াল তুলে সহরটি দুভাগ করে সহরের উচ্চপার্বত্য অংশে এই দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ তৈরি হয়েছিল; নিম্নাংশে জনগণের বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। নিম্নভূমির এই বসতি অঞ্চল সুপরিকল্পিত ও গ্রীক আদর্শে গঠিত। সহরের মধ্যের প্রশস্ত রাজপথটি উত্তর-দক্ষিণ মুখী। দু দিক থেকে বহু সমান্তরাল রাস্তা রাজপথটির সঙ্গে সমকোণে এসে মিশে-ছিল। এই সমান্তরাল শাখা পথগুলির মাঝে বাড়িগুলি সুষ্ঠুভাবে সাজান। এ ছাড়া এই অংশে ছোট মত একটি প্রাসাদ ও একটি বৌদ্ধমন্দির ও কয়েকটি স্তূপ পাওয়া গেছে। শেষ সহরটির নাম সিরসুক, সম্ভবত কুষাণ আমলে তৈরি। সিরকাপের উত্তর পূর্বে ও প্রায় ২ কি-মি দূরে সমভূমিতে অবস্থিত; লুণ্ডিনালার পাশে। সহরটি আয়ত ক্ষেত্র মত।

সহর তিনটির পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিশেষ করে পাহাড়গুলি বৌদ্ধকীর্তি রাজিতে পূর্ণ। এখানের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে বিদেশীয়, ভারতীয় ও স্থানীয় প্রভাব মিশে রয়েছে। তাই বহু স্থানে গ্রীক প্রভাব স্পষ্ট। তক্ষশিলার মুখ্য স্তূপ ধর্মরাজিকা (স্থানীয় নাম চির) হথিয়াল পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে তাম্রনালার তীরে সমুচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। নাম অনুসারে হয়তো অশোকের প্রতিষ্ঠিত; তবে দেখে মনে হয় কুষাণ যুগের। স্তূপটির ভিত্তি দেশ গোল; অর্দ্ধেক ডিমের মত আকার; ভেতরে ব্যাসার্দ্ধের মত ষোলটি পাথরের মোটা দেওয়াল দিয়ে শক্ত করে তোলা। এর গাত্র স্তম্ভগুলির মধ্যস্থ

কুলুঙ্গিগুলি ফাঁকা ; সম্ভবত এগুলিতেও বুদ্ধমূর্তি ছিল। ধর্মরাজিকাকে কেন্দ্র করে বহু স্তূপ, মন্দির, সংঘারাম এবং একটি সর্পাকার চৈত্য গড়ে উঠেছিল। কোন কোনটি স্তূপে অস্থিভস্ম পাওয়া গেছে। দু একটিতে কুষাণ মুদ্রাও পাওয়া গেছে। একটি স্তূপের গায়ে সারিবদ্ধ বুদ্ধমূর্তি এবং আর একটি স্তূপে গান্ধার শৈলীতে ক্ষোদিত বুদ্ধদেবের জীবনের কয়েকটি প্রধান ঘটনা রয়েছে। একটি মন্দিরে একটি পাথরের পাত্রের মধ্যে একটি রূপার বাটিতে সোনার ছোট একটি কৌটায় কয়েকটি হাড় পাওয়া গেছে। সঙ্গের একটি খরোষ্ঠী লিপি থেকে জানা যায় এগুলি বুদ্ধদেবের অস্থি ; তারিখ ১৩৬ অয়র (?)। আর একটি মন্দিরে গান্ধার শৈলীর, পাথরে ক্ষোদিত প্রচুর মূর্তি পাওয়া গেছে। হথিয়ালের উত্তরে শেষ পাহাড়টির ওপর কুণাল স্তূপ ; খৃ ৩ বা ৪ শতকের। কুণাল স্তূপের পশ্চিমে ১৩।১৪ ফুট উচ্চ একটি প্রশস্ত সংঘারাম ; এর পূর্ব দিকের দেওয়াল ১৯২ ফুট। সংঘারামটি আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়েছিল।

সিরসুক সহরের দক্ষিণ পূর্ব কোণে প্রায় ২ কি-মি দূরে মোহ্ড়া-মোরাদু গ্রামের কাছে নির্জন উপত্যকায় একটি সুন্দর বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান রয়েছে ; এখানকার দুটি স্তূপই চুন বালির তৈরি জীবন্ত-প্রায় বুদ্ধ মূর্তি শোভিত। সঙ্গের সংঘারামটিও বিশাল। এগুলি খৃ ৩-৫ শতকের। মোহ্ড়া-মোরাদুর উত্তর পূর্বে জৌলিয়াঁ গ্রামের কাছে এক পাহাড়ের ওপর একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত উত্তম বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান আবিষ্কৃত হয়েছে। মোহড়া-মোরাদু ও জৌলিয়াঁর মাঝে পিপুল গ্রামেও একটি স্তূপ ও সঙ্গে সংঘারাম রয়েছে ; এটি পহ্লব-কুষাণ যুগের।

তক্ষশিলার একটি আয়ত মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। সিরকাপের প্রাচীরের উত্তর প্রবেশিকার কিছু উত্তরে জণ্ডিয়ালে একটি কৃত্রিম মাটির ঢিপির ওপর মন্দিরটি। মন্দিরটির গড়ন প্রাচীন গ্রীক মন্দির মত ; কিন্তু এর স্তম্ভ ইত্যাদি গ্রীক স্থাপত্যের পরিচায়ক নয়। মন্দিরের ছাতের ওপর বিশেষ অংশে একটি উঁচু ভারী গম্বুজ ছিল মনে হয় ; অনুমান এটি জরথুশ্ত্রীয় মন্দির।

তখ্ত-ই-সুলেমান—পাকিস্তানে ডেরা ইসমাইল খাঁ অঞ্চলে একটি পর্বত শ্রেণীর নাম সুলেমান। পূর্ব দিকে এই পর্বত শ্রেণীর দক্ষিণ সীমান্তে ৩৩৭৪ মি উচ্চ একটি অংশের নাম তখ্ত-ই-সুলেমান। প্রবাদ রাজা সলোমোন ভারতের একটি মেয়েকে বিয়ে করে দৈত্যদানব বাহিত সিংহাসন করে উড়ে নিজের দেশে ফিরছিলেন। এই সময় রাণী স্বদেশের দিকে এক বার শেষ বারের মত তাকিয়ে দেখতে চান। এই জন্য সলোমান সিংহাসন নামাবার জন্য বাহকদের একটি জায়গা করতে বলেন ফলে তারা সিংহাসনটিকে বসাবার জন্য পাহাড়ে একটি গর্ত কাটেন। এখানে ৩০ বর্গ ফুট মত সেই গর্ত সলোমানের সিংহাসন বলে পরিচিত। হিন্দু মুসলমান সকলের কাছেই স্থানটি পবিত্র। অশোকের সময়ে স্থাপিত একটি মন্দির এখানে আছে।

তন্জ্যুর—বুদ্ধের দেশনা ভিন্ন অবশিষ্ট বৌদ্ধশাস্ত্রের তিব্বতী সংকলন। বৌদ্ধ দেব-দেবীদের স্তব, নানা টীকা ভাষ্য, এবং বৌদ্ধন্যায়, মাধ্যমিক ও যোগাচার দর্শন সম্পর্কে দিঙনাগ, নাগার্জুন, অশ্বঘোষ, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, চন্দ্রকীর্তি ইত্যাদির রচনার তিব্বতী অনুবাদ এই অংশে রয়েছে। এই সংকলন অংশটি মোটামুটি চারভাগে বিভক্ত : স্তোত্র, সূত্র, তন্ত্র ও বিবিধ। সংস্কৃত ও চীনা থেকে বুদ্ধের দেশিত ত্রিপিটকের

খৃ-পূ ৬ শতকের প্রথমার্দ্ধে গান্ধার পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। খৃ-পূ ৪-শতকে গান্ধারে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যের উৎপত্তি হয়; তক্ষশীলা এদের একটি। তক্ষশীলার রাজা আম্ভি আলেক- জান্দারের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন খৃ-পূ ৩২৬ সালে। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময় তক্ষশিলা রাজপ্রতিভূর প্রধান কর্মস্থান ছিল।

তক্ষশিলা তিনটি বাণিজ্য পথের সংগমে অবস্থিত ছিল। মধ্য ও পশ্চিম এসিয়ার পথের মিলন কেন্দ্র। বহুবার বিদেশী আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল। মৌর্যদের পর বাহ্লীক, ইন্দোগ্রীক, ও শক-পহ্লব রাজারা এখানে নিজেদের অধিকার স্থাপন করেছিলেন। কনিষ্কের সময় রাজধানী পুরুষপুরে সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তবুও খৃ ৪-শতক পর্যন্ত তক্ষশিলার সমৃদ্ধি ও গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়ে তক্ষশিলা ভারতে একটি বিশিষ্ট বৌদ্ধ-কেন্দ্র রূপে পরিচিত হয়। খৃ ৫-শতকে হূণদের আক্রমণে নগরটি নষ্ট হয়। খৃ ৭-শতকে হিউ-এন-ৎসাঙের সময় তক্ষশিলা কাশ্মীরের অন্তর্গত ছিল।

এখানে খনন কার্যের ফলে তিনটি প্রাচীন সহরের চিহ্ন পাওয়া গেছে। প্রাচীন সহরটির বর্তমান নাম ভিড়-ঢিপি; রেল স্টেসন ট্যাকসিলার পূর্বে এবং তাম্র-নালা নদীর পশ্চিমে। সম্ভবত খৃ-পূ ৬-শতকে এর পত্তন হয়েছিল; আয়ু খৃ-পূ ২-শতক পর্যন্ত। নগর বিন্যাস ও গৃহ নির্মাণে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না। বেশির ভাগ গৃহই পাথরে তৈরি। খৃ-পূ ২-শতকে নতুন রাজধানী হয় সিরকাপে; এই নগরীর আয়ু মনে হয় চারশো বছর। ভিড়-টিপির কিছু দূরে এবং তাম্রনালার পূর্বতীরে ইন্দো-গ্রীকরা এটি তৈরি করেন। পহ্লবদের সময় নতুন ভাবে গ্রীক নগর পরিকল্পনার আদর্শে পরিমণ্ডিত। নতুন প্রতিরক্ষা প্রাচীর তৈরির সময় গ্রীক আদর্শ মত একটি গিরিদুর্গও তৈরি করা হয়েছিল। প্রাচীর ঘেরা সহরের মধ্যে একটি দেওয়াল তুলে সহরটি দুভাগ করে সহরের উচ্চপার্বত্য অংশে এই দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ তৈরি হয়েছিল; নিম্নাংশে জনগণের বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। নিম্নভূমির এই বসতি অঞ্চল সুপরিকল্পিত ও গ্রীক আদর্শে গঠিত। সহরের মধ্যের প্রশস্ত রাজপথটি উত্তর-দক্ষিণ মুখী। দু দিক থেকে বহু সমান্তরাল রাস্তা রাজপথটির সঙ্গে সমকোণে এসে মিশে-ছিল। এই সমান্তরাল শাখা পথগুলির মাঝে বাড়িগুলি সুষ্ঠুভাবে সাজান। এ ছাড়া এই অংশে ছোট মত একটি প্রাসাদ ও একটি বৌদ্ধমন্দির ও কয়েকটি স্তূপ পাওয়া গেছে। শেষ সহরটির নাম সিরসুক, সম্ভবত কুষাণ আমলে তৈরি। সিরকাপের উত্তর পূর্বে ও প্রায় ২ কি-মি দূরে সমভূমিতে অবস্থিত; লুণ্ডিনালার পাশে। সহরটি আয়ত ক্ষেত্র মত।

সহর তিনটির পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিশেষ করে পাহাড়গুলি বৌদ্ধকীর্তি রাজিতে পূর্ণ। এখানের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে বিদেশীয়, ভারতীয় ও স্থানীয় প্রভাব মিশে রয়েছে। তাই বহু স্থানে গ্রীক প্রভাব স্পষ্ট। তক্ষশিলার মুখ্য স্তূপ ধর্মরাজিকা (স্থানীয় নাম চির) হথিয়াল পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে তাম্রনালার তীরে সমুচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। নাম অনুসারে হয়তো অশোকের প্রতিষ্ঠিত; তবে দেখে মনে হয় কুষাণ যুগের। স্তূপটির ভিত্তি দেশ গোল; অর্দ্ধেক ডিমের মত আকার; ভেতরে ব্যাসার্দ্ধের মত ষোলটি পাথরের মোটা দেওয়াল দিয়ে শক্ত করে তোলা। এর গাত্র স্তম্ভগুলির মধ্যস্থ

কুলুঙ্গিগুলি ফাঁকা ; সম্ভবত এগুলিতেও বুদ্ধমূর্তি ছিল। ধর্মরাজিকাকে কেন্দ্র করে বহু স্তূপ, মন্দির, সংঘারাম এবং একটি সূর্পাকার চৈত্য গড়ে উঠেছিল। কোন কোনটি স্তূপে অস্থিভস্ম পাওয়া গেছে। দু একটিতে কুষাণ মুদ্রাও পাওয়া গেছে। একটি স্তূপের গায়ে সারিবদ্ধ বুদ্ধমূর্তি এবং আর একটি স্তূপে গান্ধার শৈলীতে ক্ষোদিত বুদ্ধদেবের জীবনের কয়েকটি প্রধান ঘটনা রয়েছে। একটি মন্দিরে একটি পাথরের পাত্রের মধ্যে একটি রূপার বাটিতে সোনার ছোট একটি কৌটায় কয়েকটি হাড় পাওয়া গেছে। সঙ্গের একটি খরোষ্ঠী লিপি থেকে জানা যায় এগুলি বুদ্ধদেবের অস্থি ; তারিখ ১৩৬ অয়র (?)। আর একটি মন্দিরে গান্ধার শৈলীর, পাথরে ক্ষোদিত প্রচুর মূর্তি পাওয়া গেছে। হথিয়ালের উত্তরে শেষ পাহাড়টির ওপর কুণাল স্তূপ ; খৃ ৩ বা ৪ শতকের। কুণাল স্তূপের পশ্চিমে ১৩।১৪ ফুট উচ্চ একটি প্রশস্ত সংঘারাম ; এর পূর্ব দিকের দেওয়াল ১৯২ ফুট। সংঘারামটি আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়েছিল।

সিরসুক সহরের দক্ষিণ পূর্ব কোণে প্রায় ২ কি-মি দূরে মোহ্‌ড়া-মোরাদু গ্রামের কাছে নির্জন উপত্যকায় একটি সুন্দর বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান রয়েছে ; এখানকার ২টি স্তূপই চুন বালির তৈরি জীবন্ত-প্রায় বুদ্ধ মূর্তি শোভিত। সঙ্গের সংঘারামটিও বিশাল। এগুলি খৃ ৩-৫ শতকের। মোহ্‌ড়া-মোরাদুর উত্তর পূর্বে জৌলিয়াঁ গ্রামের কাছে এক পাহাড়ের ওপর একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত উত্তম বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান আবিষ্কৃত হয়েছে। মোহড়া-মোরাদু ও জৌলিয়াঁর মাঝে পিপুল গ্রামেও একটি স্তূপ ও সঙ্গে সংঘারাম রয়েছে ; এটি পহ্লব-কুষাণ যুগের।

তক্ষশিলার একটি আয়ত মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। সিরকাপের প্রাচীরের উত্তর প্রবেশিকার কিছু উত্তরে জণ্ডিয়ালে একটি কৃত্রিম মাটির ঢিপির ওপর মন্দিরটি। মন্দিরটির গড়ন প্রাচীন গ্রীক মন্দির মত ; কিন্তু এর স্তম্ভ ইত্যাদি গ্রীক স্থাপত্যের পরিচায়ক নয়। মন্দিরের ছাতের ওপর বিশেষ অংশে একটি উঁচু ভারী গম্বুজ ছিল মনে হয় ; অনুমান এটি জরথুশ্‌ত্রীয় মন্দির।

তখ্‌ত-ই-সুলেমান—পাকিস্তানে ডেরা ইসমাইল খাঁ অঞ্চলে একটি পর্বত শ্রেণীর নাম সুলেমান। পূর্ব দিকে এই পর্বত শ্রেণীর দক্ষিণ সীমান্তে ৩৩৭৪ মি উচ্চ একটি অংশের নাম তখ্‌ত-ই-সুলেমান। প্রবাদ রাজা সলোমোন ভারতের একটি মেয়েকে বিয়ে করে দৈত্যদানব বাহিত সিংহাসন করে উড়ে নিজের দেশে ফিরছিলেন। এই সময় রাণী স্বদেশের দিকে এক বার শেষ বারের মত তাকিয়ে দেখতে চান। এই জন্য সলোমান সিংহাসন নামাবার জন্য বাহকদের একটি জায়গা করতে বলেন ফলে তারা সিংহাসনটিকে বসাবার জন্য পাহাড়ে একটি গর্ত কাটেন। এখানে ৩০ বর্গ ফুট মত সেই গর্ত সলোমানের সিংহাসন বলে পরিচিত। হিন্দু মুসলমান সকলের কাছেই স্থানটি পবিত্র। অশোকের সময়ে স্থাপিত একটি মন্দির এখানে আছে।

তন্‌জুর—বুদ্ধের দেশনা ভিন্ন অবশিষ্ট বৌদ্ধশাস্ত্রের তিব্বতী সংকলন। বৌদ্ধ দেব-দেবীদের স্তব, নানা টীকা ভাষ্য, এবং বৌদ্ধন্যায়, মাধ্যমিক ও যোগাচার দর্শন সম্পর্কে দিঙনাগ্‌, নাগার্জুন, অশ্বঘোষ, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, চন্দ্রকীর্তি ইত্যাদির রচনার তিব্বতী অনুবাদ এই অংশে রয়েছে। এই সংকলন অংশটি মোটামুটি চারভাগে বিভক্ত : স্তোত্র, সূত্র, তন্ত্র ও বিবিধ। সংস্কৃত ও চীনা থেকে বুদ্ধের দেশিত ত্রিপিটকের

সূত্র, আগম ও তন্ত্রশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ সংকলনের নাম কন্‌-জ্যুর। এই সংকলন মোটামুটি বিনয়, সূত্র, অবতংশক, প্রজ্ঞাপারমিতা, তন্ত্র ও ধারণী অংশে বিভক্ত।

তন্তিপাল—বিরাট গৃহে অজ্ঞাত বাস কালে সহদেবের নাম।

তন্ত্র—অন্য নাম, আগম, নিগম বা রহস্য। যে শাস্ত্রোক্ত পন্থায় সাধনা করলে জীব মোক্ষ লাভ করে সেই শাস্ত্রকে তন্ত্র বলা হয়। বিশেষ ধরণের অধ্যাত্ম সাধন শাস্ত্র। তত্ত্ব ও মন্ত্রের আলোচনা তন্ত্রের একটা মস্ত অংশ। তত্ত্ব ও মন্ত্রের সমন্বয়ে ত্রাণ আসে তাই নাম তন্ত্র। তত্ত্ব ও মন্ত্রের সাধনে জীব উন্নত স্তরে ওঠে। তত্ত্ব অর্থে বিশ্বের মৌল সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান অর্থাৎ সৎ-বিষয়ের জ্ঞান। মন্ত্র হচ্ছে চিৎ-বিষয়ক জ্ঞান। সৎ ও চিৎ এর মিলনে আনন্দ। সচ্চিদানন্দ বিভব থেকে বিশ্বের সৃষ্টি। পাঁচটি শুদ্ধতত্ত্ব বা শিব তত্ত্ব, ছয়টি বিশ্ব বা শুদ্ধাশুদ্ধ বা বিদ্যাতত্ত্ব এবং পঁচিশটি অশুদ্ধ বা আত্মতত্ত্ব মোট ছত্রিশটি তত্ত্ব। তন্ত্রে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোনও বিভেদ নেই ; ফলে শিব ও শক্তি অভিন্ন। এই অভিন্নতার দুটি ক্ষণ বা স্তর ; একটি সূক্ষ্ম ধ্যান গম্য স-কল স্তর আর একটি হচ্ছে নিষ্কল-স্তর।

বেদ ও তন্ত্রের মূলে রয়েছে শ্রৌতজ্ঞান এবং এই জন্য তন্ত্রকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। পুরাণের পর এই সব তন্ত্র শাস্ত্রের জন্ম। কুল্লুক ভট্ট বলেছেন শ্রুতি দু রকম বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। তন্ত্রের মোটামুটি চারটি শ্রেণী : শৈব তন্ত্র, শাক্ত তন্ত্র, বৈষ্ণব তন্ত্র ও বৌদ্ধ তন্ত্র। শৈব তন্ত্রের চারটি ভাগ অনুসারে সম্প্রদায় চারটি নকুলীশ-পাশুপত, শৈব, প্রত্যভিজ্ঞা ও রসেশ্বর। বেদের মত তন্ত্র শাস্ত্রকেও অপৌরুষেয় বলা হয়। দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত তিনটি মতবাদ তন্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়। শিব মুখ নিঃসৃত ৬৪ খানি ভৈরব আগম অদ্বৈত পন্থী, ১০ খানি শৈব আগম দ্বৈতপন্থী, ১৮ খানি রৌদ্র আগম বিভিন্ন মতবাদের মিশ্রণ। গৌড়পাদ রচিত শ্রীবিদ্যা রত্নসূত্র, শংকর রচিত প্রপঞ্চসার, প্রয়োগক্রমদীপিকা এবং লক্ষ্মণ দেশিকের রচিত সারদাতিলক তন্ত্র শাস্ত্রের মূলগ্রন্থ। সোমানন্দের শিবদৃষ্টি শৈবমতবাদের একটি উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ। অভিনব গুপ্ত ছিলেন শৈব ও শাক্ত। অভিনব গুপ্তের গ্রন্থ তন্ত্রালোক, মালিনীবিজয়-বর্তিকা, পরাত্রিংশিকাবিবরণ, প্রত্যভিজ্ঞা-বিমর্শিনী এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মধ্যযুগ ছিল তন্ত্র সাহিত্যের গৌরবময় যুগ।

কাশ্মীরে শৈববাদ খৃ ৯ শতকের প্রথম দিকে গড়ে উঠেছিল ; এই সম্প্রদায়ের অপর নাম ত্রিক, স্বাতন্ত্র্যবাদ বা আভাসবাদ। এই মতবাদ যোগক্রিয়া সাপেক্ষ অধ্যাত্ম সাধন লব্ধ পরম সত্তার উপলব্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই পরমতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য শাম্ভব, শাক্ত ও আনত তিনটি যোগ নিষ্ঠ উপায় নির্দিষ্ট হয়েছে। প্রত্যভিজ্ঞা মতবাদ অনুসারে স্বাতন্ত্র্য জীবের মৌল আন্তর সত্তা ; অজ্ঞানে এটি ঢাকা থাকে। প্রত্যভিজ্ঞা হলে জীব মুক্তি পায়। শৈব সিদ্ধান্ত মতবাদের মূল উৎস আটাশটি শৈবাগম। এগুলির মধ্যে 'কামিক' সর্ব প্রধান। তিরুমূলের রচিত তিরু-মন্দিরম্ আর একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। পতি (=ঈশ্বর), পশু (=জীবাত্মা) ও পাশ (=সংসার বন্ধন) এই তিনটি তত্ত্ব সিদ্ধান্ত মতে স্বীকৃত। সিদ্ধান্তে ঈশ্বর বা শিব নির্গুণ এবং জগতের কর্তা বা নিমিত্ত কারণ। শিব বিশ্বানুস্যূত ও বিশ্বোত্তীর্ণ ; তিনি

পরমকারুণিক। জগতের বিবর্তনাংশে সিদ্ধান্তীদের সঙ্গে সাংখ্যের মিল আছে। সিদ্ধান্তী মতে বিবর্তনের দুটি ধারা শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। শুদ্ধ মায়া থেকে শব্দতত্ত্ব ও ৫টি শুদ্ধতত্ত্ব বা শিবতত্ত্ব। এবং বাকিগুলি অশুদ্ধ মায়া থেকে উৎপন্ন, মোট ৩৬ টি তত্ত্ব। জীব ও শিব দেহ ও আত্মার মতই একান্ত সম্বন্ধ যুক্ত। সত্তার দিক থেকে জীব ও শিব স্বতন্ত্র; কিন্তু স্বরূপত উভয়ে এক। মোক্ষের মার্গ: চর্যা, ক্রিয়া, যোগ ও জ্ঞান। সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সাযুজ্য এগুলি স্তর। আনব মল বা মূল অবিদ্যা দূর হলে প্রকৃত জ্ঞান আসে এবং বন্ধন মুক্ত হলে জীব মুক্তি লাভ করে।

বীর শৈব আর একটি পূর্ণাঙ্গ চিন্তাধারা। যে উৎস থেকে জগতের উৎপত্তি ও যেখানে এর লয় তাকে এই মতবাদে লিঙ্গ বলা হয়। সক্রিয়তত্ত্ব হিসাবে লিঙ্গের ধারণা এই মতবাদের ভিত্তি এবং এই মতবাদীদের নাম লিঙ্গায়েৎ। লিঙ্গ একটি প্রতীক চিহ্ন।

শাক্তাদ্বৈতবাদেও ৩৬টি তত্ত্ব স্বীকৃত। এই মতে জগতের উপাদান মায়া। তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের উপায়। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের মধ্য দিয়ে আত্মা ও দেহ এক এই ধারণা দূর হয় এবং আত্মা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান আসে। সব শেষে আসে প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। সংসার দশার মূল অজ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা নাশ করে এবং জীব মোক্ষ পায়। শাক্তেরা জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি দু রকম মুক্তিই বিশ্বাস করেন।

নারী-শক্তির উপাসনা হিন্দুধর্মে প্রথম থেকেই ছিল। শাক্ত তন্ত্রে এই পূজাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই শাক্ততন্ত্রের বক্তব্য প্রতি দেবতার মধ্যে একটি জাগ্রত বামাশক্তি আছে। এই শক্তি বা প্রকৃতি দেবতার স্ত্রী রূপে প্রতিভাত। প্রতি তন্ত্রে শিব শক্তির বিভিন্ন একটি রূপকে বড় করে দেখান হয়েছে। দেবতাদের কথোপকথন ভঙ্গিতে এই তন্ত্র রচিত; অন্য নাম গুহ্যশাস্ত্র (মিষ্টিক শাস্ত্র)। দীক্ষিত বা অভিষিক্ত ছাড়া কারো কাছে এ শাস্ত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ। কুলার্ণব তন্ত্রে আছে ধন, স্ত্রী নিজের প্রাণ সব কিছু দিতে পারা যায় কিন্তু গুহ্য শাস্ত্র কারো কাছে যেন প্রকাশ করা না হয়।

তন্ত্রের দৃষ্টি ভঙ্গি :-শিবের স্ত্রী একটি বিশেষ শক্তি রূপে প্রতিভাত হয়ে যৌন সম্পর্কের ভেতর দিয়ে ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে তন্ত্রশাস্ত্রকে কার্যকরী করেছেন। প্রতিটি শক্তির দুটি প্রকৃতি বা স্বভাব আছে :-শ্বেত বা কৃষ্ণ অর্থাৎ নম্র বা উগ্র। উমা ও গৌরী শিবের নম্র শক্তির প্রতীক এবং দুর্গা ও কালী রুদ্র শক্তির প্রতীক। তান্ত্রিক পূজায় মদ্য, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা, মৈথুন এই ৫-টি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন। শক্তি উপাসক দু রকম দক্ষিণাচারী ও বামাচারী। দক্ষিণাচারীরা বেদোক্ত বিধি অনুসারে পূজা করেন; মদ্য মাংস ইত্যাদি ব্যবহার করেন না; ঘোরতন্ত্র পূজার বিরোধী। বামাচারীরা উগ্র-তন্ত্র পূজারী; নানা বিধ যৌন ও নানা উদ্ভট পদ্ধতির সমর্থক। বামা শক্তিকে এঁরা বাস্তব রূপে পূজা করেন। এই জন্য অনেক ক্ষেত্রেই নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে শক্তিপূজা আরম্ভ হয়। বাংলাতে বামাচারীদের প্রাধান্য। কিছু কিছু জায়গায় বামাচার ও দক্ষিণাচার মিশে গেছে দেখা যায়। বৌদ্ধ তন্ত্রও এই সমস্ত শক্তি তন্ত্র অনুকরণে তৈরি হয়ে ছিল।

তপ—অপর নাম পাঞ্চজন্য ; এক জন প্রসিদ্ধ তপস্বী/দেবতা। অগ্নির মত এঁর তেজ। কশ্যপ, বশিষ্ঠ, প্রাণক, চ্যবন ও ত্রিবর্চস এঁদের তপস্যায় এঁর জন্ম। এই পাঞ্চজন্য (দ্রঃ) অগ্নির ১৫টি ছেলে :-অভীম, অতিভীম, ভীম, ভীমবল, বল, সুমিত্র, মিত্রবান, মিত্রজ্ঞ, মিত্রবর্দ্ধন, মিত্রধর্মা, সুপ্রবীর, বীর, সুবর্চস্, সুবেশ, সুরহন্তা। এঁরা যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটান। মহা ৩।২১০।১২।

তপতী—সূর্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভে জন্ম। সাবিত্রীর ছোট বোন। বহু চেষ্টাতেও উপযুক্ত পাত্র না পেয়ে রাজা সংবরণের (দ্রঃ) সঙ্গে সূর্য এঁর বিয়ে দেবেন ঠিক করেন। তপতীর ছেলে কুরু থেকে কৌরব বংশ। সূর্যের বরে তপতী নর্মদা নদীতে পরিণত হন।

তপলোক—এখানে বৈরাজরা (পিতৃগণ) বাস করেন। আগুনে এরা দগ্ধ হন না। ধ্রুবলোক থেকে ১১-যোজন উর্দ্ধে।

তপস্যা—শরীর ও মনের মালিন্য দূর করার জন্য যোগের অঙ্গ স্বরূপ অনুষ্ঠান। দেহকে নানা ভাবে কষ্ট সহিষ্ণু করে তোলা হয়। শারীরিক, বাচিক, মানসিক, সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তপস্যা নানা শ্রেণীর। জৈন মতে ছয় রকম বাহ্য ও ছয় রকম আভ্যন্তর তপস্যা। জৈনদের নিত্য অনুষ্ঠেয় ষট্‌কর্মের অন্যতম হচ্ছে তপশ্চর্যা। বুদ্ধদেব নিজে কঠোর তপস্যা করলেও পরে এই আচরণের নিন্দা করেছেন। গ্রীষ্মে চারপাশে আগুন জ্বেলে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকা ; বর্ষায় আকাশের নীচে বসে থাকা, শীতে ভিজা কাপড়ে বা জলে অবস্থান করা, গাছ থেকে খসে পড়া ফল বা পাতা খেয়ে জীবন ধারণ বা মেঘের জলের ওপর জীবন ধারণ ইত্যাদি কৃচ্ছ্রসাধনা রয়েছে।

তমঃ—আত্মার একটি গুণ। অপর দুটি সত্ত্ব ও রজঃ। তম থেকে লোভ, ঘুম, সাহস, নিষ্ঠুরতা, ঈশ্বরে অবিশ্বাস, দুষ্ট স্বভাব, ভিক্ষা করা ইত্যাদি আসে। তমো গুণের প্রভাবে মানুষ কামুক হয়। তামসিক জীবনের ফলে ক্রমশ নীচ যোনিতে জন্ম হয়।

তমসা—তিনটি নদী। একটি মধ্যপ্রদেশে মাইহারের পার্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন ; রেওয়া'র মধ্য দিয়ে এলাহাবাদের ২৮ কি-মি দক্ষিণে গঙ্গায় এসে পড়েছে। দ্বিতীয়টি উত্তর প্রদেশে ফৈজাবাদ জেলার পশ্চিম দিক থেকে বার হয়ে ঘর্ঘরা ও গোমতীর মাঝ দিয়ে এগিয়ে এসে বালিয়া জেলাতে গঙ্গায় এসে মিশেছে। উত্তর প্রদেশে যমুনার পশ্চিমে বন্দরপুঞ্চ শৃঙ্গের কাছ থেকে আর একটি তমসা বার হয়ে যমুনাতে এসে মিশেছে। বাল্মীকির তমসা কোনটি মতভেদ আছে। বাল্মীকি তাঁর তমসার তীরে ক্রৌঞ্চ বধ দেখে ছিলেন। বনে যাবার সময় রাম এখানে এক রাত বাস করে ছিলেন। সুমন্ত্র রামকে এই নদী পর্যন্ত অনুগমন করেছিলেন।

তরণীসেন—বিভীষণের স্ত্রী সরমার ছেলে। বাল্মীকি রামায়ণে নাই। তরণীসেন ও রাম/বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন তবে রাবণকে ত্যাগ করেন নি। রাবণের আদেশে যুদ্ধে আসেন। রথে পতাকাতে ও নিজের দেহে সর্বত্র রাম নাম লিখে যুদ্ধে এসেছিলেন এবং লক্ষ্মণকে পরাজিত করেন। বিভীষণ ছেলের পরিচয় গোপন রেখে রামকে ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করতে পরামর্শ দেন। এই অস্ত্রে তরণীসেন মারা যান।

তরুণক—ধৃতরাষ্ট্র বংশে একটি সাপ। সর্পযজ্ঞে নিহত হয়।

তর্পণ—জল বা তিল মিশ্রিত জল পিতৃপুরুষ ইত্যাদিকে দেওয়া।

তলাতল—এখানে মায়াবী অসুর ময় বাস করেন। পাতালের (দ্রঃ) একটি এলাকা।

তাড়কা—যক্ষ সুরক্ষের নিঃসন্তান ছেলে সুকেতু তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে হাজার হাতীর সমান শক্তি এক মেয়ে পান। প্রসিদ্ধ জম্ভ দৈত্যের/ঝর্ঝের ছেলে সুন্দের সঙ্গে বিয়ে হয়। তাড়কা স্বভাবতই নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর ও মায়াবী ছিলেন। সন্তান হয় মারীচ ও সুবাহু। সুন্দ এক বার অগস্ত্য আশ্রম আক্রমণ করলে অগস্ত্যের ক্রোধে /শাপে পুড়ে ছাই হয়ে যান। তাড়কা তখন দুই ছেলেকে নিয়ে অগস্ত্যকে খেয়ে ফেলতে গেলে শাপে ভীষণ রাক্ষসীতে পরিণত হন। এরা তিন জনে প্রথমে সুমালীর সঙ্গে পাতালে যান পরে রাবণের কাছে আসেন এবং রাবণের সাহায্যেই পরে মলদ ও কারুষ (দ্র) দুটি সমৃদ্ধ জনপদ দখল করে নষ্ট করেন এবং গো-ব্রাহ্মণ ও আশ্রমবাসীদের ওপর অত্যাচার করতে থাকেন। মলদ ও কারুষ যমুনা তীরে দুটি পাশাপাশি রাজ্য। বৃত্র হত্যার পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য ঋষিরা এখানে ইন্দ্রকে স্নান করিয়েছিলেন। ইন্দ্রের মল ও করীষ (থুথু) এখানে পড়েছিল ফলে রাজ্য দুটির নাম। অগস্ত্যের তপোবন তাড়কার বনে পরিণত হয়। যজ্ঞ কর্ম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বিশ্বামিত্র (দ্রঃ) তার পর রাম লক্ষ্মণকে (দ্রঃ) নিয়ে আসেন। তাড়কা এদের আক্রমণ করেন এবং প্রথমে পাথরের চাঙড় ছুঁড়তে থাকেন তার পর সরাসরি তেড়ে আসেন। বাণবিদ্ধ করে রাম একে নিহত করলে রাক্ষসী এক গন্ধর্ব নারীতে পরিণত হয়ে স্বর্গে চলে যান। মারীচ বাণাহত হয়ে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে।

তান—সাতটি স্বরের ক্রমিক আরোহণ ও অবরোহণকে মূর্চ্ছনা বলা হয়। এই আরোহণ থেকে একটি বা দুটি স্বর লোপ বা অপকর্ষ করে তান নির্ণয় করা হয়। এক স্বর থেকে ষট্ স্বর পর্যন্ত তানকে যথাক্রমে আর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তর, ঔড়ব ও ষাড়ব। মূর্চ্ছনাকৃত তানগুলিকে বিপরীত ভাবে উচ্চারিত হলে তাকে কূটতান বলে।

তান্ত্রিকউপাসনা—উপাসনায় পশুভাব, বীর ভাব, দিব্যভাব নামে তিনটি ভাব এবং বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল সাত প্রকার আচার আছে। দ্রঃ বামাচার।

তামস্—চতুর্থ মনু। প্রথম মনু স্বায়ম্ভুবের ছেলে প্রিয়ব্রত। বিশ্বকর্মার মেয়ে সুরূপা ও বর্হিষ্মতীকে ইনি বিয়ে করেন। প্রথমা স্ত্রী সুরূপার অগ্নীধ্র ইত্যাদি দশ ছেলে এবং সব শেষে মেয়ে উর্জস্বতী। বর্হিষ্মতীর তিন ছেলে উত্তর, তামস ও রৈবত। এবং এঁরা তিন জনে তিনটি মন্বন্তরের অধিপতি। নর্মদা তীরে তপস্যা করেছিলেন। এঁর শাসন কালে চার ভাগ দেবতা :- সুপার, হরি, সত্য ও সুধী ; প্রতি ভাগে ২৭ দেবতা। ইন্দ্র :-শিবি। সপ্তর্ষি :-জ্যোতিষ্মান, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নিবনক, পীবর, নর। ছেলে খ্যাতি, কেতুরূপ, জানুজঙ্ঘ ইত্যাদি।

তামসী—এক রকম মায়াবিদ্যা। নিকুম্ভিলা যজ্ঞে তুষ্ট হয়ে মহাদেব ইন্দ্রজিৎকে এই বিদ্যা দান করেছিলেন। এই মায়ায় মেঘনাদ নিজেকে অদৃশ্য করে যুদ্ধ করতে পারতেন।

তাম্বুরা—তানপুরা। তুম্বুরু গন্ধর্ব নির্মিত বাদ্য যন্ত্র। বড় লাউয়ের খোলা দিয়ে

তৈরি ওপরে ফাঁপা একটি বাঁশের গায়ে ২-টি পেতল ও ২-টি লোহার তার। এটি টংকার যন্ত্র।

তাম্র—মুর নামে অসুরের ছেলে তাম্র, অন্তরীক্ষ, শরবণ, বসু, বিভাবসু, নভস্বান ও অরুণ। তাম্র মহিষাসুরের মন্ত্রী ছিলেন। কৃষ্ণের হাতে মুরাসুরের সঙ্গেই নিহত হন।

তাম্রলিপ্ত—মেদিনীপুরে তমলুক। রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরে। প্রাচীন দেশ ও বন্দর নগরী। কথাসরিৎসাগরে নাম তাম্রলিপ্তিকা, অভিধান চিন্তামণিতে তাম্রলিপ্ত, দামলিপ্ত, তামলিপ্তি, তমালিনী, বিষ্ণুগৃহ, স্তম্বপূ; ত্রিকাণ্ড শেষে নাম বেলাকূল। সিংহলে ধর্মগ্রন্থ মহাবংশে আছে অশোকের নির্দেশে বোধিদ্রুম চারা নিয়ে এখান থেকে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা সিংহলের জন্য যাত্রা করেন।

খৃ ১ শতকে প্লিনি ও ২-শতকে টলেমি এই নগরীর উল্লেখ করেছেন। এক শতকের গ্রীক সমুদ্র-বিবরণীতে গাঙ্গে মোহনায় অবস্থিত গাঙ্গে বন্দরের উল্লেখ আছে। চীন গ্রন্থ শুই-চিং-চু-তে আছে তাম্রলিপ্তের এক জন রাজা খৃ ৩-শতকে নানকিং-এর রাজদরবারে দূত পাঠিয়েছিলেন। খৃ ৫-শতকে জাহাজে করে ফা-হিয়েন এখান থেকে সিংহলে যান। খৃ ৭-শতকে ঈ-ৎসিঙ এখান থেকে সমুদ্র পথে সম্ভবত সুমাত্রা দ্বীপের পূর্বাঞ্চলে (শ্রীবিজয়) অভিমুখে যান। এই শতকে হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে আসেন; তাঁর লেখায় আছে একটি সংকীর্ণ খাড়ির ধারে এই বন্দর নগরী। এই তাম্রলিপ্তি পিছনের পশ্চাৎ-ভূমি সমস্ত উত্তর ভারতের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

এখানে হিন্দুধর্মই প্রধান ছিল; বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ও ছিল। হিউ-এন-ৎসাঙের সময় বহু মন্দির ও বৌদ্ধ মঠ ছিল। দশকুমার চরিতে (খৃ ৬-শতক) এখানে যবন নাবিকদের আসার কথা আছে। ৯-শতকেও এর খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল।

এখানে মৌর্য শুঙ্গ ও কুষাণ যুগের বহু পুরা বস্তু পাওয়া গেছে। প্রাক্-খৃষ্ট যুগেরও বহু জিনিস রয়েছে। কিছু মৃৎ-ফলকে জাতক ইত্যাদির বৌদ্ধ কাহিনীর ছায়া ফুটে রয়েছে। মৌর্যশৈলীর বস্তুগুলি উত্তর ভারতের নানা স্থানে প্রাপ্ত জিনিসগুলির সঙ্গে তুলনীয়। এ ছাড়াও গ্রীস ও রোমের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের পরিচায়ক বহু জিনিস পাওয়া গেছে। একটি পোড়া মাটির ফলক পাওয়া গেছে; এর ক্ষোদিত লিপি মনে হয় গ্রীক লিপি। লিপির অর্থ মনে হয় এক জন গ্রীক নাবিক নিরাপদ সমুদ্র যাত্রার জন্য পূবের বাতাসকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। খননের ফলে এখানে কয়েকটি যুগের পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রথম যুগে নবাশ্ম কুঠার ও সামান্য দগ্ধ কৌলাল। দ্বিতীয় যুগ (খৃ পূ ৩-২); ছাঁচে তৈরি তাম্র মুদ্রা, উত্তর দেশীয় কৌলালের অনুরূপ মৃৎপাত্র; মনোরম শৈলীতে নির্মিত পুতুল ইত্যাদি। তৃতীয় যুগ (খৃ ১-২ শতক মত) রোমক জগতের সঙ্গে বাণিজ্যের পরিচায়ক এক শ্রেণীর অসংখ্য মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। এই যুগে ইঁটের ধাপ যুক্ত পুষ্করিণী ও বাঁধান কূপ ছিল। চতুর্থ যুগে (খৃ ৩-৪ শতক) কুষাণ ও গুপ্ত যুগের অদ্ভুত সুন্দর পোড়া মাটির মূর্তি পাওয়া গেছে। বিস্তৃত ইতিহাস এখনও অজ্ঞাত।

তাম্রা—দক্ষকন্যা। কশ্যপের স্ত্রী। সন্তান ক্রৌঞ্চী (পেচক ইত্যাদি), ভাসী (ভাস ইত্যাদি), শ্যেনী, (চিল, শকুন ইত্যাদি) ধৃতরাষ্ট্রী (হংস, কোকিল ইত্যাদি), শুকী (নটা ইত্যাদি)। একটি মতে এই নটা বিনতার মা। বিনতার ছেলে গরুড় ইত্যাদি।

তারক—(১) তার অসুরের ছেলে। দ্রঃ বজ্রাঙ্গ। দেবতাদের জয় করার জন্য শৈশব থেকেই হাজার বছর তপস্যা করেও ঠিক কোন ফল হয় না। এর পর মাথা থেকে একটা তেজ বার হয়ে দেবতাদের পুড়িয়ে ফেলতে থাকে। দেবতারা তখন ব্রহ্মার শরণ নেন। ব্রহ্মা এর কাছে এলে তারক তার চেয়ে শক্তিশালী কেউ যেন না জন্মায় এবং এক মাত্র মহাদেবের ছেলের হাতে যেন মৃত্যু হয় দুটি বর চেয়ে নেন। অন্য মতে বর চেয়েছিলেন যদি মরতে হয় তাহলে সাত-দিন বয়স এই রকম শিশুর হাতে যেন মৃত্যু হয়। অন্য মতে শিবের কাছে বর পেয়েছিলেন। এর পর প্রসেন, জম্ভ, কাল-নেমি ইত্যাদির সঙ্গে যোগ দিয়ে তারক নির্ভয়ে দেবতাদের ওপর অত্যাচার করতে থাকেন। শিব এই সময় সতীর বিরহে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন/তপস্যা কর ছিলেন। দেবতারা আবার ব্রহ্মার কাছে এলে ব্রহ্মা শিবের যাতে সন্তান হয় সেই চেষ্টা করতে বলেন। বলেন সতী পার্বতী হয়ে জন্মাবেন এবং শিবকে স্বামী হিসাবে পাবার জন্য তপস্যা করবেন ; এঁদের সন্তান হলে তবেই তারক নিহত হবে। দেবতারা তখন চেষ্টা করে পার্বতীর (দ্র) সঙ্গে বিয়ে দেন এবং কার্তিকেয়র (দ্রঃ) জন্ম হয়। তারক কার্তিকেয়র হাতে মারা পড়েন। তারকের ছেলে তারাক্ষ, কমলাক্ষ, ও বিদ্যুন্মালী। দ্রঃ ত্রিপুর।

(২) নন্দগ্রামে এক গণিকা বাস করত ; নাম ছিল মহানন্দা। অত্যন্ত শিব ভক্ত। এর একটি পোষা বানর ও একটি পোষা মোরগ ছিল। এদের দুটিকে রুদ্রাক্ষের মালা পরিয়ে দিয়ে মহানন্দা যখন শিবের স্তব করতেন তখন এরা নাচত। এক বার এক বৈশ্য আসে ; এর কাছে একটি স্ফটিক শিবলিঙ্গ ছিল। মহানন্দা এটি নেবার জন্য লালায়িত হয়ে পড়েন এবং বৈশ্যকে প্রতিশ্রুতি দেন এটি পেলে তিন রাত্রি তাঁর বিশ্বস্ত স্ত্রী হয়ে কাটাবেন। বৈশ্য সম্মত হন। সেই রাতে তার পর উন্মত্ত সম্ভোগের পর ক্লান্ত হয়ে যখন ঘুমচ্ছিলেন তখন গৃহে আগুন লাগে। শিবলিঙ্গ আগুনে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বৈশ্যও এই দেখে আত্ম বিসর্জন করেন। মহানন্দা বিশ্বস্তা স্ত্রী হিসাবে আগুনে দেহ ত্যাগ করতে যান। কিন্তু মহাদেব দেখা দিয়ে নিবৃত্ত করেন এবং জানান তিনি বৈশ্য সেজে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। মহানন্দা তখন শিবলোকে যেতে চান ; এবং মহাদেব নিয়ে যান। বানর ও মোরগ-টিকে বর দিয়ে যান পর জন্মে এরা শিব ভক্ত হয়ে জন্মাবে এবং মোক্ষ পাবে। পর-জন্মে বানরটি কাশ্মীর রাজ ভদ্রসেনের ছেলে সুধর্মা হয়ে জন্মায় ; এবং মোরগটি মন্ত্রীর ছেলে হয়ে জন্মায়, নাম হয় তারক।

তারা—দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী ; চন্দ্র (দ্রঃ) এঁকে চুরি করেন ; ছেলে হয় বুধ। (২) বানর রাজ বালীর স্ত্রী ; সুষেণ বানরের মেয়ে ও অঙ্গদের মা। একটি মতে তারা ও রুমা (দ্রঃ) সমুদ্র মন্থনে উঠেছিলেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ; কখন কি করতে হবে ঠিক মত বলতে পারতেন। সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবার সময় তারা স্বামীকে বাধা দেন। রামায়ণ মতে তারা (৪।১৫।১৮) অঙ্গদের কাছে খবর পেয়েছিলেন ; চরেরা খবর দিয়েছিল ; রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করেছেন ইত্যাদি। এবং সুগ্রীবকে যৌব রাজ্যে অভিষিক্ত করতে বলেন। মহাভারতে এই তারা সর্বভূতরুতজ্ঞা (৩।২৬৪।১৯), সুগ্রীবের গর্জন শুনেই 'ক্ষত্তদার' রামচন্দ্রের কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং বালীকে

জানান। বালী অবশ্য তারার বাধা মানেন নি। মৃত্যু সময়ে বালী সুগ্রীবকে সব সময় তারার পরামর্শ নিয়ে রাজকার্য চালাতে বলে গিয়েছিলেন। রামের অনুরোধে সুগ্রীব (দ্র) এঁকে বিয়ে করেন। (৩) দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় মহাবিদ্যা। দক্ষ যজ্ঞে যাবার অনুমতি চেয়ে বিফল হলে সতী নিজের যে দশ রূপ মহাদেবকে দেখিয়ে ছিলেন তারই দ্বিতীয় রূপ।

তালকেতু—দ্রঃ মদালসা।

তালধ্বজ—(১) কার্তবীর্যের ৫-ম ছেলে জয়ধ্বজ। জয়ধ্বজের ছেলে তালধ্বজ। (২) নারদ এক বার বিষ্ণুর কাছে যান; জীবনের রহস্য জানতে। বিষ্ণু বলেন জীবন বলে কিছুই নাই, যা আছে সবই মায়া। নারদ তখন মায়াকে দেখতে চান। বিষ্ণু নারদকে নিয়ে গরুড়ের পিঠে বার হয়ে পড়েন। নদনদী পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে এঁরা কান্যকুব্জে এক হ্রদের ধারে এসে নামেন। এখানে কিছু ক্ষণ পায়চারি করে একটা গাছের নীচে সকলে বসলেন। কিছু ক্ষণ বিশ্রামের পর বিষ্ণু নারদকে জলাশয়ে স্নান করতে বলেন। নারদ বীণা ইত্যাদি বিষ্ণুর জিম্মায় রেখে জলে নেমে ডুব দিলে সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দরী নারীতে পরিণত হন; আগের সব স্মৃতি ভুলে যান। ইতিমধ্যে রাজা তালধ্বজ ঘোড়ায় চড়ে যেখানে এসে পৌঁছলে নারদকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে বিয়ে করে নিয়ে যান। নারদের নাম হয় সৌভাগ্যসুন্দরী। বার বছর এক সঙ্গে থাকার পর একটি ছেলে হয় বীরধর্মা এবং তার পর প্রতি দু বছর অন্তর অন্তর একটি করে সন্তান হতে থাকে; মোট বারটি ছেলে হয়। এর পর আরো আটটি ছেলে অর্থাৎ মোট বিশটি ছেলে হয়। এর পর এই বিশটি ছেলে বড় হলে তাদের বিয়ে হয় এবং তাদেরও ছেলে হয়। মস্ত বড় একটা পরিবার গড়ে ওঠে।

এর পর হঠাৎ এক দিন অন্য এক রাজা এসে কান্যকুব্জ আক্রমণ করলে তালধ্বজের ছেলে ও নাতিরা প্রায় সকলে মারা পড়ে; তালধ্বজ কোন মতে বেঁচে যান। সৌভাগ্যসুন্দরী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। পরিত্যক্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসে ছিন্নভিন্ন দেহ ছেলে নাতি ইত্যাদিকে দেখে রাণী মাটিতে পড়ে আর্তনাদ করতে থাকেন। বিষ্ণু তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে এসে জীবনের রূঢ় বাস্তব সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেন। তার পর তালধ্বজ ও সৌভাগ্যসুন্দরীকে নিয়ে গিয়ে সেই জলাশয়ে আবার ডুব দিয়ে স্নান করতে বলেন। সৌভাগ্যসুন্দরী ডুব দিয়ে নারদের বেশে উঠে আসেন; দেখেন বিষ্ণু তাঁর বীণা ইত্যাদি নিয়ে তখনও অপেক্ষা করছেন। বিষ্ণুকে দেখে সমস্ত ঘটনা নারদের মনে পড়ল; নারদ দেখতে পেলেন সবই মায়া। তালধ্বজ এ পর্যন্ত জলে নামেন নি; জল থেকে সৌভাগ্যসুন্দরীকে না উঠে আসতে দেখে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। বিষ্ণু তখন এঁকেও স্নান করতে বলেন। তালধ্বজ স্নান করলে তাঁর মনে বৈরাগ্য আসে এবং তপস্যা করে মোক্ষ লাভ করেন।

তিতিক্ষা—দক্ষ কন্যা। তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, মৈত্রী ইত্যাদি তের জন ধর্মের স্ত্রী।

তিত্তিরি—(১) এক রকম পাখী; দ্রঃ ত্রিশিরস্। (২) একটি সাপ; কদ্রুর ছেলে। (৩) বিশেষ জাতের ঘোড়া। (৪) যাস্কের এক শিষ্য।

তিব্বত—২৭°-৩৭°উ × ৭৮°২৫´-১০০°পূ। এসিয়াতে একটি সুউচ্চ মালভূমি; উচ্চতা সমুদ্র থেকে ৩৬০০-৪৮০০ মি। সংস্কৃত সাহিত্যে নাম কিম্নরখণ্ড বা ভোট দেশ।

সিন্ধু, শতদ্রু, ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার বহু উপনদীর এবং আরো বহু নদীর উৎস এখানে। মানস ও রাক্ষসতাল হ্রদ ও এইখানে।

জনশ্রুতি এখানে আদিমতম ও প্রাচীনতম রাজা এক জন ভারতীয়। খৃ-৬ শতকের শেষ ভাগে এখানকার রাজা স্রোঙ-বৎসন-স্গম-পো একটি চীনা ও একটি নেপালী রাজকুমারীকে বিয়ে করেন। এঁরা দু জনেই বৌদ্ধ ছিলেন। ফলে রাজা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন এবং পণ্ডিতদের পাঠিয়ে ভারতীয় লিপির অনুকরণে এক লিপি তৈরি করিয়ে দেশে প্রচলিত করেন। খৃ ৮-শতকে নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ শান্তি রক্ষিত তিব্বতের রাজার নিমন্ত্রণে এখানে গিয়ে এখানকার বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার করেন। তাঁর ভগ্নীপতি পদ্মসম্ভবও ঐ কাজে সাহায্যের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন। মগধের ওদন্তপুরী বিহারের অনুকরণে রাজধানী লাসায় তিব্বতের রাজা একটি বিহার তৈরি করিয়েছিলেন; শান্তি রক্ষিত এখানে অধ্যক্ষ হন। শান্তি রক্ষিত ও পদ্ম সম্ভব এখানে লামা সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন; পূজনীয়ার্থে সংস্কৃতে উত্তর শব্দের তিব্বতী প্রতিশব্দ 'লামা'। ১০৩৮ খৃ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এখানে আসেন এবং এখানে ধর্মের বিশেষ সংস্কার করেন। এর পর ১৩ শতকে কুবলাই খাঁ চীন ও তিব্বত জয় করলে লামাদের প্রতিপত্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। কুবলাই খাঁ পরে বৌদ্ধ ধর্মকে তাঁর রাজ্যে প্রধান স্থান দেন।

তিমিধ্বজ—বৈজয়ন্ত পুরের রাজা; এক জন অসুর। অপর নাম শম্বর। এই শম্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দশরথ দেব লোকে যান।

তিলক—চন্দন, মাটি, গিরিমাটি, তুলসী মাটি, নদী তীরের মাটি, মন্দির সংলগ্ন মাটি, ইত্যাদি নানা মাটি দিয়ে দেহে যে টিপ/রেখা অঙ্কন করা হয়। তিলকের রঙ, আকার, আকৃতি, তিলক ধারণের সময়, কোন আঙুল দিয়ে দেহে কোথায় আঁকা হয়েছে এই সব কিছু মিলে তিলকের বিশেষ বিশেষ ফল। আঁকার সময় নির্দিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট দেবতাকে স্মরণ করতে হয়। ঊর্ধ্ব পুণ্ড্র একটি তিলক বিশেষ।

তিলোত্তমা—(১) কপিলা অন্য মতে প্রধার মেয়ে; রম্ভা ইত্যাদির বোন। (২) সুন্দ উপসুন্দ (দ্রঃ) দৈত্য দু জনকে দমন করার জন্য দেবতারা ব্রহ্মার স্মরণ নিলে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে ব্রহ্মা এঁর সৃষ্টি করান। ত্রিভুবনের সমস্ত উত্তম জিনিস তিল তিল সংগ্রহ করে এনে এঁকে তৈরি করা হয় বলে এই নাম। অন্য মতে ব্রহ্মা হীরক কুঁচি দিয়ে গড়েন। সৃষ্টির পর বিদায় নেবার সময় তিলোত্তমা দেবতাদের প্রদক্ষিণ করেন। এই সময়ে এঁকে দেখবার জন্য ব্রহ্মার চার দিকে চারটি মুখ হয়; ইন্দ্র সহস্রচক্ষু হন; শিব নিশ্চল হয়ে স্থাণু হয়ে যান এবং মোট ৫টি মাথা হয়। ব্রহ্মা তার পর এঁকে সুন্দ উপসুন্দের কাছে পাঠিয়ে দিলে এঁকে বিয়ে করবার জন্য দুই ভাই মারামারি করে দু জনেই মারা পড়েন।

তিলোত্তমা এক বার বলির ছেলে সাহসিকের সঙ্গে খেলায় মত্ত হয়ে ও দুর্বাসার ধ্যান ভঙ্গ করলে ঋষির শাপে বাণের কন্যা ঊষা (দ্রঃ) হয়ে জন্মাতে হয়।

তীরভুক্তি—প্রাচীন বিদেহের পরবর্তী নাম। বৈয়াকরণ বামন একে একটি দেশ বলেছেন। বৃহৎ-বিষ্ণু পুরাণে এর সীমানা উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে গঙ্গা, পূর্বে কোশী পশ্চিমে গণ্ডক। শক্তিসংগম তন্ত্রে গণ্ডকী ও চম্পারণ্যের মধ্যে অবস্থিত। প্রাচীন

তীরভুক্তি থেকে বর্তমানে অপভ্রংশ শব্দ ত্রিহুৎ।

তীর্থ—পুণ্য স্থান। এক অনার্য দৃষ্টিভঙ্গি মনে হয়; পরে আর্যরা একে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যাস্ক এক জন প্রাচীন ঋষি ঔর্ণবাভ-এর মত উল্লেখ করেছেন। এতে বোঝা যায় গয়শিরঃ (বর্তমানে গয়া) উত্তর বৈদিক যুগে তীর্থ ছিল। উত্তর বৈদিক যুগে কুরুক্ষেত্রও তীর্থ বলে স্বীকৃত হয়েছিল। প্রাচীন কালে দুটি নদীর সংগম স্থানকে তীর্থ বলা হয়েছে। পৌরাণিক যুগে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র ও মগধে তীর্থ যাত্রার কথা আছে। খৃ-পূ ৩ শতকে অশোকের শিলালিপিতে পুণ্যার্জনের জন্য তীর্থ যাত্রার কথা আছে। লুম্বিনি ও বোধগয়াতে অশোক তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। খৃ ২ শতকে পশ্চিম ভারতে এক জন হিন্দুধর্মাবলম্বী শক নায়ক প্রভাস, পুষ্কর ইত্যাদি তীর্থে গিয়েছিলেন। ৫ শতকে উত্তর বাংলা থেকে এক জন নেপালে বরাহক্ষেত্রে তীর্থে গিয়েছিলেন। ৬ শতকে পূর্ব মালবের এক রাজা প্রয়াগে আত্মহত্যা করেন। দুটি নদীর সংগম স্থল, দেবদেবীর মন্দির স্থান, সাধকের সিদ্ধিলাভ ক্ষেত্র ইত্যাদি তীর্থ বলে স্বীকৃত হয়। পুরাণে সাধারণত তীর্থগুলির বিস্তৃত বিবরণ আছে। স্নানের সময় মন পবিত্র ও নির্মল না থাকলে অবশ্য কোন পুণ্য হয় না। মহাভারত ও পুরাণ ইত্যাদি মিলে তীর্থ সংখ্যা বহু। এগুলির বেশির ভাগই আজ আর চিনে ওঠা সম্ভব নয়। কেবল মাত্র নামেই পর্যবসিত। সামান্য কয়েকটি তীর্থ যেমন কন্‌খল, গয়া, প্রয়াগ, বারাণসী ইত্যাদি আজও পুণ্যার্থীদের আকর্ষণ করে। কিছু তীর্থের অবশ্য নাম বর্তমানে অন্য। কয়েকটি প্রাচীন তীর্থ অরুন্ধতীবট, কপিলাবট, কন্যাতীর্থ, কালঞ্জর, কোটিতীর্থ, চীরবতী, জাতিস্মর, মধুস্রব, ভৃগুতুঙ্গ, বেণ্ণা, লবেডিকা, সপ্তগোদাবরী, সপ্তসারস্বত, স্বস্তিপুর ইত্যাদি মহা ৩।৮১।—।

তীর্থংকর—যিনি তীর্থ করেন। জৈন (দ্র) শাস্ত্রে এর অর্থ একটু আলাদা। সাধু সাধ্বী শ্রাবিকা সংঘও তীর্থ। যাঁরা কেবল জ্ঞান লাভ করে এই রকম সঙ্ঘ স্থাপন করেন তাঁদের তীর্থংকর বলা হয়। তীর্থংকরদের উপদেশ মালা হচ্ছে শ্রুতি-সাহিত্য। বন্ধন মুক্ত কেবলীরা সামান্য কেবলী। কেবল জ্ঞান লাভ করে যাঁরা তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন তাঁরাই তীর্থংকর। জৈনধর্মে অবতার নেই। তীর্থংকররা ফলে বহু জ্ঞানের অধিকারী পরিপূর্ণ মুক্ত আত্মা। জৈন সাহিত্যে ২৪ জন তীর্থংকর ছাড়াও কিছু অতীত ও ভবিষ্যৎ তীর্থংকরদের উল্লেখ আছে।

তুগ্র—ঋক্‌বেদে এক বিখ্যাত রাজা। রাজপুত্রকে বহু সৈন্য দিয়ে সমুদ্রপথে দ্বীপান্তরে শত্রুজয় করতে পাঠান। সমুদ্রে বেশ অনেকটা এগিয়ে গেলে ঝড়ে এদের নৌকা উল্টে যায় এবং রাজপুত্র ও সৈন্যেরা জলে পড়ে যান। রাজপুত্র তখন অশ্বিনীদেবদের প্রার্থনা করলে অশ্বিনীদেবরা এদের সকলকে জল থেকে তুলে প্রাসাদে পাঠিয়ে দেন।

তুণ্ড—দ্রঃ অশোক সুন্দরী, নহুষ। অনেক সময় হুণ্ড নামে পরিচিত।

তুণ্ডিকের—অবন্তি (?)। একটি দেশ; এখানকার অধিবাসীরা কুরুক্ষেত্রে যোগ দিয়েছিল।

তুম্বুরু—এক জন গন্ধর্ব। বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী। ব্রহ্মার কাছে সঙ্গীত শিখেছিলেন। চৈত্র মাসে সূর্যের রথে অবস্থান করেন। প্রধা ও কশ্যপ সন্তান। তুম্বুরু, বাহু, হাহা, হুহু, চার জন বিখ্যাত গন্ধর্ব। ব্রহ্মার প্রতি আসক্ত হয়ে অনুপস্থিত

থাকার জন্য প্রভু কুবেরের শাপে বিরাধ রাক্ষসে পরিণত হন। ব্রহ্মার কাছে বিরাধ অবধ্য হবার বর পান। এঁর বিকট দেহ, রক্তাক্ত কলেবর, পরণে বাঘছাল। দণ্ডকারণ্যে রাম-লক্ষ্মণ একে পরাজিত করে জীবন্ত পুঁতে ফেলেন। সুন্দর দেহ ধরে তুম্বুরু শাপ মুক্ত হয়ে বার হয়ে আসেন। তুম্বুরুর শাপেই উর্বশী ও পুরূরবার (দ্রঃ) বিচ্ছেদ ঘটেছিল। গন্ধর্বরা উর্বশীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তুম্বুরু পাণ্ডবদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ; যুধিষ্ঠিরকে এক শত ঘোড়া উপহার দিয়েছিলেন। পূর্ণিমার দিন গন্ধমাদন পর্বতে তুম্বুরুর গান শোনা যায়। দ্রঃ তানপুরা।

তুর্বশ—ঋক্‌বেদে এক রাজা।

তুর্বসু—যযাতি দেবযানীর এক ছেলে। তুর্বসুর ভাই যদু। তুর্বসু জরা নিতে রাজি না হলে যযাতি (দ্রঃ) শাপ দেন।

তুষার—প্রাচীন ভারতে একটি দেশ। বর্তমানের (?) তুখারিস্তান। এদের তুষার বলা হত ; রাজাও এখানে তুষার নামে পরিচিত। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এই তুষার রাজ ভাণ্ডার রক্ষক ছিলেন। বনবাসের সময় এই রাজ্য অতিক্রম করে পাণ্ডবরা দ্বৈত বনে গিয়েছিলেন। শান্তি পর্বে আছে মান্ধাতার দেশে তুষার নামে একটি বর্বর জাতি বাস করত। ক্রৌঞ্চব্যূহে (মহা ৬।৭১।২০) ও তুষাররা উপস্থিত ছিল।

তুষিত—চাক্ষুষ মন্বন্তরে বার জন দেবতা বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিতির পুত্র হয়ে জন্মান। বৈবস্বতে এঁরা বার জন আদিত্য।

তুষ্টি—(১) দক্ষের মেয়ে ; ধর্মের স্ত্রী। (২) চন্দ্রের কলা : পূষা যশা, সুমনশা, রতি, প্রাপ্তি, ধৃতি ঋদ্ধি, সৌম্যা, মরীচি, অংশুমালিনী, অঙ্গিরা, শশিনী, ছায়া, সম্পূর্ণমণ্ডলা, তুষ্টি, অমৃতা। অন্য মতে নাম অমৃতা, মানদা, পূষা, পুষ্টি, তুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, রঙ্গদা, পূর্ণা, অপূর্ণা। বহু মতে (রঘুনন্দন) অমা আর একটি কলা।

তুলসী—রাধার সহচরী। স্বর্গে এক দিন কৃষ্ণের সঙ্গে তুলসীকে বিহার করতে দেখে রাধিকা একে মানবী হয়ে জন্মাবার শাপ দেন। অন্য মতে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা তিন জনে বিষ্ণুর স্ত্রী। বিষ্ণু ও গঙ্গাকে পরস্পরের প্রতি এক দিন বিশেষ ভাবে অনু-রক্ত হয়ে উঠতে দেখে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা তিনজনের মধ্যে হাতাহাতি আরম্ভ হয়ে যায় এবং সরস্বতী শাপ দেন লক্ষ্মী পৃথিবীতেগাছ হয়ে জন্মাবেন। গঙ্গা এই শাপ দেওয়া সহ্য করতে না পেরে সরস্বতীকে নদী হয়ে জন্মাবার শাপ দেন এবং সরস্বতীও পাল্টা শাপ দেন গঙ্গা নদী হয়ে জন্মাবেন। এই সব ঝগড়া মিটলে বিষ্ণু লক্ষ্মীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন পৃথিবীতে রাজা ধর্মধ্বজের মেয়ে হয়ে জন্মাবেন। তার পর গাছে পরিণত হবেন এবং এই গাছ ত্রিভুবনকে পবিত্র করে দেবে। গাছের নাম হবে তুলসী। শঙ্খচূড় দৈত্যের সঙ্গে বিয়ে হবে। এবং শেষ অবধি লক্ষ্মী গোলকে ফিরে আসবেন। পবিত্র নদী পদ্মাবতীও লক্ষ্মীর অংশে উৎপন্ন হবে।

লক্ষ্মী তার পর ধর্মধ্বজের (দ্রঃ বৃষধ্বজ) স্ত্রী মাধবীর গর্ভে জন্মান। একটু বয়স হলে বনে গিয়ে ব্রহ্মার তপস্যা করে নারায়ণকে স্বামী রূপে চান। ব্রহ্মা বর দেন প্রথমে কৃষ্ণের অঙ্গজাত সুদামের স্ত্রী হতে হবে পরে বিষ্ণুকে পাবেন। এবং নারায়ণের নির্দেশ মত তুলসী গাছ হয়েও জন্মাতে হবে ; তুলসী না হলে নারায়ণের পূজা হবে

ত্বষ্টাধর—শুক্রাচার্যের ছেলে। আর এক ছেলে অত্রি।
ত্রয্যারুণ—ত্রিশঙ্কুর পিতা।
ত্রসদস্যু—ইক্ষ্বাকু বংশে এক জন পুণ্যশ্লোক রাজা। যুবনাশ্ব>মান্ধাতা>পুরুকুৎস> ত্রসদস্যু। দস্যুদের ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন বলে এই নাম। এক জন রাজর্ষিতে পরিণত হন। অশ্বিনীদেবরা এক বার এঁকে পরাজয় থেকে রক্ষা করেন। এক বার অগস্ত্য, শ্রুতর্বা, এবং ব্রধ্রাশ্ব তিনজন মুনি এঁর দেশে আসছেন খবর পেয়ে রাজা তাঁর রাজ্যের সীমানাতে গিয়ে এঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসেন। এরা কিছু অর্থ চেয়েছিলেন ; কিন্তু রাজার দেবার কোন সঙ্গতি ছিল না। (মহা ৩।৯৬।১৪।)
ত্রসরেণু—ওজনের (দ্র:) পরিমাণ।
ত্রিকোনমিতি—রেখা গণিতের এই অংশ প্রাচীন ভারতে বেশ কিছু আলোচিত হয়েছিল। ভারতে ৩°৪৫´ অন্তর অন্তর সাইন সারণী তৈরি হয়েছিল। সাইন$^2\theta$+কস$^2\theta$ =১ ; কসθ=সাইন (৯০−θ) এবং ১−কস২θ=২সাইন$^2\theta$ সূত্রগুলি তাঁরা ব্যবহার করেছিলেন। খৃ ৮-শতকে আরবরা এই বিষয়গুলি অনুবাদ করে নেন। সূর্য সিদ্ধান্তে এই রকম বহু গাণিতিক তথ্য রয়েছে এবং এগুলি ১৬ শতকের আগে ; ইউরোপে জানা ছিল না। ভারতীয় নাম সাইন=জ্যা, কোসইন=কোটিজ্যা ; ভারসাইন=উৎক্রমজ্যা।
ত্রিকূট—(১) সুমেরু পাহাড়ের ছেলে ; ক্ষীরোদ সাগর থেকে উদ্গত। এর তিনটি শৃঙ্গ ; প্রথমটি সোনার, দ্বিতীয়টি রূপার এবং তৃতীয়টি বৈদূর্য, ইন্দ্রনীল ইত্যাদি মণির তৈরি। তৃতীয় শৃঙ্গটি সর্বশ্রেষ্ঠ। এই ত্রিকূটে দেবর্ষিরা থাকতেন। অপ্সরা, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব ও কিন্নর ইত্যাদির লীলাভূমি। (২) তিনটি শৃঙ্গযুক্ত, লবন সমুদ্রের একটি পাহাড়। এই পাহাড়ে লঙ্কা অবস্থিত। বাসুকি ও বায়ুর মধ্যে এক বার তর্ক হয় কে বড়। বাসুকি মেরু পর্বতকে জড়িয়ে ধরেন এবং বায়ু পর্বতকে উড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেন। ঝড়ে এত ধুলা ওড়ে যে সমস্ত পৃথিবী চাপা পড়ে যায়। দেবতারা ভয়ে বিষ্ণুর শরণ নেন। বিষ্ণু বাসুকিকে বোঝালে বাসুকি মেরু পর্বতকে ছেড়ে দেন ; বায়ু তখন এই পাহাড়ের তিনটি শিখরকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে দ-সমুদ্রে ফেলে দেন— এই ত্রিকূট পাহাড়ের ওপর লঙ্কা।
ত্রিগর্ত—বর্তমান কাংড়া
ত্রিজট—অপর নাম গার্গ্য (দ্র)। পিঙ্গলবর্ণ একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। উঞ্ছবৃত্তিঃ ফালকুদ্দাললাঙ্গলী (রা ২।৩২।২২) বনে মাটিতে গর্ত করে বাস করতেন। তরুণী স্ত্রীর অনুরোধে শাটী পরেই ছুটে আসেন। রাম এঁকে এঁর লাঠিটি যতদূর সম্ভব দূরে ছুঁড়ে ফেলতে বলেন। ত্রিজট লাঠিটি ছুঁড়ে সরযূর অপর পারে ফেলে দিলে সেই পর্যন্ত যতগুলি গরু চরছিল সেইগুলি রাম এই ব্রাহ্মণকে দান করেন।
ত্রিজটা—রাবণের অন্তঃপুরিকা এক জন রাক্ষসী। রাবণের আদেশে সীতাকে পাহারা দিতেন। ইনি ধার্মিক ও সরমার মত সীতার প্রতি সদয় ছিলেন। রাবণের আদেশে রাক্ষসীরা সীতাকে ভয় দেখিয়ে রাবণকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে থাকে। কিন্তু সীতা রাজি না হওয়াতে সকলে সীতার অঙ্গহানি করবে বলে সীতাকে শাসাতে থাকে। ত্রিজটা এদের থামান এবং নিজের দুঃস্বপ্নের কথা এদের বলেন। স্বপ্নে

দেখেছিলেন সীতা রামের সঙ্গে মিলিত হয়ে দিব্যরথে চড়ে লক্ষ্মণকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন এবং রাবণ খরবাহিত রথে চড়ে দক্ষিণে যাচ্ছেন ; রাক্ষসরাও যাচ্ছেন এবং লঙ্কাপুরী চুরমার হয়ে ছাই হয়ে গেছে। ইন্দ্রজিতের বাণে রামলক্ষ্মণ অজ্ঞান হয়ে গেলে রাবণ সীতাকে যুদ্ধক্ষেত্র দেখিয়ে আনেন। এ সময় অশোকবনে ব্যাকুল সীতাকে ত্রিজটা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন ওঁরা অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। লঙ্কা জয়ের পর রামচন্দ্র এঁকে পুরস্কার দিয়েছিলেন।

ত্রিত—এক গৌতম মুনির ছেলে একত, দ্বিত ও ত্রিত। (মহা ৯।৩৫।-) পিতার মৃত্যুর পর এঁরা ঠিক করেন বহু পশু সংগ্রহ করে মহাফলপ্রদ যজ্ঞ করে সোম রস পান করবেন। বহু গরু সংগ্রহ করে এঁরা বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন ; ত্রিত সামনে ছিলেন। ত্রিতকে ফেলে রেখে সমস্ত গরু নিয়ে আর দুই ভাই পেছন থেকে পালিয়ে যান। কারণ ত্রিত বেদজ্ঞ এবং যজ্ঞ করলে ত্রিতই বেশি পুণ্য অর্জন করবে। মনো-কষ্টে ঘুরতে ঘুরতে একটি মতে সরস্বতী নদী তীরে এসে উপস্থিত হন। বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এক নেকড়ে বাঘ দেখে ভয় রাত্রিতে এক শুষ্ক কূপের মধ্যে ত্রিত পড়ে যান। ত্রিত তার পর এই কূপের মধ্যেই যজ্ঞ করতে থাকেন। তাঁর গলা শুনে/বেদপাঠ শুনে বৃহস্পতি ও দেবতারা এসে যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করেন এবং বর দিতে চাইলে ত্রিত কূপ থেকে বার হয়ে আসতে চান এবং সেই কূপের জল যে স্পর্শ করবে সেই সোমপায়ী গতি লাভ করবে বর চান। দেবতাদের বরে সেই কূপ থেকে সরস্বতী নদীর জন্ম হয়। অন্য মতে সরস্বতীর জলে কূপ ভরে ওঠে ; ত্রিত জলে ভেসে বার হয়ে আসেন। বার হয়ে এসে ত্রিত দুই ভাইকে শাপ দেন তারা নেকড়ে বাঘের মত ভীষণ পশুতে পরিণত হবে এবং তাদের সন্তানরা ভাল্লুক ও বানর হয়ে জন্মাবে। আর একটি কাহিনীতে মরুভূমির মধ্যে এরা এক বার পথ হারিয়ে ফেলেন এবং ভীষণ তৃষ্ণা পায়। এর পর একটি কূপ খুঁজে পেয়ে ত্রিত কূপের মধ্যে নেমে গিয়ে নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করেন এবং ভাইদের জন্য জল নিয়ে উঠে আসেন। এরা দুই ভাই জল খেয়ে ত্রিতকে কূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে কূপের ওপর গরুর গাড়ির এক চাকা চাপা দিয়ে চলে যান। অশ্বিনীদেবের স্তব করলে এঁরা ত্রিতকে উদ্ধার করেন। আর এক মতে অগ্নির সৃষ্ট ত্রিত জল আনতে গিয়ে কূপে পড়ে যান ; দানবরা কূপ চাপা দিয়ে বন্ধ করে দেন। কিন্তু ত্রিত কূপের ওপর দিক ভেঙে বার হয়ে আসেন। আর একটি মতে দেবতারা যজ্ঞ করতে করতে হবিতে হাত মাখামাখি হয়ে যায়। তখন সেই হাত পরিষ্কার করবার জন্য এঁদের জন্ম।

ত্রিদস্যু—অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার সন্তান।

ত্রিনেত্র—মহিষাসুরের তিন জন উপদেষ্টা মন্ত্রী : বাস্কল, ত্রিনেত্র ও কালান্ধক।

ত্রিপিটক—বুদ্ধ বচন সংগ্রহ। সাধারণত তিনটি বিভাগ : বিনয় পিটক, সূত্র পিটক ও অভিধর্ম পিটক। বিনয় পিটকে কায় ও বাক্যকে বিনীত করে তোলার উপদেশ। সূত্র পিটকে আত্মহিত ও পরহিত ইত্যাদি সূচনা করে এই রকম উপদেশগুলি এখানে সুতা দিয়ে মালার মত গাঁথা রয়েছে বলে এই নাম। এর শিক্ষা সাধারণ ব্যবহার ও লৌকিক শিক্ষা ; সংযম ও আত্ম সংযমের উপদেশ এখানে রয়েছে। অভিধর্ম পিটক হচ্ছে অতিরিক্ত বা বিশিষ্ট অংশ। এর শিক্ষা পরমার্থ শিক্ষা। পিটক অর্থে পেটিকা

বা ভাজন বা মঞ্জুষা। বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের পর তাঁর ৫০০ অর্হৎ শিষ্য রাজগৃহে জমা হয়ে বুদ্ধের বচন গুলি সংগ্রহ করে সম্পাদন ও সংকলিত করেন। যত দিন না এগুলি লেখা হয়েছিল তত দিন মুখে মুখে চালু ছিল। বিনয় পিটক আয়ত্ত হলে চারিত্রিক গুণ সম্পন্ন হয়ে ত্রিবিদ্যা আয়ত্ত হয়; জন্ম মৃত্যুর জ্ঞান, আস্রবক্ষয় সম্বন্ধে জ্ঞান, জাতিস্মরতা ও দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়। সূত্র পিটক আয়ত্ত হলে ছয়টি অভিজ্ঞান লাভ করা যায়। অভিধম্ম পিটক আয়ত্ত হলে প্রজ্ঞাবান হয়ে চার প্রকার প্রতিসংবেদ লাভ হয়। পালি ত্রিপিটক প্রাচীনতম ও ব্যাপকতম। এতে বিনয় অংশে ৬ ভাগ, সূত্র অংশে ৫ ভাগ, অভিধম্ম অংশে ৭-টিভাগ।

ত্রিপুর—তিন ভাই বা এদের তিনটি পুরী। দৈত্যরা হেরে গেলে তারকাসুরের তিন ছেলে তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুৎমালী তপস্যায় ব্রহ্মার কাছে বর পান তারা তিনটি আলাদা আলাদা পুর অর্থাৎ নগরে বাস করবেন। পুরগুলি ইচ্ছা মত সঞ্চরণ করতে পারত। এই পুরে তাঁদের অভীষ্ট সব কিছু থাকবে এবং কেউ এই নগর তিনটি ধ্বংস করতে পারবে না; ব্রহ্ম শাপেও নয়। হাজার বছর পরে তিন ভাই মিলিত হবেন এবং তাঁদের তিনটি পুরও মিলিত হবে এবং তখন যে দেবতা একটি বাণে এই তিনটি ভেদ করতে পারবেন তিনিই তাঁদের নিহত করতে পারবেন। ময় দানবকে দিয়ে স্বর্গে তারকাক্ষের জন্য স্বর্ণময় পুর, অন্তরীক্ষ কমলাক্ষেব জন্য রৌপ্যময় পুর এবং পৃথিবীতে বিদ্যুৎমালীর জন্য লৌহময় পুর এঁরা তৈরি করিয়ে নেন। অসুর বিরোচনের ছেলে বলি এবং বলির ছেলে বাণ; বাণ এই পুর তিনটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তিনটি পুর এক সঙ্গে ত্রিপুর নামে অভিহিত। তারকাক্ষের ছেলে হরি আবার তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে প্রতিটি পুরে একটি করে মৃত সঞ্জীবনী সরোবর তৈরি করে নেন। এখানে মৃত দৈত্যদের ফেলে দিলে তাঁরা বেঁচে উঠতেন। এর ফলে দেবতাদের ওপর অত্যাচার বেড়ে চলতে থাকে। ইন্দ্র ত্রিপুরের কাছে পরাজিত হন এবং ইন্দ্র তখন শিবকে দিয়ে ত্রিপুর নিধন করেন।

আর এক মতে ইন্দ্র পরাজিত হলে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে যান এবং ব্রহ্মা তাঁদের শিবের কাছে পাঠান। শিব এঁদের বধ করতে রাজি হন। শিব তার পর নারদকে ত্রিপুরে পাঠান। নারদের চেষ্টায় অসুর স্ত্রীরা ক্রমশ দেব ভক্ত হয়ে উঠতে থাকেন। শিব এই সময় নর্মদার তীরে এসে বাস করতে থাকেন এবং দেবতাদের কাছ থেকে অর্ধ পরিমাণ হিসাবে তেজ নিয়ে সব দেবতার বড় মহাদেবতাতে পরিণত হন। মহাদেব তারপর দেবতাদের কাছে রথ ও ধনুক চাইলে বিশ্বকর্মা তখন পৃথিবী, দেবী, মন্দর পর্বত, হিমালয়, বিন্ধ্য, দিকবিদিক, নক্ষত্র মণ্ডল, সপ্তর্ষি মণ্ডল, দিনরাত্রি শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ, সিন্ধু, গঙ্গা, সরস্বতী, বাসুকি প্রভৃতির অংশ নিয়ে রথ তৈরি করে দেন। চন্দ্র ও সূর্য রথের চাকা হন। ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের এই চার জন লোকপাল ঘোড়া হন। সুমেরু হয় রথের ধ্বজদণ্ড; বিদ্যুন্ময় মেঘ হয় পতাকা। মহাদেব সংবৎসরকে/মন্দারপর্বতকে ধনু ও কালরাত্রিকে/বাসুকিকে জ্যা করেন। বিষ্ণু অগ্নি ও চন্দ্র মহাদেবের বাণ হন; ব্রহ্মা হন রথের সারথি। রথের ধ্বজে অবস্থিত বৃষের গর্জনে ত্রিভুবন কাঁপতে থাকে। আর এক মতে শিবের এক পাশে যম ও এক পাশে কালরাত্রি অবস্থান করেন। বিষ্ণু বাণ হন বাণের মুখে অগ্নি এবং পুচ্ছে বায়ু

অবস্থান করেন। এতগুলি দেবতা এক সঙ্গে থাকাতে ভারে রথ মাটিতে বসে যায় বিষ্ণু তখন বাণ থেকে বার হয়ে বৃষ হয়ে মাটি থেকে রথ তুলে দেন। মহাদেব তখন ঘোড়ার পিঠে এক পা ও বৃষরূপী নারায়ণের পিঠে আর এক পা রেখে দানবপুর তিনটি দেখতে থাকেন। মহাদেব এই সময়ে অশ্বের স্তন ছেদ করেন এবং বৃষের খুর দু ভাগ করে দেন। সেই থেকে অশ্বজাতির স্তন নাই এবং গোজাতির ক্ষুর খণ্ডিত। মহাদেব তারপর পাশুপত অস্ত্র জুড়ে অপেক্ষা করতে থাকেন এবং ত্রিপুর মিলিত হলে পাশুপত অস্ত্রে দানব সমেত তিনটি পুরকে পুড়িয়ে পশ্চিম সাগরে ফেলে দেন।

ত্রিপুরারি—ত্রিপুর (দ্রঃ) ধ্বংসকারী ; মহাদেব।

ত্রিবক্রা—দ্রঃ কুব্জা।

ত্রিবর্চস্—এক জন মুনি। কশ্যপ, প্রাণ, চ্যবন, অগ্নি এবং এই মুনি মিলে ৫ জনে তপস্যা করে অগ্নির সমান উজ্জ্বল একটি পুত্রের জন্ম দেন। সন্তানের নাম হয় তপ (দ্র) বা পাঞ্চজন্য। (মহা ৩।২১০।১)

ত্রিবার—গরুড়ের একটি ছেলে। অন্যান্য নামকরা ছেলে অনঘ, অনল, অনিল, কপোত, কাশ্যপি, কুণ্ডলী, কুমুদ, কুমার, গুরুভার, চণ্ডতুণ্ডক, চিরান্তক দারুণ, দিশাচক্ষু, দক্ষ, দ্বীপক দৈত্যদ্বীপ, দিবাকর, ধ্বজবিষ্কম্ভ, নাগাশী, নিমেষ, নিমিষ, নিশাকর, পদ্মকেসর, পরিবর্হ বৈনতেয়, বামন, বাতবেগ, বাল্মীকি, বিষ্ণুধন্বা, বিশালাক্ষ, চিত্রবর্হ, মধুপর্ক, মলয়, মাতরিশ্বা, মেঘকৃৎ, সারস, সর্পান্ত, সপ্তবার, সরিৎ-দ্বীপ, সুবর্ণচূড়, সুমুখ, সুখকেতু, সোমভোজন, সূর্যনেত্র, সুস্বর, হরি, হেমবর্ণ, (মহা ৫।৯৯।৯)।

ত্রিমূর্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের দেবতা।

ত্রিরুম্ন—দ্রঃ ত্রিশরণ।

ত্রিলোচন—শিবের একটি নাম। হিমালয়ে মহাদেব যখন তপস্যা করছিলেন তখন পার্বতী খেলার ছলে মহাদেবের দুই চোখ চেপে ধরলে মহাদেবের কপালে তৃতীয় চোখ ফুটে ওঠে। এই চোখের দৃষ্টি ধ্বংসকারী, কামদেব এই চোখের আগুনে মারা যান।

ত্রিশঙ্কু—হরিবংশ অনুসারে মান্ধাতার বংশে ত্রসদস্যু>অনরণ্য>ত্রয্যারুণ/অরুণ> সত্যব্রত। এই সত্যব্রতই ত্রিশঙ্কু নামে পরিচিত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সত্যব্রত দুষ্ট ও কামুক হয়ে ওঠেন। এক দিন এক ব্রাহ্মণের গৃহ থেকে কন্যা সম্প্রদানের মুহূর্তে মেয়েটিকে পিঁড়ি থেকে গায়ের জোরে অপহরণ করেন। ফলে রাজা ত্রয্যারুণ ছেলেকে বারো বছরের জন্য তাড়িয়ে দেন। কোথায় থাকবেন জানতে চাইলে রাজা তাঁকে চণ্ডালদের সঙ্গে থাকতে বলে দেন। এদের সঙ্গে বাস করলেও সত্যব্রত এদের জীবন গ্রহণ করেন নি ; প্রতি দিন নিজে শিকার করে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করতেন। পিতার বিরুদ্ধে কোন বিরূপ মনোভাব ছিল না। কিন্তু কুলগুরু কিছু একটা প্রতীকার করতে পারতেন অথচ করলেন না এবং এই গুরুর পরামর্শেই তিনি বিতাড়িত হয়েছেন। এই জন্য বশিষ্ঠের বিরুদ্ধে তীব্র মনোভাব গড়ে ওঠে।

রাজারও ভীষণ মনোকষ্ট হয়, বনে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। ছেলেকে পরিত্যাগ করার জন্য শাস্তি হিসাবে ইন্দ্র বার বছর দেশে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। দুর্ভিক্ষে সকলে ভীষণ কষ্টে পড়ে। এই সময়ে গালবকে (দ্র) সত্যব্রত রক্ষা করেন এবং বিশ্বামিত্রের পরিবারের সকলের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন। ত্রয্যারুণ এ দিকে তপস্যায়

চলে গিয়েছিলেন। রাজকার্য বশিষ্ঠই দেখা শোনা করছিলেন। ফলে সত্যব্রতের ক্রোধ আরো বেড়ে চলছিল। বারো বছর দুর্ভিক্ষের শেষ দিকে অত্যন্ত ক্ষুধিত অবস্থায় এবং কোন পশু শিকার করতে না পেরে সত্যব্রত বশিষ্ঠের আশ্রমে এসে কামধেনু নন্দিনীকে মেরে নিজের ক্ষুধা নিবৃত্ত করেন এবং বাকি মাংস বিশ্বামিত্রের আশ্রমে দিয়ে আসেন। আশ্রমে বশিষ্ঠ ধ্যানে সব জানতে পারেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে সত্যব্রতকে ডেকে পাঠিয়ে শাপ দেন সেই দিন থেকে সত্যব্রত চণ্ডাল হবেন। এবং ব্রাহ্মণ কন্যা চুরি করা, পিতার ক্রোধ অর্জন করা ও গোহত্যা করা/গোমাংস ভক্ষণ করা এই তিনটি পাপের জন্য ত্রিশঙ্কু হয়ে/নামে সারা জীবন দুঃখ ভোগ করতে হবে। কামধেনুকে বশিষ্ঠ জীবিত করে নেন। অভিশপ্ত রাজপুত্র শাপ মুক্তির চেষ্টায় বহু ঋষিকে যজ্ঞ করতে বলেন ; কিন্তু কেউ সম্মত হন না। ত্রিশঙ্কু তখন দেবতাদের স্তব করে আগুনে প্রবেশ করতে যান। দেবতারা রাজপুত্রকে আত্মহত্যা করতে বারণ করেন এবং শীঘ্রই রাজা হবেন ভবিষ্যৎবাণী করে যান। নারদ এই সব খবর ত্রয্যারুণকে জানালে রাজা মন্ত্রীদের দ্বারা ছেলেকে এনে রাজা করেদিয়ে আবার বনে চলে যান।

বহু দিন ধর্মপথে রাজত্ব করে শেষ অবধি বাসনা হয় স্বশরীরে স্বর্গে যাবেন। সম্ভব নয় বলে বশিষ্ঠ বাসনা ত্যাগ করতে বলেন ; বশিষ্ঠের ছেলেদের অনুরোধ করলে তাঁরাও রাজাকে উপহাস করেন। ত্রিশঙ্কু তখন স্পষ্ট মুখের ওপর বলেন অন্য কেউ হয়তো তাঁকে স্বর্গে পাঠাতে পারবেন। এই উদ্ধত জবাবে বশিষ্ঠ ও ছেলেরা আবার চণ্ডাল হবার শাপ দেন। শাপগ্রস্ত ত্রিশঙ্কু আবার বনে চলে যান। ত্রিশঙ্কুর ছেলে হরিশ্চন্দ্র পিতাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য লোক পাঠান। কিন্তু আসেন না ; হরিশ্চন্দ্র রাজা হন। এই সময় বিশ্বামিত্র তপস্যা শেষে ফিরে এসেছিলেন। এবং স্ত্রী পুত্রদের কাছে সত্যব্রতের/ত্রিশঙ্কুর সমস্ত ঘটনা জানতে পারেন। ভীষণ চণ্ডাল বেশে ত্রিশঙ্কু এই সময় বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হন। একটি মতে প্রথম দফায় চণ্ডাল হবার পর এই দেখা ; ত্রিশঙ্কুকে বর দিয়ে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করে দেন। এবং ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণের জন্য যজ্ঞ করেন। দেবতারা ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গারোহণ স্বীকার করে নেন। আর এক মতে দ্বিতীয় দফায় চণ্ডাল হয়ে ত্রিশঙ্কু বনে ছিলেন ; বিশ্বামিত্র অশ্বাবনে এসে নিজেই দেখা করেন এবং সব শুনে যজ্ঞ করবার ব্যাবস্থা করেন। এই যজ্ঞে বশিষ্টের ছেলেরা ও মহোদয় নামে এক জন ঋষি বাদে সকলেই আসেন। কিন্তু বহু দিন যজ্ঞ করলেও দেবতারা যখন যজ্ঞভাগ নিতে এলেন না তখন বিশ্বামিত্র নিজের তপস্যা বলে রাজাকে স্বশরীরে স্বর্গে পাঠান। ত্রিশঙ্কু ক্রমশ স্বর্গের দরজায় এলে দেবতারা স্বর্গে চণ্ডাল আসছে বলে ইন্দ্রকে গিয়ে জানান। ইন্দ্র বলেন ত্রিশঙ্কু গুরুর শাপে অভিশপ্ত ; তাঁকে অধোমুখে পৃথিবীতে নেমে যেতে হবে এবং ঠেলে ফেলে দেন। ত্রিশঙ্কু ফলে পড়তে থাকেন ; বিশ্বামিত্র তখন তিষ্ঠ বলে ত্রিশঙ্কুকে ঊর্দ্ধলোকে জায়গা করে দেন এবং দক্ষিণ আকাশে অন্য এক সপ্তর্ষি মণ্ডল ও নক্ষত্রলোক সৃষ্টি করে দেন। এবং এই নতুন জগতে নতুন দেবতা ও নতুন ইন্দ্র সৃষ্টি করবার সঙ্কল্প করেন। দেবতারা তখন ভীত হয়ে পড়েন এবং ইন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে বিমানে করে স্বর্গে নিয়ে যান। অন্য মতে ইন্দ্র স্বীকার করে নেন বিশ্বামিত্রের আকাশে নক্ষত্রমণ্ডল থাকবে ও জ্যোতিশ্চক্রের বাইরে মাথা নীচু করে ত্রিশঙ্কু দেবতুল্য হয়ে অবস্থান করবেন।

ত্রিশরণ—বৌদ্ধ সাহিত্যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে ত্রিশরণ বা ত্রিরত্ন বলা হয়। এই তিনটির শরণ নিলে শরণাগতি বলা হয়। শরণাগতি একটি বৌদ্ধ প্রক্রিয়া। এই শরণের ফলে চিত্তের মলিনতা ক্রমশ দূর হতে থাকে। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি এবং সংঘং শরণং গচ্ছামি তিন বার বলে এই শরণ নিতে হয়। শরণাগতি দু রকম:- সত্যদ্রষ্টাদের শরণাগম লোকোত্তর এবং সাধারণ লোকের শরণাগম লৌকিক। লৌকিক শরণাগতির অপর নাম ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

ত্রিশিখ—রাবণের এক ছেলে।

ত্রিশিরা—(১) খরের সেনাপতি। রাবণের মিত্র। শূর্পণখার নাক কাণ কাটার প্রতিশোধ নিতে খর একে পাঠিয়েছিলেন। রামের হাতে মারা যান। (২) রাবণের এক ছেলে। তিন মাথা। কুম্ভকর্ণের পর এরা চার ভাই দেবান্তক, নরান্তক, সহোদর, ও ত্রিশিরা রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন। হনুমান এক চড়ে ত্রিশিরাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তাঁর হাতের খড়্গ কেড়ে নিয়ে এই খড়্গে তিনটি মাথাই কেটে ফেলেন। (৩) কুবেরের আর এক নাম। (৪) অন্য নাম বিশ্বরূপ। ব্রহ্মার ছেলে মরীচি; মরীচির ছেলে কশ্যপ এবং কশ্যপের ছেলে বিশ্বরূপ/ত্রিশিরা। অন্য মতে প্রজাপতি ত্বষ্টার ছেলে। বিশ্বকর্মার নাতি। আর এক মতে বিশ্বকর্মার ছেলে। ত্বষ্টা ধার্মিক ও ব্রাহ্মণদের হিতকামী ছিলেন। ইন্দ্র ও ত্বষ্টার মধ্যে বহু দিনের বিবাদ চলছিল। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে রেচনার গর্ভে ত্রিশিরার (তিন মাথাযুক্ত) জন্ম দেন। সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির মত এঁর তিন মাথা। এক মুখে বেদপাঠ করতেন এবং এক মুখে পিবন্ ইব জগৎ অবলোকন করতেন। ব্রাহ্মণ হলেও অসুরদের ভাগনে; দেবতাদের পুরোহিত। মাতুল বংশ অসুরদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। দেবতাদের প্রকাশ্যে এবং অসুরদের গোপনে যজ্ঞ ভাগ দিতেন। পরে মায়ের আদেশে অসুরদের দলে যোগ দেন। হিরণ্যকশিপু বশিষ্ঠকে ত্যাগ করে এঁকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করেন। এই জন্য বশিষ্ঠের শাপে নরসিংহের হাতে হিরণ্যকশিপু মারা যান। বাল্যকাল থেকেই জাগতিক সুখে ত্রিশিরার বৈরাগ্য এসেছিল ফলে তপস্যা করে দিন কাটাতেন (দ্রঃ ত্বষ্টা)। অসুরদের মঙ্গলের জন্য একবার কঠোর তপস্যা করেন। এই সব কারণে ইন্দ্র ভয়ে ঘৃতাচী, উর্বশী, মেনকা, রম্ভা ইত্যাদিকে এঁর তপস্যা নষ্ট করতে পাঠান। কিন্তু এঁরা বিফল হন। ইন্দ্র তখন এঁকে বধ করার জন্য দধীচির কাছে যান এবং দধীচি নিজের অস্থি দান করলে এই অস্থিতে বজ্র তৈরি করে ঐরাবতে চড়ে এসে বজ্রাঘাত করেন। একটি মতে ইন্দ্র এঁকে পুরোহিত নির্বাচন করলে ইনি যজ্ঞ করেন এবং মায়ের নির্দেশে দেবতা ও অসুর সকলেরই সমৃদ্ধি কামনা করেন। ফলে অসুরদের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকলে ইন্দ্র বজ্রাঘাত করেছিলেন। আহত ত্রিশিরা মাটিতে পড়ে যান। একটি মতে মারা গিয়েছিলেন তবু ইন্দ্র ভয়ে এক সূত্রধরকে (তক্ষা) দিয়ে এর তিনটি মাথা কাটিয়ে ফেলেন। অন্য মতে ত্রিশিরার মাথা তিনটি বেঁচে ছিল এই জন্য মুণ্ডচ্ছেদ করান। বেদপাঠী মাথা কাটলে এই গলা থেকে একঝাঁক কপিঞ্জল (চাতক) পাখী, সুরাপায়ী দ্বিতীয় মাথা কাটলে এই গলা থেকে এক ঝাঁক কলবিঙ্ক এবং তৃতীয় গলা থেকে এক ঝাঁক তিত্তির পাখী বার হয়ে যায়। ত্রিশিরার মৃত্যুতে ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রের শাস্তির জন্য অগ্নিতে আহুতি দিয়ে বৃত্রাসুরের সৃষ্টি করেন। ত্রিশিরাকে হত্যা

করার পাপ ব্রহ্ম হত্যার রূপ ধরে ইন্দ্রের (দ্র) অনুসরণ করতে থাকে।

ত্রিশূল—বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, কুবেরের পুষ্পক এবং কার্তিকেয়ের শক্তি এগুলি সূর্যের খণ্ডিত খণ্ডিত টুকরো অংশ থেকে সংজ্ঞার (দ্রঃ) পিতা বিশ্বকর্মা তৈরি করে দেন।

ত্রিষ্টুপ—সূর্যের রথের একটি ঘোড়া। দ্রঃ ছন্দ।

ত্রেতাযুগ—পরিমাণ ১২,৯৬০০০ বছর। (দ্রঃ কাল) এই যুগে মানুষ লম্বায় চোদ্দ হাত; প্রাণ অস্থিগত; পরমায়ু দশ হাজার বছর। পুণ্য ত্রিপাদ, পাপ একপাদ। এই যুগে অবতার বামন, পরশুরাম, রাম। এই যুগে সূর্যবংশে উল্লেখযোগ্য রাজা বাহুক, ককুৎস্থ, ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র, মরুত্ত, অনরণ্য, সগর, অংশুমান, রঘু, অজ, দশরথ, রাম ইত্যাদি। দ্রঃ উর্বশী।

ত্র্যম্বক—(১) শিব। (২) অষ্ট বসুর এক জন।

থ

থানেশ্বর—২৯°৫৮´´৩০ উ. ৭৬°৫২´ পূ। পূর্ব পাঞ্জাবে করনাল জেলায়, আম্বালার ৪০ কি-মি দক্ষিণে, কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত অধুনা লুপ্ত সরস্বতীর তীরে একটি তীর্থ। প্রাচীন নাম স্থাণ্বীশ্বর। মহাভারত ও বামন পুরাণে উল্লেখ আছে। ৭-শতকে পুষ্যভূতি রাজবংশের সময় রাজধানী ছিল। হিউ-এন-ৎসাঙ বৃহৎ নগরী বলে উল্লেখ করেছেন। ১১-শতকে গজনির সুলতান মামুদ আক্রমণ করে লুঠ করেন। বর্তমানে পরিত্যক্ত একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ।

থেরবাদ—বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ। সংস্কৃতে স্থাবর বাদ। বৌদ্ধ সাহিত্যে থের একটি গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষণ। এক মাত্র গৌতম বুদ্ধের ভিক্ষুশিষ্যদের ছাড়া সাধারণত কাউকে থের বলা হয় নি। ধম্মপদে আছে পক্ককেশ হলে থের হয় না; প্রকৃত জ্ঞানীই থের। অঙ্গুত্তর নিকায়ে আছে তরুণ হলেও পণ্ডিত ভিক্ষু থের হতে পারেন। স্থিতপ্রজ্ঞকে বৌদ্ধরা সাধারণত থের বা স্থবির বলেন।

গৌতমবুদ্ধের দেহত্যাগের পর ত্রিপিটক (দ্রঃ) সংকলিত হয় এবং বলা হয় থের -রা এই সংকলন করেছিলেন। ফলে ত্রিপিটকের আর এক নাম থেরবাদ বা স্থবির-বাদ বা আচার্যবাদ। রাজগৃহের প্রথম সম্মিলনের একশ বছর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতি বসে। এখানে এক দল ভিক্ষু পুরাতন কয়েকটি ক্ষুদ্র-নগণ্য আচার বিধি মানতে অস্বীকৃত হয়ে সংগীতি ত্যাগ করে আর একটি সংগীতি বসান। এই নতুন সংগীতির নাম হয় মহাসংগীতি এবং এঁতে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের নাম হয় মহাসাংঘিক। এই সর্বপ্রথম প্রচলিত থেরবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে ত্রিপিটকের এঁরা সংস্কার করেন। এই মহাসাংঘিকদের মধ্যে পরে বহু সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন থেরবাদের অনুসরণকারীদের মধ্যে পরে মহিংসাসক (মহীশাসক) ও বজ্জিপুত্তক (বৃজি-পুত্রক) দুটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে;

বজ্জিপুত্তক পরে আবার ভাগ হতে থাকে। এই ভাবে বুদ্ধের দেহ ত্যাগের ২-শত বছরের মধ্যে ছয়টি মহাসাংঘিক গত সম্প্রদায় এবং এগারটি থেরবাদ গত সম্প্রদায় মোট ১৭টি সম্প্রদায় দেখা দেয়। পরবর্তী কালে আরো বহু সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। থের বাদ অবশ্য সিংহল ও দক্ষিণপূর্ব এসিয়াতে আজও সুপ্রতিষ্ঠিত।

দ

দংশ—সত্যযুগে এক জন প্রবল অসুর। ভৃগুর স্ত্রীকে চুরি করার অপরাধে মূত্রপায়ী অলর্ক (দ্রঃ)কীট হয়ে ছিলেন। ভৃগুর বলা ছিল পরশুরামের হাতে শাপমুক্তি হবে।

দক্ষ—এক জন প্রজাপতি। বহু মতে এক, এবং বহু মতে দুই ব্যক্তি। আবার বহু মতে দক্ষযজ্ঞে নিহত হওয়া পর্যন্ত এক ব্যক্তি; পরে জীবিত হবার পর যে নতুন দক্ষ তিনি যেন আর এক জন। ব্রহ্মার মন থেকে মরীচি' অঙ্গিরস, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, বশিষ্ঠ ও ক্রতু জন্মান। এর পর ব্রহ্মার ক্রোধ থেকে রুদ্র, কোল থেকে নারদ, দ-বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষ, মন থেকে সনক ও বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে বীরণী জন্মান। দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে জন্ম বলে নাম দক্ষ। মনুর মেয়ে প্রসূতি এঁর স্ত্রী ; প্রসূতির ১৬-টি মেয়ে ; এদের তের জনকে ধর্ম, এক জনকে অগ্নি, এক জনকে মিলিত পিতৃগণ ও এক জনকে মহাদেব বিয়ে করেন। মহাদেবের স্ত্রী সতী। আর এক মতে দক্ষের স্ত্রী অসিকী ; অনেকগুলি মেয়ে হয় ও শেষকালে এক মেয়ে সতী ; শিবের স্ত্রী। মহাভারতে ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষ এবং বাম অঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষের স্ত্রী জন্মান। এই দক্ষের ৫০-টি মেয়ে। এঁদের দশটিকে ধর্ম, তেরটিকে কশ্যপ, এবং সাতাশটিকে চন্দ্র বিয়ে করেন। আর এক মতে দক্ষের স্ত্রী প্রসূতি প্রিয়ব্রতের মেয়ে, মনুর পৌত্রী। প্রসূতির মেয়ে চব্বিশ, বা পঞ্চাশ বা ষাট। চব্বিশটি মেয়ে : শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি, কীর্তি, খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, ঊর্জা, স্বাহা ও স্বধা। এঁদের প্রথম তেরজন ধর্মের স্ত্রী। আর এক কাহিনীতে আছে একটি মন্বন্তরে প্রচেতস্-রা (বর্হির দশটি ছেলে) তপস্যা করছিলেন। পৃথিবীতে ঠিক মত চাষ হচ্ছিল না ; পৃথিবী ঘন বন জঙ্গলে ভরে যায়। এমন কি বায়ু চলাচল পর্যন্ত বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। তপস্যা শেষ করে প্রচেতসরা সমুদ্র থেকে উঠে এসে এই সব বন জঙ্গল দেখে মুখ থেকে অগ্নি ও বায়ু বার করে দেন। প্রায় সমস্ত বন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তখন চন্দ্র এসে প্রচেতসদের ক্রোধ সংবরণ করতে বলেন ; তাহলে বৃক্ষেরা প্রচেতসদের সন্ধি করবেন. মারিষা চন্দ্রের পালিতা কন্যা, গাছে এর এর জন্ম ; এই মারিষার সঙ্গে চন্দ্র প্রচেতসদের বিয়ে দেবেন, এবং প্রচেতসদের মনের অর্দ্ধাংশ নিয়ে এবং চন্দ্রের মনের অর্দ্ধাংশ নিয়ে মারিষার গর্ভে দক্ষ প্রজাপতি জন্মাবেন। প্রচেতসরা তখন তাঁদের ক্রোধ সংবরণ করে মারিষাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেন। দশ জন প্রচেতসের সন্তান হিসাবে এর পর দক্ষের জন্ম হয়। এই দক্ষ ও প্রথম দক্ষ দু জনে এক কিনা কোন হদিস মেলে না। কিছু মতে শিবের অভিশাপে

এই দ্বিতীয় জন্ম। এই জন্মে দক্ষের সাত ছেলে :- ক্রোধ, তামস, দম, বিকৃত, অঙ্গিরা, কর্দম ও অশ্ব। হরিবংশ মতে বিষ্ণু নিজেই দক্ষ হয়ে জন্মে সমস্ত জীবজন্তু সৃষ্টি করেন। যোগবলে এই প্রথম মানব দক্ষ নিজেকে আবার নারীরূপে সৃষ্টি করে এই নারীর গর্ভে অনেকগুলি মেয়ের জন্ম দেন এবং এঁদের বিয়ে দেন। ভাগবত মতে দক্ষের চারটি মেয়েকে গরুড় বিয়ে করেন। কয়েকটি মেয়ের নাম :- দিতি, অদিতি, দনু, কালিকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু, অনলা ইত্যাদি।

ব্রহ্মা এক বার এই দক্ষকে ডেকে প্রজা সৃষ্টি করতে বলেন। দক্ষ তখন দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, অসুর, সর্প ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। কিন্তু এই সব সৃষ্ট প্রজারা নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করতে পারছে না দেখে নিজের স্ত্রী অসিক্নীর গর্ভে পাঁচ হাজার সন্তানের জন্ম দেন। এঁরা হর্যশ্ব নামে পরিচিত। কিন্তু নারদ এঁদের সঙ্গে দেখা করে পৃথিবীর সীমানা খুঁজে দেখতে প্ররোচনা দেন এবং এঁরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন। দক্ষ তখন আবার আর এক হাজার সন্তানের জন্ম দেন, এঁরা শবলাশ্ব নামে পরিচিত। নারদ এঁদেরও আবার পৃথিবীর সীমানা খুঁজে দেখতে পাঠান; এবং এঁরাও আর ফেরেন না। দক্ষ তখন নারদকে অভিশাপ দেন নারদও জীবন ভর এই রকম সর্বত্র ঘুরে বেড়াবেন। এর পর অসিক্নীর গর্ভে দক্ষের ৬০-টি মেয়ে হয়। এঁদের মধ্যে দশ জনকে কশ্যপ, সাতাশ জনকে চন্দ্র, চার জনকে অরিষ্টনেমি এবং দুজনকে কৃশাশ্ব বিয়ে করেন। প্রসূতি নামে স্ত্রীর গর্ভে চব্বিশটি মেয়ে হয়েছিল এবং এঁদের মধ্যে তেরজনকেও ধর্ম (দ্রঃ) বিয়ে করেন। অথচ ধর্মের স্ত্রী ছাব্বিশ জন নয়। অর্থাৎ বিবরণের মধ্যে কিছু অসামঞ্জস্য রয়েছে। বাকি এগার জনের মধ্যে খ্যাতির বিয়ে হয় ভৃগুর সঙ্গে,সতীর শিবের সঙ্গে, ইত্যাদি। বিভিন্ন গ্রন্থে কাহিনী বিভিন্ন।

বিশ্ব স্রষ্টারা একবার যজ্ঞ করলে দক্ষ ইত্যাদি সকলেই আসেন। দক্ষ এলে সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখান কিন্তু ব্রহ্মা ও মহাদেব উঠেন না। এতে দক্ষ মহাদেবকে নিন্দা করেন এবং শাপ দেন মহাদেব আর কোন যজ্ঞের ভাগ পাবেন না। আর একটি কাহিনী আছে অত্রির ছেলে দুর্বাসা জম্বুনদে গিয়ে জগদম্বিকার আরাধনা করতে থাকেন। দেবী সন্তুষ্ট হয়ে নিজের গলা থেকে মালা নিয়ে দুর্বাসাকে দেন। এই মালার ফুল থেকে মধু পড়ছিল। দুর্বাসা এই মালা মাথায় জড়িয়ে দক্ষের কাছে যান এবং দক্ষ এ রকম মালা কোন দিন দেখেন নি, দুর্বাসার কাছে এটি চেয়ে নেন এবং শয়ন কক্ষে রেখে দেন। এই ফুলের গন্ধে আকুল হয়ে দক্ষ স্ত্রীকে সম্ভোগ করতে গিয়ে মালাটিকে অপবিত্র করেন। শিব ও পার্বতী ঘটনাটি জানতে পেরে দক্ষকে ভর্ৎসনা করেন। দক্ষ এই ভাবে ভর্ৎসিত হয়েছিলেন বলেই নিজের যজ্ঞে শিব ও পার্বতীকে আমন্ত্রণ করেন নি। অন্য মতে মালাটি ঘরে ছিল; দক্ষ সম্ভোগ করাতে মালাটি অপবিত্র হয়ে যায় এবং মালাগত প্রচ্ছন্ন শাপে দক্ষ সতী ও মহাদেবকে ঘৃণা করতে থাকেন। শিবকে যজ্ঞে না ডাকার আর একটি কারণ বিষ্ণু যখন ঘুম থেকে উঠে সৃষ্টি করবেন স্থির করলেন তখন প্রথমে তাঁর মুখ থেকে ব্রহ্মা জন্মান; ব্রহ্মার পাঁচটি মাথা ছিল। এর পর বিষ্ণুর মুখ থেকে মহাদেবের জন্ম হয়। এই ব্রহ্মা ও শিব দুজনেই অহংকারে মত্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে কে বড় এই নিয়ে বিবাদ আরম্ভ

করেন এবং শেষ অবধি ব্রহ্মার একটি মাথা মহাদেব ছিঁড়ে নেন। এই মাথা শিবের হাতে আটকে লেগে থাকে : এবং ব্রহ্মা শাপ দেন মহাদেব চিরদিন অপবিত্র হয়ে থাকবেন। এই সব কারণে দক্ষ নিজের যজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নি। ব্রহ্মা দক্ষকে সকল প্রজাপতির ওপর আধিপত্য দিলে দক্ষ বৃহস্পতি নামে এক মহাযজ্ঞ করেন। সকলকে নিমন্ত্রণ করেন কিন্তু শিব ও পার্বতীকে বাদ দেন। সতী খবর পেয়ে স্বামীর কাছ থেকে জোর করে অনুমতি নিয়ে যজ্ঞে উপস্থিত হলে দক্ষ যজ্ঞস্থলে মহাদেবকে নিন্দা করতে থাকেন। অপমানিতা সতী তখন শাপ দেন দক্ষের ছাগ মুণ্ড হবে এবং যোগবলে সেই খানেই দেহত্যাগ করেন। খবর পেয়ে নিজের মাথা থেকে একটি জটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেললে এই জটা থেকে বীরভদ্রের জন্ম হয়। শিবের অনুচরদের নিয়ে বীরভদ্র এসে যজ্ঞ নষ্ট করে ভৃগুর শ্মশ্রু ও পুষণের দাঁত উপড়ে দেন এবং দক্ষের মাথা কেটে দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি দিয়ে যজ্ঞশালা ধ্বংস করেন। ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারা তখন মহাদেবের কাছে গিয়ে অন্য মতে শিবের অনুচরেরা ক্রমশ পৃথিবী নষ্ট করে ফেলতে যাচ্ছিলেন দেখে সকলে মহাদেবকে শান্ত করেন। মহাদেব অনুচরদের ফিরিয়ে নেন। দেবতারা দক্ষের জীবন ভিক্ষা চাইলে মহাদেব ছাগ-মুণ্ড জুড়ে দিতে বলেন। ছাগমুণ্ড পেয়ে জীবিত হয়ে দক্ষ যজ্ঞ পূর্ণ করেন এবং মহাদেবের স্তব করেন।

একটি মতে মহাদেবকে যজ্ঞে না ডাকার মূল কারণ মহাদেব অনার্য দেবতা। দক্ষ চন্দ্রকে (দ্রঃ) শাপ দিয়েছিলেন ক্ষয় রোগ গ্রস্ত হতে হবে। পৃথু যখন গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করেন তখন দক্ষকে রাজা করা হয়েছিল। শরশয্যায় ভীষ্মকে দক্ষ দেখতে এসেছিলেন। দক্ষের আর এক নাম ক (মহা ১২।২০১।৭)। দক্ষকে চন্দ্রের বাবা, অন্য মতে ছেলে বলা হয়।

দক্ষসাবর্ণি—নবম মনু। বরুণের ছেলে। এই মন্বন্তরে তিন শ্রেণীর দেবতা থাকবেন ; প্রাণ, মরীচি-গর্ভ ও সুধর্মা। এই তিনটি ভাগের প্রতি ভাগে বারটি করে দেবতা থাকবেন। ইন্দ্র অদ্ভুত বলে অভিহিত হবেন। সপ্তর্ষি হবেন সবন, দ্যুতিমান, ভব্য, বসু, মেধাতিথি, জ্যোতিষ্মান ও সত্য। দক্ষসাবর্ণির ছেলে হবে ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময়, পৃথু-শ্রবা ইত্যাদি ইত্যাদি। আয়ুষ্মানের ঔরসে অম্বুধরার গর্ভে ভগবান বিষ্ণু ঋষভেন্দ্র হয়ে জন্মাবেন।

দক্ষিণা—প্রজাপতি রুচি ও স্ত্রী আকূতির কন্যা। শতরূপার মেয়ে প্রসূতি ও আকূতি। আকূতির ছেলে যজ্ঞ এবং মেয়ে দক্ষিণা। যজ্ঞের ঔরসে দক্ষিণার গর্ভে বারটি ছেলে হয়। স্বায়ম্ভুব মনুর রাজত্বকালে এই বার জন যম অন্য মতে তুষিত দেব বলে পরিচিত। এঁদের নাম তোষ, সন্তোষ, প্রতোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়াস্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, বহ্নি, সুদেব ও রোচন।

এই দক্ষিণাই গোলকে রাধার সখী হয়ে সুশীলা নামে জন্মান। গোপী সুশীলাকে এক দিন কৃষ্ণ সম্ভোগ করছিলেন। রাধিকা এসে পড়েন এবং কৃষ্ণ অন্তর্হিত হয়ে যান। রাধিকা তখন সুশীলাকে অভিশাপ দেন ভবিষ্যতে গোলকে এলে ছাই হয়ে যাবে। এর পর রাধিকা কৃষ্ণকে খুঁজতে থাকেন কিন্তু খুঁজে পান না।

এর পর সুশীলা লক্ষ্মীর আরাধনা করতে থাকেন এবং লক্ষ্মী দেখা দিলে

সুশীলা লক্ষ্মীর দেহে লীন হয়ে যান। অর্থাৎ আগের জন্মের দক্ষিণা এই ভাবে লীন হয়ে গেলে দেবতাদের যজ্ঞ দক্ষিণার অভাবে পূর্ণ হতে পায় না। দেবতারা তখন ব্রহ্মার কাছে যান; ব্রহ্মা বিষ্ণুর ধ্যান করতে থাকেন। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে দক্ষিণাকে লক্ষ্মীর দেহ থেকে বার করে ব্রহ্মাকে দান করেন। ব্রহ্মা তখন দক্ষিণাকে যজ্ঞপুরুষের হাতে দান করেন। যজ্ঞপুরুষ দক্ষিণাকে পেয়ে আত্মহারা হয়ে যান এবং বহু দিন এক সঙ্গে নির্জনে বিহার করতে থকেন। ফলে দক্ষিণা গর্ভবতী হন এবং একটি ছেলে হয় নাম ফলদ। এই ফলদ যজ্ঞের ফল দান করেন।

দণ্ধরথ—দ্রঃ অঙ্গারপর্ণ।

দণ্ড—(১) ভীমসেনের অস্ত্র। (২) সুমালী কেতুমতীর ছেলে প্রহস্ত, অপম্পন, বিকট, ধূম্রাক্ষ, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদ, প্রাকৃবাত, ভাসকর্ণ, ও দণ্ড এঁরা রাবণের নয় জন মন্ত্রী। কালকার্মুক ও প্রঘস আরো দুটি (রামা ৭।৫।৪০) দণ্ডের ভাই রয়েছে। (৩) রাজা ইক্ষ্বাকুর একশ ছেলের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি, ও দণ্ড তিন জন প্রধান। ক্রোধহন্তা অসুর দণ্ড হয়ে জন্মান। দেবাসুরের যুদ্ধে বহু অসুর বধ করেছিলেন। হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্যন্ত অঞ্চলে রাজ্য; মধুমতী নগরী স্থাপন করে রাজ্য পালন করতেন। মুনি সামন্ এঁর পুরোহিত। দ্রঃ দণ্ডকারণ্য।

দণ্ড—রাজনীতির চারটি ভাগ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, শুক্র, কামন্দক ইত্যাদি মতে মানুষকে ধর্ম পথে দণ্ড অবিচলিত রাখে। না হলে মানুষ বিপথগামী হয়। দণ্ডের অভাবে সমাজে মাৎস্য ন্যায় প্রচলিত হয়। আর এক অর্থে দণ্ড রাজার বা শাসকের শক্তি। শাসকের কর্তব্য মৃদুতা ও নির্দয়তা ত্যাগ করে উচিত দণ্ড প্রয়োগ করা।

দণ্ডগৌরী—এক জন অপ্সরা।

দণ্ডধর—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে নিহত।

দণ্ডপাণি—(১) যম। (২) কাশীতে এক জন ভৈরব। যক্ষ পূর্ণভদ্র মহাদেবের আরাধনা করলে হরিকেশ নামে একটি ছেলে হয়। এই ছেলেও মহাদেবের কঠোর তপস্যা করলে মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে একে স্পর্শ করেন এবং কাশীতে দুষ্টের দমনকারী ও শিষ্টের পালক হিসাবে স্থাপিত করে দণ্ডপাণি নাম দেন। সম্ভ্রম এবং উদ্ভ্রম দু জন যক্ষ সব সময় এঁর অনুচর হয়ে থাকবেন ঠিক করে দেন। মহাদেবের নির্দেশ মত আগে এঁর পূজা। তারপর মহাদেবের পূজা; মহাদেব তাঁর নিজের সামনে দণ্ড-পাণির আসন করে দিয়েছিলেন।

দণ্ডকারণ্য—দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী ও নর্মদার মধ্যবর্তী বন। মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্র এই চারটি রাজ্যের অংশ মিলে। মৎস্যকুণ্ড, শবরী, ইন্দ্রাবতী, বংশ-ধারা, নাগবল্লী ইত্যাদি নদী এবং পূর্বঘাট পর্বতমালা এখানে অবস্থিত। ইক্ষ্বাকুর ছেলে রাজা দণ্ড (দ্রঃ) মৃগয়াতে একদিন এখানে এসে শুক্রার্যের মেয়ে অরাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বলাৎকার করেন। অরা পিতাকে জানালে শুক্র মেয়েকে তপস্যা করতে বলেন এবং শাপ দেন দণ্ডের রাজ্য ইন্দ্রের অগ্নিবৃষ্টিতে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। স্থানটি পুড়ে যায় এবং ভীষণ বনে পরিণত হয়; এবং দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত হয়। রাম এখানে কিছু দিন ছিলেন। পাশেই জনস্থান থেকে সীতা চুরি হয়।

দণ্ডী—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। (২) সূর্যের পরিচারক। সূর্যের ডান দিকে প্রহরী হিসাবে মসী ও লেখনীধারী ; বামপার্শ্বে পিঙ্গল, হাতে লাঠি। এঁরা দু জন সূর্যের গণ। (৩) এক জন রাজা। উর্বশী অভিশাপে এক বার ঘোটকী হলে দণ্ডী এই ঘোটকীকে গ্রহণ করেন। কিন্তু কৃষ্ণ এসে দাবি করলে দণ্ডী একে দিতে চান না ; ভয়ে পালিয়ে যান। ত্রিভুবনে কেউ আশ্রয় দিতে রাজি হয় না। দণ্ডী তখন ভীমের কাছে আসেন এবং ভাইদের কথা না শুনে আশ্রয় দেন। এর ফলে কুরুপাণ্ডবদের মিলিত বাহিনীর সঙ্গে কৃষ্ণ ও দেবতাদের যুদ্ধ হয়। উর্বশী শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে গেলে যুদ্ধের শেষ হয়। দণ্ডী নিজের রাজ্যে ফিরে যান।

দণ্ডী—আনুমানিক ৮-শতক। ব্যাস ও বাল্মিকীর পরবর্তী তৃতীয় প্রসিদ্ধ কবি। অলংকার গ্রন্থ কাব্যাদর্শ রচয়িতা। এঁর তিনটি বই বিখ্যাত বলা হয় ; কিন্তু কোন তিনটি স্পষ্ট নয়। দশকুমার চরিত (দ্র) কার লেখা মতভেদ আছে। পূর্ব ও উত্তর পীঠিকা সম্বন্ধে আরো বেশি মতভেদ। অবন্তিসুন্দরী কার লেখা নিশ্চিত বলা যায় না। অবশ্য এগুলি দণ্ডীর নামেই চালান হয়।

দত্তাত্রেয়—পুত্রকামনায় অত্রি উপাসনা করলে বিষ্ণু বলেছিলেন 'পুত্র রূপে আমি তোমাকে দত্ত হলাম।' এর পর অত্রির স্ত্রী অনসূয়ার সন্তান হয় ; নাম হয় দত্তাত্রেয়। আর এক মতে অনসূয়ার (দ্র) দত্তাত্রেয় ইত্যাদি তিন ছেলে হয়। আর এক মতে তিন মাথা বিশিষ্ট একটি সন্তান হয়। দ্রঃ বলি। অগ্রহায়ণ পূর্ণিমাতে জন্ম। দত্তাত্রেয় শৈশব থেকেই তপস্যা করতেন। জম্ভাসুরের সঙ্গে যুদ্ধের সময় দেবতাদের সাহায্য করে জয়যুক্ত করেন। হৈহয় রাজা কার্তবীর্যার্জুনের গুরু। স্ত্রীকে নিয়ে কার্তবীর্যার্জুন নর্মদা তীরে দত্তাত্রেয়ের আশ্রমের কাছে এসে এঁর আরাধনা করতে থাকেন। দত্তাত্রেয় তপস্যা করছিলেন ; সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে হাজার হাত ও চির-যৌবন ইত্যাদি বহু বর দেন। কার্তবীর্যার্জুন পরে প্রয়োজন হলেই এঁর কাছে ছুটে আসতেন। রাবণ একবার এঁর আশ্রমে এসে মন্ত্রপূত একটি জলপাত্র চুরি করেন। ফলে দত্তাত্রেয় শাপ দেন রাবণের মাথায় বানরে নাচবে। দত্তত্রেয়-এর বরে নহুষের জন্ম। দত্তগীতা, অদ্ভুতগীতা ইত্যাদির রচনাকার বলে প্রসিদ্ধ।

দত্তোলি—পুলস্ত্য প্রীতির ছেলে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য দত্তোলি হয়ে জন্মান।

দধীচি, দধীচ, দধ্যঙ্—অথর্ব মুনির (ঋক্) ঔরসে কর্দম কন্যা শান্তির গর্ভে জন্ম। এই অথর্ব বশিষ্ঠের ছেলে। মহাভারতে ইনি ভৃগুর পুত্র ; ভাগবতে এঁর নাম দধ্যঙ্ (দধ্যঞ্চ) ও অশ্বশির ; মায়ের নাম চিত্তি। সরস্বতী নদীর তীরে আশ্রমে বাস করতেন। কঠোর তপস্বী। ইন্দ্র বিচলিত হয়ে অলম্বুষাকে (দ্রঃ) পাঠান। অলম্বুষা এসে নাচতে ও গান করতে থাকেন (মহা ৯।৫০।—।)। ফলে দধীচি উন্মনা হয়ে পড়েন এবং বীর্যপাত হয়। এই বীর্য সরস্বতীনদীতে পড়লে নদী গর্ভবতী হয় এবং একটি সন্তান হয়। নদী মুনিকে এই সন্তান এনে দেখালে মুনি সন্তুষ্ট হয়ে নদীকে আশীর্বাদ করেন এই নদীর জলে যে দেবতাকে পূজা করা হবে তিনিই সন্তুষ্ট হবেন ; এবং ছেলের নাম দেন সারস্বত (দ্রঃ)। সরস্বতী এঁকে পালন করবার জন্য নিয়ে যান। ইন্দ্র এঁকে কয়েকটি বিদ্যা/মধুবিদ্যা শিখিয়ে বারণ করে দিয়েছিলেন এই বিদ্যা অপরকে দিলে দধীচির মাথা থাকবে না। অশ্বিনীকুমার দুজন দধীচির মাথা কেটে সেখানে ঘোড়ার মাথা

লাগিয়ে দিয়ে বিদ্যাগুলি/ মধুবিদ্যা শিখে নেন। ফলে ইন্দ্রের বিরাগভাজন হন এবং ইন্দ্র দধীচির অশ্বমুণ্ড কেটে নেন ; অন্য মতে মাথা খসে যায়। এঁরা তখন দধীচির নিজের মাথা আবার জুড়ে দেন। মহাভারত মতে ইনি শিব ভক্ত কঠোর তপস্বী। দক্ষকে শিবহীন যজ্ঞ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং যজ্ঞে যানও নি। ব্রহ্মার কাছে ইন্দ্র জানতে পারেন দধীচির অস্থিতে নির্মিত অস্ত্রে বৃত্র বধ হবে। তখন ইন্দ্র এসে অন্য মতে নরনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে এসে, আর এক মতে দেবতাদের পাঠিয়ে দধীচির অস্থি প্রার্থনা করেন। অলম্বুষাকে পাঠান ইত্যাদি নানা কারণে দধীচি ইন্দ্রের প্রতি বিরূপ ছিলেন তবু দেবতাদের উপকারের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন। অস্থিতে বজ্র (দ্র) তৈরি হলে ইন্দ্র সেই বজ্রে বৃত্রকে ও অসুরদের নিধন করেন। একটি ঋক্ কাহিনীতে আছে ইন্দ্র একবার স্বর্গে গেলে পৃথিবী অসুরে ভরে যায়। ইন্দ্র এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন এবং দধীচির আশ্রমে কিছু অস্ত্র পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে গিয়ে শরণ্য নামে একটি স্থানে একটি হ্রদে ঘোড়ার একটি মাথা খুঁজে বার করেন এবং এই হাড় দিয়ে অসুর নিধন করেন।

দধিমুখ—(১) সুগ্রীবের (দ্র) মামা। মধুবন নামে একটি সুন্দর বাগানের রক্ষক। (২) একটি সাপ।

দধ্যঙ—দধীচি।

দনায়ুস্—দক্ষের এক মেয়ে ; কশ্যপের স্ত্রী। সন্তান বিক্ষর, বল, বীর, ব্রত।

দনু—দক্ষের মেয়ে ; কশ্যপের স্ত্রী। এক শত ছেলে। প্রসিদ্ধ ছেলেগুলি অজক, অসিলোমা, অয়শিরস্, অশ্বশিরস্, অশ্বগ্রীব, অয়ঃশঙ্কু, অশ্ব, অশ্বপতি, অজমুখ, অমূর্দ্ধা, ইসৃপা, একপাদ, একচক্র, কেশী, কেতুমান, কপট, কপিল, গর্গ, চন্দ্র, তারক, তুহুণ্ড, দুর্জয়, দ্বিমূর্দ্ধা নমুচি, নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, পুলোমা, বনায়ু, বিশ্রুত, বিপ্রচিত্তি, বেগবান, বৃষপর্বা, বিরূপাক্ষ, শরভ,শলভ, শঙ্কুশীর্ষ,শঙ্কর, স্বর্ভানু, সূক্ষ্ম, সূর্য, শম্বর, প্রলম্ব, মহাবাহু, কুপথ, কাপথ, মহাবল, । এরা দানব (মহা ১।৫৯।২০)। এই নামে কিছু দৈত্যও (দ্রঃ) আছে। এই চন্দ্র সূর্য দেবতা চন্দ্র সূর্য নন। (২) একজন দানব ; দুই ছেলে রম্ভ ও করম্ভ।

দন্তধ্বজ—মনু তামসের ছেলে। দন্তধ্বজের কোন সন্তান ছিল না। যজ্ঞ করেন এবং দেহ থেকে মাংস, রক্ত, রোম ইত্যাদি নানা অংশ আহুতি দিতে থাকেন। এমন কি নিজের বীর্যও আহুতি দেন। সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী তাঁকে 'না' বলে নিষেধ করেন এবং দন্তধ্বজ তৎক্ষণাৎ মারা যান এবং আগুন থেকে তেজোদীপ্ত সাতটি সন্তান জন্ম লাভ করে কাঁদতে থাকে। ব্রহ্মা এসে এদের মরুৎ বলে অভিষেক করেন ; তামস মন্বন্তরে এঁরা মরুৎ।

দন্তপুর—প্রাচীন কলিঙ্গের রাজধানী। কলিঙ্গ রাজ ব্রহ্মদত্ত বুদ্ধের একটি দন্ত পান এবং একটি মন্দির নির্মাণ করান ; ফলে এই নাম। পরে এই দন্ত সিংহলে নীত হয়। কিছু মতে উড়িষ্যাতে পুরী এই দন্তপুর। আর এক মতে বর্দ্ধমানের রাজমাহেন্দ্রী বা বা মেদিনীপুরের দাঁতন সেই দন্তপুর। বৌদ্ধ সাহিত্যে দন্তপুরের উল্লেখ আছে ; ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে নাই।

দন্তবক্র—দমঘোষের ছেলে ; শিশুপালের ভাই ; করূষ দেশের রাজা। দ্রঃ জয় বিজয়। আর এক মতে রাজা সুরের মেয়ে পৃথুকীর্তির গর্ভে রাজা বৃদ্ধশর্মার ঔরসে

জন্ম। শিশুপালের মৃত্যুর পর কৃষ্ণের সঙ্গে গদা যুদ্ধে মারা যান।

দম—সূর্যবংশে এক রাজা। মায়ের পেটে নয় বছর ছিলেন। প্রসূতিকে এ জন্য দম অবলম্বন করতে হয়। সন্তান দমশীল হবেন জেনে পুরোহিতরা নাম রাখেন দম। রাজা দম অশেষগুণান্বিত ছিলেন ;বৃষপর্বার কাছে ধনুর্বেদ ও দুন্দুভির কাছে নানা অস্ত্র-বিদ্যা শিখেছিলেন। বেদবেদাঙ্গে বিশেষ জ্ঞান ছিল।

দমঘোষ—চেদি রাজ্যের রাজা। কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের দ্বিতীয় বোন শ্রুতশ্রবার স্বামী। ছেলে শিশুপাল ও দন্তবক্র। দমঘোষ মগধরাজ জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন। এ জন্য যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

দমন—বিদর্ভ রাজ ভীমের ছেলে। বহু দিন সন্তান হয় নি। এই সময় এক দিন দম/দমন নামে এক মহর্ষি ভীমের অতিথি হন এবং এই মহর্ষির বরে দম, দান্ত ও দমন এবং এক মেয়ে দময়ন্তী জন্মায়। এই দময়ন্তী নলের স্ত্রী।

দময়ন্তী—দ্রঃ দমন। অর্জুন যখন অস্ত্র শিক্ষার জন্য স্বর্গে যান তখন যুধিষ্ঠির অর্জুনের অভাবে অত্যন্ত মনোকষ্টে ছিলেন। মুনি বৃহদশ্ব এই সময়ে দেখা করতে আসেন এবং দময়ন্তীর কাহিনী শোনান। দময়ন্তী পরমা সুন্দরী। লোক মুখে পরস্পরের পরিচয় পেয়ে নিষধরাজ নল (দ্রঃ) ও দময়ন্তী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। স্বয়ংবরে দেবতারা দময়ন্তীর মনের কথা জানতে পেরে চার জন দেবতাই নলের রূপ ধরে স্বয়ংবর সভাতে যোগদান করেন। দময়ন্তী পাঁচজন নলকে দেখে করুণ ভাবে প্রার্থনা করেন তিনি যেন মানুষ নলকে পতিত্বে বরণ করতে পারেন। ফলে দেবতারা দেব-চিহ্ন ধারণ করেন। দময়ন্তী জানতেন দেবতাদের ঘাম হয় না, চোখে নিমেষ পড়ে না। ফলে প্রকৃত নলকে বেছে নিতে অসুবিধা হয় না।

দময়ন্তী নলকে পাশা খেলা থেকে নিবৃত্ত করাতে অকৃতকার্য হয়ে সারথি বার্ষ্ণেয়কে দিয়ে ছেলে ইন্দ্রসেন ও মেয়ে ইন্দ্রসেনাকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দেন। সারথি এদের পৌছে দিয়ে নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে ঋতুপর্ণের কাছে এসে তাঁর সারথি হয়ে কাজ করতে থাকেন। পাশাতে শেষ পর্যন্ত দময়ন্তীকে পণ রাখার প্রস্তাব ওঠে। নল রাজি হন না ; এবং নিজের গায়ের আভরণ ইত্যাদি খুলে দিয়ে এক বস্ত্রে রাজ্য ত্যাগ করেন। দময়ন্তীও এক বস্ত্রে স্বামীর সঙ্গে বনে চলে যান।

এক দিন নল (দ্রঃ) পালিয়ে যান ; দময়ন্তী তখন ঘুমচ্ছিলেন। ঘুম ভাঙলে নলকে খুঁজতে গিয়ে দময়ন্তী এক অজগরের কবলিত হন। তাঁর আর্তনাদে এক ব্যাধ এসে অজগরকে হত্যা করে মুগ্ধ হয়ে দময়ন্তীকে গ্রহণ করতে যান। কিন্তু দময়ন্তীর অভিশাপে ব্যাধ মারা পড়ে। এর পর নলের খোঁজ করতে করতে এক বণিক দলের সঙ্গে চেদি রাজ্যে যাবার চেষ্টা করেন। পথে হাতীর আক্রমণে বহু বণিক মারা গেলে দময়ন্তীই দুর্ঘটনার কারণ মনে করে এঁরা তাঁকে হত্যা করবেন ঠিক করেন। কিন্তু দময়ন্তী বুঝতে পেরে বনের মধ্যে পালিয়ে যান এবং বণিক দলের কয়েক জন ব্রাহ্মণের সঙ্গে চেদি রাজ সুবাহুর রাজধানীতে আসেন। প্রাসাদের সামনে এলে পেছনে ছেলের দল পাগলিনী মনে করে জমা হয়। দময়ন্তীর রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজমাতা তাঁকে প্রাসাদে ডেকে আনলে দময়ন্তী নিজের সমস্ত বিপদের কথা জানান কিন্তু প্রকৃত পরিচয় দেন না এবং আশ্রয় চান। রাজমাতা তাঁকে সৈরিন্ধ্রী হিসাবে রেখে দেন এবং

নিজের মেয়ে সুনন্দাকে এর প্রতি সখীর মত আচরণ করতে বলে দেন। দময়ন্তী সখী হয়ে থাকেন এবং সর্ত থাকে কোন উচ্ছিষ্ট তিনি খাবেন না ; কারো পায়ে হাত দেবেন না এবং অপরিচিত কোন পুরুষের সঙ্গে কোন কথা বলবেন না। বিদর্ভ রাজ এ দিকে খোঁজ করছিলেন। দময়ন্তীর বাল্য সখা সুদেব এই সময়ে চেদি রাজ্যে আসেন এবং এক দিন যজ্ঞ কালে দময়ন্তীকে চিনতে পেরে সেখানে নিজের পরিচয় দিলে দময়ন্তী কেঁদে ফেলেন। রাজ পরিবারে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে। চেদি রাজের স্ত্রী ছিলেন দময়ন্তীর মাসিমা। এঁরা তখন দময়ন্তীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। এর পর দময়ন্তীর অনুরোধে বিদর্ভ রাজ চার দিকে লোক পাঠান নলকে খুঁজতে। এবং পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ এসে খবর দেন রাজা ঋতুপর্ণের সারথি বাহুকই যেন নল। খবর পেয়ে দময়ন্তী সুদেবকে দিয়ে ঋতুপর্ণের কাছে খবর পাঠান নল নিরুদিষ্ট বলে দময়ন্তী পর দিন সকালে আবার স্বয়ংবরা হবেন। এই কথা মত ঋতুপর্ণ পর দিনই বাহুককে নিয়ে কুণ্ডিন নগরীতে এসে উপস্থিত হন। দময়ন্তী তখন কেশিনী নামে এক দূতীকে পাঠান বাহুককে পর্যবেক্ষণ করার জন্য। কেশিনী এসে জানায় কোন ছোট দরজা বাহুক অতিক্রম করতে গেলে দরজা আপনি বড় হয়ে যায়, পথে বের হলে জনতা সম্ভ্রমে বাহুককে পথ ছেড়ে দেয় ; বাহুকের দৃষ্টিপাতে শূন্য কলস জলে ভরে যায় এবং এক মুঠো তৃণ সূর্য কিরণে ধরলেই জ্বলে ওঠে, আগুনে বাহুকের হাত পোড়ে না এবং কোন ফুল বাহুক থেঁতলে দিলেও আরো সুগন্ধ হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত বাহুকের রান্না খেয়ে দময়ন্তী নিশ্চিন্ত হন এবং কেশিনীকে দিয়ে ছেলে মেয়েকে পাঠিয়ে দিলে বাহুক এদের জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। দময়ন্তী তখন মা বাবাকে সব কথা জানান এবং দু জনের মিলন হয়। (২) প্রম্লোচার মেয়ে।

দম্ভ—বিপ্রচিত্তির ছেলে। শুক্রের কাছে বিষ্ণু মন্ত্র লাভ করে পুষ্করতীর্থে তপস্যা করে শঙ্খচূড় নামে ছেলে হয়।

দম্ভোদ্ভব—মহাভারতে এক রাজা। অত্যন্ত শক্তিমান বলে ভীষণ দম্ভ। নিজের সমান কাউকে না পেয়ে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন অন্য মতে ব্রাহ্মণরা এঁকে বলেছিলেন গন্ধমাদন পাহাড়ে নর-নারায়ণ নামে দুজন সন্ন্যাসী আছেন, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। ইনি আক্রমণ করলে সন্ন্যাসী দুজন রাজাকে বুঝিয়ে প্রথমে নিরস্ত করতে চান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একমুঠো ইষিকা ঘাস নিয়ে তীরের মত এঁর সৈন্যের দিকে ছুঁড়ে দেন। ফলে সমস্ত আকাশ সাদা হয়ে যায় এবং সেনাদের চোখে কানে ও নাকে ঢুকে যায়। রাজা হেরে গিয়ে ক্ষমা চান এবং দম্ভ ত্যাগ করেন।

দরদ—(১)বাহ্লিক দেশের রাজা। অসুর সূর্যের অংশে জন্ম। (২) উ-পূ অংশে ভারতে একটি দেশ। কৌরব পক্ষে এখানকার রাজা যুদ্ধ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে সাত্যকির হাতে নিহত হন। (৩) ক্ষত্রিয় কিন্তু ব্রাহ্মণদের হিংসা করতে থাকেন ফলে শূদ্রে পরিণত হন।

দর্শন—ছয়টি ভাগ :- সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা/পূর্ব মীমাংসা, বেদান্ত/উত্তর মীমাংসা।

দল—ইক্ষ্বাকু বংশে রাজা পরিক্ষিতের স্ত্রী সুশোভনা ; ইনি মণ্ডুক রাজ আয়ুর মেয়ে। পিতার শাপে সুশোভনার ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী শল, দল, বল, তিনটি ছেলে হয়। মহর্ষি

বামদেবের দুটি ঘোড়া শল নিয়ে আর ফিফিয়ে দেন না ; ফলে শল বামদেবের শাপে রাক্ষসের হাতে মারা পড়েন। এর পর দল রাজা হন ; বামদেব এঁর কাছে ঘোড় চান। ইনি উত্তরে বামদেবকে মারবার জন্য তীর ছোঁড়েন এবং এই বাণে দলের ছেলে শ্যেনজিৎ মারা যান। দল আবার তীর ছুঁড়তে গেলে তাঁর হাত অবশ হয়ে যায়। দল তখন বামদেবের শরণ নেন এবং বামদেবের আদেশে নিজের স্ত্রীকে স্পর্শ করে পাপ মুক্ত হন এবং ঘোড়া দুটি ফিরিয়ে দেন। (মহা ৩।১৯০।—)

দশঅবতার—পৃথিবীর সঙ্কট মুহূর্তে দুষ্টের দমন ও ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য বিষ্ণুর দশ বার যে জন্ম/আবির্ভাব হয়েছিল। দ্রঃ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। কল্কি অবশ্য ভবিষ্যতে জন্মাবেন। দ্রঃ বিষ্ণু, অবতার।

দশকর্ম—বেদোক্ত মুখ্য দশটি সংস্কার :- গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন, ও বিবাহ।

দশকুমার চরিত—দণ্ডীর (দ্রঃ) লেখা বলে প্রচলিত। পদলালিত্যে অতুলনীয়। কবি প্রতিভার চমক লাগান অভূতপূর্ব গদ্য কাব্য। সুবন্ধু ও বাণের তুলনায় রচনা সরল। পূর্ব ও উত্তর পীঠিকা দশকুমার গ্রন্থের পূর্ব ও শেষ অংশ।

দশ মহাবিদ্যা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা এই দশ মূর্তি। দক্ষ যজ্ঞে যেতে মহাদেব নিষেধ করলে সতী এই দশ মূর্তি/বিভূতি দেখিয়ে অনুমতি আদায় করেন। বিভিন্ন মতে মহাবিদ্যার সংখ্যা বিভিন্ন ; একটি মতে ২৭। দুর্গা ও অন্নপূর্ণাও মহাবিদ্যা।

দশরথ—ইক্ষ্বাকু বংশে রাজা দিলীপের ছেলে রঘু, রঘুর ছেলে অজ এবং অজের ছেলে নেমি বা দশরথ। দশরথের প্রধান তিন স্ত্রী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। দশরথের মন্ত্রী ধৃষ্টি, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থ-সাধক, অশোক, মন্ত্রপাল, সুমন্ত্র ও জয়ন্ত। সরযূ নদীর তীরে কোশল দেশে অযোধ্যা নগরী রাজধানী। দেবতাদের সঙ্গে মিলে এক বার শম্বর অসুরের বিরুদ্ধে স্বর্গে যুদ্ধ করতে যান। সঙ্গে কৈকেয়ীও গিয়েছিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে অসুর সৈন্য ধ্বংস করলে শম্বর দশটি শম্বরে পরিণত হয়ে দশ দিক থেকে রাজাকে আক্রমণ করেন। রাজাও চকিতে দশ দিকে রথ ঘুরিয়ে নিতে থাকেন এবং যুগপৎ দশ দিকে যুদ্ধ করে অসুরকে নিহত করেন। ফলে রাজা নেমি দশরথ নামে অভিহিত হন। রথ এই ভাবে পরিচালিত করতে গিয়ে চাকার খিল খুলে গিয়েছিল এবং কৈকেয়ী নিজের আঙুল দিয়ে এই চাকা রক্ষা করেন। কৈকেয়ীর এই কাজের জন্য রাজা সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চান। অন্য মতে এই যুদ্ধে দশরথ আহত হয়ে ফিরে এলে কৈকেয়ী অক্লান্ত সেবায় ও যত্নে রাজাকে সুস্থ করেন ; সন্তুষ্ট হয়ে রাজা বর দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কৈকেয়ী প্রয়োজন হলে নেবেন বলে-ছিলেন। কৌশল্যার শান্তা নামে একটি মেয়ে ছিল। দশরথ এক বার মৃগয়াতে গিয়ে রাত হয়ে যায়। নদীতে হাতী জল খাচ্ছে মনে করে শব্দ শুনে শব্দভেদী বাণে শিকারকে বিদ্ধ করেন। অন্ধক মুনির ছেলে যজ্ঞ দত্ত/শ্রবণ কলসীতে জল ভর ছিল। মুনিপুত্র পড়ে যান। রাজা এগিয়ে এলে মুমূর্ষু বালক নিজের পরিচয় দিয়ে মারা যান। রাজা তখন কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে মৃতদেহটি নিয়ে মুনির আশ্রমে আসেন এবং সমস্ত কথা জানিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চান। রাজা বালকের সৎকার করেন ; মুনি শাপ

দেন রাজাও বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকে এই ভাবে জীবন হারাবেন এবং। মুনি ও মুনিপত্নী আগুনে আত্মবিসর্জন করেন।

এর পর মন্ত্রী সুমন্ত্র ও পুরোহিত বশিষ্ঠ ইত্যাদির পরামর্শে মুনির শাপ সফল করার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পুত্র লাভের আশায় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পরিচালনায় সরযূ নদী তীরে রাজা প্রথমে অশ্বমেধ ও পরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। যজ্ঞে আহুতি দিতে অগ্নিকুণ্ড থেকে অগ্নিদেব/দৈত্যপুরুষ বার হয়ে প্রজাপতির পাঠান চরু রাজাকে উপহার দেন। ঋষির কথা মত রাজা এই চরু কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে দেন। এঁরা দু জনে নিজেদের ভাগ থেকে সুমিত্রাকে দিয়েছিলেন। রানীরা এর পর গর্ভবতী হন এবং দু ভাগ চরু খাবার জন্য যথা সময়ে সুমিত্রার লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন দুটি ছেলে হয়। কৌশল্যার ছেলে হয় রাম এবং কৈকেয়ীর ছেলে হয় ভরত।

পদ্ম পুরাণে আছে রোহিণী নক্ষত্রে শনি এলে পৃথিবীতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হবে। দশরথের রাজ্য কালে শনি এই রকম এগিয়ে আসছিলেন। জ্যোতিষদের কাছে রাজা সব জানতে পেরে আকাশে উঠে গিয়ে রোহিণীকে বিদ্ধ করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চেষ্টা করেন। শনি সেই সময় এসে রাজাকে বাণ সম্বরণ করতে বলেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন তিনি কোন দিন আর রোহিণীতে আসবেন না।

ছেলেদের বিয়ের পর দশরথ রামকে (দ্রঃ) যুবরাজ করবার আয়োজন করলে দাসী মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী অতীতের প্রতিশ্রুত বর দুটি চানঃ এক বরে রামের চৌদ্দ বছর বনবাস আর এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক। দশরথ নিরুপায় হয়ে পড়েন। অজ্ঞান হয়ে যান এবং জ্ঞান ফিরলেও হাঁ না কিছুই বলেন নি। রাম ঘটনাটা জানতে পেরে পিতৃসত্য রক্ষার জন্য বনে চলে যান, সীতা ও লক্ষ্মণ সঙ্গে যান। এঁদের তিন জনকে সুমন্ত্র গঙ্গা তীরে পৌঁছে দিয়ে এসে দেখেন রাজা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। রাজার জ্ঞান আর ফেরে না। ভরত ও শত্রুঘ্ন তখন কেকয় রাজ্যে ছিলেন। রাজার দেহ তেলে ভিজিয়ে রাখা হয়। ভরত শত্রুঘ্ন ফিরে এসে রাজার অগ্নিসৎকার করেন। লঙ্কায় সীতার অগ্নি পরীক্ষার পর দশরথ ইন্দ্রলোক থেকে এসে সীতাকে এবং দুই ভাইকে আশীর্বাদ করে যান। দ্রঃ কলহা ; ধর্মধ্বজ।

দশহরা—জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লাদশমীতে মঙ্গল বারে হস্তা নক্ষত্রে স্বর্গ থেকে গঙ্গা পৃথিবীতে আসেন। ফলে এটি অতি পবিত্র দিন। এই দিনে স্নান ও দান করলে বাজিমেধ যজ্ঞের ফল হয়। এই তিথিতে গঙ্গা দশবিধ ও দশ জন্ম অর্জিত পাপ হরণ করেন বলে এই নাম।

দশার্ণ—বর্তমানের পাটনা ও চার পাশের অঞ্চল মিলে পূর্ব দশার্ণ এবং মালব পশ্চিম দশার্ণ। একটি মতে অবশ্য বিন্ধ্যের দ-পূর্ব অংশ। মেঘদূতে বিদিশা দশার্ণ রাজধানী। পাণ্ডু, ভীম ও নকুল এই দশার্ণ যথাক্রমে পরাজিত করে ছিলেন। দশার্ণের এক রাজা সুদামা ;সুদামার দুই মেয়ে ;বড় মেয়ে বিদর্ভরাজ ভীমের স্ত্রী, ছোট মেয়ে চেদি রাজ বীরবাহুর রাণী। (মহা ৩।৬৬।১৩) এই ভীমের মেয়ে দময়ন্তী, চেদিরাজের মেয়ে সুনন্দা। দশার্ণের এক রাজা হিরণ্যবর্মার মেয়েকে দ্রুপদের মেয়ে শিখণ্ডিনী (দ্রঃ শিখণ্ডী) পুরুষের ছদ্মবেশে বিয়ে করেন। দশার্ণ রাজ কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করে ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় দশার্ণ রাজা ছিলেন চিত্রাঙ্গদ।

দশার্হ—যদু বংশে এক বিখ্যাত রাজা। কৃষ্ণ এই বংশে জন্মান ফলে কৃষ্ণ বহু জায়গায় দাশার্হ বলে উল্লিখিত। একটি দেশ।

দশাশ্বমেধ—কাশীর একটি তীর্থস্থান। রাজর্ষি দিবোদাসের সাহায্যে ব্রহ্মা এখানে দশটি অশ্বমেধ করেছিলেন।

দশেরা—সর্বভারতীয় উৎসব। গোপথ ব্রাহ্মণে এর উল্লেখ আছে। দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রধানত পূজিতা হন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে এটি রামচন্দ্রের উৎসব বলে পালিত হয়। দশেরা অর্থে দশরাত্র, সংস্কৃতে অর্থ নবরাত্র; আশ্বিন ও চৈত্র মাস কাল-দংষ্ট্রা মাস অর্থাৎ এই সময়ে মহামারী ইত্যাদি হয়। এই সব বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ও সুখ ও সমৃদ্ধির আশায় এই পূজা করা হয়।

দস্যু—প্রাচীনকালে উ-ভারতে আদিবাসী জাতি। কুম্ভ (কাবুল) উপত্যকা থেকে যমুনা পর্যন্ত এগিয়ে আসার ইতিহাস ঋক্ বেদ। সিন্ধু পার হয়ে এই দস্যুদের সঙ্গে অনার্যদের প্রথম যুদ্ধ হয়। দস্যু রাজ শম্বরের সঙ্গে আর্যদের যুদ্ধ করতে হয়েছিল। সহস্র নগরীর রাজা ছিলেন এই শম্বর; নগরগুলি শক্তিশালী প্রাচীর দিয়ে ঘেরা; দুর্গগুলির নাম ছিল অশ্মময়ী, আয়সী ও শতভুজী ইত্যাদি। দস্যুদের একটি শাখার নাম ছিল পণি; আর্যদের এঁরা ভীষণ ভাবে বাধা দিয়েছিলেন। যাস্কের মতে পণিরা ব্যবসায়ী ছিলেন। ঋগ্‌বেদে দস্যু রাজা হিসাবে ধুনি, চুমরি, প্রিপ্রু, বর্চস, শম্বর ইত্যাদি দুর্দান্ত রাজার নাম আছে। দস্যুদের উল্লেখযোগ্য শাখা শিম্যু, কীকট, শ্রিগ্রু, যক্ষু ইত্যাদি; ঋক্‌বেদে এদের অনাস (নাসিকাহীন) বলা হয়েছে। অর্থাৎ এদের নাক চেপ্টা ছিল। রঙও এদের কালো। এরা হোম যজ্ঞ ইত্যাদি বিদ্বেষী; সম্ভবত এরা দ্রাবিড় এবং এদের দেবতা ছিল সম্ভবত লিঙ্গ, শিব ও শক্তি। দ্রঃ দাস।

দস্র—দস্র ও নাসত্য (দ্রঃ) অশ্বিনীকুমার দুজনের নাম।

দহ—এক জন রুদ্র। ব্রহ্মার ছেলে স্থাণুর পুত্র।

দাক্ষায়ণী—দক্ষের যে কোন মেয়ে। তবে অদিতিই এই নামে বিশেষ পরিচিত।

দান—প্রাচীন ভারতে সমাজ ব্যবস্থায় অর্থ বণ্টনের একটি প্রচলিত ধর্মীয় নীতি।

দানব—দনুর (দ্রঃ) সন্তান। দেবতাদের চিরশত্রু। দ্রঃ দৈত্য।

দাবা—উৎপত্তি ভারতবর্ষে। বুদ্ধের সময় যুদ্ধমূলক চতুরঙ্গ ক্রীড়ার প্রচুর প্রচলন ছিল। এর দুটি ধারা: শতরঞ্জ এবং নববল। এই দুটি ধারার মিশ্রণে বর্তমানে দাবার আন্তর্জাতিক রূপ।

দামোদর—যশোদা কৃষ্ণকে উদূখলে বাঁধলে কৃষ্ণ ছুটোছুটি করতে থাকেন। দড়ি ছিঁড়ে যায়; পেটে দড়ির একটা অংশ বাঁধা থাকে; ফলে নাম হয় দামোদর।

দায়ভাগ—বাঙলায় প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন। রচয়িতা জীমূতবাহন (দ্রঃ)। দায় বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যাগুলির মীমাংসা এই বইতে করা হয়েছে। পিণ্ড দানের সঙ্গে উত্তরাধিকার যুক্ত করেন। বাঙলাতে উত্তরাধিকারের যাবতীয় সমস্যা দায়ভাগ অনুসারে সমাধান হয়। ভারতে অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত মিতাক্ষরার সঙ্গে তীব্র মত পার্থক্য রয়েছে। গ্রন্থটিতে মৌলিক চিন্তা ও তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি সর্বত্র স্পষ্ট।

দারুক—(১) মহিষাসুরের সারথি। (২) গরুড়ের ছেলে। (৩) কৃষ্ণের সারথি। সুভদ্রা হরণের সময় কৃষ্ণার্জুনের রথ চালাতে রাজি হননি। কৃষ্ণকে অনুরোধ করে-

ছিলেন তাঁকে বেঁধে রেখে কৃষ্ণ যেন নিজে রথ চালান। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে ১৪ দিনের দিন কৃষ্ণের আদেশে সাত্যকির সারথি হয়েছিলেন। যদুবংশ ধ্বংস হলে কৃষ্ণের আদেশে হস্তিনাপুরে গিয়ে অর্জুনকে দ্বারকায় নিয়ে আসেন।

দালভ্য—নৈমষারণ্যের মুনিরা এক বার ধৃতরাষ্ট্রের কাছে কিছু পশু সাহায্য চান। মুনিদের নেতা হয়ে গিয়ে ছিলেন দালভ্য। রাজা তিরস্কার করে রিক্ত হস্তে ফিরিয়ে দেন। দালভ্যতখন সরস্বতী তীরে পৃথূদকেঅবকীর্ণ তীর্থে যজ্ঞ করে ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যকে মাংসখণ্ড রূপে আহুতি দেন। ধৃতরাষ্ট্রের রাজত্ব ক্রমশ নষ্ট হতে থাকে। রাজা ভয়ে মুনিদের শরণ নেন এবং কারণ জানতে পেরে দালভ্যকে বহু পশু উপহার দিয়ে আবার সন্তুষ্ট করেন। (মহা ৯।৪০।—) দালভ্য তখন যজ্ঞ করে শান্তির ব্যবস্থা করেন। যুধিষ্ঠিরের সভাতে দালভ্য ছিলেন। সত্যবানের পিতা দ্যুমৎসেনকে ভবিষ্যৎবাণী করে ছিলেন সত্যবান দীর্ঘায়ু হবেন।

দাশরাজ্ঞ—ভারতে বিখ্যাত একটি যুদ্ধ। পঞ্চ নদের আর্য এবং ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়। ঋক্‌বেদেরও আগে। সুদাম আর্যদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুদামের সঙ্গে আর্য ও অনার্য সকলেই ছিলেন এবং সুদাম যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই জয়লাভের পর উত্তর ভারতে যে সঙ্কর জাতি/সভ্যতা গড়ে উঠল তারাই বর্তমানের হিন্দু।

দাস—অনার্যজাতি। দাস ও দস্যু(দ্র)শব্দ প্রায় সমর্থক ;বৈদিক সাহিত্যে এরা আর্যদের শত্রু। এরা সুরক্ষিত আয়সীপুর অর্থাৎ দুর্গে বাস করত। দাসরা বিশে (গোষ্ঠীতে) বিভক্ত ছিল ; এরা কৃষ্ণত্বক, অনাস, মৃধ্রবাচ (দুষ্টভাষী)। বেদে ইলিবিশ, শম্বর, বর্চিন দাস রাজের নাম রয়েছে। কিরাত, কীকট, চণ্ডাল প্রভৃতি দাসেরা গাঙ্গেয় উপত্যকায় বাস করত। দাস শব্দ অসুর অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। তবে বেদে এরা মানুষ। পরবর্তী কালে দাস অর্থে ক্রীত দাস হয়েছে।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল থেকে দাসপ্রথা চলিত ছিল। সিন্ধু সভ্যতায় দাসত্ব প্রথা বিদ্যমান ছিল প্রমাণ হয়। প্রাচীন আর্য সমাজেও যেন ছিল। ঋক্ বেদে কোথাও কোথাও এর উল্লেখ রয়েছে। উপনিষদে ইত্যাদি দাস উপহার উল্লেখ আছে। ঋক্ বেদে দ্যূত ক্রীড়ার ফলে দাসত্ববরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। দাস ও দাসপুত্রের সোম যজ্ঞে অধিকার ছিল না। মহাভারতে দাসত্ব প্রথার বহু উল্লেখ আছে ; কদ্রু বিনতার উপাখ্যান ইত্যাদি ইত্যাদি। জাতকের গল্পে ও বৌদ্ধ সাহিত্যেও দাসত্বপ্রথার উল্লেখ রয়েছে।

গ্রীস ও রোমের মত নিষ্ঠুর প্রথা ভারতে ছিল না মনে হয়। দাসের শ্রেণী ছিল : যুদ্ধে প্রাপ্ত, ক্রীত, পণে জিত, গৃহজ, ভক্তদাস (অন্নদাস), ঋণ দাস ও দণ্ড দাস। এই দাসদের অধিকার সম্বন্ধে বহু আলোচনা সংস্কৃত ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। মুক্তি প্রাপ্ত দাসের নাগরিক অধিকার মনু স্বীকার করেন নি কিন্তু নারদ স্বীকার করেছেন।

দাসরাজ—সত্যবতীর পিতা, শান্তনুর শ্বশুর। প্রকৃত নাম উচ্চৈঃশ্রবস্।

দিকপাল—পৃথিবীতে বিভিন্ন দিকের পালক দেবগণ। প্রধান দিক পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর এবং দিকপাল যথাক্রমে ইন্দ্র, যম, বরুণ ও কুবের। দক্ষিণ পূর্ব,

দক্ষিণ পশ্চিম, উত্তর পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব দিকগুলি অপ্রধান দিক এবং এদের পালক যথাক্রমে অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু ও ঈশান। অবশ্য অন্যান্য নাম ও অনেক জায়গায় দেখা যায়। উর্দ্ধে ব্রহ্মা এবং অধঃ দিকে অনন্ত।

দিগম্বর সম্প্রদায়—জৈনদের (দ্র) প্রধানত দুটি সম্প্রদায় : শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। প্রথম দিকে এ রকম কোন সম্প্রদায় ছিল না। খৃ-পূ ৪ শতকে এঁদের মধ্যে সঙ্ঘ বিচ্ছেদ আরম্ভ হয়। ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে যাঁরা দাক্ষিণাত্যে ধর্ম প্রচার করতে যান তাঁরা পরে ফিরে এসে দিগম্বর সম্প্রদায় স্থাপন করেন। মূল সম্প্রদায়টি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় রূপে পরিচিত।

দিগ্‌গজ—দিক রক্ষক হস্তী। পৌরাণিক মতে আকাশে আট দিকে দাঁড়িয়ে এরা পৃথিবীকে ধরে রেখেছে। ঐরাবত (স্ত্রী অভ্রমু) পুব দিকে, পুণ্ডরীক (স্ত্রী কপিলা) অগ্নি কোণে, বামন (স্ত্রী পিঙ্গলা) দক্ষিণ দিকে, কুমুদ (স্ত্রী অনুপমা) নৈর্ঋতে, অঞ্জন (স্ত্রী তাম্রকর্ণী) পশ্চিমে, পুষ্পদন্ত (স্ত্রী শুভ্রদন্তা) বায়ুকোণে, সার্বভৌম (স্ত্রী অঙ্গনা) উত্তর দিকে, সুপ্রতীক (স্ত্রী অঞ্জনাবতী) ঈশান কোণে। এ ছাড়াও নীচে পাতালে চারটি হস্তী পৃথিবীকে মাথাতে ধারণ করে রেখেছে : পুব দিকে বিরূপাক্ষ —এ মাথা নাড়লে ভূমিকম্প হয়, দক্ষিণে মহাপদ্মাশ্ম, পশ্চিমে সৌমনস এবং উত্তরে ভদ্রা ; সগর সন্তানেরা পাতালে এগুলিকে দেখেছিলেন।

দিতি—প্রজাপতি দক্ষের ৬০ টি মেয়ের মধ্যে দিতি, দনু, ইত্যাদি ১৭ জন কশ্যপের স্ত্রী। দিতির পুত্ররা দৈত্য এবং দনুর পুত্রেরা দানব নামে পরিচিত। দিতির বহু দিন সন্তান হয় নি। সপত্নীদের সন্তান দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। সন্ধ্যার সময় কশ্যপ গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন ; এই সময়ে দিতি সন্তান প্রার্থনা করেন। কশ্যপ দিতিকে কিছুক্ষণ অন্তত অপেক্ষা করতে বলেন ; কিন্তু দিতি সম্মত হন না। ফলে সন্ধ্যার সময় গর্ভ ধারণ করেন। কশ্যপ বলেন সন্ধ্যায় এই গর্ভে দুষ্ট ও অত্যাচারী দুটি যমজ সন্তান হবে এবং বিষ্ণুর হাতে এরা নিহত হবে। দিতির মনে কিছুটা অনুশোচনা আসে ; কশ্যপ তখন বর দেন নাতি প্রহ্লাদ বিষ্ণু ভক্ত হবে। শতবর্ষ গর্ভ ধারণ করে দুটি ছেলে হয় হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। আরো ছেলে ছিল। অমৃত নিয়ে যুদ্ধে দিতির সমস্ত ছেলেরা নিহত হন। দিতি তখন স্বামীর কাছে ইন্দ্র বিজয়ী একটি পুত্র চান। কশ্যপ বলেন তাহলে হাজার বছর দেহ ও মনে শুচি হয়ে গর্ভ ধারণ করতে হবে। এর পর কশ্যপ দিতির সর্বাঙ্গে কেবল হাত বুলিয়ে দেন। ফলে দিতি গর্ভবতী হন। এই সন্তান ৪৯ মরুৎ (দ্র) হয়ে জন্মান। মরুৎরা ইন্দ্রের সহায়ক হন।

দিতির সন্তানগুলির মধ্যে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু ও মেয়ে সিংহিকা প্রধান। শূরপদ্ম, বজ্রাঙ্গ, সিংহবক্ত্র, তারকাসুর, গোমুখ, অজমুখ এরাও দিতির ছেলে। দ্রঃ দনু।

দিন—ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করছিলেন তখন ব্রহ্মার মধ্যে তমোগুণ প্রধান হয়ে ওঠে এবং ব্রহ্মার কটি দেশ থেকে অসুররা জন্মান। এর পর ব্রহ্মা এই তমোগুণ ত্যাগ করেন ; পরিত্যক্ত তমোগুণ রাত্রিতে পরিণত হয়। আবার ব্রহ্মা ধ্যান করতে থাকেন ; মুখ থেকে দেবতাদের জন্ম হয় ; দেবতারা সত্ত্বগুণের প্রতিমূর্তি। ব্রহ্মা তার পর এই সত্ত্বগুণ পরিত্যাগ করেন ; পরিত্যক্ত সত্ত্বগুণ দিনে পরিণত হয়। এর পর পিতৃগণ সৃষ্টি হয় ; এঁদের মধ্যে আংশিক সত্ত্বগুণ। ব্রহ্মা এই আংশিক সত্ত্বগুণ ও পরিত্যাগ করেন ;

এবং এটি সন্ধ্যাতে পরিণত হয়। এর পর ব্রহ্মা রজোগুণে মানুষ সৃষ্টি করেন এবং পরিত্যক্ত রজোগুণ ঊষাতে পরিণত হয়। অর্থাৎ দিন, রাত্রি, ঊষা ও সন্ধ্যা ব্রহ্মার অংশ।

দিবাকর—গরুড়ের এক ছেলে। দ্রঃ ত্রিবার।

দিবোদাস—(১) ঋকবেদে এক জন বৈদিক রাজা। জীবনে শেষ দিকে রাজর্ষি হয়ে যান। ঋগবেদে এই দিবোদাসের বহু উল্লেখ আছে। অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ ছিলেন। ঋক্‌বেদে আছে ইনি শম্বর অসুরের ভয়ে জলের নীচে লুকিয়ে ছিলেন। (২) চন্দ্রবংশে ধন্বন্তরী—কেতুমান—ভীমরথ (=ভীমসেন, সুদেব)—দিবোদস। আর এক মতে কেতুমানের ছেলে দিবোদাস। অন্য মতে কাশীরাজ হর্ষের ছেলে সুদেব এবং সুদেবের ছেলে দিবোদাস। আকাশ থেকে দেবতারা এঁকে রত্ন ও ফুল দিতেন বলে এই নাম। রাক্ষস ক্ষেমককে নিহত করে দিবোদাস নিজের রাজ্য বাড়িয়ে নেন। হর্যশ্ব ও সুদেব দুজনেই হৈহয় বা বীতহব্যের ছেলেদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। দিবো-দাস তখন রাজা হন। হেহয় রাজা ভদ্রশ্রেণ্য কাশী আক্রমণ করলে এঁর একশ ছেলেকে দিবোদাস নিহত করেন। বীতহব্যের ছেলেরা আবার কাশী আক্রমণ করে দিবোদাসকে পরাজিত করে তাঁর ছেলেদের নিহত করেন। হাজার দিন যুদ্ধ হয়েছিল; দিবোদাস তখন পালিয়ে গিয়ে মহর্ষি ভরদ্বাজের শরণ নিলে মর্হষি এক যজ্ঞ করেন।ফলে ছেলে হয় প্রতর্দন (দ্রঃ)। ভরদ্বাজের যোগবলে এই ছেলে পরাক্রান্ত হয়ে ওঠেন এবং দিবোদাস এঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। দিবোদাস যযাতির মেয়ে মাধবীকে ২০০ শ্যামকর্ণাশ্ব শুল্ক দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। দ্রঃ বারাণসী। (৩) পুরুবংশে রাজা হর্যশ্বের ছেলে মুদ্গল; মুদ্গল বংশের ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণত্ব পেয়ে মৌদ্গল্য নামে পরিচিত হন। মুদ্গলের ছেলে বৃদ্ধশ্ব, এবং বৃদ্ধশ্বের ছেলে দিবোদাস ও মেয়ে অহল্যা। দিবো-দাসের ছেলে মিত্রয়ু এবং মিত্রয়ুর ছেলে রাজা চ্যবন;

দিব্যগঙ্গা—সিন্ধু।

দিশাচক্ষু—গরুড়ের এক ছেলে। দ্রঃ ত্রিবার।

দিলীপ—সগর বংশে অংশুমানের ছেলে এবং ভগীরথের বাবা। পুণ্য শ্লোক রাজা। মগধ কন্যা সুদক্ষিণা স্ত্রী। এক বার স্বর্গ থেকে ফেরার পথে ঋতুস্নাতা স্ত্রীর কথা চিন্তা করতে করতে অন্য মনস্কে পথে সুরভি গাভীকে প্রণাম না করে চলে যান। অপমানিতা সুরভি শাপ দেন সুরভির মেয়ে নন্দিনীকে সেবায় সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারলে তবে দিলীপের সন্তান হবে। বহু দিন সন্তানহীন থাকার পর বশিষ্ঠের কাছে এই কথা জানতে পেরে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নন্দিনীর সেবা করতে থাকেন। এক দিন গরু চরাতে গেলে বনে এক সিংহ নন্দিনীকে আক্রমণ করে। দিলীপ শর সন্ধান করতে যান কিন্তু হাত অবশ হয়ে যায়। সিংহ নিজের পরিচয় দেন তিনি পার্বতীর বাহন; এখানে তিনি পাহারা দিতে নিযুক্ত ইত্যাদি এবং তার শিকার সে খাবে রাজা যেন বাধা না দেন। নিরুপায় হয়ে রাজা আশ্রিতকে রক্ষা করার জন্য সিংহকে অনুরোধ করেন নন্দিনীর বদলে সিংহ রাজাকে খেয়ে ফেলুক। সিংহ তখন অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং নন্দিনী জানান রাজাকে তিনি পরীক্ষা করছিলেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে বর দিলে রঘুর জন্ম হয়। (২) কশ্যপ পুত্র একটি সাপ।

দিল্লি—পূর্বে যমুনা, উত্তর পশ্চিমে আরাবল্লি পাহাড়, দক্ষিণে ওখলা ও মেহেরৌলি পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা। বহু মতে এইখানে খাণ্ডব বন ছিল; ইন্দ্রপ্রস্থ এইখানে গড়া হয়েছিল। বহু মতে পুরাণা কিল্লা হচ্ছে এই ইন্দ্রপ্রস্থ। কৌরবদের রাজধানী হস্তিনাপুর দিল্লির ৯৭ কি-মি দূরে উ-পূর্বে অবস্থিত ছিল।

দীননাথ—দ্বাপরে এক শক্তিশালী সন্তানহীন রাজা। গালবের কাছে উপদেশ চান; গালব নরমেধ যজ্ঞ করতে বলেন। সুদর্শন, বিদ্বান এবং উচ্চবংশীয় একটি বলির প্রয়োজন। রাজার অনুচরেরা সন্ধানে বার হন এবং দশপুরে আসেন। এখানে কৃষ্ণদেব নামে এক ব্রাহ্মণের তিনটি ছেলের মধ্যে একটিকে চার লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা দিয়ে কিনে নিতে চান। কৃষ্ণদেব নিজে যজ্ঞের বলি হতে চান কিন্তু অনুচরেরা সে কথা না শুনে, সুবর্ণ মুদ্রা দিয়ে একটি ছেলেকে ধরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। এই সময়ে কৃষ্ণদেবের মধ্যমপুত্র স্বেচ্ছায় নিজের ভাইকে মুক্ত করে দিয়ে রাজার অনুচরদের সঙ্গে চলে যান। পথে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দেখা হয়; বিশ্বামিত্র ছেলেটিকে ছেড়ে দিতে বলেন; কিন্তু রাজার অনুচরেরা অসম্মত হন। বিশ্বামিত্র তখন নিজে এসে যজ্ঞ করেন; নরবলির প্রয়োজন হয় না; রাজা সন্তান লাভ করেন।

দীর্ঘজিহ্ব—কশ্যপ দনুর ছেলে।

দীর্ঘতমা—ঋষি উতথ্য ও মমতার ছেলে। মমতার গর্ভকালে উতথ্যের ছোট ভাই দেবগুরু বৃহস্পতি, উতথ্যের অনুপস্থিতে, মমতার সঙ্গে সহবাস করতে চান। মমতা বারণ করেন; তিনি গর্ভবতী; গর্ভে উতথ্যের শিশু বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী হয়ে উঠেছে। বৃহস্পতির বীর্যও সমান শক্তিশালী; দুটি শক্তিশালী গর্ভ তিনি ধারণ করতে পারবেন না। গর্ভস্থ শিশুও নিষেধ করেন; কারণ একটি গর্ভে দুটি শিশুর স্থান হবে না। কিন্তু বৃহস্পতি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না; গর্ভস্থ শিশু তখন পা দিয়ে বাধা দেন; বীর্য গর্ভে প্রবেশ করতে পারে না; মাটিতে পড়ে যায় ও একটি শিশুতে পরিণত হয় (দ্রঃ ভরদ্বাজ)। বৃহস্পতি এতে ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন যে দীর্ঘকাল তামসে প্রবিষ্ট হবে অর্থাৎ অন্ধ হবে। ফলে শিশু অন্ধ হয়ে জন্মায় নাম হয় দীর্ঘতমস্ (মহাভারত)।

ধার্মিক ও বেদজ্ঞ দীর্ঘতমা বৃহস্পতির মত তেজস্বী; স্ত্রী ব্রাহ্মণ কন্যা প্রদ্বেষী; অনেকগুলি সন্তান; এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গৌতম। সুরভির মেয়ে কামধেনুর কাছে গোধর্ম শিক্ষা করে যত্রতত্র সঙ্গম করে বেড়াতেন। ফলে মুনিরা এঁকে ত্যাগ করেন; স্ত্রীও বিরক্ত হয়ে যান। মায়ের কথামত ছেলেরা মিলে একটি ভেলায় করে এঁকে গঙ্গাতে ভাসিয়ে দেন। চন্দ্র বংশে সুতপস্ পুত্র বলিরাজ এঁকে দেখতে পান এবং সন্তান উৎপাদনের জন্য বাড়িতে নিয়ে আসেন। স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে উজ্জ্বল সন্তান উৎপাদন করতে অনুরোধ করেন। সুদেষ্ণা অন্ধ ও বৃদ্ধ মুনিকে অবজ্ঞা করে তাঁর শূদ্রা দাসী ধাত্রেয়ীকে ঋষির কাছে পাঠিয়ে দেন। এই দাসীর কাক্ষীবান (মহা ১।৯৯।২৭) ইত্যাদি এগারটি ছেলে হয়। রাজা জানতে পেরে সুদেষ্ণাকে আবার অনুরোধ করেন। মুনি সুদেষ্ণাকে স্পর্শ করে বর দেন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচটি ছেলে হবে এবং প্রত্যেকের নামে একটি করে দেশের নাম হবে। দীর্ঘতমার এক স্ত্রী উশিক।

দীর্ঘবাহু—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত।

দীর্ঘরোমা—দীর্ঘলোচন। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত। (২) শিবের এক অনুচর।

দীর্ঘিকা—বিশ্বামিত্রের একটি মেয়ে। অত্যন্ত লম্বা। শাস্ত্রের বিধান অনুসারে এত লম্বা মেয়েকে বিয়ে করলে ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়। এই ভয়ে কেউ এঁকে বিয়ে করতে চান না। স্বামী লাভের জন্য বহু দিন তপস্যা করতে করতে বৃদ্ধ বয়সে এক গৃহস্থের সঙ্গে বিয়ে হয়। স্বামীকে কাঁধে নিয়ে পথে যাবার সময় অণীমাণ্ডব্যের (দ্রঃ) কাছে এই স্বামী অভিশপ্ত হন সূর্য ওঠার আগেই মারা যাবেন ইত্যাদি। স্ত্রীর পুণ্যে শাপ সফল হয়েও হয় না ইত্যাদি। মনে হয় এই দীর্ঘিকা হচ্ছেন শাণ্ডিলী।

দুঃখ—দ্রঃ বৌদ্ধধর্ম।

দুঃশল—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত।

দুঃশলা—গান্ধারীর (দ্রঃ) একমাত্র মেয়ে ; দুর্যোধনের ছোট। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের স্ত্রী। এই জন্য দ্রৌপদীকে (দ্রঃ) হরণ করার পর ধরা পড়লেও যুধিষ্ঠির জয়দ্রথের প্রাণ রক্ষা করেন। জয়দ্রথের মৃত্যুর পর শিশু পুত্র সুরথকে ইনি রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে অর্জুন সিন্ধুদেশে এলে ঘোড়া ধরার জন্য যুদ্ধ হয় ; এরা হেরে যান। দুঃশলা তখন ছেলেকে নিয়ে অর্জুনের সঙ্গে দেখা করলে যুদ্ধ বন্ধ হয়। অন্য মতে সুরথ পিতৃহন্তা অর্জুনের বাণে মূর্চ্ছিত হয়ে মারা যান। অর্জুন তখন সুরথের নাবালক ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে দুঃশলাকে সান্ত্বনা দিয়ে ফিরে যান।

দুঃশাসন—ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর দ্বিতীয় পুত্র, দুর্যোধনের ছোট ও দুর্যোধনের অতি প্রিয় পাত্র। পাঞ্চালীর স্বয়ংবরে ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিতদের খাওয়াবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। প্রথম পাশা খেলাতে দ্রৌপদীকে পণ রেখে হেরে গেলে দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন একবস্ত্রা, রজস্বলা দ্রৌপদীকে চুলের মুঠি ধরে সভায় টেনে আনেন এবং অশ্লীল ভাষায় বিদ্রূপ করতে থাকেন। অঙ্গরাজ কর্ণের প্ররোচনায় দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করতেও চেষ্টা করেন। কিন্তু বস্ত্র সীমাহীন হয়ে পড়ে ; দুঃশাসন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন। এই অপমানের জন্য ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত খাবেন এবং সেই রক্তে দ্রৌপদীর কেশ রঞ্জিত করে দেবেন। ঘোষ যাত্রায় গন্ধর্বদের হাতে বন্দী হন। অপমানিত দুর্যোধন এই সময় দুঃশাসনকে রাজত্ব দিয়ে দিতে চান কিন্তু দুঃশাসন রাজি হন না। কুরুক্ষেত্রে তীব্র যুদ্ধ করেছিলেন ; এবং অভিমন্যু ও সহদেবের কাছে হেরে যান। যুদ্ধের ১৬/১৭ দিনের দিন ভীম গদাঘাতে মাটিতে ফেলে দেন এবং বুকে চেপে বসে জানতে চান কোন হাতে দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরেছিলেন। দুঃশাসন ডান হাত তুলে দেখালে ভীম এই হাত মুচড়ে ছিঁড়ে নেন এবং ছিন্ন বাহুর আঘাতে দুঃশাসনকে জর্জরিত করে তোলেন এবং শেষ পর্যন্ত বুক চিরে রক্ত খান। পরে তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে এঁকে বধ করেন। দুঃশাসনের প্রাসাদে পরে অর্জুন বাস করতেন। ব্যাসের আহ্বানে মৃত যোদ্ধাদের সঙ্গে ইনিও দেখা দিতে এসেছিলেন।

দুঃসহ—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত। (২) অলক্ষীর (দ্রঃ) স্বামী।

দুন্দুভি—(১) কশ্যপ দনুর ছেলে। আর এক মতে হেমা ও ময়ের ছেলে দুন্দুভি ও

ও মায়াবী। অন্য মতে মায়াবীর ছেলে। রাবণের শালা। দুন্দুভি মহিষ মত দেখতে এবং দেহে সহস্র হাতীর বল। এর ওপর তপস্যা করে বল পেয়ে উদ্ধত হয়ে ওঠেন। যাকে দেখেন তার সঙ্গেই যুদ্ধ করতে যান। কিন্তু সকলেই পেছিয়ে যান। শেষ অবধি সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যান। বরুণ দেব হার স্বীকার করে হিমালয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলেন। হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি ভেঙে তছনছ করেতে থাকলে হিমালয় পরাজয় স্বীকার করে বালীর কাছে পাঠান। দুন্দুভি তখন কিষ্কিন্ধ্যায় এসে বালীকে যুদ্ধে ডাক দেন এবং হেরে গিয়ে পালাতে থাকেন। বালী ও সুগ্রীব পেছু পেছু তেড়ে আসেন। দুন্দুভি শেষ পর্যন্ত একটি গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ে; বালীও পেছনে আসেন; সুগ্রীব গুহার মুখে পাহারা থাকেন। এক বছর ধরে গুহার মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং দুন্দুভি মারা যান। দুন্দুভির দেহ বালী ঋষ্যমূক পাহাড়ের দিকে ছুঁড়ে দিলে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে ছিটকে রক্ত এসে পড়ে; ফলে মুনিশাপ দেন,যে এই রক্ত ফেলেছে কোন দিন সে যদি ঋষ্যমূক পাহাড়ে আসে তাহলে তখনই তার মাথা ফেটে মারা যাবে। (২) প্রাচীন বৃহৎ চর্ম বাদ্য। ভরত নাট্য শাস্ত্রে আছে স্বাতি মুনি দেবতাদের দুন্দুভি দেখে মুরজ বাদ্য নির্মাণ করেন। মঙ্গল/বিজয় উৎসব ইত্যাদিতে বাজানহত।

দুর্গম—হিরণ্যাক্ষ বংশে তরু'র পুত্র। জন্ম থেকেই দেবতাদের শত্রু। ভেবে ঠিক করেন বেদ নষ্ট করতে পারলে কোন যজ্ঞ হবে না; দেবতারা তখন দুর্বল হয়ে পড়বেন। দুর্গম ফলে তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে বর চান এবং বেদ হস্তগত করেন। ফলে ব্রাহ্মণরা মন্ত্র ভুলে যান, যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যায়; দেবতারা শীর্ণকায় হয়ে পর্বত গুহাতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পৃথিবী ধ্বংসের মুখে এসে হাজির হয়; এমন কি জল পর্যন্ত থাকে না। ব্রাহ্মণরা তখন হিমালয়ে গিয়ে দুর্গার শরণ নেন। এঁদের দুঃখের কথা শুনে দুর্গার চোখে জল আসে ফলে পৃথিবী আবার সজল হয়ে ওঠে। দুর্গা সকলকে শাক ভোজন করতে দিয়ে রক্ষা করেন ফলে দুর্গা শাকম্ভরী নামে পরিচিত হন। দুর্গম এদিকে খবর পেয়ে এসে আক্রমণ করেন; দুর্গার দেহ থেকে তখন বহু শক্তি/দেবী বার হন এবং যুদ্ধে দুর্গম নিহত হন।

দুর্গা—পরমা প্রকৃতি :- দ্রঃ দেবী। সৃষ্টির আদি কারণ; মহাদেবের স্ত্রী। অপর নাম নারায়ণী। ব্রহ্মাদি সকলের দ্বারা পূজিত। দুর্গার বহু মূর্তি/রূপ পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। মহিষাসুরের অত্যাচারে স্বর্গচ্যুত দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নিলে ব্রহ্মা, শিব ও অন্য সকলকে নিয়ে বিষ্ণুর কছে আসেন। ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষের অবধ্য। বিষ্ণু নির্দেশ দেন নিজ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজ নিজ তেজের কাছে প্রার্থনা করতে হবে যে সমবেত তেজ থেকে যেন এক নারীমূর্তির আবির্ভাব হয়। এই শুনে দেবতাদের দেহ থেকে তেজ বার হয়ে সেই তেজ সমবেত হয়ে এক দেবীর সৃষ্টি হয়। দেবতারা নিজেদের অস্ত্র দিয়ে এঁকেসজ্জিত করেন।দ্রঃ কাত্যায়নী।এই দেবী মহিষাসুরকে তিন বার বধ করে ছিলেন; প্রথম বার অষ্টাদশভূজা উগ্রচণ্ডা রূপে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার দশভূজা দুর্গা রূপে। স্বপ্নে ভদ্রকালীর মূর্তি দেখে মহিষাসুর এই মূর্তির আরাধনা করেছিলেন। দেবী দেখা দিলে মহিষাসুর জানান মৃত্যুতে সে ভীত নয়, সে চায় দেবীর সঙ্গে সেও যেন পূজিত হয়। দেবী বর দিয়েছিলেন উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী বা দুর্গা তিন মূর্তিতেই অসুর তাঁর পদলগ্ন থাকবেন এবং দেবতা রাক্ষস ও

মানুষের পূজ্য হবেন। সত্য যুগে রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য মূর্তি গড়ে তিন বছর দুর্গা পূজা করেছিলেন। ত্রেতা যুগে রাবণ চৈত্রমাসে এঁর পূজা (বাসন্তী পূজা) করতেন। রাবণ বধের জন্য রামচন্দ্র অকালে এঁর শারদীয়া পূজা করেন; বাল্মীকি রামায়ণে কিন্তু এ ঘটনাটি নাই; কিন্তু পুরাণে উল্লেখ আছে। দ্রঃ মহিষাসুর, নিশুম্ভ।

বৈদিক সাহিত্যে দুর্গার উল্লেখ আছে। তন্ত্র ও পুরাণে বিশেষ আলোচনাও পূজা বিধি রয়েছে। দুর্গা, মহিষমর্দিনী, শূলিনী, জয়দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, গন্ধেশ্বরী, বনদুর্গা ইত্যাদি বহু নামে এঁর পূজা হয়। তন্ত্রে ইনি চতুর্ভুজা, সিংহস্থা, মরকতবর্ণা। পুরাণ অনুসারে বাঙলায় অতসী পুষ্প বর্ণা ইত্যাদি। আশ্বিনে শুক্লপক্ষে শারদীয়া এবং চৈত্রে শুক্লপক্ষে বাসন্তী পূজা এই দুর্গার পূজা।

দুর্জয়—(১) দুষ্পরাজয়। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ঘোষ যাত্রার সময় বন্দী হন। ভীমের হাতে মৃত্যু। (২) এক জন দানব; দনুর ছেলে। (৩) সুপ্রতীকের ছেলে। গৌরমুখ মুনির কাছে চিন্তামণি মণি আছে জানতে পেরে এই মণিটি সংগ্রহ করার জন্য যুদ্ধ করেন এবং মারা যান। যেখানে মারা যান সেই স্থানটি নৈমিষারণ্য নামে পরিচিত হয়।

দুর্দম—গন্ধর্ব বিশ্বাবসুর ছেলে। উলঙ্গ স্ত্রীদের নিয়ে জলক্রীড়া করছিলেন। বসিষ্ঠ ফলে শাপ দেন রাক্ষসে পরিণত হতে হবে। কিন্তু পরে বলেন ১৭ বছর এই শাপ ভোগ করতে হবে। রাক্ষস হয়ে ইনি গালবকে এক দিন খেয়ে ফেলতে যান; বিষ্ণু তখন এঁকে সুদর্শন চক্রে নিহত করে শাপ মুক্ত করেন।

দুর্ধর—দুরাধারা। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত।

দুর্ধর্ষণ—দুর্মদ। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে মৃত্যু।

দুর্বাসা—অত্রির (দ্রঃ) ঔরসে স্ত্রী অনসূয়ার গর্ভে জন্ম। অত্যন্ত তেজস্বী ও অতি কোপনশীল পৌরাণিক ঋষি। জন্ম সম্বন্ধে নানা কাহিনী: একবার ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে যুদ্ধ হয়। শিবকে রাগে ফেটে পড়তে দেখে দেবতারা ভয়ে পালান। শিব ব্রহ্মার একটি মাথা ছিঁড়ে নেন; কিন্তু তবু রাগ মেটে না। পার্বতী ভয় পেয়ে যান এবং বলেন 'দুর্বাসস্ ভবতি মে'। কোন মতে স্বামীকে শান্ত করেন। শিব তখন বাকি ক্রোধ অনসূয়াকে আরোপ করেন। মহাদেবের এই ক্রোধ অনসূয়ার গর্ভে দুর্বাসা হয়ে জন্মান। আর এক কাহিনী আছে (দ্রঃ অনসূয়া)। আর এক কাহিনীতে ব্রহ্মার কাছে হেরে গিয়ে মহাদেব নরনারায়ণের আশ্রমে আশ্রয় নেন এবং সমস্ত কাহিনী জানান। এঁরা শিবকে বলেন এঁদের হাতে শূল বিদ্ধ করতে। শূল বিদ্ধ হাত থেকে তিনটি ধারায় রক্ত পড়তে থাকে; একটি ধারা দুর্বাসাতে পরিণত হয়। ত্রিপুরকে ধ্বংস করার জন্য মহাদেব যে বাণ সন্ধান করেছিলেন সেই বাণ ত্রিপুর ধ্বংস করে শিবের কোলে একটি শিশুর রূপ ধরে ফিরে আসে; এই শিশু দুর্বাসা। ঔর্ব মুনির মেয়ে কন্দলীর স্বামী। কথা ছিল দুর্বাসা এঁর একশ অপরাধ ক্ষমা করবেন। একশ এক অপরাধ করার পর স্ত্রীকে শাপ দিয়ে ছাই করে ফেলেন। মেয়ের শোকে ঔর্ব শাপ দেন দুর্বাসার দর্প চূর্ণ হবে। এই জন্য মহারাজ অম্বরীষের (দ্রঃ) কাছে হতদর্প হন। দ্রঃ ইল্বল। কুন্তী ভোজের প্রাসাদে (মহা ১।১১৪।৩৪) কুন্তীর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে কুন্তীকে আহ্বান মন্ত্র দিয়ে ছিলেন। এই মন্ত্রে দেবতাদের ডাকা যায়। দুর্বাসার দেওয়া

মালা মাটিতে ফেলে দেবার জন্য ইন্দ্রকে(দ্রঃ) ইনি শাপ দেন;এবং শেষ পর্যন্ত সমুদ্র মন্থন করতে হয়। দ্রঃ দক্ষ। শকুন্তলাকে (দ্র) শাপ দিয়েছিলেন দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পারবেন না। পাণ্ডবদের বনবাস কালে দুর্যোধনের (দ্রঃ) অনুরোধে দশ হাজার শিষ্য নিয়ে অসময়ে পাণ্ডবদের অতিথি হন। কৃষ্ণের (দ্রঃ) মায়াতে পাণ্ডবরা/দ্রৌপদী (দ্র) নিষ্কৃতি পান। লক্ষ্মণের (দ্রঃ) মৃত্যুর কারণ হন। হংস ও ডিম্বকের কাছে এক বার অপদস্থ হয়েছিলেন। দুর্বাসার যুক্তিহীন কাজও দেখা যায়; এক দিন উত্তপ্ত পায়স খেতে খেতে কৃষ্ণকে সারা গায়ে সেই পায়স মাখতে বলেন; কৃষ্ণ নিজের পায়ের তলা ছাড়া সারা গায়ে পায়স মাখেন। দুর্বাসা তখন রুক্মিণীর গায়ে পায়স মাখিয়ে দিয়ে তাঁকে রথে জুড়ে নিয়ে সেই রথে চড়ে রুক্মিণীকে চাবুক মারতে থাকেন। রুক্মিণী সাধ্য মত রথ টেনে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। দুর্বাসা তখন রাগে রথ থেকে নেমে দক্ষিণ দিকে চলে যাচ্ছিলেন। কৃষ্ণ দুর্বাসাকে খোসামদ করে সন্তুষ্ট করেন। এই ঘটনাতে কৃষ্ণ ক্রোধ জয় করতে পেরেছিলেন বলে কৃষ্ণকে ক্রোধজিৎ বলে প্রশংসা করেন এবং বর দেন কৃষ্ণ ও রুক্মিণী সকলের প্রিয় হবেন। সারা গায়ে পায়স মাখার জন্য কোন দিন দেহে জরা আসবে না। পায়স মাখার জন্য কৃষ্ণের সারা গা অভেদ্য হয়ে যায়; কেবল পায়ের তলা বাদ থাকে এবং পায়ের তলাতেই বাণ-বিদ্ধ হয়ে মারা যান। দুর্বাসার শাপে সাম্ব মুষল প্রসব করেন। শ্বেতকির (দ্রঃ) যজ্ঞ করে দেন; ফলে অগ্নির অজীর্ণ দেখা যায়। দ্রঃ মুদ্গল।

দুর্বিগাহ—দুর্বিষহ। ধৃতরাষ্ট্রের একটি ছেলে; ভীমের হাতে নিহত।

দুর্বিমোচন—ধৃতরাষ্ট্রের একটি ছেলে; ভীমের হাতে নিহত।

দুর্বিরোচন—ধৃতরাষ্ট্রের একটি ছেলে; ভীমের হাতে নিহত।

দুর্মদ—গন্ধর্বরাজ হংসের ছেলে। দুর্মদ ও উন্মদা দুজনে মিলে পুরূরবা ও উর্বশীকে প্রতারিত করেন। উর্বশী ফলে শাপ দেন দুর্মদ রাক্ষস হয়ে জন্মাবেন। এর ফলে উন্মদা (দ্র) বিদেহ রাজার মেয়ে হরিণী হয়ে জন্মান এবং দুর্মদ দীর্ঘজঙ্ঘ রাক্ষসের ছেলে পিঙ্গলাক্ষ হয়ে জন্মান। হরিণীকে এক দিন পিঙ্গলাক্ষ অপহরণ করেন। রাজপুত্র বসুমনস্ এই হরিণীর কান্না শুনে রাক্ষসকে হত্যা করে হরিণীকে বিদেহ রাজার কাছে পাঠিয়ে দেন। সকলে স্থির করেন বসুমনসের সঙ্গে হরিণীর বিয়েহবে। কিন্তু বিয়ের দিন হেহয় রাজ ভদ্রশ্রেণ্য হরিণীকে জোর করে নিয়ে পালিয়ে যান এবং বিয়ে করেন; ছেলে হয় দুর্মদ। দুর্মদ বড় হতে থাকে এবং গর্গের উপদেশে পিতৃব্য কন্যা চিত্রাঙ্গীকে বিয়ে করেন। এর কিছু পরে কাশীরাজ দিবোদাস ও ভদ্রশ্রেণ্যের যুদ্ধ হয় এবং উর্বশীর শাপ মত এরা নিহত হয়। হরিণী আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে শাপ মুক্ত হন।

দুর্মর্ষণ— ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর এঁর প্রাসাদে নকুল বাস করতেন।

দুর্মুখ—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ঘোষ যাত্রায় দ্বৈতবনে এসে গন্ধর্বদের হাতে বন্দী হন। কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে মারা যান। এর প্রাসাদে পরে সহদেব বাস করতেন। (২) রামের গুপ্তচর। এঁর সাহায্যে রাম প্রজাদের মতামত সংগ্রহ করতেন। সীতার বিরুদ্ধে সমালোচনা এঁর কাছেই অবগত হন। (৩) মহিষাসুরের এক অনুচর।

(৪) রাবণের এক অনুচর ; সুন্দরী ও মাল্যবানের ছেলে। (৫) একটি সাপ ; বলরামের আত্মাকে গ্রহণ করতে এসেছিল।

দুর্যোধন—(১) ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর (দ্র) প্রথম ছেলে। কলির অংশে জন্ম। স্বামীর অজ্ঞাতে গান্ধারী গর্ভপাত করেন। জন্মেই ইনি গাধার মত ডাকতে থাকেন। বহু দুর্লক্ষণ দেখা দেয়। বিদুর ও ব্রাহ্মণরা গণনা করে ধৃতরাষ্ট্রকে জানান এই ছেলে দেশের ও প্রজাদের সমূহ ক্ষতি করবে, এর জন্য কুরুকুল ধ্বংস হবে ; এবং ছেলেকে পরিত্যাগ করারও উপদেশ দিয়েছিলেন। দুর্যোধনের স্ত্রী ভানুমতী এবং একটি ছেলে লক্ষ্মণ ও একটি মেয়ে লক্ষ্মণা। (দ্রঃ বলরাম)।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর পাণ্ডবরাও ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের সঙ্গে একত্র প্রতিপালিত হতে থাকেন। ফলে বালকদের মধ্যে অনেক সময় অকারণেও ঝগড়া হত। ভীম ও দুর্যোধন একই দিনে জন্মেছিলেন। ভীম অমিত বলশালী ছিলেন ফলে অনেক সময় কৌরব বালকরা ভীমের গুণ্ডামিতে উৎপীড়িতও হত। দুর্যোধনের ঈর্ষাও ছিল। ফলে শৈশব থেকেই ভীমের সঙ্গে দুর্যোধনের একটা শত্রুতা দেখা দেয়। বলরামের কাছে দুর্যোধন গদাযুদ্ধ শেখেন। ভীমকে হত্যা করবার চিন্তা করতে থাকেন। গদাযুদ্ধে ভীমের সমান না হতে পেরে গঙ্গাতে জলক্রীড়ার জন্য পাণ্ডবদের এক দিন সঙ্গে করে নিয়ে যান। খাবার সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিলে ভীম অচৈতন্য হয়ে পড়েন। এই সুযোগে রাত্রি বেলা ভীমকে দড়ি দিয়ে বেঁধে জলে ফেলে দেন। পর দিন সকালে ভীমকে পাওয়া যায় না ; দুর্যোধন বলেন ভীম তাহলে আগেই হস্তিনাপুরে ফিরে গেছেন। আট দিন পরে ভীম পাতাল থেকে ফিরে আসেন। দ্রোণের কাছে অস্ত্র শিক্ষার পর অস্ত্র বিদ্যা প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়। এই প্রদর্শনীতে দুর্যোধন ও ভীম নৃশংস ভাবে পরস্পরকে গদা যুদ্ধে আক্রমণ করলে দ্রোণের আদেশে অশ্বত্থামা দুজনকে থামিয়ে দেন। এর পর কর্ণ অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে যোগ দিতে আসেন অন্য মতে অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন করতে এসেছিলেন মাত্র। কর্ণের বংশ পরিচয় নিয়ে কৃপাচার্য ও পাণ্ডবপক্ষীয়েরা বিরোধিতা করলে দুর্যোধন সেই মুহূর্তে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের রাজা বলে ঘোষণা করেন। এর পর দ্রোণকে-দেয় গুরু দক্ষিণা হিসাবে দ্রুপদ রাজাকে ধরে আনতে গিয়ে দুর্যোধনরা অত্যন্ত বিপদে পড়েছিলেন ; পাণ্ডবদের চেষ্টায় মুক্তি পান ; এবং অর্জুন দ্রুপদকে ধরে আনেন। ফলে দুর্যোধন নিজেকে আরো বেশি অপমানিত মনে করতে থাকেন। পাণ্ডবদের এই ভাবে ক্রমিক বর্দ্ধমান প্রতিপত্তিতে শকুনি ও কর্ণের পরামর্শে দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে সামনে রেখে মন্ত্রী পুরোচনকে দিয়ে পাণ্ডবদের বারণাবতে জতুগৃহে পাঠিয়ে দেন। এক বছর পাণ্ডবরা এখানে বাস করার পর এই প্রাসাদে আগুন দেওয়া হয়। পাণ্ডবরা গোপনে পালিয়ে গেলেও খবর ছড়ায় এঁরা পুড়ে মারা গেছেন ; দুর্যোধন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে পড়েন। স্বয়ংবর সভাতে অর্জুন দ্রৌপদীকে লাভ করলে দুর্যোধনরা লজ্জায় সেখান থেকে ফিরে আসেন। পাণ্ডবদের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, দুর্যোধন ঈর্ষায় ফেটে পড়তে থাকেন। দুর্যোধন এই সময় মেয়েছেলে পাঠিয়ে ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এঁদের সর্বনাশ করতেও চেষ্ট করেন। ভীম দ্রোণ ইত্যাদির পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র কিছুটা রাজ্য দিয়ে পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনেন। পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করতে থাকেন এবং এখানে রাজসূয় যজ্ঞ করেন।

দুর্যোধনও এই যজ্ঞে যোগ দেন। এই যজ্ঞের সময় দুর্যোধন তথা কৌরবরা ইন্দ্রপ্রস্থে প্রাসাদের ঐশ্বর্যে প্রতি পদে স্তম্ভিত এবং নিজেদের আচরণে সকলের উপহাসাস্পদ হয়ে উঠেছিলেন। যজ্ঞের পর দুর্যোধন ঠিক করেন হয় পাণ্ডবদের ধ্বংস করবেন, নয়তো আত্মহত্যা করবেন। শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করেন; শকুনি প্রথমে শান্ত করতে চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত কপট পাশাখেলার জন্য দুর্যোধনকে পরামর্শ দেন। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরদের ডেকে পাঠান। কপটতার আশ্রয়ে দুর্যোধন প্রতিবার খেলাতে জিততে থাকেন; শেষ পর্যন্ত বিদুর যুধিষ্ঠিরকে খেলা বন্ধ করতে বলেন। যুধিষ্ঠির এ উপদেশ শোনেন না; সমস্ত রাজ্য এমন কি শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীকেও দুর্যোধন জিতে নেন। দুর্যোধন তখন দূত পাঠান দ্রৌপদীকে নিয়ে আসবার জন্য; দ্রৌপদী দূতকে ফেরত দেন। দুর্যোধন তখন দুঃশাসনকে পাঠান। দুঃশাসন চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে এঁকে সভাতে নিয়ে আসেন। দুর্যোধন দ্রৌপদীকে নিজের নগ্ন উরুতে এসে বসবার জন্যও ডাকেন। এই অপমানের জন্য ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দুর্যোধনের উরু ভেঙ্গে প্রতিশোধ নেবেন। শেষ পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের সব কিছু ফিরিয়ে দিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের এই উদারতা দুর্যোধন কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। শকুনির পরামর্শে আবার পাশা খেলায় ডেকে পাঠান। ঠিক হয় হারলে বার বছর বনবাস এবং পরে এক বছর অজ্ঞাত বাসে থাকতে হবে; এবং ধরা পড়লে আবার বনবাস এবং আবার অজ্ঞাত বাসে যেতে হবে। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝান প্রথম বার খেলার পর দ্রৌপদীকে যে ভাবে অপমানিত হতে হয়েছে তার একটা প্রতিশোধ নিতে পাণ্ডবরা চেষ্টা করবেই। এই জন্যেই পাণ্ডবদের দূরে সরিয়ে দেওয়াই ভাল। পাণ্ডবরা খেলায় হেরে যান এবং দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে বনে চলে যান।

মহাদেব একবার দুর্যোধনকে নগ্ন হয়ে তাঁর সামনে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু ইনি কৌপীন মত পরে এসেছিলেন এবং মহাদেবের দৃষ্টিপাতে কৌপীন ঢাকা অংশ বাদে তাঁর সমস্ত দেহ কঠিন ও শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিল; এই কারণে ভীম উরু-ভাঙ্গতে সমর্থ হয়েছিলেন। পাণ্ডবরা কাম্যক বনে এলে মৈত্রেয় এঁদের বিপদে মর্মাহত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বিদুর মৈত্রেয়ের উপদেশ পালন করতে ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দেন; দুর্যোধন কিছুতেই সম্মত হন না; সামনে দাঁড়িয়ে থেকে উরু চাপড়াতে থাকেন। মৈত্রেয় তখন অভিশাপ দেন এই দুর্বুদ্ধিতার জন্য যুদ্ধ বাঁধবেই এবং ভীম ঐ উরু চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবেন। পাণ্ডবরা যখন দ্বৈত বনে বাস করছিলেন দুর্যোধন তখন নিজের পারিষদ নিয়ে ঘোষ যাত্রায় ও মৃগয়ার অছিলায় আসেন। উদ্দেশ্য ছিল পাণ্ডবদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখা এবং উপহাস করা। কিন্তু বনের মধ্যে গন্ধর্ব রাজ চিত্রসেনের হাতে নিগৃহীত হন ও সপরিবারে বন্দী হন। শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদের অনুগ্রহে মুক্তি পান। মুক্তি পেয়ে আত্মগ্লানিতে দুর্যোধন প্রায়োপ-বেশনে আত্মহত্যা করবেন ঠিক করেন এবং দুঃশাসনকে রাজা করে দিতে চান। কিন্তু দুঃশাসন রাজি হন না। এ দিকে পাতালে দানবরা চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং যজ্ঞ করে কৃত্যার জন্ম দিয়ে কৃত্যাকে দিয়ে দুর্যোধনকে তুলে নিয়ে আসেন। দানবরা বোঝায় দুর্যোধনের দেহের ওপর অংশ হীরক দিয়ে তৈরি; কোন দিন বাণবিদ্ধ হবে না। ভগদত্ত

ইত্যাদি দুর্যোধনকে সাহায্য করবার জন্যই জন্মেছেন ;কর্ণের মধ্যে তারকাসুরের একটা অংশ রয়েছে ইত্যাদি ; অর্থাৎ দানবরা তাঁকে সাহায্য করবেনই। দুর্যোধন আশান্বিত হয়ে ওঠেন এবং কৃত্যা আবার দুর্যোধনকে ওপরে পৌঁছে দিয়ে যান। দুর্যোধনের মনে হয় যেন তিনি স্বপ্ন দেখলেন। দুর্যোধন তখন প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করেন।

এর পর দুর্যোধন রাজসূয় যজ্ঞ করবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণরা বিধান দেন তাঁর রাজসূয় যজ্ঞের অধিকার নাই ; বিষ্ণু যজ্ঞ করতে পারেন (মহা ৩।২৪১।১২)। এই যজ্ঞে দুর্যোধন পাণ্ডবদের যোগ দিতে ডাকেন ; কিন্তু পাণ্ডবরা আসেন না। এর পর শিষ্যদের নিয়ে দুর্বাসা এক দিন আসেন ;দুর্যোধন এঁদের সেবাতে পরিতুষ্ট করে বর চান দুর্বাসা (দ্রঃ) যেন পাণ্ডবদের খাওয়া হয়ে গেলে সশিষ্য পাণ্ডবদের কুটিরে গিয়ে অতিথি হন। দ্রঃ দ্রৌপদী। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় দুর্যোধন চারদিকে চর পাঠান কিন্তু কোন লাভ হয় না। কীচক মারা গেলে ত্রিগর্ত-রাজ সুশর্মা দুর্যোধনকে পরামর্শ দেন বিরাট-রাজকে আক্রমণ করতে ; প্রথমে ত্রিগর্ত রাজ বিরাটের গরুগুলি চুরি করেন। পাণ্ডবদের এই দিন অজ্ঞাতবাসও শেষ হয়। অর্জুনের হাতে দুর্যোধনরা সম্পূর্ণ পরাজিত হন। পাণ্ডবরা এর পর দুর্যোধনের কাছে নিজেদের রাজত্ব এবং কম পক্ষে পাঁচটি মাত্র গ্রাম ফিরে চান। কিন্তু দুর্যোধন জানিয়ে দেন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও তিনি দেবেন না। যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। দুর্যোধন কৃষ্ণকে দলে নেবার জন্য দ্বারকাতে আসেন। দুর্যোধন আসছেন শুনে কৃষ্ণ ঘুমের ভাণ করে শুয়ে থাকেন ; দুর্যোধন কৃষ্ণের মাথার দিকে সিংহাসনে বসে অপেক্ষা করতে থাকেন। এর পর অর্জুন আসেন ও কৃষ্ণের পায়ের দিকে বসে থাকেন। কৃষ্ণ কপট নিদ্রা থেকে উঠে আগে পায়ের দিকে অর্জুনকে দেখেন এবং দুর্যোধনকে বোঝান অর্জুন পরে এলেও তাঁর সঙ্গে অর্জুনেরই আগে দেখা ও আগে কথাবার্তা হয়েছে। তার পর দশ লক্ষ নারায়ণী সেনা ও কৃষ্ণের মধ্যে যে কোন একটিকে অর্জুন কনিষ্ঠ বলে কৃষ্ণ অর্জুনকে আগে বেছে নিতে বলেন ;দুর্যোধনকে বেছে নেবার সুযোগই দেন না। দুর্যোধনকে ঐ সেনাবাহিনী নিতে হয় এবং কৃষ্ণ দুর্যোধনকে আরো প্রতিশ্রুতি দেন যুদ্ধে কোন দিন তিনি অস্ত্রধারণ করবেন না। দুর্যোধন তারপর বলরামের সাহায্য চান ; কিন্তু বলরাম নিরপেক্ষ থাকতে চান। দুর্যোধন শেষ পর্যন্ত এগার অক্ষৌহিনী সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন এবং যুদ্ধকে দুর্যোধন একটি যজ্ঞ বলে ঘোষণা করেন। যুদ্ধের আগের মুহূর্তে কৃষ্ণ কৌরবদের কাছে সন্ধির জন্য আসেন ; দুর্যোধন তাঁকে তখন বন্দী করবার মতবল করেন। কিন্তু হস্তিনাপুরে কেউ তাঁর এ মতলব সমর্থন করেন না। কৃষ্ণ এলে দুর্যোধন অবশ্য যথোচিত সম্মান ও বহু উপহার দিয়েছিলেন এবং খেতে নিমন্ত্রণও করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ এ আতিথ্য বা উপহার কিছুই গ্রহণ করেন না। কণ্ব মুনি এসে এই সময় দুর্যোধনকে যুদ্ধ করতে বারণ করেন কিন্তু দুর্যোধন অটল থাকেন। শেষ পর্যন্ত দুর্যোধন কৃষ্ণকে বন্দী করতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু জানাজানি হয়ে যায় ; কৃষ্ণ ফিরে যান। কৃষ্ণ ফিরে গেলে শকুনির ছেলে উলূককে দুর্যোধন দূত হিসাবে পাণ্ডবদের কাছে পাঠান ; উলূক বহু কটু কথা শুনিয়ে আসেন।

যুদ্ধে দুর্যোধন ভীষ্মকে প্রথম সেনাপতি করেন এবং দুঃশাসনকে ভীষ্মের দেহরক্ষী নিযুক্ত করেন। দুর্যোধনের পতাকা সর্পলাঞ্ছিত ছিল। কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধন

বার বার ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। অন্যান্য বহু যোদ্ধার সঙ্গেও যুদ্ধ করেছিলেন এবং কোথাও জয়লাভ ও কোথাও পরাজিত হয়েছিলেন। বহু বীর দুর্যোধনের হাতে নিহত হন। ভীষ্মের পর দ্রোণ এবং তার পর কর্ণকে সেনাপতি করেন। অভিমন্যু বধের সপ্তরথীর মধ্যে দুর্যোধনও এক জন। দ্রোণ যে দিন নিহত হন সে দিন সকালে সাত্যকিকে দেখে তাঁর কাছে এই আত্মীয় নিধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেন। কর্ণ ছাড়া প্রত্যেক কৌরব সেনাপতিকেই তিনি পাণ্ডবদের পক্ষপাতী বলে অভিযোগ এনেছিলেন। জয়দ্রথকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন এবং জয়দ্রথ মারা যেতে অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েন। দ্রোণের বিরুদ্ধে ও পক্ষপাতের অভিযোগ করেছিলেন। অশ্বত্থামা এক বার কর্ণকে হত্যা করতে গেলে দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে শান্ত করেন। শল্যকে কর্ণের সারথি হতে বললে শল্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন কিন্তু দুর্যোধন বুঝিয়ে শল্যকে রাজি করেন। অশ্বত্থামা এক বার সন্ধির একটা প্রস্তাব করেন কিন্তু দুর্যোধন কর্ণপাত করেন না। কর্ণের মৃত্যুর পর কৃপাচার্য আবার সন্ধির কথা বলেন ; কিন্তু দুর্যোধন রাজি হন না ; এবং শল্যকে সেনাপতি করেন। আঠার দিনের দিন কৌরব বাহিনী শেষ হয়ে গেলে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং মায়ায় হ্রদের জল স্তম্ভিত করে জলের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন। কৌরব পক্ষে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা এখানে পরামর্শ করতে এলে পর দিন কথা বলবেন বলে এঁদের বিদায় দেন ; আর যুদ্ধে ঠিক রাজি হন না। কয়েক জন ব্যাধ ঘটনাটি জানতে পেরে পাণ্ডবদের খবর দেন। পাণ্ডবরা এখানে এলে যুধিষ্ঠিরের কটুবাক্যে উত্তেজিত হয়ে হ্রদ থেকে বার হয়ে এসে গদা যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হন। ভীমকে বধ করার জন্য তের বছর ধরে লৌহমূর্তির ওপর গদাঘাত অভ্যাস করেছিলেন। খবর পেয়ে বলরাম ও এসেছিলেন এবং কুরুক্ষেত্রের মাঝখানে সমন্তপঞ্চকে সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে এই গদা যুদ্ধের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ভীম বলশালী হলেও সমান কৌশলী ছিলেন না। যুদ্ধের সময় কৃষ্ণের ইঙ্গিতে অর্জুন নিজের বাম উরুতে চড় মেরে প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিলে ভীম সুযোগ মত দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেন এবং বাঁ পায়ে করে মাথা থেঁতলে দিতে চেষ্টা করেন। দুর্যোধন এ সময়ে কৃষ্ণকে তিরস্কার করেন। মৃতপ্রায় দুর্যোধনকে পাণ্ডবরা ত্যাগ করে চলে গেলে কৃপাচার্যেরা তিন জনে এসে দেখা করেন ; দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে সেনাপতি করে ভীমের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে আসবার নির্দেশ দেন। এঁরা দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলে ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ইত্যাদিকে হত্যা করে এঁদের মাথা এনে দিলে অন্ধকারে ভীমের মাথা নয় দুর্যোধন ঠিক বুঝতে পারেন ও মারা যান।

ব্যাস মৃত যোদ্ধাদের গঙ্গাতীরে আহ্বান করলে দুর্যোধনও এসেছিলেন। যুধিষ্ঠির স্বর্গে পৌঁছে দেখেন দুর্যোধন সিংহাসনে সূর্যের মত ভাস্বর হয়ে অবস্থান করছেন। এই দুর্যোধন সম্বন্ধে সাম্ব নামে এক বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ ধৃতরাষ্ট্রের বনে যাবার সময় সমবেত জনতার পক্ষ থেকে (মহা ১৫।১৫।১১) বলেছিলেন প্রজারা দুর্যোধনকে পিতার মত শ্রদ্ধা করত। (২) সুবীর-এর নাতি ; স্ত্রী নর্মদা ; মেয়ে সুদর্শনা, অগ্নির স্ত্রী। (মহা ১৩।২।১২) দ্রঃ ওঘবতী।

দৃঢ়ক্ষত্র—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত।

দৃঢ়দস্যু—অপর নাম ইধ্মবাহ। অগস্ত্য লোপমুদ্রার ছেলে। সাত বছর গর্ভে ছিলেন। এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত ও তপস্বী।

দৃঢ়বর্মন—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে নিহত।

দৃঢ়রথ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে নিহত।

দৃঢ়সন্ধ—শত্রুঞ্জয়। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে নিহত।

দৃঢ়হস্ত—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে নিহত।

দৃঢ়ায়ুধ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে নিহত।

দৃঢ়াশ্ব—ইক্ষ্বাকু বংশে এক বিখ্যাত বীর। কুবলাশ্বের ২১,০০০ ছেলের মধ্যে এক জন। ধুন্দুর হাতে ছেলেগুলি মারা যান; কেবল দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও চন্দ্রাশ্ব বেঁচে যান।

দৃপ্রধর্ষণ—দুষ্প্রধর্ষ। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে নিহত।

দুষ্যন্ত—দুষ্মন্ত/দুঃষন্ত। চন্দ্র বংশে যযাতি(১)-দুষ্যন্ত(১৪)। সন্তুরোধের তিন ছেলে দুষ্যন্ত, প্রবীর ও সুমন্ত। সন্তুরোধের ভাই প্রতিরথের ছেলে কণ্ব। আর এক মতে দুষ্যন্তের পিতা ঈলিন ও মাতা রথন্তরী এবং দুষ্যন্তের আরো চার সহোদর ভাই শূর, ভীম, বসু, প্রবসু (মহা ১।৮৯।১৫)। রাজা হয়ে অল্প দিনেই সারা ভারতের সম্রাট হয়ে বসেন। এক বার মৃগয়াতে বার হয়ে হরিণের পেছু পেছু মালিনী নদীর তীরে কণ্ব মুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। মুনি ছিলেন না; তাঁর পালিতা কন্যা শকুন্তলা (দ্র) অতিথি সৎকার করেন। রাজা পরিচয় চাইলে শকুন্তলা যথাযথ সমস্ত পরিচয় দেন। রাজা মুগ্ধ হয়ে গন্ধর্ব মতে বিয়ে করেন। শকুন্তলার এই বিয়েতে সর্ত ছিল যে তাঁর ছেলেকে কিন্তু রাজা করতে হবে। এর পর রাজা চলে আসেন কথা ছিল লোকজন পাঠিয়ে শকুন্তলাকে রাজধানীতে নিয়ে যাবেন। এর পর দুর্বাসা আশ্রমে আসেন; শকুন্তলা বসে বসে রাজার কথা ভাবছিলেন দুর্বাসা এসেছেন খেয়াল হয় নি; ফলে মুনি শাপ দেন রাজা সব কিছু ভুলে যাবে। এর পর কণ্ব মুনি ফিরে আসেন; সব কিছু জানতে পেরে এবং শকুন্তলা গর্ভবতী শুনে আশীর্বাদ করেন এই ছেলে সসাগরা ধরণীর অধিপতি হবেন। যথা সময়ে ছেলে হয়; কণ্ব সমস্ত জাতকর্ম করেন এবং ছেলের নাম রাখেন সর্বদমন। ছেলে ছয় বৎসর মত হলে কণ্ব শিষ্যদের দিয়ে এঁদের রাজধানীতে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু শাপগ্রস্ত রাজা এঁদের চিনতে পারেন না। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার বহু বিতর্ক হয় এবং রাগে ও দুঃখে শকুন্তলা ফিরে আসছিলেন এমন সময় দৈববাণী হয়। দৈববাণীতে সর্বদমনের নাম ভরত রাখতে বলা হয়। রাজা এবার এদের গ্রহণ করেন এবং বলেন চিনতে পেরেও লোক অপবাদের ভয়ে অস্বীকার করছিলেন। অন্য মতে আশ্রম থেকে চলে আসার সময় রাজা নিজের আংটিটি দিয়ে এসেছিলেন। রাজধানীতে আসার সময় শকুন্তলার আঁচল থেকে এই অভিজ্ঞান জলে পড়ে যায়। দুর্বাসার শাপ ছিল রাজা চিনতে পারবেন না বটে তবে এই অভিজ্ঞান দেখলেই আবার চিনতে পারবেন। একটি মাছের পেটে এই আংটি পেয়ে এক জেলে রাজাকে এটি এনে দিলে রাজার সব ঘটনা মনে পড়ে এবং শকুন্তলাকে গ্রহণ করেন। কালিদাসের শকুন্তলা গ্রন্থে কণ্ব মুনি আশ্রমে ফিরে এসে শকুন্তলার বিয়ে ও গর্ভসঞ্চারের কথা জানতে পেরে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেন।

আংটি জলে পড়ে যায়। শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাত হন। পরে আংটি একটি জেলে এনে দিলে রাজার সব কিছু মনে পড়ে এবং দৈবক্রমে বহু দিন পরে শকুন্তলার ও সর্বদমনের সন্ধান পান। দুষ্মন্তের আর এক স্ত্রী লক্ষ্মণার ছেলে জনমেজয়। (২) পুরু বংশে অজমীঢ়ের ছেলে; মা নীলী। এই দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী দুই ভাই; পাঞ্চাল নামেও পরিচিত। (মহা ১।৮৯।২৮।)

দূত—পুরাণ, মনুস্মৃতি ও মহাভারতে দূত সম্বন্ধে বহু তথ্য আলোচনা হয়েছে।

দূষণ—রাবণ সেনাপতি। এঁর ভাই খর। রাবণের রাজ্য দণ্ডকারণ্যে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খর ও দূষণ দুই ভাই ১৪ হাজার সৈন্য নিয়ে জনস্থান থেকে রাজ্যের এই প্রান্তদেশ রক্ষা করতেন। শূর্পণখার নাক কাণ কাটা গেলে এরা সসৈন্যে রাম লক্ষ্মণকে আক্রমণ করেন এবং প্রথমে খর ও পরে দূষণ মারা পড়েন।

দৃশদ্বতী/দৃষদ্বতী—ঋক্‌বেদে একটি নদী। পূর্ব পাঞ্জাবে। বর্তমানে নাম চিতাং, চিত্রাংগ, চৌতাংগ। এরই একটি উপনদী সরস্বতী। এই দৃষদ্বতী, সরস্বতী ও আপগা নদীর তীরে ভারতীয় আর্যেরা বাস করতেন (ঋক্) এবং দৃষদ্বতী ও সরস্বতীর তীরভূমি যজ্ঞভূমিতে পরিণত হয়। সরস্বতীর দক্ষিণে ও দৃষদ্বতীর উত্তরে অবস্থিত কুরুক্ষেত্র। মনুতে দৃষদ্বতী ও সরস্বতীর মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত দেশ অবস্থিত। অন্য মতে কুরুক্ষেত্রের অংশ বিশেষ হচ্ছে ব্রহ্মাবর্ত।

দেওঘর—পুরাণে বৈদ্যনাথ ধামের বিভিন্ন নামের উল্লেখ রয়েছে; যথা:—বৈদ্যনাথ, হরিদ্রাপীঠ, রাবণ কানন, কেতকীবন। শিব পুরাণে আছে রাবণ কৈলাস থেকে শিবের প্রতীক একটি জ্যোতির্লিঙ্গ লঙ্কায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। বিষ্ণু কৌশলে এটিকে এখানে নামিয়ে নিয়েছিলেন। দেওঘর ৫২ পীঠের একটি; এখানে সতীর হৃৎপিণ্ড পড়েছিল। বৈদ্যনাথের মন্দিরটি মনে হয় চোলবংশীয় রাজা (৮৭১-৯০৭ খৃ) তৈরি করান।

দেওনীমোর—পশ্চিম ভারতে সাবরকণ্ঠা জেলাতে অবস্থিত। খৃ ৩য় শতক হতে ক্ষত্রপদের রাজত্ব কালে এখানে একটি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। প্রধান স্তূপের আসনের বহির্ভাগে পঙ্‌ক্তিবদ্ধ কুলুঙ্গিতে পোড়া মাটির তৈরি বুদ্ধমূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মূর্তিগুলিতে গান্ধার শৈলীর প্রভাব। আরো দু-টি বিহার এখানে পাওয়া গেছে। মনে হয় ৬ শতক পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান ছিল।

দেওয়ালী—দীপাবলী। মুখ্য উৎসব কার্তিক মাসে অমাবস্যার সন্ধ্যায়। সর্ব ভারতীয় (হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন) উৎসব। সীতাকে নিয়ে রাম অযোধ্যায় ফিরে এলে প্রজারা প্রথমে এই উৎসব করেন। বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও তাঁর শিষ্য মহামোগ্‌-গলায়নের পরিনির্বাণ উপলক্ষ্যেও দীপাবলী পালন করা হয়। জৈন তীর্থংকর মহাবীর আশ্বিনী কৃষ্ণাচতুর্দশী রাত্রিতে নির্বাণ লাভ করেন; জৈনরা এই জন্য দীপ দেন। কৃষ্ণা চতুর্দশীতে নরকাসুর বধের স্মারক হিসাবে হিন্দুরা দীপাবলী দেন ফলে আর এক নাম নরক/ভূত চতুর্দশী।

দেব—দেব শব্দের অর্থ আলো ও লীলা। মুণ্ডকোপনিষদে (২।১।৭) বলেছে ঈশ্বর থেকে দেবতা মানুষ, পশু-পাখী সব জন্মায়। 'তস্মাৎ চ দেবাঃ বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবঃ বয়াংসি। দেব অর্থে সাধারণত কশ্যপ অদিতি পুত্র। আদিত্য বার, রুদ্র

এগার, বসু আট এবং অশ্বিনী কুমার দুই ; মোট তেত্রিশ। দ্রঃ দেবতা।

দেবক—যযাতি বংশে এক রাজা ; উগ্রসেনের ভাই। মেয়ে দেবকী ; কৃষ্ণের মা। (২) বিদুরের শ্বশুর।

দেবকী—নহুষ(১)-কার্তবীর্যার্জুন(১২)- দেবক(৩৫)- দেবাপ(৩৬)- দেবকী(৩৭)। বিদর্ভ রাজ আহুকের দুই ছেলে দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের অন্য মতে দেবাপের সাতটি মেয়ে শ্রুতদেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা, দেবকী। এদের মধ্যে দেবকী সবচেয়ে পরিচিতা ; কৃষ্ণের মা। অগ্নি পুরাণে দেবকী কংসের ভ্রাতুষ্পুত্রী। কশ্যপের স্ত্রী অদিতি পরজন্মে দেবকী হয়ে জন্মান। এই সাত বোনেরই বসুদেবের সঙ্গে বিয়ে হয়। দেবকীর বিয়েতে বার ভার সোনা ও একটি রথ উপহার দেওয়া হয়েছিল। কংস (দ্রঃ) নিজে এই রথে করে দেবকী ও বসুদেবকে বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন। দেবকীর প্রথম ছয়টি ছেলে কংসের (দ্রঃ) হাতে নিহত হয়। সপ্তম সন্তান বলরাম গর্ভ থেকে সঙ্কর্ষিত হয়ে রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত হয়। দেবকীর প্রথম সন্তান হবার পর নারদও এক বার কংসকে বলে গিয়েছিলেন দেবকীর অষ্টম ছেলের হাতে কংসের মৃত্যু হবে। অষ্টম পুত্র কৃষ্ণ (দ্রঃ)। দেবকীর স্বয়ংবরে বহু ক্ষত্রিয় রাজা যোগ দিয়েছিলেন। কংস নিহত হলে দেবকী ও বসুদেব মুক্তি পান। কৃষ্ণের মৃত্যু সময়েও দেবকী ও বসুদেব জীবিত ছিলেন। অর্জুনের হাতে যাদব নারীদের তুলে দিয়ে বসুদেব যোগস্থ হয়ে দেহত্যাগ করেন ; দেবকী, রোহিণী ইত্যাদি অন্যান্য স্ত্রীরাও স্বামীর চিতায় সহমৃতা হন। দ্রঃ ইন্দ্র, কশ্যপ, ঊর্ণা।

দেবকুল্যা—মরীচির নাতনি , স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে। বিষ্ণুর পা ধুয়ে দিয়েছিলেন বলে পরজন্মে গঙ্গা হয়ে জন্মান।

দেবমিত্র শাকল্য—মাণ্ডুকেয় মুনির ছেলে। বেদজ্ঞ পণ্ডিত। মুদ্গল, গোকল, মৎস্য, খালিল্য, ও শৈশিরেয় এঁর শিষ্য।

দেবতা—দ্যুতি বিশিষ্ট সত্ত্বা। দ্রঃ দেব। দেবতার কল্পনা চার প্রকার ঃ-(১) যাজ্ঞিক সম্প্রদায়ের কাছে দেবতা মন্ত্র স্বরূপ। যজ্ঞাদিতে যাকে হবিঃ দেওয়া হয় তিনিই দেবতা। (২) একত্ববাদী মতে অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম সাধকের কাছে যে বিভিন্ন মূর্তিতে আবির্ভূত/পূজিত হন। সব দেবতাই মূলত পরমব্রহ্মের প্রতীক। (৩) অচেতন বস্তুর অধিষ্ঠাতা হিসাবেও দেবতা কল্পিত হয়েছেন : যেমন পৃথিবীর অধিপতি অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু, দ্যুলোকে সূর্য। আবার ঋকে আছে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকে প্রতিটি স্থানে ১১টি করে মোট ৩৩-টি দেবতা। এই ভাবে বিভিন্ন জড় বস্তুর অধিপতি হিসাবে ৩৩ কোটি বা সংখ্যাতীত দেবতা কল্পিত হয়েছে। দ্রঃ ঋক্-বেদ। জড় বস্তুর মাধ্যমেও যে মহাশক্তির লীলা সেই শক্তি/লীলাকে এই দেবতা বলে কল্পনা করা হয়েছে। (৪) দেবতাগণ এক শ্রেণীর উন্নত ধরণের দেহী ; জন্ম-মৃত্যু আছে তবে দীর্ঘায়ু বলে সাধারণত অমর বলা হয়। আদি দেবতারা হচ্ছেন মরীচি পুত্র কশ্যপের জ্যেষ্ঠা পত্নী অদিতির সন্তান। দেবতারা স্বর্গে থাকেন। এঁদের রাজা ইন্দ্র ; এঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব বিশেষ বাহন আছে এবং বিশেষ বিশেষ অস্ত্রশস্ত্রও আছে। এঁদের খাদ্য হবির্ভাগ ও প্রধান পানীয় সোমরস। দেবতারা স্বেচ্ছায় রূপ পরিবর্তন করতে পারেন ইত্যাদি ; অর্থাৎ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি রয়েছে। দেবতারা

মানুষের কল্যাণ করেন ; মানুষেও তাঁদের জন্য যজ্ঞ ও পূজা করে। অগ্নি দেবতাদের মুখ। উত্তরায়ণের ৬ মাস দেবতাদের দিন ; দক্ষিণায়নের ৬ মাস রাত্রি। দ্রঃ ইন্দ্র। দৈত্যদের এঁরা দমন করেন। দেবতাদেরও পাপপুণ্য আছে ; উপাস্য ও উপাসক ভাব আছে এবং পারিবারিকতা আছে। তাঁরাও তপস্যা করেন এবং ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে মুক্তি পান। দেবতাদের ঘাম হয় না, চোখে পাতা পড়ে না ; মাটিতে পা স্পর্শ করে না এবং গলার পুষ্পমাল্য কোন দিন ম্লান হয় না।

দেবদত্ত—বুদ্ধের খুল্লতাত পুত্র। ঐতিহাসিক মতে খৃ-পূ ৬ শতকে জন্ম। নিজের ভাই আনন্দের মত স্বেচ্ছায় যৌবনে সংসার ত্যাগ করে বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। বিম্বিসারের ছেলে অজাতশত্রুকে প্রভাবিত করেছিলেন। সংস্কারবাদী বুদ্ধের সঙ্গে রক্ষণশীল দেবদত্তের মত বিরোধ ঘটে। বুদ্ধের পর দেবদত্ত সঙ্ঘের নেতা হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধের আদেশে মহাপরিনির্বাণের পর বিনয় ও ধর্ম অনুসারে সংঘ কার্য পরিচালিত হতে থাকে। বাসস্থান, ভোজন ও পরিধেয় সম্বন্ধে ৫-টি কঠোর নিয়ম দেবদত্ত বাধ্যতামূলক করতে চান ; এবং এই সব বিষয়ে চলতি বিকল্প নিয়মগুলিকে বাতিল করতে চান। এ বিষয়ে সঙ্ঘ তাঁকে তিন বার নিরস্ত হতে বলেন। কিন্তু দেবদত্ত নিজের দাবি ত্যাগ না করায় সংঘাবশেষ অপরাধে অপরাধী হন এবং সংঘ-ভেদ করেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে দেবদত্ত সম্বন্ধে প্রচলিত নানা কাহিনী এবং বুদ্ধদেবকে হত্যা করার চেষ্টাও উল্লিখিত আছে। (২) অর্জুনের শঙ্খ। বরুণের কাছ থেকে ময় এই শঙ্খলাভ করেছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী তৈরি করে দিয়ে এই শঙ্খ অর্জুনকে ময় উপহার দেন। (৩) উতথ্য মুনির পিতা।

দেবদাসী—বড় বড় মন্দিরে দেবতার সামনে নৃত্যগীত পরিবেশনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত কন্যা। নাচ গানে এদের অতি উত্তম শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। এঁরা যেন স্বর্গে ইন্দ্র সভার অপ্সরী। সমাজে এঁদের মর্যাদাও অপরিসীম ছিল। কবে এ প্রথা চালু হয়েছিল অস্পষ্ট। দেবদাসী সৃষ্টির মাধ্যমে নৃত্য ও সঙ্গীত শিল্পের একটা মহতী আদর্শ রূপ নিয়েছিল সত্য কিন্তু বাস্তবের মানবীয় দুর্বলতা সমস্ত নান্দিক মূল্য ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল।

দেববতী—মণিময় গন্ধর্বের মেয়ে ; রাক্ষস সুকেশের স্ত্রী ; ছেলে মাল্যবান, সুমালি, মালি। অন্য মতে গ্রামণীঃ নাম গন্ধর্বের মেয়ে ; রামা ৭।৫।১।

দেববর্ণিনী—ভরদ্বাজ মুনির মেয়ে ; বিশ্রবার স্ত্রী। ছেলে বৈশ্রবণ (=কুবের)। বা বৃহস্পতির মেয়ে। রামা ৭।৩।৩।

দেবব্রত—ভীষ্মের এক নাম।

দেবযানী—শুক্রাচার্যের প্রথম মেয়ে। স্ত্রী প্রিয়ব্রতের মেয়ে ঊর্জাস্বতীর সন্তান এই দেবযানী। দ্রঃ জয়ন্তী ; কচ। শুক্রাচার্য দৈত্য বৃষপর্বার পুরোহিত ; ফলে রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা ও দেবযানী সখী ছিলেন। এক দিন এঁরা দুজনে পরিচারিকাদের নিয়ে জলক্রীড়া করছিলেন। ইন্দ্র এই সময়ে এখানে আসেন এবং বায়ুরূপে এদের পরিধেয়গুলি উড়িয়ে মিলিয়ে দেন। এরা জল থেকে তাড়াতাড়ি উঠে অন্য মতে স্নান সেরে যথা সময়ে উঠে কাপড় পরেন এবং শর্মিষ্ঠা ভুলে দেবযানীর কাপড় পরেন এবং দেবযানীর কাছে রূঢ় ভাবে তিরস্কৃত হন। শর্মিষ্ঠাও তখন শুক্রাচার্যকে বৃষপর্বার

স্তাবক, অন্নদাস ইত্যাদি বলে গালি দেন। এর পর দুজনে হাতাহাতি হয় এবং দেবযানীকে পাশে একটি কূপে ঠেলে ফেলে দিয়ে প্রাসাদে ফিরে যান। এই সময়ে যযাতি বনে মৃগয়াতে এসেছিলেন তৃষ্ণার্ত হয়ে এখানে এলে অন্য মতে দেবযানীর আর্তস্বরে এখানে এসে দেবযানীকে কূপ থেকে উদ্ধার করে দিয়ে যান। মেয়ে ফিরছে না দেখে শুক্রাচার্য ও উর্জাস্বতী ব্যস্ত হয়ে পরিচারিকা ঘূর্ণিকাকে (দ্রঃ) পাঠান; এবং ঘূর্ণিকার (মহা ১৷৭৩৷২৪) কাছে খবর পেয়ে শুক্রাচার্য এসে উপস্থিত হন। দেবযানী প্রতিকারের দাবি করেন এবং শুক্রাচার্য বৃষপর্বাকে সব কথা জানিয়ে অন্যত্র চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। রাজা এসে অনুনয় বিনয় করে এঁদের তখন শান্ত করেন এবং ঠিক হয় হাজার দাসী সমেত শর্মিষ্ঠা দেবযানীর সেবা করবেন এবং দেবযানীর বিয়ে হলে দাসীরূপে এঁদের অনুগমন করবেন।

এর কিছু পরে যযাতি আবার এক দিন বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন বা মৃগয়াতে এসেছিলেন; দেবযানীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এবং দেবযানী চিনতে পারেন এবং রাজার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেন। শুক্রাচার্যের বিনা অনুমতিতে যযাতি এই অসবর্ণ বিয়েতে রাজি না হলে দেবযানী পিতাকে সম্মত করান। কচের (দ্র) অভিশাপ স্মরণ করে শুক্র রাজি হন। যযাতি প্রচুর যৌতুক পান এবং শর্মিষ্ঠাও এক হাজার পরিচারিকাকে দাসী হিসাবে পান। শুক্রাচার্য রাজাকে শর্মিষ্ঠার সম্পূর্ণ পরিচয় জানিয়ে দিয়ে তাকে উপযুক্ত সম্মান দিতে বলেন এবং কোন দিন যেন শর্মিষ্ঠাকে বিয়ে করতে চেষ্টা না করেন সাবধান করে দেন। সকলে প্রাসাদে ফিরে আসেন।

কাল ক্রমে দেবযানীর ছেলে হয় যদু। শর্মিষ্ঠার মনে মাতৃস্নেহ দেখা দেয়। এর পর শর্মিষ্ঠা যযাতিকে অশোকবনিকাতে এক দিন একা পেয়ে বিয়ে করতে চান/ সন্তান প্রার্থনা করেন। যযাতি সম্মত হন না; কিন্তু শর্মিষ্ঠা বোঝাতে থাকেন তাঁর সখীর স্বামী অর্থে তাঁরও স্বামী ইত্যাদি। রাজা শর্মিষ্ঠার কাছে যুক্তিতে হেরে যান। শর্মিষ্ঠার যথাসময়ে ছেলে হয় দ্রুহ্যু; এই সন্তান হতে দেবযানীর সন্দেহ হয়। কিন্তু শর্মিষ্ঠা মিথ্যা কথা বলেন; এক ব্রাহ্মণের/মুনির ঔরসে সন্তান হয়েছে বলে সখীকে নিরস্ত করেন। দেবযানীর দ্বিতীয় ছেলে হয় তুর্বসু; শর্মিষ্ঠার আরো দুটি ছেলে হয় অনু ও পুরু। এর পর যযাতি ও দেবযানী এক দিন উদ্যানে যখন বেড়াচ্ছিলেন তখন শর্মিষ্ঠার ছেলে তিন জন এগিয়ে আসে। কৌতূহলে বা সন্দেহে বালকদের কাছে কে তাদের পিতা ইত্যাদি দেবযানী জিজ্ঞাসা করে সব জানতে পেরে রাগে স্বামীকে ত্যাগ করে পিতার কাছে ফিরে যান। দ্রঃ যযাতি।

দেবযোনি—দেবতা থেকে জন্ম। দেবতা ও মানুষের মধ্যবর্তী। অপ্সরা, বিদ্যাধর, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, গুহ্যক সিদ্ধ ও ভূত এই দশটি ভাগ।

দেবরক্ষিতা—দেবকীর বোন। কৃষ্ণের মাসি।

দেবরাত—(১) অভিমন্যুর ছেলে পরিক্ষিতের অন্য নাম। (২) ইক্ষ্বাকু বংশে নিমির বড় ছেলে। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করার সময় মহাদেব একটি ধনুক দিয়ে দেবতাদের শিরশ্ছেদ করতে যান। দেবতারা তখন মহাদেবকে শান্ত করলে এই ধনুক তিনি দেবতাদের কাছে গচ্ছিত রাখেন। দেবতারা ধনুকটিকে দেবরাতের কাছে গচ্ছিত

রাখেন। এই ধনুক ভেঙে সীতার বিয়ে হয়।

দেবর্ষি—ঋষি। এঁদের স্থান স্বর্গে; নারদ ইত্যাদি।

দেবল—সরস্বতী তীরে আদিত্য তীর্থবাসী গৃহস্থ তপস্বী। ধৌম্যের বড় ভাই। বিখ্যাত বেদজ্ঞ মুনি। জৈগীষব্য (দ্রঃ) মুনি এক বার এঁর আশ্রমে এসে যোগ নিরত হয়ে বাস করতে থাকেন; কোন কথা বলতেন না। কিছু দিন পরে এখান থেকে চলে যান কেবল খাবার সময় আসতেন। আশ্রমে জৈগীষব্য থাকা কালীন এক দিন দেবল আকাশ পথে সমুদ্রে এসে দেখেন জৈগীষব্য তাঁর আগেই সমুদ্রে এসেছেন, বাড়ি ফিরে এসে দেখেন বাড়িতেও জৈগীষব্য বসে রয়েছেন। জৈগীষব্যকে পরীক্ষা করার জন্য দেবল ব্যোমমার্গে উঠে গিয়ে দেখলেন অন্তরীক্ষচারী সিদ্ধগণ জৈগীষব্যের পূজা করছেন। তিনি আরো দেখলেন জৈগীষব্য স্বর্গলোক, পিতৃলোক, যমলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি উর্দ্ধলোকে ভ্রমণ করে অন্তর্হিত হলেন। সিদ্ধেরা দেবলকে জানালেন জৈগীষব্য ব্রহ্মলোকে গিয়েছেন; দেবলের অবশ্য সেখানে যাবার মত পুণ্যবল নাই। দেবল তার পর আশ্রমে ফিরে এসে দেখেন জৈগীষব্য আশ্রমেই রয়েছেন। দেবল তার পর এঁর কাছে মোক্ষ ধর্ম গ্রহণ করে সিদ্ধি লাভ করেন। জন্মেজয়ের সর্প যজ্ঞেও উপস্থিত ছিলেন। এঁর মেয়ে সুবর্চলা; সুবর্চলার স্বয়ংবর হয়; মুনিপুত্রেরা সকলে আসেন এবং শ্বেতকেতুর গলায় ইনি মালা দেন। (২) প্রত্যূষের (=এক জন বসু) ছেলে। (৩) এক জন মুনি; মহর্ষি অসিতের ছেলে। ব্যাসের শিষ্য; ধৌম্যের বড় ভাই। শিবের বরে অসিত মুনির এক ছেলে হয়; নাম হয় দেবল। রম্ভা এই দেবলের প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন কিন্তু দেবল প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে রম্ভার শাপে ইনি কৃষ্ণবর্ণ ও অষ্ট অঙ্গ বেঁকে গিয়ে অষ্টাবক্র (দ্রঃ) নামে পরিচিত। বহু দিন ইনি রাধাকৃষ্ণের তপস্যা করেন; রাধাকৃষ্ণ তার পর দেখা দেন এবং কৃষ্ণ এঁকে আলিঙ্গন করেন। দেবলের দেহ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং বিমানে চড়ে রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে স্বর্গে চলে যান। ব্যাস মহাভারত রচনা করেন; দেবল এই কাহিনী পিতৃ-দেবদের মধ্যে প্রচার করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকেও উপস্থিত ছিলেন। অপর নাম অসিত বা অসিত দেবল। স্ত্রী হিমালয়ের কন্যা একপর্ণা। দ্রঃ গজ-কুম্ভীর। অসিত, দেবল ও অসিতদেবল এই তিনটি নাম নিয়ে কিছুটা মত বিরোধ রয়েছে। দ্রৌপদী কৃষ্ণকে বলছেন স্রষ্টারং সর্বভূতানাম্ অসিতো দেবলো অব্রবীৎ (মহা ৩।১৩।৪৩।) অর্থাৎ অসিত দেবল একই ব্যক্তি।

দেবশ্রুত—ব্যাসের ছেলে শুক। শুকের স্ত্রী পিতৃদেবের কন্যা পীবরী। চার ছেলে হয় কৃষ্ণ, গৌরপ্রভ, ভূরি ও দেবশ্রুত।

দেবসেনা—সাবিত্রী গর্ভজাত ব্রহ্মার মেয়ে। অন্য নাম ষষ্ঠী, আশা বা সুখপ্রদা। ইনি মাতৃকা শ্রেষ্ঠা ও শিশুপালিকা। অন্য মতে দক্ষের মেয়ে। তবে এঁরা দুই বোন দৈত্যসেনা (দ্রঃ) ও দেবসেনা। অত্যন্ত সুন্দরী ও চরিত্রশীলা। দুজনে মানস সরোবরে জলক্রীড়াতে আসতেন। কেশী এক দিন এঁদের দেখতে পেয়ে বিয়ে করতে চান। দৈত্যসেনা রাজি হন; দেবসেনা প্রত্যাখ্যান করেন। কেশী দেবসেনাকেও চুরি করতে যান। এ দিকে দেবতারা অসুরদের হাতে বার বার পরাজিত হলে ইন্দ্র এক জন উপযুক্ত সেনাপতি খুঁজতে খুঁজতে মানস সরোবরে একটি মেয়ের আর্তনাদ

শুনে এগিয়ে আসেন। দেবসেনা ইন্দ্রের সাহায্য চান ; ফলে যুদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত কেশী দৈত্যসেনাকে নিয়ে সরে পড়েন। ব্রহ্মার বর ছিল দেবসেনার স্বামী হবে দেবতা ও সমস্ত অসুরের পূজ্য ; এই জন্য কেশী একে নিয়ে যেতে গিয়েও বিফল হন। দেবসেনা ইন্দ্রকে ব্রহ্মার বরের কথা জানান এবং অনুরূপ স্বামী চান। ইন্দ্র প্রথমে উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পান না ; পরে দেবতাদের পরামর্শে কার্তিকেয়র সঙ্গে বিয়ে দেন। দেবাসুরের যুদ্ধে এই দেবসেনা কার্তিকেয়কে সাহায্য করেছিলেন।

দেবাতিথি—পুরু বংশে এক রাজা ; অক্রোধ ও করণ্ডুর ছেলে। দেবাতিথির স্ত্রী বিদেহ রাজকন্যা মর্যাদা। (মহা ১।৯০।৫২)

দেবাদর্শ—কবন্ধের শিষ্য। দেবাদর্শের শিষ্য মেধা, ব্রহ্মবলি, সৌতায়ন, পিপ্পলাদ ইত্যাদি।

দেবান্তক—রাক্ষস রুদ্রকেতুর ছেলে। এর অত্যাচারে ত্রিভুবন জর্জরিত হয়ে উঠলে গণপতি একে নিহত করেন।

দেবাপি—চন্দ্র বংশে প্রতীপের তিন ছেলে দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লিক। (মহা ১।৯০। ৫২) ; দেবাপি বড় ; পিতা এবং প্রজাদের অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু চর্মরোগ থাকার জন্য প্রজারা আপত্তি করাতে প্রতীপ শান্তনুকে রাজত্ব দেন। দেবাপি বনে গিয়ে তপস্যা করে জীবন কাটান। কুরুক্ষেত্রে পৃথূদক তীর্থে তপস্যা করে মোক্ষ লাভ করেন।

দেবাহূতি—স্বায়ম্ভুব মনুর মেয়ে ; প্রজাপতি কর্দমের স্ত্রী। পরিচর্যায় তুষ্ট হয়ে কর্দম এঁকে দিব্যজ্ঞান দান করেন। দেবাহূতির মেয়ে অরুন্ধতী ছেলে কপিল। কপিল মাকে সাংখ্য শাস্ত্রে উপদেশ দিয়ে বনে চলে যান। সরস্বতী নদীর তীরে পুত্রের উপদেশ অনুসারে দেবাহূতি যজ্ঞ করেন।

দেবিকা—অপর নাম বেদিকা। শৈব্য রাজ গোবাসনের মেয়ে ; যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী ; ছেলে যৌধেয়। (মহা ১।৯০।৮৩)

দেবী—শক্তি। অনাদি। বিষ্ণু যখন বটের পাতায় শিশু রূপ ধরে ভাসছিলেন তখন ভাবছিলেন তিনি কে, কে তাঁকে সৃষ্টি করল, তিনি কি কাজ করবেন ইত্যাদি। এমন সময় এক দৈববাণী হয় এবং দেবী/মহাদেবী দেখা দেন। দেবীর চার হাত ; হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ; দিব্য আবরণ ও আভরণে ভূষিত এবং পরিচারিকা/মাতৃকা গণ দ্বারা পরিবেষ্টিত ; এই পরিচারিকারা : রতি, ভূতি, বুদ্ধি, মতি, কীর্তি, ধৃতি, স্মৃতি শ্রদ্ধা, মেধা, স্বাহা, স্বধা, ক্ষুধা, নিদ্রা, দয়া, গতি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা, জৃম্ভা ও তন্দ্রা। মহাদেবী বিষ্ণুকে জানান তিনি নির্গুণ পরাশক্তি নন। বিষ্ণুও পরা শক্তি নন ; বিষ্ণু সত্ত্বগুণের আধার এবং বিষ্ণুর নাভি পদ্মে ব্রহ্মা জন্মাবেন ; ব্রহ্মাতে রজো-গুণের প্রাধান্য থাকবে এবং ব্রহ্মার কপাল থেকে তমোগুণের আধার রুদ্র জন্মাবেন। ব্রহ্মা তপস্যা করে সমস্ত সৃষ্টি করবেন, বিষ্ণু সকলকে রক্ষা করবেন এবং কল্পান্তে রুদ্র সব কিছু ধ্বংস করবেন।

ব্যাস এক বার জন্মেজয়ের প্রশ্নে দেবীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন তিনি নির্গুণ, অনাদি এবং প্রয়োজন মত নানা রূপ ধারণ করেন।

মূল প্রকৃতি যখন বিষ্ণুর রূপ ধারণ করল তখন বিষ্ণুর মধ্যে দুর্গা (দ্র), লক্ষ্মী (দ্র), সরস্বতী (দ্র), সাবিত্রী (দ্র), ও রাধা (দ্র) পঞ্চ দেবী রূপ নিল। এই পাঁচটি দেবী

পরা দেবীর পূর্ণ অবতার। পরা দেবীর অংশাবতার রয়েছেন ছ জন: গঙ্গা, তুলসী, মনসা, দেবসেনা, মঙ্গল চণ্ডিকা ও ভূমিদেবী। এই দেবসেনা হচ্ছেন ষষ্টিদেবী; সন্তান দেন এবং সন্তানদের রক্ষা করেন। মঙ্গলচণ্ডিকা মূল প্রকৃতির মুখ থেকে জন্ম; মানুষের সমস্ত কামনা বাসনা পূর্ণ করেন। ভূমি দেবী অর্থে মোটামুটি পৃথিবী; মানুষকে সম্পদ দান করেন। এঁদের চেয়ে আর এক ধাপ নিম্ন পর্যায়ের দেবী রয়েছেন এঁরা মহাদেবীর অংশ অর্থাৎ পরা দেবীর অংশের অংশ; এঁরা :-কীর্তি, ক্রিয়া, ক্ষুধা, জরা, তুষ্টি, তৃষ্ণা, দক্ষিণা, দয়া, দাহিকা, দিবা, দীক্ষা, ধৃতি, নিদ্রা, পুষ্টি, প্রতিষ্ঠা প্রভা, প্রীতি, বুদ্ধি, ভক্তি, মিথ্যা, মূর্তি, মৃত্যু, মেধা, রাত্রি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, শ্রী, সতী, সন্ধ্যা, সম্পত্তি, সিদ্ধা, সুধা, স্বস্তি ও স্বাহা। এই গুলিকে অংশাংশ দেবী বলে কল্পনা করা হয়েছে; এঁদের জন্মদাতা ও স্বামীও কল্পনা করা হয়েছে। এই সব অংশাংশ দেবীগুলি মানুষের জীবনে বিশেষ বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন। এঁদের না হলে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। দিতি অদিতি ইত্যাদিকেও অংশাংশ দেবী বলা হয়েছে।

এই সমস্ত দেবীরই বিশেষ বিশেষ মূর্তি রয়েছে; বিশেষ বিশেষ অস্ত্র শস্ত্র ও বিশেষ কাজ কল্পনা করা হয়েছে। পূজার মূল মন্ত্র ও দেবী অনুসারে আলাদা। (২) দেবী অর্থে সাধারণত মহাদেবের স্ত্রী বুঝায়। শিবের শক্তি রূপে দেবীর চরিত্র দু রকম নম্র ও উগ্র। নম্র মূর্তিতে দেবীর নাম উমা, গৌরী, পার্বতী, হৈমবতী ইত্যাদি। উগ্র মূর্তি হচ্ছেন কালী, চণ্ডী, ভৈরবী, মাতঙ্গী ইত্যাদি। দ্রঃ পীঠস্থান।

দেবীতীর্থ—কুরুক্ষেত্রে তিনটি স্থান: শঙ্খিনী, মধুবর্তী ও মৃগধূমা।

দেবীভাগবত—একটি উপপুরাণ। দ্বাদশ স্কন্ধে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে বিচিত্র উপাখ্যানে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। একটি মতে বইটি ব্যাসকৃত মহাপুরাণ। একটি মতে রচনাকাল খৃ ১১ শতক।

দেরাদুন—প্রাচীন নাম কেদার খণ্ড বা শিবভূমি। কিংবদন্তি এইখানে দ্রোণাচার্যের বাস ছিল।

দৈত্য—দ্রঃ দিতি। দেবতাদের চির শত্রু; যজ্ঞ ইত্যাদি নষ্ট করে দিতেন। দ্রঃ অসুর। সুর বিদ্বেষী বলে নাম অসুর। দিতির দুই ছেলে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ; এঁরা দু জন আদি দৈত্য। আদি দানব ৬১; এদের মধ্যে ১৮ জন প্রধান; দৈত্যরাজ অর্থে হিরণ্যকশিপু। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য। দৈত্য বংশে বলি প্রহ্লাদ ইত্যাদি দাতা ও ভক্ত জন্মেছিলেন। দৈত্যরা দেবতাদের থেকে কোন বিষয়ে বিশেষ কম ছিলেন না। শৌর্যবীর্যে বরং বেশিই ছিলেন। দেবতাদের সঙ্গে এঁদের বৈবাহিক সম্বন্ধও দেখা যায়। স্থাপত্য বিদ্যায় এঁরা অসাধারণ ছিলেন। এঁদের সাহায্যে সমুদ্র মন্থন করা হয় কিন্তু বিষ্ণুর শঠতায় এঁরা সুধার ভাগ পান নি। দ্রঃ দনু। ময় দানবের লেখা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ময়মত।

দৈত্যদ্বীপ—গরুড়ের এক ছেলে। দ্রঃ ত্রিবার।

দৈত্যসেনা—দেবসেনার (দ্রঃ) বোন। দুই বোন এক বার প্রমদার্থে মানস সরোবরে গেলে সেখানে দৈতসেনা কেশী দানবকে দেখে তাঁর প্রতি অনুরাগী হন। কেশী একে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন।

দৈর্ঘ্য পরিমাণ—শতপথ, কঠোপনিষদ, আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র, সাংখ্যায়নশ্রৌতসূত্র, ঐতরেয় ইত্যাদিতে দেখা যায় অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ, পাদ, প্রাদেশ (=বিঘত) বাহু, শল ইত্যাদি মাপের একক হিসাবে ব্যবহার হত। বৃদ্ধ মনুতে একটি সূক্ষ্ম হিসাবের প্রথম প্রচলন হয়: ৮ ত্রসরেণুতে=১ রেণু; ৮ রেণুতে=১ কেশাগ্র, ৮ কেশাগ্রে=১ লিক্ষা (পোস্তদানা), ৮ লিক্ষাতে=১ যুক, ৮ যুকে=১ যব, ৮ যবে=১ অঙ্গুলি। এর পর মনু যোগ করেন ১২ অঙ্গুলিতে=১ বিতস্তি, ২ বিতস্তিতে=১ হাত। আরো হিসাব পাওয়া যায় ৪ হাতে=১ দণ্ড/যষ্টি, ১০ হাতে=১ বংশ, ২ দণ্ডে=১ নড়িকা, ২০০০ দণ্ডে=১ ক্রোশ, ২ ক্রোশে=১ গব্যূতি, ৪ ক্রোশে=১ যোজন।

দোল—ভারতে একটি বিখ্যাত উৎসব। ফাল্গুন মাসে শুক্লাচতুর্দশী তিথিতে। দক্ষিণ ভারতে চৈত্র মাসে উৎসব হয়। কবে থেকে কি ভাবে প্রচলন হয় স্পষ্ট নয়। প্রধান ধর্মীয় অংশ রাধাকৃষ্ণকে দোলায় বসিয়ে যথারীতি পূজা করে আবীর কুঙ্কুমে রঞ্জিত করা। দ্রঃ আমোদ প্রমোদ।

দ্বাপর—তৃতীয় যুগ। ৮,৬৪,০০০ বছর। দ্রঃ কাল। দ্বাপরে অর্দ্ধেক পাপ ও অর্দ্ধেক পুণ্য। মানুষ মাথায় সাত হাত। পরমায়ু হাজার বছর; অন্নপাত্র তামার। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে আরম্ভ। এই যুগে অবতার কৃষ্ণ ও বলরাম। এই যুগে নাম করা রাজা শাল্ব, বিরাট, কংস, হংসধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, বভ্রুবাহন, রুক্মাঙ্গদ, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, পরিক্ষিৎ, জন্মেজয়, বিষ্বকসেন, শিশুপাল, জরাসন্ধ, উগ্রসেন ইত্যাদি।

দ্বারকা—বর্তমানে গুজরাটের পশ্চিম সীমায়। ২২°১৪´ উ×৬৯°১´ পূ। ওখা বন্দর থেকে ২৮ কি-মি। আজও এখানে কিছু লোক কৃষ্ণের বংশে জন্ম বলে দাবি করেন এবং গোপালন করেন। প্রাচীন কালে নাম দ্বারাবতী। বৈদিক যুগে তীর্থ রূপে পাওয়া যায় না। পাণ্ডবদের তীর্থ যাত্রার সূচীতেও দ্বারকা ছিল না। সম্ভবত খৃ-পূ ২ শতকে তীর্থ রূপে পরিগণিত হয়। বৈষ্ণব তীর্থ রূপে প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ শৈব তীর্থও; এখানে জ্যোতির্লিঙ্গ নাগেশ শিব। দ্বারকার প্রাচীন আর এক নাম কুশস্থলী; মহাভারত ও কয়েকটি পুরাণ অনুসারে আনর্ত দেশের রাজধানী কুশস্থলীতেই দ্বারকা স্থাপিত হয়। পুণ্যজন রাক্ষস কুশস্থলী অধিকার করলে শর্যাতির বংসধররা ঐ নগর পরিত্যাগ করেন। কংস বধের পর কৃষ্ণের আদেশে বিশ্বকর্মা কুশস্থলীতে এই নগরী নির্মাণ করেন। কালযবন ও জরাসন্ধের বার বার আক্রমণে জর্জরিত যাদবদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এখানে চলে আসেন। এই সময়ে নাম হয় দ্বারকা। গর্গ সংহিতা অনুসারে :- আনর্তের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে সমুদ্রের ওপর শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বারকা নির্মাণ করেন। এখানে রাজর্ষি রেবত বাস করতেন। অবশ্য প্রাচীন দ্বারকা কোথায় ছিল এ নিয়ে বেশ কিছু মত ভেদ রয়ে গেছে। একটি মতে জুনাগড় বা গিরিনগরে আর একটি মতে বেট দ্বারকাই প্রধান দ্বারকা। দ্বারকা থেকে ৩২ কি-মি দূরে এই বেটদ্বারকা দ্বীপ তীর্থ হিসাবে স্বীকৃত। বেট দ্বীপে শঙ্খচূড় দৈত্যকে কৃষ্ণ নিহত করে দৈত্যের স্ত্রীকে তুলসী গাছে পরিণত করে দেন। পাশেই রৈবতক পাহাড় দুর্গের মত নগরীকে রক্ষা করত। নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজ ও মিশ্রক চারটি উদ্যান ছিল। রৈবতক ছিল পূব দিকে, উত্তরে বেণুমন্দ, পশ্চিমে সুকক্ষ এবং দক্ষিণে লতা-বেষ্ট চারটি পাহাড়। নগরীতে ৫০-টি প্রধান সিংহদ্বার ছিল। অর্জুন যখন তীর্থ

যাত্রায় বার হয়েছিলেন তখন এখানে এসে সুভদ্রা হরণ করেন। শাল্ব রাজ এক বার দ্বারকা আক্রমণ করে পরাজিত হয়ে ফিরে যান। এই খানে সাম্ব মুষল প্রসব করেন। কৃষ্ণ বলরামও এখানে দেহত্যাগ করেন। যদুবংস ধ্বংসের পর অর্জুন এখান থেকে যাদব নারীদের নিয়ে হস্তিনাপুরে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকা সমুদ্র কবলিত হয়।

দ্বিবত—গৌতমের এক ছেলে। ত্রিতের (দ্রঃ) শাপে বৃকে পরিণত হয় এবং বানর, বিছা ইত্যাদির জন্ম দিতে থাকে।

দ্বৈতবন—পঞ্চনদের অন্তর্গত সরস্বতী নদীর তীরে বিখ্যাত পবিত্র বন। এখানে দেবতা, গন্ধর্ব, ঋষি ও তপস্বীরা বাস করেন। বনবাসের সময় পাণ্ডবরা এখানে বহু দিন ছিলেন। এই বনে বাস করলে শোক ও মোহ থাকে না; ফলে নাম দ্বৈতবন।

দ্বৈতবাদ—জীব ও ঈশ্বর অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুটি পৃথক সত্তা বলে স্বীকার করা। পরমাত্মা সর্বজ্ঞ এবং এক। জীবাত্মা অল্পজ্ঞ ও বহু। সাংখ্য মতে ঈশ্বর নাই অর্থাৎ পরমাত্মা নাই। কিন্তু জীব অর্থাৎ পুরুষ রয়েছেন; এবং জড় জগতের মূল অর্থাৎ প্রকৃতি রয়েছে। এই পুরুষ ও প্রকৃতি মিলে দ্বৈতবাদ। আর এক মতে বিষ্ণু সত্য এবং জগৎ সত্য—এ দুটি পৃথক সত্তা; অর্থাৎ দ্বৈতবাদ। আর এক মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য অর্থাৎ দ্বৈতবাদ। বিশ্বপ্রপঞ্চ ও মিথ্যা নহে। প্রপঞ্চ শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট পঞ্চভেদ—অর্থাৎ জীবের সঙ্গে পরমেশ্বরের, জড়ের সঙ্গে পরমেশ্বরের, জড়ের সঙ্গে জীবের, জীবের সঙ্গে জড়ের এবং জড়ের সঙ্গে জড়ের ভেদ সত্য এবং নিত্য সত্য।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—এঁদের মতে দ্বৈতবাদে ভেদ যেমন সত্য তেমনি ভেদ নাই এ যুক্তিও সত্য। এই ভেদ ও অভেদ মিলে দ্বৈত-অদ্বৈতবাদ। আর এক মতে ভেদ ও অভেদ দুটিই সত্য দুটিই স্বাভাবিক। এই মতে ব্রহ্ম সগুণ। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে আপোষ মতবাদ হচ্ছে এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।

দ্বৈপায়ন—(১) বেদব্যাসের অপর নাম। (২) কুরুক্ষেত্রের নিকটে একটি হ্রদ। দ্রঃ দুর্যোধন।

দ্যু—অষ্টবসুর (দ্রঃ) একজন; অপর নাম আপ। একটি মতে এর স্ত্রী বনে বেড়াতে বেড়াতে নন্দিনীকে বশিষ্ঠের আশ্রমের কাছে দেখতে পান। উশীনর রাজার মেয়ে জিনবতীকে গরুটি উপহার দেবার জন্য স্বামীকে এটি চুরি করতে বলেন। বসুরা নন্দিনী ও বাছুর দুটিই চুরি করেন। (মহা ১।৯৩।২১)

দ্যুতিমান—(১) মদ্রদেশের রাজা। মেয়ে বিজয়া; সহদেবের স্ত্রী। (২) শাল্ব দেশের রাজা; ঋচীককে রাজ্য দান করেন (মহা ১২।২২৬।৩৩)। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশে রাজা মদিরাশ্বের ছেলে (মহা ১৩।২।৯)। (৪) ভৃগু বংশে এক মুনি; মৃকণ্ডুর ভাই প্রাণের ছেলে।

দ্যুমৎসেন—শাল্ব দেশের রাজা; স্ত্রী শৈব্যা ছেলে সত্যবান। সত্যবান যখন শিশু ছিলেন তখন রাজা অন্ধ হয়ে যান এবং শত্রুরা এঁর রাজ্য কেড়ে নেন। রাজা সপরিবারে বনে বাস করতেন এবং তপস্যা করতেন। পরে পুত্রবধূ সাবিত্রী (দ্র) যমের কাছ থেকে দ্যুমৎসেনের রাজ্য, চোখের দৃষ্টি ফিরে পাওয়া ইত্যাদি বর পান। তার পর যথাকালে দ্যুমৎসেন ছেলেকে রাজ্য দিয়ে সস্ত্রীক বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন।

দ্যৌঃ—ঋকবেদীয় সূক্তে দ্যৌঃ (= দৌস্পিতা) একটি দেবতা। ইনি গ্রীসে জেউস

বা জেউস-পাতের ; পরবর্তী কালে যুপিটার। ঋকৃবেদের বর্তমান সংহিতায় উষস্, অগ্নি, পর্জন্য, সূর্য, আদিত্য, মরুৎ প্রভৃতির পিতৃরূপে বর্ণিত ; স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত নয়। নতুবা পৃথিবী, ভূমি ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ভাবে উল্লিখিত—যেমন দ্যাবাপৃথিব্যৌ। বৈদিক আর্যগণ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যৌঃ এই তিনটি লোকে বিশ্বভুবনকে ভাগ করে ছিলেন। এঁদের কল্পনায় দ্যৌঃ পিতা, পৃথিবী মাতা এই দুই দেবতার মিলনে এই বিশাল সৃষ্টির উদ্ভব। ঋক্ সূক্তে ঋষি অগস্ত্য বলেছেন দ্যু এবং পৃথিবীর মাধ্য কে আগে এবং কেনই বা এঁরা উৎপন্ন হয়েছিলেন কেউ জানে না ইত্যাদি। অথর্ব বেদেও আকাশ দেবতা।

দ্রবিড়—(১) মনুপুত্র প্রিয়ব্রত বংশে এক রাজা। (২) বা দ্রমিল ; কংসের প্রকৃত পিতা ; এক জন গন্ধর্ব। মেয়ে অংশুমতী।

দ্রাবিড়—মহাভারতে দ্রাবিড়, কেরল, প্রাচ্য, বনবাসিক, কর্ণাটক, মহিষক, মূষিক/মূষক ইত্যাদি নামের উল্লেখ আছে। এরা ক্ষত্রিয় ; দ্রমিল ; ব্রাহ্মণদের শাপে শূদ্রে পরিণত হয়েছেন। মহাভারতে আছে ব্রাহ্মণানাম্ অদর্শনাৎ এই বৃষলত্ব (মহা ১৩।৩৩।২১)। প্রাচীন সংস্কৃতে দ্রমিড়, দ্রবিড়, দ্রাবিড় ইত্যাদি। একটি মতে এরা আগে প-এসিয়াতে ছিল। পরে বেলুচিস্তান হয়ে ভারতে আসে এবং আর্যদের আক্রমণে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে সরে যায়। আর এক মতে এরা ভূমধ্যসাগরীয় জাতি। এদের একটি ভাগ-কে আদি ভূমধ্যসাগরীয় জাতি বলা হয় (বর্তমানে তামিল, মালয়ালম্ ইত্যাদি অঞ্চলে)। দ্বিতীয় পরবর্তী ভাগটি দীর্ঘ কায়, সুদর্শন। এরা সুসভ্য জাতি ভারতে আর্যপূর্ব সভ্যতা এদের তৈরি। পাঞ্জাব ইত্যাদি স্থানে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। বহু মতে সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা এই দ্রাবিড় জাতি। ওড়িশা, বিহার, এমন কি বেলুচি-স্থানেও এই দ্রাবিড় জাতি রয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে দাস, দস্যু, শূদ্র, অন্ধ্র, দ্রমিড় ইত্যাদিকেও বহু জায়গায় দ্রাবিড় বলা হয়েছে।

দ্রুপদ—পাঞ্চালের রাজা। প্রকৃত নাম যজ্ঞসেন। পিতা সোমক ; অন্য মতে পৃষত/পৃষ্ট। মরুৎগণের অংশে জন্ম। চন্দ্র বংশে হস্তি(১)-অজমীঢ় (২)-পাঞ্চাল(৯)- সোমক (১৬)-যজ্ঞসেন(১৭)। ভরদ্বাজ আশ্রমে শিক্ষা লাভ করেন। দ্রোণের বাল্যসখা ও সতীর্থ। ভরদ্বাজ ও সোমক/পৃষত বন্ধু ছিলেন। অন্য মতে কেবল সতীর্থ। পিতার মৃত্যুর পর দেশে ফিরে দ্রুপদ উত্তর পাঞ্চালের রাজা হন। সতীর্থ দ্রোণকে দ্রুপদ একবার গুরুগৃহে থাকার সময় বলেছিলেন রাজ্য পেলে বন্ধুকে অর্দ্ধেক রাজ্য/অর্থ দান করবেন। দ্রুপদ রাজা হলে এই বন্ধুত্বের দাবিতে দ্রোণ দেখা করতে এসেছিলেন ; নিজের ছেলে অশ্বত্থামাকে দুধ খেতে দিতে পারতেন না ; চরম কষ্টে পড়েছিলেন। কিন্তু দ্রুপদ রূঢ় উপদেশ দিয়ে বন্ধুকে বিমুখ করেন ; এক দিনের মত ভিক্ষা দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

অস্ত্রশিক্ষার পর গুরুদক্ষিণা হিসাবে দ্রুপদকে ধরে আনবার জন্য প্রথমে দুর্যোধন, কর্ণ ইত্যাদি কৌরব সৈন্য নিয়ে পাঞ্চাল আক্রমণ করেন। দ্রুপদ এদের পরাজিত করেন। এর পর অর্জুন আসেন এবং দ্রুপদ বন্দী হন। অর্জুনের সঙ্গে অবশ্য ভীম নকুল ও সহদেবও ছিলেন। দ্রোণের কাছে দ্রুপদ নীত হন এবং উ-পাঞ্চালে অহিছত্র দ্রোণকে দিয়ে দ্রুপদ মুক্তি পান। রাজাসি দক্ষিণ কূলে ভাগী-

রথ্যাহম্ উত্তরে (মহা ১।১২৮।১২) ; দ্রুপদ কাম্পিল্যে বাস করতে থাকেন ; দ-পাঞ্চালে যাবৎ চর্মণ্বতী নদী তাঁর রাজ্য হয়। মুখে বন্ধুতা স্থাপিত হয়। কিন্তু প্রতিশোধ নেবার চেষ্টায় একটি যজ্ঞ করবার চেষ্টা করেন। রাজার উদ্দেশ্য শুনে কেউ পুরোহিত হতে চান না। রাজা তার পর এক বছর ধরে উপযাজকে সেবা করেন। উপযাজ তখন রাজাকে যাজের কাছে পাঠান। এই দুই স্নাতক তপস্বী শেষ অবধি যজ্ঞ করেন। এবং যজ্ঞের আগুন থেকে দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বার হয়ে আসেন এবং দৈববাণী হয় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে নিহত করবেন। দ্রুপদের আর একটি মেয়ে অন্য মতে নপুংসক সন্তান ছিল শিখণ্ডী। দ্রৌপদী বড় হলে ইচ্ছা ছিল অর্জুনের সঙ্গে বিয়ে দেবেন ; এবং পাণ্ডবরা জীবিত নাই জেনেও দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে কঠিন লক্ষ্যভেদের ব্যবস্থা করেছিলেন ; মনে ইচ্ছা ছিল অর্জুন ছাড়া কেউ যেন সফল না হন। দ্রৌপদীর বিয়ের সময় ৫-ভাইয়ের সঙ্গে বিয়েতেও দ্রুপদ আপত্তি করেছিলেন কিন্তু ব্যাসের কাছে পাঞ্চালীর পূর্ব জন্ম কাহিনী শুনে সম্মত হন। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের সাত জন সেনাধ্যক্ষের মধ্যে এক জন ছিলেন। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং ১৫-শ দিনে সকালে নাতির সঙ্গে দ্রুপদ দ্রোণের হাতে নিহত হন। স্বর্গে দ্রুপদ বিশ্ব-দেবগণে পরিগণিত হন। গঙ্গাতীরে ব্যাসের আহ্বানে মৃত যোদ্ধাদের সঙ্গে দ্রুপদও এসেছিলেন।

দ্রুহ্যু—যযাতির ছেলে ; শর্মিষ্ঠার গর্ভে জন্ম। সকল দিক জয় করে যযাতি ছেলেদের রাজ্য ভাগ করে দিয়েছিলেন। দ্রুহ্যু পেয়েছিলেন প্রতীচী। ইনিও যযাতির জরা নেন নি এবং অভিশপ্ত হয়েছিলেন এঁর কোন অভিলাষ পূর্ণ হবে না ; রাজ্য নষ্ট হয়ে যাবে এবং দ্রুহ্যু ভোজ নামে পরিচিত হবেন। দ্রুহ্যুর বংশে কোন রাজা নাই। (২) মতিনার-এর এক ছেলে।

দ্রোণ—মহর্ষি ভরদ্বাজের ছেলে। বৃহস্পতির অংশে জন্ম। পাঞ্চাল রাজ পৃষত একটি মতে ভরদ্বাজের বন্ধু ছিলেন ফলে পৃষতের ছেলে দ্রুপদ (দ্রঃ) দ্রোণের বাল্য বন্ধু। গঙ্গাতীরে ভরদ্বাজের আশ্রম। এক দিন স্নান করতে নদীতে এসে ঘৃতাচীকে দেখতে পান। ঋষিকে দেখে ঘৃতাচী সরে যেতে যান কিন্তু গাছপালায় বস্ত্র আটকে গিয়ে অসম্বৃত হয়ে পড়েন। ঘৃতাচীকে এই অবস্থায় দেখে ভরদ্বাজের বীর্যপাত হয় এবং এই বীর্য একটি পাত্রে (= দ্রোণ) রক্ষিত হয় এবং এই বীর্য থেকে যে ছেলে হয় তার নাম হয় দ্রোণ। পিতার কাছে বেদ বেদাঙ্গ এবং ভরদ্বাজ শিষ্য অগ্নিবেশ্য মুনির কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেন এবং আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করেন। পিতৃ আজ্ঞায় শরদ্বান কন্যা কৃপীকে বিয়ে করেন এবং এক মাত্র সন্তান হয় অশ্বত্থামা। একটি মতে রাজা দ্রুপদ এঁর কেবল সতীর্থ ছিলেন ; বাল্যবন্ধু নন। পরশুরাম ব্রাহ্মণদের নানা কিছু দান করছেন শুনে দ্রোণ মহেন্দ্র পর্বতে ছুটে আসেন। পরশুরাম তখন সব কিছু দিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর দেহ ও অস্ত্রশস্ত্রগুলি বাকি ছিল। পরশুরাম বলেন তাঁর দেহটি বাদ দিয়ে কেবল অস্ত্রশস্ত্রগুলি দ্রোণ নিতে পারেন এবং দ্রোণ তাই নেন। পরশুরামের কাছে অস্ত্র লাভ করে উত্তর পাঞ্চালের রাজা দ্রুপদের কাছে আসেন। দরিদ্র দ্রোণ ছেলেকে দুধ পর্যন্ত দিতে পারতেন না। দ্রুপদ (দ্রঃ) কিছু রূঢ় উপদেশ দেন ; রাজার সঙ্গে গরিব ব্রাহ্মণের বন্ধুতা হতে পারে না ইত্যাদি এবং ফিরিয়ে দেন। দ্রোণ তখন

প্রতিজ্ঞা করেন এর প্রতিশোধ নেবেন। এই উদ্দেশ্যে কিছু শিক্ষিত যোদ্ধা তৈরি করার মানসে ছদ্মবেশে হস্তিনাপুরে এসে কৃপের গৃহে বাস করতে থাকেন। এক দিন কুরুপাণ্ডব বালকদের খেলার গোলক কুয়ার মধ্যে পড়ে যায়। এরা বলটি কি করে তুলবে ভাবছিল এমন সময় দ্রোণ আসেন এবং সব শুনে নিজের আংটিও কূপে ফেলে দেন। তার পর গোলকটিকে বাণ বিদ্ধ করেন এবং প্রথম তীরের পেছনে তার পর দ্বিতীয় তীরের পেছনে ইত্যাদি অনেকগুলি বাণ সন্ধান করে লম্বা বাণের সারি গঠিত হয়; বলটিকে তুলে আনেন। অনুরূপ ভাবে নিজের আংটিও তুলে আনেন। কুরু-পাণ্ডব বালকরা পুরস্কার হিসাবে কি চান জানতে চাইলে দ্রোণ এই ঘটনাটি ভীষ্মকে জানাতে বলেন। ভীষ্ম শুনে সব বুঝতে পারেন এবং এঁকে রাজপুত্রদের অস্ত্র শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন। দ্রুপদের কাহিনীও দ্রোণ ভীষ্মকে জানান।

অস্ত্রশিক্ষা দেবার আগে দ্রোণ ভবিষ্যতে গুরুদক্ষিণার কথা বলে রেখে-ছিলেন। অর্জুন সব সময়ই গুরুর ইচ্ছা পূর্ণ করবেন প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং ক্রমশ প্রিয় শিষ্য হয়ে ওঠেন। বহু দেশ থেকে অন্যান্য রাজপুত্রেরাও দ্রোণের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করতে এসেছিলেন। দ্রোণ এই সব বালকদের অনেক সময় জল আনতে পাঠিয়ে দিয়ে অশ্বত্থামাকে গোপনে বিশেষ অস্ত্র শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে ছিলেন। কিন্তু অর্জুন বুঝতে পারেন এবং তাড়াতাড়ি জল এনে দিয়ে অশ্বত্থামার সঙ্গে সমান শিক্ষা লাভ করতেন। অর্জুনের কৃতিত্ব দেখে দ্রোণ বারণ করে দিয়েছিলেন অর্জুনকে যেন অন্ধকারে খেতে দেওয়া না হয়। কিন্তু এক দিন খেতে বসলে দীপ নিভে যায়, অর্জুন অন্ধকারেই খেতে থাকেন এবং অর্জুন হৃদয়ঙ্গম করেন না দেখেও লক্ষ্যভেদ করা যায়। অর্জুনের এই অভিজ্ঞতা দ্রোণও টের পান এবং প্রতিশ্রুতি দেন অর্জুনের সমান অস্ত্র শিক্ষা আর কাউকে দেবেন না।

এক বার দ্রোণের ছাত্রেরা বনে মৃগয়াতে যান এবং একলব্যের (দ্রঃ) সঙ্গে দেখা হয়। দ্রোণ নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য অর্থাৎ অর্জুনকে শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ করার জন্য একলব্যের ডান হাতের বুড়ো আঙুল গুরু দক্ষিণা হিসাবে আদায় করতে দ্বিধা করেন না। দ্রোণের কাছে শিক্ষা লাভ করে অর্জুন শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ, ভীম ও দুর্যোধন গদাযুদ্ধে অদ্বিতীয়, নকুল ও সহদেব তরবারি যুদ্ধে এবং যুধিষ্ঠির রথ যুদ্ধে বিশেষ দক্ষ হয়ে ওঠেন। দ্রোণ এক বার মাটির একটি পাখী গাছের ডালে বসিয়ে শিষ্যদের লক্ষ্যভেদ করার জন্য একে একে ডাকতে থাকেন। লক্ষ্যবদ্ধ করার পর কি দেখছে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন; প্রত্যেক বালকেরা কি কি দেখছে উত্তর দেয়; দ্রোণ হেসে বালকদের নিরস্ত করে সরিয়ে দেন। শেষ কালে অর্জুন এসে লক্ষ্যবদ্ধ করলে দ্রোণ জিজ্ঞাসা করেন এবং অর্জুন জানান পাখীটির কেবল মাত্র গলাটি তিনি দেখতে পাচ্ছেন। দ্রোণ তখন বাণ বিদ্ধ করতে বলেন। পাখীটির মুণ্ড ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে। আনন্দে দ্রোণ শিষ্যকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। দ্রোণ এক বার শিষ্যদের নিয়ে গঙ্গাতে স্নান করতে নামলে একটি কুমীর আক্রমণ করে। দ্রোণ ডাক দিয়ে সকলকে সাহায্য করতে বলেন। ছাত্রেরা বিমূঢ় হয়ে পড়ে; কিন্তু অর্জুন বাণ বিদ্ধ করে তৎক্ষণাৎ কুমীরকে নিহত করেন। মুক্ত হয়ে উঠে এসে দ্রোণ অর্জুনকে ব্রহ্মশির অস্ত্র দান করেন; তবে নিষেধ করে দেন এই বাণ যেন কোন মানুষের প্রতি প্রয়োগ করা

না হয়। গুরু দক্ষিণা হিসাবে দ্রুপদকে বেঁধে আনার জন্য দ্রোণ দাবি করেন। দুর্যোধন ও কর্ণ প্রথমে গিয়ে আক্রমণ করেন কিন্তু পরাজিত হয়ে পালিয়ে আসেন। এর পর অর্জুন গিয়ে দ্রুপদকে বেঁধে নিয়ে আসেন। দ্রোণ দ্রুপদের (দ্রঃ) কাছে অর্দ্ধেক রাজত্ব আদায় করে নিয়ে মুক্তি দেন। এর এক বছর পরে যুধিষ্ঠির যুবরাজ হন। এই রাজ সভাতে দ্রোণ অর্জুনকে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করেছিলেন যে প্রয়োজন হলে অর্জুন দ্রোণকেও যেন অস্ত্রাঘাত করতে দ্বিধা না করেন। পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে বিয়ে করেছেন খবর পেয়ে দুর্যোধন হস্তিনাপুরে নানা ষড়যন্ত্র করার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু দ্রোণ তখন পাণ্ডবদের সাদরে ফিরিয়ে আনতে এবং অর্দ্ধেক রাজত্ব দিতে উপদেশ দেন। রাজসূয় যজ্ঞে দ্রোণ ছিলেন। পাশা খেলার সময় দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে পাশাখেলা দেখতে এসে ছিলেন। শকুনি ও যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার মধ্যে কপটতা রয়েছে ঘোষণা করেন। বিরাটের গরু চুরি করলে বৃহন্নলা (অর্জুন) যুদ্ধ করতে আসেন এবং অর্জুনের শাঁখের শব্দে দ্রোণ অর্জুনকে চিনতে পারেন এবং অর্জুনের অস্ত্রে আহত হয়ে দ্রোণ পালিয়ে যান। অজ্ঞাত বাসের পর কৃষ্ণ সন্ধির জন্য এলে দ্রোণ পাণ্ডবদের সমর্থন করেছিলেন। যুদ্ধ যখন নিশ্চিত হয়ে পড়ে তখন দ্রোণ নিজের ক্ষমতার হিসাব দিতে গিয়ে বলেছিলেন পাণ্ডব সৈন্য তিনি এক মাসের মধ্যে ধ্বংস করতে পারবেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে যুধিষ্ঠির দ্রোণের কাছে দেখা করতে এলে দ্রোণ বলেন অর্থের দাস হিসাবে কৌরব পক্ষে তাঁকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। যত দিন তিনি জীবিত থাকবেন তত দিন পাণ্ডবদের জয়লাভ সহজ হবে না; পাণ্ডবরা সেই জন্য যত তাড়াতাড়ি পারে দ্রোণকে যেন নিহত করে। অর্থাৎ দুর্যোধনকে কোন দিন সমর্থন করেন নি। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে ৭ম দিনে বিরাটের ছেলে শঙ্খকে নিহত করেন। ভীষ্মের শরশয্যার পর দ্রোণ কৌরব সেনাপতি হন। ১১শ-১৫শ দিন সেনাপতি ছিলেন। ১৩ দিনের দিন অভিমন্যু বধে সাহায্য করেন। ১৪-শ দিনের দিন বৃহৎ-ক্ষত্র, ধৃষ্টকেতু এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ছেলে ক্ষত্রধর্মাকে নিহত করেন। জয়দ্রথকে রক্ষা করেছিলেন। এবং ১৫-শ দিনে বিরাটকে বধ করেন। এ ছাড়া বহু বীর যোদ্ধা দ্রোণের হাতে নিহত হন। অস্ত্র ত্যাগ না করলে দ্রোণ দেবতাদের কাছেও অজেয়। এই জন্য কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে (দ্রঃ) দিয়ে অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ দ্রোণকে শোনাতে চান। যুধিষ্ঠির ছাড়া অন্য কাউকে দ্রোণ বিশ্বাস করতে রাজি নন। ভীম ইত্যাদি যুধিষ্ঠিরকে চাপ দিতে থাকেন এবং মালব রাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বত্থামা নামে হাতীটিকে ভীম বধ করে যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে 'অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ' বলতে বাধ্য করেন। অনুচ্চ কণ্ঠে বলা 'ইতি গজঃ' অংশটুকু দ্রোণ শুনতে পান না। যুধিষ্ঠিরের কথা বিশ্বাস করে ৮৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ শোকে কাতর হয়ে রথে যোগাসনে বসে বিষ্ণুর ধ্যান করতে করতে প্রাণত্যাগ করেন। এই সুযোগে ধৃষ্টদ্যুম্ন মৃত দেহ থেকে দ্রোণের মাথা কেটে আনেন। ব্যাসের আহ্বানে মৃত কুরুপাণ্ডব বীরদের সঙ্গে ইনিও এসেছিলেন। (২) মন্দপালের ঔরসে জরিতার গর্ভে একটি পাখী। (৩) এক জন বসু; অষ্ট বসুর মধ্যে জ্যেষ্ঠ। দ্রঃ ধরা

দ্রৌপদী—দ্রুপদের (দ্রঃ) যজ্ঞ বেদীতে জন্ম। আজন্ম যুবতী, শ্যামবর্ণা, নীলকুঞ্চিত কেশ কলাপ, রন্ধন-নিপুণা, সেবাপরায়ণা ও কলাবতী। পূর্ব জন্মের কাহিনী হিসাবে দ্রঃ

মায়াসীতা, বেদবতী, নলায়নী। এঁর জন্মের সময় দৈববাণী হয় ক্ষত্রিয় ও কৌরবদের কুলক্ষয় করে দেবতাদের মহৎ কাজ সম্পন্ন করবেন। এঁর অপর নাম কৃষ্ণা, পাঞ্চালী যাজ্ঞসেনী। দ্রুপদ এক আকাশ যন্ত্র ও এক দুর্জয় ধনু তৈরি করে ঘোষণা করেন এই ধনুতে জ্যা লাগিয়ে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে পঞ্চবাণে (মহা ১।১৭৯।১৬) যে লক্ষ্যভেদ করবে সেই দ্রৌপদীকে বিয়ে করবে। অর্জুনের সঙ্গে বিয়ে দেবার ইচ্ছায় এই ভাবে ব্যবস্থা করেছিলেন। জতুগৃহ থেকে মুক্তি পেয়ে পাণ্ডবরা ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করতেন। এক দিন পথে ব্রাহ্মণদের মুখে খবর পেয়ে ব্রহ্মচারী বেশে পাণ্ডবরা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় আসেন। পথে বেদব্যাস আশীর্বাদ করে যান। পাঞ্চালে এক কুম্ভকার গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে আসেন। ঘূর্ণায়মান চাকার মধ্য ·দিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে হবে। সমবেত রাজারা কেউই ধনুতে জ্যা লাগাতে পারেন না। কর্ণ জ্যা লাগাতে পেরেছিলেন; কিন্তু সূতপুত্রকে দ্রৌপদী বিয়ে করবেন না জানালে কর্ণ ফিরে যান। সকলে অকৃতকার্য হলে রাজপুত্র নয় এমন ব্যক্তি-কেও ধৃষ্টদ্যুম্ন লক্ষ্যভেদের অধিকার দেন। ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন তখন (একটি মতে কৃষ্ণের ইঙ্গিতে) লক্ষ্যভেদ করেন।দ্রৌপদীকে নিয়ে পাঁচ ভাই কুম্ভকারের গৃহে ফিরে আসেন। পর দিন এক চক্রাতে মায়ের কাছে ফিরে যান। কুটিরের বাইরে থেকে কুন্তীকে ডেকে বলেছিলেন এক অপূর্ব জিনিস এনেছেন। কুন্তী কিছু না দেখেই জিনিসটি পাঁচ ভাইকে সমান ভাবে ভাগ করে নিতে বলেন। এঁরা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ব্যাসের/নারদের উপদেশে পাঁচ ভাই কুন্তীর কথাই রক্ষা করেন। বিয়ের পর কুন্তী নববধূকে আশীর্বাদ করেন 'যথেন্দ্রাণী মহেন্দ্রস্য স্বাহা চৈব বিভাবসৌ' (মহা ১। ১৯১।৫)। আজও নববধূকে এই মন্ত্রেই আশীর্বাদ করা হয়। নারদ তার পর ব্যবস্থা করে যান দ্রৌপদী ক্রমান্বয়ে এক বছর করে এক এক ভাইয়ের সঙ্গে থাকবেন। সেই সময় অন্য কোন ভাই সেখানে এলে তাঁকে ১২ বছর ব্রহ্মচারী হয়ে বনে বাস করতে হবে। ব্যাস আরো বলেন পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই ইন্দ্র অংশে জন্মেছেন এবং শচী জন্মেছেন দ্রৌপদী হয়ে। মহাদেবের কাছে পাঁচ বার স্বামী চাওয়ার কাহিনীও বলেন।

দ্রৌপদী এক বার যখন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ছিলেন তখন অর্জুন সেখানে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে অর্জুন তীর্থযাত্রায় বার হয়ে যান। এই সময়ে অর্জুন সুভদ্রা-কে বিয়ে করেন এবং এই বিয়ের জন্য দ্রৌপদীর বেশ ঈর্ষা বা হিংসা হয়েছিল। অর্জুন দেখা করতে এলে বলেছিলেন 'তত্রৈব গচ্ছ কৌন্তেয় যত্র সা সাত্বতাত্মজা। সুবদ্ধস্যাপি ভারস্য পূর্ববন্ধঃ শ্লথায়তে (মহা ১।২১৩।১৫)। কিন্তু পর মুহূর্তে সুভদ্রাকে আশীর্বাদ করেন নিঃসপত্নঃ অস্তু তে পতিঃ (মহা ১।২১৩।২০)। ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করার সময় দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচ ভাইয়ের যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা বা শ্রুতকীর্তি (মহা ১।৫৭।১০২ ও ১।২১৩।৭২), শতানীক ও শ্রুতসেন পাঁচটি ছেলে হয়। এঁরা বিশ্বদেবের অংশ। প্রথম পাশা খেলতে পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকেও পণ রেখে হেরে গেলে দুর্যোধন (দ্রঃ) প্রথমে বিদুরকে বলেছিলেন; বিদুর যান নি; তার পর প্রাতিকামীকে পাঠান কিন্তু দ্রৌপদী একে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তার পর দুঃশাসন (দ্রঃ) দ্রৌপদীকে সভাতে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসেন। সভাতে দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণেরও চেষ্টা করেন। অসহায় দ্রৌপদী কৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকেন। শত

শত বস্ত্র অলক্ষ্যে কৃষ্ণ দিয়ে যেতে থাকেন ; দুঃশাসন দ্রৌপদীর দেহ থেকে বস্ত্র খুলে শেষ করতে পারেন না ; ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন। দুর্যোধনও এ সময়ে অপমানিত করেন। কর্ণ তখন দ্রৌপদীকে প্রাসাদে দাসী হিসাবে পাঠিয়ে দিতে বলেন। দুঃশাসন আবার দ্রৌপদীকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। একটি মতে দ্রৌপদী এই সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দুঃশাসনের রক্ত মাখা হাতে ভীম যে দিন তাঁর চুল বেঁধে দেবেন সেই দিন থেকে আবার তিনি চুল বাঁধবেন। অবস্থা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ছিল। এই সময়ে ভীষ্ম ও দ্রোণ এদের শান্ত করতে চেষ্টা করেন ; দুর্যোধন নিজের নগ্ন উরু দ্রৌপদীকে দেখান। ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে মুক্তি দেন এবং দৌপদী প্রথম বরে যুধিষ্ঠিরের, দ্বিতীয় বরে অন্যান্য পাণ্ডবদের মুক্তি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে চেয়ে নেন। ধৃতরাষ্ট্র আরো বর দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দ্রৌপদী আর বর নিতে সম্মত হন নি।

এর পর আবার পাশা খেলায় হেরে গিয়ে পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে নিয়ে বনে যান। বনবাসের সময় দ্রৌপদী কটুবাক্যে বার বার কৌরবদের বিরুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করতেন। বনে যাবার সময় সূর্য দ্রৌপদীকে একটি তামার পাত্র দেন ; এই পাত্রে কিছু রাঁধলে দ্রৌপদী যতক্ষণ না খাবেন ততক্ষণ পাত্রটি পূর্ণ থাকবে। এই কারণে বনে যত অতিথিই আসুক দ্রৌপদীর কোন অসুবিধা হত না। কাম্যক বনে থাকার সময় দুর্যোধন (দ্রঃ) এক বার দশ হাজার শিষ্য সমেত দুর্বাসাকে দ্রৌপদীর খাওয়ার পর পাঠিয়ে দেন। দ্রৌপদী প্রকৃত বিপদে পড়ে কৃষ্ণকে স্মরণ করেন ; কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ এসে সেই তামার খালি পাত্রের কাণায় লেগে থাকা শাক অন্ন কণা খেয়ে উদ্‌গার তুলতে থাকেন ; সঙ্গে সঙ্গে সশিষ্য দুর্বাসা আকণ্ঠ ভোজনের ক্লান্তিতে যেখানে ছিলেন সেইখানেই শুয়ে পড়েন। কাম্যক বনে দ্রৌপদী এক দিন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এমন সময় বকের ভাই কির্মীর আক্রমণ করেছিলেন। গন্ধমাদন পর্বতে থাকাকালীন দ্রৌপদী ভীমকে সৌগন্ধিক পুষ্প আনতে পাঠিয়েছিলেন। বদরিকাশ্রমে অর্জুনের অপেক্ষায় থাকা কালীন জটাসুর পাঞ্চালীকে অপহরণ করেছিলেন ; অর্জুন সে সময়ে অস্ত্র শিক্ষার জন্য স্বর্গে ছিলেন। জটাসুরের হাত থেকে মুক্তি পাবার পর আষ্টিষেনের আশ্রমে এঁরা কিছু দিন কাটান। কৃষ্ণের সঙ্গে সত্যভামা এক দিন বেড়াতে এলে দ্রৌপদী সত্যভামাকে স্ত্রীর কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন। এই কাম্যক বন থেকে সকলের অনুপস্থিতে জয়দ্রথ (দ্রঃ) একবার দ্রৌপদীকে চুরি করেন ; কিন্তু পাণ্ডবরা পর মুহূর্তে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। অজ্ঞাতবাসের সময় বিরাট-রাণী সুদেষ্ণার পরিচারিকা ও কেশবন্ধনে কুশলী সৈরিন্ধ্রী রূপে বাস করতে থাকেন। দ্রৌপদীর রূপ দেখে যদি কোন বিপদ ঘটে সেই জন্য রাজবাড়িতে প্রচার করা ছিল পাঁচ জন গন্ধর্ব তাঁর স্বামী : অলক্ষ্যে তাঁরা সব সময় দ্রৌপদীকে পাহারা দিচ্ছেন। এবং দ্রৌপদী কারো পা ধুয়ে দেবেন না বা কারো উচ্ছিষ্ট খাবেন না। এখানে দশমাস থাকার পর সুদেষ্ণার ভাই কীচক দ্রৌপদীকে দেখে লুব্ধ হয়ে পড়েন। সুরা নিয়ে যাবার অছিলায় সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে কীচকের কাছে পাঠান। কীচক এঁকে ধরতে চেষ্টা করলে দ্রৌপদী ধাক্কা দিয়ে কীচককে ফেলে দিয়ে রাজসভাতে পালিয়ে আসেন। কীচক পেছু পেছু ছুটে এসে সভাতে দ্রৌপদীকে পদাঘাত করেন। কীচকের (দ্রঃ) ভয়ে বিরাট এবং আত্মপ্রকাশের ভয়ে পাণ্ডবেরা নীরব থাকেন। পর দিন গভীর

রাতে নাট্যশালায় দ্রৌপদীর আহ্বানে কীচক অভিসারে আসেন এবং ভীম নিমেষে কীচককে পিষে মাংস পিণ্ডে পরিণত করে ফেলেন।

গন্ধর্বের ভয়ে সকলেই চুপ করে থাকেন। কীচকের ভাই উপকীচকরাও (দ্রঃ) পরদিন ভীমের হাতে মারা পড়েন। সুদেষ্ণা ভীত হয়ে দ্রৌপদীকে অন্যত্র চলে যেতে বলেন। অজ্ঞাতবাস পূর্ণ হতে তখনও তের দিন বাকি ছিল; দ্রৌপদী এই কদিনের জন্য আশ্রয় চেয়ে নেন। কীচক বধের পর দুর্যোধনেরা বিরাটের গরু চুরি করতে এলে রাজপুত্র উত্তর উপযুক্ত সারথি নাই অজুহাতে যুদ্ধে যেতে চাইছিলেন না। দ্রৌপদী তখন বৃহন্নলাকে (অর্জুন) নিয়ে উত্তরকে যুদ্ধে যেতে বলেন। যুদ্ধের পূর্বে শেষ চেষ্টা হিসাবে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুরে যাবেন ঠিক হয় তখন সকলে যে যার বক্তব্য কৃষ্ণকে জানিয়ে দেন। দ্রৌপদী তখন নিজের খোলা চুল দেখিয়ে 'অয়ং তে পুণ্ডরীকাক্ষ দুঃশাসন-করোদ্ধৃতঃ', অপমানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন (মহা ৫।৮০।৩৬) ; এবং দুঃশাসনের ভুজং সংছিন্নং পাংসুগুণ্ঠিতম্ (মহা ৫।৮০।৩৯) দেখতে চান এবং বলেন পাণ্ডু পুত্রেরা সন্ধি করলেও তাঁর বৃদ্ধ পিতা এবং প্রতিবিন্ধ্য ইত্যাদি পাঁচ ছেলে অপমানের প্রতিশোধ নেবেই। যুদ্ধে কৌরবদের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্যই কৃষ্ণকে দ্রৌপদী অনুরোধ করেন।

অভিমন্যু মারা গেলে সুভদ্রাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দ্রৌপদী নিজেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর অশ্বত্থামা রাত্রিতে পাণ্ডব শিবির আক্রমণ করে দ্রৌপদীর পাঁচটি ছেলেকেই হত্যা করেন। নকুলের কাছে এই খবর পেয়ে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সামনে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগের সংকল্প করেন। শেষ অবধি অশ্বত্থামার মাথার সহজাত মণি পেলে সংকল্প ত্যাগ করবেন বলেন এবং ভীমকে এই মণি আনার জন্য পাঠান। অবশ্য অর্জুনই মণি সংগ্রহ করেন এবং ভীম সেই মণি এনে দিলে দ্রৌপদী শান্ত হন এবং যুধিষ্ঠিরকে এই মণি ধারণ করতে দেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের মনে বৈরাগ্য এলে দ্রৌপদী সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে চিত্রাঙ্গদা উলুপী ইত্যাদি এলে এঁদের বহু উপহার দেন। কুন্তি ও গান্ধারী যতদিন হস্তিনাপুরে ছিলেন তত দিন এঁদের সযত্নে সেবা করেছিলেন। কুন্তীর সঙ্গে দ্রৌপদী বনে যেতেও চেয়েছিলেন। অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকলেও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ভীমকেই বার বার অনুরোধ করতেন। পাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রৌপদীও মহাপ্রস্থানে যান এবং পথে মেরু পর্বতে প্রথমেই দেহত্যাগ করেন। যুধিষ্ঠির বলেন অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের বা বিশেষ প্রীতির জন্যই দ্রৌপদীর এই মৃত্যু। দ্রৌপদীর মত প্রকৃত জীবন সঙ্গিনী পৃথিবীর সাহিত্যে দ্বিতীয় কেউ নেই। পাণ্ডবদের নয়ন পুত্তলি এই দ্রৌপদী। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী সকলেই এঁকে সমাদর করতেন।

ধ

ধনঞ্জয়—(১) অর্জুনের এক নাম। সমস্ত ধন জয় ও সংগ্রহ করে তার মধ্যে বাস

করতেন বলে এই নাম। (২) কশ্যপ কদ্রুর একটি ছেলে; এক জন নাগ; ত্রিপুর নিধনের সময় মহাদেবের রথে অশ্ববন্ধন রজ্জু হিসাবে কাজ করেন।

ধনুর্গ্রহ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে নিহত।

ধনুষ্কোটি—৯°১২´ উ × ৭৯°২৫´ পূ। বর্তমানে মাদ্রাজে একটি বন্দর। ভারত ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গম স্থলে। প্রসিদ্ধ তীর্থ। ধনুকের কোটি/কোণ দিয়ে এই স্থানে রামচন্দ্র সেতু ভেঙে দেন। কাছেই রামেশ্বর তীর্থ।

ধন্বন্তরি—ধন্বন্তরি গোত্র প্রবর্তক। ঋক্‌বেদে ধন্বন্তরি ও দিবোদাস দুই নামই পাওয়া যায়। দিবোদাস গোত্রেরও উল্লেখ আছে। সুশ্রুত সংহিতায় জানা যায় কাশীরাজ দিবোদাস-ধন্বন্তরি বানপ্রস্থ নিয়ে বনে বাস করছিলেন। এই সময় সুশ্রুত ও সুশ্রুতদের সহপাঠীদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন। গরুড় পুরাণে গৃৎসমদ ঋষির ছেলে শৌনক, শৌনক পুত্র দীর্ঘতমা এবং দীর্ঘতমার ছেলে ধন্বন্তরি। মোটামুটি বংশ পরিচয় অনিশ্চিত এবং বহু মতে ধন্বন্তরি ও দিবোদাস বিভিন্ন। তবে কাশীরাজ বংশে জন্ম এবং দীর্ঘতমার পুত্র এ বিষয়ে এক মত। বিক্রমাদিত্যের সভার ধন্বন্তরি ৪-র্থ শতকের লোক; ইনি মূল ধন্বন্তরি কি না প্রমাণ নাই। আর এক মতে সমুদ্রমন্থনের দ্বিতীয় পর্বে এঁর আবির্ভাব। ধন্বন্তরি বৈবৈদ্য, সর্ববেদবিদ্, এবং মন্ত্রতন্ত্র বিশারদ। দণ্ড, কমণ্ডলু ও অমৃত ভাণ্ড নিয়ে ইনি জল থেকে বার হন। ইনি দেবতা, দেবতার মতই পূজিত হতেন ও যজ্ঞের ভাগ পেতেন। হরিবংশে আছে ধন্বন্তরি যখন সমুদ্র মন্থনে উঠে আসেন বিষ্ণু তখন ধ্যানস্থ ছিলেন। জল থেকে ওঠার জন্য বিষ্ণু এঁর নাম দেন অজ্জদেব। ধন্বন্তরি তখন নিজেকে বিষ্ণুর ছেলে বলে দাবি করেন এবং যজ্ঞ ভাগ ও বাসস্থান চান। বিষ্ণু বুঝিয়ে বলেন যজ্ঞ ভাগ পাওয়া সম্ভব নয় এবং এ জন্মে দেবতা হলেও পর জন্মে মানুষ হয়ে জন্মে বিখ্যাত হবেন। গর্ভে থাকাকালীন অষ্ট সিদ্ধিলাভ করবেন এবং আয়ুর্বেদকে আটভাগে বিভক্ত করবেন। এর পর দ্বিতীয় দ্বাপরে সুহোত্রের এক ছেলে শল; শলের ছেলে অরিষ্টসেন; অরিষ্টসেনের ছেলে কাশ এবং কাশের ছেলে ধন্বা। সুহোত্রের দ্বিতীয় পুত্র গৃৎসমদ; একটি মতে ধন্বন্তরি এই গৃৎসমদ বংশে জন্মান। অন্য মতে কাশের ছেলে রাজা ধন্বা পুত্র কামনায় দীর্ঘ দিন অজ্জ দেবের আরাধনা করেন। ধন্বা চান অজ্জদেবই তাঁর ছেলে হয়ে জন্মাক। অজ্জদেব প্রীত হয়ে ধন্বের ছেলে ধন্বন্তরি নামে জন্ম গ্রহণ করেন। ভরদ্বাজের কাছে এই কাশীরাজ আয়ুর্বেদ শেখেন এবং আয়ুর্বেদকে আট ভাগে ভাগ করেন। ধন্বন্তরির ছেলে কেতুমান, কেতুমানের ছেলে ভীমরথ এবং ভীমরথের ছেলে দিবোদাস।

পরিক্ষিৎ রাজাকে বাঁচাবার জন্য একটি মতে ইনিই আসছিলেন; পথে তক্ষক এঁকে ধনরত্ন দিয়ে ফিরিয়ে দেন। ধন্বন্তরি এক বার শিষ্যদের নিয়ে কৈলাস যাচ্ছিলেন পথে তক্ষক এক জায়গায় ফোঁস করে ওঠে। ধন্বন্তরির একটি শিষ্য সঙ্গে সঙ্গে তক্ষকের মাথা থেকে মণিটি তুলে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেন। বাসুকি খবর পেয়ে দ্রোণ, পুণ্ডরীক, ধনঞ্জয় ইত্যাদি সাপের নেতৃত্বে হাজার হাজার সাপকে পাঠান; এদের বিষাক্ত নিশ্বাসে ধন্বন্তরির শিষ্যেরা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। ধন্বন্তরি তৎক্ষণাৎ একটি গাছ থেকে ঔষধ তৈরি করে এদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন এবং সাপেদের সংজ্ঞাহীন করে দেন। বাসুকি তখন মনসাদেবীকে পাঠান। মনসাদেবীও

এই শিষ্যদের আবার হতজ্ঞান করে দিলে ধন্বন্তরি এদের আবার সুস্থ করে তোলেন। মনসাদেবী হেরে গিয়ে শিবের কাছে প্রাপ্ত ত্রিশূল দিয়ে আক্রমণ করেন। শিব ও ব্রহ্মা তখন আবির্ভূত হয়ে দুজনকে শান্ত করেন।

পুরাণে একটি কাহিনীতে আছে গালব বনের মধ্যে কুশ ও সমিধ আনতে যান। হাঁটতে হাঁটতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েন। এমন সময় বীরভদ্রা নামে একটি বৈশ্য কন্যা সেই পথে জল নিয়ে আসছিলেন। এর কাছ থেকে গালব জল চেয়ে খান এবং সন্তুষ্ট হয়ে সুপুত্র হক বর দেন। মেয়েটি জানায় তার বিয়েই হয় নি। গালব তখন কুশ দিয়ে একটি পুরুষ তৈরি করে এই কুশপুত্তলিকার কাছ থেকে সন্তানবতী হতে বলেন। কুশপুত্তলিকা ব্রাহ্মণ, বীরভদ্রা বৈশ্যা অর্থাৎ সন্তান হয় অম্বষ্ঠ ; সুন্দর একটি বালক জন্মায় ; নাম রাখা হয় ধন্বন্তরি। এই ধন্বন্তরি ও সমুদ্র মন্থনের ধন্বন্তরি এক ব্যক্তি কিনা কোথাও উল্লেখ নাই।

ধম্ম—ধম্ম ও সংস্কৃতে ধর্ম দুটি একার্থক শব্দ নয়। ধম্ম অর্থে নিয়ম, শীল, গুণ, দেশনা ইত্যাদি। জাগতিক ভোগসুখের ঊর্দ্ধে দুঃখ বিহীন পরমশান্তি নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য যে সাধনা তাই ধম্ম। বুদ্ধের ধম্ম :—পরিয়ত্তি, পটিপত্তি, ও পটিবেধ ধম্মরূপে ত্রিবিধ।

ধম্মকায়—বুদ্ধের আধ্যাত্মিক শরীর। এই শরীরে বুদ্ধোপযোগী সমস্তগুণের সমাবেশ হয়েছে। এই শরীর অনন্ত ও বিশ্বব্যাপী। ধম্মকায় অচিন্তনীয়, অবর্ণনীয়, অপরিবর্তনীয়, অজ্ঞেয় এবং জরা মৃত্যু ও নির্বাণের ঊর্দ্ধে। মহাযান মতে ধম্মকায়ই নির্বাণ।

ধর—প্রথম বসু। ধর্মের ঔরসে স্ত্রী ধূম্রার গর্ভে জন্ম।

ধরা—দ্রোণ নামে বসুর স্ত্রী।

ধর্ম—(১) যাহা ধারণ ও পোষণ করে। ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন এবং পরলৌকিক জীবনকে যা সুখান্বিত ও শান্তিময় করে। ধর্মের আচরণে নিজের ও বিশ্বমানবের কল্যাণ হয় ; পাপক্ষয় হয় ; পুনরায় আর জন্মাতে নাও হতে পারে। (২) বরাহ পুরাণে আছে সৃষ্টি করার জন্য ব্রহ্মা যখন গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তখন তাঁর দক্ষিণ অঙ্গ থেকে ধর্মের জন্ম হয়। ধর্ম চতুষ্পাদ এবং বৃষভ আকৃতি। গুণ, ধর্ম, ক্রিয়া ও জাতি ধর্মের এই চারটি পদ। সত্যযুগে ধর্ম চতুষ্পাদ, ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ ও কলিতে একপাদ। এঁর দুই মাথা ও সাত হাত। বেদে এঁর নাম ত্রিশৃঙ্গ। (৩) আর এক মতে ব্রহ্মার স্তন থেকে জন্ম মানুষ মত দেখতে। বামন পুরাণে এঁর স্ত্রী অহিংসা (দ্রঃ অসিক্নী)। অহিংসার চারটি ছেলে সনৎকুমার, সনাতন, সনক ও সনন্দ। অন্য পুরাণে এঁরা চারজন ব্রহ্মার মানসপুত্র। পুরাণে ও মহাভারতে ধর্মের স্ত্রী তেরটি শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুস্, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্তি। দক্ষের তেরটি মেয়ে ধর্মের স্ত্রী হিসাবে নাম পাওয়া যায় :-শ্রদ্ধা, শান্তি, পুষ্টি, তুষ্টি, ক্রিয়া, বুদ্ধি মেধা, মৈত্রী, দয়া, উন্নতি, তিতিক্ষা, হ্রী ও মূর্তি। আর এক মতে অসিক্নীর তেরটি মেয়েকে বিয়ে করেন :—অরুন্ধতী, বসু (এঁর সন্তান বসুগণ), যমী (সন্তান নাগবীথি), লম্বা (ঘোষ), ভানু (ভানুগণ), মরুৎবতী (মরুত্বানগণ ও জয়ন্ত), সংকল্পা, মুহূর্তা (মুহূর্তাভিমানী), সাধ্যা (সাধ্যগণ), বিশ্বা (বিশ্বদেবগণ)। আরো কয়েকটি নাম পাওয়া যায় :-কুকুভ, সুনৃতা। এই সব স্ত্রীদের থেকে এক একটি বংশ

গড়ে ওঠে। শ্রদ্ধা থেকে শুভ; মৈত্রী-প্রসাদ, দয়া-অভয়, শান্তি-সুখ, তুষ্টি-মোদ, উন্নতি-দর্প, বুদ্ধি-অর্থ, মেধা-স্মৃতি, তিতিক্ষা-শম, হ্রী-প্রশ্রয়, মূর্তি-নর, নারায়ণ; সুনৃতা-সত্যব্রত ও সত্যসেন দুটি দেবতা। এই সত্যসেন বহু দুষ্ট যক্ষ দানব ইত্যাদি নিহত করেন। লম্বার ছেলে ঋষভ ও বিদ্যোতন। ঋষভের ছেলে ইন্দ্রসেন এবং বিদ্যোতনের ছেলে স্তনয়িত্নু। ককুভের ছেলে শঙ্কট; এবং শঙ্কটের ছেলে কীকট ও দুর্গদেব। যামীর ছেলে স্বর্গ ও স্বর্গের ছেলে নন্দী। সাধ্যার ছেলে সাধ্যগণেরা এবং সাধ্যগণেদের ছেলে অর্থসিদ্ধি। এই সাধ্যরা ব্রহ্মার ছেলে নন। ধর্মের আর তিনটি ছেলে শম, কাম, ও হর্ষ এবং এঁদের স্ত্রী যথাক্রমে রতি, প্রাপ্তি ও নন্দা। ধর্মের ছেলেদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হরি, কৃষ্ণ, নর, ও নারায়ণ।

ধর্মের স্ত্রী ধর্মবতীর মেয়ে ধর্মব্রতা (দ্র); ব্রহ্মার ছেলেমরীচির সঙ্গে বিয়ে হয়। এক দিন মরীচি বন থেকে ফুল ও কুশ ইত্যাদি সংগ্রহ করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে আহার করে ঘুমিয়ে পড়েন। স্ত্রী পা টিপে দিতে থাকেন। ইতি মধ্যে ব্রহ্মা আসেন এবং ধর্মব্রতা ব্রহ্মার অতিথি সৎকার করতে থাকেন। মরীচির ঘুম ভাঙলে দেখেন স্ত্রী অপর এক জনের সেবা করছেন ফলে শাপ দিয়ে স্ত্রীকে পাথরে পরিণত করেন। ধর্মব্রতা তখন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তপস্যা করতে থাকেন। ব্রহ্মা ইত্যাদি অপর দেবতা এসে সান্ত্বনা দেন এবং কথা দেন তাঁরাও এই পাথরের মধ্যে অবস্থান করবেন। এই পাথরটি এর পর ধর্মশিলা নামে পরিচিত হয়।

অণীমাণ্ডব্যের (দ্রঃ) শাপে ধর্ম বিদুর হয়ে জন্মান। এই ধর্মের অংশেই যুধিষ্ঠিরের জন্ম। পাণ্ডবদের বনবাসের সময় হরিণরূপে এসে ধর্ম এক ব্রাহ্মণের অরণি চুরি করেন এবং তার পর বকরূপে যুধিষ্ঠিরকে বাদ দিয়ে চার ভাইকে ক্রমশ নিহত করেন এবং পরে যুধিষ্ঠিরের বাক্যে ও ধর্মজ্ঞানে সন্তুষ্ট হয়ে সকলকে জীবিত করে দেন। এই ধর্মই এক বার ব্রাহ্মণ বেশে সীতার পিতাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। জমদগ্নিকে পরীক্ষা করার জন্য এক বার ক্রোধরূপে এসে কামধেনুর দুধের সঙ্গে মিশে অবস্থান করেন। জমদগ্নি এই দুধ খেয়ে ফেলেন কিন্তু একটুও ক্রোধের উদ্রেক হয় না। ধর্ম তখন পরাজিত হয়ে জমদগ্নিকে আশীর্বাদ করে যান। পাণ্ডবদের মহা-প্রস্থানের পথে ধর্ম কুকুর বেশে এসে সঙ্গ নিয়েছিলেন।

ধর্ম ও কাল দুজনে ঠিক এক দেবতা নন। কাল হচ্ছেন যম। কালের পিতা সূর্য, মা বিশ্বকর্মার মেয়ে সংজ্ঞা। এই কাল বিষ্ণুর ৬-ষ্ঠ বংশধর। কালের কাজ মানুষের পাপপুণ্যের বিচার। আর ধর্মদেব ধর্মের মূর্ত বিগ্রহ। কালের কোন ছেলে নাই। ধর্মদেবের বহু ছেলে; ধর্মদেবকে অবশ্য আত্ম নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা যমন/যম ও বলা হয়।

ধর্মচক্র—(দ্র) বৌদ্ধ চক্র।

ধর্মদত্ত—করবীর নগরীতে এক ব্রাহ্মণ। এক দিন পূজার উপচার নিয়ে মন্দিরে যাচ্ছিলেন এমন সময় পথে রাক্ষসী কলহার (দ্রঃ) সঙ্গে দেখা হয় এবং পূজার উপচারগুলি এঁর মুখে ছুঁড়ে মারেন। এই উপচারের সঙ্গে তুলসীপাতা ছিল। এর স্পর্শে কলহার পূর্বজন্মের কাহিনী মনে পড়ে এবং ধর্মদত্তের কাছে এই রাক্ষসী জীবন থেকে মুক্তির উপায় জানতে চান। ধর্মদত্ত করুণাসিক্ত হয়ে কার্তিকের ব্রত জনিত

সমস্ত পুণ্য এঁকে দান করেন। পর জন্মে এঁরা দুজনে দশরথ ও কৈকেয়ী হয়ে জন্মান।

ধর্মধ্বজ—দক্ষসাবর্ণির ছেলে ব্রহ্মসাবর্ণি, ব্রহ্মসবর্ণির ছেলে ধর্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণির ছেলে রুদ্রসাবর্ণি। রুদ্রসাবর্ণির ছেলে দেবসাবর্ণি এবং দেবসাবর্ণির ছেলে ইন্দ্রসাবর্ণি। ইন্দ্রসাবর্ণির ছেলে বৃষধ্বজ,বৃষধ্বজের ছেলে রথধ্বজ ; রথধ্বজের ছেলে ধর্মধ্বজ ও কুশধ্বজ। বৃষধ্বজ ছিলেন শিবভক্ত এবং আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে বৃষধ্বজের কুটিরে শিব তিন দেবযুগ অবস্থান করেন। বৃষধ্বজ তার পর ঘোষণা করেন অন্য দেবতাকে কেউ পূজা করতে পারবে না। এই জন্য সূর্য অভিশাপ দেন সমস্ত ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাবে। শিব এতে ক্রুদ্ধ হয়ে সূর্যকে আক্রমণ করতে যান। সূর্য তখন কশ্যপের কাছে যান ; এঁরা দুজনে তারপর ব্রহ্মার কাছে এবং ব্রহ্মা এদের নিয়ে বিষ্ণুর কাছে আসেন। বিষ্ণু সকলকে শান্ত করে বলেন ইতিমধ্যে বহু দিন পৃথিবীতে কেটে গেছে ; বৃষধ্বজ রথধ্বজ মারা গেছে। বৃথা কলহ। এখন বেঁচে আছে ধর্মধ্বজ ও কুশধ্বজ। এ দিকে পৃথিবীতে ধর্মধ্বজ ও কুশধ্বজ লক্ষ্মীর তপস্যা করতে থাকেন। লক্ষ্মী এদের দেখা দিয়ে বর দেন তিনি এদের দু জনের সন্তান হয়ে জন্মাবেন এবং আবার ধনসম্পতি ফিরে আসবে। এর পর ধর্মধ্বজের স্ত্রী মাধবীর মেয়ে হয়ে লক্ষ্মী জন্মান নাম হয় তুলসী (দ্রঃ সীতা)।

ধর্মধ্বজ—জনক বংশে মিথিলার এক রাজা। দণ্ডনীতি, সন্ন্যাসধর্ম, ও মোক্ষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সুলভা নামে এক ব্রাহ্মণী সন্ন্যাসিনী যোগবলে মনোহর এক সুন্দরী সেজে একে পরীক্ষা করতে আসেন। রাজা মুগ্ধ হয়ে এঁকে সংবর্দ্ধনা করেন। সুলভা তার পর যোগবলে নিজের স্বত্ত্ব, বুদ্ধি ও চক্ষু রাজার স্বত্ব, বুদ্ধি ও চক্ষুতে সন্নিবিষ্ট করলে রাজা সুলভার অভিপ্রায় জানতে পারেন এবং সুলভাকে জানান আসক্তি, মোহ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি পরাজ্ঞান লাভ করে মোক্ষ লাভ করেছেন। ফলে তাঁদের মিলন হতে পারে না। এক জন সন্ন্যাসিনী অপর জন গৃহস্থ, এক জন ব্রাহ্মণী অন্য জন ক্ষত্রিয়। দু জনের মধ্যে কোন অনুরাগও জন্মাতে পারে না। ব্রাহ্মণী যেহেতু রাজাকে পরাজিত করে নিজের উন্নতি চাইছেন সেই হেতু এই মিলন বিষময় হয়ে উঠবে। এর উত্তরে সুলভা জানান রাজা এখনও আমার বা আমার নয় এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত নন ; সকলকে এখনও সমান জ্ঞানে দেখতে পারছেন না। নিজেকে মিথ্যা মুক্ত মনে করছেন। রাজা এখনও জীবন্মুক্ত নন বলেই ব্রাহ্মণীর সংস্পর্শে তার অপকার হবে মনে করছেন। সুলভার জ্ঞান দেখে রাজা স্তম্ভিত হয়ে যান। (২) দ্র-বৃষধ্বজ।

ধর্মনেত্র—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

ধর্মপাল—আনু খৃ ৬-৭ শতক। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক। দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চির অধিবাসী। কিছু সময় গয়াতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতেন ; কৌশাম্বীর তর্কসভাতে বহু হীনযানী পণ্ডিতদের পরাস্ত করেন। নালন্দার অধ্যক্ষ হয়েছিলেন ৬৩৫ খৃ। এর পর এঁরই শিষ্য প্রখ্যাত শীলভদ্র এখানে মঠাধ্যক্ষ হন।

ধর্মপুত্র—যুধিষ্ঠির।

ধর্মপূজা—ধর্মঠাকুরের পূজা। ধর্মমঙ্গল কাব্যের দেবতা। আদিম সমাজের সূর্য

দেবতা ; সাদা রঙের পশুবলি দিয়ে পূজা করা হয়। ছাগল ও কবুতর বলি সাধারণতঃ দেওয়া হয়। সাদা ঘোড়া এর বাহন ; সাদা ফুলে এর প্রসন্নতা।

ধর্মব্যাধ—মিথিলাবাসী, জাতিস্মর, জিতেন্দ্রিয়, পিতামাতার সেবাপরায়ণ এক জন ব্যাধ। পূর্বজন্মে ইনি এক জন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ও এক রাজার বন্ধু ছিলেন। রাজার সঙ্গে মৃগয়াতে গিয়ে হরিণ মনে করে এক ঋষিকে বাণ বিদ্ধ করেন। ঋষি শাপ দেন এ জন্য এঁকে শূদ্র ব্যাধ রূপে জন্মাতে হবে। অবশ্য কাতর অনুনয়ে জাতিস্মর হবার এবং শাপ শেষে আবার ব্রাহ্মণ হবেন বর দিয়ে ঋষি মারা যান। অন্য মতে পরজন্মে বৃত্তি চরিত্র ইত্যাদি কি হবে তাও বর দিয়েছিলেনএবং মারা যান নি (মহা ৩।২০৬।৭)।

এই জাতিস্মর ব্যাধের কাছে কৌশিক (দ্রঃ) ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা করতে এলে ধর্মব্যাধ দিব্যজ্ঞানে সমস্ত ঘটনা জানতে পারেন এবং সসম্মানে এঁকে গ্রহণ করেন এবং নিজের পূর্ব জন্মের কাহিনীও জানান। নিজের সম্বন্ধে বলেন হরিণ ও মহিষ মাংস বিক্রয় করলেও তিনি নিজে এ সব পশুহত্যা করেন না,এবং মাংস তিনি একদমই খান না। এই মাংসে লোকে দেবতাদের, পিতৃগণের, অতিথিগণের,ও আত্মীয়দের সেবা করে। নিহত পশুরও এতে পুণ্য হয়। তিনি সাধ্য মত দান করেন এবং দেবতা অতিথি, ভৃত্য ইত্যাদি সকলের খাবার পর যা থাকে তাই খান। ব্রহ্মবিদ্যা, দর্শন, মোক্ষ ও ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাধ বহু উপদেশ দেন এবং বলেন পিতামাতাই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ। এবং জানান পিতামাতার অনুমতি না নিয়ে কৌশিক বেদ পাঠের জন্য গৃহ ত্যাগ করেছেন বলে তাঁর পিতামাতা অন্ধ হয়ে গেছেন। কৌশিকের উচিত সত্বর ফিরে গিয়ে তাঁদের সেবা করা।

ধর্মব্রতা—ধর্ম (দ্র) নামে এক রাজা ও রাণী বিশ্বরূপার মেয়ে। ধর্মব্রতা কঠোর তপস্যা করছিলেন পতিব্রতা হবার জন্য। ঋষি মরীচি এক দিন এঁকে জিজ্ঞাসা করে এই তপস্যা ও পতিব্রতা হবার ঘটনা জানতে পারেন। মরীচি তখন এঁকে জানান তাঁর মত পতিব্রতা স্ত্রীর সন্ধানে তিনি ঘুরছেন। নিজেও তিনি স্বামী হিসাবে শ্রেষ্ঠ হবেন। সুতরাং তাঁরা বিয়ে করতে পারেন। ধর্মব্রতা তখন এঁকে ধর্মের কাছে গিয়ে প্রস্তাব জানাতে বলেন। রাজা ধর্ম এঁদের তারপর বিয়ে দেন।

এক দিন মরীচির নির্দেশে ধর্মব্রতা স্বামীর পা ধুয়ে দিচ্ছিলেন এমন সময় মরীচির বাবা ব্রহ্মা এলে শ্বশুরকে অভ্যর্থনা করবার জন্য ধর্মব্রতা উঠে যান। মরীচি এতে রেগে গিয়ে পাথরে পরিণত হবার শাপ দেন। এই অকারণে শাপ দেবার জন্য ধর্মব্রতাও রেগে গিয়ে শাপ দেন যে শঙ্করও এক দিন মরীচিকে শাপ দেবেন।

ধর্মমঙ্গল—দ্রঃ মঙ্গলকাব্য।

ধর্মরথ—সগর (দ্রঃ) রাজার ছেলে। কপিল মুনির শাপে অন্যান্য ছেলেরা মারা যান ; কেবল বর্হকেতু, সুকেতু, ধর্মরথ, ও মহাবীর এই চারজনে অবশিষ্ট থাকেন।

ধর্মরাজ—যম।

ধর্মশাস্ত্র—যে সব গ্রন্থে ধর্মীয় জীবনের অনুশাসন ও নির্দেশ ইত্যাদি রয়েছে এবং আলোচিত হয়েছে। রাজধর্ম ইত্যাদিও এই সব গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এই সব গ্রন্থগুলির তিনটি ভাগ :-ধর্মসূত্র, ধর্মসংহিতা (=শাস্ত্র), এবং ব্যাখ্যা। বর্তমানে

গৌতম, বৌধায়ন, আপস্তম্ভ, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, ও বৈখানস, এই কয় জনের ছাড়া সূত্রগ্রন্থ বিশেষ পাওয়া যায় না। এগুলির মধ্যে গৌতমধর্মসূত্র খৃ-পূ ৫-৪ শতকে এবং সবচেয়ে অর্বাচীন বৈখানস ধর্মসূত্র খৃ ৩-৪ শতক।

প্রধানত মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ইত্যাদিকে আগে ধর্মশাস্ত্র বলা হত। পরে সমস্ত স্মৃতিকেই ধর্মশাস্ত্র বলা হয়েছে বা হয়। এগুলিতে সাধারণত আচার ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত থাকে। শাস্ত্রকার (সংখ্যা ১৮ বা ২০ অন্য মতে ৪২) মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, অঙ্গিরা, আপস্তম্ব, উশনা, কাত্যায়ন, গৌতম, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ব্যাস, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, যম, লিখিত, হারীত, শঙ্খ, সংবর্ত, শাতাতপ। নারদ, ভৃগু, মরীচি, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, এবং বৌধায়নও শাস্ত্রকার হিসাবে পরিচিত।

ধর্মসাবর্ণি—চতুর্দশ মনুর মধ্যে ১১-শ। এই মন্বন্তরে অবতার ধর্মসেতু; ইনি বিষ্ণুর অবতার। ইন্দ্রের নাম বৈধৃতি। এই মন্বন্তরে বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ, ও নির্বাণরতিগণ দেবতা; প্রতিটি গণে ৩০ জন করে দেবতা। এই মন্বন্তরে নিশ্চর, অগ্নিতেজা, বপুষ্মান, বিষ্ণু, আরুণি; হবিষ্মান, ও অনঘ এই সাতজন ছিলেন সপ্তর্ষি অন্য মতে বৃষ, অগ্নিতেজস্, বপুষ্মান, ঘৃণী, আরুণি, হবিষ্মান ও অনঘ। ছেলে সর্বত্রগ, সুধর্মা, দেবানীক ইত্যাদি।

ধর্মাধিকরণ—রাজা এবং বিচারক (ধর্মাধিকারী) নিয়ে বিচারালয় গঠিত হত। বিচারককে ধর্মস্থ বা ধর্ম প্রবক্তাও বলা হত। রাজা সব সময় আসতে পারতেন না; ফলে এক জন বিদ্বান ব্রাহ্মণ (=প্রাড়্‌বিবাক) নিযুক্ত করতেন। এই প্রাড়্‌বিবাকই বিচার সভায় সভাপতি-স্থানীয় হতেন; ইনিই বাদী, সাক্ষী ইত্যাদিকে প্রশ্ন করতেন। প্রাড়বিবাক ছাড়া তিন জন মত বিচারক/ধর্মাধিকারী নিয়ে এই বিচার সভা। যে সব বিবাদ সম্বন্ধে (মূল ১৮টি) স্পষ্ট শাস্ত্র নির্দেশ থাকত সেগুলি ছাড়াও অন্যান্য বিবাদ বিচারের জন্য উপস্থিত হলে অনুশাসন ছিল শাশ্বত ধর্ম অনুসরণে বিচার করতে হবে। বিচারালয়ে বাদী বিবাদীর কোন প্রতিনিধি গ্রাহ্য হত কিনা স্পষ্ট ঠিক বোঝা যায় না। মনুস্মৃতি ইত্যাদি মতে বিচারপ্রার্থীদের পক্ষে ব্যবহার শাস্ত্রজ্ঞ উকিল বিচার সভাতে যোগ দিতে পারতেন; কিন্তু মেধাতিথি মতে এই উকিলের কোন পক্ষ অবলম্বন করার কোন অধিকার ছিল না। বিচারালয় সত্যাসত্য নির্ণয় করতেন কিন্তু সাধারণত রাজা দণ্ড দিতেন। প্রাচীন যুগে ছোট এবং প্রধান বিচারালয় ইত্যাদি কিছু ভাগ ছিল না মনে হয়। তবে কুল, শ্রেণী, গণ প্রভৃতির নিজ নিজ বিষয়ে বিচার করার অধিকার ছিল; এগুলি যেন মোড়ল বা পঞ্চায়েত বিচার। এই বিচার ব্যবস্থার ক্রমান্বয় ছিল অর্থাৎ এক জনের কাছ থেকে আর এক জনের কাছে বা এক জনের পরিবর্তে পক্ষপাতিত্বের কারণে আর এক জনের কাছে বিচার প্রার্থনা করা যেতে পারত। সব কিছুর ওপরে ছিলেন রাজা। এই সব কুল প্রভৃতির বিচারে পরাজিত হলে রাজা পুনর্বিচার করতে পারতেন। ধর্মাধিকরণে অন্যায় বিচার হলেও রাজার পুনর্বিচারের অধিকার ছিল। অন্যায় বিচার করলে প্রাড়্‌বিবাক বা ধর্মাধিকারীর দণ্ড হত।

ধাতৃ—সৃষ্টিকর্তা। ঋক্‌বেদের পরবর্তী স্তোত্রে এঁর বিশেষ কোন গুণাবলীর উল্লেখ নাই। সৃষ্টি ও স্বাস্থ্য রক্ষার কাজে সব সময় নিযুক্ত। বিবাহে ঘটক, জন্মদাতা,

গৃহকর্তা এবং ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধার কর্তা হিসাবে দেখা যায়। ইনি এক জন আদিত্য; খাণ্ডব দাহনে কৃষ্ণানুর্জুনকে বাধা দিয়েছিলেন। পুরাণে ইনি প্রজাপতি বা ব্রহ্মাতে পরিণত। বিষ্ণু পুরাণে ভৃগুর ছেলে ধাতা (স্ত্রী আয়তি), বিধাতা (স্ত্রী নিয়তি) এবং মেয়ে লক্ষ্মী (স্বামী বিষ্ণু)। ধাতার ছেলে প্রাণ, প্রাণের ছেলে দ্যুতিমান, দ্যুতিমানের ছেলে রাজবান···ইত্যাদি।

ধাত্রীবিদ্যা—চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসা শাস্ত্রে স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি পরিচর্যার বিবরণ রয়েছে। প্রসব কার্যে বিশেষ যন্ত্রপাতিও ব্যবহার হত। এদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে 'যুগ্মপত্র' অস্ত্র।

ধারণ—দ্রঃ রাজযোগ।

ধারিণী—পিতৃদেবগণ ও স্বধার বড় মেয়ে মেনা, ছোট ধারিণী, দু জনেই বেদজ্ঞ।

ধুন্দু—দনুর ছেলে। ব্রহ্মার তপস্যা করে দেবতাদের অবধ্য হবার বর পান। চতুর্থ কলিযুগের আরম্ভে হিরণ্যকশিপুর রাজত্বকালে স্বর্গে দেবতাদের তাড়িয়ে দিয়ে বাস করতে থাকেন। এবং হিরণ্যকশিপুও এই সময়ে মন্দর পর্বতে ধুন্দুর অনুচর হয়ে বাস করেছিলেন। দেবতারা ব্রহ্মলোকে গিয়ে বাস করতে থাকেন। শুক্রের কাছে ধুন্দু শোনেন ইন্দ্র ১০০ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন। ধুন্দু ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে থাকেন; দেবতারা ভীত হয়ে পড়ে বিষ্ণুর কাছে এসে কিছু একটা করবার জন্য প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু তখন বামন রূপ ধরে দেবিকা জলাতে এসে একটুকরো শুষ্ক কাঠের মত ভাসতে থাকেন। ধুন্দু ও মুনিরা দেখেন বামন ডুবছেন আবার ভেসে উঠছেন। জল থেকে এঁরা বামনকে তোলেন এবং জানতে চানএখানে তিনি কি করে এলেন। বামন জানান বরুণের বংশে প্রভাস নামে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের তিনি ছোট ছেলে; নাম গতিভাস। পিতার মৃত্যুর পর ভাইদের সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ করতে চাইলে বড় ভাই এই জলে ফেলে দিয়েছেন। পুরোহিতরা তখন ধুন্দুকে বলেন বামনকে অর্থ সম্পত্তি ও দাস-দাসী দিতে। বামন নিতে চান না; অর্থ সম্পত্তি তাঁকে আবার কোন জলায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে। বামন বরং ত্রিপাদ ভূমি চান। ধুন্দু ত্রিপাদ ভূমি দিতে সম্মত হলে বামন স্বর্গ ও মর্ত অধিকার করেন এবং তৃতীয় পদ রাখার স্থান না পেয়ে এই পায়ের আঘাতে গভীর গর্তে ধুন্দুকে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে কালিন্দীর জলে অন্তর্হিত হয়ে যান। (২) মধু কৈটভের ছেলে। তপস্যায় ব্রহ্মার বরে সকলের অবধ্য হয়ে ওঠেন এবং পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টায় দেবদানব সকলের ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ান। উত্তঙ্ক ঋষির আশ্রমের কাছ মরু/মরুধন্ব প্রদেশে উজ্জালক নামে এক বালু-ময় মরুভূমিতে বালির নীচে বাস করতেন। বৎসরান্তে এক বার জেগে উঠে নিশ্বাস ফেলতেন তাতে চন্দ্র সূর্য পর্যন্ত ধূলি, ধোঁয়া ও অগ্নিশিখাতে ঢেকে যেত এবং এক সপ্তাহ ধরে ভূমিকম্প হত। চার দিকে বহু ক্ষতি হত। উত্তঙ্ক/উত্তানক মুনিই সব চেয়ে বিপন্ন হয়ে পড়তেন। বিষ্ণু এক দিন দেখা দিলে মুনি ধুন্দুর শাস্তির কথা বলেন। বিষ্ণু বলে যান কুবলাশ্বের হাতে নিহত হবে। উত্তঙ্ক তখন কুবলাশ্বের (দ্র) শরণ নেন।

ধুন্দুমার—কুবলাশ্ব।

ধূমকেতু—জীবকুল নাশের জন্য ব্রহ্মা এক সুন্দরী নারী মৃত্যুকে সৃষ্টি করে জীবদের নিহত করতে বলেন। কিন্তু এই নারী অসম্মত হয়ে কাঁদতে থাকেন; চোখের জলের

ফোঁটাগুলি এক একটি রোগে পরিণত হতে থাকে। এই দেখে মৃত্যু তখন তপস্যা করতে থাকেন। ব্রহ্মা তখন আশীর্বাদ করে বলেন জীবদের আর নিধন করতে হবে না। মৃত্যু তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন এবং এই নিশ্বাস ধূমকেতুতে পরিণত হয়।

ধূমাবতী—দশ মহাবিদ্যার এক জন। তন্ত্রে আছে ক্ষুধিত হয়ে পার্বতী এক বার মহাদেবের কাছে খাদ্য চেয়ে না পেলে ক্ষুধায় মহাদেবকেই গ্রাস করে ফেলেন। এই সময় পার্বতীর দেহ থেকে ধোঁয়া বার হয়ে পার্বতীকে বিবর্ণ করে দেয়। মায়াতে মহাদেব শরীর কাঁপিয়ে বলেন স্বামীকে খেয়ে বিধবা হয়ে বিধবা বেশেই থাকতে হবে। এই বেশে ধূমাবতী নামে সকলের পূজা পাবেন। এই চেহারা :- রুক্ষ, মলিন বসনা, বিবর্ণ কুন্তলা, বিরল দন্তা, বিলম্বিত পয়োধরা, দীর্ঘনাসা, চঞ্চলা, রুষ্টা, কলহপ্রিয়া, দীর্ঘা, নিত্যবুভুক্ষিতা। দুটি হাত, এক হাতে কুলা ও এক হাতে বর। রথারূঢ়া, রথের ধ্বজাতে কাক।

ধূম্র—বানর দলপতি জাম্ববানের ভাই। লঙ্কাতে যুদ্ধে বহু রাক্ষস বিনাশ করেন।

ধূম্রকেশ—রাবণের মন্ত্রী। অপর নাম ধূম্রাক্ষ (দ্রঃ) বা ধূম্রলোচন। সুমালি কেতুমতী সন্তান। লঙ্কার যুদ্ধে হনুমানের হাতে মৃত্যু।

ধূম্রবর্ণ—এক নাগরাজ। যাদব বংশের আদি পুরুষ যদু এক বার সমুদ্র ভ্রমণে গেলে এই নাগ এঁকে নাগেদের রাজধানীতে নিয়ে যান। যদু এখানে ধূম্রবর্ণের পাঁচ মেয়েকে বিয়ে করেন। এই থেকে নাগেদের পাঁচটি বংশের উৎপত্তি।

ধূম্রলোচন—শুম্ভ দৈত্যের সেনাপতি। ভগবতী রূপসী মূর্তি ধরে বলেছিলেন যে তাঁকে জয় করতে পারবে তার গলায় তিনি মালা দেবেন। এই কথা শুনতে পেয়ে দেবীকে বেঁধে আনবার জন্য শুম্ভ ধূম্রলোচনকে ষাট হাজার সৈন্য সমেত পাঠান। কিন্তু দেবীর হুঙ্কারে এঁরা সকলেই মারা পড়েন।

ধূম্রা—দক্ষের এক মেয়ে। ধর্মের স্ত্রী ; ছেলে ধ্রুব ও ধর।

ধূম্রাক্ষ—রাবণের এক সেনাপতি। নাগপাশ থেকে রাম লক্ষ্মণ মুক্তি পেলে রাবণ এঁকে যুদ্ধে পাঠান। পাহাড়ের আঘাতে হনুমান এঁর মাথা চূর্ণ করে দেন।

ধৃতদেবা—দেবকের মেয়ে। বসুদেবের স্ত্রী। ছেলে হয় বিপৃষ্ট।

ধৃতবর্মা—ত্রিগর্ত রাজ কেতুবর্মার ছেলে। সূর্যবর্মা, কেতুবর্মা, ও ধৃতবর্মা এরা তিন ভাই। বড় ভাই সূর্যবর্মা অশ্বমেধের ঘোড়া ধরলে যুদ্ধ হয়। কেতুবর্মা ও সূর্যবর্মা মারা গেলে ইনি অর্জুনের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করে পরে বশ্যতা স্বীকার করেন।

ধৃতরাষ্ট্র—(১) চন্দ্রবংশে শান্তনুর দ্বিতীয় স্ত্রী সত্যবতীর বড় ছেলে চিত্রাঙ্গদ ছোট বিচিত্রবীর্য। বিচিত্রবীর্যের দুই স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকা। বিয়ের অল্পকাল পরে বিচিত্রবীর্য ক্ষয় রোগে মারা যান। সত্যবতী তখন ব্যাসের ঔরসে অম্বিকা ও অম্বলিকার ক্ষেত্রজ সন্তানের ব্যবস্থা করেন। ব্যাসের মূর্তি দেখে অম্বিকা ভয় পান এবং চোখ বুজিয়ে থাকেন। ফলে তাঁর ছেলে অন্ধ হয়ে জন্মায় ; নাম দেওয়া হয় ধৃতরাষ্ট্র। ভীষ্মের কাছে পালিত হন। অন্ধ বলে রাজা হন নি ; ছোট ভাই পাণ্ডু রাজা হন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্বল মতি কিন্তু প্রাজ্ঞচক্ষু এবং ব্যাসের বরে শতহস্তীর সমান বলশালী। পাণ্ডু রাজা হলেও বনে চলে গিয়েছিলেন এবং অল্প বয়সে মারা যান। ফলে ধৃতরাষ্ট্র রাজা না হলেও সারা জীবন রাজকার্য পরিচালনা করেছিলেন। দ্রঃ হংস।

ধৃতরাষ্ট্রের বয়স হলে ভীষ্ম গান্ধারীর সন্ধান পান এবং জানতে পারেন শিবের বরে তার এক শত ছেলে হবে। গান্ধারীর পিতা রাজা সুবলের কাছে ভীষ্ম দূত পাঠান ; সুবল অন্ধ জামাতাকে ঠিক পছন্দ না করলেও বংশ পরিচয়ে বিয়েতে সম্মত হন। দুর্যোধন ইত্যাদি একশ ছেলে এবং দুঃশলা নামে একটি মেয়ে হয়। গান্ধারীর গর্ভকালে এক বৈশ্যা নারী রাজার সেবা করতেন। ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে এই বৈশ্যার গর্ভে আর একটি ছেলে হয় যুযুৎসু। দুর্যোধন এঁদের মধ্যে বড়। দুর্যোধনের জন্মের সময় বহু কুলক্ষণ দেখা দিতে থাকে সকলে এই ছেলেকে ত্যাগ করতে বলেন কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তা পারেন নি।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদেরও অভিভাবক হন এবং ভীষ্মের সঙ্গে একত্রে সব কিছু দেখাশোনা করতেন। দুর্যোধন কিন্তু পাণ্ডবদের সব সময়ই উচ্ছেদ করতে চাইতেন এবং ধৃতরাষ্ট্র এই সব বিষয়ে নিজের ছেলেদের বহুদিক থেকে সমর্থনই করতেন। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়েই পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠান। পাণ্ডবদের শ্রীবৃদ্ধিতে মনে মনে তিনি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। জতুগৃহে পাণ্ডবদের মৃত্যু সংবাদে ধৃতরাষ্ট্র বাইরে শোকার্ত দেখান এবং এঁদের শ্রাদ্ধেরও ব্যবস্থা করেন। দ্রৌপদীর বিয়ের খবর পেয়ে অন্তরে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রথম খবর পেয়ে মনে করেছিলেন দুর্যোধন বিয়ে করেছেন এবং আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত খবর জানতে পেরে সন্তুষ্ট হবার ভাণ করেন। দুর্যোধন তখনই পাণ্ডবদের বিনাশ করবার পরামর্শ দেন কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র দোলায়িত চিত্ত হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত ভীষ্ম ইত্যাদির পরামর্শে পাণ্ডবদের ফিরিয়ে এনে অর্দ্ধরাজ্য (মহা ১।১৯৯।২৫) দিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করার ব্যবস্থা করে দেন। দুর্যোধন কপট পাশা খেলার ব্যবস্থা করলে প্রথমে সৎ পরামর্শ দিলেও পুত্রস্নেহে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ সম্মতি দিয়েছিলেন এবং বিদুরকে দিয়ে পাণ্ডবদের ডাকিয়ে পাঠান। এই সময়ে গান্ধারী ও বিদুরের পরামর্শও উপেক্ষা করেছিলেন। প্রথম খেলায় পাণ্ডবরা যখন ক্রমশ সর্বস্বান্ত হচ্ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র তখন ক্রমশ উল্লসিত হয়েছিলেন এবং দ্রৌপদীকে পণ রেখে খেলা আরম্ভ হলে স্পষ্ট উল্লাসে বিচলিত হয়ে পড়েন। পাশাতে কৌরবরা দ্রৌপদীকে জিতেছে জেনে আনন্দিতই হয়েছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতেই দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা হন ; অথচ তিনি কোন বাধা দেন নি। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে বিদুর, বিকর্ণ ইত্যাদির প্রতিবাদে এদের সকলকে মুক্তি দেওয়া ও রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। এর পরই দ্বিতীয় বার পাশা খেলার প্রস্তাবে আবার সম্মতি দিয়েছিলেন। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ছেলেদের কোন বাধা দেন নি। পাণ্ডবরা হেরে গিয়ে বনে চলে যান। ধৃতরাষ্ট্র এই সময় অস্থির-চিত্তে বিদুরের কাছে সকলের মঙ্গলার্থে পরামর্শ চান। যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া এবং দুর্যোধনকে নিগৃহীত করার পরামর্শ দিলে বিদুরকে তিনি তিরস্কার করেন এবং স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে বলেন। ফলে বিদুর পাণ্ডবদের কাছে চলে যান ; অনুতপ্ত হয়ে পরে অবশ্য সঞ্জয়কে দিয়ে বিদুরকে ফিরিয়ে আনেন। ব্যাসদেবও পরে সৎপরামর্শ দিয়েছিলেন ; কিন্তু স্নেহান্ধ পিতা তা নেন নি। ঘোষ যাত্রাতেও শেষ পর্যন্ত মত দিয়েছিলেন। অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবরা রাজ্য ফিরে চাইলে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে দিয়ে

পাণ্ডবদের কাছে শান্তি ভিক্ষা করেন কিন্তু রাজ্য ফিরিয়ে দেবার কথা বাদ দিয়ে যান। বিদুরকে আবার পরামর্শে ডাকেন এবং স্বীকার করেন দুর্যোধন কাছে এলেই তাঁর বুদ্ধি নষ্ট হয়, অন্যায় করে বসেন। সন্ধির প্রস্তাব আসে পাণ্ডব পক্ষ থেকে; দুর্যোধনকে তিরস্কার করে ধৃতরাষ্ট্র সন্ধি করতেই বলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কর্ণ ইত্যাদির কথায় আবার চুপ হয়ে যান। মধ্যস্থতার জন্য কৃষ্ণ এলে ধৃতরাষ্ট্র নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে গান্ধারীকে দিয়ে দুর্যোধনকে বোঝাতে চেষ্টা করেন কিন্তু সম্ভব হয় নি। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় সঞ্জয় রাজাকে সমস্ত ঘটনা শোনাতেন। এ সময়ে আত্মপক্ষের পরাজয় শুনলেই বিচলিত হয়ে পড়তেন। এই সময় সঞ্জয় স্পষ্ট মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর পুত্র স্নেহ, পক্ষপাত, পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষ, কুটিল মনোভাব এবং ন্যায় পরায়ণতার অভাবই কুরুক্ষেত্রে বংশনাশের কারণ। অর্জুন জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা করেছেন শুনে ধৃতরাষ্ট্র ভয়ে চিৎকার করে ওঠেন। সাত্যকি যখন কুরু সৈন্য ধ্বংস করেন ধৃতরাষ্ট্র তখন দুঃখে বাক্যহীন হয়ে পড়েন। কর্ণের পতন শুনে ধৃতরাষ্ট্র অজ্ঞান হয়ে যান। শল্য ও দুর্যোধন মারা গেছে শুনেও আবার ধৃতরাষ্ট্র পড়ে যান এবং কাঁদতে থাকেন। যুদ্ধের শেষে শোকাকুল রাজাকে সঞ্জয় সান্ত্বনা দেন। এর পর গান্ধারী ইত্যাদি মহিলাদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে এসে অসন্তুষ্ট মনেই যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করেন এবং ভীমকে খুঁজতে থাকেন। কৃষ্ণ তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে এক আয়সী মূর্তি (যুগটি একটি মতে তাম্র যুগ ছিল) এগিয়ে দেন। আলিঙ্গনে মূর্তিটি চূর্ণ করে ফেলে বুকে চাপ পড়ায় রক্ত বমি করতে করতে বসে পড়ে ভীমের জন্য শোক করতে থাকেন। এটি তাঁর কপটতার চরম পরাকাষ্ঠা। কৃষ্ণ তখন ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিয়ে পঞ্চপাণ্ডবকে তাঁর সামনে এনে হাজির করেন। ধৃতরাষ্ট্র তারপর শ্রাদ্ধশান্তি করার জন্য পাণ্ডবদের নির্দেশ দেন।

পাণ্ডবরা রাজা হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে স-সম্মানে রাজপ্রাসাদে রেখে দিলেও ভীমের প্রচ্ছন্ন বিরোধিতা ও অপমান সহ্য করতে না পেরে পনের বছর পরে বনে যাবার জন্য যুধিষ্ঠিরের অনুমতি চান। যুধিষ্ঠির রাজি হন নি; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র অনশন কর-ছিলেন এবং কথা বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন; ফলে যুধিষ্ঠির বাধ্য হয়ে অনুমতি দেন। যুধিষ্ঠিরের কাছে অর্থ চেয়ে নিয়ে মৃত যোদ্ধাদের শ্রাদ্ধ শান্তি করেন এবং প্রচুর দান করেন; তার পর প্রজাদের অনুমতি নিয়ে এবং দুর্যোধনের জন্য প্রজাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে গান্ধারীকে নিয়ে বনে চলে যান; কুন্তী, সঞ্জয় ও বিদুর সঙ্গে যান। এটা ছিল কার্তিক মাস। গঙ্গাতীরে মহর্ষি শতযূপের আশ্রমের কাছে কিছু দিন বাস করেন। এখানে এক দিন ব্যাসদেব এসে কুন্তীর অনুরোধে যুদ্ধে নিহত সকলকে ভাগীরথী তীরে এক দিনের জন্য জীবিত করে তোলেন এবং এঁদের দেখবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু দান করেন। পাণ্ডবরা ও প্রজারা দেখা করেতে এসেছিলেন। গঙ্গাতীরে বায়ুভুক হয়ে ছয় মাস ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয় কঠোর তপস্যা করে কুরুক্ষেত্রে এসে বাস করতে থাকেন। এক দিন গঙ্গাস্নান করে আশ্রমে ফিরবার সময় চারদিকে দাবাগ্নি জ্বলে ওঠে। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে-ছিলেন; পালাবার ক্ষমতাও ছিল না। রাজা তখন সঞ্জয়কে আত্মরক্ষার নির্দেশ দিয়ে নিজেরা তিন জনে সমাধি মগ্ন হন (মহা ১৫।৪৫।৩১) এবং সমাধি অবস্থাতে

দাবদাহে এঁদের মৃত্যু হয় এবং কুবের লোক প্রাপ্ত হন। (২) মুনি ও কশ্যপ পুত্র। এক জন গন্ধর্ব। এই গন্ধর্বই দুর্যোধনের পিতা হয়ে জন্মান। (৩) কদ্রু কশ্যপ সন্তান। বরুণের সভায় বাস করেন। পৃথু রাজার সময়ে নাগেরা যখন পৃথিবীকে দোহন করেন তখন এই ধৃতরাষ্ট্রই দোহন করেছিলেন। এই ধৃতরাষ্ট্রই একবার শিবের রথে স্থান পান। দেহ ত্যাগের পর বলরামের আত্মা পাতালে এলে ধৃতরাষ্ট্র ইত্যাদি নাগেরা তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। (৪) বাসুকির ছেলে। পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় অর্জুন যখন মণিপুরে যুদ্ধে মারা যান তখন বভ্রু নাগলোকে মৃত সঞ্জীবনী মণি নিতে আসেন। বাসুকির ভাণ্ডারে মণি রক্ষক হিসাবে এই ধৃতরাষ্ট্র অবস্থান করে-ছিলেন। বভ্রুর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের তীব্র যুদ্ধ হয় তবে মণি সংগ্রহ করতে পারেন। এই ধৃতরাষ্ট্র অর্জুন জীবিত হক চাইছিলেন না; ফলে নিজের ছেলেদের দিয়ে অর্জুনের মাথা দালভ্যের আশ্রমে লুকিয়ে রাখেন।

ধৃতরাষ্ট্রী—তাম্রা ও কশ্যপ কন্যা। ধৃতরাষ্ট্রীর সন্তান রাজহংস ও লাল হাঁস।

ধৃতি—(১) দক্ষের মেয়ে; ধর্মের স্ত্রী। ধৃতি ও ধর্মের সন্তান নিয়ম। পর জন্মে মাদ্রী হয়ে জন্মান; নকুল ও সহদেবের মা। (২) বিদেহ রাজ বীতহব্যের ছেলে। বিচিত্র-বীর্যের সমকালীন; ধৃতির ছেলে বহুলাশ্ব।

ধৃষ্টকেতু—(১) চেদিরাজ শিশুপালের ছেলে। আগের জন্মে হিরণ্যকশিপুর ছেলে অনুহ্লাদ ছিলেন। শিশুপালের পর রাজা হন। ধৃষ্টকেতুর বোন করেণুমতি, নকুলের স্ত্রী। পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। জয়দ্রথ যে দিন মারা যান সে দিন অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে ছিলেন। দ্রোণাচার্যের গতি রোধ করতে গেলে ত্রিগর্ত রাজ সুশর্মার ছেলে বীরধম্বা ধৃষ্টকেতুকে বাধা দেন এবং নিহত হন। বহুক্ষণ তারপর যুদ্ধ করে দ্রোণের হাতে ধৃষ্টকেতু মারা যান। মৃত্যুর পর বিশ্বদেবে পরিণত হন। ব্যাসের আহ্বানে মৃত যোদ্ধাদের সঙ্গে ইনিও দেখা দিতে এসেছিলেন। (২) দ্রুপদের নাতি, ধৃষ্টদ্যুম্নের ছেলে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—(দ্রোণ দ্রঃ) অর্দ্ধেক পাঞ্চাল অর্জুনের (দ্রঃ) সাহায্যে আদায় করে নিলে অপমানিত দ্রুপদ দ্রোণকে বধ করার জন্য যজ্ঞ করেন। যজ্ঞাগ্নি থেকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর জন্ম। কবচ ও অস্ত্র ধারণ করেই এঁর জন্ম এবং অগ্নি থেকে বার হয়েই রথে উঠে বসেন যেন তখনই দিগ্বিজয়ে যাবেন। এবং দৈববাণী হয় এই ছেলে দ্রোণকে নিধন করবেন। দ্রুপদ এঁকে পালন করেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্মের কারণ সকলেই জানতেন; দ্রোণও জানতেন। তবু দ্রোণই এঁকে অস্ত্র শিক্ষা দেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে দ্রৌপদীকে সভাতে নিয়ে আসেন এবং স্বয়ংবর পরিচালনা করেন। পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণবেশী হলেও ধৃষ্টদ্যুম্নের সন্দেহ ছিল এবং নিশ্চিত হয়ে দ্রুপদকে সান্ত্বনা দিয়ে-ছিলেন দ্রৌপদী বোধহয় অপাত্রে পড়েনি; ছন্নাঃ ধ্রুবং তে প্রচরন্তি পার্থাঃ (মহা ১।১৮৫।১৩)। পাণ্ডবরা বনে গেলে ধৃষ্টদ্যুম্ন বোনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং দ্রৌপদীর ছেলেদের নিয়ে নিজের দেশে ফিরে যান। কাম্যক বনেও পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে এসে ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নিশ্চিত হয়ে উঠলে ইনি পাণ্ডব সেনা বাহিনীকে শিক্ষিত করে তুলতে থাকেন। পাণ্ডবদের সাত জন কুশলী রণনায়কের এক জন। তীব্র যুদ্ধ করেছিলেন এবং ইনিই দ্রোণের (দ্রঃ)

মাথা কেটে নিয়ে আসেন। এতে পাণ্ডব পক্ষে সকলেই তাঁকে তিরস্কার করেন। এমন কি সাত্যকির সঙ্গে হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়। কৃষ্ণ ইত্যাদির চেষ্টায় মিটমাট হয়। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর রাত্রিবেলা অশ্বত্থামা পাণ্ডব শিবির আক্রমণ করে লাথি মেরে নৃশংস ভাবে এঁকে হত্যা করেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের আত্মা অগ্নিতে গিয়ে প্রবেশ করে। তিন ছেলে : ক্ষত্রবর্মা (দ্রঃ), ক্ষত্রঞ্জয় ও ক্ষত্রধর্মা।

ধেনুক—এক জন রাক্ষস। কংসের অনুচর। বৃন্দাবনের কাছে থাকতেন। এঁর এলাকাতে ভয়ে কেউ যেতেন না। এক বার গরু নিয়ে এই জন শূন্য স্থানে/তাল বনে কৃষ্ণ বলরাম আসেন এবং তাল পাড়তে থাকেন। ধেনুক তখন তীব্রভাবে আক্রমণ করেন এবং বলরামকে কামড়াতে থাকেন। বলরাম এর পা ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে তাল গাছে আছাড় মেরে হত্যা করেন। অন্য মতে ধেনুক ধেনু রূপে এঁদের গরুর পালে এসে ঢুকেছিলেন এবং মারা পড়েন।

ধৌম্য—(১) মহর্ষি অসিতের ছেলে ও দেবলের ছোট ভাই। জতুগৃহ থেকে মুক্তি পাবার পর অর্জুনের হাতে চিত্ররথ পরাজিত হয়ে বন্ধুতা করেন। চিত্ররথের পরামর্শে উৎকোচক তীর্থে তপস্যারত ধৌম্যকে পাণ্ডবরা নিজেদের পুরোহিত করেন (মহা ১।১৭৪।২)। এর পর পাণ্ডবদের জীবনের সঙ্গে ইনি যেন মিশে যান। পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে দ্রৌপদীর পৃথক পৃথক ভাবে বিয়ে দেন। পাণ্ডবদের সন্তান হলে এদের উপনয়ন ইত্যাদি করেন। রাজসূয় যজ্ঞে প্রধান পুরোহিত ছিলেন এই ধৌম্য। পাণ্ডবরা বনবাস যাবার সময় ইনি হাতে কুশ নিয়ে মন্ত্রপাঠ করতে করতে পথ দেখিয়ে এগিয়ে যান এবং বহু মূল্যবান উপদেশ দেন। নারদের কাছে সূর্যের একটি স্তব লাভ করে যুধিষ্ঠিরকে এটি শিখিয়ে দেন। এই স্তবের দ্বারা যুধিষ্ঠির অক্ষয় স্থালী (দ্রঃ দ্রৌপদী) লাভ করেন। বনে কির্মীর রাক্ষসের মায়াজাল নষ্ট করেন। জয়দ্রথ পাঞ্চালীকে চুরি করলে ধৌম্য একে উদ্ধার করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। বিরাট নগরে কি ভাবে অজ্ঞাত বাসে থাকতে হবে ইত্যাদি বহু উপদেশ দিয়েছিলেন এবং অজ্ঞাতবাসে যাবার মুহূর্তে এঁদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য যজ্ঞ করে আশীর্বাদ করেন। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় বাধ্য হয়ে দ্রুপদের আশ্রয়ে বাস করতেন। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পর ইনি শ্রাদ্ধ শান্তি করেন। (২) আয়োদ্-ধৌম্য ইত্যাদি নামে এক জন ঋষি। আরুণি, উপমন্যু ও বেদ এঁর তিনটি শিষ্য। অন্য মতে উপমন্যুর ভাই। সত্যবানের পিতা দ্যুমৎসেনের পরিচিত ছিলেন। (৩) সত্যযুগে ব্যাঘ্রপদ ঋষির ছেলে। বড় ভাই উপমন্যু। এই উপমন্যু একদিন দুধ দোওয়া দেখে মার কাছে গিয়ে দুধ খেতে চান। মা দুধ দিতে পারেন না; উপদেশ দেন অভীষ্ট বস্তু পেতে হলে মহাদেবের উপাসনা করতে হবে। ফলে উপমন্যু কঠোর তপস্যা করেন এবং মহাদেবের বরে অজর অমর ও দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন হন। সামান্য দুধের জন্য তপস্যা করেছিলেন বলে উপমন্যু চাইলেই তাঁর সামনে ক্ষীর সমুদ্র আবির্ভূত হত। মহাদেব স্থায়ীভাবে তাঁর আশ্রমে বাস করতেন। এক কল্প পরে উপমন্যু মহাদেবে গিয়ে লীন (উপযাস্যসি, মহা ১৩।১৪।১৯৪) হয়ে যান।

ধ্রুব—রাজা উত্তানপাদের (দ্রঃ) ছেলে মা উপেক্ষিতা সুনীতি। এক দিন বৈমাত্রেয় ভাই উত্তম রাজার কোলে বসে ছিল ধ্রুবও সেই সময় কোলে উঠতে চান। কিন্তু বিমাতা সুরুচি অপমান করে তাড়িয়ে দেন। ধ্রুব নিজের মাকে জানালে সুনীতি সান্ত্বনা দিয়ে

উপদেশ দেন এক মাত্র হরিই দুঃখ মোচন করতে পারেন। পাঁচ বছরের বালক ব্যাকুল হয়ে ওঠেন ; এমন একটি স্থান চান যেখানে তাঁর পিতাও যেতে পারবেন না। এবং রাত্রিতে গভীর বনে গিয়ে হরিকে খুঁজতে থাকেন। ক্রমাগত পূব দিকে এগোতে এগোতে সপ্তর্ষিদের দেখতে পান এবং এ পর্যন্ত যে স্থান কেউ কোন দিন পাননি সেই রকম স্থান পাবার বাসনা ব্যক্ত করেন। এঁরা বিষ্ণুর আরাধনা করতে বলেন। ধ্রুব তখন যমুনা তীরের মধুবনে কঠোর তপস্যা করেন। সুনীতি বালককে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেও বিফল হন। দেবতারা প্রথমে ভীত হয়ে তপস্যা ভাঙতে চেষ্টা করেন এবং বিফল হয়ে বিষ্ণুর শরণ নেন। বিষ্ণু এসে দেখা দিলে ধ্রুব বর চান চির দিন তিনি যেন হরির স্তব করতে পারেন। বিষ্ণু তখন ধ্রুবের পরম স্থান পাবার বাসনার কথা মনে করিয়ে দেন এবং বলেন আগের জন্মে ধ্রুব এক ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। বন্ধু এক রাজপুত্রকে দেখে রাজপুত্র হতে চেয়েছিলেন। এই জন্য এ জন্মে রাজপুত্র হয়ে জন্ম। উপস্থিত তপস্যা করে ধ্রুব মুক্তি পেয়েছেন এবং ধ্রুবের কামনা মতই চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা সব কিছুর উর্দ্ধে ধ্রুবলোকে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট করে দেন॥ এর পর ধ্রুব পিতার রাজ্যে রাজা হন। ধ্রুবের স্ত্রী প্রজাপতি শিশুমার কন্যা ব্রাহ্মী ; এঁর দুটি ছেলে হয় কল্প ও বৎসর। ধ্রুবের দ্বিতীয়া স্ত্রী বায়ুর কন্যা ইলা ; ছেলে হয় উৎকল। আর এক স্ত্রী শম্ভু এবং এঁর দুটি ছেলে শিষ্টি ও ভব্য। ধ্রুবের ভাই উত্তম এক যক্ষের হাতে নিহত হয়েছিলেন ; ধ্রুব তখন কুবের লোক আক্রমণ করে পরাজিত করেছিলেন। কুবের তখন দেখা দিয়ে ধ্রুবকে আশীর্বাদ করে বিমানে করে ধ্রুব লোকে স্থাপন করে আসেন। অন্য মতে মৃত্যুর পর বিষ্ণু দত্ত ধ্রুব লোকে নক্ষত্র রূপে অবস্থান করেন। জননী সুনীতিও নক্ষত্র হয়ে কাছেই অবস্থান করেন। স্বর্গে বিষ্ণুপাদ নামে পরিচিত অংশে এই ধ্রুবলোক। (২) নহুষের একটি ছেলে ; যযাতির ভাই। (৩) ধর্ম ও স্ত্রী ধূম্রার ছেলে।

ধ্রুবতারা—লঘু সপ্তর্ষি শিশুমার গত একটি উজ্জ্বল তারা।

ন

নকুল—পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র ; ৪-র্থ পাণ্ডব। মাদ্রীর (দ্রঃ) গর্ভে অশ্বিনীকুমার দুজনের ঔরসে এঁর ও সহদেবের জন্ম। অত্যন্ত সুপুরুষ। কুলে এত সুন্দর কেউ নন বলে নাম ন-কুল। মাদ্রী সহমৃতা হন ; সকলে হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন এবং কুন্তীর কাছে পালিত হন। শতশৃঙ্গ পর্বতে মুনিরা নকুলের জাতকর্ম করেছিলেন। বসু-দেবের পুরোহিত কশ্যপ উপনয়ন করান ; রাজর্ষি শুক বাল্যকালে ধনুর্বেদ ও অসিবিদ্যা শেখান পরে দ্রোণের কাছে অস্ত্রশিক্ষা ; এবং অসি যুদ্ধে পারদর্শী হন। বিচিত্র যুদ্ধ করতে পারতেন ফলে নাম হয়েছিল অতিরথ ও চিত্রযোধী। জতুগৃহ থেকে বার হয়ে গঙ্গাতীরে পৌছলে নকুল ও সহদেব ক্লান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়লে ভীম এঁদের বগলে করে নিয়ে যান। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর এক জন ; ছেলে হয় শতানীক। এঁর অপর

স্ত্রী চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুর বোন করেণুমতী, ছেলে নিরমিত্র (মহা ১।৯০।৮৬)। রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্‌কালে নকুল পশ্চিম দিকে দশার্ণ, মালব, ত্রিগর্ত ও পঞ্চনদ প্রভৃতি দেশ জয় করেন। নকুলের পাঠান দূতের কাছে কৃষ্ণাদি যাদবরাও বশ্যতা স্বীকার করেন। শাকলে গিয়ে মামা মদ্ররাজ শল্যের কাছে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। ম্লেচ্ছাদি জাতিদের জয় করে হাজার করভের পিঠে বোঝাই ধনরত্ন নিয়ে ফিরে আসেন। যজ্ঞের পর নকুল রাজা সুবল ও তাঁর ছেলেদের গান্ধারে পৌঁছে দিয়ে আসেন। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ইনিও বনে যান। বনে নকুল দুঃখে গায়ে মাটি মেখে বসে থাকতেন। ঘোষযাত্রায় দুর্যোধনদের উদ্ধার করার জন্য ইনিও ভাইদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। বনে জটাসুর একবার নকুলকে ধরে নিয়ে পালান। জয়দ্রথের হাত থেকে দ্রৌপদীকে উদ্ধার করবার সময় (মহা ৩।২৫৫।১৭) বনে ক্ষেমংকর, মহামুখ, ও সুরথকে নিহত করেন। ব্রাহ্মণের অরণি-মন্থ উদ্ধারের জন্য পাঁচ ভাই বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লে নকুল ভাইদের জন্য তূণে করে জল আনতে গেলে জলাশয়ের তীরে বকরূপী ধর্ম তাঁকে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জল পান করতে নিষেধ করেন। নকুল এই নিষেধ অগ্রাহ্য করলে তখনই মারা যান। পরে মৃত ভাইদের মধ্যে যে কোন এক জনকে ধর্ম জীবন দিতে চাইলে যুধিষ্ঠির প্রথমেই নকুলের জীবন ভিক্ষা চান। অজ্ঞাত বাসের সময় নকুল নিজেকে রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্ব-রক্ষক ও অশ্ব-চিকিৎসক বলে পরিচয় দিয়ে বিরাটের অশ্বশালার ভার নেন। এই সময়ে নকুলের ছদ্মনাম ছিল জয়ৎসেন, ও গ্রন্থিক। অজ্ঞাতবাসের পর গরু চুরির যুদ্ধে ত্রিগর্তরাজের সঙ্গে নকুলের যুদ্ধ হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে মন্ত্রণাকালে কৃষ্ণ যখন দূত হয়ে কৌরবদের কাছে আসছিলেন নকুল তখন তাঁকে কালোচিত কার্য করতে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন প্রথমে মিষ্ট ভাষায় যদি কাজ না হয় তাহলে যেন ভয় দেখাতে কৃষ্ণ কুণ্ঠিত না হন। নকুলের প্রস্তাব ছিল কুরুক্ষেত্রে দ্রুপদরাজ পাণ্ডবদের সেনাপতি হবেন। কুরুক্ষেত্রে নকুল বহু কৌরব সৈন্য নিহত করেন। ষোল দিনের দিন কর্ণের হাতে লাঞ্ছিত ও পরাজিত হন। কুন্তীর কাছে প্রতিজ্ঞা অনুসারে কর্ণ নকুলকে নিহত করেন না। দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলে মারা গেলে উপপ্লব্য নগর থেকে নকুল দ্রৌপদীকে নিয়ে আসেন। অশ্বত্থামার মণি আনার সময় নকুল ভীমের রথে সারথি হয়ে প্রথম বার হয়ে যান। যুদ্ধের পর নকুল যুধিষ্ঠিরকে গার্হস্থ্য ধর্মে উপদেশ দেন। যুধিষ্ঠির যুদ্ধের পর নকুলকে সৈন্যাধ্যক্ষ করে দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে দুর্মদের প্রাসাদে বাস করতেন। অশ্বমেধের সময় ভীম ও নকুলের হাতে নগরী রক্ষার ভার ছিল। ভাইদের সঙ্গে ইনিও মহাপ্রস্থানে যান। সবচেয়ে রূপবান বলে গর্ব ছিল বলে স্বর্গে যেতে পারেন নি। নরক ভোগ করার পর ভাইদের সঙ্গে নকুলও স্বর্গবাস করেন। অশ্বিনীকুমারদের সঙ্গে মিশে যান।

নকুলীশ—লকুলীশ। মহাদেবের ২৮তম ও শেষ অবতার। একটি মতে ইনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি; খৃ-পূ ২ শতকে পশ্চিম ভারতে জন্ম। পাশুপত ধর্ম সম্প্রদায় তৈরি করেন। পুরাণ বর্ণিত কাহিনী অনুসারে কায়াবতারে বা কায়ারোহনে (আধুনিক কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে) কার্বান গ্রামে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। নকুলীশের মূর্তি পূজা কবে প্রচলিত হয় ঠিক হিসাব নাই। ভারতে নানা স্থানে নকুলীশের বহু মূর্তি পাওয়া গেছে। ভুবনেশ্বরের রাজরাণী, মুক্তেশ্বর, শিশিরেশ্বর ইত্যাদি শিব-

মন্দিরের গায়ে নকুলীশের মূর্তির সঙ্গে আরো ৪-টি মূর্তি খোদিত দেখা যায়। সম্ভবত এঁরা নকুলীশের ৪-জন শিষ্য কুশিক, মিত্র, গর্গ, এবং পৌরুষ্য। কালীঘাটে নকুলেশ্বর শিবও এই নকুলীশ।

নক্ষত্র—দ্রঃ তারা। চন্দ্র-কক্ষপথে আকাশের গায়ে চিহ্নিত করার মত এবং চন্দ্র কি বেগে ঘুরছে হিসাবের জন্য ২৭-টি নক্ষত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলি এক একটি নক্ষত্র পুঞ্জ; প্রতিটি পুঞ্জে একটি প্রতিনিধি স্থানীয় তারা আছে—এটি যোগ তারা। এই যোগ তারার নাম অনুসারে নক্ষত্রপুঞ্জটিরও নাম। যেমন অশ্বিনী নক্ষত্রের পুঞ্জটিকে অশ্বিনী বলা হয়। ২৭ দিনের জন্য ২৭-টি নক্ষত্র রয়েছে:-অশ্বিনী-বিটা বা গামা আরিয়েটিস্; ভরণী-৩৫ আরিয়েটিস্, মুস্কা; রোহিণী-আলফা টাউরি, ৫টি তারা, অলডিবারন্; আর্দ্রা-আলফা ওরিয়োলিস্: পুষ্যা-ডেল্টা কাউক্রি; মঘা-আলফা লিয়োনিস্; উত্তর ফাল্গুনী-বিটা লিয়োনিস্; চিত্রা-আলফা ভার্জিনিস, স্পিকা; বিশাখা-আয়োটা লিব্রা; জ্যেষ্ঠা-আলফা স্কর্পি; পূর্বাষাঢ়া ডেল্টা সাজিটারি; শ্রবণা -আলফা একুইলা; শতভিষা-ল্যাম্বডা এক্যোয়ারি; উত্তরভাদ্রপাদ-গামা-পেগাসি; কৃত্তিকা-এটা টাউরি, প্লেইডস্; মৃগশিরা-ল্যাম্বডা ওরিয়োলিস; পুনর্বসু বিটা জেমিনো-রাম; অশ্লেষা-ডেল্টা হাইড্রা; পূর্ব ফাল্গুনী-ডেল্টা লিয়োনিস্; হস্তা-ডেল্টা করভি; স্বাতী-আলফা বুটিস্; আরেটুরাস্; অনুরাধা-ডেল্টা স্কর্পি: মূলা-ল্যাম্বডা স্কোর্পিয়ো-রিস; উত্তরাষাঢ়া-টাউ সাজিটারি; ধনিষ্ঠা-বিটা ডেলফিনি; পূর্বভাদ্রপাদ-আলফা পেগাসি; রেবতী-জিটা পিসসিয়াম। আর একটি বহু উল্লিখিত নক্ষত্র অগস্ত্য-ক্যানোপাস্ এবং বৈদিক যুগে বার বার উল্লিখিত নক্ষত্র অভিজিৎ—আলফা লিরা, ভেগা।

নক্ষত্রকল্প—অথর্ববেদের একটি ভাগ। মুঞ্জকেশ মুনি ভাগ করেন:-নক্ষত্রকল্প (নক্ষত্র পূজা সম্বন্ধীয়), বেদকল্প (ঋত্বিক হিসাবে ব্রহ্মের কাজ), সংহিতা কল্প (মন্ত্রঅংশ), অঙ্গিরসকল্প (অভিচার ও ইন্দ্রজাল) এবং শান্তিকল্প (হস্তী, অশ্ব ইত্যাদির রোগ চিকিৎসা)।

নক্ষত্রযোগ—অশ্বিনী ভরণী ইত্যাদি ২৭-টি নক্ষত্রে বিশেষ বিশেষ দান করলে বিশেষ পুণ্য হয়। যেমন অশ্বিনী নক্ষত্রে রথ ও অশ্ব দান করলে পরজন্মে মহৎ পরিবারে জন্ম হয় ইত্যাদি।

নগর—যেখানে নগ অর্থাৎ অচল আয়তন সৌধগুলি থাকে। প্রাচীন ভারতে নগরের অধীনে অনেক গুলি গ্রাম থাকত। তখন নগর ছিল তিন রকম:-নগর, পত্তন ও খর্বট। নগরের অধীনে থাকত ৮০০ গ্রাম; যেখানে রাজধানী থাকত তাকে পত্তন বলা হত; এবং ২০০ গ্রাম বিশিষ্ট নগরকে খর্বট বলা হত। নগর এক যোজন বা আরো বড় হতে পারত। নগরের আকৃতি চারকোণা, তিনকোণা বা কদাচিৎ গোলাকার হত। নগরের মাঝখান দিয়ে পূর্বপশ্চিমে ও উত্তরদক্ষিণে দুটি রাস্তা থাকত ফলে নগরটি চারটি খণ্ডে ভাগ হয়ে যেত। এই রাজপথগুলির সমান্তরাল সংকীর্ণ আরো অনেক রাস্তা থাকত, ফলে নগরটি ছোট ছোট চারকোনা বহু এলাকাতে বিভক্ত হয়ে পড়ত। সাধারণত নগরগুলি পাথরের প্রাচীর এবং নদী বা সমুদ্র তীরবর্তী হলে কাঠের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত। প্রধান

দুটি রাজপথের প্রান্তে অর্থাৎ মূল চারটি প্রবেশ দ্বার থাকত। দ্বারগুলি কতটা চওড়া হবে ইত্যাদি নির্দিষ্ট ছিল এবং নাম ছিল দক্ষিণে গন্ধর্বদ্বার, পশ্চিমে বরুণ দ্বার, উত্তরে সোমদ্বার এবং পূর্বে সূর্যদ্বার। অন্যান্য পথের প্রান্তেও অনেক ক্ষেত্রে প্রবেশ দ্বার থাকত। পাটলিপুত্র নগরে এই রকম ৬৪-টি প্রবেশ দ্বার ছিল। নগরে চতুর্বর্ণের লোক, অনেক জাতি, অনেক শিল্পী, নৃত্যকার, অভিনয়কারী, নট, গণিকা, মৎস্য-জীবী, সূত্রধর, রাজমিস্ত্রি, মগু ব্যবসায়ী ইত্যাদি এবং সর্ব ধর্মের লোক থাকত। বিভিন্ন বৃত্তির লোক নগরে বিভিন্ন স্থানে বাস করা হত। দেবায়তনগুলি সাধারণত নগরের মধ্যস্থলে হত; এবং আশে পাশে পণ্যবীথি সুবিন্যস্ত ভাবে সাজান থাকত। নগরের এক প্রান্তে শ্মশান ও সমাধিস্থান থাকত। নগর সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত হত; অর্থাৎ অধীনে সমস্ত গ্রামগুলিকেও রক্ষা করাতে। নগরগুলির শাসনের জন্য উপযুক্ত কর্মচারী ব্যবস্থাও ছিল। পাটলিপুত্রের পৌরসংঘের শাসন ভার ৬-টি উপসমিতিতে ৩০ জনের এক পরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল। প্রাচীন নগরগুলিতে পথে অনেক সময় দীপ স্তম্ভ এবং পথ প্রান্তে ঢাকা দেওয়া নর্দমা ছিল। নগরে নানা উৎসব, নাটক অভিনয় ও নৃত্য গীত ইত্যাদিও হত। বাণিজ্যের জন্য বিদেশীদের যাতায়াত সব সময়ই ছিল ফলে ভোজনাগারে ভাত ও রান্না মাংস সব সময়ই কিনতে পাওয়া যেত। নগরে রাজপথে প্রতি দিন সকালে ঝাঁট দিয়ে জল ও দেওয়া হত (রামা ১।৫।৮)। পথে কেউ আবর্জনা ফেললে দণ্ড পেত।

এই নগর গড়ার নির্দিষ্ট ব্যবস্থা মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা ইত্যাদিতে স্পষ্ট। এই সময়ে নগরে স্নানাগারও থাকত। তক্ষশিলা, পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, বুদ্ধগয়া, সমৃদ্ধি-শালী নগরী ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে বহু উপাসনা স্থানকে বা মন্দিরকে কেন্দ্র করে নগর গড়ে উঠেছিল। রাজধানী ও বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেও নগর গড়ে উঠত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্র নগর। খাজুরাহো, কাঞ্চীপুরম মন্দির নগর। সে কালে বেশির ভাগ নগরই এক একটি দুর্গ বিশেষ ছিল। বাঙলার প্রাচীন নগরী তাম্রলিপ্ত পুণ্ড্র বর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ, ত্রিবেণী, লক্ষণাবতী ও পরে গৌড়।

নগ্নজিৎ—কোশলের রাজা; এঁর মেয়ে সত্যা বা নাগ্নজিতী। অগ্নির স্ত্রী স্বাহা কৃষ্ণকে স্বামী রূপে পাবার জন্য তপস্যা করেন। পর জন্মে সত্যা নামে জন্মান। রাজার পণ ছিল তাঁর রক্ষিত সাতটি মহাবৃষকে যিনি বধ করতে পারবেন তাঁর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন। কৃষ্ণ এগুলিকে পরাস্ত করে সত্যাকে বিয়ে করেন। (২) গান্ধারের এক জন ক্ষত্রিয় রাজা। অসুর ইষুপাদ (দ্রঃ) অংশে জন্ম। কর্ণ একে নিহত করেন এবং এর ছেলে কৃষ্ণের হাতে পরাজিত হন। (৩) প্রহ্লাদের এক জন অনুচর; পরজন্মে সুবল।

নচিক—বিশ্বমিত্রের এক ব্রহ্মবাদী ছেলে।

নচিকেতা—রাজা বাজশ্রবার (= অন্য নাম গৌতম) ছেলে। স্বর্গে যাবার জন্য রাজা এক যজ্ঞ করে সমস্ত ধন রত্ন দান করেন। নচিকেতা তখন বালক। কিছু বুড়ো গরুও রাজা দান করেছিলেন। নচিকেতা তখন বাবাকে অনুরোধ করেন কোন ঋত্বিকের হাতে তাকে দান করতে। রাজা প্রথমে কান দেন নি; কিন্তু নচিকেতা তিন বার জিজ্ঞাসা করেন কার হাতে তাকে দান করবেন। রাজা তখন রেগে গিয়ে বলেন যমের হাতে। ফলে কথা রাখার জন্য ছেলেকে তিনি যমের কাছে পাঠিয়ে

দেন। যম তখন প্রাসাদে ছিলেন না; ফলে এখানে নচিকেতা তিন রাত উপোস করে কাটান। যম ব্রহ্মলোক থেকে ফিরে এসে সব শুনে তিন রাত উপোস করার জন্য তিনটি বর দিতে চান। প্রথম বরে নচিকেতা চান তার বাবা যেন ছেলের জন্য চিন্তা না করেন এবং আগের মতই যেন নচিকেতার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। দ্বিতীয় বরে স্বর্গে যাবার পথ জানতে চান এবং যাঁরা স্বর্গে আসবেন তাঁরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, মৃত্যু, শোক ইত্যাদির অধীন যেন না হন। তৃতীয় বরে জানতে চান মৃত্যুর পর আত্মার কি হয়; জীবাত্মা বলে কিছু আছে কি না। যম প্রথম দুটি বর দিয়ে নানা প্রলোভন দেখিয়ে নচিকেতাকে নিবৃত্ত করতে চান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে ব্রহ্ম বিদ্যা দান করেন। এই তৃতীয় প্রশ্নের জবাবই কঠোপনিষদ।

মহাভারত মতে উদ্দালক ঋষির ছেলে। একদিন ঋষি নদীতীরে ফুল ইত্যাদি ফেলে এসে ছেলেকে সেগুলি আনতে বলেন। নচিকেতা এসে দেখেন সে গুলি সব জলে ভেসে গেছে। খালি হাতে ফিরলে ঋষি ছেলেকে যমের বাড়ি যাবার শাপ দেন; সঙ্গে সঙ্গে নচিকেতা মারা যায়। উদ্দালক তখন বিলাপ করতে থাকেন এবং এক দিন এক রাত মৃতদেহ পড়ে থাকে। পর দিন ছেলেকে জীবিত দেখে ঋষি বুঝতে পারেন ছেলে দেবলোক থেকে ফিরে এল এবং এখন তার দেহ আর মানবীয় দেহ নয়। নচিকেতা জানান তিনি যমরাজের কাছে গিয়ে ছিলেন এবং কোথায় তারপর যেতে হবে জানতে চাইলে যম বলেন উদ্দালকের শাপ অনুসারে নচিকেতার যম দর্শন হয়েছে এবার সে বাবার কাছে ফিরে যেতে পারে। যমের অতিথি হবার জন্য যম বর দিতে চান। নচিকেতা তখন পুণ্যবান লোকদের দেখতে চান এবং যমের আদেশে দিব্যরথে করে পুণ্যবান লোকদের দেখতে গিয়ে দুগ্ধহ্রদ ইত্যাদি দেখেন এবং দেখেন ধেনুদানকারীই সবচেয়ে উচ্চ-স্থান লাভ করেছেন। যম নচিকেতাকে বহু উপদেশ দেন; এই উপদেশগুলি মিলে কঠোপনিষদ্।

নচিকেতার প্রথম উল্লেখ ঋক্‌বেদে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে নচিকেতা ফিরে এসে ঋষিগণের কাছে সুকর্মের ফল ও পাপের ফল ইত্যাদি বর্ণনা করেন।

নটরাজ—মহাদেবের নৃত্যরত লীলামূর্তি। সভাপতি নামেও পরিচিত। দ-ভারতে কোন স্থানে এই রূপ কল্পনা শুরু হয়েছিল মনে হয়। ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তিগুলি মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিল্পীদের অসাধারণ সৃষ্টি রূপে নন্দিত হয়েছে।

অপস্মার-পুরুষ নামক এক কুশ্রী বামনের ওপর নর্তনশীল মূর্তি; দক্ষিণ পা অপস্মারের পিঠে প্রোথিত; বাম পা একটু দক্ষিণ ঘেঁষে তোলা। সামনের বাম হাত গজহস্তভঙ্গিতে উত্থিত, বাম পা'কে নির্দেশ করে প্রলম্বিত; সামনের ডান হাতে অভয়মুদ্রা, পেছনের বাম হাতে অগ্নিগোলক; পেছনের ডান হাতে ডমরু। সম্পূর্ণ মূর্তিটি অগ্নিশিখার মালা বা প্রভাবলী দ্বারা বেষ্টিত; প্রভাবলীর প্রান্ত দুটি নীচে পীঠিকায় এসে মিলিত হয়েছে। ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয় ডমরু থেকে সৃষ্টির সুরু; অভয় মুদ্রাতে স্থিতির ইঙ্গিত, অগ্নিগোলক প্রলয়ের প্রতীক; উত্থিত বাম পদে মুক্তির (অনুগ্রহ, প্রাসাদের) আভাস; প্রভাবলী তাঁর তিরোভাবের দ্যোতক। অর্থাৎ এই মূর্তিতে দেবতার পঞ্চকৃত্য সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, অনুগ্রহ, ও তিরোভাব পরিস্ফুট।

এ ছাড়া বহু বিভিন্ন রীতিতে বহু বিভিন্ন মূর্তি পাওয়া যায়; হাতের সংখ্যা বেশি হয় এবং সঙ্গে নন্দী, পার্বতী, গঙ্গা ইত্যাদিকেও দেখা যায়। ব্যাখ্যাও নানা রকম হয়।

নড্বলা—চাক্ষুস মনুর (দ্রঃ) স্ত্রী।

নদী—ঋক্‌বেদে ও পুরাণে কুভা, সিন্ধু, সুবাস্তু, অসিক্নী, পরুষ্ণী, বিপাশা, শতদ্রু, সরস্বতী ও যমুনা ইত্যাদি নদীর নাম পাওয়া যায়। গঙ্গার থেকে এগুলির গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অনেক অনেক বেশি ছিল। গঙ্গার নাম ঋক্‌বেদে মাত্র এক বার আছে। কুভা থেকে যমুনা এলাকা আর্যাবর্ত।

নন্দ—(১) নন্দ গোপ (দ্রঃ)। (২) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে নিহত। (৩) একটি সাপ।

নন্দক—বিষ্ণুর খড়্গ। মেরুপর্বতে অলকানন্দা তীরে ব্রহ্মা এক বার যজ্ঞ করেন। ব্রহ্মা যখন গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তখন লোহাসুর আসে যজ্ঞে বিঘ্ন করতে। ব্রহ্মার ধ্যান থেকে তৎক্ষণাৎ এক জন পুরুষ জন্মান এবং ব্রহ্মাকে নমস্কার করেন। দেবতারা পুরুষটিকে অভিনন্দন করেন ফলে নাম হয় নন্দক এবং খড়্গে পরিণত হন। দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু এই খড়্গ গ্রহণ করেন এবং সহস্র হস্ত বজ্রমুষ্টি লোহাসুর গদা হাতে এগিয়ে এলে বিষ্ণু এই খড়্গে একে নিহত করেন। ব্রহ্মাও যজ্ঞ শেষ করতে সক্ষম হন।

নন্দগোপ—নন্দ। প্রথম বসু দ্রোণ এবং স্ত্রী ধারা একবার দেবতাদের অনুচিত একটি কাজ করে বসেন। ব্রহ্মা জানতে পেরে অভিশাপ দেন গোপালক বংশে গিয়ে জন্মাতে হবে। এরা তারপর অনুনয় বিনয় করলে বলেন বিষ্ণু কৃষ্ণ হয়ে জন্মালে তারপর মুক্তি পাবেন। এঁরা নন্দ ও যশোদা হয়ে জন্মান। আর একটি কাহিনীতে আছে উজ্জয়িনীতে মহাকালের মন্দিরে চন্দ্রসেন তপস্যা করেছিলেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একটি রত্ন দেন। অন্যান্য রাজারা খবর পেয়ে রত্নটি কেড়ে নিতে আসেন। রাজা পালিয়ে এসে মন্দিরে আশ্রয় নেন। এই সময় উজ্জয়িনীতে এক গোয়ালিনীর শ্রীকর নামে একটি ছেলে ছিল। এই শ্রীকরও ছেলেবেলা থেকে শিবভক্ত, মহাকালের মন্দিরে শিবের আরাধনা করে শিবের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। যে সব রাজারা চন্দ্রসেনকে ধরতে এসেছিলেন তাঁরা এই শ্রীকরের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতি দেখে ভয়ে পালিয়ে যান। এই শ্রীকর অষ্টম জন্মে নন্দগোপ হয়ে জন্মান।

নন্দগোপ মথুরার অপর দিকে গোকুল গ্রামে বাস করতেন। জাতিতে গোপ; স্ত্রী যশোদা। কৃষ্ণকে (দ্রঃ) পালন করেন। কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কংস ক্রমাগত ছদ্মবেশী চর পাঠাতে থাকলে শেষ পর্যন্ত ভীত হয়ে নন্দ বৃন্দাবনে চলে যান। বরুণ এক বার নন্দকে ধরে পাতালে নিয়ে যান (দ্রঃ কৃষ্ণ)। নন্দকে এক বার একটি অজগর সাপ গিলতে চেষ্টা করে; কৃষ্ণ (দ্রঃ) বাঁচান। কংসের যজ্ঞে নন্দ নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন; সঙ্গে কৃষ্ণ ছিলেন এবং এই সময়ে কংস কৃষ্ণের হাতে মারা যান। দ্রঃ ধর্ম।

নন্দন—হিরণ্যকশিপুর ছেলে। শ্বেতদ্বীপে রাজত্ব করতেন। শিবের বরে অজেয় হন। জীবনের শেষে মহাদেবের গণদের সঙ্গে যোগ দেন।

নন্দনকানন—স্বর্গের উদ্যান। চৈত্ররথ, বৈভ্রাজ ও সর্বভদ্র আরো তিনটি উদ্যান।
নন্দা—পুষ্কর থেকে সরস্বতী (দ্রঃ) পশ্চিম দিকে এগিয়ে যান নাম হয় নন্দা। রাজা প্রভঞ্জন স্তন্য দান রত এক হরিণীকে বাণ বিদ্ধ করলে হরিণী শাপ দেয় রাজাকে বাঘ হয়ে এইখানে বাস করতে হবে। এবং ক্ষমা চাইলে বলে এক শত বছর পরে এই খানে নন্দা নামে এক গাভীর সঙ্গে কথা বললে মুক্তি পাবে। এক শত বছর পরে এখানে এক দল গরু চরতে আসে; দলের নেত্রী ছিল নন্দা নামে একটি গাভী। বাঘ প্রভঞ্জন এই নন্দাকে আক্রমণ করলে গাভীটি বাঘের কাছে প্রার্থনা করে উপস্থিত তাকে ছেড়ে দিতে, তার দুগ্ধপোষ্য বাচ্ছার কাছে সে বিদায় নিয়ে আসতে চায়। বাঘ ছেড়ে দেয় এবং গাভী পরে আবার ফিরে আসে। বাঘ প্রভঞ্জন এই রকম সত্যরক্ষা দেখে অবাক হয়ে যান, গাভীকে তার নাম জিজ্ঞসা করেন এবং নাম শুনে রাজার শাপ মুক্তি ঘটে। ধর্ম তখন এসে এই ভাবে সত্যরক্ষার জন্য নন্দাকে বর দিতে চাইলে নন্দা চায় স্থানটি পবিত্র তপোবন হক এবং এইখানে প্রবাহিত সরস্বতী নদীর নাম হক নন্দা। (২) একটি নদী। তীর্থ যাবার সময় অর্জুন এই নন্দা ও অপরানন্দা তীরে এসেছিলেন। নৈমিষারণ্যের পূর্ব দিকে এই নদী। বনবাসের সময়ও পাণ্ডবরাও এই দুটি নদী অতিক্রম করে লোমশ মুনির সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিলেন।
নন্দিকেশ—নন্দী (দ্রঃ)
নন্দিনী—সুরভির মেয়ে। ইনিও কামধেনু। বশিষ্ঠের আশ্রমে। এঁর সেবা করে দিলীপ (দ্রঃ) পুত্র লাভ করেন। বসুরা (দ্রঃ দ্যু) এঁকে হরণ করে অভিশপ্ত হন। এই গরুটির জন্যই বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিবাদ আরম্ভ হয়।
নন্দী—নন্দিকেশ, নন্দীশ্বর। মহাদেবের প্রধান অনুচর ও গণনায়ক। মহর্ষি শিলাদ মহাদেবের বরে অযোনি সম্ভব ছেলে পান। এই ছেলে নন্দী বহু দিন মহাদেবের পূজা করে তাঁর গণ-মধ্যে পরিগণিত হন। মরুৎদের মেয়ে সুযশার সঙ্গে মহাদেব নন্দীর বিয়ে দেন। নন্দীর বর্ণনা :—বিকট দেখতে, মুণ্ডিত মাথা, ক্ষুদ্র বাহু, করাল দর্শন, কৃষ্ণ পিঙ্গল বর্ণ। নন্দীর সঙ্গী ভৃঙ্গী (দ্রঃ)। কুবেরকে জয় করে পুষ্পক রথে করে রাবণ কৈলাসে যাচ্ছিলেন। পথে রথ থেমে যায়; নন্দী রাবণকে নিষেধ করেন; কারণ হরগৌরী তখন বিহার করছিলেন। এঁর মুখ দেখে রাবণ হেসে ফেললে নন্দী শাপ দেন তাঁর মুখের আকৃতি বিশিষ্ট বানররা রাবণকে সবংশে নিধন করবে।
নন্দীগ্রাম—অযোধ্যা থেকে ১-ক্রোশ/১৪ মাইল দূরে। রামকে ফিরিয়ে আনতে না পেরে ভরত (দ্রঃ) এখানে এসে রামের হয়ে রাজ্য পালন করতেন। রাম ফিরে এলে এইখানে ভাইদের মিলন হয়, পরে সকলে অযোধ্যাতে আসেন।
নন্দীমুখ—নান্দীমুখ। পিতৃদেবদের একটি শ্রেণী।
নন্দীশ্বর—নন্দী (দ্রঃ)।
নপ্তা—এক ধরণের দেবতা (মহা ১৩।৯১।৩৫)।
নবগ্রহ—রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু।
নবদুর্গা—কালী, কাত্যায়নী, ঈশানী, মুণ্ডমালিনী, চামুণ্ডা, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ত্বরিতা ও বৈষ্ণবী। দক্ষ যজ্ঞ নষ্টের সময় বীরভদ্রের (দ্রঃ) সঙ্গে এঁরা গিয়েছিলেন।

নবরাত্র—দ্রঃ দশেরা।

নবলা—নড়লা।

নবাশ্মীয় যুগ—অশ্ম যুগের পর। মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যে কুঠারাদি বেশির ভাগ তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে কুচাই নামে জায়গায় ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ বিশিষ্ট স্তরের ওপর নবাশ্মীয় স্তর দেখা যায়। আসামে, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে ও বিহারে বহু নবাশ্মীয় অস্ত্র পাওয়া গেছে। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের নবাশ্ম কুঠারের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য আছে। পূর্ব ভারতীয় নবাশ্মীয় ধারা পূর্ব এসিয়া থেকে আগত মনে হয়। কাশ্মীরে শ্রীনগর জেলায় বুর্জাহোম নামক স্থানে নবাশ্ম সংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে। এখানে অধিত্যকায় শক্ত মাটিতে অর্দ্ধবৃত্তাকার গর্ত খুঁড়ে মানুষ বাস করত; দৈনিক ব্যবহারের জন্য ছিল পাথরের কুঠার, হাড়ের অস্ত্র হিসাবে হারপুন, তুরপুন ও ছুঁচ; হাতে তৈরি কালো-মৃৎ পাত্রও প্রচলিত ছিল। এই ধরণের সংস্কৃতি ভারতে আর কোথাও দেখা যায় না। বহির্ভারতের সঙ্গে বোধ হয় এদের যোগ ছিল।

নব্যন্যায়—দ্রঃ ন্যায়।

নভগ—বৈবস্বত মনুর দশটি ছেলের এক জন। ইনি যখন ব্রহ্মচারী ছিলেন তখন এঁর বাবা ও ভাইগুলি এঁকে পিতৃধনে বঞ্চিত করেন। নভগ পরে বাবার কাছে অনুযোগ করলে মনু তাঁকে ভাইদের অবিশ্বাস করতে বলেন এবং আঙ্গিরস মুনিদের কাছে বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে দুটি সূক্ত পাঠ করে শোনাতে বলেন। এই সূক্ত পাঠ করলে যজ্ঞের শেষে স্বর্গে যাবার সময় এঁরা যজ্ঞের অবশিষ্ট সমস্ত ধন নভগকে দিয়ে যাবেন। যজ্ঞের শেষে এই ভাবে দান গ্রহণ করতে গেলে এক জন কৃষ্ণকায় পুরুষ এসে বাধা দিয়ে এই ধন দাবি করেন। নভগ আবার বাবাকে জানালে মনু বলেন ইনি রুদ্র, ইনিই দানের প্রকৃত অধিকারী। নভগ তখন রুদ্রকে সমস্ত ধন নিতে দেন। নভগের সত্য-বাদিতায় সন্তুষ্ট হয়ে রুদ্র এঁকে ধন ও ব্রহ্মবিদ্যা দিয়ে অন্তর্হিত হন।

নভস্বান—দ্রঃ নরকাসুর।

নমুচি—একজন দৈত্য। কশ্যপ দনুর পুত্র। শুম্ভের তৃতীয় ভাই (বাম-পু)। ঋক্‌বেদে ও শতপথ ব্রাহ্মণেও উল্লেখ আছে। অন্য মতে বিপ্রচিত্তি দানবের ছেলে। ইন্দ্র অসুরদের পরাজিত করেন কিন্তু একমাত্র এঁর কাছে হেরে যান। প্রথমে ইন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। পরে সোমরস ও ইন্দ্রের বল হরণ করেন। নমুচি বহু সৈন্য নিয়ে দেবলোক আক্রমণ করেন; দৈত্যরা হেরে যায় এবং নমুচি পালিয়ে গিয়ে সূর্যের কিরণে লুকিয়ে থাকেন। ইন্দ্র এঁকে খুঁজে বার করেন ও সন্ধি হয়। সর্ত হয় দিনে কিংবা রাত্রে শুষ্ক বা আর্দ্র কোন অস্ত্র দিয়ে ইন্দ্র এঁকে বধ করতে পারবেন না। এই সন্ধির পর নমুচির সাহস ফিরে আসে এবং বার হয়ে আসেন। আবার যুদ্ধ হয়। শুম্ভ নিশুম্ভকে ইন্দ্র বিতাড়িত করলে দৈত্যরা পাতালে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রের ফেনার আঘাতে ইন্দ্র নমুচিকে হত্যা করেন। অন্য মতে ইন্দ্র বন্দী হয়ে গিয়েছিলেন। নমুচির সঙ্গে সন্ধির পর মুক্তি পান। এর পর সরস্বতী ও অশ্বিনীকুমার-দুজনের কাছ থেকে সমুদ্রের-ফেনা রূপ দিব্যাস্ত্র লাভ করেন। জলের এই ফেনা শুষ্কও নয় আর্দ্রও নয়। এই অস্ত্রে দিবা ও রাত্রির সন্ধিতে অর্থাৎ গোধূলিতে ইন্দ্র নমুচির মাথা কেটে

ফেলেন। অন্ত মতে ইন্দ্র সমুদ্রের ফেনার মধ্যে আত্মগোপন করে ছিলেন। নমুচি যখন সমুদ্রের জলে খেলা করছিলেন সেই সময় এই ফেনা নমুচির নাকে, কানে ও মুখে ঢুকে যায়। ফেনার মধ্য থেকে ইন্দ্র বজ্রযোগে নমুচিকে হত্যা করেন। নমুচির মাথা কাটা গেলে এই কাটা মাথা, 'পাপাত্মা, বন্ধুর মাথা কেটে ফেললি' বলে ইন্দ্রকে ধরতে গেলে ইন্দ্র ব্রহ্মার শরণ নেন। ব্রহ্মার উপদেশে অরুণা/সরস্বতী নদীতে স্নান করে পাপ মুক্ত হয়ে ইন্দ্র স্বর্গে ফিরে যান। নমুচির মাথাও এখানে স্নান করে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে। নমুচির মৃত্যুতে রাগে শুম্ভ নিশুম্ভ আবার দেবতাদের আক্রমণ করেন। (২) হিরণ্যাক্ষের এক সেনাপতি। যুদ্ধে ইন্দ্র অজ্ঞান হয়ে যান। বিষ্ণু শেষ পর্যন্ত সাহায্যে আসেন এবং ইন্দ্রের হাতে নমুচি মারা যান। (৩) হিরণ্যাক্ষের আর এক জন সেনাপতি। যুদ্ধে প্রথমে চারদিক ইন্দ্রজালে অন্ধকার করে দেন। ইন্দ্র এই অন্ধকার দূর করলে নমুচি ঐরাবতের দাঁত ধরে এমন নাড়া দেন যে ইন্দ্র পড়ে যান; মাটিতে পড়ে গিয়ে ইন্দ্র তরবারি দিয়ে নমুচির মুণ্ডচ্ছেদ করেন।

নর—ব্রহ্মার বুক থেকে ধর্মের জন্ম। ধর্মের অনেকগুলি ছেলে হয়; এদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ। নর ও নারায়ণ বদরিকাশ্রমে তপস্যা করে কাটাতেন। এঁরা উর্বশীর (দ্রঃ) জন্ম দেন। সমুদ্র থেকে অমৃত ওঠার পর অমৃত ভক্ষণ করে দেবাসুরের যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধে নর নারায়ণ দেবতাদের পক্ষ নিলে তবে অসুররা পরাজিত হন। এর পর থেকে ইন্দ্র এই নর মুনিকে অমৃত রক্ষার ভার দেন। দ্রঃ দম্ভোদ্ভব, খণ্ডপরশু, নরনারায়ণ।

নরক—এখানে পাপের শাস্তি ভোগ করতে হয়। শাস্ত্র মতে অধর্মই নরকের হেতু। মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীর নরকে গিয়ে কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই অল্প-বিস্তর নরকের কথা আছে। বিষ্ণু পুরাণে নরকের বিবরণ সর্ব প্রথম দেখা যায়। পরবর্তী কালে শ্রীমদ্ভাগবতে তামিস্র, রৌরবাদি ২১-টি এবং ক্ষার-কর্দম ইত্যাদি আরো সাতটি নরকের বর্ণনা পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পাপ অনুসারে নির্দিষ্ট বহ্নিকুণ্ড, তপ্তকুণ্ড ইত্যাদি ৮৬-টি ভয়াবহ কুণ্ডের বর্ণনা রয়েছে। স্মৃতি শাস্ত্রে পাপ ও পাতকের কথা আছে, প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে কিন্তু নরকের কথা বিশেষ নাই। বৈদিক সাহিত্যে যম, যমলোক ইত্যাদি অনেক কিছু আছে নরক নই। ঈশোপনিষদের অসূর্যলোক হয়তো নরক। বৌদ্ধ শাস্ত্রে নরকের বহু উল্লেখ রয়েছে। জৈনেরা ৭-টি নরক স্বীকার করেন। ভাগবতে আছে ভূমণ্ডলের দক্ষিণে মাটির নীচে ও জলের ওপর পিতৃগণের সঙ্গে যম বাস করেন। ইনি দণ্ডদাতা। যম মৃতদের এখানে এনে কর্ম অনুসারে শাস্তি দেন। নরকে নদীর নাম বৈতরণী; অধিবাসীরা প্রেত। মহাভারতে যুধিষ্ঠির নরক দেখেন; স্থানটি বালুকা, অস্থি, কণ্ঠকসংকুল; দুর্গন্ধ, যন্ত্রণাদায়ক; এখানে প্রদীপ্ত অগ্নি, জলন্ত তৈলকটাহ, অসিপত্র, শাল্মলীবন ইত্যাদি রয়েছে। কয়েকটি নাম :-অন্ধতামিস্র, অন্ধকূপ, অবীচি, অসিপত্রবন, অধঃ-শিরস্, অপ্রতিষ্ঠ, অপ্রাচী, অয়ঃপান, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, কৃমিভোজন, কৃমীশ, কৃষ্ণ, ক্ষারকর্দম, তামিস্র, তপ্তকৃমি, তাল, তপ্তমূর্তি, তপ্তকুম্ভ, তমস, দারুণ, দণ্ডশূক, পাপ, পর্যাবর্তনক, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বৈতরণী, বজ্রকণ্টক, বিষাশন, বিলোপিত, বহ্নিজ্বালা, বটরোধ, মহারৌরব, মহদ্জ্বালা, রৌরব, রোধ, রুধিরান্ধস, রক্ষঃভক্ষ,

লালাভক্ষ, লবন, শূকরমুখ, শ্বভোজন, (সারমেয়ার্দন), শূলপোত, শাল্মলী, সন্দংশ, সূকর, সূচীমুখ।

নরকাসুর—বিখ্যাত অসুর। হিরণ্যাক্ষ বরাহের রূপ ধরে পৃথিবীকে দাঁতে করে তুলে পাতালে নিয়ে যান। বরাহের দাঁতের স্পর্শে পৃথিবী গর্ভবতী হন, ছেলে হয় দুর্দ্ধর্ষ নরকাসুর। অন্য মতে দনু কশ্যপ পুত্র। পৃথিবী বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করেন শিশুকে যেন তিনি রক্ষা করেন। বিষ্ণু শিশুকে নারায়ণাস্ত্র প্রদান করেন। এই অস্ত্র হাতে থাকলে বিষ্ণু বাদ দিয়ে সকলের কাছে নরক অজেয় হবে। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজধানী স্থাপন করেন ও বহু দিন রাজত্ব করেন। ছেলে ভগদত্ত। দেবতারা ভয়ে কাঁপতে থাকেন। এক বার এই অসুর হাতী সেজে বিশ্বামিত্রের/ত্বষ্টার মেয়ে কশরুকে চুরি করে বলাৎকার করেন। পরে দেবতা গন্ধর্ব অপ্সরাও মানুষদের ১৬০০ মেয়েকে নানা স্থান থেকে ধরে এনে মণিপর্বত শিখরে বন্দী করে রাখেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে দ্বাররক্ষী হিসাবে চার জন দুর্দ্ধর্ষ অনুচর হয়গ্রীব, নিসুন্দ পঞ্চাশু ও মুরকে নিযুক্ত করেছিলেন। নরকাসুরের দশটি ছেলে অন্তপুর রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল। সীতার খোঁজে বানরদের পাঠানর সময় সুগ্রীব এখানেও অনুসন্ধান করবার জন্য বলে দিয়েছিলেন।

এক রাজার ১৬০০০ মেয়ে ছিল; বিষ্ণু এক দিন সন্ন্যাসী বেশে এখানে এলে এই মেয়েরা এসে সন্ন্যাসীকে ঘিরে ধরে। রাজা এতে ক্রুদ্ধ হয়ে মেয়েদের শাপ দেন এবং এরা অনুনয় বিনয় করলে রাজা বলেন পরজন্মে এরা বিষ্ণুর স্ত্রী হবে। আর এক মতে মেয়েরা নারদকে অনুরোধ করেছিলেন এবং নারদের নির্দেশ ব্রহ্মার স্তব করলে ব্রহ্মা শাপ মুক্তির ব্যবস্থা করেন। অন্য মতে নারদই শাপ মুক্তির ব্যবস্থা করে ছিলেন। এই রাজাই পরে নরকাসুর হয়ে জন্মান এবং মেয়েগুলি নানা দেশে রাজকুমারী হয়ে জন্মান; নরকাসুর এঁদের বন্দী করে আনেন। নরকাসুর এক বার দেবলোক আক্রমণ করে অদিতির কুণ্ডল ও ইন্দ্রের ছত্র কেড়ে নিয়ে যান। ইন্দ্র বিষ্ণুর কাছে অভিযোগ করেন। কৃষ্ণ হয়ে জন্মে সত্যভামাকে (দ্র) সঙ্গে নিয়ে গরুড়ের পিঠে চড়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে এসে যুদ্ধ করেন। বহু দুর্দ্ধর্ষ অসুর মারা যায়। শেষকালে নরকাসুর নিহত হন। কুণ্ডল ও ছত্র কৃষ্ণ যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে আসেন। ইন্দ্রের থেকেও বড় হবার জন্য নরকাসুর তপস্যা করেছিলেন; কৃষ্ণের হাতে নিহত হবার এটিও একটি কারণ। তাম্র, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, বসু, বিভাবসু নভস্বান, অরুণ সাতটি উল্লেখযোগ্য ছেলে। (২) নরকের ছেলে ভগদত্ত পাতালে নরক অংশে রাজত্ব করতেন ফলে নরক নামেও পরিচিত।

নরনারায়ণ—দু জন প্রাচীন ঋষি। ধর্ম ও অহিংসার (দ্রঃ মূর্তি)। অন্য মতে ধর্ম ও দক্ষের কন্যাদের যে সব ছেলে হয় তাদের মধ্যে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ প্রধান। এই নারায়ণ কৃষ্ণের অংশাবতার। দ্রঃ রক্তজ। অতি দুর্গম পাহাড়ে অন্য মতে বদরিকাশ্রমে তপস্যা করতেন। হাজার বছর তপস্যা করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। এঁদের কঠোর তপস্যায় পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ইন্দ্র ঐরাবতে চড়ে এসে এঁদের বর দিতে চান। ইন্দ্রের কথায় এঁরা কর্ণপাতও করেন না। ইন্দ্র তখন মায়ার আশ্রয় নিয়ে নানা বন্য জন্তু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি করে এঁদের ভয় দেখাতে থাকেন; কিন্তু

কোন ফল হয় না। এর পর মদন, রতি ও বহু অপ্সরাকে পাঠান তপস্যা ভাঙবার জন্য। অন্য মতে দু জন মাত্র অপ্সরা এসেছিলেন। নারায়ণ চোখ চেয়ে দেখেন; কিছুটা বিচলিত হন; সামনে মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, সুকেশিনী, মনোরমা, মহেশ্বরী, পুষ্পগন্ধা, প্রমদ্বরা, ঘৃতাচী, চন্দ্রপ্রভা, সোমা, বিদ্যুৎমালা, অম্বুজাক্ষী, কাঞ্চনমালা, ইত্যাদি অপ্সরাকে দেখতে পান। সব বুঝতে পারেন এবং নিজেদের ক্ষমতা ও আসক্তি হীনতা দেখাবার জন্য নারায়ণ নিজের উরুতে আঘাত করে সামনের অপ্সরাদের থেকেও সুন্দরী এক জন অপ্সরার জন্ম দেন। উরু থেকে জন্ম বলে নাম উর্বশী। এবং আরো কয়েক জন/হাজার অপ্সরাকে জন্ম দেন। অর্থাৎ প্রমাণ করে দেন প্রয়োজন হলে নিজেই তিনি অপ্সরাদের গড়ে নিতে পারেন। স্বর্গ থেকে আগত অপ্সরারা ভয়ে ক্ষমা চান। নারায়ণ ক্ষমা করেন এবং এঁদের দিয়ে উর্বশীকে উপহার হিসাবে ইন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেন। অন্য মতে এদের মধ্য থেকে যে কোন এক জনকে বেছে নিতে বলেন এবং ইন্দ্র যাঁকে বেছে নেন তিনিই উর্বশী। ইন্দ্র লজ্জিত হয়ে ফিরে যান। নারায়ণ অপ্সরাদের ক্ষমা করলে এঁরা বার বার তাঁকে বিয়ে করতে অনুরোধ করেন। নারায়ণ এঁদের তখন বুঝিয়ে বলেন উপস্থিত তিনি তপস্যা করছেন। ২৮-শ দ্বাপরে তিনি কৃষ্ণ হয়ে জন্মাবেন তখন এদের সকলকে বিয়ে করবেন।

নর মুনির রঙ উজ্জ্বল; নারায়ণ কালো। একটি মতে শরভ রূপী মহাদেব দাঁত দিয়ে নরসিংহকে দু টুকরো করলে দেহের নর অংশ থেকে নর এবং সিংহ অংশ থেকে নারায়ণ দু জন তপস্বী জন্মান। বদরিকাশ্রমে এঁরা মহাসমাধি পান। পর জন্মে দ্বাপরে এঁরা অর্জুন ও কৃষ্ণ হয়ে জন্মান। মহাভারতে আছে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বিষ্ণুর অবতার এই নর। দ্রঃ খণ্ডপরশু, প্রহ্লাদ।

নরমেধ—এই যজ্ঞে নর (পুং) বধের বিধান। শুক্ল যজুর্বেদে ৩০ ও ৩১ অধ্যায়ে আছে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রতিষ্ঠা কামনা করে এই যজ্ঞ করেন। ৪০ দিনে সমাপ্য। অম্বরীষ, হরিশ্চন্দ্র, যযাতি এই যজ্ঞ করেছিলেন।

নরসিংহ—সত্য যুগে বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। অর্ধ নর ও অর্ধ সিংহ রূপ। লাথি মেরে হিরণ্যকশিপু (দ্রঃ) রাজ সভাতে একটি স্ফটিক স্তম্ভ ভেঙ্গে ফেললে এর মধ্য থেকে বার হয়ে পেট চিরে দৈত্যকে হত্যা করেন। দৈত্যের অন্ত্র নিজের গলায় মালার মত পরে গর্জন করে ওঠেন। মুখ এবং হাত ও পায়ের থাবা সিংহের মত, দেহ মানুষের মত। প্রহ্লাদের বাক্য সত্য প্রতিপন্ন করতে স্তম্ভ থেকে বার হন। ব্রহ্মার বরে হিরণ্যকশিপু মানুষ ও পশুর অবধ্য ছিলেন ফলে বিষ্ণু এই রূপ ধরেন (দ্রঃ ত্রিশিরস্)। প্রহ্লাদ স্তব করে এঁকে শান্ত করলে প্রহ্লাদকে আশীর্বাদ করে বিষ্ণু অন্তর্হিত হন। দ্রঃ নরনারায়ণ।

নরা— উশীনরের স্ত্রী নৃগা, নরা, কৃমী, দশা ও দৃশদ্বতী ইত্যাদি। নৃগার ছেলে নৃগ, নরার ছেলে নর, কৃমীর ছেলে কৃমি, দশার ছেলে সুব্রত এবং দৃশদ্বতীর ছেলে শিবি।

নরান্তক—(১) রাবণের এক দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি; অঙ্গদের হাতে মৃত্যু। (২) রুদ্রকেতুর ছেলে, এক জন অসুর। অত্যাচারে ত্রিভুবন অস্থির হয়ে ওঠে। গণপতি কশ্যপের ঘরে আর্বিভূত হন। গণেশকে হত্যা করার বহু চেষ্টা নরান্তক করেছিল। শেষ পর্যন্ত গণেশের হাতে নিহত হন।

নরিষ্যন্ত—মরুত্তের ছেলে, এক জন রাজা। স্ত্রী ইন্দ্রসেনা। ছেলে দম। গৃহস্থ রূপে বনবাস কালে বপুষ্মানের হাতে নিহত হন। ইন্দ্রসেনা সহমৃতা হন।

নর্মদা—(১) এক গন্ধর্বী। এঁর তিন মেয়ে, সুন্দরী কেতুমতী ও বসুদা; এঁরা যথাক্রমে মাল্যবান সুমালি ও মালির স্ত্রী (রামা ৭।৫।৩৩)। (২) একটি নদী। প্রাচীন নাম রেবা, সোমন্তবা, মেখলা-সুতা। মেখল দেশের মহাকাল (মৈকাল) পাহাড়ে অমরকণ্টক শৃঙ্গস্থিত এক কুণ্ড (২২°৪১´ উ × ৮১°৪৮ পূ) থেকে উৎপন্ন। কয়েকটি ছোট নদী মান্দালা পর্বতে এই নর্মদাতে এসে মিশেছে। মধ্যপ্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গুজরাটে ভৃগু কচ্ছের (বর্তমানে ব্রোচ সহর) নিকট খম্বাত উপসাগরে এসে পড়েছে। আগে খান্দেশের দ-পশ্চিম দিক দিয়ে তাপ্তীতে গিয়ে পড়ত। নর্মদা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সীমা। নারদের মতে কনখলে গঙ্গা অধিক পুণ্যতোয়া, সরস্বতী কুরুক্ষেত্রে; কিন্তু নর্মদা সর্বত্রই সমান পুণ্যতোয়া। সরস্বতীর জলে তিন দিনে মানুষ পবিত্র হয়, গঙ্গার জলে এক দিনে কিন্তু নর্মদার জলে স্পর্শমাত্রেই পাপমুক্ত। শিবের দেহ থেকে জন্ম। তপতী পরজন্মে নর্মদা নদীতে পরিণত হন। (৩) মাহিষ্মতীর রাজা দুর্যোধনের সঙ্গে দেবনদী নর্মদার বিয়ে হয়েছিল; মেয়ে হয়েছিল সুদর্শনা। (৪) মান্ধাতার ছেলে পুরুকুৎসকেও নর্মদা এক বার বিয়ে করেছিলেন; ছেলে ত্রসদস্যু।

নল—(১) বিশ্বকর্মার এক ছেলে। রামের সেনাবাহিনীতে বিখ্যাত একজন স্থপতি। সমুদ্র শাসনের সময় বরুণ দেখা দিয়ে নলের পরিচয় দিয়ে বলে যান এই নলই সেতু বাঁধতে পারবে। দ্রঃ চিত্রাঙ্গদা। (২) নল নিষধরাজ। রাজা বীরসেনের ছেলে। একটি মতে গৌড়দেশে পিপ্পল নগরীতে এক বৈশ্য ছিলেন। এই বৈশ্য সব কিছু ত্যাগ করে বনে চলে যান এবং বনে এক জন মুনির উপদেশে গণেশের আরাধনা করেন। পর জন্মে নল হয়ে জন্মান। আর এক কাহিনীতে নল ও দময়ন্তী আগের জন্মে আহুক ও আহুকা নামে দুজন বনবাসী ছিলেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন পর জন্মে রাজ পরিবারে জন্ম হবে এবং শিব নিজে হংসের বেশে এসে সাহায্য করবেন।

অত্যন্ত ধার্মিক রাজা। ছেলে ইন্দ্রসেন এবং মেয়ে ইন্দ্রসেনা। নল এক দিন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি সোনালি রাজহাঁস ধরেন। রাজহাঁসটি প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে ছেড়ে দিলে সে নলের প্রিয় কাজ সাধ্য মত করে দেবে। প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজহাঁসটি দময়ন্তীর কাছে এসে নলের প্রশংসা করে নলের প্রতি দময়ন্তীকে প্রণয়াসক্ত করে তোলে এবং দময়ন্তীর মনোভাব নলকে এসে জানায়। এর পর বিদর্ভ রাজধানী কুণ্ডিনপুরে স্বয়ংবর সভাতে নল যোগ দিতে আসেন। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম এঁরাও দময়ন্তীকে বিয়ে করার আশায় স্বয়ংবরে যোগ দিতে আসছিলেন পথে নলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এঁরা জানতেন নল দময়ন্তীকে ভালবাসেন; তবু নলকে দিয়েই দময়ন্তীকে খবর পাঠান দময়ন্তী যেন এঁদের একজনকে বরণ করেন। নল প্রথমে রাজি হন নি; কিন্তু পরে বাধ্য হন। দেবতাদের বরে অদৃশ্য হয়ে এসে নল দময়ন্তীকে দেবতাদের কথা জানান। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত দময়ন্তী নলকেই বরণ করলে প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতারা তখন সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র বর দেন যজ্ঞকালে নল তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাবেন, যম বর দিলেন নলের প্রস্তুত যে কোন রান্নাই সুস্বাদু হবে, অগ্নি বর

দেন নলের ইচ্ছা মত তিনি আবির্ভূত হবেন, বরুণ বর দিলেন যে, চাইলেই নল জল পাবেন।

এই স্বয়ংবর সভার খবর পেয়ে কলি ও দ্বাপরও আসছিলেন। পথে ইন্দ্র ইত্যাদি ফিরে আসছেন দেখা হয় এবং এদের কাছে দময়ন্তী নলকে বিয়ে করেছেন শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে দুজনে ফিরে যান। কলি নলকে শাপ দিতে যান; ইন্দ্র কলিকে নিরস্ত করেন। এর পর কলি নলের দেহে প্রবেশ করার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। এবং বার বছর অপেক্ষা করার পর নল এক দিন প্রস্রাব করে পা না ধুয়ে সন্ধ্যা করতে বসেন। এই ত্রুটি পেয়ে কলি নলের দেহে প্রবেশ করেন এবং কলির বন্ধু দ্বাপর অক্ষের ছকের মধ্যে প্রবেশ করেন। ফলে নলের মতিচ্ছন্ন হয় এবং ভাই পুষ্করের অনুরোধে পাশা খেলতে সম্মত হন। এবং সর্বস্বান্ত হয়ে দময়ন্তীকে (দ্রঃ) নিয়ে কপর্দক হীন অবস্থায় বনে চলে যেতে বাধ্য হন। তিন দিন এঁরা নগরীর বাইরে অবস্থান করেছিলেন। এই সময় ভাই পুষ্কর ঘোষণা করেছিলেন কেউ এদের কোন সাহায্য করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এই ঘোষণার পরও আরও তিন দিন কেবল জল খেয়ে নল ও দময়ন্তী ঐখানেই ছিলেন। তার পর বনে গিয়ে ঢোকেন।

বনেও কলি নলকে নানা ভাবে উৎপীড়ন করতে থাকেন। বনে ঘুরতে ঘুরতে ক্ষুধার্ত নল এক দিন সোনারঙ কতকগুলি পাখী দেখে নিজের পরিহিত কাপড় দিয়ে ধরতে গেলে পাখীগুলি কাপড়টি নিয়ে উড়ে চলে যায় এবং বলে যায় যে অক্ষ-কাটি দিয়ে নল পাশা খেলেছিলেন এরা সেই অক্ষ-কাটি। দময়ন্তীর বস্ত্রের অর্দ্ধেক তখন নল নিজের দেহে জড়িয়ে নিয়ে দু জনে বনে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। নল এর পর দময়ন্তীকে বুঝিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে যেতে বলেন; কিন্তু দময়ন্তী রাজি হন না। এর পর এক দিন রাত্রিতে দময়ন্তী ঘুমিয়ে পড়লে কলির প্রভাবে নল সামনে মাটিতে একটি খড়্গা পড়ে থাকতে দেখেন। এবং এই খড়্গো তাঁদের পরা কাপড়টি দু টুকরো করে স্ত্রীকে ফেলে পালিয়ে যায়।

নল তারপর বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একটি দাবাগ্নি দেখেন এবং আগুনের মধ্যে থেকে আর্তনাদ করে তাঁর নাম ধরে কে ডাকছে শুনতে পান। এগিয়ে এসে কর্কোটক নাগকে দেখতে পান; নারদের শাপে কর্কোটক স্থবির হয়ে অবস্থান করছিল। নলের স্পর্শে মুক্তি পাবেন কথা ছিল। নল একে তুলে এনে আগুন থেকে রক্ষা করেন, নলের স্পর্শে কর্কোটক শাপ মুক্ত হয়ে নলকে পদক্ষেপ গুণতে গুণতে এগিয়ে যেতে বলেন; এবং দশম পদক্ষেপে কর্কোটক নলকে দংশন করেন। বিষে নলের রূপ বিকৃত বিবর্ণ হয়ে যায়। কর্কোটক আশ্বাস দিয়ে নলকে বলেন তিনি প্রত্যুপকার করলেন; এই বিপদের দিনে কেউ আর চিনতে পারবে না; নলের এতে ভীষণ সুবিধা হবে এবং এই বিষের জ্বালায় দেহস্থ কলি সর্বদা ছটফট করতে থাকবেন। এবং এই বিষ যতদিন নলের দেহে থাকবে ততদিন নলের কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এবং দুটি পরিধেয় দিয়ে বলেন এই দুটি বস্ত্র পরিধান করে কর্কোটককে স্মরণ করলে আবার পূর্বের চেহারা ফিরে পাবেন। এবং পরামর্শ দেন অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা ঋতুপর্ণের কাছে গিয়ে বাহুক নামে সারথি হয়ে বাস করতে এবং রাজাকে অশ্বহৃদয় মন্ত্র শিখিয়ে দিতে এবং রাজার কাছ থেকে অক্ষহৃদয় মন্ত্র শিখে নিতে।

নল এর পর অযোধ্যাতে এসে বাহুক নামে অশ্বরক্ষক নিযুক্ত হন। বার্ষ্ণেয় (দ্রঃ দময়ন্তী) ও জীবল যে দুজন অশ্ব রক্ষক ছিল তাঁরা বাহুকের অধীনে কাজ করতে থাকেন। বেতন ছিল শতং শতাঃ। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে নল কাজের শেষে একটি শ্লোক আবৃত্তি করতেনঃ-ক নু সা ক্ষুৎপিপাসার্তা শ্রান্তা শেতে তপস্বিনী, স্মরন্তী তস্য মন্দস্য কং বা সাদ্য উপতিষ্ঠতি। (মহা ৩।৬৪।১০) শুনতে শুনতে জীবল এক দিন প্রশ্ন করেন কি ব্যাপারটা। বাহুক সমস্ত কাহিনী শোনান কিন্তু স্পষ্ট কিছুই ব্যক্ত করেন না।

এ দিকে দময়ন্তী (দ্রঃ) বাপের বাড়িতে চলে আসেন এবং পিতাকে অনুরোধ করেন নলকে খুঁজে বার করতে। চার দিকে লোক যায়। এবং পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ দময়ন্তীর (দ্রঃ) কাছে খবর আনলে দময়ন্তীই ঋতুপর্ণ রাজাকে নিজের স্বয়ংবরের মিথ্যা খবর পাঠান; রাজা যেন নিশ্চিত যোগদান করেন। অযোধ্যা থেকে বিদর্ভের রাজধানী কুণ্ডিন নগরীতে এক রাত্রিতে আসতে হবে। বাহুক আশ্বাস দিয়ে রাজাকে নিয়ে রথে করে বার হয়ে পড়েন; রথে সারথি বার্ষ্ণেয়ও ছিলেন। আকাশ পথে তীব্র গতিতে রথ এগিয়ে চলেছিল; পথে এক জায়গায় রাজার উত্তরীয় উড়ে যায়। রাজা বাহুককে রথ থামাতে বলেন, বাহুক জানান সে উত্তরীয় এক যোজন দূরে পড়ে আছে। রথ চালাবার অদ্ভুত ক্ষমতা/অশ্বহৃদয় মন্ত্রের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। পথে একটি বিভীতক গাছ পড়ে; ঋতুপর্ণ এই গাছে কতগুলি পাতা ও ফল আছে গুণে বলে দেন; বাহুকের বিশ্বাস হয় না; রথ থামিয়ে নিজে গিয়ে গুণে দেখেন। রাজা ঋতুপর্ণ তখন অক্ষহৃদয় মন্ত্রের কথা জানান এবং বাহুককে এই মন্ত্র শিখিয়ে দেন। এই মন্ত্রের সাহায্যে এই রকম গুণে ওঠা সম্ভব এবং পাশা খেলায় অজেয় হওয়া যায়। একটি মতে এই সময় বাহুকও অশ্ব সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য অর্থাৎ অশ্বহৃদয় মন্ত্র রাজাকে শিখিয়ে দেন। অক্ষহৃদয় মন্ত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গে কলি কর্কোটক বিষ বমন করতে করতে নলের দেহ থেকে বার হয়ে আসেন। নল কলিকে অভিশাপ দিতে যান কিন্তু কলির প্রার্থনায় ক্ষমা করেন এবং সামনে একটি বিভীতক গাছে গিয়ে কলি আশ্রয় নেন। সেই থেকে বিভীতক অভিশপ্ত।

কুণ্ডিনপুরে সন্ধ্যার সময় এঁরা এসে উপস্থিত হন। রাজা ভীম সাদরে অভ্যর্থনা করেন; কিন্তু স্বয়ংবরের কোন ব্যবস্থা রাজা ঋতুপর্ণ দেখতে পান না। দময়ন্তী (দ্রঃ) নিশ্চিন্ত হবার জন্য আরো কয়েকটি প্রমাণ সংগ্রহ করেন এবং ছেলে ও মেয়েকে বাহুকের সামনে পাঠিয়ে দিলে বাহুক এদের বুকে জড়িয়ে ধরেন। নল ও দময়ন্তীর এর পর মিলন হয়; কর্কোটকের দেওয়া বস্ত্র পরিধান করে নল নিজের রূপ ফিরে পান এবং বায়ু এই সময় নলকে ডেকে বলেন 'নৈষা কৃতবতী পাপং নল সত্যং ব্রবীমি তে'। রাজা ঋতুপর্ণ নলের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করে সুখী মনে ফিরে যান। এবং কয়েক দিন বিশ্রাম করে কিছু সৈন্য নিয়ে নল নিজের দেশে ফিরে আসেন। পুষ্কর প্রথমে পাশা খেলায় রাজি হন নি; কিন্তু শেষ অবধি পাশা খেলায় নল রাজ্য ফিরে পান; ভাইকে ক্ষমা করেন এবং অর্দ্ধেক রাজত্ব দান করেন। নলরাজ পাক-কর্মে নিপুণ ছিলেন; তাঁর রচনা বলে কথিত পাকশাস্ত্র পাওয়া যায়।

নলকুবর—বা নলকুবের। কুবেরের ছেলে। এঁর ভাই মণিগ্রীব। রাবণ যখন

ত্রিভুবন জয় করে বেড়াচ্ছিলেন তখন এক দিন রাত্রিবেলা কৈলাসে আসেন। রম্ভা এখানে নলকূবরের কাছে অভিসারে আসবেন কথা ছিল। রম্ভা আসতে রাবণ ধরে ফেলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের স্ত্রী হিসাবে অনেক অনুনয় করেন। কিন্তু রাবণ কোন কথা শোনেন না ; ধর্ষণ করেন। মুক্তি পেয়ে রম্ভা নলকূবরকে সব কথা জানান এবং নলকূবর অভিশাপ দেন ভবিষ্যতে কোন দিন জোর করে কাউকে ধর্ষণ করলে তৎক্ষণাৎ রাবণের মৃত্যু হবে ; মাথা সাত টুকরো হয়ে খসে পড়বে। এই ভয়ে রাবণ সীতার ওপর কোন জোর করেন নি। নলকূবরের আর এক স্ত্রী ময়ের মেয়ে সোমপ্রভা। নলকূবর ও মণিগ্রীব দুই ভাই একবার সুরা পানে মত্ত ও বিবস্ত্র হয়ে কতকগুলি মেয়েদের নিয়ে গঙ্গাতে জলক্রীড়া করছিলেন। নারদ এই সময় বিষ্ণুর কাছ থেকে ফিরছিলেন। নারদকে দেখে মেয়েরা সম্ভ্রমে বস্ত্র পরিধান করে পথ ছেড়ে দেন। এঁরা দু জন নারদকে লক্ষ্য করেন নি ; এদের দু জনকে এই অবস্থায় দেখে স্থাবর-যোনি পাবার অভিশাপ দেন। ফলে এঁরা যমলার্জুন নামে দুটি গাছ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। নারদকে অবশ্য স্তব স্তুতি করেছিলেন এবং নারদ বলেছিলেন কৃষ্ণের স্পর্শে মুক্তি পাবেন। গোকুলে নন্দের বাড়ির কাছে দুটি গাছ হয়ে জন্মেছিলেন। দ্রঃ কৃষ্ণ।

নলতন্তু—নবতন্তু। বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবাদী এক ছেলে।

নলায়নী—মৌদ্গল্য নামে এক বৃদ্ধ মুনির স্ত্রী ইন্দ্রসেনা বা নলায়নী। নলায়নীর বয়স কম ছিল এবং অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন। কিন্তু মুনি বদ মেজাজি হয়ে উঠতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত মুনির কুষ্ঠ হয়। এক দিন খাবার সময় মুনির একটি আঙুল খসে অন্নের মধ্যে পড়ে যায়। নলায়নী এই আঙুল সরিয়ে রেখে নিজে অম্লান মুখে খেয়ে নেন। মুনি সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চান। নলায়নী বর চান মুনি পঞ্চশরীর হন ; তিনি যৌবন ভোগ করতে পারবেন। মৌদ্গল্য বর দেন। হাজার বছর ধরে তারপর এঁরা যৌবন ভোগ করতে থাকেন ; মুনি পর্বত আকার ধারণ করলে নলায়নী পর্বতে নদী হয়ে ভেসে যান ; মুনি পুষ্পিত তরু হলে নলায়নী লতা হয়ে জড়িয়ে থাকেন। শেষ পর্যন্ত মুনি আবার তপস্বী জীবনে ফিরে আসেন কিন্তু নলায়নী মুনিকে যৌবনোচ্ছল জীবনে ফিরে যাবার জন্য খোসামোদ করতে থাকেন। মুনি তখন স্ত্রীকে পাঞ্চাল রাজের মেয়ে হয়ে জন্মাতে ; পাঁচজন স্বামী হবে, যৌবন ভোগ করতে পারবে শাপ দেন। অভিশপ্ত হয়ে নলায়নী শিবের তপস্যা করতে থাকেন। মহাদেব দেখা দিয়ে বর দেন পাঁচজন স্বামী হলেও দ্রৌপদী কুমারীই থাকবেন। মহাদেব নলায়নীকে গঙ্গার তীরে পাঠান ; সেখানে একটি সুন্দর যুবককে দেখতে পাবেন তাকে মহাদেবের কাছে নিয়ে আসতে বলে দেন। নৈমিষারণ্যে এই সময় দেবতারা যজ্ঞ করছিলেন ; কাল/যম পুরোহিত ছিলেন। গঙ্গার জলে সোনার ফুল ভেসে আসতে দেখে ইন্দ্র কৌতূহলী হয়ে পড়েন এবং কোথা থেকে আসছে খুঁজতে খুঁজতে নলায়নীর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে দেখেন নলায়নীর অশ্রুবিন্দু এই সোনার পদ্ম ফুলে পরিণত হচ্ছে। ইন্দ্র নলায়নীর পরিচয় চান। নলায়নী ইন্দ্রকে শিবের কাছে নিয়ে যান। ইন্দ্র শিবকে চিনতে পারেন না ; নলায়নীকে বোঝাতে চান তিনি ইন্দ্র, স্বর্গের রাজা ইত্যাদি। শিব শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে ধরে একটি গুহার মধ্যে নিয়ে যান ; গুহাতে ইন্দ্রের সমান আরো চারজন ইন্দ্র বসে আছেন দেখে ইন্দ্র আশ্চর্য হয়ে যান। শিব তখন নলায়নীকে বলেন এরা তার

স্বামী হবেন ; নলায়নী পাঞ্চালে গিয়ে জন্মাবেন। মহা ১।১৮৯।-।

নলোদয়—একটি মতে কালিদাস রচিত।

নষ্টচন্দ্র—ভাদ্রমাসে শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থীর চন্দ্র। এই চাঁদ দেখা নিষিদ্ধ: দেখলে মিথ্যা অপবাদ পেতে হয়। এই জন্যই কৃষ্ণকে স্যমন্তক মণি চুরির অপবাদ পেতে হয়েছিল। পুরাণের কাহিনী এই দিন চন্দ্র তাঁর গুরুপত্নীকে বলাৎকার করেছিলেন তাই তাঁকে দর্শনে পাপ হয়। পশ্চিম ভারতে এই দিন গণেশ চতুর্থী; কাহিনী আছে এই দিন ঘরে ঘরে গণেশের পূজা হতে থাকে ; ফলে ভূরিভোজনে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যাবেলা গণেশ (দ্রঃ) অস্বাভাবিক ভাবে পথ চলতে থাকলে চন্দ্র হেসে ফেলেন। ফলে এই দিন কেউ যেন চাঁদ না দেখে গণেশ শাপ দেন।

নহুষ—পুরূরবা উর্বশীর ছেলে আয়ু। আয়ুও স্ত্রী ইন্দুমতীর ছেলে নহুষ। ইন্দুমতী স্বর্ভানুর মেয়ে। নহুষের স্ত্রী অশোকসুন্দরী (দ্রঃ)। আয়ু (দ্রঃ) দত্তাত্রেয়ের কাছে একটি ফল পান এবং ফলটি ইন্দুমতীকে খেতে দেন। যথা সময়ে একটি ছেলে হয়। এক দিন আঁতুড় ঘর থেকে দাসী যখন বার হয়ে আসে সেই সময়ে তুণ্ড/হুণ্ড অসুর দাসীর দেহে প্রবেশ করে ঘরের মধ্যে আসেন এবং সকলে ঘুমিয়ে পড়লে শিশুটিকে নিয়ে কাঞ্চনপুরে নিজের রাজধানীতে ফিরে আসেন।- নিজের স্ত্রী বিপুলাকে শিশুটি দিয়ে রান্না করে দিতে বলেন। বিপুলা দাসীকে নির্দেশ দেন। দাসী কিন্তু শিশুটিকে বশিষ্ঠের আশ্রমের দরজায় ফেলে দিয়ে এসে অন্য মাংস রান্না করে দেন। পর দিন বশিষ্ঠ একে পান এবং পালন করেন। এ দিকে আয়ু ও ইন্দুমতী কান্নাকাটি করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত নারদ এসে সান্ত্বনা দিয়ে যান : যথা সময়ে তাঁরা ছেলে ফিরে পাবেন।

নহুষ এক দিন সমিধ আনছিলেন এমন সময় দেবচারণদের মুখে নিজের কাহিনী শুনতে পান এবং বশিষ্ঠের কাছে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করে ঘটনাটা সব কিছু জানতে পারেন। এর পর বশিষ্ঠকে প্রণাম করে তীর ধনুক নিয়ে বার হয়ে পড়েন। তুণ্ড এ দিকে নহুষকে খেয়ে ফেলেছেন ধারণা নিয়ে অশোক সুন্দরীকে গিয়ে ঘটনাটা জানিয়ে আবার বিয়ে করতে চান। অশোকসুন্দরী মর্মাহত হয়ে পড়েন কিন্তু কিন্নর বিদ্যুৎ-ধর ও তাঁর স্ত্রী সান্ত্বনা দেন নহুষ বেঁচে আছেন এবং আরো ঘটনা যা ঘটবে বর্ণনা করেন। ইতি মধ্যে এইখানে নহুষ এসে উপস্থিত হন এবং তীব্র যুদ্ধে অসুরকে নিহত করে অশোকসুন্দরীকে বিয়ে করে পিতার কাছে ফিরে আসেন (পদ্মপুরা)।

পুণ্যবান ও আত্মসংযমী রাজা ; তুণ্ডকে বধ করে ত্রিলোকের প্রশংসা ভাজন হন। পুণ্যকর্মে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন বলে হঠাৎ গোবধ করে ফেলেও ঋষিদের কৃপায় পাপ থেকে মুক্তি পান। অনৃতের প্রশ্রয় নিয়ে বৃত্রকে বধ করে শ্রান্ত ও বিচেতন ও স্বকল্মষে অভিভূত হয়ে মানস সরোবরে ইন্দ্র যখন আত্মগোপন করে বাস করছিলেন তখন দেবতা ও মহর্ষিরা সকলে মিলে নহুষকে দেবরাজ করে দেন। শত অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করার জন্য নহুষ ইন্দ্রত্বের অধিকারী হয়েছিলেনও। শত সহস্র বছর ইন্দ্রত্ব করার পর নহুষ অহঙ্কারী, উদ্ধত ও বিলাসী হয়ে পড়েন এবং এক দিন শচীকে দেখে তাঁকে স্ত্রীরূপে পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন (মহা ৫।১১।১৫)। শচী

বৃহস্পতির আশ্রয় নেন। বৃহস্পতি ইত্যাদি ঋষিরা ইন্দ্রাণীকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন। বাধা পেয়ে নহুষ ক্রমশ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। শচী এই সময়ে ইন্দ্রকে খুঁজে বার করেন। এক মতে বৃহস্পতি অগ্নিকে দিয়ে ইন্দ্রের সন্ধান করিয়েছিলেন। এবং ইন্দ্রের পরামর্শে শচী জানান নহুষ যদি ঋষি বাহিত পাল্কিতে তাঁর কাছে আসেন তবেই তিনি নহুষের অনুগামিনী হবেন। নহুষ পাল্কির ব্যবস্থা করেন এবং যেতে যেতে ঋষিদের সঙ্গে মন্ত্র সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করতে করতে অসাবধানে অগস্ত্যের মাথায় পা ঠেকে যায়। অন্য মতে পাল্কি যেতে দেরি হচ্ছে দেখে রাজা অধৈর্য হয়ে বাহকদের 'সর্প সর্প' (সৃপ্-ধাতু) বলে এগিয়ে যেতে বলেন এবং তাঁহাদের মাথাতে পদাঘাত করেন এবং বেঁটে অগস্ত্যকে কশাঘাত করেন। ঋষিদের অবমাননায় অগস্ত্য আগে থেকেই ক্রুদ্ধ ছিলেন। ফলে অগস্ত্য অন্য মতে ভৃগু শাপ দেন; রাজা অজগর সাপ হয়ে বিশাখ যূপ বনে গিয়ে পড়েন। নহুষের করুণ প্রার্থনায় শেষ অবধি অগস্ত্য বর দেন যুধিষ্ঠির তাঁকে শাপ মুক্ত করবেন।

পাণ্ডবরা যখন দ্বৈতবনে তখন নহুষ সাপ এক দিন ভীমকে জড়িয়ে ধরেন। যুধিষ্ঠির খুঁজতে এসে সাপকে অনুরোধ করেন ভীমকে ছেড়ে দিতে। সাপ তখন প্রশ্ন করেন কে প্রকৃত ব্রাহ্মণ। যুধিষ্ঠির বলেন সত্য, দান, ক্ষমা, অহিংসা, দয়া ও তপস্যা যাঁর আছে তিনি শূদ্র হলেও ব্রাহ্মণ। উত্তর শুনে অন্য মতে যুধিষ্ঠিরের স্পর্শে ভীমকে (দ্র:) ছেড়ে দিয়ে শাপ মুক্ত হয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে দিব্যরূপ ধারণ করে স্বর্গে ফিরে যান। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও ঐশ্বর্য গর্বিত নহুষের স্বর্গপ্রাপ্তির কাহিনী আছে। ইন্দ্র হবার ঘটনা ঋক্‌বেদেও আছে। পিতার কাছ থেকে বিখ্যাত তরবারি লাভ করে ছিলেন। চ্যবনের কাছেও একটি বর পেয়েছিলেন। নহুষের ছেলে যতি, যযাতি, সংযাতি, অযাতি, বিযাতি ও কৃতি। মহাভারতে (১।৭০।২৮) যতিং যযাতিং সংযাতিং আযাতিং পাঞ্চম্ উদ্ভবম্। নহুষঃ জনয়ামাস ষট্ পুত্রান্ প্রিয়বাসসি॥ আযতি অযতি ধ্রুব ইত্যাদি নাম ও পাওয়া যায়। কিন্তু মোট ছয় ছেলে। (২) কদ্রুর একটি ছেলের নাম।

নাগ—মানুষের আকার দেবযোনি। নাগলোকে থাকেন। কশ্যপের স্ত্রী কদ্রুর অনন্ত, বাসুকি, কম্বল, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, কুলিক, ও অপরাজিত নামে কয়েকটি পরাক্রান্ত ছেলে হয়েছিল। এদের বংশ। এরা কুটিল ও বিষধর। এদের বংশ পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছিল। বহু প্রজাক্ষয় হচ্ছিল। প্রজারা তখন ব্রহ্মার শরণ নিলে ব্রহ্মা শাপ দেন কল্পান্তরে নাগ বংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। নাগেরা তখন অনুনয় করেন; ব্রহ্মা নিজেই তাঁদের কুটিল ও বিষধর করেছেন; শাপ না দিয়ে নাগদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এই সময় থেকে নাগেরা ব্রহ্মার নির্দেশে পাতাল বিতল ও সুতল এই তিনলোকে বাস করতে থাকেন। এবং ব্রহ্মার নির্দেশ মত এক মাত্র আয়ুশেষ জীবকেই এরা কামড়াবেন এবং মন্ত্রৌষধি যারা ধারণ করবে তাদের স্পর্শ করবেন না। একটি মতে সুরসার সন্তানরা নাগ। কদ্রুর সন্তানরা উরগ।

নাগদত্ত—ধৃতরাষ্ট্রের একটি ছেলে। ভীমের হাতে নিহত।

নাগপঞ্চমী—শ্রাবণে কৃষ্ণা কোথাও কোথাও শুক্লা পঞ্চমীতে মনসাদেবী ও নাগসমূহের পূজা হয়। এই সময়ে দেবী মনসা গাছ আশ্রয় করেন ফলে এই গাছ দিয়ে পূজা হয়।

নাগপাশ—মন্ত্রপূত অস্ত্র। এই অস্ত্র প্রয়োগে লক্ষ লক্ষ সাপ বার হয়ে শত্রুকে জড়িয়ে ধরে। বরুণের অস্ত্র। ইন্দ্রজিৎ এই অস্ত্র ইন্দ্রের কাছে পেয়েছিলেন। দ্রঃ গরুড় অস্ত্র।
নাগপুর—নৈমিষারণ্যে গোমতী নদীর বেসিন-এ একটি এলাক। মহাভারতে এর উল্লেখ আছে। এখানে পদ্মনাভ বলে একটি নাগ বাস করত।
নাগরী— ব্রাহ্মী লিপি থেকে গঠিত উত্তর ও মধ্য ভারতে প্রচলিত লিপি। নগর জনের জন্য ব্যবহৃত। এই লিপিতে বর্তমানে সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপা হয়। দেবভাষার লিপি বলে অপর নাম দেবনাগরী।
নাগলোক—দ্রঃ নাগ। এখানে বাসুকি রাজা। এখানে একটি বিশেষ জলাশয়ে জল পান করলে হাজার হাতীর বল পাওয়া যায়।
নাগারি—গরুড়ের একটি নামকরা ছেলে।
নাগার্জুন—মহাযানের একটি প্রধান শাখা মাধ্যমিক; এই শাখার প্রথম ও প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, আর্যদেব, ও কুমারলাত সমসাময়িক ছিলেন। খৃ ২ শতক। বিদর্ভের অদিবাসী। অন্ধ্রদেশে রাজা সাতবাহনের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুতা ছিল। ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ। যাদু বিদ্যাতেও সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। এই নামের সঙ্গে বহু প্রবাদ রয়েছে; হয়তো একাধিক নাগার্জুন ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি মাধ্যমিক কারিকা এই গ্রন্থে শূন্যবাদ আলোচিত হয়েছে। সুহৃৎ-লেখ, প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রশাস্ত্র, দশভূমিবিভাষা শাস্ত্র, বিগ্রহব্যবর্তনী, যুক্তি ষষ্টিকা, শূন্যতাসপ্ততি, মহাযান বিংশক ইত্যাদি তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ। মনে হয় তন্ত্রশাস্ত্রকার, রসায়নশাস্ত্রকার ও চিকিৎসাশাস্ত্রকার আরো তিন জন নাগার্জুন ছিলেন।
নাগার্জুনকোণ্ডা—গুণ্টুর জেলাতে কৃষ্ণা নদীর তীরে বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ। ১৬°৩১ উ × ৭৯°১৪´ পূ। প্রাচীন নাম বিজয়পুরী। এই প্রতিষ্ঠান খৃ ৩-শতকে ইক্ষ্বাকু রাজাদের সময়কার। বহু স্তূপ, চৈত্যগৃহ ও বিহার ছিল। কয়েকটি স্তূপ হরিতাভ চূণাপাথরে খোদিত ফলক দিয়ে আবৃত ছিল। ফলকগুলিতে বুদ্ধের জীবনী অমরাবতী শৈলীতে অঙ্কিত করা ছিল।

পাহাড়ের পাদ দেশে একটি প্রশস্ত উপত্যকা। এখানে একটি বাঁধ দেবার ফলে এলাকাটি বর্তমানে জলমগ্ন; উপত্যকার মধ্যগত পাহাড়টি একটি দ্বীপে পরিণত। উপত্যকাটি ২৩ বর্গ কি-মি; প্রত্নকীর্তি সমৃদ্ধ এবং এখানে বিজাপুরের রাজধানী ছিল। উপত্যকার তিন দিকে দুর্ভেদ্য পাহাড় এবং চতুর্থ দিক কৃষ্ণা নদী দিয়ে রক্ষিত। নাগার্জুনের সময়ের সঙ্গে জড়িত হলেও প্রত্নতাত্ত্বিক কোন প্রমাণ মেলে না। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও এখানে বসবাস ছিল। প্রত্নাশ্মীয়, ক্ষুদ্রাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় বহু অস্ত্রশস্ত্র ও মৃৎপাত্র এখানে পাওয়া গেছে। ইক্ষ্বাকু রাজাদের সময় এখানে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির চরম সমৃদ্ধি দেখা যায়। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি এখানে ছিল না। কিন্তু তবু সমৃদ্ধি ব্যাহত হয় নি। খৃ ৪-র্থ শতকের পর বৌদ্ধ ভাস্কর্যের আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইক্ষ্বাকুদের পরই এখানকার গৌবরের দিন অস্তমিত হয়। ইক্ষ্বাকু রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মী ছিলেন; ফলে হিন্দু মন্দিরও প্রচুর গড়ে উঠেছিল। বিষ্ণু, শিব, কার্তিকেয় ইত্যাদির ২০টি মন্দির পাওয়া গেছে। মন্দিরগুলি হয় দুর্গের কাছে নয়-

তো কৃষ্ণা নদীর কাছে। সর্বদেবতাদের উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রাসাদ মত মন্দিরটি ইহুভূল চান্তমূল রাজার রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। আর একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির অষ্ট-ভুজস্বামীর (=বিষ্ণু); ২৭৮ খৃঃ মত। ৩০-এর বেশি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষ এখানে পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি ৯০% স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। সংঘারাম থেকে বিচ্ছিন্ন স্তূপের সংখ্যা মাত্র ৫-টি। প্রাচীনতম স্তূপটি মহাচৈত্য; এখানে বুদ্ধদেবের ধাতু পাওয়া গেছে। এই ধাতু একটি স্বর্ণ মঞ্জুষার মধ্যে রাখাছিল; মঞ্জুষাটি একটি রূপার পাত্রের মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং রূপার পাত্রটি একটি পাত্রের মধ্যে অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধ স্তূপ ইত্যাদিতে শৈলী অমরাবতীর শেষ পর্যায়ের (খৃ ২-৪ শতক)। অলংকরণ ছিল অপর্যাপ্ত; স্তূপ, চৈত্যগৃহ, সংঘারাম ইত্যাদিতে ইঁট ও পাথর প্রয়োজন মত ব্যবহৃত হয়েছে; স্তূপ গুলির মধ্যগত কক্ষের গঠন ও কারুকার্য্য বিচিত্র। কাঠের স্তম্ভও প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে। সিংহল ও অন্যান্য জায়গা থেকে তীর্থ যাত্রীরাও এখানে আসতেন। বিদেশী তীর্থযাত্রীদের জন্য স্বতন্ত্র চৈত্যগৃহও গড়ে উঠেছিল।

নাগার্জুনকোণ্ডার এই সহরে একটি উন্মুক্ত প্রেক্ষাগৃহ পাওয়া গেছে; আয়ত চত্বর ১৬.৪৬ × ১৩.৭২ মি; একে ঘিরে চারদিকে প্রায় এক হাজার দর্শকের বসবার সোপানাসন (গ্যালারি) ছিল। আমোদপ্রমোদ ও পাশাখেলার জন্য নির্মিত কিছু মঞ্চের ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে। সহরের বিভিন্ন অংশে বেশ কয়েকটি পান্থশালা, স্নানের চৌবাচ্চা, বাঁধান ঘাট ইত্যাদি পাওয়া গেছে। কৃষ্ণা নদীর তীরে শ্মশান ছিল। সতীদাহের একটি উদ্গত চিত্রও এখানে পাওয়া গেছে।

দুটি বিষ্ণু মন্দির পাওয়া গেছে; এ দুটি মনে হয় প্রথমে জৈন মন্দির ছিল; কারণ আরাধ্য তীর্থঙ্কর মূর্তি দুটি বাইরে প্রাঙ্গণে পড়ে রয়েছে।

নাটক—ভরতের নাট্য শাস্ত্রে আছে ব্রহ্মা চতুর্বেদ থেকে উপকরণ নিয়ে নাটক তৈরি করেন এবং এতে শিবের তাণ্ডব ও পার্বতীর লাস্য যোগ করেন। অর্থাৎ কবে থেকে অভিনয় আরম্ভ হয়েছিল অস্পষ্ট। পুরূরবা-উর্বশী, যম-যমী ইত্যাদি দৃশ্যকাব্যের বিষয়বস্তু হতে পারে কিন্তু অভিনয় হত কিনা স্পষ্ট নয়। হয়তো পুতুল নাচ ও চালু ছিল। বৈদিক যুগে মহাব্রত অনুষ্ঠান হয়তো নাটক অভিনয়ের প্রথম পদক্ষেপ ছিল। এই অনুষ্ঠানে বৈশ্যশূদ্রের যুদ্ধ, ব্রাহ্মণছাত্রের ও গণিকার অশ্রাব্য খিস্তি ইত্যাদি বিষয়গুলি যেন নাটকের আদিরূপ। একটি মতে আলেকজান্দারের ভারত অভিযানের পর গ্রীক দরবারে নাটক অভিনয় দেখে ভরতে প্রেরণা এসেছিল। কিন্তু এ মতের কোন প্রমাণ নাই। নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত অমৃতমন্থন ও ত্রিপুরদাহ কবে কে লিখেছিলেন কিছুই জানা যায় না; বই ও পাওয়া যায় না। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে (খৃ-পূ ২ শতকে) কংসবধ ও বলি বন্ধ দুটি দৃশ্যকাব্যের উল্লেখ আছে। রামায়ণে নাটক শব্দের উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতে আছে কৃষ্ণের বংশধরেরা নাটক অভিনয় করেছেন। অর্থাৎ অভিনয় কবে আরম্ভ হয়েছিল এবং সাজ সজ্জা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে উল্লিখিত নাট্যকার সৌমিল্ল ও কবিপুত্র সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। কালিদাসের আগে খ্যাতিনামা এ পর্যন্ত যত দূর জানা গেল নাট্যকার অশ্বঘোষ ও ভাস। কালিদাসের পরে শূদ্রক। উভয়া-

মৃত্যুর কারণ জানতে চান। ব্রহ্মা বলেন আগের ব্যবস্থা অনুসারে এখনও হাজার বছর আয়ু রয়েছে ; প্রজাপতিদের ক্রোধে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ব্রাহ্মণ তখন বিষ্ণু রূপে প্রকাশ পান এবং উপবর্হনকে আশীর্বাদ করে বাঁচিয়ে দেন। ছেলে ও নাতিনাতনিদের নিয়ে উপবর্হন সুখে জীবন কাটাতে থাকেন। আয়ু শেষ হয়ে এলে উপবর্হন ও মালতী গঙ্গাতীরে কৃচ্ছ্র সাধন করতে থাকেন এবং উপবর্হন মারা গেলে মালতীও চিতায় প্রাণত্যাগ করেন।

কান্যকুব্জে দ্রুমিল নামে এক গোপরাজের স্ত্রী কলাবতী। সস্ত্রীক রাজা গঙ্গাতীরে সন্তানের জন্য তপস্যা করতেন। কশ্যপকে কলাবতী সন্তুষ্ট করেন এবং তাঁর আশীর্বাদে গর্ভ হয়। অন্য মতে কশ্যপ নামে এক ঋষি এক দিন মেনকাকে দেখে কামার্ত হয়ে বীর্যপাত করলে এই বীর্য পান করে কলাবতীর গর্ভ হয়। দ্রুমিল এ দিকে ব্রাহ্মণদের সব কিছু দান করে বনে গিয়ে বাস করতে থাকেন এবং বনেতেই মারা যান। কলাবতী সহমরণে যাচ্ছিলেন কিন্তু দৈববাণী তাঁকে নিষেধ করেন। কলাবতী তখন এক ব্রাহ্মণের গৃহে দাসী হয়ে বাস করতে থাকেন। যথা সময়ে একটি ছেলে হয়। দেশে অনাবৃষ্টি চলছিল ; ছেলেটি হতে প্রচুর বৃষ্টি হয় ; গৃহস্বামী এই জন্য নার-দ নাম রাখেন। এই ছেলে বড় হলে কলাবতীকে তাঁর পূর্ব জীবনের কথা জানান এবং বিষ্ণু ভক্ত হয়ে পড়েন। মায়ের আদেশে যোগীদের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। যোগীদের আজ্ঞায় তাঁদের উচ্ছিষ্ট অন্ন এক বার আহার করায় নারাদর শাপ মোচন হয় ; চিত্তশুদ্ধি ও ধর্মে মতি আসে। এক দিন কলাবতী দুধ দুইতে গিয়ে অন্য মতে পথে সাপের কামড়ে মারা পড়েন। শিব ও শিবের তিন জন অনুচর এই সময় ছদ্মবেশে এসে নারদের বিষ্ণু ভক্তি ও দাস্যভাব দেখে অত্যন্ত খুসি হন। নারদ সঙ্গীতেও নিপুণ হয়ে ওঠেন এবং মহাদেব নারদকে ভাগবত শিক্ষা দিয়ে যান। ভগবান বিষ্ণু এক বার এসে ক্ষণিক দেখা দিয়ে গিয়েছিলেন এবং জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন নারদের অনুরাগ বাড়িয়ে দেবার জন্য এসেছিলেন ; এবং সাধুদের সেবায় নিযুক্ত থাকলে ক্রমে নারদ ভগবানের পার্শ্বচর হতে পারবেন। নারদ তখন ভগবৎ চিন্তায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে থাকেন। গঙ্গা তীরে বহু দিন তপস্যা করে বিষ্ণুর ধ্যান করতে করতে নারদ মারা যান এবং ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। কয়েক কল্প করে ব্রহ্মা যখন আবার সৃষ্টি করতে থাকেন তখন তাঁর কণ্ঠ থেকে নারদ আবার জন্মান।

ব্রহ্মা এ বারও চেয়েছিলেন নারদ বিয়ে করুক। চতুরাশ্রমের মধ্যে দিয়েও মুক্তি পাওয়া যায় ইত্যাদি বোঝাতে থাকেন। মহর্ষি সৃঞ্জয়ের মালতী অপর নাম দময়ন্তী নামে একটি মেয়ে আছে। শিবের বর আছে এই জন্মে এদের বিয়ে হবে। নারদকে ব্রহ্মা নরনারায়ণের আশ্রমে যেতে বলেন ; নরনারায়ণ বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। নারদ বাধ্য হন এবং পর্বত মুনির সঙ্গে তীর্থযাত্রায়/পৃথিবী পরিক্রমায় বার হয়ে ঘুরতে ঘুরতে সৃঞ্জয় রাজার কাছে আসেন। রাজা এঁদের থাকবার ব্যবস্থা করে দেন ; রাজার মেয়ে দময়ন্তী/মদয়ন্তী এঁদের পরিচর্যা করতে থাকেন এবং নারদের প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। পর্বতমুনির সন্দেহ হয় ; নারদের কাছে কথাটি তুললে নারদ ও স্বীকার করেন তিনি দময়ন্তীর প্রতি মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন। পর্বতমুনি তখন ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন।

তীর্থযাত্রায় বার হবার সময় তাঁদের মধ্যে অঙ্গীকার ছিল কেউ কোন কথা গোপন রাখবেন না ; অথচ নারদ এ কথা এত দিন গোপন রেখে ছিলেন। নারদকে পর্বত মুনি শাপ দেন বানরে পরিণত হতে হবে। নারদ ও শাপ দেন পর্বতকে একশ বছর ; স্বর্গে যেতে পাবেন না, নরকে থাকতে হবে। এ দিকে সৃঞ্জয়ের মন্ত্রীরা অন্য বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলেন ; কিন্তু দময়ন্তীর কষ্টে কাতর হয়ে শেষ পর্যন্ত রাজা বানরের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেন। একশ বছর/বহুদিন পরে পর্বত মুনি শাপ মুক্ত হয়ে ফিরে এলে বানর রূপী নারদ পর্বতকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং মুনি নারদকে বানরত্ব থেকে মুক্তি দেন। রাজপ্রাসাদে নারদ বহু দিন সুখে কাটান এবং দময়ন্তী মারা গেলে নারদ ব্রহ্মলোকে ফিরে যান। মহাভারতে আছে পর্বত শাপ দিয়েছিলেন বিয়ে করলেই বানর মুখ হতে হবে এবং নারদ শাপ দিয়েছিলেন স্বর্গবাসমাপ্স্যসি (১২।৩০।২৬)। মহাভারতে আছে বহু দিন পরে দুজনের আবার দেখা হয় এবং দুজন দুজনকে শাপ মুক্ত করেন (মহা ১২।৩০।৩৭)।

সৃষ্টির কাজ শেষ হয়ে গেলে ব্রহ্মার নির্দেশে দক্ষ (দ্রঃ) বীরণীকে বিয়ে করেন। বীরণীর ৫-হাজার ছেলে হয় ; এঁদের নাম হর্যশ্ব। এরাও বিয়ে করে সন্তানের জন্ম দিতে যাবেন এমন সময় নারদ এসে এদের পরামর্শ দেন পৃথিবীর সীমা আগে খুঁজে দেখতে। ফলে হর্যশ্বেরা চার দিকে বার হয়ে পড়েন এবং আর ফেরেন না। এর পর দক্ষ শবলাশ্ব নামে সন্তানদের জন্ম দেন। এঁদের ও নারদ আবার ঐ ভাবে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেন। দক্ষ আবার ৫-হাজার সন্তানের জন্ম দেন এবং এঁদেরও নারদ বিরাট বিশ্বে ছড়িয়ে দিলে দক্ষ/ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে নারদকে শাপ দেন দক্ষের ছেলে-দের মত নারদও সারা জীবন পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। কোন স্থায়ী আবাস থাকবে না এবং এক বার দক্ষের ছেলে হয়েও জন্মাতে হবে।

নারদ একবার কীট হয়ে জন্মান। এক বার নারদ যখন দ্বারকাতে ছিলেন তখন কৃষ্ণের সঙ্গে এক দিন বিমানে করে বার হন। পথে একটি নদী পড়ে ; নারদ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। কৃষ্ণ বলেন আগে স্নান করে তারপর যেন জল পান করেন। কিন্তু নারদ সে কথা না শুনে আগেই জল খান এবং সুন্দরী একটি রমণীতে পরিণত হন। কৃষ্ণকে আর দেখতে পান না। বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে এক ঋষির আশ্রমে আসেন ; বিয়ে হয় এবং ষাটটি ছেলে হয়। এর পর এক দিন এই ঋষি ও ছেলেগুলি সব মারা যান। নারদ শোকে কাতর হয়ে পড়েন ; এদের শেষকৃত্য করতে হবে তাও সংযত হতে পারছিলেন না। এই সময় ভীষণ ক্ষিদে লাগে। কাছে একটা আম গাছ ছিল। ক্ষিধেতে এত অস্থির হয়ে পয়ড়ন যে মৃত দেহগুলি পর পর গাদা করে তার ওপর উঠে আম পাড়েন। ইতি মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ এসে বলেন এই অবস্থায় স্নান না করে খাওয়া অনুচিত। রমণীটি তখন আমটি হাতে নিয়ে নদীতে গিয়ে ডুব দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের পূর্ব দেহ ফিরে পান। যে হাতটিতে আমটি ছিল সেই হাতটি উঁচু করে রেখেছিলেন, জল লাগেনি ; হাতটি চুড়ি সমেত মেয়েছেলের হাত রূপেই থাকে। নদীর তীরে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণে রূপান্তরিত হয়ে যান। কৃষ্ণ তখন আবার ডুব দিতে বলেন এবং নারদ সম্পূর্ণ ডুব দিয়ে উঠে আসেন ; হাতটি এবার নিজের হাতে পরিণত হয় এবং হাতের আমটি বীণাতে পরিণত হয়। কৃষ্ণ বলেন ঐ ঋষি

ছিলেন কাল পুরুষ। মায়া কি জিনিস নারদ এই ভাবে প্রত্যক্ষ করেন। আরও একবার মায়া কি জিনিস দেখতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণ জানান পরে দেখাবেন। এর পর এক দিন পথে বেড়াতে বেড়াতে বৃষ্টি এলে নারদ একটি কুঁড়ে ঘরে গিয়ে ওঠেন। এখানে একটি সুন্দরী যুবতী ছিল। এঁকে দেখে নারদ মুগ্ধ হয়ে বহু বছর এর সঙ্গে বাস করতে থাকেন এবং অনেকগুলি সন্তান হয়। এর পর এক বন্যায় স্ত্রী ও সন্তান গুলি সব ভেসে যায়। নারদ শোকে কাতর হয়ে পড়েন। কৃষ্ণ এই সময় দেখা দিয়ে শোক করতে বারণ করেন; কারণ এ সব বৃথা। দ্রঃ তালজঙ্ঘে।

কলি যখন পৃথিবীতে জাঁকিয়ে বসেছেন তখন কলির কীর্তি দেখবার জন্য নারদ সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে থাকেন। যমুনা তীরে কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রে একটি মেয়েকে দেখতে পান; মেয়েটির দুপাশে দুটি বৃদ্ধ অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে এবং মেয়েটি এদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন নারদ দেখতে পান। আরো বহু মেয়ে পাশে ছিল তারাও এদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্য বাতাস করছিল ও মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিল। নারদ এগিয়ে এসে মেয়েটির পরিচয় পান, তার নাম ভক্তি; এই দুটি বৃদ্ধ তাঁর ছেলে; একজনের নাম জ্ঞান ও আর এক জনের নাম বৈরাগ্য। বাকি যারা রয়েছেন এঁরা পুণ্যতোয়া নদী; ভক্তিকে সেবা করতে এসেছেন; মেয়েটি আরো বলেন দ্রাবিড় দেশে কর্ণাটকে তার জন্ম। গুজরাটে গিয়েছিলেন; নাস্তিকরা কলির প্রভাবে তাঁর দেহ ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছিল: উপস্থিত অত্যন্ত দুর্বল। মেয়েটি আরো বলেন বৃন্দাবনে এসে নিজের যুবতী দেহ আবার ফিরে পেয়েছেন; কিন্তু এখনও জ্ঞান হয় নি; এদের জন্য মেয়েটির দুঃখের সীমা নাই। মেয়েটি জানতে চান তাঁরা তিন জনে এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন; মা আবার যুবতী হল অথচ ছেলে দু জন বৃদ্ধই রয়ে গেল এ রকম অসঙ্গতির কারণ কি। নারদ বেদাঙ্গ পড়ে শোনান কিন্তু কোন ফল হয় না। এই সময় ব্রহ্মের মানস পুত্রেরা সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, সনৎসুজাত ইত্যাদি নারদকে ভাগবৎ পাঠ করতে বলেন। ভক্তির ছেলে দুটি আবার যুবাতে পরিণত হন। নারদ একবার কৌতূহলে কৃষ্ণকে পরীক্ষা করতে যান এবং কৃষ্ণকে (দ্রঃ) তাঁর প্রতিটি স্ত্রীর ঘরে যুগপৎ দেখতে পান। শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসাবে নারদ একবার অত্যন্ত গর্বিত হয়ে ওঠেন। বিষ্ণু তখন এঁকে বনে এক জায়গায় নিয়ে যান; বহু সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে; ছটপট করছে নারদকে দেখান। এঁরা নিজেদের পরিচয় দেন এঁরা বিভিন্ন রাগিণী; নারদের হাতে তাঁদের এই দশা হয়েছে। নারদের তখন গর্ব নষ্ট হয়। নারদের সঙ্গে এক বার হনুমানের দেখা হয় এবং হনুমান একটি গান শোনান। গান শুনতে শুনতে নারদ তাঁর বীণাটিকে একটি পাথরের ওপর রাখেন। গানে পাথরটি গলে গিয়েছিল; বীণা এই গলা পাথরের মধ্যে ডুবে যায় এবং গান থামলে পাথরটি আবার জমে ওঠে এবং বীণাও এই পাথরের মধ্যে আটকে যায়। হনুমান তখন নারদকে বলেন গান গেয়ে পাথরকে গলিয়ে নিজের বীণা খুলে নিতে। নারদ চেষ্টা করে বিফল হন। হনুমান তখন আবার গান করেন; নারদ বীণা ফিরে পান এবং লজ্জায় ফিরে যান। ব্রহ্মার কাছে নারদ গান শিখেছিলেন। পরে বিষ্ণুর কাছে গন্ধর্ব তুম্বুরুর গান শুনে নিজের সঙ্গীতজ্ঞান অপূর্ণ বুঝে বিষ্ণুর পরামর্শে উলূকেশ্বর গন্ধর্বের কাছে গান

শেখেন। শেষকালে কৃষ্ণের দয়ায় জ্ঞান যোগ, গীতযোগ ও উপদেশামৃত শুনে ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। নারদ একবার বীণা বাজাতে বাজাতে বৈকুণ্ঠে এলে লক্ষ্মী দেবী সলজ্জ ভঙ্গিতে সেখান থেকে চলে যান। বিষ্ণুকে নারদ এর কারণ জানতে চান। বিষ্ণু বলেন মারকে সকলে সম্পূর্ণ জয় করতে পারে না ; লক্ষ্মীও পারেন নি ; নারদকে ভাল লেগে গেছে ফলে লজ্জায় উঠে গেছেন। নারদ এক বার সনৎকুমারের কাছে গিয়ে ব্রহ্ম বিদ্যা শিক্ষা করেন। ব্রহ্ম নারদকে হরে রাম, হরে রাম ষোলটি শব্দযুক্ত মন্ত্র শিক্ষা দেন ; এই মন্ত্রে কলির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। রামায়ণ রচনা করার জন্য রামের কাহিনী বাল্মীকিকে শুনিয়ে গিয়েছিলেন ; অর্থাৎ কাহিনী নারদের কাছে পাওয়া। সন্তানহীন ব্যাস একবার এঁর কাছে জানতে চান কি করলে সন্তান লাভ হবে। নারদ পরাশক্তির আরাধনা করতে বলেন। ব্যাস কৈলাসে গিয়ে আরাধনা করলে শুক জন্মলাভ করেন। কাহিনীর স্রোতের মধ্যে নারদ চমক এনে দিতেন। বৃকাসুর এক বার জানতে চান ত্রিমূর্তির মধ্যে কে আশু-তোষ ; নারদ জানান মহাদেব। অসুর তখন মহাদেবের তপস্যা করতে থাকেন। অগস্ত্যের (দ্রঃ) শাপে নারদের মহতী মানুষের হাতের বীণায় পরিণত হয়। নারদ এক কল্পে কশ্যপ ও মুনির সন্তান গন্ধর্ব হয়ে জন্মান। দ্রৌপদীর বিয়ের পর নারদ এসে পাণ্ডবরা বিবাহিত জীবন কি ভাবে কাটাবেন ব্যবস্থা করে যান এবং সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী শুনিয়ে যান। প্রশ্নোত্তর ছলে যুধিষ্ঠিরকে বহু উপদেশ দিয়েছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণের পর নারদ এসে ইন্দ্রের অমরাবতী, ব্রহ্মা যম ও বরুণের সভার বর্ণনা শুনিয়ে যান। রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করেছিলেন। কৌরব পক্ষ নিহত হলে নারদই বলরামকে গিয়ে খবর দিয়ে আসেন। কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর মৃত্যুর খবরও নারদ যুধিষ্ঠিরকে এনে দিয়ে দিয়েছিলেন। সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতির কাছে সত্যবানের অল্পায়ুর কথা জানান এবং সাবিত্রীকেই সমর্থন করেছিলেন ফলে সাবিত্রীর সঙ্গে সত্যবানের বিয়ে হয়।

বীণা বাজিয়ে ত্রিভুবন ঘুরে সকলকে মোহিত করে বেড়াতেন। পরামর্শ দেওয়া, গোপন খবর জানিয়ে দেওয়া, ঘটকালি ইত্যাদিতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন যেন। প্রকর্তা কলহানাং নিত্যং চ কলহপ্রিয়ঃ (মহা ৯।৫৩।১৮)। শিবের বিয়ে দেওয়া, ধ্রুবকে তপস্যার মন্ত্র দেওয়া, দক্ষের দর্প চূর্ণ করার ব্যবস্থাও এঁর কাজ। দেব সভায় কংস বধের যে পরিকল্পনা হয়েছিল কংসকে সেটি জানিয়ে দেন ; অনিরুদ্ধ বন্দী হয়েছেন কৃষ্ণকে খবর দেন, সগরের ছেলেরা কপিলের শাপে মারা গেছেন জানিয়ে বলে যান ইত্যাদি। কোন গোপন খবর প্রকাশ করে দেবার যেন একটা দুর্বার চেষ্টা ছিল ; ফলে গোলযোগ/কলহ বেড়ে যেত। নারদ মাতুল এবং পর্বত ঋষি ভাগনে (মহা-১২।৩০।৬)। নারদের বাহন ঢেঁকি ; কিন্তু শাস্ত্রে উল্লেখ নাই। নারদ স্মৃতি, নারদ রচনা বলে পরিচিত। বিশ্বসাহিত্যে এ রকম ভবঘুরে চরিত্র আর নাই। কেবল ভব ঘুরে নয় ; ভূমার স্বাদ পেয়েছে এবং অপরকে (হর্যশ্ব ইত্যাদিকে) ভূমার সন্ধান ও দিয়েছে। ব্রহ্মার ও সংসারের মুখে তুড়ি মেরে বেড়িয়েছে এই মহাবাউল। দ্রঃ নলকূবর ; কংস। বৃদ্ধকন্যা।

নারদ— বিশ্বামিত্রের এক ব্রহ্মবাদী ছেলে।

নারদী—বিশ্বামিত্রের এক ব্রহ্মবাদী ছেলে।

নারাচ—লৌহময় বাণ।

নারায়ণ—প্রলয়ের পর নারায়ণ অনন্ত শয্যায় যোগ নিদ্রায় শুয়ে ছিলেন। সেই সময়ে তাঁর হাজার মাথা, হাজার চোখ, হাজার হাত ও হাজার পা ছিল। এর পর এঁর নাভি থেকে সাত যোজন বিস্তীর্ণ এক পদ্ম বার হয়। এই পদ্মে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। দ্রঃ বিষ্ণু, নরনারায়ণ। নারায়ণ গায়ত্রী ঃ-ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

নারায়ণী সেনা—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যে দশ কোটি দুর্দ্ধর্ষ সেনা কৃষ্ণ (দ্রঃ) দুর্যোধনকে দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে অর্জুন এদের নিহত করেন।

নালিক—এক জাতীয় বাণ।

নালন্দা—২৫°৫´ উ এবং ৮৫°২০´ পূ। বক্তিয়ারপুর রাজগির রেল লাইনে একটি স্টেসন। রাজগিরের প্রায় ১০ কি-মি উত্তরে। বুদ্ধদেব কয়েক বার নিজে এখানে এসেছিলেন। এখানে পাবরিকের আম্রকুঞ্জ তাঁর প্রিয় আবাস ছিল। সারিপুত্রের জন্মস্থান। মহারাজ অশোক এখানে সারিপুত্রের চৈত্যে উপাসনা করেছিলেন। নাগার্জুন (খৃ ২-শতক) এখানে প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে কয়েক বছর অধ্যয়ন করেন। খৃ ৫-শতকে গুপ্তরাজাদের সাহায্যে নালন্দাতে সমৃদ্ধির একটি পরম যুগ এসেছিল। প্রথম বিহারটি মনে হয় গুপ্ত যুগে প্রথম তৈরি হয় এবং পরে আটবার পুনর্নির্মিত হয়েছিল। গুপ্ত ও অন্যান্য রাজাদের এখানে সিলমোহর ইত্যাদি পাওয়া গেছে। একটি তাম্রপটে আছে সুবর্ণ দ্বীপের শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা বালপুত্রদেব একটি বিহার নির্মাণ করান এবং তাঁর অনুরোধে পালরাজ দেবপাল বিহারটির ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করেন। এখানে বুদ্ধদেবের ৮০ ফু উচ্চ একটি তাম্রমূর্তি নির্মাণেরও চেষ্টা হয়েছিল। সমগ্র বৌদ্ধ জগতে শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে এই সময়ে এর খ্যাতি ছড়িয়ে যায়। খৃ ১২-শ শতক পর্যন্ত এই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল। জ্ঞানের সমস্ত শাখা, এমন কি হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও বেদও পড়ান হত। ৮ম থেকে ১২শ খৃ শতকে পাল রাজাদের বদান্যতায় আরো সমৃদ্ধ ও প্রখ্যাত হয়ে ওঠে। মহাযান ও বজ্রযানের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখান থেকে শ্রমণরা দেশ বিদেশে বুদ্ধের বাণী নিয়ে যেতেন। ১২শ শতকের শেষাংশে মুসলমান আক্রণে নালন্দা ক্রমশ বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যেতে থাকে। এখানে বহু বিহার ও মন্দির ছিল। প্রধান মন্দিরটি প্রথমে ছোট ছিল। পরে পর পর ছ বার পরিবর্তনের ফলে বিরাট আকার হয়। ৪-র্থ বারের পরিবর্ধিত মন্দির গাত্রে চূণা নির্মিত সারি সারি বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তি সাজান। এখানে সংঘ মন্দিরগুলিতে যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবলোকিতেশ্বর, বজ্রপাণি, মঞ্জুশ্রী, জম্ভল, ত্রৈলোক্যবিজয়, যমান্তক, তারা, প্রজ্ঞাপারমিতা, মারীচী, হারিতী, অপরাজিতা ও মহামায়ূরী। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূর্তি হিসাবে বিষ্ণু, বলরাম, সূর্য, রেবন্ত, ও গণেশ পাওয়া যায়।

নাসত্য—অশ্বপধারী সূর্য (দ্রঃ) উত্তর কুরুতে এসে বড়বা রূপধারিণী স্ত্রী সজ্ঞার (দ্রঃ) সঙ্গে মিলিত হতে যান। পরপুরুষ আশঙ্কায় সংজ্ঞা ঘুরে দাঁড়ান। দু জনে পরস্পরের নাসিকা স্পর্শ করেন এবং মুখ ও নাসিকা থেকে নাসত্য ও দস্রের জন্ম হয়। রেতঃ

থেকে রেবন্ত (গুহ্যকাধিপতি) জন্মান। অশ্বিনী কুমার (দ্রঃ)।

নাসিক—মহারাষ্ট্রে একটি জেলা; ১৯°৩৫´-২০°৫৩´ উত্তর এবং ৭৩°১৫´-৭৪°৫৬´ পূর্ব। কয়েকটি গ্রাম ছাড়া সমস্ত জেলাটি একটি মালভূমি। সমুদ্র থেকে ৪০-৬০ মি ওপরে। প্রধান নদী গোদাবরী; অন্যগুলি গোদাবরীর উপনদী এবং গিরনা ইত্যাদি নদী রয়েছে। জেলাতে তিনটি প্রধান বিভাগ প্রাচীনতম পঞ্চবটী; গোদাবরীর পূর্ব তটে। বহু মতে এটি রামায়ণের পঞ্চবটী। পতঞ্জলে, বৃহৎসংহিতায়, বায়ুপুরাণে, বরাহপুরাণে, নন্দিসূত্র ইত্যাদিতে এর উল্লেখ রয়েছে।

নাসিক থেকে ৮ কি-মি দূরে অতীত নাম ত্রিরশ্মি পাহাড়ের ২৪-টি গুহা পাণ্ডবদের গুহা বা পাণ্ডুলেন নামে ও পরিচিত। এই গুহাগুলির অধিকাংশ গুহা খৃ ২ শতকের সৃষ্টি। এগুলি বৌদ্ধ বিহার/চৈত্যগৃহ। অলংকরণ স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য ইত্যাদিতে তুলনাহীন।

নিকষা—অন্য নাম কৈকসী। সুমালি রাক্ষসের মেয়ে; মায়ের নাম কেতুমতী। লঙ্কা রাক্ষসদের আবাস স্থল ছিল। কিন্তু বিষ্ণুর কাছে হেরে গিয়ে রাক্ষসরা পাতালে পালিয়ে যায়। সুমালি তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য পাতাল থেকে বার হয়ে আসেন এবং বিষ্ণুকে দমন করতে পারে এমন এক নাতির আশায় অন্য মতে কুবেরের ঐশ্বর্য দেখে কুবেরের পিতা বিশ্রবাকে বিয়ে করতে বলেন। তপস্যারত বিশ্রবার কাছে গিয়ে নিকষা অধোমুখে মাটিতে আঙুল দিয়ে দাগ দিতে থাকেন। বিশ্রবা তখন নিকষার পরিচয় ও আসার কারণ জানতে চাইলে নিকষা নিজের পরিচয় দেন এবং এখানে আসার কারণ ধ্যানে জেনে নিতে বলেন। বিশ্রবা নিকষার আসার কারণ জানতে পারেন। মহর্ষি বলেন প্রদোষ কালে নিকষা এসেছেন বলে তাঁর ছেলেরা রাক্ষস হবে। নিকষার অনুনয়ে শেষ পর্যন্ত বলেন ছোট ছেলে রাক্ষস হলেও ধার্মিক হবেন। নিকষার সন্তান যথাক্রমে রাবণ, কুম্ভকর্ণ শূর্পণখা ও বিভীষণ (রাম৷ ৭৷৯৷৩৮)। সপত্নী পুত্র কুবেরের ঐশ্বর্য্য দেখে ঈর্ষায় নিকষা ছেলেদের তপস্যা করে কুবেরের মত তেজ ও ঐশ্বর্য্য পেতে বলেছিলেন। অন্যমতে কুবের বিশ্রবার সেবা পরিচর্যা করবার জন্য পুষ্পোৎকটা, রাকা ও মালিনী তিন জন রাক্ষসীকে পাঠান। পুষ্পোৎকটার ছেলে হয় রাবণ ও কুম্ভকর্ণ; মালিনীর ছেলে বিভীষণ, এবং রাকার যমজ সন্তান খর ও শূর্পণখা (মহা ৩৷২৫০৷৩-৮)।

নিকায়—পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকের সমগ্র সূত্রসংগ্রহ অংশ। এই নিকায় ৫-ভাগে বিভক্ত। সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রে নিকায়গুলিকে আগম বলা হয়। (১) দীর্ঘ নিকায় =দীর্ঘাগম—বুদ্ধের উপদিষ্ট দীর্ঘাকার সূত্রগুলি সন্নিবেশিত গ্রন্থ। (২) মজ্ঝিম্ নিকায়=মধ্যাগম—এই ভাগে নিকায়গুলি নাতি দীর্ঘ ও নাতি হ্রস্ব। (৩) সংযুক্তি নিকায়—বিষয়বস্তুর দিকে সঙ্গতি রেখে অধ্যায় সম্মত ভাগ করা হয়েছে ফলে এই নাম। (৪) অঙ্গুত্তর নিকায়—অঙ্গ-উত্তর নিকায়—বুদ্ধোপদিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ক কথোপকথন ও উপদেশাবলী উত্তর ও প্রত্যুত্তর হিসাবে সাজান; ফলে এই নাম। গ্রন্থটি ত্রিপিটকের সার সংগ্রহ। (৫) খুদ্দক নিকায়—ছোট ছোট সূত্র ও শ্লোক সংগ্রহ।

নিকুম্ভ—(১) কুম্ভকর্ণের ঔরসে স্ত্রী বজ্রমালার একটি ছেলে; অপর ছেলে কুম্ভ। নিকুম্ভ রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং হনুমানের হাতে মারা যান। (২) এক জন

অসুর। হরিবংশ মতে ব্রহ্মার বর ছিল বিষ্ণুর হাতে মারা যাবেন। মায়াতে নানা আকার ধারণ করতে পারতেন। কৃষ্ণের বন্ধু ব্রহ্মদত্তের মেয়েদের হরণ করেন এবং নানা মূর্তি ধারণ করে ব্রহ্মদত্তকে যুদ্ধে নিহত করেন। শেষ কালে কৃষ্ণের হাতে মারা যান। (৩) গণেশ নিকুম্ভ নামে বারণসীতে এক মন্দিরে পূজিত হতেন। রাজা দিবোদাসের স্ত্রী সুযশা এঁকে বহু দিন পূজা করলেও কোন সন্তান হয় নি। রাজা তখন রাগে নিকুম্ভ বিগ্রহ ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেন। নিকুম্ভ তখন শাপ দেন বারাণসীও ধ্বংস হবে। এই শাপের জন্যই তালজঙ্ঘ ইত্যাদির আক্রমণে কাশী (দ্রঃ) ধ্বংস হয় এবং দিবোদাস পালিয়ে যান। পরে আবার নিকুম্ভ মন্দির তৈরি করা হয়; কাশীও আবার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। (৪) প্রহ্লাদের তৃতীয় সন্তান। (৫) হিরণ্যকশিপু বংশে এক জন দৈত্য; ছেলে সুন্দ উপসুন্দ।

নিকুম্ভিলা—লঙ্কাতে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞস্থান। এখানে যজ্ঞ করে যুদ্ধে যেতেন। বিভীষণের সাহায্যে লক্ষ্মণ এখানে এসে যজ্ঞ কালে ইন্দ্রজিৎকে বধ করেন।

নিকেত—একটি পুণ্যস্থান। এখানে বিশ্রবা মুনির ছেলে কুবের জন্মান (মহা ৩।৮৭।৩)।

নিক্ষুভা—একজন অপ্সরা। মিহির গোত্রে এক ব্রাহ্মণ, নাম সুজিহ্ব; সূর্যের শাপে নিক্ষুভা এঁর মেয়ে হয়ে জন্মান। পিতার নির্দেশে নিক্ষুভা সব সময় অগ্নি প্রজ্বলিত রাখতেন। এক দিন এই আগুন হঠাৎ জ্বল জ্বল করে জ্বলে ওঠে; নিক্ষুভার সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং সূর্য মুগ্ধ হয়ে যান। পর দিন সূর্য এসে সুজিহ্বকে জানান এই মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছেন; নিক্ষুভা গর্ভবতী হয়েছেন। সুজিহ্ব এতে রেগে গিয়ে মেয়েকে শাপ দেন তার সন্তানদের সকলে ঘৃণা করবে। সূর্য নিক্ষুভাকে সান্ত্বনা দেন ঘৃণা করলেও এরা সুশিক্ষিত ও পণ্ডিত হবে এবং অগ্নির আরাধনা করতে পারবে। সূর্যের ঔরসে নিক্ষুভার অনেকগুলি ছেলে হয়েছিল। ভোজ পরিবারে এই ছেলেদের বিয়ে হয়েছিল। নিক্ষুভা যখন শক দ্বীপে বাস করতেন সেই সময়ে কৃষ্ণের ছেলে শাম্ব নিক্ষুভার ছেলেদের শাম্বপুরে সূর্য মন্দিরে পূজা করবার জন্য পাঠান।

নিঘণ্টু—অর্থ-শব্দ সংগ্রহ। সাধারণত বোঝায় বৈদিক শব্দ সংগ্রহ। এর ব্যাখ্যা/টীকার নাম নিরুক্ত। বহু নিঘণ্টু রচিত হয়েছিল মনে হয়। একটি মাত্র নিঘণ্টু এবং যাস্ক কৃত এর নিরুক্তই বর্তমানে পাওয়া যায়। কিছু মতে এই নিঘণ্টুটি যাস্ক দ্বারা সংকলিত।

নিঘ্ন—দ্রঃ সত্রাজিৎ।

নিধি—কুবেরের নয়টি রত্ন। এদের নাম পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, শঙ্খ, কুন্দ, খর্ব ও নীল।

নিধ্রুব—কশ্যপ বংশে ঋষি বৎসার ছেলে। স্ত্রী, চ্যবন সুকন্যার মেয়ে সুমেধস্। অনেকগুলি ছেলে নাম কুণ্ডপায়িন্।

নিবাতকবচ—হিরণ্যকশিপুর ছেলে সংহ্লাদের বংশ। সংখ্যায় এঁরা তিন কোটি। এঁদের কবচ বাতহীন; অর্থাৎ অভেদ্য। তপস্যা ও কৃচ্ছ্র সাধন করে নিজেদের জীবন এঁরা পবিত্র করে ছিলেন। ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে সমুদ্রের নীচে মণিমতী নগরীতে বাস করার ও দেবতাদের অবধ্য হবার বর পান। নিবাতকবচ ও কালকেয়রা মিলে বিরাট একটা দল গড়ে তুলেছিলেন। রাবণ এক বার এঁদের নগরী

আক্রমণ করেন ; ভীষণ যুদ্ধ হয়। এবং শেষ অবধি দু জনে মিত্রতা স্থাপন করেন। পরে সারা পৃথিবী নাশের কারণ হয়ে পড়েন ও দেবতাদের ওপর অত্যাচার করতে থাকেন। স্বর্গে অস্ত্র-শিক্ষা করে অর্জুন গুরু দক্ষিণা দিতে চাইলে ইন্দ্র এঁদের নিধন করতে বলেন। মাতলি চালিত রথে ভীষণ যুদ্ধে অর্জুন এঁদের প্রায় সকলকে নিহত করেন। রামায়ণ অনুসারে বিষ্ণুর হাতে নিহত।

নিমি—সূর্যবংশে ইক্ষ্বাকুর ১৩টি ছেলের মধ্যে এক জন। ধার্মিক রাজা, দানশীল, বহু যজ্ঞ করেছিলেন। হিমালয়ে বৈজয়ন্ত নগরে রাজত্ব করতেন। গৌতম মহর্ষির আশ্রমের কাছে ব্রাহ্মণদের জন্য জয়ন্তপুর নগরী নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এক বার ৫০০ বৎসর ব্যাপী যজ্ঞের আয়োজন করেন ; বহু অর্থ ব্যয় সাপেক্ষ যজ্ঞ ; পিতা অনুমতি দেন। গৌতম, অত্রি, অঙ্গিরা, বামদেব, পুলস্ত্য, পুলহ, ঋচীক, ভৃগু ইত্যাদি বহু ঋষিকে যজ্ঞে আহ্বান করেছিলেন। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে আহ্বান করেন ; কিন্তু বশিষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন ; কিছু দিন বা ৫০০ বছর মত অপেক্ষা করতে বলেন। রাজা ক্ষুণ্ণ হন ; অপেক্ষা করতে পারেন না ; গৌতমকে অপর মতে গৌতম পুত্র শতানন্দকে দিয়ে ৫০০ বছরে যজ্ঞ সম্পন্ন করান। ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ করে বশিষ্ঠ আসেন এবং গৌতমকে হোম করতে বা যজ্ঞ শেষ হয়ে গেছে দেখে নিজেকে অপমানিত মনে করেন। নিমি এই সময় ঘুমছিলেন, বশিষ্ঠ কয়েক মুহূর্ত রাজার জন্য অপেক্ষা করেন এবং তার পর শাপ দেন নিমির দেহ থেকে আত্মা বার হয়ে যাবে। অনুচরেরা রাজাকে ঘুম থেকে তুলে এই শাপের কথা জানালে নিমি বশিষ্ঠকে পায়ে ধরেন ; কিন্তু বশিষ্ঠ তবু শান্ত হন না ; নিমি তখন পাল্টা শাপ দেন তাঁরও আত্মা বিদেহ হবে ; দেহ অবিকৃত থাকবে। বশিষ্ঠ বিচলিত হয়ে ব্রহ্মার কাছে ছুটে যান। ব্রহ্মা জানান বশিষ্ঠই দোষ করেছেন। উপস্থিত দেহ ত্যাগ করে মিত্রাবরুণের তেজে মিশে অবস্থান করুন পরে কোন নারীর গর্ভে অবস্থান না করেই জন্ম হবে এবং পূর্বজন্মের সব কিছু স্মরণ থাকবে। বশিষ্ঠ মিত্রাবরুণের আশ্রমে এসে দেহত্যাগ করেন ; বশিষ্ঠের আত্মা/তেজ মিত্রাবরুণের দেহে গিয়ে মেশে। দ্রঃ অগস্ত্য। নিমি যজ্ঞস্থলে এসে ব্রাহ্মণদের সব কথা জানান এবং দেহত্যাগ করেন। মুনিরা রাজার দেহ তেল, ঔষধ ও মন্ত্র দিয়ে রক্ষা করে যজ্ঞ সমাধা করেন। দেবতারা শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে নর দেহ বা দেব দেহ দিতে চান। নিমি জানান তিনি আর শরীর চান না ; সমস্ত মানুষের চোখে বাস করতে চান। দেবতাদের বরে সেই থেকে রাজা সর্বভূতের চোখে বাস করেন এবং এই জন্য সকলের চোখে বিশ্রামের জন্য বার বার উন্মেষ ও নিমেষ দেখা দেয়। রামায়ণে আছে বায়ুভূত নিমি প্রাণীদের চোখে বাস করেন সেই জন্য মানুষের চোখে নিমেষ পড়ে থাকে। নিমির কোন সন্তান ছিল না শ্রাদ্ধ করবে। ঋষিরা নিমির দেহ গন্ধমাল্য দিয়ে পূজা করে অরণিতে মন্থন করতে থাকেন এবং একটি ছেলের জন্ম হয়। মন্থন জাত সন্তান বলে নাম মিথি বা জনক (মৃত থেকে জাত) বা বিদেহ। এই বংশেই সীতার পিতা জনক জন্মেছিলেন। (২) দত্তাত্রেয়ের এক ছেলে। (৩) বিদর্ভ রাজের এক ছেলে ; মেয়েকে অগস্ত্যের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে স্বর্গে যান।

নিমেষ—গরুড়ের এক ছেলে। দ্রঃ নিমি।

নিম্বার্ক—এঁর প্রচারিত মতবাদ :-স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈত বাদ।

নিয়তি—বিধাতার স্ত্রী ; ছেলে প্রাণ। প্রাণের ছেলে মৃকণ্ডু এবং মৃকণ্ডুর ছেলে মার্কণ্ডেয়।

নিয়াপ্রাকৃত—এসিয়াতে খোতন দেশের সীমান্তে প্রাপ্ত প্রত্নলিপির ভাষা। বেশির ভাগ পাওয়া যায় নিয়া নামক স্থানে ; ফলে নাম নিয়াপ্রাকৃত। অশোকের পর কাবুল, কান্দাহার ও পেশোয়ারে খরোষ্ঠী অক্ষরে যে ভাষা প্রচলিত ছিল তারই জ্ঞাতি ভাই। নিয়া প্রত্নলিপিগুলি সবই খরোষ্টীতে লেখা ; দুটিতে কেবল ব্রাহ্মীলিপি। এটি কথ্য ভাষা মিশ্রিত সাধুভাষা।

নিরমিত্র—নকুলের ও করেণুমতির ছেলে। (২) এক জন ত্রিগর্ত রাজ ; সহদেবের হাতে মারা যান।

নিরুক্ত—দ্রঃ নিঘণ্টু। যাস্ক লিখিত বৈদিক অভিধান। বেদের কঠিন শব্দের বিশ্লেষণ, প্রয়োগ ও অর্থ এই গ্রন্থে দেওয়া আছে। মোটামুটি ২৫০০ বৈদিক শব্দের আলোচনা। গ্রন্থটিতে ১২টি অধ্যায় ; প্রতি অধ্যায় ৪টি পাদ : প্রতিপাদে একাধিক খণ্ড। প্রথম অধ্যায়ে শব্দশাস্ত্রের সাধারণ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে একার্থ-বোধক শব্দগুলির নিবর্ত। ৪র্থ-৬ষ্ঠ অধ্যায়ে কঠিন শব্দগুলির অর্থ। ৭ম-১২শ অধ্যায়গুলি শেষ ছয় কাণ্ড নামে পরিচিত এবং এগুলি এক সঙ্গে দৈবত কাণ্ড নামে অভিহিত। ১৩শ-১৪শ অধ্যায় গ্রন্থটির পরিশিষ্ট।

নির্ঋতি—(১) একজন দিকপাল ; দ-পশ্চিম কোণে। এক জন রুদ্রও বটে। ব্রহ্মার ছেলে স্থাণুর পুত্র। রাক্ষসেশ্বর। রক্ষকূট পাহাড়ে বাস। জটাজুটধারী ; মহাকায়, কৃষ্ণাচলোপম, প্রাংশু, কৃষ্ণ বস্ত্র পরিধানে ; দু হাত। এঁর বিগ্রহ গর্দভ বাহন ; হাতে তরবারি। (২) অধর্মের স্ত্রী। তিন ছেলে ভয়, মহাভয় ও অন্তক। (৩) অলক্ষ্মী ; লক্ষ্মীর আগে সমুদ্র মন্থনে ওঠেন। লক্ষ্মী বিষ্ণুকে লাভ করেন ; এবং তার পর বিষ্ণুকে অনুরোধ করেন তাঁর বড় বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করতে। বিষ্ণু উদ্দালক মুনির সঙ্গে বিয়ে দেন। স্রবদারক্ত-নয়না, রুক্ষপিঙ্গশিরোরুহা স্ত্রীকে নিয়ে হোম-ধূপ-সুগন্ধাঢ্যং বেদঘোষ-মুখরিতম্ আশ্রমে মুনি ফিরে আসেন। কিন্তু অলক্ষ্মী এ আশ্রমে প্রবেশ করতে চান না। যেখানে নিত্য কলহ, অশান্তি, কটূক্তি, অপমান ও অন্যায় কাজ রয়েছে সেই রকম স্থানে/আশ্রমে থাকতে চান। উদ্দালক বিপন্ন হয়ে পড়েন ; নির্ঋতিকে অশ্বত্থ গাছের নীচে একটু অপেক্ষা করতে বলেন এবং আশ্রম খুঁজতে যাবার নামে পালিয়ে যান। বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অলক্ষ্মী কাঁদতে থাকলে লক্ষ্মী এই কান্না শুনে নারায়ণকে পাঠান। নারায়ণ এই অশ্বত্থ গাছে অলক্ষ্মীর বাস নির্দ্ধারিত করে যান।

নিশা—ভানুর তৃতীয় স্ত্রী। এঁদের সাত ছেলে অগ্নি, সোম, বৈশ্বানর, বিশ্বপতি, সংনিহিত, কপিল ও অগ্রণী এবং এক মেয়ে রোহিণী। মহা ৩।২১১।-।

নিশাকর—(১) এক জন মুনি ; বিন্ধ্যপর্বতে থাকতেন। দেবতারাও এঁকে শ্রদ্ধা করতেন। সম্পাতির ডানা পুড়ে গেলে এঁর আশ্রমের কাছে এসে পড়েন। মুনি সম্পাতিকে রক্ষা করেন। বহু দিন সম্পাতি মুনির সেবা করেছিলেন এবং মুনি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন সীতা অন্বেষণে বানরেরা এলে তাদের সীতার সংবাদ দিলে আবার ডানা গজাবে। এর পর আট হাজার বছর অপেক্ষা করার পর বানর দলের

সঙ্গে দেখা হয়। (২) মুগল মুনির ছেলে কোশকার সুপণ্ডিত ও তপস্বী। স্ত্রী ধর্মিষ্ঠা ; বাৎস্যায়নের মেয়ে। এদের একটি মূক, বধির ও হতশ্রী ছেলে হয়। ছেলেকে এরা বাড়ির বাইরে পরিত্যাগ করেন। সুরূপাক্ষী নামে এক রাক্ষসী শিশুদের ধরে নিয়ে যেত। এর কাছে একটি রোগা চিমসে ছেলে ছিল ; এটিকে রেখে দিয়ে বদলে ধর্মিষ্ঠার ছেলেকে নিয়ে স্বামীর কাছে খাবার জন্য ফিরে যায় এবং সব ঘটনা বলে। সুরূপাক্ষীর অন্ধ স্বামীও রাক্ষস ; তৎক্ষণাৎ শিশুকে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে বলেছিল ; কারণ কোশকার জানতে পারলে অভিশাপ দেবেন। এ দিকে কোশকার মূক ছেলের কান্না শুনে কৌতূহলে বাইরে বার হয়ে এসে দেখেন ছেলেটিকে কে যেন বদলে নিয়ে গেছে। কোশকার মন্ত্রযোগে শিশুটিকে মাটির সঙ্গে বেঁধে রাখেন। এ দিকে রাক্ষসী অলক্ষ্যে ফিরে এসে ধর্মিষ্ঠার ছেলেকে ফিরিয়ে দেয় বটে কিন্তু একে মাটি থেকে খুলে নিয়ে যেতে পারে না। কোশকার তার পর রাক্ষসীর দেওয়া শিশুটিকে স্ত্রীকে দিয়ে দেন এবং জড়বুদ্ধি শিশুটিকে নিজে পালন করতে থাকেন। ক্রমশ এদের সাত বছর বয়স হয় ; রাক্ষসীর দেওয়া বালকটির নাম রাখা হয় দিবাকর এবং কোশকারের ছেলের নাম হয় নিশাকর। দু জনেরই উপনয়ন হয় ; দিবাকর বেদ ইত্যাদি পাঠ করেন, নিশাকর কিছুই অধ্যয়ন করেন না ; সকলে এঁকে ঘৃণা করতেন। শেষ পর্যন্ত কোশকার একে এক কূপে ফেলে দিয়ে একটি পাথর চাপা দিয়ে দেন। নিশাকর বহু দিন কূপের মধ্যে বাস করেন ; কূপের মধ্যে যে সব গাছ হয়েছিল তার ফল খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। বছর দশেক পরে ধর্মিষ্ঠা এক দিন বন্ধ কূপ লক্ষ্য করে আপন মনে জিজ্ঞাসা করেন কে কূপ বন্ধ করল। কূপের মধ্য থেকে নিশাকর তখন উত্তর দেন পিতা কূপ বন্ধ করেছেন ; এবং পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। ধর্মিষ্ঠা তখন পাথর সরিয়ে ফেললে নিশাকর মায়ের সঙ্গে ঘরে ফিরে যান। বাড়িতে ফিরে পিতা কোশকারকে নিজের পূর্ব জন্মের কথা ও এ জন্মে মূকবধির হয়ে জন্মাবার কারণ জানান।

পূর্ব জন্মে বৃষাকপি ও মালার ছেলে হয়ে জন্মেছিলেন। বেদ ও সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে গর্বিত ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েন। অপরের স্ত্রী ও অর্থ অপহরণ করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে রৌরব নরকে যেতে হয়েছিল। নরকে হাজার বছর থাকার পরে একটি বাঘ হয়ে জন্মান ; তখনও কিছু পাপ অবশিষ্ট ছিল। এক রাজা এই বাঘকে বন্দী করে প্রাসাদে নিয়ে আসেন। এই রাজা এক দিন যখন অনুপস্থিত ছিলেন তখন রাজার সুন্দরী রানী অজিতাকে দেখে বাঘ কামুক হয়ে ওঠে। অজিতাও কামার্ত হয়ে পড়েন এবং বাঘের বন্ধন খুলে দেন। বাঘ রানীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকলে রাজার অনুচরেরা দেখে ফেলে এবং বাঘকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এর পর আবার নরকে হাজার বছর থাকার পর অগ্নিবেশ্য নামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে একটি সাদা গাধা হয়ে জন্ম হয়। ব্রাহ্মণের অনেকগুলি স্ত্রী ছিল। গাধার কাজ ছিল এদের বহন করা। এক দিন বিমতি নামে এক স্ত্রী গাধার পিঠে চড়ে বাপের বাড়ি যাত্রা করেন। পথে এই বিমতি একটি নদীতে স্নান করেন। এবং স্নানরতা বিমতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গাধাও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সেই সময়ে একটি লোক এসে গাধাকে ধরে ফেলে। গাধা লোকটির হাত থেকে কোন মতে

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে যায় এবং বিমতির কথা ভাবতে ভাবতে ছয় দিন পরে মারা যায় এবং আবার নরকে যেতে হয়। পর জন্মে শুক পাখী হয়ে জন্ম হয় এবং এক ব্যাধ এই পাখীটিকে ধরে এক বৈশ্য বণিকের কাছে বিক্রয় করে। বণিক বাড়িতে মেয়েদের পাখীটি দিয়ে দেন। এক দিন এই বণিকের স্ত্রী পাখীটিকে বুকে নিয়ে আদর করছিল। এই স্ত্রীলোকটির স্পর্শে শুকপাখী কামুক হয়ে পাখা দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে যায়, কিন্তু হটকারিতার ফলে মাটিতে পড়ে গিয়ে কপাটের চাপে পিষ্ট হয়ে মারা যায়। এর পর জন্মে এক চণ্ডাল গৃহে বৃষ হয়ে জন্ম হয়। চণ্ডাল এক দিন এই বৃষকে গাড়িতে জুড়ে স্ত্রীকে নিয়ে বনের দিকে যাচ্ছিল। পথে চণ্ডালের স্ত্রী গান করতে থাকে ; গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ফিরে দেখতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে বৃষ মারা যায় এবং আবার একশ বছর নরক বাস করার পর এইখানে এসে সে জন্মেছে। কূপে বাস করার পর তার সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে গেছে।

নিশাকর এই কাহিনী বলে বনে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন এবং বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হন। নিশাকর (১) ও নিশাকর (২) এক ব্যক্তি কিনা কোথাও উল্লেখ নাই।

নির্বাণ—নির্বাণ অর্থে মুক্তি। বুদ্ধের বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত। বৌদ্ধ দর্শনে শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ ; বিশেষ মুক্তি সূচিত হয়। মোটামুটি অর্থ :-(১) পুনর্জন্ম নিরোধ, (২) সব রকম বন্ধন থেকে মুক্তি, (৩) তৃষ্ণার বিনাশ, (৪) বাসনা ও আসক্তির বিনাশ (৫) পঞ্চস্কন্ধের নিরোধ, (৬) রাগ, দ্বেষ, ও মোহ ক্ষয়। নির্বাণ মানে মৃত্যু নয়। নির্বাণ লাভের পর বুদ্ধ ৪৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই হিসাবে নির্বাণ একটি আনন্দঘন জীবন।

নিশুম্ভ—কশ্যপের ঔরসে দনু/দিতির গর্ভে জন্ম। বড় ভাই শম্ভু, ছোট নমুচি। পাতালে জন্ম এবং সেইখানেই বড় হয়ে ওঠেন। যৌবনে পৃথিবীতে এসে কঠিন তপস্যা করেন। ব্রহ্মার কাছে অমর হবার বর চান। ব্রহ্মা দিতে রাজি হন না ; তখন বর চান কোন দেব, মানুষ, পাখী বা জন্তুর হাতে যেন মৃত্যু না হয়। এই বর পেয়ে এরা পাতালে ফিরে যান। শুক্রকে শুম্ভ নিশুম্ভ গুরু করেন। সোনার সিংহাসনে বসিয়ে শুম্ভকে গুরু অভিষেক করেছিলেন। ধূম্রলোচন, রক্তবীজ ইত্যাদি বহু দৈত্য এসে দলে যোগ দান করেন।

নমুচি ইন্দ্রের হাতে মারা যাবার পরবর্তী ঘটনা শুম্ভ রাজা। নিশুম্ভ সমস্ত পৃথিবী জয় করে দেবলোক আক্রমণ করেন। তীব্র যুদ্ধে নিশুম্ভ অজ্ঞান হয়ে যান ; সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে শুম্ভ এসে আক্রমণ করেন ; দেবতারা হেরে যান ; শুম্ভ স্বর্গেও রাজা হন ; ঐরাবত ইত্যাদি শুম্ভের হস্তগত হয়। কুবের ও যমকেও তাঁদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। হাজার বছর এই ভাবে কেটে যায়। দেবতারা দেবীর আরাধনা করলে দেবী দেখা দেন। দেবীর দেহ থেকে তার পর আর এক দেবী বার হয়ে আসেন ; ইনি কৌষিকী। কৌষিকীর রঙ কালো ফলে অপর নাম কালিকা। দেবী ও কালিকা তখন দেবলোকের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটি পাহাড়ের ওপর এসে অবস্থান করেন। মহিষাসুরের মন্ত্রী রক্তবীজের কাছে এর পর শুম্ভ জানতে পারেন দেবী দুর্গার হাতে মহিষাসুর মারা গেছেন এবং সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ড প্রাণভয়ে জলের নীচে লুকিয়ে আছেন। এই শুনে এরা কৌষিকী দেবীকে বিনাশ করবার জন্য চণ্ডমুণ্ডের

সঙ্গে মিলিত হন।

একটি মতে চণ্ডমুণ্ড এক দিন পথে যেতে যেতে শুম্ভ নিশুম্ভকে দেখতে পেয়ে এই অপরূপ সুন্দরী দেবীর কথা জানান। শুম্ভ তখন অনুচর সুগ্রীবের মুখে বলে পাঠান শুম্ভ নিশুম্ভ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর, এবং দেবীও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ; সেই হেতু দেবী এদের এক জনকে বিয়ে করুক। দেবী জানিয়ে দেন যুদ্ধে তাঁকে যে হারাতে পারবে তাকেই তিনি বিয়ে করবেন। ফলে প্রথমে ধূম্রলোচন তার পর চণ্ডমুণ্ড বিশ কোটি সৈন্য সমেত এবং তার পর রক্তবীজ দেবীকে ধরতে চেষ্টা করেন এবং তীব্র যুদ্ধে দেবীর হাতে নিহত হন। শেষকালে শুম্ভ নিশুম্ভও যুদ্ধে এসে মারা পড়েন। এই যুদ্ধে ব্রহ্মাণী মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, নারসিংহী এঁরা সপ্ত মাতৃকা : এঁরাও যোগ দান করেছিলেন। চামুণ্ডা রক্তবীজকে গিলে ফেলেন। দেবীর বর্শার আঘাতে নিশুম্ভ মারা যান এবং শুম্ভও মারা পড়েন। দেবতারা স্বর্গে ফিরে যান। দ্র: লঙ্কালক্ষ্মী, বিহুণ্ড, ও জলন্ধর।

নিশঠ—নিষঠ, নিসঠ, নিসথ। রেবতী ও বলরামের ছেলে। সুভদ্রার বিয়ের যৌতুক নিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে আসেন (মহা ১।২১৩।২৭)। রৈবতক পর্বতে মহোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর বিশ্বদেবে পরিণত হন।

নিশ্চবন—বৃহস্পতির দ্বিতীয় পুত্র। যশ, শ্রী ও বর্চস্ থেকে ইনি চ্যুত (চ্যবন) হন না (মহা ১।২০৯।১২)। পৃথিবীকে স্তব করেন। ছেলে সত্য।

নিষঙ্গী—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত।

নিষাদ—প্রাচীন ভারতে একটি অনার্য জাতি। নিষাদ অর্থে নিষাদ, পুলিন্দ, কোল্ল, ভিল্ল, মুণ্ডা খেরওয়াল, খাসিয়া, নিকোবরী, ইত্যাদি বর্তমানের অস্ট্রিক (দক্ষিণ-দেশীয়) গোষ্ঠী। দ্রঃ কিরাত, দ্রাবিড়। অবশ্য প্রাচীন যুগে নিষাদ, কিরাত ইত্যাদি নাম ব্যবহার হলেও এরা যে কারা কোথাও সে কথা আলোচিত হয় নি। কেবল বোঝা যায় রাজস্থান থেকে বাঙলা দেশ পর্যন্ত অরণ্যময় পার্বত্য অঞ্চলে নিষাদরা বাস করত। এদের জীবিকা ছিল শিকার করা ও মাছ ধরা। এরা কালো, মাথাতে পাখীর পালক এবং তীরন্দাজ। বর্তমানের হিসাবে এরা অস্ট্রিক জাতি। ভূমধ্যসাগরের পূর্বপ্রান্ত-বাসী জাতির একটি অতি প্রাচীন শাখা থেকে জন্ম। ভারতে দ্রাবিড়দের আগমনের আগে এরা এসেছিল। এদের চেহারা অতি দীর্ঘকায়, দীর্ঘ করোটি, ঋজু ও তনু দেহ ; মাথায় চুল লম্বা. ও কোমল, রঙ কালো, নাক চেপ্টা। ভারতে কৃষিমূলক গ্রামীণ সংস্কৃতি প্রধানত এদেরই দান। বলদ সাহায্যে চাষ ও পশুপালন এরাই সুরু করে-ছিল। সম্ভবত হাতীকেও এরা পোষ মানায়। বর্তমানে নিষাদ গোষ্টীর ভাষা অর্থে সাঁওতাল, মুণ্ডারি, হো, ভূমিজ, কোরুক, গদব, এবং সোরা বা শবর, আসামে খাসিয়া ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ভাষা।

অগ্নিপুরাণে আছে রাজা বেণের (দ্রঃ) উরু মথিত হলে এক বেঁটে কালো পুরুষ নিষাদ জন্মান। মনুর মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত সন্তান। রামায়ণে কোশল রাজ্যের বাইরে একটি নিষাদ রাজ্যের উল্লেখ আছে ; রাজধানী শৃঙ্গবের পুর ; রাজা গুহক। রামকে ইনি সাহায্য করেছিলেন এবং ভরতকে মাছ মাংস, ও মধু উপহার দিয়েছিলেন। দ্রঃ পৃথু।

নিষ্কৃতি—বৃহস্পতির ছেলে ; একটি অগ্নি। মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তি দেন বলে এই নাম।

নীতিসার—কামন্দক রচিত। বইটিতে প্রথমে কৌটিল্যকে প্রণাম করে বলা হয়েছে অর্থশাস্ত্রের অনুকরণে এই বই রচিত। নীতিসারে ২০টি সর্গ ও ৩৬ টি প্রকরণ রয়েছে। রাজার ও দেশের মঙ্গলের জন্য গুপ্ত হত্যা, বিশ্বাসঘাতকা ও বিষপ্রয়োগের কথা রয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী রাজাকে ছলে বলে ধ্বংস করতে বলা হয়েছে। অধিকাংশই অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত। এর টীকা জয়মঙ্গল ; জনৈক শঙ্করাচার্য রচিত। রাজ্যের কেন্দ্রীয়, প্রান্তীয় ও গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ নাই। স্মৃতির আইন কানুনের কথাও বাদ দেওয়া হয়েছে।

নীল—(১) এক জন বানর। অগ্নির অংশে জন্ম। সুগ্রীবের বন্ধু। সীতার খোঁজে বহু বানর নিয়ে দক্ষিণ দিকে গিয়েছিলেন। সেতু বন্ধনের সময় রামকে সাহায্য করে-ছিলেন। (২) মাহিষ্মতী নগরীর রাজা। হেহয় বংশ ; অসুর ক্রোধবশার অংশে জন্ম। অপর নাম দুর্যোধন ; স্ত্রী নর্মদা। এঁর মেয়ে স্বাহা/সুদর্শনাকে এক দিন যজ্ঞাগারে দেখে মুগ্ধ হয়ে অগ্নি বিয়ে করেন এবং জামাতা হিসাবে এখানে অবস্থান করতে থাকেন ও শ্বশুরকে বর দেন মাহিষ্মতী যে অবরোধ করবে সেই দগ্ধ হবে। রাজসূয় যজ্ঞের সময় সহদেব এই নগরী অবরোধ করলে অগ্নি সহদেবদের সৈন্যদের ঘিরে ফেলেন। পরে সহদেবের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা নীলকে কর দিতে অগ্নি রাজি করান। কুরুক্ষেত্রে ইনি পাণ্ডবদের দলে ছিলেন এবং অশ্বত্থামার শরে নিহত হন। দ্র জনা।

নীলকণ্ঠ—সমুদ্র মন্থনে বিষ উঠে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়লে বহু সুরাসুর মারা পড়েন। দেবতারা তখন মহাদেবের সাহায্য চাইলে সৃষ্টি রক্ষার্থে মহাদেব এই বিষ পান করে গলায় রেখে দেন। ফলে গলা নীল হয়ে যায়। এই জন্য নাম।

নীললোহিত—যাঁর কণ্ঠ নীল এবং জটা লোহিত। বা এক কল্পে যিনি নীল, অপর কল্পে লোহিত।

নৃগ—ইক্ষ্বাকুর একটি ভাই। নৃগের ছেলে সুমতি। রামায়ণে ছেলে বসু। অত্যন্ত ধার্মিক, সদাশয় ও ব্রাহ্মণ ভক্ত রাজা। পুষ্কর তীর্থে এক বার ব্রাহ্মণদের এক কোটি গরু দান করেন। পুষ্করের কাছে পর্বত বলে এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন ; তিনিও একটি সবৎসা গাভী পান। পর্বত এই গরুটিকে এখানে রেখে বনে গিয়েছিলেন এমন সময় অনার্ত নামে আর এক জন ব্রাহ্মণ এলে নৃগ এই গরুটিও অনার্তকে দিয়ে দেন। গরুটি আগে দান করা হয়ে গেছে খেয়াল ছিল না। অনার্ত খুসি হয়ে চলে যান। পর্বত ফিরে এসে নিজের গরু খুঁজতে খুঁজতে অনার্ত পণ্ডিতের ঘরে গরুটি খুঁজে পান। রামায়ণে (৭।৫৩।৮) আছে দরিদ্র এক ব্রাহ্মণের গরু রাজার গরুর সঙ্গে মিশে গিয়ে ছিল। পুষ্করে রাজা এটি দান করেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণটি বহু দিন ধরে খুঁজতে খুঁজতে কনখলে গিয়ে গরুটিকে দেখতে পান। শবলা নাম ধরে ডাকলে গরুটি ব্রাহ্মণকে চিনতে পারে ইত্যাদি। দুই মালিকের মধ্যে তখন বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। দু জনে তখন সমস্যা মেটাবার জন্য রাজার কাছে আসেন। রাজদ্বারে বহু দিন অপেক্ষা করার পরও রাজার দেখা না পেয়ে দুজনেই রাজাকে কৃকলাস হবার শাপ দেন। হাজার বছর এই ভাবে গর্তে কাটাতে হবে। শাপের কথা জানতে পেরে দুজনকেই

রাজা স্তবস্তুতি করেন এবং এঁরা বলেন বিষ্ণু যখন কৃষ্ণ হয়ে জন্মাবেন তখন তাঁর স্পর্শে মুক্তি পাবেন। কনখল থেকে আসা ব্রাহ্মণ দুজন শাপ দিয়েছিলেন শ্বভ্রে (গর্ত) 'অস্মিন্ বসিষ্যসি'। রাজা কিন্তু 'শিল্পীদের' দিয়ে ফলবন্ত, পুষ্পবন্ত, ছায়াবন্ত, হিমন্ন, গ্রীষ্মন্ন ইত্যাদি শ্বভ্র তৈরি, করিয়ে (রামা ৭।৫৪।১০) এবং ছেলে বসুকে রাজ্য দিয়ে এই শ্বভ্রে/গর্তে বাস করতে থাকেন।

রাজা দ্বারকাতে একটি পরিত্যক্ত কূপে কৃকলাস হয়ে জন্মান। মহাভারতে (১৩।৬৯-) আছে নৃগ যজ্ঞসহস্রযাযী। এক ব্রাহ্মণের গাভী রাজার গরুর পালে মিশে গিয়েছিল ; ইত্যাদি। দুই ব্রাহ্মণ রাজার কাছে এলে বহু কিছু দিয়ে রাজা গরুটিকে ফিরে চান। কিন্তু ব্রাহ্মণটি সম্মত হন না। গাভীর প্রকৃত মালিকও পরিবর্তে অন্য কিছু নিতে রাজি হন না। ব্রাহ্মণদের ঐ সমস্যা মেটাবার আগেই রাজা মারা যান। এই অজ্ঞানকৃত পাপের (ব্রাহ্মণস্ব অভিমর্শন মহা ১৩।৬৯।১) জন্য যম শাস্তি দেন কৃকলাস হয়ে থাকতে হবে এবং কৃষ্ণের স্পর্শে পাপ মুক্ত হয়ে স্বর্গে ফিরে যাবেন। রামায়ণ মতে 'কার্যার্থীদের সঙ্গে দেখা করতে দেরি বা অবহেলা করার জন্য এই শাস্তি (রামা ৭।৫৩।২৫)। এক দিন সাম্ব ও অন্যান্য যাদবরা, মহাভারত মতে কয়েক জন জলার্থী এটিকে দেখে কূপ থেকে এটিকে তুলতে চেষ্টা করেন। শেষ অবধি কৃষ্ণ এটিকে তোলেন এবং কৃষ্ণের স্পর্শে শাপ মুক্তি হয়। একটি মতে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি ঘটে।

নৃগ একবার বরাহ তীর্থে পয়োষ্ণী নদীর তীরে যজ্ঞ করেছিলেন। এই যজ্ঞে ইন্দ্র সোম রস পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। (২) দ্রঃ নরা, উশীনর

নৃত্য—ঋক্ বেদে বিবাহ, ফসল কাটা ও অন্যান্য উৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্যের উল্লেখ আছে। নর্তকী উষসের উল্লেখও রয়েছে। ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় নৃত্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। কৃষ্ণযযুর্বেদে ইয়াতি শব্দের অর্থ আবৃত্তি সহ নাচ। রামায়ণ, মহাভারতের যুগে নৃত্য ছিল সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অর্জুন দক্ষ শিল্পী ছিলেন। রাসনৃত্য ও পরিচারিকাদের নাচের ব্যপকতার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া শিবের তাণ্ডব ও উমার লাস্যের কাহিনী ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি পদে ছড়ান রয়েছে। সাঁচি, অমরাবতী, কণারক, খজুরাহো, অজন্তা, ইলোরা গুহাতে নাচের বিভিন্ন ভঙ্গি ফুটিয়ে রাখা হয়েছে। চিদাম্বরম মন্দিরে গোপুরমের গায়ে পাথরে খোদাই ১০৮-টি নৃত্যরত মূর্তি ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন সূত্রের উদাহরণ স্বরূপ গঠিত।

নৃষদ্—কণ্বের পিতা (ঋক্)।

নৃসিংহ—নরসিংহ। (দ্রঃ) নরনারায়ণ।

নেপাল—দিগ্বিজয়ের সময় কর্ণ নেপাল আক্রমণ করেছিলেন এক বার। দ্রঃ কাঠমুণ্ডু।

নেমি—দশরথ (দ্রঃ)।

নেমিচক্র—হস্তিনাপুরে এক রাজা। যমুনার বন্যায় হস্তিনাপুর এক বার নষ্ট হয়ে যায়। রাজা কৌশাম্বীতে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন।

নেমিনাথ—অরিষ্টনেমি। ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২২-শ তীর্থঙ্কর। জন্ম মথুরার কাছে সৌরিপুরে। পিতা সমুদ্র বিজয়, মাতা শিবা। গৌতম গোত্র, ক্ষত্রিয়। ছোট বেলা থেকেই উদাসীন। ভোজরাজ উগ্রসেনের কন্যা রাজীমতীকে বিয়ে করবেন ঠিক

হয়। কিন্তু উগ্রসেনের প্রাসাদের কাছে এসে পশুদের আর্তনাদ শুনে বিগলিত হয়ে পড়েন। বিবাহের ভোজের আয়োজনে এগুলি বধ করা হবে। নেমিনাথ সঙ্গে সঙ্গে সংসার ত্যাগ করে গিরনারে গিয়ে তপস্যা করেন ও কেবল জ্ঞান লাভ করেন। ভাবী বধূ রাজীমতীও নেমিনাথের পালিয়ে যাবার খবর পেয়ে তাঁর অনুগামিনী হয়েছিলেন।

নৈমিষারণ্য—গোমতী নদীর কাছে পুরাণ প্রসিদ্ধ তপোবন। উত্তর ভারতে সীতাপুর জেলায়; বর্তমান নাম নিমসর। গৌরমুখ মুনি বা বিষ্ণু এখানে নিমেষে অসুর সৈন্য পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছিলেন ফলে এই নাম। এই বনে সমবেত ঋষিদের সামনে সৌতি মহাভারত পাঠ করেন। শৌনক মুনি এখানে বার বছর যজ্ঞ করে ছিলেন। যজ্ঞে যে সব মুনিরা এসেছিলেন তাঁরা সরস্বতী নদীর তীরে নানা স্থানে কুটিরে বাস করছিলেন। যাঁরা স্থান পান নি তাঁরা পূব দিকে স্থানে স্থানে ছড়িয়ে অবস্থান করতে থাকেন। নদী সরস্বতী এতে দুঃখিত হয়ে পড়ে ঘুরে আবার পূর্ব গামিনী হন যাতে সমস্ত ঋষিরা তাঁর তীরে বসবাস করতে পারেন। আর এক কাহিনীতে আছে কলিযুগ এগিয়ে আসছে দেখে মুনিরা দল বেঁধে ব্রহ্মার কাছে যান এবং কি করণীয় জানতে চান। ব্রহ্মা তখন মুনিদের সামনে একটি চক্র এনে এটিকে অনুসরণ করতে বলেন। চক্র যেখানে গিয়ে থামবে সেখানে বাস করলে কলি যুগ স্পর্শ করতে পারবে না। সত্য যুগ আসা পর্যন্ত অনায়াসে এইখানে মুনিরা থাকতে পারবেন। চক্রটি তার পর নৈমিষারণ্যে এসে পড়ে এবং এখানে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। দ্রঃ দুর্জয়।

নৌকা—নৌকার ব্যবহারে ভারত বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছিল। মহেঞ্জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ, অজণ্টার গুহামন্দিরে ও সাঁচির স্তূপগাত্রে নৌকা আঁকা আছে। জাভাতে বোরোবুদুর মন্দিরে ভারতীয় নৌকার রূপায়ণ রয়েছে। যুক্তি কল্পতরু ও বৃক্ষ আয়ুর্বেদে নৌকার শ্রেণীবিভাগ, নৌকার অলংকরণ, এবং যাত্রীদের সুখ সুবিধা বিধানের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

ন্যগ্রোধ—উগ্রসেনের এক ছেলে। কংস মারা গেলে ইনি যুদ্ধ করেন এবং বলরামের হাতে মৃত্যু হয়।

ন্যায়—যা দিয়ে বাদীর বিবক্ষিত অর্থের সিদ্ধি বা নিশ্চয়কে লাভ করা যায়। ন্যায় প্রতিপাদক শাস্ত্র ও ন্যায় বা প্রমাণ-শাস্ত্র নামে অভিহিত। পরার্থ অনুমান ও তজ্জন্য প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্যগুলিই ন্যায়। এই পঞ্চাবয়ব বাক্যগুলি = প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়ন ও নিগমন। ন্যায়ে প্রতিপাদ্যাদি ১৬টি পদার্থ :—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞান ও শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান সংগ্রহের পর অনুমান, প্রমাণ, ও যুক্তি সাপেক্ষে মননই অন্বীক্ষা। অন্বীক্ষা শাস্ত্রের নাম আন্বীক্ষিকী। ন্যায় মতে প্রমেয় ১২-টি :—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ।

গৌতম কৃত ন্যায়শাস্ত্র ও বাৎস্যায়নাদি ভাষ্য ও টীকাদি প্রাচীন ন্যায় গ্রন্থ। গঙ্গেশ উপাধ্যায় ও পক্ষধর মিশ্র ইত্যাদির যুক্তি ধারাকে নব্য ন্যায় বলা হয়। ন্যায় মতে জ্ঞান দু রকম অনুভূতি ও স্মৃতি। অনুভূতি প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা প্রমা; স্মৃতি প্রকৃষ্ট

জ্ঞান নয়। যে জিনিস প্রকৃষ্ট অনুভূতি ঘটায় সেই জিনিসই প্রমাণ। গৌতম মতে প্রমাণ চতুর্বিধ :—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দপ্রমাণ। প্রত্যক্ষ অর্থে প্রতি+ অক্ষ (=যে কোন ইন্দ্রিয় বা মন)। প্রত্যক্ষ দু রকম :—লৌকিক ও অলৌকিক প্রত্যক্ষ। আর এক হিসাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দু রকম :—নির্বিকল্প ও সবিকল্প। অনুমান প্রমাণ তিন রকম :—পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট।

গৌতম ও কণাদের ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনকে অবলম্বন করে মোটামুটি ১৪-শ খৃ-শতকে প্রথমে মহামতি গঙ্গেশ (মিথিলাতে জন্ম) নব্যন্যায়ের প্রবর্তন করেন। গঙ্গেশ প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে কেবল প্রমাণকে মেনে নিয়েছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারটি প্রমাণ নিয়ে চার খণ্ডে রচিত গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থ। তত্ত্বচিন্তামণিতে অধ্যাত্ম তত্ত্ব অংশ অতি অল্প।

ন্যায় অজাকৃপাণীয়—খুঁটে ছাগল নিজের পা ঘসতে গিয়ে খুঁটে আলগা ভাবে বাঁধা কৃপাণ পড়ে গিয়ে ছাগলের মৃত্যু। নিজের হাতে নিজের বিনাশ।

ন্যায় অন্ধগোলাঙ্গুল—এক অন্ধকে এক জন শঠ একটি গরুর লেজ ধরিয়ে দিয়ে বলে গরুটি তাকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেবে; সে যেন লেজ না ছাড়ে। ফলে অন্ধকে গোরুর পেছু পেছু যেতে যে বিপদে পড়তে হয়। শঠের হাতে সরল মানুষের প্রতারণা।

ন্যায় অন্ধদর্পণ—অন্ধের কাছে দর্পণ নিষ্ফল। তেমনি অজ্ঞের কাছে শাস্ত্রও নিষ্ফল।

ন্যায় অন্ধপঙ্গু—অন্ধের কাঁধে পঙ্গু উঠে বসে পারস্পরিক সহযোগিতা।

ন্যায় অন্ধপরম্পরা—এক অন্ধ দুধকে কালো বলতে দ্বিতীয় অন্ধ কথাটা মেনে নিল। দ্বিতীয় অন্ধ থেকে তৃতীয় অন্ধ এই ভাবে ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়ে পড়া।

ন্যায় অরণ্যরোদন—জনশূন্য অরণ্যে রোদন নিষ্ফল।

ন্যায় অন্ধহস্তী—কতকগুলি অন্ধ হস্তীর স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে কেউ বলে হস্তী শুণ্ডের মত দেখতে ইত্যাদি। অংশত দৃষ্ট খণ্ড ধারণা।

ন্যায় অরুন্ধতীদর্শন—যে কোন একটি নক্ষত্র দেখিয়ে ক্রমশ দৃষ্টিকে অরুন্ধতীতে নিয়ে আসা। ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া।

ন্যায় অর্ধজরতী—চুল পাকেনি অথচ স্তন গলিত এ রকম স্ত্রী। প্রয়োজন কিছু সিদ্ধ কিছু অসিদ্ধ থাকা অবস্থা।

ন্যায় অশোকবনিকা—অশোক বনে ছায়া, সৌরভ ফল, ফুল সব পাওয়া যায়। তবু অন্যত্র যাবার ইচ্ছা।

ন্যায় অশ্বতরীগর্ভ—অশ্বতরীর গর্ভ তার মৃত্যুর কারণ হয়।

ন্যায় অশ্মলোষ্ট—লোহা তুলার চেয়ে কঠিন কিন্তু পাথরের চেয় নরম। অর্থাৎ নীচের সহিত তুলনায় যে উচ্চ সে আবার অপরের তুলনায় নীচ।

ন্যায় অহিনকুল—নিত্য শত্রুতার উদাহরণ।

ন্যায় উষ্ট্রকণ্টক ভক্ষণ—উটেরা কণ্টক যুক্ত পত্র খায়। অভীষ্ট লাভে প্রচুর কষ্ট পাওয়া।

ন্যায় কদম্বগোলক—কদম্বের সমস্ত অংশের এক সঙ্গে উদ্গম হয়। সবগুলি ঘটনার যুগপৎ সমাবেশ।

ন্যায় করকঙ্কন—করে অবস্থিত কঙ্কন মত। অন্যত্র রক্ষিত নয়।

ন্যায় কাকতালীয়—গাছ থেকে খসে পড়া তালের আঘাতে বৃক্ষমূলে অবস্থিত কাকের মৃত্যুরূপ অভাবনীয় যোগাযোগ।

ন্যায় কাকদন্তপরীক্ষা—কাকের দাঁত নাই জেনেও পরীক্ষা করতে যাওয়ার অনুরূপ চেষ্টা।

ন্যায় কাকাক্ষিগোলক—প্রবাদ কাকের একটি অক্ষিগোলক। প্রয়োজন মত দুটি চোখেই এই গোলক স্থানান্তরিত করে কাজ চালায়।

ন্যায় কূপমণ্ডূক—কূপের ব্যাঙ। বাইরে সংসারের অভিজ্ঞতা হীন।

ন্যায় কূপযন্ত্রঘটিকা—কূপযন্ত্রে ঘটিকাগুলি এক বার খালি হয় আবার ভর্তি হয়। জীবনে এই রকম পূর্ণতা ও শূন্যতার মালা।

ন্যায় কূর্মাঙ্গ—কচ্ছপের প্রত্যঙ্গ দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেও সেগুলি রয়েছে; কেবল বাহ্যত অদৃশ্য।

ন্যায় কৈমুতিক—পূরবর্ত্তী বাক্য বা শব্দের দ্বারা পরবর্তী অংশের অর্থ সমর্থিত হওয়া।

ন্যায় খলকপোত—বৃদ্ধ, শিশু যুবা সকলের এক সঙ্গে খলে (অর্থাৎ শস্য মাড়ার স্থানে) যুগপৎ এসে পড়া।

ন্যায় গড্ডালিকাপ্রবাহ—মেষ যূথের এগিয়ে যাওয়া। সামনের পশুগুলি বিপদে পড়লেও পেছনের পশুগুলি নির্বিচারে সেই পথেই এগিয়ে যায়।

ন্যায় গোবলীবর্দ—বলীবর্দও গরু। কিন্তু তবু পূর্ববর্তী গো শব্দ অর্থ প্রকাশে যেন কিছুটা সাহায্য করছে।

ন্যায় ঘট্টকুটীপ্রভাত—খেয়াঘাটে পয়সা দেবার ভয়ে অন্য পথে সারারাত ঘোরাফেরা করে প্রভাতে আবার সেই ঘাটে এসে হাজির হওয়া।

ন্যায় ঘুণাক্ষরে—ঘুণ কাঠে ছিদ্র করে; সেই ছিদ্র রেখা অক্ষর মত হলেও হতে পারে।

ন্যায় তক্রকৌণ্ডিন্য—সকল ব্রাহ্মণকে দই দাও এবং কৌণ্ডিন্য ব্রাহ্মণকে ঘোল দাও এই রকম ব্যবহার।

ন্যায় তৃণজলৌকা—তৃণজলৌকা (জোঁক) তৃণান্তর গ্রহণ করে পূর্বাশ্রিত তৃণ ত্যাগ করে। তেমনি মানুষ কর্মানুসারে পর জন্ম সৃষ্টি করে ইহ জন্ম ত্যাগ করে।

ন্যায় দগ্ধপট/পত্র—পুড়ে যাওয়া পট বা পত্রের আকার বোঝা গেলেও কোন কার্য সাধিত হয় না।

ন্যায় দণ্ডাপূপ—ইঁদুর দণ্ড খেয়ে ফেলেছে অর্থে দণ্ড সংলগ্ন পিষ্টকও খেয়েছে বুঝতে হবে।

ন্যায় দেহলীদীপ—চৌকাটের দীপ; ঘরের ভেতর ও বাইরে আলোকিত করে।

ন্যায় নষ্টাশ্বদগ্ধরথ—একের ঘোড়া গেল অন্যের রথ গেল। দুজনে তখন একের রথ ও অন্যের ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে যায়।

ন্যায় পঙ্কপ্রক্ষালন—পাঁক ঘেঁটে হাতপা ধোয়ার চেয়ে পাঁক না ঘাঁটাই ভাল।

ন্যায় পিষ্টপেষণ—পিষ্ট দ্রব্যের আবার পেষণ। নিরর্থক অনুষ্ঠান বা অত্যাচার।

ন্যায় বধ্যঘাতক—বধ্য ও ঘাতক একত্রে অবস্থান করে না। এদের সম্পর্ক।

ন্যায় বহ্নিধূম—যেখানে ধোঁয়া সেখানে আগুন আছে। সম্বন্ধ সূচকতা।

ন্যায় বিষকৃমি—বিষে জাত কৃমি বিষকে সহ্য করতে পারে।

ন্যায় বিষবৃক্ষ—নিজে পুঁতলে ও বিষবৃক্ষ কেটে ফেলা উচিত নয়। নিজের অর্জিত বিষয় নষ্ট করা অনুচিত।

ন্যায় বীজাংকুর—বীজ থেকে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর থেকে আবার বীজ। অর্থাৎ বীজ ও অঙ্কুর উভয়ই কার্য ও কারণ।

ন্যায়বৃদ্ধকুমারীবাক্য—বৃদ্ধ কুমারী বর চায় তার ছেলেরা যেন সোনার থালায় দুধভাত খেতে পায়। অর্থাৎ একই বরে স্বামী, পুত্র, সম্পতি লাভ।

ন্যায় মণ্ডূকপ্লুতি—বেঙের মত লাফিয়ে যাওয়া। কোন কিছুকে বাদ দিয়ে ডিঙিয়ে যাওয়া।

ন্যায় লাজবন্ধন—কোন স্তম্ভের কাছে বসে থাকা কোন ক্ষুধিত ব্যক্তি স্তম্ভের দু পাশ দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে অঞ্জলি ভরে তাড়াতাড়ি খই ভিক্ষা নেয়; কিন্তু খেতে পারা সম্ভব হয় ওঠে না।

ন্যায় লৌহচুম্বক—নিষ্ক্রিয় চুম্বক যেমন লোহাকে টেনে নেয় তেমনি কাজ করা।

ন্যায় শতপত্রভেদ—পদ্মের শত সংখ্যক দল পরপর রেখে সূচ দিয়ে বিদ্ধ করলে যুগপৎ দল গুলি বিদ্ধ হয়েছে মনে হলেও সবগুলি কিন্তু বিদ্ধ হয় না।

ন্যায় শ্যেনকপোত—শ্যেনের আকস্মিক আক্রমণ রূপ আকস্মিক দুর্ঘটনা।

ন্যায় সিংহাবলোকন—প্রসিদ্ধি সিংহ কোন পশু শিকার করে মাথা ঘুরিয়ে সামনে পেছনে দেখে নেয়।

ন্যায় সূচীকটাহ—প্রথমে অল্পব্যায় সাধ্য সূচী নির্মাণ করে পরে বহুব্যায় সাধ্য কটাহ নির্মাণ বিধেয়।

ন্যায় স্থালীপুলাক—স্থালীতে একটি তণ্ডুল সিদ্ধ হয়েছে দেখার ন্যায় একটি বস্তু থেকে সবগুলির অবস্থা জানতে পারা।

ন্যায় স্থূণানিখনন—গৃহের স্থূণাকে (খুঁটি) নিখনন দ্বারা শক্ত করার মত।

ন্যায় স্ফটিক লৌহিত্য—জবা ফুলের সান্নিধ্যে স্ফটিক লাল দেখায়। এই রূপে অপরের গুণে গুণান্বিত হওয়া বা দেখান।

ন্যায় দর্শন—অক্ষপাদ গৌতম রচিত। অন্য মতে দীর্ঘতমা ঋষি রচিত। ৫-টি অধ্যায়ে ১০ আহ্নিকে বিভক্ত। ৫২৮টি সূত্র। কি ভাবে অনুকূল ও প্রতিকূল তর্কের দ্বারা জ্ঞান বিশুদ্ধ ও ভ্রমশূন্য হয় তাই এর প্রতিপাদ্য।

প

পক্‌থ—সুদাসের বিরুদ্ধে দাশরাজ্ঞ-যুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। অশ্বিনীকুমাররা ও ইন্দ্র এই বৈদিক রাজা পক্থকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন।

পক্ষধর মিশ্র—মিথিলাতে নব্যন্যায়ের প্রবর্তক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পরবর্তী। আনুমানিক

খৃ ১৫-শতকে। তর্কে যে পক্ষ অবলম্বন করতেন সেই পক্ষ রক্ষিত হত বলে নাম। প্রকৃত নাম জয়দেব। যজ্ঞপতি উপাধ্যায় ও গ্যায় মিশ্র এঁর গুরু।
পক্ষতীর্থ—তামিলনাড়ু রাজ্যে চিংলেপুট জেলাতে (১২°৩৬´ উ×৮০°৩´ পূর্ব) একটি তীর্থ। ৫০০ ধাপ সিঁড়ি পার হয়ে ১৫২ মিটার মত ওপরে বেদগিরি পাহাড়ের চূড়ায় স্বয়ম্ভু শিবের মন্দির। একটু নীচে গুহা-মধ্যে পার্বতী মন্দির। পাশেই একটি মস্ত বড় পাথরের ওপর ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে দুটি সাদা রঙ পাখী পুরোহিতের হাত থেকে আহার্য গ্রহণ করে। কখনো একটি আসে। পাখী দুটি প্রবাদ শাপগ্রস্ত ঋষি ; দুই ভাই অম্বি ও শম্ভু ; কাশী থেকে রামেশ্বরের পথে রোজ এখানে বিশ্রাম করতে আসেন। এঁরা দু জনে যথাক্রমে শিব ও শক্তির উপাসক ছিলেন। কে বড় এই নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে শিবের কাছে মীমাংসার জন্য আসেন এবং মহাদেব দু জনকেই সমান বলেন। এ বিচার এদের মনঃপূত না হওয়াতে শিবের শাপে পক্ষীতে পরিণত হন। অন্য মতে এরা শিবপার্বতী। এখানে বাজারের এক পাশে শঙ্খতীর্থ সরোবর। ১২ বৎসর অন্তর এখানে পুষ্কর মহোৎসব হয়। এখানে মুভর-কোইল মন্দিরের পাশে নন্দীতীর্থ সরোবর রয়েছে। গরুড়কে আঘাত করার পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য নন্দী এখানে তপস্যা করেন।
পঙক্তি—সূর্যের একটি অশ্ব।
পংকজিৎ—গরুড়ের এক ছেলে।
পঞ্চ কন্যা—অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী। এদের স্মরণে মহাপাতকও মুক্তি পায়। শ্লোকটি শ্লেষ, অর্বাচীন ইত্যাদি মত বিরোধ আছে।
পঞ্চ কুণ্ড—দ্রঃ কেদারনাথ।
পঞ্চ গঙ্গা—দ্রঃ কেদারনাথ।
পঞ্চ চূড়—এক জন অপ্সরা। নারদ এক বার পৃথিবী পরিক্রমা করছিলেন পথে এক জায়গায় এঁর সঙ্গে দেখা হয়। নারদ মেয়েদের চরিত্র জানতে চান। পঞ্চচূড় বলেন যে কোন স্ত্রীলোককে একটু খোসামদ করলে হস্তগত করা যায়। এবং বলেন নাগ্নি স্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্ ন পুংসাং বামলোচনাঃ, দৃষ্টৈব পুরুষং হৃষ্যং যোনিঃ প্রক্লিদ্যতে স্ত্রিয়ঃ। অন্তকঃ শমনঃ মৃত্যুঃ পাতালং বড়বামুখম্ ক্ষুরধারা বিষং সর্পঃ বহ্নিঃ ইতি একতঃ স্ত্রিয়ঃ (মহা ১৩।৩৮।২৯)।
পঞ্চজন—(১) অসুর। হিরণ্যকশিপুর নাতি ; সংহ্লাদের ছেলে। শঙ্খরূপে বা শঙ্খ মধ্যে সমুদ্রে বাস করতেন। কৃষ্ণের গুরু সান্দীপনি মুনির ছেলে স্নান করতে এলে অসুর একে চুরি করেন ও শঙ্খের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। গুরু দক্ষিণা হিসাবে কৃষ্ণ (দ্রঃ) বরুণের সাহায্যে একে নিহত করে গুরুপুত্রকে উদ্ধার করেন। অসুরের দেহ বা আবাস্থল পাঞ্চজন্য শঙ্খ নামে পরিণত। (২) এক জন প্রজাপতি ; মেয়ে পঞ্চজনী =অসিক্নী ; দক্ষের স্ত্রী। (৩) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও চণ্ডাল। (৪) রাজা সাগরের স্ত্রী কেশিনীর একটি ছেলে। বর্হকেতু, সকেতু পঞ্চজন ও ধর্মরথ (দ্রঃ) এই চারটি ছেলে বাদে বাকি সকলে কপিলের শাপে মারা গিয়েছিল। সগরের পর পঞ্চজন রাজা হন। পঞ্চজনের ছেলে অংশুমান (দ্রঃ)।
পঞ্চতন্ত্র—গল্প গ্রন্থ। বইতে ৫টি ভাগ :-মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, সন্ধিবিগ্রহ, লব্ধনাশ,

ও অপরীক্ষিতকারিত্ব। প্রতিটি ভাগে একটি প্রধান গল্পের অন্তর্গত অনেকগুলি ছোট ছোট গল্প যুক্ত রয়েছে। মূল গ্রন্থ লুপ্ত। খৃ-পূ ২ শতক থেকে খৃ-২ শতকের মধ্যে এবং ৫৭০ খৃষ্টাব্দের আগে রচিত। খৃ ৬-শতকে প্রথমে পহ্লবীতে অনূদিত হয়। ক্রমশ নানা ভাষা মাধ্যমে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। পশুপাখী ও মানুষ মিলে উপদেশাত্মক রচনা। লেখক বিষ্ণু শর্মা, মনে হয় কাল্পনিক নাম। বিষ্ণুশর্মার আরবীয় নাম বিদ্ পাই এবং য়ুরোপে নাম পিল্পে।

পঞ্চ তন্মাত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।

পঞ্চ তীর্থ—(১) কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্কর। (২) অগস্ত্য তীর্থ, সৌভদ্র তীর্থ, পৌলম তীর্থ, করন্ধম তীর্থ ও ভরদ্বাজ তীর্থ। এই পাঁচটি তীর্থে বর্গা, সৌরভেয়ী সমীচী, বুদবুদ ও লতা এই পাঁচ জন অপ্সরা এক মুনির শাপে কুমীর হয়ে বাস করতেন ফলে এখানে কেউ যেতেন না। অর্জুন তীর্থ যাত্রাতে এখানে এসে জলে নামলে আক্রান্ত হন; এবং ওপরে পাড়ে তুলে আনলে এঁরা শাপমুক্ত হন (মহা ১।২০৮।-)।

পঞ্চ দেবী—দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী ও রাধা।

পঞ্চনদ—বিতস্তা (ঝিলম), চন্দ্রভাগা (চেনাব), ইরাবতী (রাভি), বিপাশা (বিয়াস) ও শতদ্রু (সাটলেজ)। মূল অববাহিকা অংশ বৈদিক যুগে সপ্তসিন্ধবঃ নামে পরিচিত।

পঞ্চপ্রাণ—প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান। পাঁচটি কল্পিত বায়ু। এদের মধ্যে প্রাণ প্রধান; অন্য বায়ুগুলিকে কাজ করায়। প্রাণ হৃদয়ে অবস্থিত এবং নিশ্বাসের কাজ করায়। অপান বায়ু পায়ু দেশে অবস্থিত, মলমূত্র ইত্যাদি ত্যাগ করায়। ব্যান সারা দেহে ছড়ান রয়েছে। নিশ্বাস কিছু ক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে গেলেও এই ব্যান বায়ু জীবকে বাঁচিয়ে রাখে। তীরন্দাজ রুদ্ধ নিশ্বাসে যখন লক্ষ্যস্থির করতে থাকেন তখন এই ব্যান বায়ু তাকে জীবিত রাখে। সমান বায়ু নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের ছন্দ ঠিক রাখে। উদান বায়ু মৃতের আত্মাকে বয়ে নিয়ে যায়। প্রাণবায়ু ইত্যাদির অবস্থান সম্বন্ধে অন্য মতও রয়েছে।

পঞ্চবট—বট, বিল্ব, অশ্বত্থ, অশোক, আমলকী।

পঞ্চবটী—দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী নদীর দক্ষিণ তীরে/উৎসে একটি রমণীয় বন বা কুঞ্জ। একটি মতে পাঁচটি বট গাছ মিলে। এক বার পাঁচ জন গন্ধর্ব যুবক অগস্ত্যকে ঘিরে ধরেন। অগস্ত্য রাগে শাপ দিয়ে এঁদের বৃক্ষে পরিণত করেন। এঁরা তার পর অনুনয় করলে ঋষি বলেন রামচন্দ্র এখানে এলে মুক্তি পাবেন। বনবাসের সময় রামচন্দ্র এখানে কিছু দিন কুটির বেঁধে বাস করেছিলেন। এখানে কুটির বাঁধবার সময় লক্ষ্মণ একটি গাছ কাটেন; গাছটি মাটিতে পড়ে অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং সেখানে শূর্পণখার ছেলে রাক্ষস শম্বুকুমারের দেহ পড়ে থাকে। সীতাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে রাক্ষস গাছে পরিণত হয়ে দু চোখ ভরে সীতাকে দেখছিল; লক্ষ্মণের হাতে এই ভাবে মারা পড়ে। এই পঞ্চবটীতে শূর্পণখার নাক কান কাটা যায় এবং সীতা হরণ হয়। শূর্পণখার নাক গিয়েছিল বলে অন্য নাম নাসিক (দ্রঃ)।

পঞ্চবৃক্ষ—স্বর্গে পাঁচটি গাছ:-মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন।

পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

পঞ্চ মকার—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা (লুচি ইত্যাদি ভাজা খাদ্য) ও মৈথুন। দ্রঃ

বামাচার।

পঞ্চ মহাযজ্ঞ—ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ।

পঞ্চ রাত্র—বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ। বা গ্রন্থ বিশেষ।

পঞ্চ লক্ষণ—পুরাণে পাঁচটি লক্ষণ :-সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশচরিত এই ৫-টি বিষয় বা লক্ষণ থাকলে পুরাণ।

পঞ্চশর—মদনের পাঁচটি বাণ :-হর্ষণ, রোচন (লোভ দেখান), মোহন, শোষণ (দুর্বল করা) ও মারণ (হত্যা করা)। অন্য মতে উন্মাদন, তাপন, শোষণ, স্তম্ভন ও সম্মোহন। এই সব বাণের মুখে ফুল অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল।

পঞ্চ শিখ—এক জন দার্শনিক। আসুরির শিষ্য। আসুরি ছিলেন কপিলের শিষ্য। পঞ্চ শিখ সারা ভারতে সাংখ্য মতবাদ প্রচার করেন। আসুরির স্ত্রী কপিলা। গুরু পত্নীর স্তন্য পান করতেন বলে কপিলাপুত্র নামেও পরিচিত। জনকের সঙ্গে নানা তর্ক করে পরাজিত করেন।

পঞ্চ শীল—বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিত্যপ্রতিপাল্য ৫-টি শীল। (১) প্রাণি হত্যা (২) অদত্তদান, (৩) অবৈধ কাম তৃপ্তি (৪) মিথ্যাভাষণ, (৫) ও মাদক দ্রব্য সেবনে বিরতি। বৌদ্ধ মতে শীল অর্থে কায়-বাক-মন-সংযম। এই শীল সমস্ত কুশলধর্মের বা আত্মমুক্তির আধার। এই কাজগুলি নিজে না করা, অপরকে দিয়ে না করান এবং অপরকে এই সব কাজে অনুমতি না দেওয়া—তবেই প্রকৃত শীলবান হওযা যায়।

পঞ্চাক্ষরমন্ত্র—ন-মঃ-শি-বা-য়।

পঞ্চাগ্নি—মনু নামে অগ্নি ও নিশার ছেলে :-বৈশ্বানর, বিশ্বপতি, সন্নিহিত, কপিল ও অগ্রণী। মহা ৩।২১১।১৫।

পঞ্চানন্দ—লোকায়ত দেবতা। শিবের একটি রূপ। মনে হয় মিশ্র দেবতা। আর্য দেবতা ও অ-আর্য দেবতা মিলে উৎপন্ন। তামিল তেলেগু দেশে পূজ্য তাঁরু-বন্নর দেবতার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে।

পঞ্চাপ্সর—দ্রঃ মাণ্ডকর্ণি।

পঞ্চাল—বেরেলি (বেরিলি), ফররুখাবাদ, বদায়ুঁ ইত্যাদি কতিপয় জেলা ও উত্তর প্রদেশের মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চল বোঝাত। আর এক মতে দেশটি কুরুক্ষেত্রের উত্তরে এবং কুরুক্ষেত্র ও কুরু দেশের পশ্চিমে পশ্চিম-পাঞ্জাব ও দক্ষিণ কাশ্মীর অঞ্চলে অবস্থিত। বৈদিক যুগে উত্তর ও দক্ষিণ পঞ্চাল এই ভাগ ছিল না। আবার সংহিতো-পনিষদ ব্রাহ্মণে প্রাচ্য পঞ্চাল পাওয়া যায়। যজুর্বেদ সংহিতার কাম্পিলবাসিনী শব্দগত কাম্পিল পরবর্তী কালের কাম্পিল্য হতে পারে। শতপথ ব্রাহ্মণে পঞ্চালের পরিচক্রা নগরীর কথা আছে। মহাভারত, জাতক, দিব্যাবদান ইত্যাদিতে গঙ্গা দ্বারা বিভক্ত উত্তর ও দক্ষিণ পঞ্চাল দুটি ভাগের উল্লেখ রয়েছে। উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী (দ্রোণ দ্রঃ) ছিল অহিছত্র ; এটি বেরিলি জেলার বর্তমান রামনগর। দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী ছিল কাম্পিল্য ; বর্তমানে এটি কাম্পিল এবং ফররুখাবাদ জেলার ফতেগড় সহরের ৪৫ কি-মি উ-পূর্বে অবস্থিত। পঞ্চালগণ কান্যকুব্জ নগরী স্থাপন করেন।

বৈদিক যুগে সৃঞ্জয়, ক্রিবি, তুর্বশ, কেশী ও সোমক এই ৫-টি জাতি মিলে পাঞ্চাল জাতি. বৈদিক পঞ্চালদের মধ্যে কেশিন দাল্ভ্য ও প্রবাহন জৈবলি সমধিক

বিখ্যাত। জৈবলি রাজর্ষি জনকের সমসাময়িক এবং আরুণি ও শ্বেতকেতুর সঙ্গে দার্শনিক আলোচনা (উপনিষদ) করেছিলেন। প্রবাহন জৈবলি থেকে বিম্বিসারের সময়ের মধ্যে দুর্মুখ ও চূলনি ব্রহ্মদত্ত নামে দু জন রাজার নাম পাওয়া যায়। সঞ্জয় নামে এক জন কাম্পিল্য-রাজ রাজ্য ত্যাগ করে জিনধর্ম গ্রহণ করেন। মহাপদ্মনন্দের সময় পঞ্চাল রাজ্য মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়।

পঞ্জিকা—যজ্ঞানুষ্ঠানের কাল নির্ণয় করার জন্য বৈদিক ঋষিরা সূর্য ও গ্রহাবস্থান নির্ণয়ের হিসাব ব্যবস্থা করেছিলেন। ঋতু বিভাগ ইত্যাদি সুষ্ঠু ভাবে করার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। প্রথম দিকে বিশেষ কোন গণনা পদ্ধতি ছিল না। সূর্যের অবস্থান দেখে উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন ভাগ করে তপঃ, তপস্যা, মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভস্, নভস্য, ইষ, উর্জ, সহস্ ও সহস্য ১২-টি মাস সৃষ্টি করেছিলেন। তপঃ থেকে শুচি পর্যন্ত উত্তরায়ণ। এই ভাবে কাল বিভাগ ১৫০০ খৃ-পূ যজুর্বেদের কালে প্রচলিত ছিল। তিথি বিভাগ ছিল না; পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টকা ব্যবহার হত। নক্ষত্র বিভাগ ছিল। কৃত্তিকা থেকে আরম্ভ করে ২৭ বা ২৮টি নক্ষত্র বিভাগ জানা গিয়েছিল। ভারতে এটি পঞ্জিকার আদিযুগ। চান্দ্র মাস গণনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই চান্দ্রমাস যেন পূর্ণিমান্ত মাস ছিল।

১০০০ খৃ-পূ মত সময়ে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অধিকতর বিজ্ঞান ভিত্তিক হিসাব চালু হয়। এই হিসাবে বৎসর আরম্ভ হত উত্তরায়ণ দিবস থেকে; ১২-টি চান্দ্র মাস ব্যবহার হত; ৩০-টি তিথি ও ২৯-টি নক্ষত্র গণনার ব্যবস্থা ছিল। ৫-বৎসর চক্রে এই গণনা আবর্তিত হত; ফলে ৫-বৎসরে এক যুগ বলা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস পূর্তির সময় হিসাব করা হয়েছিল।

খৃ ৪-৫ শতকে গণনার আরো সূক্ষ্ম পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। আর্যভট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ইত্যাদি জ্যোতির্বিদরা এই নতুন পদ্ধতি গড়ে তোলেন। এ বিষয়ে সূর্যসিদ্ধান্ত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এই পদ্ধতিতে হিসাব করে পুরোহিতরা গ্রামে গ্রামে এগুলি শুনিয়ে আসতেন বা অনুলিপি দিয়ে আসতেন। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ চালু হবার পর গ্রহসঞ্চার কালও হিসাব করা সম্ভব হয়। আগে এ হিসাব করা হত না। পূর্বের প্রাচীন পঞ্জিকাতে ফলিত জ্যোতিষ থাকত না। বর্তমানে ছাপার যুগে ফলিত জ্যোতিষ পঞ্জিকার বিশেষ একটি অঙ্গ দখল করেছে।

পট্টিকা—খড়্গ মত; পুরুষ প্রমাণ দীর্ঘ, দুদিকে ধার, অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ, এবং মুঠহস্ত-ত্রাণযুক্ত।

পণি—বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত অর্দ্ধপৌরাণিক ও অর্দ্ধ ঐতিহাসিক জাতি। দেবতাদের শত্রু। এরা দেবতাদের গরু চুরি করেন। ইন্দ্র দেবতাদের কুকুর সরমাকে গরু খুঁজতে বললে সরমা তার বাচ্ছাদের দুধ খাওয়াতে ও দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে বলে। ইন্দ্র এই সব দায়িত্ব নিলে সরমা সন্ধান এনে দেয়; ইন্দ্র গরু উদ্ধার করেন। একটি মতে এই পণিগণ ও ঐতিহাসিক পাণিয়গণ অভিন্ন। এরা আর্যবিরোধী, যজ্ঞবিরোধী, ধনশালী ও কৃপণ। এদের গো সম্পদ ছিল। এরা বেকনাট—অর্থাৎ যেন কুসীদ জীবী।

পণ্ডিতক—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত।

পতঞ্জলি—পাণিনি ভাষ্যকার। অপর নাম গোণিকাপুত্র, গোনর্দীয়, বা চূর্ণিকৃৎ। গোনর্দ (উত্তর প্রদেশের আধুনিক গোণ্ডা) নামক স্থানে খৃ-পূ ২-শতকে জন্ম। মনে হয় শুঙ্গবংশীয় নরপতি পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে জীবিত বা সভাসদ ছিলেন। এঁর অশ্বমেধ যজ্ঞে ঋত্বিক রূপেও যেন কাজ করেছিলেন। মিলিন্দ/মিনন্দার কর্তৃক সাকেত ও মাধ্যমিকা আক্রমণ পতঞ্জলি উল্লেখ করেছেন। মোটামুটি ১০০ খৃ পূর্বের আগে। পতঞ্জলিকে অনন্ত নাগের অবতার বলা হয়। তাঁর ভাষ্যের অপর নাম ফণি-ভাষ্য (=মহাভাষ্য)। পাণিনি ও কাত্যায়নের বার্তিক বোঝাবার জন্য তাঁর এই মহাভাষ্য। যোগদর্শন রচয়িতা পতঞ্জলি অন্য ব্যক্তি হতে পারে। কিছু মতে পতঞ্জলির অন্যান্য গ্রন্থ যোগশাস্ত্র ও বৈদ্যক শাস্ত্র।

কাহিনী আছে গোণিকা সূর্যের কাছে সন্তান প্রার্থনা করেন। তৎক্ষণাৎ অনন্তনাগ এই মুনি কন্যার অঞ্জলিতে বালক হিসাবে এসে পতিত হন। গোণিকা একে পালন করেন। বয়স হলে চিদাম্বরমে গিয়ে শিবের আরাধনা করে বর চান কাত্যায়নের বার্তিকের ওপর যাতে টীকা লিখতে পারেন। এর পর বহু ছাত্র আসতে থাকে অধ্যয়ন করতে। পতঞ্জলি সকলের সঙ্গে সর্ত করেন; পর্দার আড়াল থেকে তিনি তাঁদের পড়াতে থাকেন। কিন্তু পতঞ্জলির বহু কথা দ্ব্যর্থ বোধক ছিল ফলে শিষ্যরা এই পর্দা এক দিন সরিয়ে ফেলেন। ফলে পতঞ্জলি সকলকে অভিশাপ দেন। এক জন শিষ্য এই সময় এখানে ছিলেন না; তাকেও বিনা অনুমতিতে চলে যাবার জন্য অভিশাপ দেন। এই শিষ্যটি তখন অনুনয় করলে পতঞ্জলি একটি সর্তে একে মুক্তি দেন।

আর এক কাহিনী পাণিনি যখন হাত জোড় করে তপস্যা করছিলেন সেই সময় পতঞ্জলি সর্পদেহ ধারণ করে স্বর্গ থেকে তাঁর অঞ্জলিতে এসে পড়েন। ফলে এই নাম; পাণিনি সূত্রের ভ্রমপ্রমাদ দেখবার জন্য কাত্যায়ন যে বার্তিক লিখেছিলেন পতঞ্জলি তার বিশেষ সমালোচনা করেন।

পদপাঠ—বেদপাঠের একটি পদ্ধতি।

পদ্ম—(১) কদ্রুর ছেলে, একটি সাপ। (২) একটি নিধি।

পদ্মকূট—কৃষ্ণের স্ত্রী সুপ্রভা এখানে বাস করতেন।

পদ্মকেতন—গরুড়ের এক ছেলে।

পদ্মনাভ—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। (২) নৈমিষারণ্যে গোমতী নদীর তীরে একটি সাপ। এই সাপ ভীমের কাছে এক বার ধর্ম জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিল। (৩) খৃ-১০ শতকের এক জন গণিতবিদ। বীজগণিত প্রণেতা। গ্রন্থটি বর্তমানে লুপ্ত। দ্বিঘাত সমীকরণের দুইটি বীজের অস্তিত্ব ইনি অবগত ছিলেন।

পদ্মসম্ভব—খৃ-৮ম শতকে বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শান্তরক্ষিতের পরামর্শে নেপালে থেকে এঁকে তিব্বতে আনা হয়। পদ্মনাভ অবিলম্বে স্বীয় অলৌকিক ঋদ্ধি প্রভাবে যক্ষরক্ষ ইত্যাদিকে পর্যুদস্ত করে তাদেরও বৌদ্ধধর্মে বশংবদ করেন। তান্ত্রিক মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও তিব্বতের পুরাতন পোণ্ড ধর্মের সমন্বয়ে লামাধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। এটি পরে ঞীং-মা-পা ধর্ম নামে রূপান্তরিত হয়। এঁদের কাছে পদ্মনাভ বুদ্ধের সম পূজ্য।

বিখ্যাত তন্ত্রাচার্য 'উ-জ্ঞাঙ'-রাজ ইন্দ্রভূতি সরোবরে একটি পদ্মপাত্রে আসীন

দেবোপম ৮-ম বর্ষীয় একটি বালককে পান ; এই জন্যই নাম পদ্মনাভ। সাম্‌-য়াই বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের বড় কীর্তি। প্রায় ২০-টি গ্রন্থের লেখক হিসাবে তাঁর নাম পাওয়া যায়।

পদ্মা—(১) বৃহদ্রথ রাজার মেয়ে। কল্কির স্ত্রী। (২) লক্ষ্মী। (৩) মনসার নাম পদ্মা ও পদ্মাবতী।

পদ্মাবতী—বিদর্ভরাজ সত্যকেতুর মেয়ে। উগ্রসেনের স্ত্রী। বিয়ের পর এক বার কিছু দিনের জন্য বাপের বাড়ি এলে কুবেরের দূত গোভিলের সঙ্গে প্রণয়াবদ্ধ হয়ে গর্ভবতী হন। এই সন্তান কংস (দ্রঃ)।

পবন—বায়ু। দ্রঃ অঞ্জনা, কুশনাভ।

পবমান—অগ্নি ও স্বাহার এক ছেলে। বশিষ্ঠের শাপে বিজিতাশ্বের ছেলে হয়ে জন্মান।

পম্পা—ঋষ্যমূক পর্বতে একটি হ্রদ। এখানে সুগ্রীব বাস করতেন।

পয়োষ্ণী—বিন্ধ্য পর্বতে উৎপন্ন নদী ; পশ্চিম দিকে প্রবাহিত। নল ও দময়ন্তী এই নদী ধরে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই নদীর তীরে একটি জায়গা বরাহতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে রাজা নৃগ যজ্ঞ করেছিলেন এবং ইন্দ্র এই যজ্ঞে সোমপানে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাজা অমূর্তরয়সের ছেলে গয় এই নদীর তীরে সাতটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

পর—বিশ্বামিত্রের একটি ব্রহ্মবাদী ছেলে।

পরকীয়াতত্ত্ব—কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার সম্বন্ধ তত্ত্ব। বামাচারী তান্ত্রিক বা বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়ারা বা বাউলেরা পরস্ত্রীকে উত্তরসাধিকা করে সাধন করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে বামদেব্য সামোপসানার মধ্যে পরকীয়াবাদের মূল রয়েছে বলে কেহ কেহ মনে করেন। উজ্জ্বল নীলমণি ইত্যাদিতে এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়েছে। উজ্জ্বল-রসকে আদি রস বলে মেনে নিয়ে এই পরকীয়াতত্ত্বের জন্ম।

পরমব্রহ্ম—ব্রহ্মার দুটি রূপ :-পরব্রহ্ম—নির্গুণ ও অমূর্ত ; অপর ব্রহ্ম—সগুণ ও মূর্ত।

পরমাণুবাদ—ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে গৃহীত হয়েছে। অপর নাম আরম্ভবাদ বা অসৎকার্যবাদ। উদয়নাচার্য মতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে পতত্র শব্দ রয়েছে সেটি পরমাণু। মহর্ষি কণাদ পরমাণুবাদের আবিষ্কর্তা ও সমর্থক।

পরমাণু অতি সূক্ষ্ম, সর্বপ্রকার উৎপত্তিশীল দ্রব্যের উপাদান কারণ। প্রতিটি উৎপত্তিশীল সাবয়ব দ্রব্য ভাগ করলে সব শেষে যে অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম অংশ পড়ে থাকে সেই নিরবয়ব অংশ পরমাণু। ঈশ্বরের ইচ্ছায় দুটি পরমাণু মিলে দ্ব্যণুক ; তিনটি পরমাণু মিলে ত্রসরেণু বা ত্রুটি। ত্রস শব্দের অর্থ গতিশীল। ঘরের জানলার ছিদ্র দিয়ে আসা আলোতে ত্রসরেণু দেখা যায়। দ্ব্যণুক দেখা যায় না। পরমাণু নিরবয়ব ফলে দুটি পরমাণুর সংযোগ সম্ভব নয়—এই ভাবে যুক্তি তর্ক গড়ে তুলে শঙ্কর ইত্যাদি পরমাণু বাদ অস্বীকার করেছিলেন। গৌতম ও কণাদ পরমাণুর নিত্যত্ব স্বীকার করেছিলেন। পরমাণুগুলি অচেতন তবু ঈশ্বরের অধিষ্ঠান হেতু এগুলি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।

পরলোক—ভারতীয় দর্শনে চার্বাক পন্থীরা পরলোক ও দেহাতিরিক্ত আত্মা মানেন না। বৌদ্ধগণ পরলোক মানেন, কিন্তু নিত্য আত্মা স্বীকার করেন না। পাপ ও

পুণ্যের ফল অনুসারে পরলোকে বাস করতে হয়। পুণ্যক্ষয় হলে আবার জন্মাতে হয়। নরক ভোগের পরও জন্মাতে হয়। ধার্মিকরা দেবযান পথে স্বর্গে যান। এই পথে অগ্নিলোক, বায়ুলোক, আদিত্যলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক ও প্রজাপতিলোক বিদ্যমান। ভগবদ্ধামে এসে ভক্তরা সালোক্য মুক্তি অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে একই লোকে বাস, বা সারূপ্য মুক্তি ভগবান যে রূপে লীলা করেন সেই রূপ লাভ বা সামীপ্য মুক্তি অর্থাৎ ভগবানের সমীপে বাস ; বা সাযুজ্য মুক্তি ভগবানের সঙ্গে একত্ব লাভ করেন। ভারতীয় দর্শনে স্বর্গলাভ অপেক্ষা মুক্তিকে বড় বলা হয়েছে। কারণ স্বর্গ লাভের পর আবার জন্মাতে হয়। মুক্তি/মোক্ষ লাভের পর আর জন্মাতে হয় না। সাধনার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। ফলে মুক্তি আসে। মুক্ত আত্মার (ন্যায় বৈশেষিক মতে) সুখ ও দুঃখ কিছুই নাই। (২) ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, সত্য, মহঃ, তপঃ, জন এই সাতটি লোক।

পরশু—কুড়াল মত। ফলা অর্দ্ধচন্দ্র। এর আস্য বিস্তৃত ; সামনে চকচকে সরু মুখ, মস্তকে শিখা, বাহু পরিমিত লম্বা। দ্রঃ খণ্ডপরশু, নরনারায়ণ।

পরশুরাম—বিষ্ণুর ৬-ষ্ঠ অবতার। ঋচীক>জমদগ্নি>পরশুরাম। জমদগ্নির (দ্রঃ) পাঁচটি ছেলে বসু, বিশ্বাবসু, বৃহৎ-ভানু, বৃহৎ-কণ্ব, ও পরশুরাম। মা রেণুকা। পিতৃ-কুল হিসাবে ভৃগুবংশ, ফলে নাম ভার্গব ; মায়ের দিক থেকে কুশিক বংশ। ক্ষত্রিয় রাজাদের অত্যাচারে ধরিত্রী বিব্রত হয়ে উঠে ব্রহ্মার কাছে অভিযোগ করেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে নিয়ে যান। অন্য মতে পৃথিবী সরাসরি গো রূপ ধারণ করে বিষ্ণুর কাছে যান। আর এক মতে কার্তবীর্যার্জুন অগ্নিকে যথেচ্ছ ভোজন করবার অনুমতি দিলে আপব-মুনির আশ্রম পুড়ে যায় ; এই মুনি জানতে পারেন কার্তবীর্যার্জুনই এই আগুনের মূল কারণ। ফলে আপবঃ (তং ততঃ রোষাৎ মহা ১২।৪৯।৩৬) শাপ দেন বিষ্ণু পরশুরাম রূপে জন্মে এঁদের শাস্তি বিধান করবেন। বিষ্ণুও পৃথিবীকে এই আশ্বাসই দিয়েছিলেন।

নর্মদা তীরে পিতার আশ্রমে পরশুরামরা পাঁচভাই বাল্যে লেখাপড়া শেখেন। প্রথম জীবন থেকেই পরশুরামের ধনুর্বিদ্যা শেখার ঝোঁক। পরশুরাম দাম্ভিক, ক্রোধী ও প্রতিহিংসা পরায়ণ। দুষ্ট ক্ষত্রিয় দমনের জন্য তাঁর জন্ম। হিমালয়ে গিয়ে বহু দিন মহাদেবের তপস্যা করেন এবং বহু অস্ত্রশস্ত্র লাভ করেন। দেবতারা এই সময় অসুরদের হাতে বিব্রত হয়ে শিবের কাছে এসে সাহায্য চাইলে শিব পরশুরামকে যুদ্ধে যেতে বলেন। অসুরদের পরাজিত করে ফিরে এলে মহাদেব আবার অস্ত্র শস্ত্র ও বর দেন এবং পরশু অস্ত্র ও (দ্রঃ খণ্ডপরশু) দান করেন। এই সময় থেকে নাম হয় পরশুরাম ; প্রকৃত নাম ছিল রাম। পরশু ইত্যাদি নিয়ে শিবের কাছ থেকে ফেরার পথে অকৃতব্রণকে শিষ্য লাভ করেন। ক্রমশ ধনুর্বেদের বিখ্যাত শিক্ষক বলে পরিগণিত হন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ইত্যাদিকেও শিক্ষা দিয়েছিলেন তবে দ্রোণের মত পেশা বা জীবিকা হয় নি। নীচ জাতি বলে দ্রোণাচার্যের কাছে বিমুখ হয়ে এঁর কাছে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে কর্ণ (দ্রঃ) অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। জমদগ্নির (দ্রঃ) মৃত্যুর পর পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে সব শুনে প্রতিজ্ঞা করেন ক্ষত্রিয় জাতিকে তিনি ধ্বংস করবেন। একাই তিনি কার্তবীর্য ও তাঁর ছেলেদের এবং তাঁর দলের

ক্ষত্রিয়দের হত্যা করেন এবং একুশ বার অন্য মতে আঠার বার পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করে পাঁচটি রক্তের হ্রদ তৈরি করে পিতৃতর্পণ করেন। ঋচীককে সঙ্গে নিয়ে পিতৃদেবরা এসে এই তর্পণ গ্রহণ করে বর দিতে চান। পরশুরাম ক্ষত্রিয় নিধনের পাপ থেকে মুক্তি চান; এবং এই পাঁচটি হ্রদ/স্থান পবিত্র বলে স্বীকৃত হক বর চান। এই পাঁচটি স্থান মিলে সমন্তপঞ্চক; পরে স্থানটি কুরুক্ষেত্র নামে পরিচিত। পিতামহ ঋচীক ও পূর্বপুরুষদের অনুরোধে এই ক্ষত্রিয় হত্যা বন্ধ করেছিলেন। ক্ষত্রিয় হত্যা পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য কশ্যপের পৌরোহিত্যে সমস্ত পঞ্চকে একটি মহাযজ্ঞও করেছিলেন। নিজের ধন সম্পত্তি যা কিছু ছিল দান করে দিয়েছিলেন। দ্রোণ শুনতে পেয়ে ছুটে আসেন। পরশুরাম দ্রোণকে জানান তাঁর দেহ ও ধনুর্বেদ এই দুটি মাত্র আর আছে; দ্রোণ যেটি নেবেন নিন। দ্রোণ (দ্রঃ) ধনুর্বেদ গ্রহণ করেন।

ভৃগু বংশের সঙ্গে হেহয় বংশের যে শত্রুতা দেখা যায় (দ্রঃ কার্তবীর্যার্জুন/ঔর্ব), সেই বিবাদ ক্রমশ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের দু দলে ভাগ করে ফেলে। পরশুরামের সময় কার্তবীর্যার্জুন ছিলেন হেহয়-রাজা। আপব মুনি শাপ দিলে ব্রাহ্মণ (ভার্গব) ক্ষত্রিয়-দের বংশানুক্রমিক শত্রুতা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। জমদগ্নির গরু চুরি থেকে শত্রুতা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। একটি মতে সমস্ত পঞ্চকের যজ্ঞে এ পর্যন্ত যত দেশ জয় করেছিলেন সব কশ্যপকে (দ্রঃ) দান করে দিয়েছিলেন। এর পর ২০হাত × ১৮হাত স্বর্ণ নির্মিত একটি আসনে বসিয়ে কশ্যপকে পূজা করে তাঁর নির্দেশে এই আসন টুকরো টুকরো করে ব্রাহ্মণদের বিলিয়ে দেন। এর পর দ্রোণ এসেছিলেন। পরশুরাম (দ্রঃ কশ্যপ) কেরলে কিছু দিন বাস করার পর এই দেশও ব্রাহ্মণদের দান করে দিয়ে মহেন্দ্র পর্বতে তপস্যা করতে চলে যান। পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করলেও অবশ্য কয়েকটি ক্ষত্রিয় বালক বেঁচে গিয়েছিল :-পৌরব দায়াদ বিডূরথ-সুত ঋক্ষৈঃ সংবর্দ্ধিত হন; সৌদাস পুত্রকে পরাশর পালন করেন; শিবি পুত্র গোপতি গোভিঃ সংরক্ষিত হন; প্রতর্দনের ছেলে বৎস বৎসৈঃ গোষ্ঠে সংবর্দ্ধিত হন; দধিবাহন পৌত্র অর্থাৎ দিবিরথ পুত্র অঙ্গ গঙ্গার তীরে গৌতমের কাছে পালিত হন; বৃহদ্রথ গৃধ্রকূট পর্বতে গোলাঙ্গুলৈঃ অভিরক্ষিত হয়েছিলেন এবং মরুত্ত বংশে তিন জন বসু সমুদ্রের দ্বারা অভিরক্ষিত হয়েছিলেন। মহা ১২।৪৯।৬৮-৭৪।

কাশীরাজের বড় মেয়ে অম্বা (দ্রঃ) ভীষ্মের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পরশু-রামের কাছে এসে প্রতিকার প্রার্থনা করেন। গুরু হিসাবে পরশুরাম ভীষ্মকে বিয়ে করতে বলেন। ভীষ্ম রাজি হন না; ফলে দু জনে বহু দিন ঘোরতর যুদ্ধ হয়; কেউই পরাজিত হন না। পরশুরাম শেষ পর্যন্ত আবার মহেন্দ্র পর্বতে তপস্যায় চলে যান।

রামচন্দ্র মিথিলা থেকে বিয়ে করে অযোধ্যায় ফেরার পথে পরশুরাম এসে পথ রোধ করে দাঁড়ান। হরধনু ভাঙার জন্য ক্ষুব্ধ হয়ে এসেছেন; নিজের বৈষ্ণবী ধনু দিয়ে রামকে এই ধনুতে গুণ পরাতে বলেন। বশিষ্ঠ ইত্যাদি পরশুরামকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন ফল হয় না। রামচন্দ্র ধনুতে গুণ পরালে পরশুরাম সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করে মহেন্দ্র পর্বতে ফিরে যান। অন্য মতে রামচন্দ্র গুণ পরিয়ে শরস্থাপন করে কাকে বিদ্ধ করবেন জিজ্ঞাসা করেন; পরশুরাম বিমূঢ় হয়ে পড়েন।

ত্রিভুবন ধ্বংস করতে পারে এই রকম বাণ; পরশুরাম বলেন তাঁর সমস্ত সঞ্চিত তপ বলকে বিদ্ধ করতে। রামচন্দ্র পরশুরামের সমস্ত দিব্যলোকের পথ রুদ্ধ করে দেন। পরশুরাম তার পর নিজের তেজ ও সেই ধনু ইত্যাদি রামকে দিয়ে মহেন্দ্র পর্বতে তপস্যা করতে চলে যান। লোমশ মুনি পাণ্ডবদের যে কাহিনী বলেছিলেন তাতে আছে রামচন্দ্রের নাম ও ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়লে রামচন্দ্র এঁকে দেখতে আসেন। যে ধনুতে পরশুরাম ক্ষত্রিয় নিধন করেছিন সেই ধনুতে রামকে গুণ লাগাতে ও শর সন্ধান করতে বলেন। রাম চন্দ্র গুণ লাগালে পরশুরাম দেখতে চান রামচন্দ্র আকর্ণ পর্যন্ত গুণ টানতে পারেন কি না। রামচন্দ্র এতে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন। রামের এই ক্রোধরঞ্জিত মুখে আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বালখিল্য, দেবর্ষি, বেদ, নদী, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি বিশ্বরূপ ফুটে উঠছে দেখতে পান। রাম তার পর বাণ মুক্ত করেন ফলে পৃথিবী কেঁপে ওঠে, বজ্রপাত ও উল্কাপাত হতে থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। পরশুরাম তখন বিষ্ণুর অবতার বলে চিনতে পারেন এবং নমস্কার করে মহেন্দ্র পর্বতে ফিরে যান। এখানে ফিরে এসে তাঁর খেয়াল হয় তাঁর সমস্ত তেজ চলে গেছে। এই সময় পিতৃদেবরা দেখা দিয়ে বধূসরা নদীতে স্নান করে আসতে বলেন। স্নান করে পরশুরাম আবার নিজের তেজ ফিরে পান।

কৃষ্ণ বলরাম এক বার প্রকৃতির শোভা দেখার জন্য গোমন্ত পাহাড়ের চূড়াতে গিয়ে ওঠেন। পথে পরশুরামের সঙ্গে দেখা হয়। দু জনে দু জনকে প্রণাম করেন ও কথাবার্তা হয়। পরশুরাম কৃষ্ণকে করবীর রাজ শৃগাল-বাসুদেবকে নিহত করতে বলেন। কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দেন; পরশুরাম আশীর্বাদ করেন। কৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদের হয়ে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসছিলেন তখন পথে কয়েক জন ঋষির সঙ্গে দেখা হয়। এঁদের মধ্যে পরশুরামও ছিলেন। এটি দ্বিতীয় বার দেখা। কৃষ্ণের সঙ্গে কথাবার্তা হয়, পরশুরাম কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেন এবং কৃষ্ণের চেষ্টা যেন সফল হয় বলে আশীর্বাদ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের সভাতে কৃষ্ণ যখন কথা বলছিলেন তখন পরশুরামও সেখানে ছিলেন। কৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরে কৌরব পক্ষ যখন নিরুত্তর থাকেন তখন পরশুরাম দম্ভোদ্ভবের কাহিনী শোনান।

পরাবসু—মহর্ষি রৈভ্যের দুই ছেলে পরাবসু ও অর্বাবসু। রৈভ্যের কাছেই রৈভ্যের বন্ধু ভরদ্বাজ ও থাকতেন। ভরদ্বাজের ছেলে যবক্রীত গভীর তপস্যা করে ইন্দ্রের কাছে বেদজ্ঞান লাভ করে দাম্ভিক ও ক্ষুদ্রমনা হয়ে পড়েন এবং ঋষিদের অনিষ্ট করতে থাকেন। এক দিন পরাবসুর সুন্দরী স্ত্রীকে ডাকেন তাঁর সেবা করতে। পরাবসুর স্ত্রী তথাস্তু বলে ভয়ে পালিয়ে যান। রৈভ্য জানতে পেরে তাঁর দুটি লম্বমান জটা ছিঁড়ে আগুনে ফেলে দিলে প্রথমটি থেকে এক সুন্দরী নারী (কৃত্যা) ও দ্বিতীটি থেকে এক ভীষণ রাক্ষসের জন্ম হয়। রৈভ্য এদের যবক্রীতকে হত্যা করতে বলেন। স্ত্রীলোকটি যবক্রীতকে মুগ্ধ করে তাঁর কমণ্ডলু হরণ করেন এবং রাক্ষস তেড়ে আসে। যবক্রীত পিতার অগ্নিহোত্রগৃহে আশ্রয় নিতে যান কিন্তু গৃহরক্ষী এক অন্ধশূদ্র তাঁকে বাধা দেন। ইতি মধ্যে রাক্ষস এসে তাঁকে হত্যা করে। ভরদ্বাজ তখন শাপ দেন রৈভ্য শীঘ্রই বড় ছেলে পরাবসুর হাতে মারা যাবেন এবং ছেলের সৎকার করে ভরদ্বাজ আগুনে প্রাণত্যাগ করেন। এর পর পরাবসুরা দুই ভাই বৃহদ্যুম্নের যজ্ঞে নিযুক্ত হন। এক দিন

রাত্রিতে আশ্রমে ফেরার সময় নিদ্রান্ধ পরাবসু কৃষ্ণাজিন-ধারী-রৈভ্যকে হরিণ মনে করে আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করেন। পিতৃহত্যার পর অর্বাবসুকে গোপনে খবর পাঠান অর্বাবসু যেন আশ্রমে ফিরে গিয়ে পরাবসুর হয়ে ব্রহ্মহত্যার জন্য যেন প্রায়শ্চিত্ত করেন। মহাভারতে (৩।১৩৯।৭) আছে পরাবসুর পিতার শেষ কৃত্য করে যজ্ঞস্থলে ফিরে এসে ভাইকে সব জানান এবং ফিরে গিয়ে পরাবসুর হয়ে প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি করতে বলেন। পরাবসু একাই বৃৎদত্যুম্নের যজ্ঞ সম্পন্ন করবেন। অর্বাবসু শেষকৃত্য/ প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি করে যজ্ঞস্থানে ফিরে যান। পরাবসু ইতিমধ্যে যজ্ঞস্থানে এসে (মহাভারতে আছে অর্বাবসুকে পাঠিয়ে দিয়ে পরাবসু যজ্ঞ করছিলেন) রাজাকে জানান অর্বাবসুই পিতাকে হত্যা করেছেন ; যজ্ঞে অংশ নিলে রাজার ক্ষতি হবে। অর্বাবসু রাজাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন তিনি পিতাকে হত্যা করেন নি ; পরাবসু করেছিল এবং প্রায়শ্চিত্ত করে ভাইকে তিনি পাপমুক্ত করেছেন। রাজা কিন্তু পরাবসুকে বিশ্বাস করে অর্বাবসুকে তাড়িয়ে দেন। অর্বাবসু তখন বনে গিয়ে সূর্যের উপাসনা করে সূর্য ও দেবতাদের বা অগ্নি-পুরোগমা-দেবতাদের বরে রৈভ্য, ভরদ্বাজ ও যবক্রীতকে জীবিত করে দেন। পিতৃহত্যার পাপ ও পিতৃহত্যার স্মৃতি থেকেও ভাইকে মুক্ত করে দেন (মহা ৩।১৩৯।১৮)। দ্রঃ যবক্রীত।

পরাশর—বশিষ্ঠ পুত্র শক্তির ঔরসে অদৃশ্যন্তীর গর্ভে জন্ম। বৈদিক ঋষি ; বেদের বহু মন্ত্রের রচয়িতা ; এঁর সংহিতা পরাশর সংহিতা। কল্মাষপাদ (দ্রঃ) রাজা রাক্ষস হয়ে বশিষ্ঠের ছেলে শক্তি সমেত একশ জনকে খেয়ে ফেলেন। শোকে বশিষ্ঠ বহু ভাবে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বিফল হয়ে সন্তপ্ত মনে আশ্রমে ফিরে আসছিলেন এমন সময় পেছনে বেদপাঠ শুনে ফিরে দেখেন এবং জানতে পারেন পেছনে অনুবর্তমানা পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তীর গর্ভস্থ সন্তান বেদপাঠ করছে। অন্য মতে অদৃশ্যন্তী বশিষ্ঠকে আত্মহত্যা করতে বাধা দেন। বশিষ্ঠ ও অদৃশ্যন্তী আশ্রমে থাকতেন। এক দিন বশিষ্ঠ স্পষ্ট বেদপাঠ শুনতে পান এবং পুত্রবধূ জানান তাঁর গর্ভস্থ সন্তান বেদপাঠ করছে। বশিষ্ঠ সুখী হন। ইতিমধ্যে কল্মাষপাদ এঁদের খেতে আসেন। বশিষ্ঠ পুত্রবধূকে আশ্বস্ত করে রাজার দেহে মন্ত্রপূত জল দিয়ে রাজাকে শাপমুক্ত করেন এবং পুত্রবধূকে পুত্ররত্ন লাভের বর দেন। বশিষ্ঠ পরাশু হতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পৌত্রের সম্ভাবনায় নিবৃত্ত হয়ে বালকের নাম রাখেন পরাশর। পরাশর এক দিন বশিষ্ঠকে বাবা বললে অদৃশ্যন্তী ছেলেকে সব ঘটনা জানান। পরাশর ফলে রাগে রাক্ষস নিধনের জন্য এক যজ্ঞ করেন। যজ্ঞে রাক্ষসরা দগ্ধ হতে থাকেন। তখন অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ও মহাক্রতু এসে এবং বশিষ্ঠ নিজেও পরাশরকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করেন। এই সময় পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ দু জনেই আশীর্বাদ করেন পরাশর পুরাণ-সংহিতা লিখবেন। তীর্থ পর্যটনে পরাশর যমুনা তীরে এসে মৎস্যগন্ধাকে বলেন নদী পার করে দিতে। মৎস্য-গন্ধা যমুনাতেই খেয়া পারাপার করতেন। নৌকাতে অবস্থান কালে কামার্ত হয়ে পরাশর মৎস্যগন্ধার কাছে বংশ রক্ষার জন্য পুত্র কামনা করেন। মৎস্যগন্ধা বলেন তাঁর গায়ে মাছের গন্ধ ; তিনি সন্তান ধারণ করতে ঠিক রাজি নন। পরাশর তখন তাঁকে সুন্দরী যোজন-গন্ধা করে দেন। যোজন-গন্ধা পরাশরকে রাত্রির জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। খোলা নৌকায় মিলন সম্ভব নয়। কিন্তু পরাশর চার দিকে কুয়াসা

সৃষ্টি করে সহবাস করে যোজন-গন্ধাকে সদ্যঃ গর্ভবতী করে দেন এবং বর দেন পরাশরের অভিলাষ পূর্ণ করে দেবার জন্য তিনি কুমারীই থাকবেন। ছেলে হয় ব্যাস। পরাশর মৎস্য-গন্ধাকে আরো বর দিয়েছিলেন। রাজা জনকের সঙ্গে এক বার অধ্যাত্ম আলোচনা করেছিলেন এবং শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের সঙ্গেও দেখা করে গিয়েছিলেন। (২) ধৃতরাষ্ট্র বংশে একটি সাপ ; সর্পযজ্ঞে নিহত হয়।

পরিঘ—লৌহ মুখ ও লৌহ কণ্টকযুক্ত গদা।

পরিণাম বাদ—কারণ দুটি :-উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। মৃৎপিণ্ড উপাদান কারণ এবং কুম্ভকার, যন্ত্রপাতি ও কুম্ভকারের ইচ্ছা নিমিত্ত কারণ। এই দুটি কারণ মিলে কুম্ভের জন্ম। অর্থাৎ দুটি কারণে পরিণাম অর্থাৎ ঘটের উৎপত্তি। পরিণাম বাদের আর একটি দিক কারণ ও কার্য সমজাতীয় এবং দুটিই সমান সত্য। অর্থাৎ মৃৎপিণ্ড ও মৃন্ময় ঘট দুটিই সমান সত্য। দ্রঃ বিবর্তবাদ। রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ ইত্যাদির মতবাদ। অর্থাৎ দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী এবং বিশিষ্ট দ্বৈতবাদীদের এই মত। সাংখ্যে যোগও পরিণামবাদী। এই মতে ব্রহ্ম থেকে জীবজগৎ সৃষ্ট এবং দুটিই এক। অর্থাৎ সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম বা ব্রহ্মেদং সর্বং।

পরিবর্হ—গরুড়ের এক ছেলে।

পরিব্যাধ—উষদ্গু, এঁর ভাইরা, করুষ, ধৌম্য, সুবীর্যবান, একত, দ্বিত, ত্রিত, সারস্বত, পরিব্যাধ, দীর্ঘতমা, গৌতম, আত্রিপুত্র, কশ্যপ, এঁরা পশ্চিম ভারতের মুনি। মহা ১৩।১৫২।৩৪।

পরীক্ষিৎ—চন্দ্রবংশে অভিমন্যু ও উত্তরার (দ্রঃ) ছেলে। স্ত্রী মাদ্রবতী, ছেলে জন্মেজয় (দ্রঃ) শ্রুতসেন, উগ্রসেন, ভীমসেন ; মহা ১।৩।১। অশ্বত্থাম অর্জুনের উদ্দেশ্যে যে ব্রহ্মশির অস্ত্র ত্যাগ করেন সে অস্ত্র আর ফেরাতে পারেন না ; উত্তরার গর্ভের সন্তান এতে নিহত হয়। কৃষ্ণ তার পর গর্ভস্থ শিশুকে জীবিত করে দেন। অন্য মতে মৃত সন্তান জন্মাবার পর কৃষ্ণ একে জীবিত করে দেন। এবং আশীর্বাদ করেন শিশু ৬০ বছর রাজত্ব করবেন। একটি মতে শিশু ছ মাস বয়সে জন্মান। অশ্বমেধ যজ্ঞের কয়েক দিন আগে বৃষ্ণিদের সঙ্গে হস্তিনাপুরে কৃষ্ণ অবস্থান করছিলেন এই সময়ে জন্ম (মহা-১৪।৬৫।৮)। কৃষ্ণ জীবিত করে দেন। পরিক্ষীণে কুলে জাত পুত্রের বাসুদেব নাম রাখেন পরিক্ষিৎ (মহা ১৪।৬৯।১০)। পাণ্ডবরা এঁকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে কৃপাচার্যের ওপর এঁর শিক্ষা ভার দিয়ে মহাপ্রস্থানে বার হয়ে যান। পরিক্ষিৎ মৃগয়া প্রিয় ছিলেন। এক দিন তীর বিদ্ধ এক হরিণের পেছু গভীর বনে প্রবেশ করেন (মহা-১।৩৬।১১)। দুপুর বেলা ক্লান্ত হয়ে সামনে ধ্যানমগ্ন শমীক মুনিকে দেখে হরিণ কোন দিকে গেল জানতে চান ; অন্য মতে তৃষ্ণার্ত হয়ে মুনিকে জল চান, কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে বিরক্ত হয়ে ধনুকের ডগা দিয়ে একটি মরা সাপ মুনির গলাতে জড়িয়ে দিয়ে চলে যান। মুনি কিছুই টের পান না। কিন্তু মুনির ছেলে শৃঙ্গী (=গবিজাত) অন্যান্য মুনি বালকদের সঙ্গে খেলা করছিল ; শৃঙ্গীকে এরা বিদ্রূপ করেন শমীক শিব হয়েছেন ; গলায় সাপ জড়ান রয়েছে। শৃঙ্গী দ্রুত আশ্রমে এসে সব দেখে শাপ দেন এই কাজ যে করেছে সপ্তম দিনে তক্ষক দংশনে সে নিহত হবে। শাপ দেবার পর শৃঙ্গী জানতে পারেন রাজা পরিক্ষিৎ এই কাজ করেছেন। অনুশোচনা হয় এবং

গৌরমুখ নামে এক মুনি কুমারকে দিয়ে রাজাকে শাপের কথা জানিয়ে দেন। অন্য মতে শৃঙ্গী জেনে শুনেই শাপ দিয়ে ছিলেন (মহা ১।৩৭।৫-৯) এবং শমীক ছেলের কাছে শাপের কথা শুনে বিব্রত হয়ে পড়েন; রাজাকে ঠিক দোষী মনে করেন না এবং শিষ্যকে দিয়ে রাজাকে ঘটনাটা জানিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করতে বলেন। রাজা প্রথমে ভয় পেয়ে যান; পরে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে (সাগরের মধ্যে) একটি মাত্র স্তম্ভের ওপর সুরক্ষিত একটি ঘরে/সাততলা এক প্রাসাদ তৈরি করিয়ে ওপর তলাতে বিষ-চিকিৎসকদের নিয়ে সতর্ক হয়ে অবস্থান করতে থাকেন। প্রাসাদের চারদিক বড় বড় হাতী পাহারা ছিল; এত কঠোর পাহারা ছিল যে বাতাসও ভেতরে আসতে পারছিল না। সাত দিনের দিন বিষ বৈদ্য কাশ্যপ (দ্রঃ) নামে এক বিষ চিকিৎসক অন্য মতে ধন্বন্তরি রাজার কাছে আসছিলেন। পথে ব্রাহ্মণবেশী তক্ষকের (দ্রঃ) সঙ্গে দেখা হয়। তক্ষক তখন বিষবৈদ্যকে বোঝান ভবিতব্যতা খণ্ডন করতে চেষ্টা করা উচিত নয় এবং প্রচুর ধনরত্ন দেন। কাশ্যপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে মনে করে ফিরে যান। তক্ষক তার পর রাজার প্রাসাদের কাছে এসে ভেতরে যাবার কোন পথ না পেশে অন্যান্য নাগদের ডাক দেন। এদের সকলকে ব্রাহ্মণবেশে রাজাকে দর্ভ, আপ, ও ফল উপহার দেবার জন্য নিয়ে যেতে বলেন। এবং তক্ষক নিজে একটি ফলের মধ্যে ছোট একটি কীট হয়ে অবস্থান করেন। রাজার অনুচরেরা ফলগুলি রাজাকে এনে দেয় এবং রাজা সুন্দর দেখে একটি ফল নিয়ে কাটেন। ফলের মধ্য থেকে লাল রঙের একটি কীট বার হয়। রাজা এটিকে হাতে করে তুললে কীট সঙ্গে সঙ্গে তক্ষকে পরিণত হয়ে রাজাকে দংশন করে অন্তর্হিত হয়ে যান। দ্রঃ কলি। পরিক্ষিৎ মারা যাবার পর স্বর্গ লাভ করেন নি। নারদের উপদেশে জন্মেজয় নবরাত্রি উৎসবের সময় অশ্বাযাগ করে প্রচুর দান করেন এবং দেবী ভাগবৎ পাঠ করান; ফলে রাজা দেবী-লোক প্রাপ্ত হন।

মহাভারতে যুদ্ধ হয়েছিল ৩১৩৮ খৃ-পূ; ৩৬ বছর পাণ্ডবরা রাজত্ব করেন অর্থাৎ ৩১০২ সালে মহাপ্রস্থানে যান; ৬০ বছর পরীক্ষিত রাজত্ব করেন অর্থাৎ ৩০৪২ সালে মারা যান এবং জন্মেজয় রাজা হন। সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘাযুক্ত (সপ্তর্ষয়ঃ মঘাযুক্তাঃ) হয়েছিল ৩০৭৭ খৃ-পূর্বে এবং ৪৭৭ খৃ-পূর্বে; এই উক্তি অনুসারে এই গণনা।

(২) ইক্ষ্বাকু বংশে এক রাজা। মৃগয়াতে একটি হরিণের অনুসরণে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে এক নদী/সরোবরের তীরে এসে ঘোড়া সমেত জলে নামেন। ঘোড়াকে জল খাইয়ে এবং নিজে জল খেয়ে উপরে উঠে এসে সামনে একটি গাছে ঘোড়া বেঁধে বিশ্রাম করতে থাকেন। এর পর হঠাৎ সুন্দর একটি গান শুনতে পান; গান শুনতে শুনতে পরমা সুন্দরী একটি মেয়েকে দেখতে পান এবং এঁর পাণিপার্থী হন। মেয়েটি সর্ত করেন যদি কখনো তাঁকে জল দেখান রাজাকে ত্যাগ করবেন। অন্য মতে সর্ত ছিল জল স্পর্শ করবেন না (মহা ৩।১৯০।১০)। রাজধানীতে তার পর রাজা ফিরে আসেন এবং একটি গোপন কক্ষে এনে রেখে দেন; কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দেন না। প্রধান মন্ত্রী কৌতূহলী হয়ে পড়েন এবং রানীর পরিচারিকাদের মুখে শোনেন এই কক্ষে জল নিয়ে যাওয়া নিষেধ। মন্ত্রী তখন রাজা রানীর জন্য সুন্দর একটি উদ্যান করে দেন; এখানে একটি পুকুরও ছিল কিন্তু জল মুক্তা জাল দিয়ে ঢাকা

দেওয়া ছিল, পাড়ও চুনের লেপে ঢাকা দিল। রাজারানী এখানে বিহার করতে থাকেন; এবং বুঝতে না পেয়ে রাজরানী এগিয়ে এসে জল স্পর্শ করেন। অন্য মতে (মহা ৩।১৯০।২৭) রাজা রানীকে জলে নামতে বলেছিলেন; সর্তের কথা মনে ছিল না। রানী জলে নেমে আর ওঠেন না। রাজা তখন পুষ্করিণীর সমস্ত জল তুলে ফেলে দেবার ব্যবস্থা করেন এবং পুষ্করিণীর নীচে একটি বেঙ পান। রাজা বিশ্বাস করেন এই বেঙই রাণীকে খেয়ে ফেলেছে এবং সমস্ত মণ্ডুককুল ধ্বংস করবার চেষ্টা করেন। এই সময় মণ্ডুক রাজ আয়ুস এক জন তপস্বীর বেশে এসে রাজাকে নিরস্ত করেন এবং জানান এই রাণী তাঁরই মেয়ে; নাম সুশোভনা; অত্যন্ত দুষ্ট স্বভাব, বহু রাজাকে এই ভাবে প্রতারিত করেছে। রাজা স্ত্রীকে ফিরে চান; মণ্ডুকরাজ মেয়েকে এনে দেন এবং বহু রাজাকে এইভাবে প্রতারিত করার জন্য শাপ দেন সুশোভনার ছেলেরা অত্যন্ত দুষ্ট হবে। সুশোভনার তিন ছেলে শল, দল, বল; ব্রাহ্মণদের এঁরা বহু ক্ষতি করে ছিলেন। পরিক্ষিতের পর শল রাজা হন; এবং পরিক্ষিত বনে চলে যান।

পরেশনাথ—প্রাচীন নাম সম্মেত শিখর। বিন্ধ্য, সাতপুরা প্রভৃতি পাহাড়ের অংশ। জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের নামে নাম। পার্শ্বনাথ সমেত ২০ জন তীর্থঙ্কর এখানে নির্বাণ লাভ করেন। মন্দিরে পার্শ্বনাথ ও অন্য চারটি মূর্তি রয়েছে।

পর্জন্য—বৃষ্টির দেবতা। ব্রহ্মা এঁকে জল বর্ষণের অধিপতি করেন। পর্জন্যের ছেলে হিরণ্যরোমাকে ব্রহ্মা উত্তর দিকের দিকপাল করে দিয়েছিলেন। পর্জন্য সম্বন্ধে বেদে অনেক মন্ত্র আছে।

পর্ণয়—ঋকবেদে এক দৈত্য; এর বন্ধু করঞ্জয় ও বঙ্গৃদ। এরা আর্য রাজা অতিথিগ্বা ও ঋজিশ্বা-কে আক্রমণ করেন। ইন্দ্র আর্যদের সাহায্য করেন; দৈত্যরা হেরে যান।

পর্ণাদ—রাজা নলের (দ্রঃ) অনুসন্ধানে নিযুক্ত এক ব্রাহ্মণ। বিদর্ভরাজ ভীম এঁকে নিযুক্ত করেছিলেন। দ্রঃ দময়ন্তী।

পর্বত—(১) মরীচির স্ত্রী সম্ভূতি; একটি ছেলে হয় পৌর্ণমাস। পৌর্ণমাসের দুই ছেলে বিরজস্ ও পর্বত। পৌর্ণমাসের স্ত্রী নারদের বোন। নারদ (দ্রঃ) ও পর্বত মুনি বহু দিন অভিন্ন হৃদয় হয়ে বাস করতেন। পর্বত মুনি দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে, ও জন্মেজয়ের সর্প যজ্ঞে ছিলেন। কাম্যক বনে পাণ্ডবদের উপদেশ দিয়ে ছিলেন তীর্থ যাত্রায় বার হতে। (২) দ্রঃ মৈনাক।

পশুপতি—সমস্ত জীবের পতি। দ্রঃ রুদ্র।

পশুপতিনাথ—কাঠমণ্ডু থেকে ৫ কি-মি দূরে বাগমতী নদীর তীরে শিব মন্দির। মন্দিরের চূড়া তামার; তার ওপর সোনার পালিস; দরজাগুলি রৌপ্যমণ্ডিত। প্রবেশ পথে তামার বলীবর্দরূপী নন্দী ইত্যাদি। বেদীতে শিবলিঙ্গের ওপর চতুর্মুখ/পঞ্চানন মূর্তি। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ এই পঞ্চ শক্তির প্রতীক হিসাবে পঞ্চাননের মূর্তি কল্পনা। ইনি নেপালের রাজবংশের দেবতা; দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। বাগমতীর অপর তীরে গুহ্যেশ্বরীর মন্দির; এটি ৫২ পীঠের একটি; ভেতরে কোন মূর্তি নাই; কেবল একটি কুণ্ড। অন্য দিকে একটি সিঁড়ি গোরক্ষনাথের মন্দিরে গিয়েছে। খৃ-৮ম শতকের আগে এটি বৌদ্ধ তীর্থ স্থান ছিল মনে হয়। মন্দির গঠন শৈলী বৌদ্ধযুগীয় প্যাগোডা ধরণের। একটি মতে মন্দিরটি শঙ্করাচার্য স্থাপিত (খৃ ৭৮৮)।

পহ্লব—(১) সগর রাজ যে সব ক্ষত্রিয় বংশকে পরাজিত করে নানারূপে চিহ্নিত করে দেন ও অগ্নির উপাসক করে দেন তাদের মধ্যে একটি বংশের নাম পহ্নব বা পহ্লব। এঁরা শ্মশ্রুমণ্ডনে নিষিদ্ধ হন। পারসিক দেশে যে সমস্ত প্রস্তর মূর্তি দেখা যায় সেগুলি এই রকম শ্মশ্রু বিশিষ্ট। অর্থাৎ ইরানিরা পহ্লব। এঁরা মনে হয় প্রথমে পার্থিয়া বা পারদ সম্রাজ্যের সামন্তরাজ হিসাবে আফগানিস্তানে সিস্তান প্রদেশ শাসন করতেন ; পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

পহ্লবী ভাষা—কিছু মতে পর্থব শব্দের পরিবর্তিত রূপ পহ্লব। ইরানের উ-পূ অঞ্চলের একটি বিশেষ জনপদের অধিবাসীদের এই পর্থব বলা হত। আলেকজান্দারের রাজত্ব ভেঙ্গে পড়ে খৃ-পূ ৩-শতকে ; এই সময়ে পর্থব বা পহ্লবদের বাসভূমি 'পার্থিয়া' জনপদ গত অর্সাক বংশীয়েরা ইরানে রাজা হন এবং ৫০০ বছর মত রাজত্ব করেন। এই পহ্লব সম্রাটদের সময়ে সমগ্র ইরানে যে ভাষা প্রচলিত হয় সেটির নাম পহ্লবী ভাষা ; পহ্লবদের ভাষা বলে এই নাম নয়। কিন্তু তবু এই রাজাদের সময়ের পহ্লব ভাষায় কোন সাহিত্যিক নিদর্শন মেলে না। খৃ-পূ ৬-৫ শতকে ইরানে যে রাজভাষা (=প্রাচীন পারসিক) চালু ছিল সেই ভাষাই খৃ-পূ ৪-শতকে মধ্যপারসিক = পহ্লবী রূপ পায়। খৃ ৩-য় বা ৪-র্থ শতক থেকে অর্থাৎ পহ্লবদের পর থেকে এবং মোটামুটি সাসান বংশের রাজত্ব কালে পহ্লবী ভাষার সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়। ৭ম শতকের শেষে ইরান ইসলাম গ্রহণ করেন কিন্তু পহ্লবী ভাষা বা মধ্য পারসিক বিবর্তনে ৮ম শতকে নব্য পারসিকে পরিণত হয়। ইরানে জরথুস্ত্র পণ্ডিতেরা ১০ম শতক পর্যন্ত এই ভাষার চর্চা করেছিলেন। অর্থাৎ পহ্লবী ভাষার কাল খৃ ৩য় থেকে ১০ম শতক পর্যন্ত মোট ৭০০ বছর মত। পহ্লবী ভাষায় ইতিহাস, আখ্যান, কথা-কবিতা ইত্যাদি সবই রচিত হয়েছিল মনে হয়। কিন্তু বর্তমানে পারসী ধর্মশাস্ত্র গত পহ্লবী গ্রন্থগুলিই (এবং তাও ভারতে) কেবল পাওয়া যায়।

পাকশাসন—পাক নামে অসুরকে বিনাশ করে ইন্দ্রের এই নাম। তীব্র যুদ্ধ হয়েছিল।

পাকশাস্ত্র—পাকদর্শন। বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের বর্ণনা যুক্ত একটি গ্রন্থ ; রচয়িতা নল রাজা।

পাঞ্চজন্য—দ্রঃ পঞ্চজন। কৃষ্ণের শঙ্খ। দ্রঃ ত্রিবর্চস্। একটি অগ্নি ; তিনটি স্ত্রী :- সুপ্রজা, বৃহদ্ভাষা ও নিশা (দ্রঃ)। প্রথম দুই স্ত্রীর ছয় ছেলে ; তৃতীয় স্ত্রীর সাত ছেলে ও এক মেয়ে। দ্রঃ তপ।

পাঞ্চাল—দ্রঃ পঞ্চাল ; বাহ্লিক ; কৌশিক। জনৈক ভেষজ শাস্ত্র প্রণেতা, ছেলে পুণ্ডরীক।

পাঞ্চালিক—কুবেরের এক ছেলে। ভারতে বিভিন্ন স্থানে পূজা হয়। দাক্ষায়ণী সতীর মৃত্যুর পর মহাদেব যখন তপস্যা করছিলেন তখন মদন মহাদেবকে বাণবিদ্ধ করেন। মহাদেব কামোন্মত্ত হয়ে সতীকে খুঁজে বেড়াতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত কালিন্দীতে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এই সময় থেকে কালিন্দীর জল কালো হয়ে ওঠে। শিব শেষ পর্যন্ত আবার জল থেকে উঠে ছুটতে থাকেন এবং কামদেব আবার উন্মাদন বাণ সন্ধান করেন। দুটি বাণে জর্জরিত হয়ে মহাদেব ছুটে বেড়াতে বেড়াতে সামনে পাঞ্চালিককে দেখতে পান এবং নিজের উন্মাদনা এর ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে শান্ত

হন। মহাদেব বলেন এখন থেকে প্রতি চৈত্রমাসে যারা পাঞ্চালিকের পূজা করবে তারা পুরুষশক্তিধর হবে।

পাঞ্চালী—দ্রৌপদীর এক নাম।

পাঞ্চেনলামা—ধ্যানী বুদ্ধের অবতার। পাঞ্চেন অর্থে পণ্ডিত।

পাটনা—জেলাটি প্রাচীনকালে মগধরাজ্যের অংশ বিশেষ ছিল। পাটলীপুত্র (দ্রঃ) নগরের ধ্বংসাবশের ওপর পাটনা সহর গড়ে ওঠে। বর্তমান পাটনা সহরের উপকণ্ঠে বহু পুরাকীর্তি পাওয়া গেছে।

পাটলিপুত্র—(১) বিহারে বর্তমানে পাটানা সহর ও আশেপাশের অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। গঙ্গার দক্ষিণে অবস্থিত ; গঙ্গার উত্তর তীরে গণতান্ত্রিক লিচ্ছবিরা প্রবল পরাক্রান্ত ছিল। বুদ্ধের জীবন দশাতে মগধরাজ অজাতশত্রু খৃ-পূ ৫-শতকে গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমে পাটলিগ্রামে একটি সুরক্ষিত দুর্গ স্থাপন করেন। বুদ্ধদেব ভবিষ্যৎ-বাণী করেন করেন এটি একটি সমৃদ্ধ নগরীতে এক দিন পরিণত হবে। অজাতশত্রুর পৌত্র উদয়-বর্দ্ধন মগধের রাজগৃহ থেকে পাটলি গ্রামে রাজধানী নিয়ে আসেন, নাম হয় পাটলিপুত্র ; প্রায় ১০০০ বছর এখানে মগধের রাজধানী ছিল। মেগাস্থিনিসের (খৃ-পূ ৪ শতক) বর্ণনায় এটি ১৪ কি-মি × ২'৫ কি-মি। ৬০০ ফু চওড়া ও ৬০ ফু গভীর পরিখা বেষ্টিতনগরী। পরিখার পাশে পাশে সুদৃঢ় ও সুউচ্চ শালকাঠের প্রাচীর। এই প্রাচীরের স্থানে স্থানে ছিদ্র থাকত ; এই স্থান থেকে রক্ষীরা তীর ছুঁড়ে শত্রু প্রতিহত করত। বহু হর্মে শোভিত সুন্দর নগরী ছিল। খৃ ৫ শতকে ফা-হিয়েন বলেছেন এখানে পাথরের তৈরি বিশাল প্রাসাদগুলি যেন কোন দানবের রচনা বলে প্রতিভাত হত। খৃ ৬ শতকে বৈদেশিক আক্রমণে পাটলিপুত্র অরণ্য সঙ্কুল হয়ে পড়ে। ৮ম-৯ম শতকে পাল সম্রাটদের সময় আবার পাটলিপুত্রের গৌরব কিছুটা ফিরে আসে।

মৌর্যকালীন একটি হলঘর পাওয়া গেছে। এই ঘরে আশি বা আরো বেশি পাথরের থাম ছিল। থামগুলি পরে ইচ্ছা করে ভাঙা হয়েছিল দেখা যায়।

পাটলীপুত্র—(২) গঙ্গাতীরে একটি পবিত্র পুষ্করিণী ছিল নাম কনখল। এই পুষ্করিণী/হ্রদের তীরে দক্ষিণ ভারত থেকে আগত একটি ব্রাহ্মণ দম্পতী কঠোর তপস্যা করতেন। এখানে এঁদের তিনটি ছেলে হয়। এঁদের মৃত্যুর পর ছেলে তিন জন রাজগৃহে এসে বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কার্তিকের তপস্যা করবার জন্য বার হয়ে পড়েন। পথে সমুদ্র তীরে ভোজিক নামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হন। ব্রাহ্মণের তিনটি মেয়ে ছিল ; এঁদের সঙ্গে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে সমস্ত ধনসম্পত্তি এঁদের ভাগ করে দিয়ে নিজে তপস্যা করতে চলে যান। এরা তিন ভাই এখানে থাকেন। এক বার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হলে এরা তিন ভাই স্ত্রীদের রেখে বার হয়ে যান। দ্বিতীয় বোনটি এই সময় গর্ভবতী ছিল ; এঁরা তিনজনে পিতৃ-বন্ধু যজ্ঞদত্তের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। যথা সময়ে এর একটি ছেলে হয়। হর-পার্বতী এক দিন আকাশ পথে যেতে যেতে ছেলেটিকে আশীর্বাদ করেন। আগের জন্মে এই ছেলে এবং এর স্ত্রী পাটলী (রাজা মহেন্দ্রের মেয়ে) অত্যন্ত শিবভক্ত ছিলেন। হরপার্বতী বলে যান এ জন্মে এঁদের বিয়ে হবে এবং সুখী হবে। মহাদেব তারপর ছেলেটির মাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে ছেলেটির নাম পুত্রক রাখতে বলেন এবং বলেন

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠলে এর মাথা থেকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ঝরে পড়বে। এই অর্থ এরা জমাতে থাকেন এবং ব্রাহ্মণদের দানও করতে থাকেন। এক দিন পুত্রকের পিতা ও পিতৃব্যেরা আসেন ভিক্ষার জন্য কিন্তু ঈর্ষায় ছেলেটিকে হত্যা করার জন্য ভুলিয়ে বিন্ধ্য পর্বতে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে যান এবং ঘাতকের ব্যবস্থা করে এরা চলে যান। পুত্রক ঘাতককে গায়ের গয়না ইত্যাদি দিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করেন। এ দিকে ভীষণ ঝড় ওঠে। পুত্রক এই ঝড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। পথে এক জায়গায় দেখেন ময়াসুরের তিনটি ছেলে ঝগড়া করছেন; ময়ের দেওয়া একটি লাঠি, এক জোড়া পাদুকা ও একটি পাত্র নিয়ে এই ঝগড়া। এই লাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ কেটে যা চাইবে পাওয়া যায়, পাদুকা পরলে আকাশে উড়ে যাওয়া যায় এবং পাত্রটিতে হাত দিলে প্রচুর ভক্ষ্য বস্তু পাওয়া যায়। পুত্রক এদের বোঝান ঝগড়া না করে বাজি রেখে ছুটে যে জিততে পারবে সে এইগুলি নিক। এরা সম্মত হয়ে ছুটতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে সুযোগ পেয়ে পুত্রক ঐ পাদুকা পরে লাঠিও পাত্রটি নিয়ে কেটে পড়েন এবং দূরবর্তী একটি সহরে এক বৃদ্ধার ঘরে এসে আশ্রয় নেন। এই দেশের রাজার মেয়েরও নাম ছিল পাটলী। বৃদ্ধার কাছে পাটলীর বর্ণনা শুনে পুত্রক একে বিয়ে করতে চান। রাত্রি বেলা রাজপ্রাসাদে সকলে যখন ঘুমিয়েছে তখন ঐ পাদুকা পরে জানালা দিয়ে পাটলীর ঘরে এসে ঢোকেন। পাটলীর ঘুম ভেঙে যায় এবং দু জনের গন্ধর্ব মতে বিয়ে হয়। পুত্রক তার পর পাটলীকে নিয়ে বার হয়ে যান এবং গঙ্গার তীরে এক জায়গায় এসে নামেন। এইখানে পাটলীর অনুরোধে পুত্রক একটি নগরী স্থাপন করেন; নাম হয় পাটলীপুত্র।

পাটীগণিত—আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, ভাস্করাচার্য ইত্যাদি গণিতবিদদের নাম উল্লেখ যোগ্য। ভাস্করাচার্যের লীলাবতী একটি অমূল্য গ্রন্থ। দশমিক পদ্ধতি ভারতেই প্রথম চালু হয়।

পাণিনি—বৈয়াকরণ। পৃথিবীর কোন ভাষায় এত সংক্ষিপ্ত ও সম্পূর্ণ কোন ব্যাকরণ কেউ লিখতে পারেন নি। এর আগে আরো ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল কিন্তু সেগুলি আজ লুপ্ত। এই গ্রন্থে (= অষ্টাধ্যায়ীতে) গার্গ্য, গালব, শাকল্য, শাকটায়ন প্রভৃতি পূর্ব-সূরীদের নাম আছে। খৃ-পূ ৭-ম শতকে অন্য মতে খৃ-পূ ৪-র্থ শতকে। পাকিস্তানে আটক সহরের কাছে শালাতুর গ্রামে, বর্তমানে নাম লাহুর, জন্ম। কথাসরিৎ-সাগরে জানা যায় পাণিনি পাটলীপুত্রে বাস করতেন; অর্থাৎ জীবনের বেশির ভাগই পাটলী-পুত্রে কাটে। একটি মতে পূর্বপুরুষরা শালাতুরে ছিলেন। মহারাজ নন্দের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা ছিল। কাহিনী অনুসারে গুরু বর্ষ-এর কাছে শিক্ষা লাভ করেন। পাণিনি অত্যন্ত বোকা ও গুরুভক্ত ছিলেন। গুরুপত্নী পাণিনিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং ইনিই পাণিনিকে হিমালয়ে গিয়ে শিবের তপস্যা করতে বলেন। পাণিনি যখন শিবের তপস্যা করছিলেন তখন শিব এসে সামনে নাচতে থাকেন; এবং ঢক্কা (ডমরু) বাজাতে থাকেন। এই ডমরুর শব্দ থেকে পাণিনি ১৪-টি শব্দ/অক্ষর লাভ করেন। শব্দ বিশ্লেষণে এটি ফোনেটিক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ। পাণিনি তপস্যায় ব্যাকরণে জ্ঞান লাভ করে ফিরে আসেন। এই সময় বর্ষের আর এক শিষ্য বররুচি ইন্দ্রের কাছ থেকে আর একটি ব্যাকরণ নিয়ে আসেন। বররুচির কাছে

পাণিনি তর্কে হেরে যান। কিন্তু বররুচির ব্যাকরণ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায়। এর পর থেকে আজ পর্যন্ত মুগ্ধবোধ ইত্যাদি বহু ব্যাকরণ লেখা হয়েছে ; এগুলির প্রত্যেকেরই উপজীব্য কিন্তু পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী। বইটিতে আটটি অধ্যায় ; প্রতি অধ্যায়ে ৪-টি পাদ ; প্রতি পাদে বহু সূত্র। অক্ষর ও শব্দের উৎপত্তি, দুটি শব্দের মধ্যগত সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। কাহিনীতে ডমরু শব্দ থেকে অক্ষর সংগ্রহ/অক্ষরের ধারণা হওয়ার অর্থ শব্দ তত্ত্বের সূক্ষ্ম এবং খৃ-বিশ শতকের সমগোত্রীয় ফোনেটিক বিশ্লেষণ। বইটি ঠিক ব্যাকরণ নয় ; এটি শব্দ বিজ্ঞান।

পাণ্ডব—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। অজ্ঞাত বাস-কালে এঁদের নাম ছিল যথাক্রমে কঙ্ক, বল্লব, বৃহন্নলা, গ্রন্থিক ও তন্তিপাল। একটি কাহিনীতে আছে বিশ্বভুক্, ভূতধামা, শিবি, শান্তি ও তেজস্বী পঞ্চ পাণ্ডব রূপে জন্মান।

পাণ্ডু—বিচিত্রবীর্যের দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র। অম্বালিকার গর্ভে জন্ম। সত্যবতীর অনুরোধে অম্বালিকা ব্যাসের কাছে যান এবং ব্যাসকে দেখে ভয়ে বা ব্যাসের কুৎসিত চেহারা দেখে বিরক্তিতে পাণ্ডুবর্ণা হয়ে পড়েন। ফলে ছেলের রঙ ও পাণ্ডুর হয় এবং এই জন্য নাম। ভীষ্মের কাছে পালিত হন ; ভীষ্ম বেদ ইত্যাদি এবং গদা-যুদ্ধ ও ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দেন। বিখ্যাত ধনুর্ধর ছিলেন। বড় ভাই ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলে ইনিই রাজা হন। কুন্তীকে স্বয়ংবরে লাভ করেন। এর পর মদ্ররাজ শল্যের বোন মাদ্রীকে ভীষ্ম নিয়ে এসে পাণ্ডুর সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে দেন। দশার্ণ, কাশী, মিথিলা, সুহ্ম, পুণ্ড্র ইত্যাদি বহু দেশ এবং মগধরাজ দীর্ঘকে জয় করেন। এই সব দেশ থেকে যা কিছু ধনরত্ন এনেছিলেন সব ভীষ্ম ও সত্যবতীর হাতে তুলে দেন। পাঁচ-টি মহা-যজ্ঞ করেছিলেন। বনে এক দিন মৃগয়াকালে অন্য মতে বনে কিছু দিন থাকার সময় সঙ্গম রত এক মৃগ মিথুনকে পাণ্ডু পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করেন। মুনি কিমিন্দম্ দম্পতী পুত্র কামনায় হরিণ রূপে মিলিত হয়েছিলেন। মুনি শাপ দেন সঙ্গম করলে রাজারও মৃত্যু হবে। ব্রহ্ম হত্যার জন্য কোন অভিশাপ দেন নি। মুনি মারা যান। অভিশপ্ত রাজা প্রথমে আত্মহত্যা করবেন ঠিক করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই স্ত্রীকে নিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বনবাসী হন। চৈত্ররথ, গন্ধমাদন, ইন্দ্রদ্যুম্ন হ্রদ ইত্যাদি তীর্থ ঘুরে শেষ পর্যন্ত শত-শৃঙ্গে এসে তপস্যা করতে থাকেন। এক বার স্ত্রীদের নিয়ে ব্রহ্মলোকে যজ্ঞে যোগদান করেন এবং এই সময়ে পাণ্ডু সন্তান হবার কথা চিন্তা করেন। কয়েক জন ব্রহ্মর্ষিও পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হবার জন্য ইঙ্গিত করেছিলেন। রাজা কুন্তীকে কোন ব্রাহ্মণ ইত্যাদির ঔরসে ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্য অনুরোধ করেন। কুন্তী রাজি হন না ; দুর্বাসাদত্ত মন্ত্রের কথা জানান এবং মন্ত্র বলে কুন্তীর তিন ছেলে হয়। এর পর মাদ্রীর কথা মত রাজা কুন্তীকে অনুরোধ করেন এবং কুন্তী মাদ্রীকে মন্ত্র দান করলে মাদ্রীর দুই ছেলে হয়। এর পর এক দিন বসন্ত কালে নির্জনে মাদ্রীকে পেয়ে কামার্ত রাজা মাদ্রীর নিষেধ অগ্রাহ্য করে সহবাস করতে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। খবর পেয়ে হস্তিনাপুর থেকে লোক আসে ; পাণ্ডুর শেষকৃত্য করা হয় ; কুন্তী ও মাদ্রী দু জনেই সহমৃতা হতে যান : কিন্তু শেষ অবধি কুন্তী নিরস্ত হন। কশ্যপ মুনি শবদাহ করেন। স্বর্গ থেকে পাণ্ডু নারদকে দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করার জন্য সংবাদ পাঠিয়েছিলেন।

পাণ্ডুয়া—২৫°৮´ উ ও ৮৮°১০´ পূ: মালদহ জেলার ছোট একটি গ্রাম। পাণ্ডু নগরের অপভ্রংশ পাণ্ডুয়া। পাণ্ডব রাজার দালান ইত্যাদি ছিল। এখান থেকে প্রস্তর ইত্যাদি নিয়ে এখানকার মুসলিম সৌধ নির্মিত হয়েছে। পাণ্ডুভূমি নামধেয় প্রখ্যাত বিহারটি বোধহয় এইখানে ছিল।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি—রাজার ঢিবি। বর্দ্ধমান জেলার উপর সীমায় অজয় নদের দক্ষিণে পাণ্ডু নামে কোন রাজার নামের সঙ্গে জড়িত। এখানে কিছু তাম্রাশ্মীয় মাটির পাত্র ও ক্ষুদ্রাশ্ম ও নবাশ্ম আয়ুধ পাওয়া গেছে। খননের ফলে তিনটি প্রাগৈতিহাসিক যুগ ও একটি ঐতিহাসিক যুগের পরিচয় মিলেছে। খৃ-পূ ২০০০ সহস্রকে এখানকার বসতি; এই সময়ে এখানে অজয় নদীর তীরে ধান চাষ হত প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম যুগের ঢিবিতে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্লাবনের চিহ্ন পাওয়া যায়। দ্বিতীয় যুগে পলি পড়া বালি-মাটির ওপর নতুন বসতি গড়ে ওঠে। এটি তাম্র-অশ্মীয় যুগ। দ্বিতীয় যুগে সুচারু শিল্প মানসের পরিচয় পাওয়া যায়। এটি নগর ভিত্তিক একটি অনুপম সভ্যতা ছিল। শূকর পালিত হত। প্রতীকধর্মী বহু কারুকার্যও দেখা যায়। বিভিন্ন রঙের উজ্জ্বল ও কারুকার্যমণ্ডিত মৃৎপাত্রও এই দ্বিতীয় যুগে পাওয়া যায়। এই যুগেই তামার অলঙ্কার, পোড়ামটির তকলি এবং শিমুল তুলা থেকে বোনা চিকন ও শুভ্র বস্ত্রের প্রমাণ রয়েছে। একটি বিশেষ জিনিস পাওয়া গেছে, এটি জলহস্তীর সছিদ্র একটি দন্ত; এটি মনে হয় ৩ হাজার বছর আগে আফ্রিকা বা মাদাগাস্কার থেকে আনীত। দ্বিতীয় যুগের বয়স যেন খৃ-পূ১০১২। তৃতীয় যুগে এখানে অঙ্গার মিশ্রিত লোহার অস্ত্র, এবং নানা বর্ণের ও কারুকার্য যুক্ত মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। লৌহ গলাবার চুল্লীও রয়েছে। কোন একটি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে এই তৃতীয় যুগ শেষ হয়েছিল। তৃতীয় যুগের পর স্থানটি বহু দিন পরিত্যক্ত ছিল। পরে মৌর্য, শুঙ্গ ও কুষাণ যুগে আবার এখানে বসবাস আরম্ভ হয়। সম্রাট কণিষ্কের একটি স্বর্ণমুদ্রাও পাওয়া গেছে।

পাণ্ড্য—দাক্ষিণাত্যে একটি প্রাচীন দেশ। কাত্যায়নের বার্তিকে, মেগাস্থিনিসের (খৃ-পূ ৪-শতক) বিবরণে, অশোকের অনুশাসনে, টলেমির ভূগোল ইত্যাদিতে এর উল্লেখ আছে। ইতালির সম্রাট জুলিয়ান (১৬১ খৃষ্টাব্দ) পাণ্ড্য দেশের লোকের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। খৃ ১-ম শতকে পাণ্ড্যরাজ রোম সম্রাট আগাস্টাসের কাছে দূত পাঠান। কাবেরী নদীর বদ্বীপের দক্ষিণে মাদুরাই, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ইত্যাদি অংশ মিলে গঠিত। মহাভারতে কৃষ্ণ এক জন পাণ্ড্যরাজকে নিহত করেন। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ড্যরাজরা পাণ্ডবদের পক্ষে ছিলেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে এখানে প্রচুর মুক্তা পাওয়া যেত।

পাণ্ড্যরাজ—পাণ্ডবপক্ষে এক জন যোদ্ধা। অন্য যে কোন যোদ্ধার চেয়ে নিজেকে বড় মনে করতেন। কুরুক্ষেত্রে ১৬ দিনের দিন যুদ্ধে অশ্বত্থামার হাতে নিহত হন।

পাতঞ্জলদর্শন—পতঞ্জলি মুনি প্রবর্তিত। এই দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত। এঁর মতে ঈশ্বর নিজের ইচ্ছা মত শরীর ধারণ করে জগৎ সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ সাকারবাদীর দর্শন। মানুষের নানা চিত্তবৃত্তির এবং প্রতিটি বৃত্তির বিভিন্ন বিষয় নির্ধারিত রয়েছে। যেমন দর্শনের বিষয় রূপ, শ্রবণের বিষয় শব্দ ইত্যাদি। মনকে সমস্ত বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে পরমেশ্বরের

বিষয়ে ধ্যান করাকে যোগ বলা হয়। পাতঞ্জল মতে এই যোগের আটটি অঙ্গ :-যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। পাতঞ্জল মতে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। এই তত্ত্ব হচ্ছে পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা ; জড় জগৎ থেকে আলাদা। স্ফটিক যেমন স্বভাবতই শুভ্র, জীব ও তেমনি স্বভাবতই চিন্ময়। অজ্ঞানতার জন্যই সুখদুঃখ বোধ। তত্ত্বজ্ঞান এলে অজ্ঞানতা চলে যাবে ; কেবল চিন্ময় স্বরূপই পড়ে থাকে। এই চিন্ময় স্বরূপতা হচ্ছে কৈবল্য বা মুক্তি। পাতঞ্জল দর্শন চার ভাগে বিভক্ত :-যোগপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। পতঞ্জলি মতে একমাত্র ঈশ্বর উপাসনা করে সমাধি লাভ করা যায়। ঈশ্বরের উপাসনা করতে হলে কায়িক, বাচিক, মানসিক সব কিছুই ঈশ্বরকে অর্পণ করতে হবে। পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বর নিত্য, নিরতিশয়, অনাদি, অনন্ত। অল্পতার সীমা পরমাণু এবং বৃহতের সীমা আকাশ তেমনি জ্ঞান শক্তির অল্পতার সীমা জীব এবং পরকাষ্ঠা ঈশ্বর।

পাতাল—পৃথিবীর নীচে অবস্থিত। দেবী ভাগবত অনুসারে এই পৃথিবীর অধোদিকে সাতটি বিবর/এলাকা/তল পাতাল নামে পরিচিত। স্বর্গের চেয়ে সুখদায়ক। এখানেও চন্দ্র সূর্য রয়েছে ; দৈত্যদানব ও সর্পেরা এখানে বাস করে। অনন্ত বা শেষ নাগ ও এইখানে থাকেন। সাতটি পাতাল যথাক্রমে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। এই সব জায়গায় মণিরত্ন সুশোভিত নানা পুরী ও বাসগৃহ ময় দানব রচনা করেছিলেন। বিষ্ণু পুরাণে ক্রমিক নাম অতল, বিতল, নিতল, গভস্তি-তল, মহাতল, সুতল ও পাতাল। এগুলির প্রতিটির পরিমাণ এক যোজন। পাতাল সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যে যে সব বিবরণ রয়েছে তাতে মনে হয় বিন্ধ্যের দক্ষিণে অবস্থিত দেশগুলিকে যেন পাতাল বলা হয়েছে। হিমালয়ের সানু দেশকে স্বর্গ বলা হয়েছে। নাগ ইত্যাদিকে বহু বহু স্থানে মানুষ হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে ; আবার সময়ে সময়ে তারা সাপের মত চেহারা ধারণ করত। অর্থাৎ নাগেরা যেন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কোন শাখা। কিছু মতে কেরল অংশ যেন পাতাল। যদুর ভাই তুর্বসুর বংশে রাজা গান্ধারের জন্ম। এবং এই গান্ধার বংশের শাখা চোল, কোল, পাণ্ড্য ইত্যাদি। অনেক সময় পাতাল অর্থে কেবল নাগলোক বোঝায়। অনন্ত, বাসুকি, শঙ্খ, গুলিক, শ্বেত, ধনঞ্জয়, মহাশিখ, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বল, অশ্বধর ও দেবদত্ত এখানে বাস করেন। এরা সকলেই ভয়ঙ্কর বিষধর ; পাঁচ থেকে ১০০ ফণা ; মাথায় মণি আছে। দ্রঃ দিগ্‌গজ।

পাতালকেতু—বজ্রকেতু দানবের ছেলে। মহর্ষি গালবকে উৎপীড়ন করতেন। গালবের অনুরোধে কুবলাশ্ব (= ঋতধ্বজ) তাঁর আশ্রমে এসে পাতালকেতুকে আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধ করতে করতে পাতালপুরীতে গিয়ে উপস্থিত হন। এখানে পাতাল-কেতুকে বধ করে বিশ্বাবসুর অপহৃতা মেয়ে মদালসাকে (দ্রঃ) উদ্ধার করেন।

পাতিমোক্‌খ—প্রাতিমোক্ষ। শীল সম্বন্ধে বিধিনিষেধের প্রধান অংশগুলি এই গ্রন্থে রয়েছে। গ্রন্থটি বৌদ্ধসঙ্ঘের দণ্ডবিধি এবং বিনয়পিটকের সারাংশ। বিনয়পিটকের এটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ। বইটিতে ৮ বিভাগ ; মোট ২২৭-টি নিয়ম।

বিভাগগুলি :-(১) পারাজিক :-মৈথুন, চৌর্য, প্রাণিহত্যা, ও নিজের ওপর অলৌকিক ক্ষমতার আরোপ সম্বন্ধে দণ্ড ব্যবস্থা। (২) সঙ্ঘাদিসেস্ ; (৩) অনিয়ত ;

(৪) নিস্সগ্‌গিয় পাচিত্তিয় (নৈসর্গিক প্রায়শ্চিত্তিক); (৫) পাচিত্তিয় (প্রায়শ্চিত্তিক); (৬) পাটিদেসনিয় (প্রতিদেশনীয়); (৭) সেখিয় (শৈক্ষ্য); (৮) অধিকরণসমথ—ভিক্ষু সঙ্ঘের বিবাদ মিটাবার পথ নির্দেশ। প্রতি মাসে অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে সঙ্ঘে উপসথ দিনে পাতিমোক্‌খ আবৃত্তি করতে হয়। অপরাধী ভিক্ষুক বিধি অনুসারে শাস্তি গ্রহণ করে পাপমুক্ত হন। ভিক্ষুণীদের জন্য নির্দিষ্ট আছে ভিক্‌খুনী পাতিমোক্‌খ।

পাদুকা—দ্রঃ রেণুকা।

পাবক—পাবক, পবমান ও শুচি তিন ভাই। তিন জনেই ঘৃতভোজী। অগ্নির ঔরসে স্বাহার গর্ভে জন্ম। এই তিন ছেলের ৪৫-টি ছেলে। ফলে ১+৩+৪৫=৪৯ অগ্নি।

পাবন—(১) একজন বিশ্বদেব। (১) কৃষ্ণ ও মিত্রবিন্দের ছেলে।

পাবরিকাম্ববন বিহার—কৌশাম্বী (দ্রঃ)।

পারদ—(১) ভারতে বহু প্রাচীন যুগ থেকে ব্যবহার। রসসার গ্রন্থে ১৮ প্রকার পারদ যৌগ প্রস্তুতের বিবরণ আছে। (২) প্রাচীন ভারতে একটি দেশ। এখানকার লোকেরা যুধিষ্ঠিরকে বহু উপহার দিয়েছিল। এদের বংশধর উত্তর বালুচিস্তানে বাস করেন।

পারিজাত—সমুদ্র মন্থনে এই গাছ উঠে আসে। ইন্দ্রের অমরাবতীতে বসান হয়। কৃষ্ণ ও রুক্মিণী এক দিন বসেছিলেন এমন সময় নারদ এসে কৃষ্ণকে একটি পারিজাত ফুল দেন। কৃষ্ণ সেটি রুক্মিণীকে দেন। খবর পেয়ে সত্যভামা ক্রুদ্ধ হয়ে পড়লে কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দেন এই গাছ তিনি এনে দেবেন। এর পর সত্যভামাকে নিয়ে ইন্দ্রলোকে গিয়ে পারিজাত গাছ দেখান এবং সত্যভামার কথায় গাছ তুলে নিয়ে আসতে গেলে ইন্দ্র বাধা দেন। যুদ্ধে ইন্দ্র পরাজিত হন; এবং কৃষ্ণ গাছ এনে দ্বারকাতে বসান। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর ইন্দ্র আবার এই গাছ ফিরিয়ে নিয়ে যান।

পারিযাত্র—একটি পর্বত; বিন্ধ্যের পশ্চিম শাখা; এখানে গৌতমের আশ্রম ছিল।

পার্থ—পৃথা অর্থাৎ কুন্তীর ছেলে। বিশেষত অর্জুনকে বোঝায়।

পার্বতী—অন্য নাম উমা বা অপর্ণা। তারকাসুরকে নিধন করতে হলে হরপার্বতীর বিবাহ দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দেবতারা বৃহস্পতির কাছে এসে পরামর্শ চান। সতী (দ্রঃ) তখন মারা গেছেন। হিমবান ও মেনকা সন্তান লাভের আশায় অমৃত সরোবরের কাছে তপস্যা করছিলেন। এঁরা এক দিন জলে স্নান করতে নামলে চতুর্ভুজা একটি বালিকাকে জলেতে পান। শরীরে দেবীর সমস্ত চিহ্ন ছিল। হিমবান ও মেনকা এঁর স্তব করতে থাকেন; সমস্ত দেবী-চিহ্ন এঁর অন্তর্হিত হয়; এঁরা বালিকাকে এনে পালন করেন। ইনি পার্বতী। অন্য মতে হিমবানের তিনটি মেয়ে হয় রাগিণী, কুটিলা ও কালী। ব্রহ্মা চেয়েছিলেন তারক যেন কিছু না জানতে পারেন; এই জন্য নিশাকে পাঠান। গর্ভবতী মেনকা হাঁ করে ঘুমচ্ছিলেন; নিশা মেনকার গর্ভে প্রবেশ করে শিশুকে কালো করে দেন; নাম হয় কালী। এঁরা তিন জনেই মহাদেবকে বিয়ে করার জন্য তপস্যা করছিলেন। দেবতারা লক্ষ্য রাখছিলেন

কার সঙ্গে শিবের বিয়ে হতে পারে। এক বার সুযোগ মত দেবতারা রাগিণীকে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে যান ; ব্রহ্মা বলেন শিবের বীর্য এ ধারণ করতে পারবে না। রাগিণী এতে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং ব্রহ্মা এঁকে শাপ দিয়ে সন্ধ্যা-রাগে পরিণত করে আকাশে রেখে দেন। দেবতারা তার পর কুটিলাকে নিয়ে এলে ব্রহ্মা এঁকেও অসমর্থা বলেন। কুটিলাও রেগে যান এবং ব্রহ্মা এঁকে শাপ দিয়ে নদীতে পরিণত করে ব্রহ্মলোকে রেখে দেন। মেনকা এই ভাবে দুটি মেয়েকে হারিয়ে অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং কালীকে তপস্যা বন্ধ করে ঘরে ফিরে যেতে বলেন। পার্বতী বাড়ি ফিরে যান। নারদ এসে জানিয়ে যান শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিয়ে হবে। তারকাসুর (দ্রঃ) নিধন করবার জন্য দেবতারাও পার্বতীর বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পার্বতী আবার তপস্যা করতে থাকেন। কঠোর তপস্যা দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে মেনকা 'উ-মা' বলে মেয়েকে নিষেধ করে ছিলেন ; সেই থেকে নাম হয় উমা। একটি মতে তপস্যা করতে করতে গৌরবর্ণ হয়ে যান বলে নাম হয় গৌরী। মহাদেব এই সময়ে হিমালয়ে এসে কিছু দিন এখানে থাকবেন ঠিক করেন এবং পার্বতীর তপস্যার কথা জানতে পেরে কৌতূহলে এক দিন সামনে এসে দেখা দেন। উমা সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করেন কিন্তু মহাদেব তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়ে যান। উমা হতাশায় আবার তপস্যা করতে থাকেন। অন্য মতে মহাদেব হিমালয়ে ফিরে এসে তপস্যা করছিলেন ; পার্বতী ও সখীরা তাঁর পরিচর্যা করতেন। ইন্দ্রের নির্দেশে এই সময় কামদেব আসেন, কামদেবের বাণে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হয় এবং ক্রোধে কামদেবকে ভস্ম করে ফেলেন। এর পর মহাদেব অন্যত্র চলে যান। হতাশ হয়ে পার্বতী তখন কঠোর তপস্যা করেন এবং এই সময় উ-মা ও অপর্ণা নাম অর্জন করেন। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ বটু বেশে মহাদেব এসে দেখা দেন এবং শিবের নিন্দা করে পার্বতীকে বোঝাতে চেষ্টা করেন এই মহাদেব পার্বতীর স্বামী হবার সর্বত ভাবে অনুপযুক্ত। পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং শেষ পর্যন্ত শিব নিজের মূর্তি ধারণ করেন। দ্রঃ পাঞ্চালিক।

শিব ও পার্বতীর বিয়ে হয়। দু জনে তার পর আবার ত্রিভুবন পরিক্রমা করে বেড়াতে থাকেন। একটি মতে শিব এক জায়গায় এক বার কৌতুক করে কালী বলে ডাক দেন। পার্বতীর সন্দেহ হয় মহাদেব যেন উপহাস করছেন। অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পার্বতী একা একা বনে চলে যান। এখানে পার্বতী নিজের চার জন পরিচারিকা সোমপ্রভা/অপরাজিতা, জয়া, বিজয়া ও জয়ন্তী সৃষ্টি করে নেন এবং কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। ব্রহ্মা (দ্রঃ) দেখা দেন এবং তপস্যার কারণ শুনে বর দেন পার্বতীর রঙ পদ্মের পাপড়ির মত হবে। নাম হবে গৌরী। গায়ের চামড়া খোলস মত খুলে পড়ে যায় ; রঙ গৌর বর্ণ হয়ে যায়। পার্বতীর সন্তান হয় কার্তিকেয়, গণেশ। (দ্রঃ) দুর্গা, কৌষিকী, মদন, অশোকসুন্দরী, মন্দোদরী, হনুমান। রাম সীতা যখন বনে ছিলেন তখন সীতা এক দিন জল আনতে যান ; এই সময়ে পার্বতী সীতা সেজে রামকে এবং মহাদেব রাম সেজে সীতাকে দেখে যেতে/পরীক্ষা করতে এসে ছিলেন। কৃষ্ণকে পার্বতী অনেকগুলি বর দিয়ে ছিলেন :-১৬ হাজার স্ত্রী, নিজের সুন্দর চেহারা, আত্মীয় স্বজনের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা এবং প্রতি দিন সাত হাজার

অতিথিকে প্রয়োজন হলে খাওয়াতে পারার ক্ষমতা। বিয়ের পর শিব যখন সম্ভোগ করছিলেন তখন সৃষ্টি উত্তপ্ত হয়ে নষ্ট হতে যায়। দেবতারা এসে মহাদেবকে নিবৃত্ত হতে বলেন। অন্য মতে শিব যখন সম্ভোগ করছিলেন দেবতারা তখন মহাদেবকে নিবৃত্ত হতে বলেন ; কারণ এই সন্তানকে ধারণ করার মত ক্ষমতা পৃথিবীর নাই। মহাভারতে আছে দেবতারা এসে মহাদেবকে প্রণাম করে অনুরোধ করেন মহাদেব যেন সন্তান উৎপাদনের চেষ্টায় বিরত থাকেন। কারণ দুই 'অমিতোতেজার' মিলনে যে সন্তান হবে সে ত্রিষু লোকেষু সব শেষ করে ফেলবে (মহা ১৩৷৮৩৷৪৪)। মহাদেব দেবতাদের অনুরোধ রক্ষা করেন। কিন্তু পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে দেবতাদের অভিশাপ দেন দেবতাদের কারো কোন দিন কোন সন্তান হবে না। দ্রঃ বট।

পার্বতীয়—এঁরা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এসে ছিলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে পার্বতীয়দের এক বার যুদ্ধও হয়ে ছিল। জয়দ্রথের সঙ্গে বনে যখন যুদ্ধ হয়েছিল পার্বতীয়েরা তখন জয়দ্রথের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করে ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে শকুনি ও উলূকের অধীনে পার্বতীয়েরা যুদ্ধ করেছিলেন।

পাশ্বর্নাথ—জৈনদের ২৩-শ তীর্থঙ্কর। ২৪-শ ও শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের ২৫০ বছর আগে খৃ-পূ ৮-ম শতকে। বারাণসীর রাজা অশ্বসেনের ছেলে, মা বামাদেবী। কুশস্থলের রাজা প্রসেনজিতের মেয়ে প্রভাবতীর স্বামী। ৩০ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন। দীক্ষা গ্রহণের ৮৪-দিন পরে এঁর কেবল জ্ঞান হয়। ১০০ বয়সে পরেশনাথ পাহাড়ে নির্বাণ লাভ করেন। এঁর রঙ নীল, লাঞ্ছন সর্প, চৈত্যবৃক্ষ ধাতকী, শাসনদেব পার্শ্বযক্ষ এবং শাসন দেবী পদ্মাবতী। পার্শ্বনাথের শ্রমণ সম্প্রদায় পরে মহাবীরের শ্রমণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক হয়ে যায়।

পাঙ্ক্তিক্ষেম—একজন বিশ্বদেব।

পার্সি—আধুনিক ইরানের প্রাচীন অধিবাসী আর্যদের একটি শাখা। মহাভারতের যুদ্ধে পারসিক উপজাতি অংশ গ্রহণ করেছিল। শক পুরোহিত মণ্ডলী পরে ব্রহ্মক্ষত্রিয় হয়। দ্রঃ বল্লাল সেন। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে আরবগণ ইরান জয় করলে সেখানে সকলে ধর্মান্তরিত হন ; বাকি কিছু মৃত্যু বরণ করেন এবং কিছু লোক পালিয়ে যান। ৭৬৬ খৃষ্টাব্দে হোরমুজ বন্দর থেকে নৌকাযোগে কাথিওয়াড়ে দীউ নামক স্থানে কিছু ইরানীয় অগ্নি উপাসক এসে হাজির হন। রানা জয়দেব এঁদের বসবাসের জন্য স্থান দেন। সমুদ্র উপকূলে এঁদের প্রথম বসতি গড়ে ওঠে। এঁরা জরথুস্ত্র পন্থী।

পালি—মধ্য ভারতীয় আর্যদের প্রথম স্তরের সর্বভারতীয় সাধুভাষা। অশোকের গিরনার শিলালিপির ভাষার সঙ্গে পালি ভাষার বিশেষ মিল রয়েছে। মোটামুটি সিদ্ধান্ত উজ্জয়িনী অঞ্চলের ভাষাই পালি ভাষার বীজ। বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে সরে এলে এই পালি ভাষা মাধ্যমে বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিত হতে থাকে। বৌদ্ধ ধর্মের হীনযান শাখা ক্রমশ দক্ষিণে এগোতে এগোতে সিংহল গিয়ে উপস্থিত হয়। সিংহলে পণ্ডিত বুদ্ধ ঘোষের (খৃ-৫ শতক) দেওয়া এই নাম পালি। সংস্কৃতে পরিভাষা থেকে পালিতে পারিভাসা এবং পারিভাসা থেকে পালিভাষা (বিশেষ জ্ঞান)। পালি সাহিত্য বিরাট। ধর্মগ্রন্থ হলেও সাহিত্য মূল্য বহু স্থানে অতুলনীয়।

ধম্মপদ পালির প্রধান, সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ ; পৃথিবীর সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ বই। পালি ও সংস্কৃতে বহু মিল।

পাশ—অস্ত্র। লম্বায় দশ হাত। গুণরজ্জু, কাপাসরজ্জু, মঞ্জুরজ্জু; পশু বিশেষের অন্ত্র, আকন্দ ছালের ফালি ও চর্ম বিশেষের ত্রিশটি ফালিকে একত্রে ভাল ভাবে পাকিয়ে তৈরি। ছোঁড়বার সময় একে কুণ্ডলাকৃতি করে মাথার ওপর ঘুরিয়ে নিক্ষেপ করতে হয়। এই পাশ দিয়ে শত্রুকে বেঁধে ফেলা যায়। এই পাশ প্রয়োগের তিন প্রকার গতি বলগণ, প্লবন ও পব্রজন।

পাশা—ক্রীড়া বিশেষ। প্রাচীন অক্ষক্রীড়ার পরবর্তী রূপ। বৈদিক যুগে বিভীতক/ বহেড়া থেকে অক্ষ নির্মিত হত। মহেঞ্জোদড়োর উৎখননে পোড়া মাটির অক্ষ পাওয়া গেছে।

পাশী—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত হন।

পাশুপত—(১) শিবের একটি অস্ত্র। অর্জুন বনে বাস করার সময় তপস্যা করে শিবের কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করেন। শিবের বিশেষ একটি বাণ। ত্রিপুর এই বাণে ধ্বংস হয়। (২) মহাদেবের সমস্ত ভূতদের সামগ্রিক নাম।

পাহাড়পুর—২৫°২´উ×৮৯°৩´পূ। বাঙ্গলা দেশে রাজসাহি জেলাতে একটি গ্রাম। নাম যাই হক পাশে কোথাও পাহাড় নাই। পাল রাজ বংশের সময় নাম ছিল সোমপুর। তার আগে নাম ছিল বটগোহালী। এখানকার প্রাচীনতম নিদর্শন ৪৭৯ খৃষ্টাব্দের একটি তাম্রপট। একটি দণ্ডায়মান তীর্থঙ্করের ব্রোঞ্জমূর্তি ব্যতীত জৈন প্রত্নতত্ত্ব কিছু পাওয়া যায় না। গুপ্তোত্তর যুগে এখানে একটি ব্রাহ্মণ্য মন্দির ছিল ; মন্দিরে বহু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ছিল। ভাস্কর্যে এগুলি অনবদ্য। পালবংশের রাজত্বকালে এখানে শ্রীধর্মপালদেব মহাবিহার নামে যে সংঘারাম তৈরি হয় সেটি ভারতে আবিষ্কৃত সমস্ত সংঘারাম-গুলির মধ্যে বৃহত্তর। অষ্টম শতকে এটি তৈরি হয়। অনতিদূরে দ্বাদশ শতকের বৌদ্ধ তারা দেবীর একটি মন্দির ছিল। বঙ্গাল সৈন্য কর্তৃক সোমপুর বিহার দগ্ধ হয়। এবং এই আগুনে করুণাশ্রীমিত্র ও মারা যান। ১১-শ শতকের শেষদিকে আবার এখানকার সমৃদ্ধি ফিরে আসে। ব্রাহ্মণ্যধর্মী সেন রাজ বংশের কালে বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠানটি রাজ পোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়। মুসলমান আমলে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। সংঘারামটিতে প্রদক্ষিণ পথের প্রাচীরের গায়ে পোড়া মাটির শতশত ফলক ছিল। এই সব ফলকে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ দেবদেবী, গন্ধর্ব, বিদ্যাধরমূর্তি, জীবজন্তু, সাধারণ জীবন যাত্রা, পঞ্চতন্ত্র উপকথা ইত্যাদি উৎকীর্ণ ছিল। পোড়া মাটির অতুলনীয় কাজ ছিল। এখানে বুদ্ধের ও জম্ভলের ব্রোঞ্জমূর্তি পাওয়া গেছে।

পিঙ্গল—(১) কদ্রুর এক ছেলে। (২) এক জন যক্ষ, শিবের অনুচর। (৩) সূর্যের এক জন পরিচারক। সূর্যের ডান দিকে দণ্ডী, বাম দিকে পিঙ্গল অবস্থান করেন। (৪) এক জন ব্রাহ্মণ ; স্ত্রী এক জন গণিকা। স্ত্রীর হাতে নিহত হন। পর জন্মে পিঙ্গল শকুনি ও স্ত্রী শুক পাখী এবং স্মৃতিধর হয়ে জন্মান। শকুনি প্রতিশোধ নেবার জন্য শুককে নিহত করেন। এর পর এক বাঘ পিঙ্গলকে খেয়ে ফেলে। এক জন ব্রাহ্মণ এদের উদ্দেশ্যে গীতা পাঠ করে শোনান এবং এঁরা পিতৃলোক প্রাপ্ত হন।

পিঙ্গলা—(১) অবন্তিতে এক গণিকা। ঋষভ মুনির প্রতি সশ্রদ্ধ আচরণের ফলে পরজন্মে রাজা চন্দ্রাঙ্গদের মেয়ে কীর্তিমালিনী নামে জন্মান। ভদ্রায়ুর সঙ্গে বিয়ে হয়। (২) অযোধ্যার একটি রমণী। রামচন্দ্রের কাছে কামার্ত হয়ে এসেছিলেন। রাম এক পত্নীত্বে দৃঢ়ব্রত ছিলেন। পিঙ্গলাকে বর দেন পর জন্মে পিঙ্গলা কংসের পরিচারিকা হয়ে জন্মাবেন এবং রামচন্দ্র কৃষ্ণ হয়ে তাঁকে গ্রহণ করবেন। সীতা অভিশাপ দেন এই ভাবে কামাতুর হবার জন্য কংসের পরিচারিকা হলেও তাঁর দেহ তিন ভাগে বেঁকে যাবে। পিঙ্গলা ক্ষমা চাইলে সীতা ক্ষমা করেন; বলেন কৃষ্ণের স্পর্শে দেহ আবার ঠিক হয়ে যাবে। দ্রঃ কুব্জা

পিঞ্জোর—৩০°৪৮´ উ × ৭৬°৫৯´ পূ। পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়ের নিকট। এখানে মনে হয় বনবাসের সময় পাণ্ডবরা এসেছিলেন। মহাভারতে স্থানটির উল্লেখ আছে। হিন্দু যুগের বহু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখানে পাওয়া গেছে।

পিটক—পারিভাষিক অর্থে 'পরিয়ত্তি ভাজন'-অর্থাৎ পালি ত্রিপিটক। সমগ্র বৌদ্ধ শাস্ত্র পিটক ও অনুপিটক দুই ভাগে বিভক্ত।

পিতামহ—ব্রহ্মা।

পিতৃগণ—দ্রঃ পিতৃদেব।

পিতৃদেব—পিতৃগণ। হিরণ্যগর্ভ মনুর মরীচি ইত্যাদি সন্তান হয়; এঁরা সপ্তর্ষি। সপ্তষিরা পিতৃগণদের জন্ম দেন। অন্য মতে বিরাট পুরুষ বা ব্রহ্মা পিতৃগণের জন্ম দিয়ে ছিলেন। ব্রহ্মা প্রথমে সাত রকমের/শ্রেণীর পিতৃগণ সৃষ্টি করেন :-অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ (দ্র.) ও সোমপা এই তিন শ্রেণীর পিতৃগণ দেহধারী; যম, অনল, সোম ও অর্যমা বাকি চারটি শ্রেণী; এঁরা তেজময় দেহ। অন্য মতে পিতৃদেব সাতজন :-বৈরাজ, অগ্নিষ্বাত্ত, গার্হপত্য, সোমপ, একশৃঙ্গ, চতুর্বেদ ও কাল। অন্যমতে এঁদের নাম সোমসদ, অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ সোমপা, হবির্ভুক, আজ্যপা, সুকালিক। দ্রঃ নন্দীমুখ। মরীচি পুত্র অগ্নিষ্বাত্তরা যজ্ঞ করেন না এঁরা দেবতাদের পিতৃগণ; বর্হিষদরা যজ্ঞ করেন; অত্রি বর্হির্ষদগণকে জন্ম দেন; এই বর্হিষদরা দৈত্যদানব যক্ষ গন্ধর্ব রাক্ষস কিন্নর উরগ সুপর্ণ ও মানুষ ইত্যাদির পূর্বপুরুষ। বিরাট পুরুষ সোমসদগণকে সৃষ্টি করেন; এঁরা সাধ্যদের পিতৃগণ। সোম-পারা ভৃগুর সৃষ্টি, ব্রাহ্মণদের পিতৃপুরুষ, অঙ্গিরস সৃষ্টি করেন হবির্ভুকদের; এঁরা ক্ষত্রিয়দের পূর্ব পুরুষ। পুলস্ত্য সৃষ্টি করেন আজ্যপা পিতৃদের, এঁরা বৈশ্যদের পিতৃ-পুরুষ। বশিষ্ঠ সৃষ্টি করেন সুকালিকদের; এঁরা শূদ্রদের পিতৃপুরুষ। সপ্তর্ষিদের সন্তান পিতৃগণ; পিতৃগণের সন্তান দেবাসুর এবং দেবাসুরদের সন্তান সমস্ত জীব। মনো হিরণ্যগর্ভস্য যে মরীচ্যাদয়ঃ সুতাঃ তেষাম্ ঋষিণাম সর্বেষাম্ পুত্রাঃ পিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ। দ্রঃ অর্চিষ্মৎ। পিতৃদের মিলিত স্ত্রী স্বধা (দ্রঃ)।

পিতৃতীর্থ—আগে এটি কুম্ভীপাক নরক ছিল। পাপীদের এখানে শাস্তি হত। দুর্বাসা এক বার যমলোকে আসেন এবং কুম্ভীপাক নরক থেকে পাপীদের আর্তনাদ শুনে যমের অনুমতি নিয়ে কুম্ভীপাক নরক দেখতে যান। এর পর থেকে এই নরক স্বর্গে পরিণত হয়। পাপীরা এখানে সুখে বাস করতে থাকেন। যম আশ্চর্য হয়ে যান, সব দেবতারা দেখতে এসে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। বিষ্ণু মহাদেবকে খবর দিলে

মহদেব বলেন ভস্মমাখা দুর্বাসার দেহ থেকে নিশ্চয়ই এই ভস্ম/বিভূতি খসে পড়েছিল যার জন্যে এই পরিবর্তন এসেছে। কুম্ভীপাক তীর্থে পরিণত হয়েছে। মহাদেব ওখানে শিবলিঙ্গ ও পার্বতী বিগ্রহ স্থাপন করতে বলেন।

পিতৃপুরুষ—(১) মৃত পিতৃপুরুষ ; এদের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দিনে পিণ্ড দেওয়া হয়। (২) দশ জন প্রজাপতি : এঁরা পৃথিবীর সমস্ত জীব ও মানুষের জন্মদাতা।

পিতৃলোক—সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন অনুসারে ওই পিতৃলোকে পিতৃপুরুষরা, ঋষিরা ও প্রজাপতিরা বাস করেন।

পিনাক—একটি লাঠি মত। দু মাথা বেঁধে নিয়ে ধনুক করা যেত। অন্য মতে ইন্দ্র-ধনু মত রঙ একটি সাপ ; সাতটি মাথা ; তীব্র বিষ দাঁত। লাঠি বা সাপ যাই হক মহাদেব যুদ্ধাস্ত্র এবং বাদ্য যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। একটি মতে এটি ত্রিশূল। এই ত্রিশূলটি হাত থেকে মাটিতে পড়ে বেঁকে যায় ; ধনুকে পরিণত হয়।

পিনাকী—এক জন রুদ্র। মহাদেবের এক নাম।

পিপ্পলাদ—এক জন ব্রহ্মচারী ঋষি। এঁর শিষ্য সুকেশ, শৈব্য, সত্যকাম (কশ্যপ), কৌশল্য, ভার্গব ও কবন্ধী ; এঁর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করেন। আর এক শিষ্য গার্গ্য। যাজ্ঞবল্ক্যের বোন কংসারী। যাজ্ঞবল্ক্যের বীর্যসিক্ত কাপড় পরে কংসারী স্নান করতে গেলে ওই বীর্য জলে গুলে গিয়ে গর্ভে প্রবেশ করে। ফলে কংসারী গর্ভবতী হন ও একটি সন্তান হয়। কিন্তু অপবাদের ভয়ে একটি পিপ্পল গাছের মূলে সন্তানকে ত্যাগ করেন। ফলে নাম পিপ্পলাদ। দ্রঃ সুবর্চা। অন্য মতে প্রচুর পিপ্পলী খেতেন বলে এই নাম। পদ্মপুরাণে আছে কুরুক্ষেত্রে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দম্পতীর এক ছেলে হয় সুকর্মা। বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করতেন। পিতা কুণ্ডল ছেলেকে বেদ ইত্যাদি অধ্যয়ন করান। এই সময়ে কশ্যপ গোত্রে পিপ্পলাদ নামে এক জন ব্রাহ্মণ জন্মান। এই পিপ্পলাদ ইন্দ্রিয় সংযম করে দশারণ্যে কঠোর তপস্যা করেন। এঁর তপস্যায় বনের পশুরা পর্যন্ত স্বাভাবিক হিংসা ভুলে গিয়েছিল। তিন হাজার বছর এই ভাবে তপস্যা করলে ব্রহ্মা এঁকে সর্বকাম সিদ্ধি বর দেন। পিপ্পলাদ সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। পরে পিপ্পলাদ উদ্ধত হয়ে পড়েন। এক দিন নদী তীরে বসে ছিলেন এই সময় একটি রাজ হাস এসে বলেন তপস্যার গর্ব করা বৃথা ; কোন শিক্ষা দীক্ষা না থাকলে এই অবস্থা হয়। কুণ্ডলের ছেলে সুকর্মা দান-ধ্যান যজ্ঞ বা তীর্থ যাত্রা কিছুই করেন নি। কিন্তু তবু মহাজ্ঞানী, সমস্ত শাস্ত্রবিৎ ও পিতা মাতার সেবাপরায়ণ। পিপ্পলাদ বুঝতে পারেন হংস স্বয়ং ব্রহ্মা ; এবং সুকর্মার কাছে গিয়ে উপদেশ লাভ করেন।

পিশাচ—(১) কুবের অনুচর এক জন যক্ষপতি। (২) এক জন রাক্ষস। রাবণের পক্ষে লঙ্কায় যুদ্ধ করেছিলেন। (৩) ভূত পিশাচ ইত্যাদি। বেদ অনুসারে রাক্ষসদের নীচে এদের স্থান। অত্যন্ত ঘৃণিত প্রাণী। ব্রাহ্মণ ও মহাভারত মতে ব্রহ্মা এঁদের অসুর ও রাক্ষসদের সঙ্গেই সৃষ্টি করেছিলেন। যে জলবিন্দু থেকে দেবতা মানুষ ও গন্ধর্ব সৃষ্টি হয়েছিল সেই জলবিন্দুর কয়েকটি ফোঁটা অন্য জায়গায় পড়লে এই পিশাচ ও রাক্ষস সৃষ্টি হয়। মনুর মতে এরা প্রজাপতি থেকে উদ্ভূত। পুরাণে কশ্যপ ক্রোধ-বসার সন্তান। ব্রহ্মার ও কুবেরের সভাতে ও আছেন। পার্বতী পরমেশ্বরের এরা

ভক্ত। এদের কাজ মানুষকে বিপদগামী করা। মৃতদেহ খায় ও শ্মশানে থাকে। একটি মতে দেবতা, যক্ষ ও রাক্ষস থেকে নীচে এবং অশুচি ও মরুদেশবাসী, (৪) অতীত ভারতে 'পিশাচ'-দেশের লোক ; মহাভারতে দু পক্ষেই যুদ্ধ করেছিলেন।

পীঠস্থান—(১) যে আসনে বসে কোন মহাপুরুষ সিদ্ধি লাভ করেন। (২) মধ্যযুগে তন্ত্রগুলিতে শাক্ত ও শৈব কতকগুলি তীর্থকেও পীঠস্থান বলা হয়। পীঠস্থানের সংখ্যা ও নামের তালিকা নানা গ্রন্থে নানা রকম। কিছু পীঠ স্থান পৌরাণিক এবং সতীর (দ্রঃ) দেহ ত্যাগের পর তাঁর খণ্ডিত দেহ ছড়িয়ে দেবার কাহিনী পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সতীর অঙ্গ যেখানে পড়েছে সেখানে দেবী ও তাঁর ভৈরবের একটি কেন্দ্র/ পীঠস্থান গড়ে উঠেছে। মহাদেব পূর্বদিকে যত দূর গিয়েছিলেন তত দূর পর্যন্ত স্থান যাজ্ঞিক ভূমি বলে কথিত। ভগের অন্ধত্ব ও পূষার দন্তহীনতার প্রাচীন কাহিনী পরে শিবের দ্বারা দক্ষযজ্ঞের ধ্বংসের গল্পে আত্ম প্রকাশ করেছে। মহাভারতে যোনিকুণ্ড ও স্তনকুণ্ডের উল্লেখ আছে। সতীর পতিত অঙ্গ অনুসারে এই নাম। কিন্তু তীর্থগুলি কোথায় বোঝা যায় না।

আদি মধ্যযুগে চারটি পীঠস্থানের নাম পওয়া যায় :-জলন্ধর, উড্ডিয়ান, পূর্ণগিরি ও কামরূপ। আর এক মতে উড্ডিয়ান, পূর্ণগিরি, কামরূপ ও শ্রীহট্ট। আইন-ই-আকবরী অনুসারে কাশ্মীরে শারদা, বিজাপুরে তুলজাভবানী, কামরূপে কামাখ্যা, এবং পাঞ্জাবে জালন্ধরী। কালিকা পুরাণে ৭টিঃ-(১) কামরূপে কামগিরিতে যোনিদেশ, দেবী কামাখ্যা ; (২) উড্ডিয়ানে উরুদ্বয়, দেবী কাত্যায়নী ; (৩) দেবীকূটে চরণ দ্বয়, দেবী মহামায়া ; (৪) জলন্ধরে স্তনদ্বয় দেবী চণ্ডী : (৫) পূর্ণগিরিতে স্কন্ধদ্বয় ও কণ্ঠ দেবী পূর্ণেশ্বরী ইত্যাদি। উত্তর মধ্য-যুগে পীঠের তালিকার বিবরণ অন্য রকম। রুদ্র যামল তন্ত্রে ১৮-টি পীঠের এবং ১০টি প্রধান পীঠের দুটি তালিকা আছে। কুব্জিকা তন্ত্রে ৪২-টি, জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে ৫০-টি, তন্ত্রসারে ৫১-টিপীঠের নাম পাওয়া যায়। আবার কিছু কিছু গ্রন্থে ১০৮-টি পীঠ স্থানের ও উল্লেখ আছে। কিছু উপপীঠ ও রয়েছে। বর্তমানের ৫১-পীঠের অনেক গুলিই বাঙ্গলা দেশের ছোট ছোট তীর্থস্থান মাত্র। আদি মধ্যযুগে এগুলির কোন উল্লেখ ছিল না।

একশত আটটি পীঠস্থান হিসাবে নাম পাওয়া যায় বারাণসী (দেবী বিশালাক্ষী), নৈমিষারণ্য (লিঙ্গধারিণী), প্রয়াগ (কুমুদা), গন্ধমাদন (কামুকী), মানস/ দক্ষিণ কৈলাস (কুমুদা), মানস/উত্তর কৈলাস (কুমুদা), গোমন্ত (গোতমী), মন্দর (কামচারিণী), চৈত্ররথ (মদোৎকটা), হস্তিনাপুর (জয়ন্তী)।

কান্যকুব্জ (গৌরী), মলয়াচল (রম্ভা) ; একাম্রপীঠ (কীর্তিমতী), বিশ্ব (বিশ্বেশ্বরী), পুষ্কর (পুরুহূতা), কেদার (সন্মার্গদায়িণী), হিমবৎ পৃষ্ঠ (মন্দা), গোকর্ণ (ভদ্রকর্ণিকা) স্থাণ্বীশ্বর (ভবানী), বিল্বক (বিল্বপত্রিকা)।

শ্রীশৈল (মাধবী), ভদ্রেশ্বর (ভদ্রা), বরাহশৈল (জয়া), কমলালয় (কমলা), রুদ্রকোঠি (রুদ্রাণী), কালঞ্জর (কালী), শালগ্রাম (মহাদেবী), শিবলিঙ্গ (জলপ্রিয়া), মহালিঙ্গ (কপিলা), মাকোট (মুকুটেশ্বরী)।

মায়াপুরী (কুমারী), সন্তান (ললিতাম্বিকা), গয়া (মঙ্গলা), পুরুষোত্তম (বিমলা),

সহ্যাদ্রাক্ষ (উৎপলাক্ষী), হিরণ্যাক্ষ (মহোৎপলা) বিপাশা (অমোঘাক্ষী), পুণ্ড্রবর্দ্ধন (পাটলা), সুপার্শ্ব (নারায়ণী), ত্রিকূট (রুদ্রসুন্দরী)।

বিপুল (বিপুলা), মলয়াচল (কল্যাণী), সহ্যাদ্রি (একবীরা), হরিশচন্দ্র (চন্দ্রিকা), রামতীর্থ (রমণা), যমুনাতীর্থ (মৃগাবতী), বিকোটতীর্থ (কোটি), মাধববন (সুগন্ধা), গোদাবরী তীর্থ (ত্রিসন্ধি), গঙ্গাদ্বার (রতিপ্রিয়া)।

শিবকুণ্ড (শুভানন্দা), দেবিকাতট (নন্দিনী), দ্বারাবতী (রুক্মিণী), বৃন্দাবন (রাধা), মথুরা (দেবকী), পাতাল (পরমেশ্বরী), চিত্রকূট (সীতা), বিন্ধ্য (বিন্ধ্যবাসিনী), করবীর (মহালক্ষ্মী), বিনায়ক (উমা)।

বৈদ্যনাথ (আরোগ্যা), মহাকাল (মহেশ্বরী), উষ্ণতীর্থ (অভয়া), বিন্ধ্যপর্বত (নিতম্বা), মাণ্ডব্য (মাণ্ডবী), মহেশ্বরীপুর (স্বাহা), ছগলাণ্ড (প্রচণ্ডা), অমরকণ্টক (চণ্ডিকা) সোমেশ্বর (বরারোহা), প্রভাস (পুষ্করাবতী)।

সরস্বতী (দেবমাতা), মহালয় (মহাভাগা), পয়োষ্ণী (পিঙ্গলেশ্বরী), কৃতশৌচ (সিংহিকা), কার্ত্তিকা (অতিশঙ্করী), বরট্টক (উৎপলা), শোণসঙ্গম (সুভদ্রা), সিদ্ধবান (লক্ষ্মী), ভরতাশ্রম (অনঙ্গা), জলন্ধর (বিশ্বমুখী)।

কিষ্কিন্ধ্যা (তারা), দেবদারুবন (পুষ্টি), কাশ্মীর-মণ্ডল (মেধা), হিমাদ্রি (ভীমা), কপালমোচন (সুধা), কায়াবরোহণ (মাতা), শঙ্খোদ্ধার (ধারা), পিণ্ডারক (ধৃতি), চন্দ্রভাগ (কলা), অচ্ছোদ (শিবধারিণী)।

বেণ (অমৃতা), বদরিকা (উর্বশী), উত্তরকুরু (ঔষধি), কুশদ্বীপ (কুশোভা), হেমকূট (মন্মথা), কুমুদ (সত্যবাদিনী), অশ্বত্থ (বন্দনীয়া), বৈশ্রবণালয় (নিধি), বেদপতন (গায়ত্রী), শিবসন্নিধি (পার্বতী)।

দেবলোক (ইন্দ্রাণী), ব্রহ্মলোক (সরস্বতী), সূর্যবিম্ব (প্রভা), মাতৃলোক (বৈষ্ণবী), সতীতীর্থ (অরুন্ধতী), রামতীর্থ (তিলোত্তমা), চিত্ত (ব্রহ্মকলা), জীবশরীর (শক্তি)।

পীতাব্ধি—অগস্ত্য। কালকেয় (দ্রঃ) অসুরকে নিধন করার জন্য অগস্ত্য সমুদ্র পান করেছিলেন। ফলে এই নাম।

পীবরী—ব্যাসের পুত্রবধূ; শুকের স্ত্রী, ছেলে কৃষ্ণ, গৌরপ্রভা ভূরি, দেবশ্রুত, ও একটি মেয়ে কীর্তি।

পুণ্যশ্রবস—এক জন বৈষ্ণব মহর্ষি। নন্দের এক ভাইয়ের মেয়ে লবঙ্গা হয়ে জন্মান।

পুণ্যকৃত—এক জন বিশ্বদেব।

পুণ্যজন—এক জন রাক্ষস। কুশস্থলীর রাজা রৈবত ব্রহ্মার সঙ্গে দেখা করতে গেলে এই সুযোগে রাক্ষস কুশস্থলী অধিকার করেন। রৈবতের এক শত ভাই রাক্ষসের ভয়ে পালিয়ে যান।

পুঞ্জিকাস্থলা—এক জন অপ্সরা, অন্য নাম অঞ্জনা। পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট অপ্সরাদের অন্যতমা। ইন্দ্রের নির্দেশে মার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যা নষ্ট করতে যান কিন্তু বিফল হন। এক দিন ব্রহ্মার কাছে যাচ্ছিলেন পথে রাবণ এঁকে বিবসনা করেন। ব্রহ্মাকে অপ্সরা এ কথা জানালে ব্রহ্মা শাপ দেন কোন স্ত্রীলোকের ওপর বল প্রয়োগ করলে রাবণের মাথা চূর্ণ হবে। বৃহস্পতির এক বার পরিচারিকা ছিলেন। এক দিন ফুল তুলছিলেন

এমন সময় কিছু ছেলে মেয়ে সেখানে এসে বিহার করতে থাকে। এদের দেখতে দেখতে পুঞ্জিকাস্থলাও কামার্ত হয়ে পড়েন এবং নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে আশ্রমে ফিরে এসে কাম চরিতার্থ করবার জন্য বৃহস্পতির হাত ধরে অনুরোধ করেন অন্য মতে চুম্বন করতে থাকেন। বৃহস্পতি এতে ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন বানরী হয়ে জন্মাতে হবে। পুঞ্জিকাস্থলা তখন কাতর হয়ে অনুনয় বিনয় করলে বৃহস্পতি বলেন নিজের পছন্দ মত প্রণয়ীর সঙ্গে জীবন কাটাতে পারবে; এবং শিবের অংশে সন্তান হলে মুক্তি পাবে। পুঞ্জিকাস্থলা এর পর অঞ্জনা বানরীতে পরিণত হয়ে কেশরী (দ্রঃ) বানরের স্ত্রী হন। বহু বছর এই ভাবে কেটে যায়, কোন সন্তান হয় না।

পুণ্ডরীক—(১) রামের বংশে নিষধের ছেলে এবং ক্ষেমধন্বার পিতা। (২) এক জন ব্রাহ্মণ; নারদের সঙ্গে পাপপুণ্যের আলোচনা করেন। (৩) একটি দিক হস্তী। (৪) একটি যজ্ঞ। (৫) একটি তীর্থ।

পুণ্ডরীয়ক—এক জন বিশ্বদেব।

পুণ্ড্র—(১) বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র; দ্রঃ দীর্ঘতমা। (২) মালদার কিছু অংশ, কোশী নদীর পূর্ব তীরের কিছুটা এবং দিনাজপুরের কিছু স্থান মিলে। রাজা পাণ্ডু এই দেশ জয় করেছিলেন। পৌণ্ড্র বাসুদেব এখানকার রাজা ছিলেন। দ্রঃ পৌণ্ড্র।

পুৎ—নিঃসন্তান মানুষেরা যে নরকে যায়। পুৎ-নরক থেকে যে উদ্ধার করে তার নাম পুত্র।

পুনর্বসু—অত্রি ও চন্দ্রভাগার ছেলে। কশ্যপ, বশিষ্ঠ, অত্রি ও ভৃগুকে ইন্দ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন। অত্রির অসমাপ্ত আয়ুর্বেদ গ্রন্থ পুনর্বসু সম্পূর্ণ করেন। অত্রি ও ভরদ্বাজের কাছে পুনর্বসু আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেছিলেন।

পুনা—প্রাগৈতিহাসিক যুগে অঞ্চলটি দণ্ডকারণ্যের অংশ হিসাবে ছিল। বেদশগুহার শিলালিপি থেকে জানা যায় এখানে এক দিন বৌদ্ধধর্ম প্রধান হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ যুগীয় গুহা কার্লা, ভাজা ও বেদশা এইখানে। জুন্নার গুহার শিলালিপিও উল্লেখযোগ্য কিছু মতে পুনা সহরটি প্রাচীন যুগের পুণ্যপুর; মূলা ও মুথা নদীর সঙ্গমে অবস্থিত।

পুদ্গল—দ্রঃ বৌদ্ধধর্ম।

পুরঞ্জন—কয়েকটি যজ্ঞ ধেনু হত্যা করার পর তীর্থ যাত্রায় বার হন। ঘুরতে ঘুরতে বহু দিন পরে হিমালয়ে আসেন। বনে উদ্যান সমন্বিত একটি প্রাসাদ দেখতে পান। এই প্রাসাদে সখীদের নিয়ে গন্ধর্বকন্যা পুরঞ্জনী বাস করতেন। দরজায় পাহারা ছিল পঞ্চ-ফণা সাপ প্রজাগিরি। গন্ধর্বকন্যা প্রথম দর্শনেতেই প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন এবং বিয়ে করেন। এক শত বছর সুখে জীবন কাটান। এক দিন রাজা পুরঞ্জন মৃগয়াতে যান কিন্তু এইটুকু সময়ের জন্যও বিরহ সহ্য করতে না পেরে দ্রুত ফিরে আসেন। পুরঞ্জনীও এ দিকে বিরহে কাতর হয়ে মাটিতে পড়েছিলেন। রাজাকে অভ্যর্থনা করতেও উঠে আসতে পারেন না। এই ভাবে সুখে জীবন কাটতে থাকে।

কালের মেয়ে কালকন্যকা; এই মেয়ে একটা কুৎসিত জীবন যাপন করতেন। বিয়ের চেষ্টা করেন কিন্তু কেউ রাজি হয় না। পূরুকে কিছু দিনের জন্য বিয়ে করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পূরু এঁকে বিতাড়িত করেন। মেয়েটি তখন যবন রাজ ভয়ের

কাছে যান। এই ভয়ের ভাই প্রজ্বর। ভয় বিয়ে করতে চান না এবং ফিরিয়ে দিয়ে বর দেন কালকন্যকা যাকে পছন্দ করবেন তাকে গোপনে ভোগ করতে পারবেন। কিছু দিন এই ভাবে বনে বনে ঘুরে বেড়াবার পর আবার ভয়ের কাছে ফিরে যান। এর পর ভয় ও প্রজ্বর দুজনে মিলে পুরঞ্জয়কে আক্রমণ করে পরাজিত করে বন্দী করেন। পথে এক জায়গায় একপাল বন্য গরুর আক্রমণে পুরঞ্জন মারা যান। পর জন্মে বিদর্ভরাজ কন্যা হয়ে জন্মান এবং পাণ্ড্য রাজ মাল্যধ্বজের সঙ্গে বিয়ে হয়। মাল্যধ্বজের মেয়ে অগস্ত্যের স্ত্রী (ভাগবৎ)।

পুরঞ্জয়—অন্য নাম ইন্দ্রবাহু ও ককুৎস্থ।

পুরশ্চরণ—তান্ত্রিক অনুষ্ঠান। উপাস্য মন্ত্রকে শক্তিশালী করার প্রক্রিয়া। অনুষ্ঠানে ৫-টি অঙ্গ :- মন্ত্রজপ, মন্ত্রদ্বারা হোম, মন্ত্রদ্বারা তর্পণ, মন্ত্রদ্বারা অভিষেক ও ব্রাহ্মণ ভোজন। জপের দ্বারাই স্থল বিশেষে পুরশ্চরণ সম্পন্ন হয়। শুক্লপক্ষে শুভ দিনে পুরশ্চরণ আরম্ভ করা হয়। সমাপ্তি পর্যন্ত প্রতি দিন সকাল থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত জপ করতে হয়। চন্দ্রসূর্য গ্রহণের সময় পুরশ্চরণ বিশেষ প্রশস্ত।

পুরাণ—প্রাচীন আখ্যায়িকা সম্বলিত গ্রন্থ। অথর্ব বেদে, শতপথ ও গোপথ ব্রাহ্মণে তৈত্তিরীয়, আরণ্যক, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, আপস্তম্ভ ও গৌতমধর্মসূত্রে, মহাভারত ও মনুতে পুরাণ সম্বন্ধে কিছু প্রসঙ্গ রয়েছে। বৈদিক সাহিত্য অনুসারে পুরাণ ও ইতিহাস এক জিনিস। বেদোত্তর যুগের ইতিহাস, আখ্যায়িকা, উপকথা, ধর্মীয় আলোচনা, ইত্যাদি বহু জিনিস মিলিয়ে এই মিশ্র গ্রন্থ পুরাণ। ছান্দোগ্য মতে পুরাণ পঞ্চম বেদ। স্মৃতি মতে পুরাণ বেদের টীকা। সমস্ত পুরাণেই ত্রিমূর্তিকে শ্রদ্ধা করা হয়েছে। বর্তমানে মুখ্য পুরাণগুলিকে মহাপুরাণ-সংখ্যায় ১৮ এবং অপ্রধানগুলিকে উপপুরাণ বলা হয়। উপপুরাণ বহু। বর্তমানে প্রাপ্ত পুরাণ সংখ্যা অনেক। অবশ্য মহাভারতের সমান পর্যায়ে কোন পুরাণই পড়ে না। এই মহাভারত ও পুরাণের পাতায় ভারতীয় জীবনের প্রতিটি দিকের চিন্তাধারা ফুটে রয়েছে। সব পুরাণই শ্লোকে রচিত। বাণ (খৃ ৭-শতক) পুরাণের উল্লেখ করেছেন।

সমুদায় পুরাণই বেদব্যাসের রচনা বলা হয়। সবগুলির নামই জয় এবং এদের প্রবক্তা লোমহর্ষণের ছেলে উগ্রশ্রবা। নৈমিষারণ্যে এদের প্রচার হয়। দ্রঃ মহাভারত। বেদে সব সময়ই পুরাণবিৎ হবার নির্দেশ রয়েছে। অবশ্য বৈদিক ধর্ম ও পুরাণ প্রচারিত ধর্ম অতি পৃথক। যজ্ঞের জটিলতা এবং ইন্দ্র, মরুৎ ও অগ্নির উপাসনা পুরাণে প্রায় নাই। পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদির পূজা, মন্দির ও প্রতিমা নির্মাণ, তীর্থমাহাত্ম্য, অন্য ধরণের পূজা উপকরণ ও বিধি এবং অবৈদিক মন্ত্রও স্তব দেখা যায়। পুরাণ যেন সাময়িক লোকাচার আশ্রয়ী। অমরকোষ ও অন্যান্য গ্রন্থ মতে পুরাণের পাঁচটি ভাগ/লক্ষণ থাকা দরকার। লক্ষণগুলি-(১) সর্গ (সৃষ্টি) ; (২) প্রতিসর্গ (প্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি) ; (৩) বংশ (দেবতা ও ঋষিদের) ; (৪) মন্বন্তর (১৪ জন মনুর শাসন বিবরণ) ; (৫) বংশানুরচিত (রাজগণের বংশাবলী ও কীর্তি ; সব পুরাণে অবশ্য এ ভাগ নাই)। মৎস্যপুরাণে এই পঞ্চ লক্ষণের সঙ্গে আরো ছয়টি বিষয়ের উল্লেখ আছে। ভাগবত ইত্যাদি মতে পুরাণের লক্ষণ ১০-টি :- সর্গ, বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, অন্তর, বংশ, বংশানুচরিত, সংস্থা, হেতু, অপাশ্রয়।

পুরাণগুলিকে অনেকে রাজস, সাত্ত্বিক, তামস, ও সংকীর্ণ চারটি ভাগে ভাগ করেন। রাজসে ব্রহ্মা, সাত্ত্বিকে বিষ্ণু, তামসে শিব এবং সঙ্কীর্ণে পিতৃগণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। বর্তমানে পুরাণগুলিকে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। উপপুরাণেও তিনটি ভাগ শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব। সৌর, গাণপত্য ও সঙ্কীর্ণ ইত্যাদি কয়েকটি শ্রেণীরও উপপুরাণ রয়েছে।

জৈন মতে ২৪-জন তীর্থঙ্কর নিয়ে ২৪-টি পুরাণ। এগুলির মধ্যে আদি, অরিষ্টনেমি, উত্তর ও পদ্মপুরাণ প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধেরা নয়খানি পুরাণ স্বীকার করেন এবং এদের নবধর্ম নামে অভিহিত করেন। ললিতবিস্তরও এই মতে একটি বৌদ্ধপুরাণ।

ক্ষত্রিয় পিতার ও ব্রাহ্মণ মাতার সন্তান স্তুতিপাঠক সূতগণ ছিলেন প্রথম যুগে পুরাণের প্রবক্তা যেন। স্মৃতি ও তন্ত্রের প্রাধান্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ এই পুরাণে যা খুসি যোগ করতে থাকেন। এঁরা কেউ ঐতিহাসিক ছিলেন না। ফলে অপটু হাতে ঐতিহাসিক ঘটনা বিকৃত হয়ে অদ্ভুত একটা রূপ পুরাণে ফুটে উঠেছে। যে নিষ্ঠা ও ক্ষুরধার তর্কবুদ্ধি হিন্দুদর্শন গড়ে তুলেছিলেন সেই নিষ্ঠা ও সতর্ক সাবধানতার অভাব পুরাণে প্রতি ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে। শক, যবন, তুসর, হূণ, গর্দভিল, আভীর প্রভৃতি কযেকটি বৈদেশিক জাতির বর্ণনাও রয়েছে।

পুরাণে আছে স্থাবর, জঙ্গম, দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, মনুষ্যাদির বৃত্তান্ত ; সৃষ্টির বিবরণ, ব্রহ্মার তত্ত্ব, অনন্ত তত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পূর্বতন রাজন্যবর্গের বংশ, নৃত্য-গীত, ব্যাকরণ, পশুচিকিৎসা, প্রতিমা নির্মাণ, রত্ন বিচার ইত্যাদি ইত্যাদি। মহা-পুরাণ :-ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড। সত্ত্বগুণযুক্ত পুরাণ/বিষ্ণুপুরাণ :-বিষ্ণু, নারদ, ভাগবৎ, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ। তমোগুণ যুক্ত পুরাণ/শিবপুরাণ :-মৎস্য, কূর্ম, লিঙ্গ, শিব/বায়ু, স্কন্দ, অগ্নি। রজোগুণ যুক্ত পুরাণ/ব্রহ্মপুরাণ :-ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য ও বামন। পুরাণের এই সব নাম সম্বন্ধে অনেক মতভেদ রয়েছে।

পুরাণ অগ্নি—পুরাণগুলির অন্যতম। বিশ্বকোষ তুল্য। বহু মতে বাংলাতে বা বিহারে খৃ ৯-ম শতকে রচিত। বহু প্রকীর্ণ বিষয় এর অন্তর্গত। অশ্বহস্তী চিকিৎসা থেকে অলঙ্কার ব্যকরণ অভিধান সব কিছুই এতে রয়েছে। কোন কোন মতে এটি উপপুরাণ ; প্রকৃত মহাপুরাণ বহ্নিপুরাণ। বশিষ্ঠকে ব্রহ্মজ্ঞান শেখাবার জন্য অগ্নি-বশিষ্ঠ সংবাদরূপে রচিত। প্রধানত শিব মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। বিষ্ণুর দশ অবতার, লিঙ্গ, দুর্গা, গণেশ, সূর্য প্রভৃতির পূজা, রামায়ণ, মহাভারত, দীক্ষা, ধর্ম, নীতি, সন্ধ্যাবিধি, গায়ত্রী-অর্থ, তান্ত্রিক অনুষ্ঠান, প্রতিমা তৈরি ও প্রতিষ্ঠা, বিবাহ, প্রায়শ্চিত্তবিধি, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পদ্ধতি, শ্রাদ্ধবিধি, নরকবর্ণনা, জন্মান্তরবাদ, মৃত্যুতত্ত্ব, সৃষ্টি-তত্ত্ব, ভূগোল, তীর্থমাহাত্ম্য, বংশ পরিচয়, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ, শকুনিবিদ্যা, গৃহ-নির্মাণ, রাজনীতি, ধনুর্বিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, কায়ধর্মবিজ্ঞান, ব্যবহার বিধি, চিকিৎসা, পশু-চিকিৎসা, অলঙ্কার, ছন্দ, কাব্যতত্ত্ব, নাটকতত্ত্ব, শব্দানুশাসন, ভাস্কর্য ইত্যাদি নানা কিছু আছে। ১২ হাজার শ্লোক।

পুরাণ, উপ—বহু। যথা সনৎকুমার, নারসিংহ, নারদীয়, শিব, দুর্বাসা, কপিল, মানব, উশনস, বরুণ, কালিকা, শাম্ব, সৌর, আদিত্য, মহেশ্বর, দেবীভাগবত, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু-

ধর্মোত্তর, ও নীলমত ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুরাণ কালিকা—একটি উপপুরাণ। বাংলা ও কামরূপে স্মার্তগণের প্রামাণ্য গ্রন্থ। শারদীয়া দুর্গা পূজা এই মতে হয়।

পুরাণ কূর্ম—প্রাচীন পুরাণ। ব্রাহ্ম সংহিতা অংশ রয়েছে, বাকি অংশ লুপ্ত। বিষ্ণু কূর্ম রূপে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সমূহের মূল্য বর্ণনা করেছেন। ভৃগু বংশ চরিত, কাল-পরিমাণ, পার্বতীর সহস্র নাম, ব্যাস গীতা, ঈশ্বর গীতা, তীর্থ মাহাত্ম্য, বর্ণ বিচার, জাতি সংকরতা ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। ইন্দ্রদ্যুম্নের কাহিনী আছে। আট হাজার শ্লোক।

পুরাণ গরুড়—বৈষ্ণব পুরাণ। বিরাট গ্রন্থ। অসংখ্য প্রকীর্ণ বিষয় রয়েছে। বাস্তু-বিদ্যা, রত্নপরীক্ষা কিছুই বাদ যায় নি। গরুড়কল্পে বিনতার গর্ভে গরুড়ের উৎপত্তি বিষ্ণু সবিস্তারে বর্ণনা করছেন। সবটাই বিষ্ণু বলছেন গরুড় শুনছেন। পূর্ব খণ্ডে বিষ্ণুর হাজার নাম, বিবিধ পূজা বিধি, দীক্ষা, প্রায়শ্চিত্তবিধি, আয়ুর্বেদ। উত্তর খণ্ডে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, যমপুরীর বিষয়, শ্রাদ্ধবিধি, প্রেতত্বের কারণ, মৃত্যুর পূর্বাপর বিষয় প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যা এবং ব্যাকরণও আছে। আট হাজার শ্লোক।

পুরাণ দেবীভাগবৎ—একটি উপপুরাণ। ১২ স্কন্দ ১৮০০ শ্লোক। শাক্তেরা এটিকে ভাগবৎ ও মহাপুরাণ বলেন।

পুরাণ নারদ—শিব ও বিষ্ণু মাহাত্ম্য বর্ণনা। বৃহৎকল্পে পালিত কর্তব্যগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। বিষ্ণুর স্তব, বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব আচরণ গ্রন্থটির উপজীব্য। নারদ সনৎ-কুমারকে ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছেন। ২৫০০০ শ্লোক।

পুরাণ পদ্ম—বৈষ্ণব পুরাণ। এতে ৭-টি খণ্ড; শেষ খণ্ডটি ক্রিয়াযোগসাগর। ক্রিয়া-যোগসাগর নিজেই একটি উপপুরাণ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন সোনার পদ্মরূপে অবস্থিত ছিল সেই সময়ের বিবরণ। ফলে এই নাম। ৫-টি ভাগ :-সৃষ্টিখণ্ড, ভূমিখণ্ড, স্বর্গখণ্ড, পাতালখণ্ড ও উত্তরখণ্ড। এই পুরাণে প্রধান প্রধান বিষয় :-সৃষ্টির ক্রম, তারকাসুর বধ কাহিনী, বৃত্রবধ, পৃথুচরিত, বেণরাজা, নহুষ, যযাতি, রাবণ, দধীচি, গৌতম, জলন্ধর, সাগর ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, নৃসিংহ উৎপত্তি, গোমাহাত্ম্য, কাশী, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতি জম্বুদ্বীপ তীর্থগুলির মাহাত্ম্য, শিব, ভাগবত, গঙ্গা একাদশী ও ব্রত মাহাত্ম্য, কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থের ও জগন্নাথের বিবরণ, কর্মযোগ, অগস্ত্যাদি ঋষির আগমন, কৃষ্ণের নিত্যলীলা, মৎস্যাদি অবতার এই পুরাণে আলোচিত হয়েছে। কালিদাসের শকুন্তলা ও রঘুবংশের কাহিনীর সঙ্গে এর কাহিনীর মিল আছে। অর্থাৎ মনে হয় কালিদাসের পর রচনা। শ্লোক ৫৫০০০।

পুরাণ বরাহ—বৈষ্ণব পুরাণ; দু ভাগ; ২৪০০০ শ্লোক। প্রতিপাদ্য বিষ্ণু মাহাত্ম্য। মানবকল্প প্রসঙ্গে বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। পূর্বভাগে রৈভ্য চরিত, শ্রাদ্ধবিধি, গৌরীর উৎপত্তি, ব্রত নির্ণয়, মহিষাসুর বধের জন্য ত্রিশক্তি থেকে দেবীর জন্ম ও দেবী মাহাত্ম্য, প্রায়শ্চিত্ত ও কর্মবিপাক বর্ণিত হয়েছে। উত্তর ভাগে পুলস্ত্য-কুরুরাজ সংবাদ, সমস্ত তীর্থ মাহাত্ম্য এবং বহু ধর্ম-লক্ষণ ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। মথুরার বর্ণনা রয়েছে। বুদ্ধ দ্বাদশী ব্রতের বিবরণও পাওয়া যায়।

পুরাণ বামন—১০,০০০ শ্লোক রচিত। শিব, বিষ্ণু ও তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণনা। বামনের পূর্ববর্তী অবতারগুলির বিষয় নাই; পরবর্তী অবতারগুলি সব আছে। বামন হয়ে বলিকে ছলনা, দান-মাহাত্ম্য, দেব দানব যুদ্ধ, মহিষাসুর, দক্ষযজ্ঞ, মদনভস্ম, শিবের বিয়ে, কুমারের জন্ম এবং বহু তীর্থ বর্ণনা ইত্যাদি রয়েছে। হরপার্বতীর বিবাহ বিশদ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। বরাহ পুরাণের সঙ্গে বহু মিল।

পুরাণ বায়ু—আধুনিক মতে সবচেয়ে প্রাচীন। বায়ু কথিত। বাণভট্ট (খৃ ৭-ম শতক) এর উল্লেখ করেছেন। গুপ্ত রাজাদের (খৃ ৪-শতক) বহু উল্লেখ আছে। ফলে মনে হয় ৫-৬ খৃ শতকে লেখা। চারটি ভাগ। প্রথম ভাগে ব্রহ্মাণ্ড ও জীবের সৃষ্টি। দ্বিতীয় ভাগে কল্পাদি, ঋষিবংশাবলী, ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনা, মন্বন্তর ও শৈব আখ্যানাদি। তৃতীয় ভাগে জীবজন্তু ও চন্দ্রসূর্য-বংশের বিবরণ। চতুর্থ ভাগে যোগ শাস্ত্র, যোগী ও শিবের মাহাত্ম্য।

পুরাণ বিষ্ণু—পুরাণের পাচটি লক্ষণ পূর্ণভাবে বর্তমান। পঞ্চরাত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অর্চিত মূল গ্রন্থ। রামানুজ এর প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন। ছয়টি ভাগঃ- (১) বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর উৎপত্তি; ধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিত ইত্যাদি। (২) পৃথিবী, সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রের বিবরণ। (৩) ব্যাস কর্তৃক বেদ বিভাগ, শাখা বিভাগ, আশ্রম ধর্ম ইত্যাদি। (৪) সূর্য ও চন্দ্র বংশ ও অন্যান্য রাজ বংশ বর্ণনা। (৫) কৃষ্ণ চরিত, বৃন্দাবন লীলা, রাম লীলা ইত্যাদি। (৬) বিষ্ণু-ভক্তি, যোগ, মুক্তি। বরাহ কল্পের বিষয়গুলি ও দশ অবতার আলোচিত হয়েছে। পরাশর তাঁর শিষ্য মৈত্রেয়কে উপদেশ দেবার ছলে বর্ণনা। ব্যাস এর প্রণেতা; শিষ্য সূত-রোমহর্ষণকে এই পুরাণ দান করেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের উল্লেখ আছে; অর্থাৎ ১-ম বা ২য় খৃ শতকে। সবচেয়ে প্রাচীন পুরাণ, ২৩,০০০ শ্লোক;

পুরান বিষ্ণু ধর্মোত্তর—সবচেয়ে বড় উপপুরাণ। প্রথম খণ্ডে নানা বিষয়ের সঙ্গে কাশ্মীর ও গান্ধারের ভৌগলিক বিবরণ রয়েছে। তৃতীয় অংশে ব্যাকরণ, অলঙ্কার. ছন্দ, অভিধান, নৃত্যগীত, স্থাপত্য, প্রতিমা নির্মাণ ও চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে।

পুরাণ ব্রহ্ম—অপর নাম আদি পুরাণ। যে কোন পুরাণের তালিকায় এই নাম প্রথমে থাকে। ব্রহ্মা দক্ষকে উপদেশ দিচ্ছেন। তীর্থ মাহাত্ম্য সহ উড়িষ্যার মন্দিরগুলির বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ ১২-১৩ শতকে লেখা। আদিপুরাণ নাম অর্থহীন। সব প্রথমে রচিত হয়েছিল বলা হয়। প্রথমাংশে সৃষ্টি, দেবতা ও অসুরদের জন্ম এবং সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ। এর পর বিশ্বের বর্ণনা এবং দ্বীপ, বর্ষ, স্বর্গ, নরক ও পাতাল ইত্যাদির বিবরণ। এর পর শ্রীকৃষ্ণ জীবন এবং শেষ অংশে যোগ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা রয়েছে। উড়িষ্যা এবং সূর্যক্ষেত্র কোণরক সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ আছে। ২৫,০০০ শ্লোক।

পুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত—কৃষ্ণ লীলাত্মক। নারদ সাবর্ণিমনুকে উপদেশ দিচ্ছেন। রথন্তর কাহিনী নিয়ে লিখিত। ব্রহ্মা, প্রকৃতি, গণেশ ও কৃষ্ণ চারটি খণ্ড। প্রপঞ্চ হচ্ছে ব্রহ্মের বৈবর্ত। এই পুরাণে কৃষ্ণের লীলা ও স্তুতি বেশি। প্রসঙ্গ ক্রমে সাবিত্রী, সত্যবান, সুরভি, স্বাহা, স্বধা, সুরথ, কার্তবীর্য, পরশুরাম ইত্যাদি কাহিনীও রয়েছে। ১৮,০০০ শ্লোক।

পুরাণ ব্রহ্মাণ্ড—প্রাচীন পুরাণ। ব্রহ্মা কথিত। ব্রহ্মাণ্ডের মাহাত্ম্য অর্থাৎ বিশ্ব-জগতের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ ও অধ্যাত্ম রামায়ণেরও কিছু উল্লেখ আছে। চার পাদে বিভক্ত:-প্রক্রিয়াপাদ, অনুষঙ্গপাদ, উপোদ্‌ঘাত ও উপসংহারপাদ। সৃষ্টি, কল্প, যুগভেদ, মন্বন্তর, রাজবংশ, বর্ষ, ভারতবর্ষ ও দ্বীপাদি বর্ণিত হয়েছে। ১২০০০ শ্লোক।

পুরাণ ভবিষ্য—সূর্য মনুকে বর্ণনা করেছেন। সূর্য পূজা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ। শক দ্বীপ থেকে শাম্ব কর্তৃক মগব্রাহ্মণ আনয়নের কথা আছে। প্রতিসর্গ অংশে ১৮ শতকের ঘটনাও আছে। ভবিষ্যতে কি হবে তারই বহু আলোচনা। পুরাণের স্বীকৃত লক্ষণ এতে নাই। সৃষ্টি, চতুবর্ণের সংস্কার আশ্রমধর্ম ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। কৃষ্ণ, শাম্ব, বশিষ্ঠ, নারদ, ও ব্যাসের কথোপকথন ও সূর্যের মাহাত্ম্য রয়েছে। এই পুরাণে উপাস্য শিব। সূর্য, অগ্নি ও নাগের পূজা ও বহু তীর্থ কাহিনী ও পূজা পদ্ধতির বিষয় রয়েছে। ১৪,০০০ শ্লোক।

পুরাণ ভাগবৎ—অন্য নাম শ্রীমৎ ভাগবৎ। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। অত্যন্ত প্রিয় ও ব্যাপক প্রচলিত। শ্রীধর স্বামীর টীকা সমেত। স্কন্ধ ১২ শ্লোক ১৮,০০০। সাহিত্যিক মূল্যে সংস্কৃত সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ব্যাস রচিত। শুকদেব পিতার কাছে শুনে ছিলেন এবং ব্রহ্মশাপ গ্রস্ত পরিক্ষিতের প্রার্থনায় কীর্তন করেন। বৃত্রের পরাজয় ও মৃত্যু বিবরণ আছে। সৃষ্টিতত্ত্ব মায়াবাদ ইত্যা দি এবং ব্রহ্মার সৃষ্টি, বরাহ অবতার, কপিল অবতার, বেণ ধ্রুব, পৃথু, ভরত, প্রহ্লাদ ও কৃষ্ণ-চরিত আলোচিত হয়েছে। সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ, মথুরা, বৃন্দাবন লীলা যদু বংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণের মৃত্যু আছে। শেষ অংশে ভবিষ্য রাজাদের বিবরণ আলোচিত হয়েছে। বিষ্ণুর সমস্ত অবতার বর্ণিত হয়েছে। ১০ম স্কন্দ সবচেয় আকর্ষণীয়; কৃষ্ণের জীবনী এখানে বিষয়। খৃ-১১ শতকে বল্লালসেন এর উল্লেখ করেছেন। সব ভারতীয় ভাষাতেই অনূদিত।

পুরাণ মৎস্য—সুবৃহৎ প্রাচীন পুরাণ। অন্যান্য পুরাণের কিছু অনুক্রমণীও রয়েছে। মৎস্য অবতার স্বায়ম্ভুব মনুকে বলছেন। সৃষ্টি, রাজবংশ বর্ণনা, নর্মদা মাহাত্ম্য, ধর্ম-নীতি, মন্দির ও প্রতিমা নির্মাণ ইত্যাদি বিষয় উপজীব্য। জৈনধর্ম, বুদ্ধধর্ম ও অন্ধ্র রাজবংশের আলোচনাও আছে। ১৩০০০ শ্লোক।

পুরাণ মার্কণ্ডেয়—এই মহাপুরাণে বাসুদেবের প্রকৃতি সম্বন্ধে জৈমিনি জিজ্ঞাসা করছেন মার্কণ্ডেয়কে। মহর্ষি তাঁকে বিন্ধ্য পর্বতবাসী শকুন পক্ষীর কাছে যেতে বলেন। জৈমিনি যে সব উত্তর পেয়েছিলেন তাই নিয়ে এই পুরাণ। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের ঝগড়া, চণ্ডী, দুর্গাকথা, কৃষ্ণের বাল্যকাল, হরিশ্চন্দ্র, মদালসা, ইক্ষ্বাকু, রামচন্দ্র, পুরূরবা উপাখ্যান, রুদ্রাদি সৃষ্টি, মার্তণ্ডের জন্ম, কুবের বংশ এবং যোগধর্ম ইত্যাদি রয়েছে। ইন্দ্র, সূর্য, অগ্নি সম্বন্ধে বহু কাহিনী আছে। দেবী মাহাত্ম্য ও সপ্তশতী চণ্ডীও এরই অন্তর্গত। ৯,০০০ শ্লোক।

পুরাণ লিঙ্গ—শৈব পুরাণ। লিঙ্গ হিসাবে শিব উপদেশ দিচ্ছেন। মহেশ্বর অগ্নি-লিঙ্গ থেকে অগ্নিকল্পান্তকালে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বিষয়ে আলোচনা করছেন। দুটি ভাগ। লিঙ্গোৎপত্তি, লিঙ্গপূজা, দধীচি কাহিনী, যুগধর্ম, লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা, শিবব্রত,

প্রায়শ্চিত্ত, কাশীবর্ণনা, শিবের হাজার নাম, বরাহ, নৃসিংহ চরিত, দক্ষযজ্ঞ বিনাশ, মদন ভস্ম, পার্বতীর বিয়ে, শিবের নাচ, বিনায়ক-অম্বরীষ-উপমন্যু উপাখ্যান, শিব-মাহাত্ম্য ও পূজাবিধি, সূর্যপূজা, দান ও শ্রাদ্ধপ্রকরণ ইত্যাদি উপজীব্য। ২৮ রকমের বিভিন্ন শিবের উল্লেখ আছে। শ্লোক ১১,০০০।

পুরাণ শিব—বর্তমানে প্রচলিত। প্রাচীন নয়। নানা অবান্তর বিষয় এর মধ্যে এসেছে। ৬-টি সংহিতায় বিভক্ত। কুমার সম্ভব থেকেও কিছু শ্লোক এতে গৃহীত হয়েছে।

পুরাণ স্কন্দ—শৈব পুরাণ। তীর্থ মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ। ৭ম খণ্ডে ৮১,০০০ শ্লোক ছাপা হয়েছিল। মতান্তরে ৬-টি সংহিতায় বিভক্ত। সত্যনারায়ণ ব্রতও এতে রয়েছে। অতি আধুনিক পুরাণ। খণ্ডগুলি = মহেশ্বর, বৈষ্ণব, ব্রহ্ম, কাশী, অবন্তি নাগর ও প্রভাসখণ্ড। কাশীখণ্ডই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং এখানে কাশী মাহাত্ম্য বর্ণিত। তারকাসুর বধ রয়েছে; কুমার সম্ভবের সঙ্গে মিলে যায়। এই পুরাণে স্কন্দ (= ষড়ানন) তৎপুরুষকল্পের ঘটনা বর্ণনা করছেন। পার্বতী স্কন্দের কাছে, স্কন্দ নন্দীর কাছে এবং নন্দী অত্রিকুমারের কাছে এই বর্ণনা করেন।

পুরী—১৯°২৮-২০°৩৫´উ × ৮৪°২৯´-৮৬°২২´ পূর্ব। উড়িষ্যার একটি জেলা ও সহর। বঙ্গোপসাগরের কূলে অবস্থিত। উত্তর পশ্চিম অংশ পাহাড়ি। পুরী ভুবনেশ্বর ও কোণারক তিনটিই এই জেলাতে। অশোকের শিলালিপি, কোণারকে সূর্যমন্দির, পুরী ও ভুবনেশ্বরে হিন্দু স্থাপত্য, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে প্রাচীন জৈন গুহামন্দির এই জেলার ঐতিহ্য।

পুরু—(১) চন্দ্রবংশে যযাতির (দ্রঃ) ছেলে; মা শর্মিষ্ঠা। পুরুর বংশ পৌরব, ভাই যদুর বংশ যাদব। পৌরব বংশে দুই শাখা কৌরব ও পাণ্ডব। পুরুর স্ত্রী কৌশল্যা (= পৌষ্টি); ছেলে প্রবীর (= জন্মেঞ্জয়) ঈশ্বর, ও রৌদ্রাশ্ব (মহা ১।৮৯।৫)। মান্ধাতার কাছে পুরু একবার পরাজিত হয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের যুদ্ধ দেখতে এসেছিলেন। (২) চাক্ষুষ মনুর ছেলে। এই পুরুর স্ত্রী আগ্নেয়ী, ছেলে অঙ্গ, সুমনস্, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও শিবি। (৩) অর্জুনের সারথি।

পুরুকুৎস—মান্ধাতা ও স্ত্রী বিন্দুমতীর ছেলে পুরুকুৎস, মুচুকুন্দ ও অম্বরীষ। পুরুকুৎসের স্ত্রী নর্মদা, ছেলে ত্রসদস্যু রসাতলবাসী ৬০ কোটি গন্ধর্ব বিনাশ করে নাগকুল রক্ষা করেন। স্ত্রীকে নিয়ে কুরুক্ষেত্রে তপস্যা করতে যান। ঋক্‌বেদেও এক জন পুরুকুৎস পাওয়া যায়।

পুরুজিৎ—কুন্তীর ভাই। কুন্তিভোজের ছেলে। কুরুক্ষেত্রে মারা যান।

পুরুমিত্র—ধৃতরাষ্ট্রের এগার জন সাহসী ছেলের মধ্যে এক জন।

পুরুষ—দ্রঃ প্রকৃতি। পুরুষ চরম সত্য। অজ্ঞেয়, অনাদি, অনন্ত, অজর, অপ্রমেয় ইত্যাদি। এই পুরুষের তিনটি রূপ ব্যক্ত, অব্যক্ত ও সময়/কাল।

পুরুষোত্তম—পরম পুরুষ/বিষ্ণু।

পুরূরবা—চন্দ্রবংশে বিখ্যাত রাজা। বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে জন্ম। পুরুনামে পর্বতে জন্ম ফলে নাম পুরূরবা (মহা ৩।৮৮।১৯)। সুদর্শন বলশালী রাজা। এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। হিমাদ্রি শৃঙ্গে বাস করতেন। কেশী ইত্যাদি

দৈত্য এঁর পরিচর্যা করতেন। মিত্রাবরুণের (দ্রঃ) শাপে উর্বশী (দ্রঃ) পৃথিবীতে এসে জন্মে এঁর প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন এবং বিয়ে হয়। ঋক্‌বেদ থেকে আরম্ভ করে বহু গ্রন্থে এই কাহিনী রয়েছে। ঋক্‌বেদ অনুসারে ৪-বৎসর এক সঙ্গে থাকার পর উর্বশী চলে যান। পুরূরবার কাতর প্রার্থনা নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। গ্রন্থ অনুসারে এই কাহিনী বহুরূপ নিয়েছে। এক সময়ে ধর্ম অর্থ ও কাম ছদ্মবেশে রাজাকে পরীক্ষা করতে আসেন। সকলকে রাজা সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং ধর্মকে বিশেষ ভাবে আপ্যায়িত করেন। এতে বিরক্ত হয়ে অর্থ অভিশাপ দেন লোভে পুরূরবাকে দারিদ্র্যতা বরণ করতে হবে। কাম অভিশাপ দেন উর্বশীর বিরহ ভোগ করতে হবে। ধর্ম এই সব শুনে বর দেন দীর্ঘজীবী হবে; ধর্ম পথে থাকবে এবং যত দিন আকাশে চন্দ্র সূর্য থাকবে তত দিন পুরূরবার বংশে গৌরব উজ্জ্বল থাকবে। উর্বশীর জন্য কামার্ততা ৬০ বছর পর্যন্ত থাকবে এবং তার পর এক মন্বন্তর ধরে উর্বশী পুরূরবার সঙ্গে থাকবেন। পুরূরবা রোজ ইন্দ্রের কাছে যেতেন। এক দিন আকাশ পথে যেতে যেতে দেখেন কেশী দৈত্য উর্বশী ও চিত্রলেখাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। কেশীকে পরাজিত করে এদের দু জনকে মুক্ত করে ইন্দ্রকে ফিরিয়ে দেন। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে পুরূরবার সম্মানে লক্ষ্মীস্বয়ংবর নামে একটি অভিনয় করেন। উর্বশী লক্ষ্মী সাজেন এবং মেনকা ইত্যাদি নাটকে অংশ গ্রহণ করেন। নৃত্যরতা উর্বশী এই সময়ে পুরূরবাকে দেখে কামার্ত হয়ে পড়েন; তাঁর নাচে ছন্দ পতন হয়। নারদ/ব্রহ্মা এই দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন উর্বশী যা শিখেছে ভুলে যাবেন এবং পুরূরবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ষাট বছর বল্লরী হয়ে কাটাতে হবে। আর এক কাহিনীতে আছে মায়াধর অসুরকে নিহত করে ইন্দ্র উৎসব করছিলেন, রম্ভা নাচছিল; সামনে তুম্বুরু ছিলেন। নাচে তাল থাকছে না দেখে পুরূরবা উপহাস করে বলেন রম্ভা বা রম্ভার গুরু তুম্বুরু থেকেও ভাল নাচ উর্বশী কাছে তিনি শিখেছেন। ফলে তুম্বুরু বিরক্ত হয়ে শাপ দেন উর্বশীর থেকে বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এর পরই গন্ধর্বরা উর্বশীর (দ্রঃ) সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটায়।

পুরূরবা এক বার ব্রাহ্মণের অর্থ সম্পত্তি চুরি করেন। ব্রাহ্মণ সনৎকুমারকে সঙ্গে নিয়ে রাজার কাছে আসেন কিন্তু কোন ফল হয় না। ফলে ব্রাহ্মণের অভিশাপে রাজা শ্রীহীন হয়ে পড়তে থাকেন। পুরূরবা তখন স্বর্গ থেকে তিনটি অগ্নিকে নিয়ে এসে যজ্ঞ করেন ফলে আবার শ্রী-সমৃদ্ধি ফিরে পান। ইক্ষ্বাকু পুরূরবাকে একটি তরবারি দিয়েছিলেন। এই তরবারিটি রাজা বৃদ্ধ বয়সে আয়ুসকে দিয়ে যান। গো-দান করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। উর্বশী পুরূরবার ৬/৭/৮ ছেলে :-আয়ুস্, দৃঢ়ায়ুস্, বশ্যায়ুস্, দনায়ুস্, বৃতিমান, বসু, দিবিজাত, সুবাহু। ধীমান, শতায়ুস্, বনায়ুস্ ও অমাবসু সত্যায়ু নামও পাওয়া যায়। দ্রঃ উন্মদা।

পুরোচন—(১) দুর্যোধনের বিশ্বাসী মন্ত্রী। শিল্পকর্ম বিশারদ। দুর্যোধনের নির্দেশে বারণাবতে জতুগৃহ তৈরি করে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেন। কিন্তু পাণ্ডবরা নিজেরাই জতু-গৃহে আগুন দিয়ে পালিয়ে যান। পুরোচন এই বাড়িতেই ছিলেন, পুড়ে মারা যান। (২) বসু প্রাণ ও উর্জাস্বতীর ছেলে।

পুলক—এক জন দৈত্য। মহাদেবের তপস্যা করে গায়ে দিব্য গন্ধ লাভ করেন।

এই গন্ধের সাহায্যে অপ্সরাদের ভুলিয়ে নিয়ে আসতেন। ত্রিভুবনে ভীতির সঞ্চার করেন। দেবতারা শিবের কাছে অভিযোগ করলে মহাদেব পশু হয়ে জন্মাবার শাপ দেন। দৈত্য কিন্তু আবার বর চেয়ে নেন তার গায়ের গন্ধ যেন ঠিক থাকে।

পুলস্ত্য—ব্রহ্মার (দ্রঃ) কাণ থেকে জন্ম ; মানসপুত্র। এক জন প্রজাপতি ; ব্রহ্মর্ষি। ব্রহ্মার কাছে ব্রহ্ম পুরাণ পান এবং পরাশরকে শেখান। পরাশর এই পুরাণ সাধারণে প্রচার করেন। স্ত্রী প্রীতি, ছেলে দত্তোলি বা দম্ভোলি ; স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই দত্তোলি অগস্ত্য হয়ে জন্মান। আর এক স্ত্রী হবির্ভূ (=মালিনী, দ্রঃ তৃণবিন্দু) ছেলে বিশ্রবস্। মহাভারতে রয়েছে সন্ধ্যা ও প্রতীচী দুই স্ত্রী। পুলস্ত্যের সন্তান বানর, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব ও কিন্নর (মহা ১।২০।৭)। রাবণ কার্তবীর্যার্জুনের হাতে বন্দী হলে কারাগার থেকে এঁকে ছাড়িয়ে আনেন। পরাশরকে রাক্ষস যজ্ঞ থেকে নিবৃত্ত করেন। ভীষ্মকে এক বার সমস্ত তীর্থস্থান সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন ; অর্থাৎ ভীষ্মের গুরু। এক মতে পুলস্ত্যের এক স্ত্রী গৌ ; ছেলে কুবের। সপ্তর্ষি চিত্রশিখণ্ডিনদের মধ্যে এক জন।

পুলহ—এক জন প্রজাপতি ; ব্রহ্মার মানস পুত্র। নাভিতে জন্ম। দ্রঃ পুলস্ত্য। স্ত্রী ক্ষমা, ছেলে কর্দম, উর্বরীবান, আর্যাবৎ, সহিষ্ণু, কর্মশ্রেষ্ঠ। পুলহের অন্যান্য সৃষ্টি প্রজাপতি, সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, মেষ, ও কিম্পুরুষ (মহা ১।৬০।৭)। পরাশরকে রাক্ষস যজ্ঞ থেকে নিবৃত করেন। গঙ্গার এক শাখা অলকা নন্দার তীরে তপস্যা করেছিলেন। চিত্র-শিখণ্ডিন সপ্তর্ষিদের এক জন। দ্রঃ হরিভদ্রা, শ্বেতা।

পুলিন্দ—নন্দিনীর মুখের ফেনা থেকে এঁদের জন্ম। অন্য মতে একটি ম্লেচ্ছ জাতি। আর এক মতে ক্ষত্রিয় ; কিন্তু ব্রাহ্মণ শাপে শূদ্রে পরিণত। কুরুক্ষেত্রে কিছু পুলিন্দ দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন।

পুলোমজা—পুলোমা (দ্রঃ)।

পুলোমা/পুলোমন—(১) দনু/দিতির ছেলে। মেয়ে শচী (দ্রঃ)। রাবণ স্বর্গ জয় করতে এলে মেঘনাদের হাতে জয়ন্ত আহত হন। মায়াতে মেঘনাদ চার দিক অন্ধকার করে ফেললে পুলোমা আহত জয়ন্তকে নিয়ে পালিয়ে যান। পুলোমার অনুমতি নিয়ে শচীকে এক বার অনুহ্লাদ হরণ করেছিলেন। এ জন্য ইন্দ্র পুলোমা ও অনুহ্লাদ দু জনকেই নিহত করেন। (২) ভৃগু (দ্রঃ) মুনির স্ত্রী। দৈত্যরাজ বৈশ্বানরের মেয়ে ; ছেলে চ্যবন। পুলোমা দৈত্য এঁর প্রণয়ী ছিলেন। (৩) এক জন রাক্ষসী। পুলোমার অপর নাম কালকা ; অন্য মতে পুলোমার বোন কালকা। পুলোমার সন্তানরাও পুলোমা নামে পরিচিত : আবার কালকা নামেও অভিহিত। ছেলেদের নিরাপত্তার জন্য পুলোমা অন্য মতে পুলোমা ও কালকা দুজনে হাজার বছর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে বর পান এই ছেলেরা জীবনে কোন দিন দুঃখ পাবে না। দেবতা রাক্ষস, ও নাগেদের হাতে মৃত্যু হবে না। এবং ব্রহ্মা এঁদের জন্য হিরণ্যপুর নামে একটি নগরী নির্মান করে দেন। অর্জুনের হাতে এই কালকেয়রা (দ্রঃ) মারা যান।

পুষ্কর—(১) রাজস্থানে একটি সহর ও হ্রদ। মোটামুটি ২৬°২৯´উ×৭৪°৩৩´পূ। আজমীর ষ্টেসন থেকে ১১ কি-মি উত্তরে। আরাবল্লী গিরি শ্রেণী হ্রদটিকে ঘিরে

রয়েছে। সরস্বতী নদীর ৫-টি শাখা হ্রদের পাশ দিয়ে প্রবাহিত। পুরাণ মতে পরশুরাম এই তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা; ব্রহ্মা এখানে তপস্যা/যজ্ঞ করেছিলেন। এখানে ব্রহ্মা, সাবিত্রী, বরাহ, বদ্রিনারায়ণ ও শিব ৫-টি মন্দির রয়েছে। ব্রহ্মা এখানে এক বার পদ্ম হাতে নিয়ে দেখা দিয়েছিলেন। দেবতাদের ধ্বংস করার জন্য বজ্রনাভ এখানে তপস্যা করেছিলেন। ব্রহ্মার হাতের পদ্ম মাটিতে পড়ে গিয়ে বজ্রের মত ভীষণ শব্দ হয় এবং এই শব্দে বজ্রনাভ মারা যায়। এই সময় থেকে স্থানটি পুষ্কর নামে পরিচিত হয়। যমও এখানে তপস্যা করেছিলেন। হিন্দুদের প্রাচীন পিতৃতীর্থ। (২) পুরাণে সপ্তদ্বীপের একটি। (৩) নিষধরাজ নলের ছোট ভাই। কলির প্ররোচনায় পাশাতে নলকে (দ্রঃ) পরাজিত করেন। (৪) বরুণের ছেলে; সোমের কন্যা এঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে একে বিয়ে করেন। (৫) ভরতের ছেলে; পুষ্কর/পুষ্কল।

পুষ্করিণী—(১) চাক্ষুষ মনুর স্ত্রী; ছেলে মনু। (২) ভূমন্যুর স্ত্রী; সুহোত্র, (মহা-১।৮৯।২০) সুহবি ইত্যাদি ছয় ছেলে। (৩) উন্মুখের স্ত্রী, ছেলে:-অঙ্গ, সুমনস্, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও গয়।

পুষ্কল—দশরথের ছেলে ভরত; ভরতের ছেলে তক্ষ, ও পুষ্কল বা পুষ্কর। গান্ধার-দেশ জয় করে সেখানে পুষ্কলাবতী নগরী স্থাপন করেন। পুষ্কলের স্ত্রী কীর্তিমতী। অশ্বমেঘ যজ্ঞের ঘোড়া এই পুষ্কল ও শত্রুঘ্নের হাতে ছিল। লবের কাছে পরাজিত হন।

পুষ্কলাবতী—প্রাচীন গান্ধারের রাজধানী। পেশোয়ার। দ্রঃ পুষ্কল।

পুষ্পক—সংজ্ঞা সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে পিতা বিশ্বকর্মার কাছে ফিরে যান। বিশ্বকর্মা সূর্যকে তখন ভ্রমি যন্ত্রে ছেঁটে ছোট করেন। সূর্যের তেজ অষ্টম ভাগের এক ভাগও কমেনি। সূর্যের এই টুকরো টুকরো অংশ নিয়ে বিশ্বকর্মা সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল, কার্তিকের শক্তি, পুষ্পক বিমান ইত্যাদি তৈরি করেন। এই রথ ব্রহ্মা বরুণকে উপহার দেন। রাবণ বরুণের কাছ থেকে এটি কেড়ে নেন; রাবণ এই রথে চড়ে দিগ্বিজয়ে যান। এক বার অলকাপুরী থেকে এক যক্ষ কন্যাকে রাবণ নিয়ে পালাচ্ছিলেন। মেয়েটির চিৎকারে সম্পাতি রাবণকে আক্রমণ করেন; রথ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়, রাবণ পরাজিত হন। মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে রাবণ সম্পাতির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। দিব্য রথ অবশ্য পরমুহূর্তেই পুনগঠিত হয়ে যায়। এই রথে করেই রাবণ সীতাকে অপহরণ করেন। রাবণের পর বিভীষণ এই রথ পান এবং রামকে দান করেন। রামচন্দ্র এই রথে করে অযোধ্যাতে ফিরে এসে কুবেরকে রথ ফিরিয়ে দেন। পরে শম্বুককে খোঁজবার সময় রামচন্দ্র এই রথকে আবার স্মরণ করেছিলেন। হংসচালিত আকাশচারী রথ। এই রথে রত্নময় বিহঙ্গ, স্বর্ণময় ভুজঙ্গ ও প্রাণময় তুরঙ্গ ছিল। বিহঙ্গদের পাখা একটু সঙ্কুচিত ও বাঁকান ও পুষ্পখচিত। পদ্মরাগ মণ্ডিত ও শুণ্ডে পদ্মপত্র শোভিত হস্তী ছিল। স্থানে স্থানে পদ্মের ওপর পদ্ম হস্তে কমলা বিরাজমান ছিলেন। রাত্রিচর ভূতেরা এই রথ বহন করত। এবং আরোহীর ইচ্ছা অনুসারে রথ চলত।

পুষ্পদন্ত—(১) এক জন গন্ধর্ব; শিবের বিশিষ্ট চর। দুর্গার সখী জয়ার স্বামী। শিবপার্বতীর গোপন কথোপকথন শুনে অন্যকে জানালে মহাদেবের সাপে বররুচি নামে জন্মাতে হয়। (২) এক জন গন্ধর্ব; এঁর ছেলে মাল্যবান। (৩) অষ্ট দিক

গজের একটি। উ-পশ্চিমের দিকপাল বায়ু এঁর পিঠে অবস্থান করেন। (৪) কার্তিকের এক জন যোদ্ধা।

পুষ্পবাণ বিলাস—কালিদাস কৃত গ্রন্থ।

পুষ্পরথ—রাজা বসুমানের রথ। এটিও আকাশচারী।

পুষ্পোৎকটা—রাক্ষস সুমালীর (দ্রঃ) ঔরসে স্ত্রী গন্ধর্বকন্যা কেতুমতীর গর্ভে প্রহস্ত প্রকম্পন, বিকট. কালকার্মুক ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস, ভাসকর্ণ (রাম ৭।৫।৪০) দশ ছেলে ও চার মেয়ে রাকা/বাকা. পুষ্পোৎকটা. কৈকসী ওকুম্ভীনসী জন্মান। সুমালী চারটি মেয়েকে নিয়েই বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন এবং চার জনকেই বিশ্রবার সঙ্গে বিয়ে দেন। পুষ্পোৎকটার ছেলে হয় কুবের। একটি মতে পুষ্পোৎকটার একটি মেয়ে কুম্ভীনসী ও দশটি ছেলে।

পুষ্টি— দক্ষের একটি মেয়ে; ধর্মের সঙ্গে বিয়ে হয়।

পূজনী—কাম্পিল্য নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজার পূজনী নামে বুদ্ধিমান ও সর্বজ্ঞ একটি পাখী ছিল। রাণীর একটি সন্তান হয় এবং পূজনীরও একটি বাচ্ছা হয়। রাজপুত্র ও পূজনীপুত্র দু জনে খেলার সাথী হন। পূজনীপুত্র নানা জায়গা থেকে নানা কিছু মুখে করে এনে রাজপুত্রকে দিত/খাওয়াত। তবু এক দিন রাজপুত্র পূজনী-পুত্রকে হত্যা করে বসেন। পূজনী সে সময়ে সেখানে ছিল না; ফিরে এসে সমস্ত দেখে রাজপুত্রের দুটি চোখ নষ্ট করে দিয়ে উড়ে চলে যায়। পূজনীর এই বিদায় নেওয়া অত্যন্ত মর্মান্তিক; পূজনী বলে যায় ক্ষত্রিয়কে কেউ যেন বিশ্বাস না করে। (শান্তি)

পূজা—যে সব পূজা চালু রয়েছে এগুলি বাহ্য পূজা। বাহ্য পূজা নিম্নস্তরের অধিকারীর জন্য বিহিত। এর অঙ্গ অধিবাস, স্বস্তিবাক্য, সংকল্প, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি. বলি, আরতি. হোম ও দক্ষিণা উল্লেখযোগ্য। উচ্চস্তরের যাঁরা অধিকারী তাঁদের জন্য অন্তর্যাগ বা আন্তরপূজা। বা মানস পূজা বিধেয়। এই পূজাতে বাইরের কোন উপকরণ লাগে না। কল্পিত উপকরণ দেবতাকে দেওয়া হয়। তান্ত্রিক পূজায় বাহ্য পূজার সঙ্গে আন্তর পূজার ব্যবস্থা দেখা যায়। ন্যাস, ভূতশুদ্ধি, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠানে দেবতা, পূজা উপকরণ ও পূজকের ঐক্য ভাবনার নির্দেশ রয়েছে। প্রতিমাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে অত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠায় পূজক নিজ দেহে দেবতার আবির্ভাব কল্পনা করে নিজেকে দেবময় বলে মনে করেন। শাস্ত্রের বিধান নিজেকে দেব স্বরূপ কল্পনা করে পূজক দেবপূজায় প্রবৃত্ত হবেন। আন্তর পূজাই সর্বোত্তম পূজা। বাহ্যিক পূজা ও আবার তিন রকম ঃ-সাত্ত্বিক পূজা, ধীর ও শান্ত অনুষ্ঠান; রাজসিক পূজা আড়ম্বর বহুল কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা হীন; তামসিক পূজাতে আড়ম্বর ও উচ্ছৃঙ্খলতাই প্রধান।

পূতনা—রাক্ষসী। বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন বিবরণ। কৈটভীর মেয়ে; পূতানার ছোট বোন বৃকোদরী। অন্য মতে বালীর মেয়ে, বকাসুরের বোন। কংসের স্ত্রীর পরিচারিকা অন্য মতে কংসের ধাত্রী; আর এক মতে কংসের অনুচরী। আর এক মতে কংসের বোন এবং ঘটোদরের স্ত্রী। পূতনা আগের জন্মে ছিলেন বলির মেয়ে রত্নমালা। বামন বলির যজ্ঞ নষ্ট করতে এলে রত্নমালা মনে মনে ভাবেন এই বামন যদি তাঁর ছেলে হত তাহলে বামনকে তিনি স্তন্য দিতে পারতেন। বামন এই মনের কথা জানতে পেরে পূতনা হয়ে জন্মাবে বর দেন। আর এক কাহিনীতে মুনি

কালভীরু ও মেয়ে চারুমতী পথে যেতে যেতে সরস্বতী নদী তীরে মুনি কক্ষীবানকে তপস্যা করতে দেখেন। কালভীরু মুনিকে পছন্দ করেন এবং মেয়ের বিয়ে দেন। কক্ষীবান এক বার তীর্থযাত্রা করেন; স্ত্রী আশ্রমে থাকেন। এই সুযোগে এক জন শূদ্র চারুমতীর সঙ্গে বাস করতে থাকেন। কক্ষীবান ফিরে এসে সব জানতে পেরে শাপ দেন রাক্ষসী হয়ে জন্মাবে। চারুমতী অনুনয় বিনয় করলে মুনি বলেন কৃষ্ণকে স্তন্য দিলে মুক্তি পাবেন। গোকুলে পাখীর বেশে এসে প্রবেশ করেছিলেন। সুন্দরী স্ত্রী বেশে নন্দের বাড়িতে এসে ঢোকেন এবং শিশু কৃষ্ণকে বিষ মাখান স্তন পান করাবার চেষ্টা করেন। কৃষ্ণ স্তন্য পান করতে করতে তাঁর জীবনী শক্তিও শোষণ করে নেন। পূতনা যন্ত্রণায় নিজমূর্তি ধারণ করে আর্তনাদ করে মারা যান।

পূর্ণভদ্র—(১)কশ্যপ বংশে একটি সাপ। (২) রত্নভদ্রের ছেলে এক জন যক্ষ।

পূর্ণায়ুস—প্রধা কশ্যপ সন্তান।

পূর্বচিত্তি—পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট অপ্সরা। অগ্নীধ্রের (দ্রঃ) স্ত্রী।

পূর্ব মীমাংসা—অপর নাম মীমাংসা দর্শন। বিষয় বস্তুর দিক থেকে বেদে প্রথমে কর্ম ও পরে জ্ঞান অবস্থিত রয়েছে। বেদে এই কর্ম কাণ্ডের/অংশের অর্থাৎ প্রথম অংশের বিচার ও মীমাংসা এই পূর্ব মীমাংসা বা পূর্বভাগের মীমাংসা। বেদের উত্তর অংশ অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসাকে উত্তর মীমাংসা বা দর্শন বলা হয়। জৈমিনি এই পূর্ব মীমাংসার সূত্রকার কিন্তু ঠিক উদ্ভাবক নন। ভারতে দীর্ঘ দিন যে সব যাগ-যজ্ঞাদি বৈদিক অনুষ্ঠান চলে এসেছে এই গ্রন্থে সেই সম্বন্ধেই নানা বিধি নিষেধ ইত্যাদি সংকলিত হয়েছে।

পূর্ব মীমাংসা উত্তর মীমাংসার মতই শ্রুতি বা বেদের ওপর নির্ভরশীল। মীমাংসা মতে বেদ ঈশ্বর প্রণীত নয়; এটি নিত্য এবং অপৌরুষেয়। পূর্ব মীমাংসা মতে বেদ বিহিত কর্মই ধর্ম এবং কর্তব্য এবং এই কাজ ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখেই করে যেতে হবে। কর্মের নিজস্ব নিয়ম অনুসারে এই কর্তব্য কর্ম থেকে শুভ ফল আসবেই। বৈদিক যজ্ঞের বিচারই মীমাংসা দর্শনের প্রধান কাজ; ফলে ঈশ্বর তত্ত্ব নিয়ে বিশেষ কিছু আলোচনা এখানে নাই। কর্মের নিয়ম অনুসারে জগৎ সৃষ্ট এবং কর্মের নিয়ম অনুসারেই জীবজীবনে কর্মফল। অর্থাৎ ঈশ্বরকে বিধাতা রূপে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই। জৈমিনি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে স্বীকার করেন নি। মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ নিয়েও আলোচনা আছে। গ্রন্থে ১২টি অধ্যায় এবং সঙ্কর্ষ কাণ্ড নামে আরো ৪টি অধ্যায় অর্থাৎ মোট ১৬টি। মীমাংসা দর্শনের চরম লক্ষ্য জীবের মুক্তি এবং মুক্তির উপায় কর্ম। অনুষ্ঠিত কর্ম থেকে অদৃষ্ট বা অপূর্ব গড়ে ওঠে। মুক্তি কামীরা বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করবেন এবং নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করবেন।

পূর্বাশ্রম—সরযূতীরে একটি পবিত্র স্থান। এখানে মহাদেব মদনকে ভস্ম করেন।

পূষা—(১) সূর্যের এক নাম। (২) বৈদিক ঋষিদের এক দেবতা। এঁর নামে বহু ঋক্ রয়েছে। এঁর বাহন ছাগ। বেদে ইনি কোথাও মানুষদের কোথাও পশুদের পোষক। কোথাও আবার সূর্যদেব রূপে পৃথিবী পরিদর্শন করছেন। এঁর সাহায্যে দিন ও রাত্রির প্রকাশ। ইন্দ্র ও ভগের সঙ্গে পূষাও স্তুত হয়েছেন। নিরুক্ত ও পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে ইনি সূর্য। কূর্ম পুরাণে দক্ষযজ্ঞ নষ্টের সময় বীরভদ্র পূষার দাঁত

ভেঙ্গে দেন। মহাভারত মতে মহাদেব পদাঘাতে এঁর দাঁত ভেঙ্গে দেন। একটি মতে দেবতারা যজ্ঞ করেন, মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেন না। তবু মহাদেব আসেন। দেবতারা এতে বিরক্ত হন এবং আদিত্যেরা সকলে মিলে শিবকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে পূষার দাঁত ভেঙ্গে যায়; খাণ্ডব দাহনের সময় ইন্দ্রের মিত্র হিসাবে অবস্থান করেন।

পৃথা—অন্য নাম কুন্তী (দ্রঃ)।

পৃথিবী—পৃথু (দ্রঃ) গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করেন। এর পর অগস্ত্য বৎস হন বৃহস্পতি দোহন করেন। তার পর চন্দ্র বৎস হন গ্রহেরা দোহন করেন। এই সময়ে যে উর্জক্ষীর পাওয়া গিয়েছিল দেবতারা সেই ক্ষীর আজও পান করছেন। ঋষিরা দোহন করে সত্য ও ধর্ম লাভ করেন। পিতৃদেবরা যমকে বৎস করেন, অন্তক দোহন করেন এবং রৌপ্য পাত্রে স্বধাকে লাভ করেন। সর্পেরা তক্ষককে বৎস করেন ধৃতরাষ্ট্র-সাপ দোহন করেন এবং বিষ লাভ করেন। দৈত্যদানবরা বিরোচনকে বৎস করেন এবং ঋত্বিক দ্বিমূর্দ্ধা-মধু পৃথিবীকে দোহন করে সাহস, শক্তি ও সর্বশত্রু জয়কারী মায়া লাভ করেন। দৈত্যরা লৌহ পাত্রে দোহন করেন। রাক্ষস, পিশাচ ও দুষ্ট মরুৎরা সুমালীকে বৎস করেন; সুনাভ দোহন করেন; কপাল দুগ্ধপাত্র হয় এবং রক্ত দোহন করেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরারা চিত্ররথকে বৎস এবং সুরুচিকে দোগ্ধা করে পদ্মপাত্রে গান দোহন করেন। পর্বতরা হিমালয়কে বৎস করেন; মেরু দোহন করেন ফলে হীরক ইত্যাদি রত্ন ও ঔষধ লাভ করেন। এই ভাবে আরো অনেকে দোহন করে ছিলেন এবং বহু কিছু লাভ করেছিলেন।

পৃথু—অন্য নাম পৃথি। বেণের (দ্রঃ) ছেলে। ঋক্‌বেদে এঁর উল্লেখ আছে। ইন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটি ঋক্‌মন্ত্র এঁর রচনা। হরি বংশে আছে:-অত্রি বংশে রাজা অঙ্গের ছেলে বেণ। বেণ যজ্ঞ, বেদপাঠ, ধর্মকর্ম সব বন্ধ করে দিলে ঋষিরা রাগে বেণকে নিহত করেন। তার পর ঋষিদের চেষ্টায় মৃত বেণের প্রথম ছেলে হয়; ঋষিরা একে বলেন নিষীদ ফলে নাম হয় নিষাদ (দ্রঃ) এবং বেণের দ-বাহু মথিত করে ঋষিরা প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় পৃথু নামে আর একটি ছেলে তৈরি করেন। পৃথু জন্মালে বেণ পুন্নাম নরক থেকে রক্ষা পান। পৃথু আকাশ থেকে অজগব ধনু ও বহু বাণ এবং একটি দিব্য কবচ পান। পৃথিবীতে প্রতিটি জীব সুখী হয়। এঁর অভিষেকে সমুদ্র নানা ধনরত্ন দেন, নদীরা তাদের পুণ্য জল এনে দেন। ব্রহ্মা ও অঙ্গিরস অন্য মতে মহর্ষিরা এঁকে অভিষিক্ত করেন। ব্রহ্মা এই সময়ে চন্দ্রকে, গ্রহ, নক্ষত্র, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ ও ওষধি সমূহের অধিপতি, কুবেরকে ধনপতি ও রাজাদের অধিপতি, বরুণকে জলাধিপতি, বিষ্ণুকে আদিত্যাধিপতি, পাবককে বসুদের অধিপতি, দক্ষকে প্রজাপতিদের, ইন্দ্রকে মরুৎদের, প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবদের, যমকে পিতৃদেবদের, উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বদের, বৃষকে গবাদি পশুদের, সিংহকে সমস্ত পশুর, ব্যাঘ্রকে সমস্ত নখী ও দীর্ঘ নাসিকা জীবদের, ঐরাবতকে হস্তীদের, হিমালয়কে পর্বতদের, প্লক্ষকে সমস্ত বৃক্ষদের এবং কপিলকে সমস্ত মুনিদের অধিপতি করে দেন। এর পর দিকপাল হিসাবে পূর্বে বৈরাজ প্রজাপতির ছেলে সুধন্বা, দক্ষিণে কর্দম প্রজাপতির ছেলে শঙ্খপাদ, পশ্চিমে রজসের ছেলে কেতুমান এবং উত্তরে হিরণ্যরোমাকে স্থাপন করেন। পৃথুর

দক্ষিণ হস্তে চন্দ্রের রেখা ছিল অর্থাৎ বিষ্ণুর অংশে জন্ম। সমস্ত প্রজাকে তিনি ভাল-বেসে জয় করেছিলেন। সমুদ্রের ওপর দিয়ে এগিয়ে গেলে সমুদ্রের জল স্থির হয়ে অবস্থান করত, পর্বতের ওপর দিয়ে গেলে পর্বত সম্ভ্রমে পথ করে দিত। পৃথু জন্মালে ব্রহ্মা একটি যজ্ঞ করেন এবং এই যজ্ঞে সূত নামে এক জন বুদ্ধিমান দৈত্য এবং মগধ নামে এক পণ্ডিত জন্মান। এঁরা জন্মালে ঋষিরা এঁদের পৃথুর জয় গান করতে বলেন। এঁরা সম্মত হন না; বলেন পৃথু এখনও বালক; এখনও এমন কিছু করেন নি যে তাঁর প্রশংসা গান করতে হবে; ঋষিরা তখন ভবিষ্যতের সম্ভাব্যগুণের জন্য প্রশস্তি গান করতে বলেন। সূত ও মাগধ তখন গান করতে থাকেন। পৃথু এই গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যান এবং প্রতিজ্ঞা করেন এই সব গুণের অধিকারী হবেন। বড় হয়ে পৃথু সূতকে সারথি এবং মাগধকে তাঁর বন্দী নিযুক্ত করেন।

প্রজারা এত দিন দুর্ভিক্ষ ও অনাহারে ছিল। তারা জানায় বেণ মারা যাওয়া থেকে পৃথুর রাজা হওয়া পর্যন্ত ধরিত্রী কোন শস্য/উদ্ভিদ দিচ্ছেন না। পৃথু তখন তাঁর অজগধ ধনু ও তীর নিয়ে ধরিত্রীকে খুঁজতে বার হন। গো রূপ ধারণ করে ধরিত্রী যে কোন লোকে গিয়ে আশ্রয় নিতে যান পৃথু সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। ধরিত্রী তখন পৃথুরই শরণ নেন এবং নারী হত্যা থেকে বিরত হতে বলেন। ধরিত্রী প্রশ্ন করেন তিনি যদি নষ্ট/নিহত হন তাহলে প্রজারা কোথায় আশ্রয় নেবে। পৃথু জানান দুর্বৃত্তকে হত্যা করলে স্ত্রী বধ হয় না এবং ধরিত্রী না থাকলেও পৃথু তাঁর যজ্ঞ বলে প্রজাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেবেন। পৃথু তার পর ধরিত্রীকে তাঁর মেয়ে হতে বলেন এবং প্রজাদের অভাব মেটাতে বলেন। পৃথুর মেয়ে হিসাবে এই সময় থেকে নাম হয় পৃথিবী। ঠিক হয় গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করতে হবে এবং এ জন্য একটি বৎস চাই। দুগ্ধ রূপে তিনি সব কিছু ফিরিয়ে দেবেন। এবং পৃথিবীকে সমতল না করে নিলে এই দুধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারবে না।

পৃথু তখন ধনুর প্রান্ত দিয়ে ইতস্তত ছড়ান পর্বতগুলিকে একত্র করে স্থাপন করেন বা পৃথিবীকে উৎসারিত করলে পর্বতের সৃষ্টি হয় ও ভূমি সমতল হয়। কোন গ্রাম বা সহর ছিল না, কোন কৃষিক্ষেত্র ছিল না, কোন গো-রক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। পৃথু এই সমস্ত ব্যবস্থা করেন। এর পর স্বায়ম্ভুব মনুকে অন্য মতে ইন্দ্রকে বৎস করে পৃথু নিজে গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করে সমস্ত গাছ পালার জন্ম দেন। ফলে প্রজারা আজও অন্ন লাভ করছে। বা এই ভাবে পৃথু ভূমিকে আবার জীবিত করে তোলেন বলে ভূমির নাম হয় পৃথিবী (দ্রঃ)। পৃথুর রাজ্য সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। মহাভারতে আছে বিষ্ণুর মানস পুত্র বিরজা। বিরজার বংশে বেণের ছেলে এই পৃথু। পৃথুকে ঋষিরা সমদর্শী হয়ে ধর্ম পালন করতে এবং বর্ণ সঙ্করতা নিবারণ করতে বলেন। পৃথু সম্মত হলে দেবতারা এঁকে রাজা করেন। মুনিরা এঁর মন্ত্রী হন। পৃথিবীকে দোহন করে সপ্তদশ প্রকার শস্য ও বিবিধ দ্রব্য লাভ করেন। পৃথুর সময় সমস্ত ভূমণ্ডল প্রোথিত (খ্যাত) হয়েছিল বলে নাম পৃথিবী হয়। বেদ বেদাঙ্গ ধনুর্বেদ ও দণ্ডনীতিতে পারঙ্গম হয়েই পৃথু জন্মেছিলেন।

পৃথু তার পর অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন; ছেলে বিজিতাশ্ব ঘোড়া নিয়ে বার হন। ইন্দ্রকে অত্রি সাহায্য করেন এবং ইন্দ্র ঘোড়া ধরেন। যুদ্ধে ইন্দ্র ভীষণ ভাবে

পরাজিত হন এবং ক্ষমা চেয়ে নিয়ে মিত্রতা স্থাপন করেন। বৃদ্ধ বয়সে বিজিতাশ্বকে রাজ্য দিয়ে স্ত্রী অর্চিসকে নিয়ে তপস্যা করতে যান এবং বহু দিন তপস্যা করে পরম ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। অর্চিস সহমরণে যান। পৃথুর ছেলে অন্তর্ধান/অন্তর্ধি, বাদী, সূত, মাগধ, পালিত, বিজিতাশ্ব। আর এক মতে বিজিতাশ্ব ভাই হর্যক্ষকে পূব দিকের, ভাই ধূম্রকেশকে দক্ষিণ দিকের, ভাই বৃককে পশ্চিম দিকের এবং ভাই দ্রবিণকে উত্তর দিকের ভার দেন। অর্থাৎ বিজিতাশ্ব হর্যক্ষ ইত্যাদি পাঁচ ভাই এবং সকলে মিলে পৃথিবী শাসন করতেন। দ্রঃ পৃথূদক।

পৃথুরশ্মি—এক জন যতি। যতিরা যজ্ঞ বিরোধী ছিলেন ফলে ইন্দ্রের ক্রোধে ভস্মীভূত হন। কিন্তু বৃহৎগিরি, পৃথুরশ্মি ও রযোবাজকে ইন্দ্র পালন করেন ; এঁদের ব্রহ্ম, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বিদ্যাদান করেন। পৃথুরশ্মি ইন্দ্রের কাছথেকে ক্ষত্রতেজও আদায় করেন।

পৃথুশ্রবস্—(১) ঋক বেদে এক রাজা ; ইন্দ্র এঁর শত্রুদের নিহত করেন। (২) এঁর মেয়ে কামা ; অযুতনায়ীর স্ত্রী। (৩) এক জন মুনি ; যুধিষ্ঠিরের বন্ধু। (৪) একটি সাপ ; বলরামের আত্মাকে নিতে প্রভাসে এসেছিলেন।

পৃথূদক—৩০°৫৯´ উ এবং ৭৬° ৫৫´ পূ। পাঞ্জাবে একটি তীর্থ। বর্তমান নাম পেহোয়া ; সরস্বতী নদীর তীরে। মহাভারতে বনপর্ব ও অন্যান্য গ্রন্থ অনুসারে শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এমন কি সরস্বতী ও কুরুক্ষেত্র থেকেও বড়। রাজা পৃথু এইখানে শ্রাদ্ধের সময় (বিষ্ণু পুরাণ) ১২ দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে জলদান করেছিলেন ; ফলে এই নাম। মহাভারত মতে কার্তিকেয় তীর্থ, বামন পুরাণে ব্রহ্মযোনি তীর্থ। প্রাচীন কালে এখানে বহু মন্দির ছিল।

পৃথূদর—বিখ্যাত যক্ষ। মেয়ে সৌদামিনী।

পৃষত—পাঞ্চাল রাজা। দ্রুপদের (দ্রঃ) পিতা ; ভরদ্বাজের বন্ধু।

পৃষতাশ্ব—অম্বরীষের ছেলে পৃষতাশ্ব, কেতুমান ও শম্ভু।

পৃষধ্র—(১) বৈবস্বত মনুর নবম ছেলে। প্রাতঃস্মরণীয়। কুরুক্ষেত্রে তপস্যা করে স্বর্গ লাভ করেন। বাল্যকাল থেকেই তপস্বী। গুরুগৃহে অধ্যয়নকালে এক দিন রাত্রিতে গোয়ালে একটি বাঘ আসে। পৃষধ্র তরবারি নিয়ে অন্ধকারে বাধা দিতে এসে একটি গরুকে নিহত করেন। বাঘ মারা গেছে মনে করে নিশ্চিন্তে ঘুমতে যান। পর দিন সকালে গোহত্যার কথা জানতে পেরে সারা জীবন তপস্যা করে কাটান। (২) দ্রুপদের এক ছেলে। কুরুক্ষেত্রে অশ্বত্থামার হাতে নিহত।

পৃশ্নি—(১) স্বায়ম্ভুব মনুরও আগে সুতপা রাজার/প্রজাপতির স্ত্রী। এঁরা দু জনে ১২,০০০ বছর তপস্যা করেন। বিষ্ণু দেখা দিলে পৃশ্নি বিষ্ণুর মত একটি সন্তান চান। বিষ্ণু বর দেন এবং এঁর গর্ভে জন্মাবার জন্য বিষ্ণুর নাম হয় পৃশ্নি-গর্ভ। জন্মান্তরে কৃষ্ণের মা দেবকী। দ্রঃ দেবকী। (২) এক জন মুনি। দ্রোণের সঙ্গে দেখা করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বন্ধ করতে বলেছিলেন।

পৃশ্নিগর্ভ—পৃশ্নির (দ্র) ছেলে বলে বিষ্ণুর এক নাম পৃশ্নিগর্ভ। অন্ন, জল, অমৃত, ও বেদ এগুলি পৃশ্নি ; বিষ্ণুর মধ্যে এগুলি রয়েছে বলে বিষ্ণুর অপর নাম পৃশ্নিগর্ভ।

পেনগঙ্গা—মহারাষ্ট্রের একটি নদী।

পেশোয়ার—প-পাকিস্তানে ৩৩°৪৩´-৩৪°৩২´ উত্তর × ৭১°২২´-৭২°৪১´ পূর্ব। বিভাগ,

জেলা ও সহর। পূর্বে সিন্ধু নদ। পশ্চিমে আফগানিস্তান। জেলাতে ৬২০ গ্রাম। জেলাটি একটি পর্বত বেষ্টিত উপত্যকা। জেলার প্রধান নদী কাবুল, নদীটি খাইবার গিরিপথের নিকট গভীর একটি খাদের মধ্য দিয়ে উত্তরে সিন্ধু নদে মিলিত হয়েছে। কাবুল নদীবাহিত অবক্ষেপ দ্বারা গঠিত উপত্যকা।

আর্যেরা এই পথে ভারতে আসে। গ্রীক ও ব্যাকট্রিয়ানরাও এই পথে ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন। কুষাণ সাম্রাজ্যও এইখানে স্থাপিত হয়। এইখানে বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুসলমানরাও এই পথে এসেছিলেন। এখান থেকে প্রায় ২৫ কি-মি দূরে চরসাদায় প্রাচীন গান্ধারের রাজধানী পুষ্কলাবতী রয়েছে। প্রাচীন অপর নাম পুরুষপুর। বাবর একে পরশাওয়র এবং আকবর একে পেশাওয়র অথাৎ সীমান্ত নগর নাম দেন। পুরুষপুর নগরের পত্তন কবে জানা নাই। খৃ ১ শতকে কুষাণদের সময় এর সমৃদ্ধি ঘটে। খৃ ৩ শতকে কুষাণদের পতনের পরও বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বহু দিন পুরুষপুর গৌরবোজ্জল ছিল। পুরুষপুরে কনিষ্কের কীর্তি একটি বিরাট স্তূপ, পাশে প্রসিদ্ধ সংঘারাম ও ছিল। এখানে পার্শ্ব, বসুবন্ধু ইত্যাদি আচার্য ছিলেন। ফা-হিয়েনের মতে এ রকম স্তূপ তিনি কোথাও আর দেখেন নি। প্রবাদ জম্বুদ্বীপের একটি উচ্চতম স্তূপ।

পৈল—বেদজ্ঞ মহর্ষি। ব্যাসের (দ্রঃ) শিষ্য। ঋক্‌গুলি সংগ্রহ করে দু ভাগ করে নিজের শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কলকে পড়ান। পিতার নাম বসু। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়তে এসেছিলেন এবং শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করে যান।

পৈশাচী—একটি প্রাকৃত ভাষা। কোন এলাকাতে প্রচলিত ছিল স্পষ্ট নয়। এক মতে বিন্ধ্যগিরি অংশে; আর এক মতে উত্তরপশ্চিম সীমান্তে গান্ধার অঞ্চলে। একটি সাহিত্যিক ভাষা। মনে হয় উজ্জয়িনীর প্রাকৃত বৌদ্ধদের হাতে পালি রূপ নিয়েছিল এবং ব্রাহ্মণদের হাতে পৈশাচী রূপ পেয়েছিল। খৃ ৪-৫ শতকে গুণাঢ্য রচিত একটি বৃহৎ গল্পসংকলন এই পৈশাচীতে রচিত হয়েছিল। মূল গ্রন্থ লুপ্ত। কথাসরিৎ-সাগর এরই একটি কাহিনী; সংস্কৃতে পরিবর্তিত।

পোড়া মাটি—প্রাগৈতিহাসিক যুগে দাক্ষিণাত্যে পোড়া মাটির বহু মূর্তি পাওয়া গেছে। শবাধারের আচ্ছাদনের ওপর কিছু মূর্তি বসান থাকত। সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচিস্তানেও প্রচুর পোড়া মাটির জিনিস পাওয়া গেছে। এই সব মূর্তিগুলির গড়ন সংক্ষিপ্ত, শিল্পকৌশল ও অনুন্নত। সিন্ধু উপত্যকাতে প্রায় সম্পূর্ণ দেহ যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে তাদের মুখ অনেক সময় পশুপাখী মত। এগুলি অধিকাংশই হাতে গড়া। মহেঞ্জোদড়োতে উন্নত কলাকৌশলের কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে। ছাঁচে গড়া কয়েকটি মাথা দক্ষ শিল্পীর পরিচায়ক। জীবজন্তুর মূর্তিগুলি মানুষের মূর্তির চেয়ে সাধারণত শ্রেষ্ঠ। সুগঠিত ষাঁড়ের মূর্তি বহু পাওয়া গেছে। মাটির মোটা বাঁশি, গাড়ি ইত্যাদি বহু খেলনাও আছে। পাথরের মূর্তির চেয় অবশ্য শিল্পমানের বিচারে এই মূর্তিগুলি নিকৃষ্ট। কিছু নারীমূর্তি মিলেছে; এগুলি অধিকাংশই মাতৃদেবী ও প্রজনন শক্তির পরিচায়ক মূর্তি বলে মনে হয়। তক্ষশীলা, মথুরা, গান্ধার, ভিটা, বক্সার, পাটনা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত মূর্তিগুলি সিন্ধুসভ্যতা ও মৌর্য যুগের মধ্যকালীন। প্রাচ্য দেশের বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাচীন এক সর্বজন উপাস্য মাতৃমূর্তি প্রচলিত ছিল। অহিচ্ছত্রে

খননের ফলে মৌর্যযুগের স্তরে এই মূর্তি পাওয়া গেছে। পাটনায় খননের ফলে মৌর্যযুগের বা অব্যবহিত পূর্ব যুগের কিছু সুন্দর পোড়ামাটি মূর্তি মিলেছে। এগুলি কিছু হাতে গড়া ; কিছু ছাঁচে গড়া এবং সুন্দর ও প্রাণবন্ত। দাক্ষিণাত্যের মাস্কি থেকে পোড়ামাটি মূর্তি পাওয়া গেছে। তক্ষশীলা থেকে বাংলার চন্দ্রকেতু গড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শুঙ্গ, কাণ্ব ও আন্ধ্রযুগের (খৃ পূ ২ শতক থেকে খৃ ১-শতক) বহু নর-নারীর মিলন মূর্তি পাওয়া গেছে। পূর্ণাবয়ব মূর্তি ও ফলক দুইই আছে। ক্ষুদ্র ফলকগুলির কারুকার্য বিস্ময়কর। নারীমূর্তিগুলি লৌকিক যক্ষিণী দেবী মূর্তি। নগ্ন বা সূক্ষ্ম বেশ পরিহিত দৃশ্যত নগ্ন নারীমূর্তিগুলি মনে হয় প্রজনন শক্তির দেবী। এ ছাড়া শকুন্তলা কাহিনী, উদয়ন কাহিনী, ফলকও পাওয়া যায়। এই যুগের কিছু কিছু মূর্তিতে বিদেশী প্রভাব রয়েছে। বসর বা প্রাচীন বৈশালীর ধ্বংসাবশেষে এই রকম মূর্তি পাওয়া যায়। তমলুকে পাওয়া ডানাওলা নারীমূর্তি পশ্চিম এসিয়ার প্রভাব জাত। তক্ষশীলার মূর্তিতে গান্ধার ছাপ রয়েছে। অবশ্য এই বিদেশী প্রভাব ব্যতিক্রম মাত্র ; ভারতীয় শৈলীই সর্বত্র ও সর্বটাই।

কুষাণ যুগে (খৃ ২-৩ শতকে) বহু অবয়বহীন বিজাতীয় আকৃতির মস্তক পাওয়া যায়। বিদেশীদের অনুকৃতি মনে হয়। কিছু পূর্ণাবয়ব মূর্তি, অশ্বারোহী, গায়ক, বাদক ইত্যাদি মূর্তিও পাওয়া গেছে। ভারতে আগত পহ্লব, রোমান ইত্যাদিদের মূর্তি শিল্পী গড়তে চেষ্টা করেছিল মনে হয়। কুষাণ যুগের শিল্পকর্ম পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় হীন। নাগার্জুন কোণ্ডায় এই যুগের কিছু উৎকৃষ্ট মূর্তি এবং রাজস্থানের সুরতগড়ে কিছু গান্ধারী রীতির মূর্তি পাওয়া গেছে। গুপ্তযুগে (৪-৭ শতক) গৃহ-মন্দির ইত্যাদির অলঙ্করণে ও সামাজিক উৎসবে ইত্যাদিতে প্রচুর পোড়ামাটির জিনিস ব্যবহৃত হয়। কাশিয়ার বুদ্ধমূর্তি ও অহিচ্ছত্রের গঙ্গাযমুনা মূর্তি পূর্ণবয়স্ক ও বৃহদাকার মূর্তি। উত্তর প্রদেশে ভিতরগাঁও, সাহেটমাহেট, বাঙলার মহাস্থান গড়, সিন্ধুর মীরপুরখাসের ও সৌরাষ্ট্রের দেবীনোমোরিতে মাঝামাঝি পরিমাণের উৎকৃষ্ট মূর্তি পাওয়া গেছে। ছোট আকারের মূর্তি নানা জায়গায় অজস্র পাওয়া গেছে। বারাণসীতে রাজঘাটে প্রাপ্ত মন্দিরগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গুপ্তপূর্ব যুগের মূর্তিগুলি লৌকিক উপাস্য যক্ষযক্ষিণীর মূর্তি। গুপ্ত যুগের মূর্তিগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর। সাধারণ নরনারীর মূর্তিও পাওয়া যায়। এগুলি পরিমার্জিত রুচির মূর্তি। নগ্ন ও দৃশ্যত নগ্ন নারীমূর্তি গুপ্ত যুগে নাই। খৃ-৪ শতক থেকে গ্রীকো-রোমান প্রভাব ক্ষীয়মান ; ভারতীয় প্রভাব ক্রমশ বেশি। কাশ্মীরে উস্কুর অঞ্চলে খৃ-৮ শতকের মূর্তিগুলি উন্নত মানের ও স্পষ্ট গান্ধার রীতির প্রভাব যুক্ত। দেবীনোমোরি ও সিন্ধুর মীরপুরখাসের মূর্তিগুলিতেও গান্ধার রীতির ছাপ রয়েছে।

পৌরব—পুরু বংশ। যযাতির ছেলে পুরু (দ্রঃ)। (২) বিশ্বামিত্রের এক ব্রহ্মবাদী ছেলে। (৩) দৈত্য, শরভের বংশে জন্ম। কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন ; অর্জুনের হাতে মারা যান।

পৌণ্ড্র—(১) নন্দিনীর পুচ্ছ থেকে জাত বর্বর জাতি। (২) মহাভারতে একটি দেশ। এই দেশের রাজা ও অধিবাসী। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এরা এসেছিলেন। কুরু-

ক্ষেত্রে এঁরা পাণ্ডব দলে ছিলেন। কৃষ্ণ ও কর্ণ বিভিন্ন কারণে পৃথক ভাবে এই দেশ জয় করেন। পৌণ্ড্ররা ক্ষত্রিয় ছিলেন, ব্রাহ্মণদের শাপে শূদ্রে পরিণত হন। (৩) ভীষ্মের শঙ্খ।

পৌণ্ড্রক—(১) নিকুম্ভের ছেলে। লঙ্কাতে রামের হাতে মৃত্যু। (২) কারুষ দেশের রাজা; অপর নাম পৌণ্ড্র বাসুদেব। ইনি এক বার দ্বারকাতে কৃষ্ণের কাছে দূত পাঠিয়ে বলেন তিনিই প্রকৃত বাসুদেব; কৃষ্ণ যেন তাঁর কাছে এসে আরাধনা করেন। কৃষ্ণ এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে একে আক্রমণ করে নিহত করেন।

পৌরবী—(১) বাসুদেবের এক স্ত্রী। যুধিষ্ঠিরের এক স্ত্রী; ছেলে দেবক (ভাগব)।

পৌরুষেয়—সূর্যের রথে জ্যৈষ্ঠমাসে যে রাক্ষস থাকেন।

পৌলস্ত্য—পুলস্ত্যের ছেলে বা নাতি। কুবের, রাবণ ইত্যাদি। দ্রঃ বিশ্রবা।

পৌলস্ত্যনী—পুলস্ত্যের নাতনি; শূর্পণখা, কুম্ভীনসী (দ্রঃ) ইত্যাদি।

পৌলমী—পুলোমার সন্তান। বিখ্যাত দৈত্য। কশ্যপ ঔরসে জন্ম। সংখ্যায় ৬০,০০০। অর্জুনের হাতে এঁরা মারা যান।

পৌষ্টি—পুরু রাজার স্ত্রী; অপর নাম কৌশল্যা। মহা ১।৮৯।৫ আছে এদের মধ্যে প্রবীর বংশকৃৎ এবং প্রবীরের ছেলে মনস্যু। আবার মহা ১।৯০।১১ শ্লোকে রয়েছে পুরুর স্ত্রী কৌশল্যা; ছেলে জনমেজয়।

পৌষ্য—জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা। এই পৌষ্য ও অভিমন্যুর নাতি জনমেজয় বেদের শিষ্য; উত্তঙ্কের গুরুভাই (মহা ১।৩।৮৫)। উত্তঙ্ক (দ্রঃ) পৌষ্যের স্ত্রীর কাছে কর্ণকুণ্ডল নিতে আসেন।

প্রকৃতি—চেতনহীন বস্তু। পুরুষ (দ্রঃ) হচ্ছেন চৈতন্য। প্রকৃতি শব্দের তিনটি অর্থ:- প্র-অর্থে আগে; কৃতি অর্থে সৃষ্টি অর্থাৎ সৃষ্টির আগে যা ছিল। প্র অর্থে প্রধান, কৃতি অর্থে সৃষ্টি অর্থাৎ সৃষ্টির জন্য যা মূল প্রয়োজন। প্র অর্থে সত্ত্ব, কৃ অর্থে রাজসিক, তি অর্থে মানসিক—অর্থাৎ তিনটি গুণযুক্ত। প্রকৃতি ও পুরুষ সৃষ্টির প্রথমে এক সঙ্গে মিলিত হয়ে পরমপুরুষে অবস্থিত ছিলেন। তার পর সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিলে প্রকৃতি (বাম অংশ) এবং পুরুষ (দক্ষিণ অংশ) হিসাবে পরম পুরুষ ভাগ হয়ে যান। এই প্রকৃতি থেকে পরে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী, ও রাধার সৃষ্টি হয়।

প্রচেতা—(১) বৈদিক যুগে এক জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। দুঃস্বপ্ন ও অমঙ্গল নাশের জন্য কয়েকটি ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। (২) পৃথু বংশে প্রাচীন-বর্হিস-এর (দ্রঃ) স্ত্রী সমুদ্র কন্যা সবর্ণার ১০-টি ছেলে। এঁদের সকলের নামই প্রচেতা। এঁরা ১০-হাজার বছর সমুদ্রের জলে শুয়ে বিষ্ণুর তপস্যা করেছিলেন। এই তপস্যার ফলে এঁরা মানুষদের সৃষ্টিকর্তা হন। মহর্ষি কণ্ডুর মেয়ে মারিষা এঁদের স্ত্রী; মারিষার গর্ভে দক্ষ প্রজাপতির জন্ম।

প্রজা—মনুর সন্তান।

প্রজাপতি—বেদে ইন্দ্র, সাবিত্রী, হোম, হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদিকে বলা হয়। প্রজাদের এঁরা সৃষ্টি ও রক্ষা করেন। মনুতে ব্রহ্মা প্রজাপতি; কারণ ইনি প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা। ব্রহ্মার পুত্র হিসাবে স্বায়ম্ভুব মনুও প্রজাপতি। মনু ১০-জন ঋষির সৃষ্টিকর্তা, এঁরা দশ জন অন্য মতে ব্রহ্মার মানস পুত্র (দ্রঃ)। প্রজাপতি ষোল জন:- কর্দম, বিকৃত, শেষ, সংশর্য, স্থাণু,

মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরস, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান, অরিষ্টনেমি, কশ্যপ। অন্য মতে ব্রহ্মা প্রথমে ২১ জন প্রজাপতি সৃষ্টি করেন এবং এঁরা অন্য সব কিছু সৃষ্টি করেন :- ব্রহ্মা, রুদ্র, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম, তপ, যম, মরীচি, অঙ্গিরস, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পরমেষ্টি, সূর্য, চন্দ্র, কর্দম, ক্রোধ, বিক্রীত।

প্রজ্ঞা পারমিতা—দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা এই ছয়টি পারমিতা বোধিসত্ত্বের অবশ্য কর্তব্য। অন্যান্য পারমিতা ও বিভিন্ন বৌদ্ধচর্যার সম্যক অনুশীলনে প্রজ্ঞাপারমিতা লাভ হয়। মহাযানী বৌদ্ধদের 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র' গ্রন্থের বিষয়বস্তু এই প্রজ্ঞাপারমিতা। এখানে উল্লিখিত আছে ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্য সুভূতি, সারিপুত্র, পূর্ণ মৈত্রায়ণী-পুত্র ও দেবরাজ শক্র প্রভৃতির সঙ্গে কথোপকথনে প্রজ্ঞাপারমিতা ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেন। প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র নামে বিভিন্ন আকারের বহু গ্রন্থ পাওয়া যায়। চীনা ভাষায় ১৫৯ খৃষ্টাব্দে একটি প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের অনুবাদ হয়।

প্রণিধি—পাঞ্চজন্য অগ্নির একটি ছেলে।

প্রণীত—কোন মহাপুরুষের ঔরসে নিজের স্ত্রীর গর্ভে ক্ষেত্রজ সন্তান।

প্রতর্দন—(১) চন্দ্রবংশীয় রাজা, মদালসার স্বামী, অলর্কের পিতা। (২) কাশীরাজ দিবোদাস ও মাধবীর (দ্রঃ) ছেলে। যযাতির নাতি। রাজা বীতহব্য দিবোদাসের বংশ বিনষ্ট করলে ভৃগুর সাহায্যে যজ্ঞ করে দিবোদাসের এই ছেলে হয়। ভরদ্বাজের যোগ বলে প্রতর্দন পরাক্রান্ত হয়ে উঠলে রাজা এঁকে যুবরাজ করে দেন। পিতার আজ্ঞায় প্রতর্দন এর পর বীতহব্যের একশ ছেলেকে বিনাশ করেন। বীতহব্য তখন পালিয়ে গিয়ে ভৃগুর শরণ নিলে ভৃগু বীতহব্যকে ক্ষমা করতে বলেন। কিন্তু প্রতর্দন সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বলেন বীতহব্যকে তিনি বধ করে পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হতে চান। ভৃগু বীতহব্যকে ব্রাহ্মণ করে দিয়ে জানান তাঁর আশ্রমে কোন ক্ষত্রিয় নাই। ক্ষত্রিয় বীতহব্য জাতি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন জেনে প্রতর্দন খুসি হয়ে চলে যান। রাজা শিবি প্রতর্দনকে একটি তরবারি দিয়েছিলেন। নিজের একটি চোখ প্রতর্দন ব্রাহ্মণদের দান করেন।

প্রতাপী—চ্যবনের ছেলে প্রমতির স্ত্রী। প্রতাপীর ছেলে রুরু।

প্রতিবিন্ধ্য—যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর ছেলে। বিশ্বদেবের অংশে জন্ম। রাত্রিবেলা অশ্বত্থামার গোপন আক্রমণে নিহত।

প্রতিভানু—সত্যভামা কৃষ্ণের ছেলে।

প্রতিষ্ঠান পুর—প্রয়াগ (দ্রঃ)। বর্তমান নাম ঝুসি। যযাতি এখানে রাজা ছিলেন।

প্রতীচী—পুলস্ত্য মহর্ষির স্ত্রী। অপর স্ত্রী সন্ধ্যা (মহা ৫।১১৫।১১)

প্রতীত—এক জন বিশ্বদেব।

প্রতীপ—চন্দ্রবংশে ; পিতা ভীমসেন, পিতামহ পরিক্ষিৎ। গঙ্গাতীরে এক দিন জপ/সূর্যপূজা করছিলেন এমন সময় গঙ্গা একটি সুন্দরী মেয়েছেলের বেশে জল থেকে উঠে এসে প্রতীপের ডান উরুতে বসেন ; এবং বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উরুতে বসেছিলেন বলে গঙ্গার নাম হয় উর্বশী। কিন্তু প্রতীপ জানান ডান উরুতে বসার জন্য গঙ্গা তাঁর কন্যা বা পুত্রবধূর স্থান পেতে পারেন। গঙ্গা সম্মত হন কিন্তু রাজাকে দিয়ে সর্ত করিয়ে নেন যে প্রতীপের ছেলে যেন গঙ্গাকে কোন কাজে বাধা না দেন।

অন্য মতে সর্ত হয়েছিল সরাসরি শান্তনুর সঙ্গে। প্রতীপের ছেলে শান্তনু; এই ছেলে বড় হলে প্রতীপ সমস্ত ঘটনা জানিয়ে, অর্থাৎ ভাবী স্ত্রীকে কোন কাজে যেন বাধা না দেওয়া হয়, ছেলেকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

প্রস্তনাশ্ম যুগ—প্যালিয়োলিথিক যুগ।

প্রদাতা—এক জন বিশ্বদেব।

প্রদোষ—ধ্রুবের ছেলে পুষ্পার্ণ। পুষ্পার্ণের স্ত্রী প্রভা, ছেলে প্রদোষ, নিশীথ ও ব্যুষ্ট।

প্রদ্বেষী—দীর্ঘতমার (দ্রঃ) স্ত্রী; সন্তান গৌতমাদি।

প্রদ্যুম্ন—মদন ভস্মের পর রতি মহাদেবের শরণাপন্ন হলে মহাদেব বর দেন কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন নামে মদন জন্ম নেবেন। রতি জন্মাবেন মায়াবতী রূপে। অন্য মতে রতি তপস্যা করতে থাকেন এবং দেবী দেখা দিয়ে বর দেন। দেবতারা অসুর রাজ শম্বরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। এই প্রদ্যুম্নের হাতে তাঁর মৃত্যু হবে। ফলে শম্বররাজ খবর রাখছিলেন। রুক্মিণীর সন্তান হয় নি। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে নিয়ে কৈলাসে আসেন। পথে নরনারায়ণের আশ্রমে প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। কৈলাসে মহাদেব বর দেন ভস্মীভূত কামদেব তাদের সন্তান হয়ে জন্মাবেন। এঁরা ফিরে আসেন; যথা সময়ে প্রদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করেন। শম্বর সূতিকা গৃহ থেকেই ৬-দিনের দিন শিশুকে চুরি করে সাগরে ফেলে দেন। একটি মাছ শিশুকে খেয়ে ফেলে এবং মাছটি ধরা পড়লে জেলেরা মাছটি শম্বরকে উপহার দেয়। মায়াবতী একটি মতে শম্বরের পাকশালাতে দাসীরূপে থাকতেন। অন্য মতে মায়াবতী (রতি) শম্বরের স্ত্রী ছিলেন। মাছটি কাটা হয় অন্য মতে মায়াবতী নিজেই মাছটি কাটেন এবং ছেলেটিকে পেয়ে নিজের ছেলের মত পালন করেন। অন্য মতে মায়াবতী শিশুকে চিনতে পেরে পালন করেন। বা প্রদ্যুম্ন বড় হয়ে উঠতে থাকে; এবং নারদ এসে মায়াবতীকে অতীত ঘটনা ইত্যাদি সব কিছু বলে যান। মায়াবতী তখন যুবক প্রদ্যুম্নকে সব কথা জানিয়ে প্রণয় ভিক্ষা করেন। একটি মতে নারদ দু জনকেই অতীত ঘটনা সব বলে গিয়েছিলেন। কলাবতী, শম্বরকে নিহত করে, বিয়ে করে দ্বারকায় ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করেন এবং শম্বরের সমস্ত মায়াবিদ্যা ইত্যাদি প্রদ্যুম্নকে শিখিয়ে দেন। ১৬ বছর বয়সে গন্ধর্ব মতে একে বিয়ে করেন। এর পর প্রদ্যুম্ন শম্বরের ধ্বজদণ্ড শর সন্ধানে ভেঙে দেন; ফলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথমে শম্বরের ছেলেরা নিহত হন। তার পর শম্বর যুদ্ধ করেন এবং সম্মুখ যুদ্ধে কিছু করতে না পেরে মায়া যুদ্ধ করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিহত হন। প্রদ্যুম্ন ও মায়াবতী তার পর দ্বারকাতে ফিরে আসেন এবং রুক্মিণীও কৃষ্ণকে সমস্ত ঘটনা জানান। দ্বারকাতে ফিরে এলে নাম হয় প্রদ্যুম্ন। প্রদ্যুম্নের দ্বিতীয়া স্ত্রী তাঁর নিজের মামাতো বোন কুমুদ্বতী। কুমুদ্বতীর ছেলে অনিরুদ্ধ। প্রদ্যুম্নের মেয়ে তৃষ্ণা। তৃতীয়া স্ত্রী বজ্রনাভের (দ্রঃ) মেয়ে প্রভাবতী।

সৌভপতি শাম্বের সঙ্গে তীব্র যুদ্ধ করেছিলেন দ্বারকাতে। বীরযোদ্ধা ছিলেন; কৃষ্ণের সঙ্গে বহু যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। যদুবংশ ধ্বংসের সময়ে মারা যান। একটি মতে সনৎকুমারের অংশে প্রদ্যুম্নের জন্ম; মৃত্যুর পর সনৎকুমারে গিয়ে মিশে যান।

প্রধা—বা প্রাবা (মহা ১।৫৯।৪৬); কশ্যপের স্ত্রী। অলম্বুষা, অসুরা ইত্যাদি আট মেয়ে।

প্রবর—প্রাচীন পূর্বপুরুষ ঋষিদের নামের তালিকা। অতি প্রাচীন তালিকা বৈদিক যুগেও এগুলি প্রচলিত ছিল। প্রবরে এক, দুই, তিন বা পাঁচজন ঋষির নাম থাকতে পারে। যেমন কশ্যপ গোত্রের প্রবর হচ্ছে কাশ্যপ, আবৎসার, নৈধ্রুব। বাসিষ্ঠ, আত্রি, জাতুকর্ণ্য, এবং বাসিষ্ঠ, শাক্ত্য, পারাশর্য এই দুই প্রবর থেকে দেখা যায় এই দুই বংশই বশিষ্ঠের বংশ। দুটি প্রবরে একই নাম থাকলে সমান প্রবর হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ একই পূর্ব পুরুষ। দ্রঃ গোত্র।

প্রবসু—রাজা ঈলিন ও স্ত্রী রথান্তরীর ছেলে প্রবসু, দুষ্মন্ত (দ্রঃ), শূর, ভীম ও বসু।

প্রবাহন—পাঞ্চাল দেশের রাজা; উদ্দালকের সমসাময়িক। প্রসিদ্ধ দার্শনিক। এঁর বিতর্ক সভায় শ্বেতকেতু আসেন; কিন্তু রাজার পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। শ্বেতকেতু লজ্জিত হয়ে ফিরে গিয়ে পিতা উদ্দালককে প্রশ্নগুলির জবাব চান। উদ্দালকও দিতে পারেন না। তখন পিতাপুত্রে রাজার কাছে এসে জ্ঞান লাভ করেন।

প্রবীর—(১) মাহিষ্মতী রাজা। নীলধ্বজের ঔরসে জনার (দ্রঃ) গর্ভে জন্ম একটি ছেলে। (২) পুরু ও পৌষ্টির (দ্রঃ) ছেলে ঈশ্বর, রৌদ্রাশ্ব ও প্রবীর। প্রবীর ও শূরসেনীর ছেলে মনস্যু। প্রবীর তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। (৩) চণ্ডাল বেশী মহাদেব; এই চণ্ডালের কাছে রাজা হরিশ্চন্দ্র নিজেকে বিক্রয় করেন।

প্রভদ্রক—পাঞ্চালরাজের একটি সেনাবাহিনী; ক্ষত্রিয়দের দ্বারা গঠিত। বাহিনীর নেতা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী। প্রভদ্রক সৈন্যের কিছু মারা যায় শল্যের হাতে বাকি মারা যায় অশ্বত্থামার শিবির আক্রমণে।

প্রভা—(১) একজন অপ্সরা। (২) দানব স্বর্ভাণুর মেয়ে, আয়ুসের স্ত্রী; নহুষ ইত্যাদির মা। দ্রঃ প্রদোষ।

প্রভাকর—(১) অত্রি বংশে একটি মুনি। ঘৃতাচী রুদ্রাশ্বের (ভদ্রাশ্ব-পুরুবংশ) দশটি মেয়ে রুদ্রা, শূদ্রা, মলদা, ভদ্রা, মলহা, খলদা, বলদা, সুরমা, গোচপলা, স্ত্রীরত্নকূটা—এঁদের বিয়ে করেন। এক বার সূর্যগ্রহণের সময় প্রভাকর স্বস্তি বলে সূর্যকে রাহু মুক্ত করলে নাম হয় প্রভাকর। এক বার যজ্ঞ করলে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে দশটি ছেলে ও প্রচুর অর্থ দিয়ে যান। (২) কশ্যপ বংশে একটি সাপ।

প্রভাতা—দুই (মহা ১।৬০।১৮) ছেলে প্রত্যুষ ও প্রভাস (দ্রঃ)।

প্রভানু—সত্যভামা কৃষ্ণের ছেলে।

প্রভাবতী—(১) অঙ্গরাজ চিত্র-রথের স্ত্রী (মহা ১৩।৪২।৮)। প্রভাবতীর ছোট বোন রুচি, দেবশর্মার স্ত্রী। (২) বজ্রনাভের (দ্রঃ) মেয়ে; প্রদ্যুম্নের স্ত্রী। প্রদ্যুম্ন নটের বেশে বজ্রনাভের (দ্রঃ) রাজধানীতে এলে প্রভাবতীর সখী সূচীমুখী গভীর রাত্রিতে প্রদ্যুম্ন ও প্রভাবতীর মিলনের ব্যবস্থা করে দেন; সারা রাত এরা উপভোগ করতে থাকেন। একটি মতে প্রভাবতীই চন্দ্রাবতী ও গুণবতীর (দ্রঃ) জন্য স্বামী নির্বাচন করে দিয়েছিলেন। প্রতি দিন রাত্রে এদের গোপন মিলন চলতে থাকে। কিছু দিন এই ভাবে চলার পর প্রদ্যুম্ন যুদ্ধ করতে বাধ্য হন এবং বজ্রনাভ (দ্রঃ) নিহত হন।

প্রভাস—ধর্মদেব ও স্ত্রী প্রভাতার (দ্রঃ) ছেলে এক জন বসু; স্ত্রী বৃহস্পতির বোন যোগসিদ্ধা। প্রভাসের ছেলে বিশ্বকর্মা।

প্রভাস—২১°৪´ উ এবং ৭০°২৬´ পূ। গুজরাটে জুনাগড় জেলাতে সমুদ্র তীরে।

কাথিয়াড়ের সমুদ্র উপকূলে বর্তমানে প্রভাস তীর্থ/সোমতীর্থ। প্রাচীন কালে একটি বৃহৎ বন্দর। প্রভাসপত্তন বা সোমনাথ হিন্দু ও জৈন উভয় সম্প্রদায়েরই তীর্থস্থান। বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির এইখানে অবস্থিত। দক্ষের জামাতা চন্দ্র (দ্রঃ) দক্ষের শাপে ক্ষয় রোগাক্রান্ত হলে দেবতারা দক্ষকে অনুরোধ করেন ক্ষমা করার জন্য। দক্ষ তখন নির্দেশ দেন এবং চন্দ্র এখানে মহাদেবের তপস্যা করে লুপ্ত প্রভা ফিরে পান এবং অমাবস্যায় ঐ তীর্থে স্নান করে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকেন। চন্দ্র এখানে প্রভা লাভ করেছিলেন বলে নাম প্রভাস। অন্য নাম সোমতীর্থ। এইখানে যদু বংশ ধ্বংস হয় কৃষ্ণ ও বলরামও এইখানে দেহত্যাগ করেন। সোমনাথ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম।

মার্কোপোলোর বিবরণীতে এই বন্দরের উল্লেখ আছে। প্রথম মন্দিরের নির্মাণ বা ধ্বংসের কথা কিছুই জানা যায় না। দ্বিতীয় মন্দির তৈরি করেন বল্লভী রাজবংশ খৃ-৭ ম শতকে; ধ্বংস হয় ৭২৫ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুর আরব শাসন কর্তার হাতে। তৃতীয় মন্দির তৈরি হয় ৮ শতকে এবং নষ্ট হয় ১০২৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান মামুদের হাতে। ৪র্থ মন্দিরটি ১০৩০ খৃষ্টাব্দের গুজরাটের ভীমদেব ও মালবের ভোজরাজা মিলিত ভাবে নির্মাণ করেন এবং এটি সারান ও পুনর্নির্মিত হয় ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে কুমারপালের দ্বারা। ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজি এটিকে ধ্বংস করেন। ৫-ম মন্দিরটি নির্মাণ আরম্ভ করেন রাজা মহীপাল দেব এবং নির্মাণ শেষ করে তাঁর ছেলে খঙ্গর মোটামুটি সময় ১৩৫১ খৃষ্টাব্দের আগে। ১৩৯৪ সালে গুজরাট শাসক মুজফ্ফর খান আবার মন্দিরটি ধ্বংস করে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। অহল্যাবাই পরে এখানে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ৬-ষ্ঠ মন্দিরটি নির্মিত করেছেন, স্বর্গীয় বল্লভভাই প্যাটেলের আগ্রহে, ভারত সরকার।

কৃষ্ণ যেখানে দেহত্যাগ করেছিলেন সেই স্থানটি ভাল্কা তীর্থ নামে পরিচিত। সরস্বতী, কপিলা, ও হিরণ্য এই তিন নদীর সঙ্গমে (=প্রাচী সঙ্গম) রুদ্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির রয়েছে।

প্রমগন্দ—জনৈক কীকটরাজ (ঋক্)।

প্রমতি—প্রমিতি। চ্যবন ও স্ত্রী সুকন্যার ছেলে। স্ত্রী ঘৃতাচী/প্রতাপী: প্রমতির ছেলে রুরু (মহা ১।৫।৭)। অন্য মতে বীতহব্যের ছেলে গৃৎসমদ্। গৃৎসমদ্ বংশে (মহা ১৩।৩১।৬০) বাগিন্দ্রের ছেলে।

প্রমথ—শিবের পারিষদ ও অনুচর বর্গ। এঁরা মায়াবী, নৃত্যগীত বিশারদ ও নানা রূপধারী। কালিকা পুরাণ মতে মহাদেবের মুখের ফেনা থেকে জন্ম। প্রমথদের নানা দল; এক দল ভোগহীন, এক দল ধ্যানী যোগী, এক দল কামুক এবং মহাদেবের ক্রীড়া বিষয়ে সহচর; এক দল যুদ্ধে শত্রুদমন কারী; এক দল রুদ্র নামে মহাদেবের আদেশে স্বর্গে বাস করেন ও সেবাব্রতী।

প্রমদ—বশিষ্ঠের এক ছেলে। উত্তম মন্বন্তরে একজন সপ্তর্ষি।

প্রমদ্বরা—গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু ও মেনকার মেয়ে। জন্মের পর মেয়েকে ফেলে দিয়ে মেনকা চলে যান। মহর্ষি স্থূলকেশ নিয়ে এসে পালন করেন। প্রমদাভ্যঃ বরা বলে নাম হয় প্রমদ্বরা (মহা ১।৮।১০) প্রমতির ছেলে রুরু মৃগয়াতে এসে এঁকে দেখে মুগ্ধ হন

এবং প্রমতি বিয়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বিয়ের আগে খেলা করতে করতেএক ঘুমন্ত সাপকে মাড়িয়ে ফেললে সাপের কামড়ে প্রমদ্বরা মারা যান। রুরু শোকার্ত হয়ে পড়েন এবং বলেন এত দিন যদি ঠিক মত তিনি তপস্যা ও ধর্মকর্ম করে থাকেন তাহলে প্রমদ্বরা জীবিত হবে। দেবতারা তখন সদয় হয়ে জানান মেয়েটির আয়ু ছিল না বলেই মারা গেছে ; কেউ যদি আয়ু দিতে পারে তাহলেই ও আবার বেঁচে উঠবে। রুরু নিজের অর্দ্ধেক আয়ু দিতে রাজি হন। বিশ্বাবসু যমকে এ কথা জানালে প্রমদ্বরা বেঁচে ওঠেন এবং বিয়ে হয়। দ্রঃ রুরু।

প্রমাজ্ঞান—প্রকৃত জ্ঞান। দু রকমঃ-প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। দ্রঃ প্রমাণ।

প্রমাণ—যার দ্বারা প্রমা অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান জন্মায়। প্রমাণ ব্যতীত জ্ঞানের যাথার্থ্য নিরূপিত হয় না। ভারতীয় ন্যায়ে এই প্রমাণ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। প্রমেয় বস্তু বিভিন্ন ফলে প্রমাণ ও বিভিন্ন হতে বাধ্য। চার্বাক ও লোকায়ত মতে এক মাত্র প্রমাণ প্রত্যক্ষ। বৈশেষিক ও বৌদ্ধ দর্শনে প্রমাণ দুটি, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। কোন কোন বৈশেষিক মতে শব্দও একটি প্রমাণ। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও রামানুজ মতে প্রমাণ তিন রকম :-প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। মীমাংসকদের মতে :-প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। ন্যায় (প্রাচীন ও নব্য) মতে :- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ। ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিক মতে ন্যায়ের এই চারটি প্রমাণ ছাড়াও অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব, ঐতিহ্য ও অভাব আরো-৫টি প্রমাণ রয়েছে।

প্রমাথ—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। (২) খরদূষণের এক মন্ত্রী।

প্রমাথী—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে নিহত। (২) ঘটোৎকচের এক বন্ধু রাক্ষস, দুর্যোধনের হাতে নিহত। (৩) রাবণের এক অনুচর।

প্রমীলা—(১) ইন্দ্রজিতের স্ত্রী ; কালনেমির মেয়ে। (২) এক নারী রাজ্যের অধিনায়ক। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের ঘোড়া এখানে এলে এঁর কথাতে ঘোড়া আটকান হয়। অর্জুন ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত হন। শেষ পর্যন্ত প্রমীলাকে বিয়ে করতে রাজি হলে অন্য মতে দৈববাণী অনুসারে ঘোড়া ফিরে পান।

প্রমোদ—(১) ব্রহ্মার এক মানস পুত্র ; কণ্ঠ থেকে জন্ম। (২) ঐরাবত বংশে একটি সাপ ; সর্পযজ্ঞে নিহত (মহা ১।৫২।১০)।

প্রমোহিনী—এক জন গন্ধর্ব কন্যা ; শুকসংগীতির মেয়ে। এঁর সখী সুশীলা (সুশীলার মেয়ে), সুস্বরা (স্বরবেদীর মেয়ে), চন্দ্রিকা (চন্দ্রকার মেয়ে), সুতারা (সুপ্রভার মেয়ে)। এই পাঁচটি মেয়ে বসন্ত কালে এক দিন অচ্ছোদ সরেবেরে স্নান করতে আসেন এবং স্নান করে এখানে মাটি দিয়েঅম্বিকার মূর্তি তৈরি করে কুঙ্কুম ও চন্দন মাখিয়ে নিজে-দের গয়না পরিয়ে পূজা করতে থাকেন। এই সময় বেদনিধি মুনির বড় ছেলে স্নান করতে আসেন। এঁরা পাঁচ জন এঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান এবং বিয়ে করবেন বলে এগিয়ে আসেন। মুনি কুমার এদের আচরণে ভীত হয়ে পালিয়ে যান। পাঁচটি গন্ধর্ব কন্যা বাড়িফিরে এসে বিরহে কাতর হয়ে কোন মতে সেই দিন ও রাত কাটান। পর দিন সকাল হতে আবার পাঁচ জনে অচ্ছোদ সরোবরে আসেন ; মুনি কুমারও আসেন। এই দিন মুনি কুমারকে এরা ঘিরে ধরে বিয়ের জন্য অনুরোধ করেন।

মুনি বালক প্রথমে বোঝাতে চান এবং শেষ পর্যন্ত এদের রাক্ষসী হবার শাপ দেন। এরাও পাল্টা শাপ দিয়ে এঁকে রাক্ষসে পরিণত করেন। সকলে মিলে রাক্ষসে পরিণত হয়ে বনে বাস করতে থাকেন। বহু দিন পরে লোমশ মুনি এখানে আসেন। দৃপ্ত তেজ মুনির সামনে এক মাত্র রাক্ষসে পরিণত মুনি কুমার এগিয়ে এসে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। মুনির করুণা হয়; এদের নর্মদার তীরে নিয়ে আসেন। বাতাসে নর্মদার জলের কণা উড়ে এসে এদের গায়ে লাগলে এরা আবার পূর্বের চেহারা ফিরে পান। লোমশ মুনি তখন মুনি বালককে এঁদের বিয়ে করতে বলেন এবং নর্মদার তীরে বাস করতে বলেন।

প্রমৃত—দ্রঃ অমৃত।

প্রম্লোচা—একটি অপ্সরা। ইন্দ্র এঁকে কণ্ডু (দ্রঃ) মুনির তপস্যা নষ্ট করতে পাঠান। প্রম্লোচার গর্ভ ফোঁটা ফোঁটা ঘামের মত গাছে গাছে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। গাছেরা এই গর্ভ বিন্দুগুলি গ্রহণ করে; এবং বায়ু এগুলি একত্র করে দেন ফলে মারিষা নামে একটি মেয়ে মূর্তি পায়। বৃক্ষদের রাজা সোম এই মেয়েকে পালন করেন। প্রচেতারা দশ ভাই একে বিয়ে করেন। প্রম্লোচার আর এক মেয়ে মনোরমা।

প্রয়াগ—বর্তমানে নাম এলাহাবাদ। আর্যদের প্রথম দিকের একটি উল্লেখযোগ্য উপনিবেশ। পুরাণে বহু উল্লেখ আছে। অশোকের (২৭৩-২৩২ খৃ পূ) সময় থেকে বিশেষ প্রসিদ্ধ। সমুদ্রগুপ্তের (৩২০-৩৮০ খৃ) অধীন ছিল। হিউ-এন্-ৎসাঙ বলেছেন পূর্বপুরুষদের ন্যায় হর্ষবর্দ্ধনও প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সঞ্চিত সমস্ত ধনরত্ন এখানে দান করতেন। হিউ-এন-ৎসাঙের সময় হীনযান বৌদ্ধধর্মের বিশেষ কেন্দ্র ছিল।

গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী এখানে মিলিত হয়েছে; অপর নাম ত্রিবেণী। প্রতি ১২ বৎসর অন্তর এখানে কুম্ভমেলা ও ৬ বৎসর অন্তর অর্ধকুম্ভ মেলা এবং প্রতি মাঘ মাসে মাঘমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে অক্ষয়বট সংলগ্ন ভূগর্ভস্থিত ব্রাহ্মণ্য মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। আকবরের নির্মিত দুর্গের মধ্যে অশোক স্তম্ভ রয়েছে। গঙ্গার অপর তীরে ঝুসি সহর পুরাণে কেশী বা প্রতিষ্ঠান পুর।

প্রলম্ব—এক জন অসুর, কংসের আশ্রিত। কৃষ্ণ বলরাম ও গোপাল বালকরা এক দিন ভাণ্ডীর নামে এক বটগাছের নীচে খেলা করছিলেন। প্রলম্ব গোপ বেশে এসে হাজির হন। কৃষ্ণ বুঝতে পেরে গোপদের সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ খেলা আরম্ভ করেন এবং বাজি থাকে হারলে বিজয়ীকে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। বলরামের সঙ্গে হেরে গিয়ে প্রলম্ব বলরামকে কাঁধে নিয়ে ঘুরতে থাকেন এবং সুযোগ খুঁজতে থাকেন একটু দূরে গিয়ে বলরামকে বধ করবেন। শেষ পর্যন্ত আকাশে উঠে পালাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বলরাম বুঝতে পেরে এমন ভারী হয়ে ওঠেন যে প্রলম্ব সহ্য করতে না পেরে নিজের মূর্তি ধরে বলরামকে আক্রমণ করেন ও বলরামের হাতে নিহত হন।

প্রলয়—(১) পুরাণে চার রকম প্রলয় :- নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক। বস্তুর প্রাত্যহিক প্রলয়কে নিত্য প্রলয় বলা হয়। সুষুপ্তিকেও নিত্য প্রলয় রূপে গণ্য করা হয়। নৈমিত্তিক প্রলয়ের অপর নাম ব্রহ্মা প্রলয়। কল্পের শেষে, ব্রহ্মার এক দিবা ভাগের (=সহস্র চতুর্যুগের) শেষে ত্রিলোকের বিনাশকে নৈমিত্তিক বা খণ্ড প্রলয় বলা

হয়। এই প্রলয়ের সময় প্রজাপতি ত্রিলোককে কুক্ষিগত করেন। এই সময় বিষ্ণু সূর্যের সপ্তরশ্মির মধ্যে মিশে যান। এই রশ্মি ত্রিভুবনের সমস্ত জল পান করে প্রবৃদ্ধ হয়ে উঠবে। সাতটি রশ্মিকে তখন বিষ্ণু সাতটি সূর্যে পরিণত করে দেবেন। সাতটি সূর্য তখন ত্রিভুবন পুড়িয়ে ফেলবে : পৃথিবীকে তখন কূর্মপৃষ্ঠ মত কালো দেখতে হবে। এর পর রুদ্র কালাগ্নি মূর্তিতে প্রথমে পাতাল তার পর পৃথিবী তার পর স্বর্গ পুড়িয়ে ফেলবেন। ত্রিভুবনে যারা জীবিত থাকবেন তারা মহ লোকে এবং সেখান থেকে জন লোকে গিয়ে আশ্রয় নেবেন। এর পর বিষ্ণুর মুখ থেকে মেঘ ও বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়বে। একশ বছর ধরে এক টানা বৃষ্টি হবে এবং সমস্ত অগ্নি নির্বাপিত হবে। বৃষ্টি যখন অসহ্য হয়ে উঠবে বায়ু এসে এই মেঘ অপসারিত করবে। বিষ্ণু তার পর শেষ নাগের কোলে সমুদ্রে যোগ নিদ্রায় এক কল্প শায়িত থাকবেন। দ্রঃ সৃষ্টিতত্ত্ব।

মহদাদি তত্ত্ব সমূহের বিনাশকে প্রাকৃত প্রলয় বলা হয়। দুই পরার্দ্ধ কালের পর কালাগ্নি রুদ্র এই প্রলয় ঘটান। প্রাকৃত প্রলয়ে/মহাপ্রলয়ে নিখিল প্রপঞ্চও ধ্বংস হয়। যোগীর পরমাত্মাতে স্থিতির নাম আত্যন্তিক প্রলয়। (২) ভারতীয় সব পুরাণেই বিশেষ একটি প্রলয়ের উল্লেখ রয়েছে। এই সময়ে বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধারণ করে-ছিলেন। বাইবেল ইত্যাদিতেও এই প্রলয়ের উল্লেখ রয়েছে।

প্রসন্ধি—বৈবস্বত মনুর ছেলে। প্রসন্ধির ছেলে ক্ষুপ। মহা ১৪।৪।২ অনুসারে প্রসন্ধির অপর নাম প্রজাতি।

প্রসন্ন রাঘব—এই বইতে রাম ও বাণাসুর দুজনকেই সীতার প্রণয়ী দেখা যায়।

প্রসূতি—স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার তিন মেয়ে আকূতি, দেবাহূতি ও প্রসূতি। প্রসূতি দক্ষের স্ত্রী। চব্বিশটি মেয়ে হয়। এদের তের জন ধর্মের (দ্রঃ) স্ত্রী। বাকি এগার জনের মধ্যে খ্যাতি ভৃগুকে, সতী-শিব, সম্ভূতি-মরীচি, স্মৃতি-অঙ্গিরস, প্রীতি-পুলস্ত্য. ক্ষমা-পুলহ, সন্ততি/শান্তি-ক্রতু, অনসূয়া-অত্রি, উর্জা-বশিষ্ঠ, স্বাহা-অগ্নিকে এবং স্বধা-পিতৃদেবদের বিয়ে করেন।

প্রস্কণ্ব—কণ্ব মুনির ছেলে।

প্রসেনজিৎ—(১) যাদব রাজ নিঘ্নের দুই ছেলে সত্রাজিৎ (দ্রঃ) ও প্রসেনজিৎ। কার্ত-বীর্যার্জুন (১)>প্রসেনজিৎ (৭)। প্রসেনজিৎ স্যমন্তক মণিটি গলায় বেঁধে এক বার শিকারে যান এবং সিংহের হাতে নিহত হন। সিংহ মণিটি নিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু জাম্ববান (দ্রঃ) সিংহকে নিহত করে মণিটি পান ও ছেলেদের খেলা করতে দেন। কিন্তু অপবাদ রটে কৃষ্ণই প্রসেনজিৎকে হত্যা করে মণিটি আত্মসাৎ করেছেন। (২) রেণুকার পিতা।

প্রহস্ত—সুমালী কেতুমতীর ছেলে। রাবণের এক জন প্রধান মন্ত্রী। লঙ্কার যুদ্ধে অকম্পন মারা গেলে রাবণের আদেশে যুদ্ধে যান ; বিভীষণের হাতে মারা পড়েন। ছেলে জাম্বুমালী। দ্রঃ পুষ্পোৎকটা।

প্রহেতি—(১) এক জন রাক্ষস। ব্রহ্মা এক বার ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েন ; এই ক্ষুধাতে ব্রহ্মা রক্ষামহে বলতে রাক্ষস এবং যক্ষামহে বলতে যক্ষের জন্ম হয়। প্রহেতি রাক্ষস বংশের এবং হেতি যক্ষ বংশের প্রথম পুরুষ। প্রহেতি মনে করতেন ধার্মিক হতে পারলে তবেই পর জীবনে সুখী হওয়া সম্ভব ; ফলে বিয়ে না করে তপস্যা করে মোক্ষ

লাভ করেন। হেতির স্ত্রী কালের বোন ভয়া। (২) এক জন রাক্ষস। সূর্য অর্যমার রথে বৈশাখ মাসে অবস্থান করেন।

প্রহ্লাদ— হিরণ্যকশিপুর ঔরসে রানী কয়াধুর (দ্রঃ) গর্ভে জন্ম। বিষ্ণুর হাতে ভাই হিরণ্যাক্ষ (দ্রঃ) নিহত হলে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং ব্রহ্মার তপস্যা করতে থাকেন। এই সময়ে সুযোগ বুঝে দেবতারা অসুরদের আক্রমণ করেন। তীব্র যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হন; কিন্তু সুযোগ মত ইন্দ্র কয়াধুকে নিয়ে পালিয়ে যান। নারদ তখন কয়াধুকে ইন্দ্রের হাত থেকে উদ্ধার করেন। কয়াধু এর পর কিছু দিন নারদের আশ্রমে ছিলেন। এই সময়ে কয়াধু গর্ভবতী ছিলেন। নারদ গর্ভস্থ শিশুকে বেদ ইত্যাদি পাঠ করান। হিরণ্যকশিপু ফিরে এলে কয়াধুও ফিরে আসেন এবং এর পর প্রহ্লাদের জন্ম হয়। প্রহ্লাদের ভাই সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি ও বাষ্কল। প্রহ্লাদের তিন ছেলে বিরোচন (দ্রঃ) কুম্ভ ও নিকুম্ভ। নারায়ণের নাম পৃথিবী থেকে মুছে দেবার ব্যবস্থা করেন হিরণ্যকশিপু।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের দুই ছেলে ষণ্ড ও অমর্ক রাজপ্রাসাদেই থাকতেন এবং এঁরা প্রহ্লাদের শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ ক্রমশ বিষ্ণুভক্ত হয়ে উঠতে থাকলে হিরণ্যকশিপু প্রথমে ছেলেকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন। বহু চেষ্টা করেন বিষ্ণু দ্বেষী করে তুলতে। আবার কিছু দিন ষণ্ডও অমর্কের কাছে বিদ্যা লাভের পর হিরণ্যকশিপু পরীক্ষা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ছেলের বিষ্ণু ভক্তি দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে মত্তহস্তী, বিষধর সাপ, আগুন ইত্যাদি নানা কিছুর সাহায্যে ছেলেকে হত্যা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সফল হন না। পুরোহিতরা তখন আশ্চর্য হয়ে গিয়ে রাজাকে শান্ত করে প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে পাঠান। এখানে প্রহ্লাদ সতীর্থদের বিষ্ণু মন্ত্র শিক্ষা দিতে থাকেন। রাজা খবর পেয়ে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন। পুরোহিতরা যজ্ঞ করে এক কৃত্যার সৃষ্টি করেন; কিন্তু কৃত্যা বর্শার আঘাতেও কিছু করতে পারে না; অন্য মতে সুদর্শন চক্রে কৃত্যা নিহত হন। এর পর পাহাড়ের চূড়া থেকে প্রহ্লাদকে ফেলে দেওয়া হয়; কিন্তু প্রহ্লাদ একটুও আহত হন না। হিরণ্যকশিপু তখন শম্বরকে ডাকেন; কিন্তু শম্বরের সমস্ত মায়াজাল বৃথা হয়। সব দিক থেকে বিফল হয়ে রাজা আবার ছেলেকে গুরুগৃহে পাঠান। কিছু দিন পরে ফিরে এলে প্রহ্লাদের সঙ্গে হিরণ্যকশিপুর ভীষণ তর্ক হয়। রাজা আবার হত্যার নির্দেশ দেন এবং প্রহ্লাদকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়; এবং প্রহ্লাদের ওপর বড় বড় পাথর এনে দৈত্যরা চাপা দিয়ে ডুবিয়ে মারতে চেষ্টা করে। কিন্তু তবুও প্রহ্লাদ অক্ষত দেহে উঠে আসেন। ছেলেকে ফিরে পেয়ে হিরণ্যকশিপুর কিছুটা অনুশোচনা হয়; প্রহ্লাদকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং সাময়িক একটা মিটমাট হয়।

কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে আবার বিরোধ দেখা দেয়। রাজা ছেলের বিষ্ণু ভক্তি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। এক দিন সন্ধ্যাবেলায় ক্রোধে হিরণ্যকশিপু জানতে চান তাঁর বিষ্ণু কোথায় থাকেন। এবং বিষ্ণুর অধিষ্ঠান সর্বত্র শুনে প্রমাণ করবার জন্য সভাগৃহে সামনে স্ফটিক স্তম্ভটি পদাঘাতে/তরবারির আঘাতে ভেঙ্গে ফেলেন। স্তম্ভের ভেতর থেকে নৃসিংহ মূর্তি বিষ্ণু বার হয়ে হিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ করে কোলের ওপর টেনে এনে নখে করে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেন। প্রহ্লাদ সামনে

শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে স্তব করতে থাকেন। নৃসিংহমূর্তি তার পর বিষ্ণু রূপ ধারণ করে প্রহ্লাদকে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিত হয়ে যান। বিষ্ণুর স্পর্শে প্রহ্লাদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন এবং কামনাহীন হবার ও পিতার পাপমুক্তির বর চেয়ে নেন। এর পর প্রহ্লাদ পাতালে দৈত্যদের রাজা হন।

চ্যবনের কাছে (দ্রঃ কেকর লোহিত) প্রহ্লাদ এক বার শুনতে পান পৃথিবীতে নৈমিষতীর্থ শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ফলে দৈত্যরা সকলে এখানে স্নান করতে যান। প্রহ্লাদ স্নান করে বনের মধ্যে মৃগয়া করতে যান এবং ক্রমশ সরস্বতী তীরে এসে পড়েন। নদীর কাছে এখানে একটি দেবদারু গাছ দেখতে পান; এই গাছের শাখা থেকে অসংখ্য তীর মালার মত ঝুলছে এবং গাছের কাছে নর ও নারায়ণ তপস্যা করেছেন। এঁদের কাছে শার্ঙ্গ ও অজগব দুটি ধনুক ও দুটি অক্ষয় তূণ রয়েছে। প্রহ্লাদ এঁদের চিনতেন না; দুষ্টব্যক্তি মনে করেন এবং কথায় কথায় যুদ্ধ বেঁধে যায়। নর উঠে দাঁড়িয়ে অজগব ধনুক থেকে বাণ বর্ষণ করতে থাকেন; প্রহ্লাদ এই সমস্ত বাণ নিবারণ করেন। শেষ পর্যন্ত প্রহ্লাদ ব্রহ্মাস্ত্র ও নর মুনি নারায়ণাস্ত্র ব্যবহার করেন। কিন্তু অস্ত্র দুটি বিফল হয়। প্রহ্লাদ তখন গদা হাতে তেড়ে এলে নারায়ণ মুনি নরকে সরিয়ে দিয়ে তীব্র যুদ্ধ করেন; প্রহ্লাদের গদা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এবং প্রহ্লাদ বুকে বাণবিদ্ধ হয়ে পড়ে যান। প্রহ্লাদ তখন নারায়ণকে বিষ্ণু বলে চিনতে পারেন এবং স্তব করেন। অন্য মতে পড়ে গিয়ে বিষ্ণুর ধ্যান করতে থাকেন এবং বিষ্ণু দেখা দিয়ে বলেন এঁরা ধর্মদেবের ছেলে, এঁরা অজেয়। এই শুনে প্রহ্লাদ পাতালে গিয়ে হিরণ্যাক্ষের ছেলে অন্ধককে রাজ্য দিয়ে বদরিকাশ্রমে এসে নরনারায়ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য কুটির বেঁধে তপস্যা করতে থাকেন। এঁরা প্রহ্লাদকে আশীর্বাদ করেন। প্রহ্লাদ তার পর পাতালে ফিরে গিয়ে কুটির বেঁধে বাস করতে থাকেন। অন্ধককে উপদেশ দিতেন, আশীর্বাদ করতেন কিন্তু রাজ্যভার আর গ্রহণ করেন নি।

অন্ধক কিছুদিন রাজত্ব করার পর দেবাসুরের আবার যুদ্ধ হয়। ইন্দ্রের সঙ্গে প্রহ্লাদ ১০০ বছর যুদ্ধ করেন এবং হেরে গিয়ে বিরোচনের ছেলে বলিকে (দ্রঃ) রাজা করে দিয়ে গন্ধমাদন পর্বতে গিতে তপস্যা করতে থাকেন। উশনস এক বার প্রহ্লাদের স্তব করেছিলেন। রাজা পৃথুর সময়ে গো-রূপা পৃথিবীকে অসুররা দোহন করেন; প্রহ্লাদ বৎস (দ্রঃ বিরোচন) সাজেন এবং সুরা লাভ করেন। বিরোচন ও সুধন্বার (দ্রঃ) কলহ দেখা দিলে প্রহ্লাদ মধ্যস্থতা করেছিলেন। প্রহ্লাদ এক বার স্বর্গ জয় করে ইন্দ্রকে তাড়িয়ে দিলে ইন্দ্র বৃহস্পতির উপদেশে শুক্রাচার্যের কাছে যান। শুক্র বলেন প্রহ্লাদ অত্যন্ত সৎ ও গুণবান। প্রহ্লাদের এই সব গুণ ইন্দ্রকে সংগ্রহ করতে হবে। ইন্দ্র তখন ব্রাহ্মণ বালক বেশে প্রহ্লাদের শিষ্য হয়ে ধর্ম শিক্ষা করতে চান। শিষ্যের ভক্তিতে শেষ পর্যন্ত প্রীত হয়ে প্রহ্লাদ বর দিতে চান এবং ইন্দ্র তখন গুরুর সমস্ত সৎগুণ বর চান। প্রহ্লাদ বর দেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রহ্লাদের দেহ থেকে সমস্ত সৎগুণ ছায়ার মত বার হয়ে ব্রাহ্মণ বালকের দেহে গিয়ে প্রবেশ করে। সমস্ত গুণ ইন্দ্র এই ভাবে লাভ করলে প্রহ্লাদ তখন সব বুঝতে পারেন। এই সময় থেকে প্রহ্লাদের ক্রমশ অবনতি হতে থাকে এবং ইন্দ্র ক্রমশ যুদ্ধে জিততে থাকেন।

প্রাক্ জ্যোতিষপুর—নরকাসুরের রাজধানী। নরকাসুরের পর ভগদত্ত এবং তারপর

বজ্রদত্ত রাজা হন।

প্রাকৃত ভাষা—প্রাচীন বৈয়াকরণ ও আলংকারিকদের উল্লিখিত ভাষা। কিছু সংস্কৃত নাটকে, কিছু কাব্যগ্রন্থে এবং জৈন শাস্ত্র ইত্যাদি নানা স্থানে কিছু কিছু দেখা যায়। আধুনিক বাংলা; হিন্দি, গুজরাতি, মারাঠি ইত্যাদি ভাষার পূর্ববর্তী ভাষা। অশোকের অনুশাসনে ব্যবহৃত। একটি আঞ্চলিক প্রাকৃত বৌদ্ধদের হাতে পালি ভাষাতে পরিণত হয়। কোন কোন মতে সংস্কৃত থেকে জাত। উৎপত্তি মোটামুটি খৃ পূ ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে; স্থিতিকাল খৃষ্টীয় ১০-১১ শতক পর্যন্ত। এই দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে তিনটি স্তর দেখা যায়:—আদি মধ্য ভারতীয়; মধ্য-ভারতীয় (=প্রাকৃত নামে পরিচিত) এবং অন্ত্য মধ্যভারতীয় (=অপভ্রংশ)। আদি প্রাকৃত অর্থে অশোকের অনুশাসনের ভাষা ও উপভাষা: খরোষ্ঠী অক্ষরে লেখা ধম্মপাদের ভাষা এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রধান ভাষা অর্থাৎ পালি। এই স্তরের জীবন মোটামুটি ৫০০ বছর। দ্বিতীয় স্তরও মোটামুটি ৫০০ বছর ছিল; এই স্তরের শেষ অর্দ্ধেকের ভাষাগুলিই সাহিত্যিক প্রাকৃত। সাহিত্যিক প্রাকৃতের অন্তর্গত শাখা মহারাষ্ট্রী, সৌরসেনী, অর্ধমাগধী, মাগধী, ও পৈশাচিক। এগুলির মধ্যে শৌরসেনী অনেকটা সংস্কৃত ঘেঁষা। পৈশাচী মনে হয় পালিরই রূপান্তর ও নামান্তর। দ্রঃ নিয়া প্রাকৃত।

প্রাচীন বর্হিস্—রাজা হবির্ধান ও স্ত্রী ধিষণার (অগ্নিবংশে) ছেলে প্রাচীনবর্হিস, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ও ব্রজ, অজিন। এদের মধ্যে প্রাচীনবর্হিস এক জন বিখ্যাত প্রজাপতি। পূর্বদিকে (প্রাচী) মাথা করে সারা পৃথিবীতে দর্ভঘাস (বর্হিস=কুশশয্যা) বপন করেছিলেন বলে নাম প্রাচীনবার্হিস। কঠোর তপস্বী। স্ত্রী সমুদ্রের কন্যা সবর্ণা; দশটি ছেলে; ছেলেদের নাম প্রচেতস্; ধনুর্বিদ্যায় বিশারদ। প্রচেতসরা বহুদিন জলে ডুবে তপস্যা করেন। ব্রহ্মা প্রাচীনবর্হিসকে বলেন ছেলেদের বিয়ে দিতে। পিতার কাছে ব্রহ্মার কথা শুনে সমুদ্রে বসে এঁরা আবার দীর্ঘ দিন তপস্যা করেন এবং বিষ্ণু দেখা দিয়ে প্রজা সৃষ্টির বর দিয়ে যান।

প্রাজাপত্য—কোন ব্রহ্মচারীকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে এনে যথাবিধি তাঁর পূজা ইত্যাদি করে তাঁর সঙ্গে মেয়ের বিয়ের দেওয়া।

প্রাণ—(১) সোম ও মনোহরার ছেল প্রাণ, বর্চস, শিশির ও রমণ চার ভাই। (২) ধাতার ছেলে প্রাণ; প্রাণের ছেলে দ্যুতিমান এবং দ্যুতিমানের ছেলে রাজপাল। দ্রঃ বায়ু।

প্রাণায়াম—প্রাণ=বায়ু, আয়াম=নিয়ন্ত্রণ; অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের গতি ও হার নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া। এক নাকে বাতাস গ্রহণ (কাজটি পুরক) করে দুই নাক বন্ধ করে এই বাতাস আটকে (এটি কুম্ভক) রেখে পরে দ্বিতীয় নাক দিয়ে এই বাতাস বার করে দেওয়া (=রেচক) এই তিনটি মূল প্রক্রিয়া। পুরকের চারগুণ সময় কুম্ভক অর্থাৎ বাতাস ধারণ করতে হয় এবং দ্বিগুণ সময় রেচকে/নিশ্বাস ত্যাগে ব্যয় করা হয়। এই সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক মন্ত্র জপ করতে হয়। যোগের অষ্টম অঙ্গ এই প্রাণায়াম। আসনে বসে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজ বন্ধ করে একটি মাত্র বিষয়ে মন সংযোগ করে এই নিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করলে আত্মশুদ্ধি হয়। দেহ রথ, ইন্দ্রিয়গুলি অশ্ব, মন সারথি, প্রাণায়াম কশা। প্রাণায়ামে জ্ঞানের আবরক কর্ম ক্ষয় হয়; মনে দীপ্তি ও বিশুদ্ধি

আসে। প্রাণায়াম দ্বারা পূজার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। পূজার আদিতে ও অন্তে প্রায়শ্চিত্ত হিসাবেও প্রাণায়াম কর্তব্য।

প্রাতর—(১) সপ্তম আদিত্য ধাতা ও স্ত্রী রাকার ছেলে (ভাগবৎ)। (২) কৌরব্য বংশে একটি সাপ, সর্পযজ্ঞে নিহত। অপর নাম পাতর (মহা ১।৫২।১২)।

প্রাতিকামী—দুর্যোধনের সারথি। পাশা খেলাতে যুধিষ্ঠির হেরে গেলে দুর্যোধনের নির্দেশে দ্রৌপদীকে সভাতে নিয়ে আসতে যান। দ্রৌপদী ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে নিহত হন।

প্রাপ্তি—জরাসন্ধের মেয়ে; অস্তির বোন; কংসের স্ত্রী।

প্রাবীরকর্ণ—ইন্দ্রদ্যুম্নের হ্রদে অমর একটি পেচক। প্রকারকর্ণ (মহা ৩।১৯১।৪)।

প্রায়শ্চিত্ত—কৃত পাপের জন্য অনুষ্ঠানাদি। বহু ক্ষেত্রেই এই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা শারীরিক শাস্তিতে রূপান্তরিত। ব্রহ্মহত্যার একটি প্রায়শ্চিত্ত ছিল নিজের প্রাণ উপেক্ষা করে এক জন ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করা। মদ্যপানের প্রায়শ্চিত্ত ছিল উত্তপ্ত সুরা, জল, গব্যঘৃত গোমূত্র, বা গোদুগ্ধ খেয়ে মৃত্যুবরণ। গোবধের প্রায়শ্চিত্ত ছিল এক মাস সংযত হয়ে থাকা, পঞ্চ গব্যপান, গোশালাতে শয়ন, গরুর পরিচর্যা ও মাসান্তে গোদান। বহু উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে চান্দ্রায়ণ, পরাক (১২ দিন উপবাস) বা শত বা শতাধিক প্রাণায়াম। পূর্ব দিনে মস্তক মুণ্ডনের ব্যবস্থাও ছিল।

প্রাস—ক্ষেপণাস্ত্র। সাত হাত লম্বা বাঁশ ইত্যাদির মাথায় লোহার তীক্ষ্ণ ফলক; মূলে তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম লৌহ শলাকা। ফলকের নীচে ও মূলে রেশমের স্তবক। চার রকম ব্যবহার :—আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ধুনন ও পশ্চাৎ বিদ্ধকরণ।

প্রিয়দর্শন—দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের যুদ্ধে কর্ণের হাতে নিহত দ্রৌপদীর এক ভাই।

প্রিয়ব্রত—ব্রহ্মা ও শতরূপার ছেলে। অন্য মতে স্বায়ম্ভুব/বৈবস্বত মনুর বড় ছেলে। কশ্যপ > বিবস্বান = বৈবস্বত মনু > প্রিয়ব্রত। প্রজাপতি বিশ্বকর্মার মেয়ে বর্হিষ্মতীকে অন্য মতে সুরূপা ও বর্হিষ্মতী দুই বোনকে বিয়ে করেন। সুরূপার দশ ছেলে :- অগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, রুক্মশুক্র/হিরণ্যরেত, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র ও কবি এবং এক মেয়ে উর্জস্বতী সবচেয়ে ছোট। অন্য মতে অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, বপুষ্মান, দ্যুতিমান, মেধস্, মেধাতিথি, ভব্য, সবন, পুত্র ও জ্যোতিষ্মান এবং দুই মেয়ে সম্রাট ও কুক্ষি। কবি, সবন ও মহাবীর এঁদের জীবনে বৈরাগ্য আসে এবং এঁরা তপস্যায় আত্ম নিয়োগ করেন। মেধস, অগ্নিবাহু ও পুত্র এই তিন জন যজ্ঞ প্রিয় ও জাতিস্মর ছিলেন। বর্হিষ্মতীর ছেলে উত্তম, তাপস ও রৈবত; এঁরা মন্বন্তরাধিপ হন। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে :- অগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপে, বপুষ্মান-শাল্মলীদ্বীপে, দ্যুতিমান ক্রৌঞ্চদ্বীপে, মেধাতিথি প্লক্ষদ্বীপে, ভব্য শাকদ্বীপে, সবন পুষ্করদ্বীপে ও জ্যোতিষ্মান কুশ দ্বীপে রাজা হন। বিষ্ণুপুরাণ মতে কর্দম প্রজাপতির মেয়ে কাম্যা এঁর স্ত্রী; দুই মেয়ে এবং দশ ছেলে, তিনটি ছেলে অত্যন্ত ধার্মিক বাকি সাত ছেলেকে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী দান করেন। সূর্য আলো দিয়ে অর্দ্ধেক পৃথিবী অলোকিত করতেন। এতে অসন্তুষ্ট হয়ে প্রিয়ব্রত তাঁর বেগবান জ্যোতির্ময় রথে চড়ে সূর্যের পেছু পেছু মেরু পর্বত পরিক্রমা করেন অর্থাৎ সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে রাত্রিকে দিনে পরিণত করতে চেষ্টা করেন। রাত্রি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং দিনের সূর্য ম্লান দেখাতে থাকে। সূর্য চিন্তিত

হয়ে পড়েন। ত্রিমূর্তির অনুরোধে প্রিয়ব্রত শেষ পর্যন্ত এই পরিক্রমা বন্ধ করেন। কিন্তু তাঁর রথের চাকায় এই সাত দিনে সাতটি গর্ত হয়েছিল ; এগুলি সাতটি সমুদ্রে পরিণত হয় এবং সমুদ্রগুলিই সাতটি দ্বীপ বা মহাদেশ সৃষ্টি করেছে। দশকোটি বছর প্রিয়ব্রত সুখে রাজত্ব করে অগ্নীধ্রকে রাজ্য দিয়ে পরিণত বয়সে বনবাসী হন। দ্রঃ আকৃতি, অগ্নিবাহু।

প্রীতি—পুলস্ত্যের স্ত্রী।

প্রেত—মৃত্যুর পর মানুষ প্রেত দেহ পায়। আদ্যশ্রাদ্ধ থেকে সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত ১১টি শ্রাদ্ধের দ্বারা প্রেতত্বের বিমুক্তি হয়। এর পর নিজের কর্ম অনুসারে প্রেত স্বর্গে বা নরকে যায়। শবদাহ থেকে সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত সব কাজগুলি প্রেতকৃত্য। গয়াতে প্রেতশিলাতে পিণ্ডদান করলেও প্রেতত্বের অবসান হয়।

প্লক্ষদ্বীপ—প্রিয়ব্রতের ছেলে ইধ্মজিহ্ব এখানে রাজা। এখানে পাহাড় :-গোমেদ চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি, সোম, ঋষভ ও বিভ্রাজ। অন্য মতে মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান্, সুবর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীবী ও মেঘমালা। নদী ও সাতটি :-অনুতপ্তা, শিখী, বিপাশা ত্রিদিবা, কৃতা, সুকৃতা, অমৃতা। অন্য মতে অরণা, নৃমণা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতা, ঋতম্ভরা ও সত্যম্ভরা। দ্বীপটি ক্ষীরোদ সাগরকে সংবেষ্টয়িত্বা অবস্থিত। দ্বীপটিকে অভয়, শিব, বয়স, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম ও অমৃত এই সাতটি ভাগ করে সাত ছেলেকে দেন। মধ্যম পাণ্ডব ভীম এই অভয় রাজ্য জয় করেছিলেন।

—(*)—